পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

(নব পর্য্যায়)
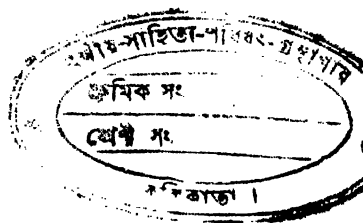
শ্রীজানকীবল্লভ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

নবম বর্ষ।

১৩৩২ সন।

কোচবিহার।

কোচবিহার ষ্টেট প্রেসে—
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা বার আনা।

পরিচারিকা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী—১৩৩২।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩৩২ সাল। | ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

'ভক্তি হউক সর্ব্বজয়া,
মাগছি ক্ষমা, মাগছি দয়া
কৃতজ্ঞতার অশ্রু ছাপায়
আসলো ঘাটে পারের তরী।
আজ সবারে প্রণাম করি।'

'আসলো ঘাটে পারের তরী,'— সুদীর্ঘ কর্ম্ম জীবনের একটি বৎসর আজ অবসান হইল। মুহূর্ত্তের আরাম-আনন্দ, বিশ্রাম। কত আশা, কত আশঙ্কা, বাধাবিপত্তি এ-কর্ম্ম প্রবাহে, যে বিরাট সর্ব্বশক্তিমান্ মহান পুরুষের অনুকম্পায়, যাঁহার শক্তিপুঞ্জের সাহচর্য্য,

দয়াদাক্ষিণ্যে, উৎসাহে বৎসরান্তে নববর্ষে নব অনুরাগে সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবার আবার সুযোগ উপস্থিত, স্বতঃই আজ তাঁহাদের দয়া স্মরণে আসিয়া 'কৃতজ্ঞতার অশ্রু ছাপায়' আপনি,—দেহমন আনত হইয়া আসে! কত ত্রুটি এ জীবনে—সম্বল মাত্র দয়া—মাগছি ক্ষমা, মাগছি দয়া—তাহাই হউক পরিচারিকার সম্বল। ভক্তি হউক সর্ব্বজয়া। সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে মন প্রাণকে সর্ব্বগর্ব্ব হইতে বিমুক্ত করিয়া একান্ত নির্লিপ্ত অন্তরে শরণাগত হই তাঁহার বরাভয়প্রদ শ্রীশ্রীচরণ-মহাতীর্থে—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

প্রণাম করি—সহস্র সহস্রবার প্রণাম করি। যাঁহার আহ্বানে বিশ্বে কর্ম্ম প্রবৃত্তি, যাঁহার কর্ম্ম—জীবনের ধর্ম্ম,—যাঁহার নিয়োগে কর্ম্ম—যিনি আদি, যিনি মধ্য,—যিনি অন্ত—অনাদিমধ্যান্তম্,—তিনিই এ আয়োজনের কর্ত্তা, তিনিই করিয়াছেন রক্ষা—তিনিই করিবেন সর্ব্বকর্ম্মের ব্যবস্থা। ক্ষমতা অক্ষমতার বিচার কর্ম্মীর নহে, হিসাবনিকাশের খতিয়ানের আবশ্যক নাই। যে আনন্দ-স্বরূপের আহ্বানে, আনন্দ-আস্বাদে, শুভাশুভের, তর্কবিতর্কের অতীত হইয়া উপনীত এ জীবনে তাঁহাকেই সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। কর্ম্মের বিচারক তিনিই কেবল,—প্রাণের প্রার্থনা তাঁহার শ্রীশ্রীচরণে নিবেদিত হউক; হে দেবতা,—হে কর্ম্মনিয়ন্তা—হে সর্ব্বাশ্রয়—

'তোমারে সঁপেছি দিনের কর্ম্ম,
তোমারে সঁপেছি প্রাণ,—'

গ্রহণ কর—গ্রহণ কর—সার্থক কর জীবন—তোমার আনন্দ-সত্তায় হই সার্থক·

"তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে
বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে।
তব আনন্দ পরম দুঃখে মম
জ্বলে' উঠে যেন পুণ্য-আলোক সম,
তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি
ফুটে ওঠে ফেটে আমার সকল কাজে।"

সেই হয় যেন পরিচারিকার পুরস্কার।

একি পুরস্কার! তব আনন্দ দুঃখেও পুণ্য-আলোক সম উদ্ভাসিত—দৈন্যেও শক্তি,অনুভূতিতে সবল; বলিবার অধিকার নাই কর্ম্মীর, যন্ত্রীর যন্ত্রের,—'অক্ষম আমি, দীন আমি, অক্ষমের স্কন্ধে কেন এ গুরুভার দেবতা!' কে দীন,—কোথায় দৈন্য—সর্ব্বশক্তিমান্ যাহার নিয়ন্তা, শক্তি-দেবতার সেবক যে, আত্মদৈন্যের বিহ্বলতাও তাহা'র প্রত্যবায়। কিসের দৈন্য কিসের ত্রাস? শক্তি তাহা—মহাদান তোমার,—ক্ষুণ্ণ হইবার কি আছে? তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে। নয়নের বারি নয়নে নিবারি' তাই সর্ব্বদুঃখ সর্ব্বত্রাসবিমুক্ত মনে শরণাগত হই তোমাতে!

দীর্ঘ অষ্ট বর্ষ ব্যাপী যাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিবার অধিকারী করিয়াছিলে,—তিনি আজ দূরে,—কর্ম্মান্তরে। নিঃস্বার্থ পূজারিণী আজ শিশির সম্পাতে বিকশিত, প্রস্ফুটিত সার্থক হউন তিনি,—তাঁহার প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ-মধু অমৃত পরিণত হউক। তাঁহার ভাষাতেই বলি—

"এই শিশিরেই ফুটিবে গো ফুল
এই শিশিরেই ফুটিবে,
প্রেম পরাগে নয় অতুল
চরণ তলে লুটিবে।"
তাই—
"আজ দুঃখ নিয়ে সরে' থাকা
সাজেই না যে,
তাঁর চরণধূলি লুট্ করে নাও
মনের মাঝে।"

চরণধূলি সম্বল করি'—দীন ভক্তের প্রার্থনা এই—

"সুন্দর, তুমি লহ লহ মোরে,
লহ জীবনের সাধন ধন,
সুন্দর কর তোমার আদরে
আমার সেবার এ আয়োজন।

———*———

সাগর পারের মাণিক।

—:*:—

মায়ার পূরে কে আজ জাগে
আঁধার রাতের পুলক ভরা,
ব্যথায় আঁখি ক্লান্ত করুণ
মৌন নীরব স্বপন জড়া।

মনের কোঠায় প্রদীপ জ্বেলে
বুন্‌চে কে জাল সোনার তারে
ঘুমের দেশে এ কোন্ হাসি
কাজ্‌লা চোখের অশ্রু ধারে!

কুহেলি আর আব্‌ছা মাখা
মেঘ নীলিমার ওপার হ'তে
সুরের কণা ঝর্‌চে কাহার
অরুণ-ঢাকা ছায়ার পথে।

আলোক চুমা অলখ্ দেশে
কাঁকণ কাহার উঠ্‌চে রণি।
বনের ঝরা শুক্‌নো পাতায়
বাতাস্ জাগায় চরণ ধ্বনি।

জমাট মধু নিঙ্ড়ে ঢালা
অচিন্ বঁধুর আবেশ ছোঁয়া
সাঁজের মাঠে ঘনায় কাহার
আরতি আর পূজার ধোঁয়া !

শাল পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা
ডুব্তে যাওয়া চাঁদের আড়ে—
পথিক মেঘের আঁচল দোলা
দোল্ দিয়ে যায় মনের দ্বারে।

হঠাৎ কে আজ চম্কে ওঠে
উতল গতির উদাস বায়ে
বুকের কোণে কাঁপন ধরে
ফাগুন রাতের আগুন ছায়ে।

রূপ ঝরণার চপল সাথী
নীরব দিঠির বেদন ভাষা
সাগর পারের মাণিক কে ও
তরুণ বুকের গভীর আশা।

বন্দে আলী।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ।

প্রথম প্রস্তাব, বাঙ্গালা দেশ,—ভৌগোলিক আয়তন ও সীমা।

কোন দেশের কোন কথা বলিতে হইলেই প্রথমে সেই দেশের ভৌগোলিক সীমা অথবা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা উচিত। বাঙ্গালাদেশের রাজনৈতিক বিভাগ লইয়া সীমা ধরিতে পারিলে বড় সুবিধা হইত, কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমাদের এই অভাগ্য দেশে রাজ-নৈতিক নামের গৌরব বড় অধিক ; এমন কি আমরা সেই নাম-নির্দেশের উপরই দেশের যাবতীয় গবেষণার সীমাকে নিবদ্ধ রাখিতে ভালবাসি। আর, পরের কথার অনুবাদ এবং অনুকরণ করিতে করিতে আমাদের বুদ্ধি এরূপ জড় হইয়া গিয়াছে যে অনুবাদ করিয়া কাজ চালাইতে পারিলে আমাদের দেশের লেখকগণ "পুত্রজন্মোৎসব"-সুখ অনুভব করিতে থাকেন,—স্বাধীনভাবে চিন্তার দায় আর থাকে না। গ্রীকেরা সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র এক ভূভাগকে (প্রাচীন কালে যাহাকে **সিন্ধু-সৌবীর** বলিত) "ইণ্ডিয়া" বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী য়ুরোপীয়গণ সেই নামই মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাঠানেরা এ দেশের যে অংশটুকু প্রথমে দখল করিতে পারিয়াছিলেন, সেই টুকুকে "হিন্দুস্তান" (হিন্দুদিগের বাসভূমি বা 'স্থান',—পারসীক ভাষায় সংস্কৃত 'স্থান' শব্দ উচ্চারণ বৈকল্যে 'স্তান' হইয়া যায়) বলিতে লাগিলেন। মোগলেরা পাঠানের রাজ্যের সহিত রাজ্যের নামেরও অধিকারী হইয়া ঐ "হিন্দুস্তান" নামই চালাইতে লাগিলেন। দক্ষিণাপথ মোগলের মুখে "দখিন" হইল। ইংরাজ প্রথমে দক্ষিণাপথে আসিয়া উহাকে "ডেকানে" পরিণত করিয়া লইলেন এবং প্রথম প্রথম উত্তরাংশকে "ইণ্ডোষ্টান"—(ইংরেজের উচ্চারণ-শক্তি পারসীকগণের অধিক,—তাঁহারা পারসীক "হিন্দুস্তান"কে—"ইণ্ডোষ্টান" করিলেন!) বলিতে লাগিলেন (১), এবং পরে সমগ্র রাজ্যের জন্য গ্রীকদিগের "ইণ্ডিয়া"কেই স্বীকার করিয়া

(১) খৃষ্টীয় ১৭৬৪ অব্দে (তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে) প্রকাশিত Robert Orme. Esqr. F. A. S. কর্ত্তৃক সংকলিত A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan from the year MDCCXLV.

লইলেন। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এবং মলয় "Further India" এইরূপ ইংরাজী নাম পাইয়াই ধন্য হইল। ইংরেজের শিষ্য আমারা বেশ সুশীল এবং সুবোধ ছাত্রের মত "ইণ্ডিয়া"কে "ভারতবর্ষ" বলিয়া তরজমা করিলাম। আমাদের ঋষিরা যে পূর্বে জাপান হইতে পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত অর্থাৎ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা (চীনদেশে 'পি-লিঙ', তিব্বতে কিউন্-লু-এন, ভারত-খণ্ডে 'হিমালয়া' ও 'কারাকোরাম', আফগানিস্তানে 'হিন্দুকুশ', পারসিয়ায় 'এলবাজ', আরমেনিয়ায় 'ককেশাস্', এবং এসিয়া মাইনরে 'টরাস্' নামে এই একই পর্বতমালা পরিচিত (২)) হইতে দক্ষিণে মহাসাগর পর্যান্ত বিস্তৃত এই সুবিশাল মহাদেশকে "ভারতবর্ষ" নামে পরিচিত করিয়াছেন, সে সংবাদ লইবার আবশ্যকতা আমাদের কেহই বোধ করিলেন না (৩)। Indian Historyর তরজমা "ভারতবর্ষের ইতিহাস" এখনও আমরা লিখিতেছি এবং পড়িতেছি।

অনেকে বলিতে পারেন, আমি পুরাণের পচা-পাতা লইয়া মহা মহা পণ্ডিতগণের গৃহীত সংজ্ঞার মর্যাদা নষ্ট করিতেছি। প্রকৃত কথা তাহা নহে। আমরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য পুরাতন জাতি, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের নিকটই সমুদয় জগৎ সভ্যতার আলোক পাইয়া ধন্য হইয়াছে (৪), পুরাতন ভিন্ন আমাদের উপায় নাই; আর পঞ্চম-বেদ পুরাণ যে বড়ই পুরাতন (৫), তাহাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না। এক্ষণে আমরা যতই নূতন হই, পুরাতন এবং পুরাণকে ছাড়িলে আমাদের রক্ষা নাই। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বে **লিখিত** (কেবল রচিত নহে, লিপির সাহায্যে লিখিতও বটে) পাণিনি মুনি-কৃত ব্যাকরণ, মনু মহারাজের "মনুসংহিতা" এবং

(২) Charles Rollins' Ancient History, Vol. I, Introduction, Page XVI. Arian's Indika, &c. &c.

(৩) বায়ুপুরাণ, ৪৫ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৭ অধ্যায় এবং অন্যান্য মহাপুরাণ।

(৪) "এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব-মানবাঃ॥ ২০॥" মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৫) অতি প্রাচীন সামবেদীয় "ছান্দোগ্য উপনিষদ্" এবং যজুর্বেদীয় "বৃহদারণ্যক উপনিষৎ" শ্রুতিতে সনৎকুমার-নারদ-সংবাদে "পুরাণ পঞ্চম বেদ" উল্লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় শতার্ধ বৎসর পূর্বের কালিদাস কৃত কাব্য-নাটকাবলী প্রভৃতি অনেক পুরাতন পুথি আমাদের নব্য সভ্য কলেজে পড়া হইয়া থাকে। ইস্কুলের নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য বৃদ্ধ বিষ্ণুশর্মার সঙ্কলিত "পঞ্চতন্ত্রম্" (যাহা নানা নামে এবং নানা ছাঁদে 'পড়ান' হইয়া থাকে তাহাও) কম পুরাতন নহে। য়ুরোপীয় বিদ্যার ভাণ্ডারে এরূপ পুরাতন পুথি বড়ই বিরল। টোলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে ত আমাদের "বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত" সমস্তই "শেষ" করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায়, য়ূরোপের "রেনেস াঁস্" (Renaissance) অথবা "নবযুগে"র পরবর্তী সময়ে জাত বিদ্যার ভাণ্ডার যে চাবি দিয়া খুলিতে পারা যাইবে, এ দেশের অপরা অথবা পরা-বিদ্যার প্রাচীন ভাণ্ডার সে চাবি দিয়া কখনই খুলিতে পারা যাইবে না,—অন্ততঃ সহজে ত নহে। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কলেজের আই, এ, (Intermediate Examination in Arts) পরীক্ষার সংস্কৃত পাঠ্য-তালিকায় কালিদাস-কৃত "কুমার-সম্ভবম্" কাব্য ভুক্ত আছে, অর্থাৎ ঐ পরীক্ষার পড়ুয়াদিগকে ঐ কাব্যখানি পড়িতে হয় এবং অধ্যাপক মহাশয়দিগকেও অগত্যা পড়াইতে হয়। আজকাল কলেজে যাঁহারা সংস্কৃত কাব্যাদি শাস্ত্র পড়ান, তাঁহাদের মধ্যে, সকলে না হইলেও, অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বি-এ, উপাধি লইয়া সংস্কৃত-ভাষার কোনও শাখার এম-এ উপাধি লইয়াছেন। তাঁহারা যে সুশিক্ষিত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। "কুমারসম্ভব" কাব্যখানির প্রথমেই এই শ্লোকটি আছে,—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ বারিনিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥ (৬)

---

(৬) "আছেন উত্তরদিকে দেব আত্মময়
অচল-কুলের রাজা নাম হিমালয়।
পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই পারাবার
মগ্ন করি রাখিয়াছে দুই প্রান্ত তাঁর।
শৈলেন্দ্রের সুবিশাল শরীর আয়ত।
শোভিতেছে বসুধার মানদণ্ড মত ॥ ১ ॥

লেখক-কৃত অনুবাদ। (পাণ্ডু-লিপি হইতে উদ্ধৃত।)

এই শ্লোকের হিমালয় যে "পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত থাকিয়া পৃথিবীর মানদণ্ড অথবা মাপকাঠির মত অবস্থিত রহিয়াছেন", তাহার চাক্ষুষপ্রমাণ এসিয়ার মানচিত্র খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কালেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা অবশ্যই নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি মত এই বিষয় স্ব স্ব ছাত্রকে বুঝাইয়া দেন। কলিকাতার কোন কলেজের এক সুবিদ্বান্ অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল আজি কালি অনেক সংস্কৃত-ভাষার কাব্য-নাটকাদির 'কি'-কর্তা (Key-maker-চাবি-ওয়ালা ?) রূপে ছাত্র-সমাজে সুখ্যাতি পাইয়াছেন। তিনি কালিদাসের উক্ত শ্লোকের অর্থ অথবা মর্ম বুঝাইতে গিয়া মানদণ্ডের অর্থ 'মাপকাঠি' না করিয়া "দাঁড়িপাল্লা" করিয়াছেন। এখনকার ইংরাজী (অথবা তাহারই নকল বাঙ্গালা) মানচিত্রে "ইণ্ডিয়া" দেশের উত্তরে The Himalaya Mountains অথবা হিমালয় পর্বতমালাকে পশ্চিমে আফ্‌গানিস্তানের উত্তর-পূর্ব হইতে পূর্বে আসামদেশের উপর পর্যন্তই দেখিতে পাওয়া যায়,—এবং কোন সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায় না। তাই তিনি "পূর্বাপরৌ বারিনিধী বগাহ্য" (পূর্ব এবং পশ্চিম এই উভয় সমুদ্রে অবগাহন করিয়া) এই বাক্যাংশের অর্থ করিতে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছেন যে ঐ পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশ দক্ষিণ মুখে বাকিয়া "সুলেমান বা হালা" ইত্যাদি নামে আফ্‌গানিস্তান বেলুচিস্তান ও ইণ্ডিয়ার সীমা-নির্দেশক 'আইল' স্বরূপে আরবসাগরে এবং উহার পূর্বাংশ একদিকে আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের ও অন্যদিকে ব্রহ্মদেশের মধ্যসীমার নির্দেশ করিয়া দিতে দিতে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে,—এবং সেই জন্যই কবি লিখিয়াছেন যে 'হিমালয়ের দুই প্রান্ত পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই সাগরে স্নান করিতেছে।' এই ব্যাখ্যা সঙ্গত হইলে হিমালয়ের আকার ⌐¬ এইরূপই হয়, সুতরাং "চাবি-ওয়ালা" মহাশয় কালিদাসের "মানদণ্ডের" অর্থ "তুলাদণ্ড" বা ওজনের "দাঁড়িপাল্লা" করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ অর্থের আবিষ্কারের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয় বটে, কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে,—তাঁহার পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে। "পৃথিবীর ওজনের দাঁড়িপাল্লা" যদি হিমালয় হন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীর উপর পড়িয়া থাকিলে কি করিয়া সেই কার্য সিদ্ধ হইবে ? যদি, সেই পাল্লার একদিকে পৃথিবীকে রাখা যায়, অন্য দিকের "বাট্‌খারা" বা "পড়েন" (weight) কোথায় পাওয়া যাইবে ? আর,

এইরূপ "হতোপমা" দ্বারা "উপমা কালিদাস্য" প্রবাদেরই বা মান রক্ষা কিরূপে হইবে? অপর দিকে, যদি আমরা মল্লিনাথের ব্যাখ্যা অর্থাৎ—

"হিমালয়ঃ অস্তি। কথংভূতঃ? পূর্বাপরৌ প্রাচ্যপশ্চিমৌ তোয়নিধী সমুদ্রৌ বগাহ্য প্রবিশ্য। অতএব পৃথিব্যা ভূমের্মানং হস্তাদিনা পরিচ্ছেদঃ। ভাবে ল্যুট্। তস্য দণ্ডঃ। যদ্‌ বা মীয়তেঽনেনেতি মানম্। করণে ল্যুট্। স চাসৌ দণ্ডশ্চ স ইব স্থিতঃ। আয়াম-পরিচ্ছেদেক দণ্ড ইব স্থিত ইত্যর্থঃ। পূর্বাপরসাগরাবগাহিত্বং চাস্য হিমালয়স্যাস্ত্যেব। উক্তং চ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণে বর্ষপর্বতৌ। পূর্বপশ্চিমগাবেতাবর্ণবান্তরূপস্থিতৌ॥' অত্র হিমাচলস্যোভয়াব্ধিব্যাপ্তিসাম্যান্মানদণ্ডত্বেনোৎপ্রেক্ষণাদুৎপ্রেক্ষালংকারঃ।" (৭)

এই অর্থ গ্রহণ করি, অর্থাৎ মানদণ্ডকে "মাপকাঠি" ধরিয়া লই, তাহা হইলে উৎপ্রেক্ষা এবং মর্ম বেশ বজায় থাকে। আসল কথা এই যে, এই শ্লোকে কবি কালিদাস নূতন কোন কথা বলেন নাই, কেবল পুরাতন "পুরাণ" গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়া "হিমালয়কে পূর্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত" লিখিয়া গিয়াছেন, এবং কেবল নিজের অভ্যাস বশতঃ মানদণ্ডের উৎপ্রেক্ষাটি দিয়াছেন মাত্র। টীকাকার সূরি মল্লিনাথ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া কালিদাসের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নহে,—বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, এবং মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি প্রায় সমুদায় মহাপুরাণেই বর্ষপর্বত হিমালয়ের উল্লেখ এবং বর্ণনা আছে। পুরাণের মতে জম্বুদ্বীপে (এসিয়া?) "হিমবান্, হেমকূট (কৈলাস), নিষধ, নীল, শ্বেতশৃঙ্গ এবং শৃঙ্গবান্" এই ছয়টি বর্ষপর্বত আছে এবং উহারা সকলেই জম্বুদ্বীপের (পৃথিবীর) মানদণ্ডের মত উহার সমস্ত আয়তন ব্যাপিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহাদের প্রত্যেকেরই পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রান্ত যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে মগ্ন রহিয়াছে। ঋষিরা বলিতেছেন,—

"জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ।
প্রাগায়তাঃ সুপর্বাণঃ ষড়িমে বর্ষপর্বতাঃ।
অবগাঢ়া উভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব-পশ্চিমৌ॥ ১৩।"

বায়ু পুরাণ, ৩৪ অধ্যায়।

(৭) "কুমার-সম্ভবম্" কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকের টীকা বোম্বাই এর 'নির্ণয়-সাগর' ছাপাখানার ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

(মৎস্যপুরাণ ১১৩ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৭ অধ্যায়ে ও এই মর্মের উক্তি আছে।)

ভারতবর্ষের আকার সম্বন্ধে ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

"ধনুঃ সংস্থেচ বিজ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে।" ৩১। বায়ুপুরাণ, ৩৫ অধ্যায়।

"ইদং তু মধ্যমং চিত্রং শুভাশুভফলোদয়ম্।
উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ ॥ ৭৫ ॥" বায়ু পুরাণ, ৪৫ অধ্যায়।

"দক্ষিণাপরতোহ্যস্য পূর্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্মুকস্য যথাগুণঃ ॥ ৫৯ ॥
তদেতদ্ ভারতং বর্ষং সর্ববীজং দ্বিজোত্তম।" মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৭ অধ্যায়।

জম্বুদ্বীপের আকার গোল এবং উহার চারিদিকে লবণ-সমুদ্র ঘিরিয়া রহিয়াছে। হিমালয় হইতে শৃঙ্গবান্ পর্যন্ত ছয়টি বর্ষ পর্বতমালা ঐ গোলাকার দ্বীপের উপর যথাক্রমে দক্ষিণ হইতে উত্তরে একটির পর আর একটি বিস্তৃত থাকিয়া ঐ বৃত্তকে সাতটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে এবং সকল বর্ষ-

পর্বতমালারই পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই দিক পূর্ব এবং পশ্চিম দুই সাগরে নিমগ্ন আছে। এই বর্ষগুলির মধ্যে উত্তর দিকের (কুরু বর্ষ) এবং দক্ষিণ দিকের (ভারতবর্ষ) দুইটি বর্ষের আকার সুতরাং ধনুর মত। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় বা হিমবান্ এবং দক্ষিণে সমুদ্র। ইহার পশ্চিম দক্ষিণ, এবং পূর্ব দিকে মহাসাগর "ছিলা চড়ান" ধনুর মত আছেন এবং উত্তরে হিমবান্ গুণের (ছিলার) আকারে রহিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই ধনুরাকার অংশই সকল ধর্মকর্মের বীজস্বরূপ ভারতবর্ষ। স্বায়ম্ভুব মনুমহারাজের পুত্র প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সম্রাট্ ছিলেন এবং তিনি তাঁহার সাতপুত্রকে সাতটি-দ্বীপ বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অগ্নীধ্র নামক পুত্র জম্বুদ্বীপের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তিনি নিজের নয় পুত্রকে এই দ্বীপের নয়টি বর্ষ বা অংশের এক একটি দান করেন এবং নাভি নামক পুত্রকে সর্ব দক্ষিণ "হৈমবত বর্ষ"টি দিয়া যান।
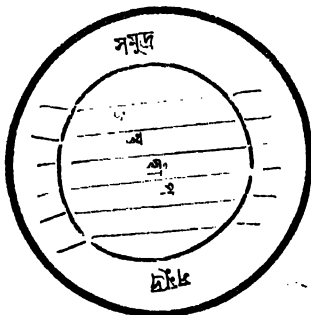
নাভির পৌত্র এবং ঋষভদেবের পুত্র ভরত মহারাজের নাম হইতে এই বর্ষ "ভারতবর্ষ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে (৮)। এই নাভি-বিষ্ণু ভাগবত পুরাণের মতে ভগবানের ২৪ অবতারের প্রথম অবতার এবং জৈন পুরাণের মতে ২৪ তীর্থঙ্করের প্রথম তীর্থংকর। এই ভরতই মৃগত্ব প্রাপ্ত এবং পরজন্মে "জড়ভরত" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণু এবং বিষ্ণু-ভাগবতাদি পুরাণে আখ্যায়িকা আছে। শকুন্তলাপুত্র রাজর্ষি ভরত এবং দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরত অপেক্ষা এই ঋষভ-পুত্র ভরত লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন রাজা ছিলেন।

ইংরেজেরা যে দেশকে এখন "ইণ্ডিয়া" এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যাহাকে "ভারতবর্ষ" বলিতেছেন, পৌরাণিকেরা ইহাকে বিশাল "ভারতবর্ষের" এক অতিমাত্র ক্ষুদ্রাংশ বলিয়া গণ্য করিতেন। পৌরাণিক ভারতবর্ষের ভিতরে "প্রশান্ত" এবং "ভারত" মহাসাগর-বক্ষঃস্থিত আটটি বড় বড় দ্বীপ এবং চীন হইতে মিশর পর্যন্ত ভূভাগকে ধরা হইত। ঐ আটটি দ্বীপকে তাঁহারা "ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ (তাম্রপর্ণ) গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব এবং বারুণ" এবং হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে ও মহাসমুদ্রের উত্তরে অবস্থিত ভূভাগ (Mainland) কে নবমখণ্ড অথবা "ভারতখণ্ড" বলিতেন (৯)।

ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া বাঙ্গালার কথা ধরা যাউক। বাঙ্গালা, "আর্যাবর্তের" অন্তর্গত। এখনকার রাজনৈতিক "বেঙ্গল" অথবা বাঙ্গালাদেশের উত্তরে দার্জিলিঙ্ জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার "দুয়ার" "(স্থানীয় লোকে যাহাকে 'ভোটান্ত' বলে) অথবা আলিপুর দুয়ার সবডিভিজন এবং পূর্বে চট্টগ্রাম পার্বত্যপ্রদেশ আছে। এই দুই অংশ প্রাচীন কালে গৌড়বঙ্গের অন্তর্গত ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। পক্ষান্তরে, পূর্বে আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া (ধুবড়ী) ও শ্রীহট্ট (এবং সম্ভবতঃ কছাড়), উত্তরে পূর্ণিয়া, পশ্চিমে মানভূম, সিংহভূম এবং সাঁওতাল পরগণা) এবং উত্তর পশ্চিমে বেহার (মগধ) এবং ত্রিহুত (মিথিলা) প্রভৃতি পূর্বে গৌড়বঙ্গের

(৮) বায়ু-মৎস্যাদি সমুদায় প্রাচীন পুরাণেই এই সংবাদ পাওয়া যাইবে।

(৯) বায়ুপুরাণ, ৩৪ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ, ১১৩ অধ্যায় হইতে দ্রষ্টব্য। তাম্রবর্ণকে গ্রীকেরা Taprobane বলিতেন, এক্ষণে উহা Cylon নামে পরিচিত।

অন্তর্গত ছিল এবং এখন বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার এই বর্তমান রাজনৈতিক সীমা গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহার পূর্বে,—১৯০৫—১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পূর্বাংশ "পূর্ববঙ্গ এবং আসাম" এবং পশ্চিমাংশ" বাঙ্গালা, বেহার এবং ওড়িশা" এই দুই রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত হইত। ১৯০৫—১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সেই "বঙ্গভঙ্গের" আন্দোলন হইতেই বর্তমান "রাজনৈতিক অবস্থা"র জন্ম হইয়াছে। ঐ "বঙ্গভঙ্গ" অথবা "বঙ্গ-বিভাগের" পূর্বে, ইংরাজের আমলে যে দেশকে আমরা "বাঙ্গালা" বলিয়া জানিতাম, তাহা এখন "আসাম," "বেঙ্গল," এবং "বেহার ও ওড়িশা" এই তিন রাজনৈতিক প্রদেশে পরিণত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন তিনজন গভর্ণরের দ্বারা শাসিত হইতেছে (১০)। ইংরাজের পূর্বে, মোগল আমলে, আসামের অধিকাংশ ব্যতীত উক্ত তিন প্রদেশই "সুবে বাঙ্গালা" নামে পরিচিত এবং বাঙ্গালার সুবেদার (Vice-roy) কর্তৃক শাসিত হইত। তাহার পূর্বে, পাঠানরাজত্ব সময়েও, প্রায় তুল্যরূপ অবস্থা ছিল বলিলেও চলে। তাহার পূর্বে, হিন্দু আমল। সেই আমলে, সময়ে সময়ে, রাজনৈতিক বাঙ্গালার আকার এবং সীমা রাজার বলবীর্যের অনুপাতে বাড়িত এবং কমিত। মুসলমানগণের (পাঠানদিগের) দখলের অব্যবহিত পূর্বে এই দেশ সেনরাজগণের অধিকারে ছিল এবং সেই সময়ে পূর্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে বেহার ও মিথিলা পর্যন্ত এবং উত্তরে পূর্ণিয়া-দিনাজপুর-রঙ্গপুর হইতে দক্ষিণে ওড়িশা পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাঁহাদের প্রভাবের অধীন হইয়াছিল। তাহার পূর্বে, পালরাজগণ পশ্চিমে কান্যকুব্জ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। পাল এবং সেনরাজবংশের বিক্রমের প্রভাব এককালে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় (১১)।

পাল এবং সেনরাজগণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শাসনাধীন দেশটি রাঢ়, বরেন্দ্রী, বগড়ী, বঙ্গ, এবং মিথিলা এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। মোটামোটি ধরিতে গেলে, সে

(১০) রেনেলের "মানচিত্র" (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রস্তুত) এবং Mr. G. R. Grierson I. C. S. ইত্যাদি কৃত Linguistic Survey of India, Vol I. Part. I. গ্রন্থের প্রথম পাতার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

(১১) আবুল ফজল কৃত আইন আকবরী, পাল ও সেনরাজগণের প্রাচীন লিপিমালা এবং শ্রীশ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিপাদ প্রণীত "সত্যার্থ প্রকাশ" গ্রন্থের ৪২০—৪২৪ পৃষ্ঠা।

কালের বিভাগের সহিত এখনকার বিভাগের নিম্ন লিখিত রূপে তুলনা করা যাইতে পারে, যথা :—

প্রাচীন—	বর্তমান—
(১) রাঢ়	বর্ধমান বিভাগ, (সাঁওতাল পরগণা, মানভূম ও সিংহভূম অর্থাৎ প্রাচীন "ঝাড়খণ্ড" এবং মালদহ ও মুরশিদাবাদ জেলার ভাগিরথীনদীর পশ্চিম পারের অংশ সমেত)।
(২) বরেন্দ্রী	রাজসাহী বিভাগ, (পূর্ণিয়া সমেত)।
(৩) বঙ্গ	ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (শ্রীহট্ট ও কছাড় সমেত)।
(৪) বগড়ী	প্রেসিডেন্সী বিভাগ (মুরশিদাবাদ জেলার ভাগিরথীনদীর পশ্চিমপারের অংশ ব্যতিরিক্ত ; ঐ অংশকে এখনও স্থানীয় লোকে "রাঢ়"ই বলে)।
(৫) মিথিলা	উত্তর বেহার বা ত্রিহুত ; (সম্ভবতঃ দক্ষিণ বেহার বা মগধও ইহার অন্তর্গত ছিল।)

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পুত্র শূরপালের সময়ে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তেরা তাহাদের নেতা দিব্বোক রুদোক এবং ভীমের অধিনায়কতায় বিদ্রোহী হইয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিলে, শূরপালের ভ্রাতা বিখ্যাত রামপাল মিত্ররাজগণের সহায়তায় সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি পুনরধিকার করেন। সেই বিদ্রোহ-দমনের ইতিহাস বারেন্দ্র-কায়স্থ-কুলোৎপন্ন মহাসান্ধিবিগ্রহিক শ্রীকর নন্দীর পুত্র "কলিকাল-বাল্মীকি" সন্ধ্যাকর-নন্দী "রামচরিত" নামক দ্ব্যর্থক কাব্যে লিখিয়া নিজে অমর হইয়া গিয়াছেন। ঐ কাব্যের কবির স্বরচিত টীকায় রাজা রামপালের নিম্ন লিখিত মিত্ররাজগণের উল্লেখ আছে,—যথা :—

মগধ ও পীঠির	ভীমযশঃ।
অঙ্গরাজ	মথনদেব (রামপালের মাতুল)।
কোটাটবী...	বীরগুণ।
দণ্ডভুক্তি	জয়সিংহ।
দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বালবলভী (বিক্রমপুর) ...	বিক্রমরাজ।

অপরমন্দারাধিপতি এবং আটবিক সামন্ত-

চক্রের প্রধান	...	...	লক্ষ্মীশূর।
কুজবটী ...	...	...	শূরপাল।
তৈলকম্প	...	...	রুদ্রশিখর।
উচ্ছালের	...	...	ময়গলসিংহ।
ঢেক্করীর ...	...	...	প্রতাপসিংহ।
কয়ঙ্গলমণ্ডল	...	...	নরসিংহার্জুন।
শঙ্কটগ্রাম	...	...	চণ্ডার্জুন।
নিদ্রাবল ...	...	...	বিজয়রাজ।
কৌশাম্বী...	...	...	দ্বোরবর্ধন (গোবর্ধন)।
পদুবন্বা ...	...	...	সোম।

(রামচরিতম্—২য় সর্গের ৭ম শ্লোকের টীকা।—এসিয়াটীক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি, আই, ই, মহাশয়ের সংস্করণ, তাঁহার যত্নে নেপাল হইতে সংগৃহীত পুথি।)

এই সকল মিত্ররাজের রাজ্য-গুলির মধ্যে মগধ (পাটনা জিলা), অঙ্গ (ভাগলপুর জিলা), দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বালবলভী (নদীয়া জেলার উত্তরাংশে স্থিত দেবগ্রাম রেল-ষ্টেশনের নিকটস্থ প্রদেশ—বিক্রমপুর), অপরমন্দার (দক্ষিণরাঢ়ের গড় মান্দারণ, হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ), তৈলকম্প (মানভূম), কোটাটবী, দণ্ডভুক্তি, উচ্ছাল, ঢেক্করী (রাঢ় অথবা ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত), নিদ্রাবল, কৌশাম্বী এবং পদুবন্বা (বরেন্দ্রের অন্তর্গত),—এই কয়েকটি সামন্ত রাজ্যের অবস্থান কতকটা বুঝিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু কয়ঙ্গলমণ্ডল এবং শঙ্কটগ্রামের অবস্থান কোথায় ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না, অন্ততঃ আমরা জানিতে পারি নাই (১২)।

---

(১২) F. B. Bradly Birt, Esq. I. C. S., F. R. G. S., কর্তৃক লিখিত "Choto Nagpur" নামক ইংরাজী পুস্তকের ১৮০—১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে দামোদর নদের দক্ষিণকূলে, মানভূম জেলায়, তৈলকম্প (আধুনিক তেলকুপী = Telkupi) নগরে অনেক পুরাকীর্তির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান্ আছে।

এই সময়ে, বঙ্গে, খুব সম্ভব, বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা অথবা তাঁহার পুত্র বিখ্যাত শ্যামলবর্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। জাতবর্মা "কৈবর্তপতি দিব্য অথবা দিব্যোককে গ্রাহ্য করেন নাই, তিনি কামরূপ-রাজ্য-পরাজয়, অঙ্গরাজ্যে নিজ প্রভাব বিস্তার এবং গোবর্ধন নামক কোন রাজার হানি করিয়াছিলেন, বলিয়া জানিতে পারা যায় (১৩); কিন্তু, তিনি অথবা তাঁহার পুত্র শ্যামলবর্মা কৈবর্ত-দমন-বিষয়ে গৌড়রাজ রামপালকে কোন সাহায্য করিয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারা যায় না।

খৃষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই দেশ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, 'ভুক্তি' অথবা 'বিষয়ে' বিভক্ত ছিল, তাহাদের অধিকাংশের নামই আমরা জানি না, তাহার পুর্বের সংবাদ পাওয়া ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি দ্বারা যতদূর সম্ভব, তাহাই আমরা করিতেছি; যোগ্যতর ব্যক্তি আমাদের আশা-পূরণ করিবেন, এই আশাই বর্তমানে সম্বল।

'বাঙ্গালা' অথবা 'বেঙ্গল' শব্দ কতদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহাই বা কে জানে? ইংরাজী ভাষায় লিখিত কোন কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে "বঙ্গাল" নামে একটি বিখ্যাত নগর নাকি পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে ছিল। সে যে কোথায় ছিল, তাহার কোন সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই। খৃষ্টীয় আনুমানিক ১০২৫ অব্দে বিখ্যাত চোড়রাজ পরকেশরীবর্মা (রাজেন্দ্র চোড়) বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই আক্রমণ অথবা বিজয়ের বার্তা কলিঙ্গদেশের "তিরুমলয়-গিরি"র গাত্রে ক্ষোদিতলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে,—তিনি এদেশের কয়েকজন ভূস্বামীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। উহাতে লিখিত আছে যে,—তন্দবুত্তির (দণ্ডভুক্তি) ধর্মপাল নিহত, তক্কণলাঢ়ম্ (দক্ষিণরাঢ়) রণশূর পরাস্ত, ঝড় বৃষ্টির চিরনিবাস 'বঙ্গাল' দেশের গোবিন্দচন্দ্র পলায়িত, এবং কর্ণভূষণ, চর্মপাদুকা ও বলয়া বিভূষিত মহীপাল পলায়িত হইয়াছিলেন (১৪)। এই মহীপালকে অনেকেই প্রাগুক্ত রামপালের প্রপিতামহ গৌড়াধিপ বিশ্রুতকীর্তি প্রথম মহীপাল দেব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

---

(১৩) বেলাব গ্রামে (ফরিদপুর জেলায়) প্রাপ্ত ভোজবর্মার তাম্র শাসন। ভোজবর্মা শ্যামলবর্মার পুত্র। Journal of the Asiatic Soceity of Bengal, New Series, Vol. X, P 127.

'বঙ্গাল' দেশে ঝড়বৃষ্টি নিত্যনিবাস করে ; ইহা পূর্ববঙ্গ। এই লিপি হইতে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, এ দেশের লোকে বাঙ্গালা দেশের পূর্বাংশ কে 'বঙ্গাল' বলিত বলিয়া বোধ হইতেছে ; কোন নির্দ্দিষ্ট নগরের নাম 'বঙ্গাল' ছিল কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। বঙ্গজ-কায়স্থ-গণের কুল-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে কায়স্থগণের সর্বনিম্নস্তরের লোককে "বঙ্গাল" বলিত। খুব সম্ভব, এই হীনতা-ব্যঞ্জক 'বঙ্গাল' শব্দ হইতে বর্তমান "বাঙ্গাল" শব্দের জন্ম হইয়াছে। উহার ভিতর হীনতা-ব্যঞ্জক ধ্বনি না থাকিলে (এবং কেবল মাত্র 'বঙ্গপ্রদেশের অধিবাসী' বুঝাইলে) কথনই উহার দ্বারা লোকের অপ্রীতির উৎপাদন করিত না।

ইহার পূর্বে পাল ও সেনরাজগণের সময়ে 'বঙ্গ' শব্দ দ্বারা যে এই দেশের পূর্বাংশকে বুঝাইত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তাহার পূর্বে, ফা-হিয়ান এবং য়োয়ান্ চোয়াঙ্গ প্রভৃতির সময়ে (খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তমশতাব্দী পর্য্যন্ত) এই দেশের দক্ষিণ পূর্বাংশকে সমতট, এবং অন্যান্য অংশ কামরূপ, গৌড় (পুণ্ড্রবর্ধন) কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইত। কবি কালিদাসের "রঘুবংশ" কাব্যে "বঙ্গ" "সুহ্ম উৎকল" "এবং" "কলিঙ্গ" প্রদেশের উল্লেখ আছে (১৫)। কালিদাসের অপেক্ষা কয়েকশত বৎসর পূর্বগামী গুণাঢ্য কবির "বৃহৎ-কথা" (কথা-সরিৎ-সাগর)" নামক গল্পের গ্রন্থের ও এই দুই নাম পাওয়া গিয়াছে (১৬)। তাহার পূর্বে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম এই পাঁচটি নাম পুরাণে পাওয়া যায়।

---

(১৪) Vide Memoirs of Asiatic Soceity of Bengal, Vol. III, P 36 and Epigraphica Indica, Vol. XI pp 232—232 তমিড় ভাষায় এই লিপি লিখিত। গ্রীয়ারসনের Linguistic Survery Vol. V. Part I গ্রন্থের উপক্রমণিকায় "বঙ্গাল" সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে (পৃষ্ঠা ১১)।

(১৫) সমুদ্রগুপ্ত মহারাজের দিগ্‌বিজয় লিপি এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি) সমতটের উল্লেখ আছে ; ইহা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ক্ষোদিত (Fleet's Gupta Insceiptions)। রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ, ৩৫ হইতে ৩৮ শ্লোক।

(১৬) কথাসরিৎসাগর, লাবাণক লম্বক।

মহাপুরাণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বায়ু (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও প্রায় বায়ু পুরাণেরই কথা আছে) এবং মৎস্য পুরাণের মতে ভারতখণ্ডের প্রাচ্য বিভাগে এই কয়েকটি দেশ বা জনপদ আছে, যথাঃ—

"অঙ্গ, বঙ্গ, মদ্‌গুরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ মালবর্ত্তী, সুহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব (মার্গব) প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, শাল্ব মগধ এবং গোনদ (গোবিন্দ)।" (১৭)

দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে পুরাণ-গ্রন্থাবলীর ভাল সংস্করণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; আমাদের চক্ষুতে, এসিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা), আনন্দাশ্রম (পুনা), নির্ণয়সাগর ও বেঙ্কটেশ্বর (বোম্বাই) এবং বঙ্গবাসী (কলিকাতা) প্রভৃতি ছাপাখানার প্রকাশিত পুরাণের যে সকল পুথি পড়িয়াছে, তাহাদের কোন কোন গুলির ছাপা অধিকতর সুন্দর হইলেও একখানির পাঠও ঠিক আছে বলিয়া বোধ হয় না। অসাবধানতা "বঙ্গবাসী"র পুরাণেই বেশী দেখা যায়; তথাপি, সুলভ বলিয়া আমরা উহাই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং তজ্জন্য "বঙ্গবাসী"র কর্তৃপক্ষের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ আছি। তাঁহারা কৃপা না করিলে আমাদের পক্ষে অনেক পুরাণের দর্শন-লাভই ঘটিত না। যাহাই হউক, মুদ্রিত পুরাণ গুলির ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভৌগোলিক নাম সমূহের এরূপ পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে যে তাহা হইতে প্রকৃত নাম বুঝিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমাদের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিমত সমন্বয় করিয়া উপরিউক্ত নামগুলি দিয়াছি; বিজ্ঞজনেরা যদি অনুসন্ধান করত প্রকৃত পাঠের নির্ণয় করেন, তাহা হইলে দেশের ভূগোল এবং ইতিহাসজ্ঞান পাঠকসমাজে ক্রমশঃ প্রচারিত হইতে পারে।

রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অযোধ্যাপতি দশরথ সেকালে ভারত-খণ্ডের সম্রাট্ ছিলেন এবং তাঁহার সভায় প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য এবং দাক্ষিণাত্য বহু আর্য এবং ম্লেচ্ছ

(১৭) বায়ুপুরাণ, ৪৫ অধ্যায়, (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৯ অধ্যায়) মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৮ অধ্যায় এবং মৎস্যপুরাণ, ১১৪ অধ্যায়। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)। বরাহমিহির কৃত "বৃহৎ সংহিতা" ১৪শ অধ্যায় (এসিয়াটীক সোসাইটী সংস্করণ)।

ভূমিপাল উপস্থিত থাকিতেন (১৮)। দশরথ তাঁহার প্রিয়া কৈকেয়ী দেবীকে বলিয়াছিলেন, "যতদূর সূর্য কিরণ প্রদান করেন, আমার রাজ্য ততদূর বিস্তৃত ; বঙ্গ, মগধ, মগধ, মৎস্য এবং সমৃদ্ধ কাশী ও কোশল রাজ্য আমার অধীন" (১৯)। অঙ্গদেশের তদানীতন রাজা দশরথ অঙ্গরাজ রোমপাদ দশরথকে নিজ কন্যা শান্তাকে পোষ্যকন্যা স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। এই শান্তার স্বামী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গই শ্বশুর অযোধ্যাধিপতি দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান হোতৃপদে প্রতিষ্টিত হইয়াছিলেন (২০)। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গকে বরণ করিবার উদ্দ্যোগে দশরথ অযোধ্যা হইতে সপরিবারে সখা অঙ্গরাজের রাজধানীতে গিয়া তথা হইতে শান্তা ও তাঁহার স্বামী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনিয়াছিলেন (২১)। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে দশরথ প্রাচ্য বিভাগের মিথিলা, কাশী, মগধ এবং অঙ্গদেশের রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন (২২)। রামায়ণে অন্যত্র, প্রাচ্য দেশ বর্ণনা-মুখে, "ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, কোশকারদিগের এবং রৌপ্যধাতুর আকরাধিকারিগণের" উল্লেখ আছে (২৩)। প্রাগ্-জ্যোতিষ জনপদের অবস্থিতি কিন্তু রামায়ণের মতে পূর্বদিকে নহে, পরন্তু পশ্চিমে (২৪)। রামায়ণের এই "ব্রহ্মজাল" বোধহয় "সুহ্ম-মাল" (সুহ্ম অথবা রাঢ় দেশের পার্বত্য এবং উচ্চ বনভূমি,— ঝাড়খণ্ড, The high woodlands of west Bengal, অর্থাৎ বীরভূমি, সিংহভূমি, মল্লভূমি অর্থাৎ বর্তমান বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া মেদিনীপুর, মানভূম, সিংহভূম এবং ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি) হইবে। যেহেতু আমাদের পূর্বোদ্ধৃত বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পুথিতেও "সুহ্মোত্তর" স্থলে "ব্রহ্মোত্তর" মুদ্রিত আছে।

---

(১৮) রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড তৃতীয় সর্গ, ২৫শ শ্লোক। (বঙ্গবাসী)

(১৯) ঐ ঐ দশম সর্গ, ৩৭শ শ্লোক।

(২০) ঐ বালকাণ্ড, দশম সর্গ।

(২১) ঐ ঐ একাদশ সর্গ।

(২২) ঐ ঐ ত্রয়োদশ সর্গ।

(২৩) ঐ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, চত্বারিংশ সর্গ, ২২ ২৩শ শ্লোক।

(২৪) ঐ ঐ দ্বি চত্বারিংশ সর্গ, ৩০ ৩১শ শ্লোক।

মহাভারতে ভারতখণ্ডের উত্তরদিগ্ বর্ণনা উপলক্ষ্যে "প্রাগ্-জ্যোতিষ" জনপদ এবং তথাকার রাজা "চীন ও কিরাত সৈন্যেরদ্বারা পরিবৃত ভগদত্তের" (২৫)। এবং পূর্বদিগভাগের বর্ণনায়, বিদেহ, দশার্ণ, দক্ষিণ-কোশল, উত্তর-কোশল, গোপালকক্ষ, মল্ল (মল্লভূমি?), কাশী, মৎস্য, মলদ, শর্মক, বর্মক, সুহ্ম প্রসুহ্ম, মগধ দণ্ড ও দণ্ডধার (দণ্ডভুক্তি?), গিরিব্রজ, অঙ্গ, মোদাগিরি (মুদগিরি-মুঙ্গের?), পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাম্র-লিপ্ত, কর্বট এবং লৌহিত্য" জনপদের উল্লেখ আছে (২৬)। এই সমুদায় প্রদেশই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব এবং পশ্চিমে সমুদ্র, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তীস্থানকে অতি প্রাচীনকালে "আর্য্যাবর্ত্ত" বলিত (২৭)।

প্রাগ্জ্যোতিষ এবং কামরূপ এককালে যে পরস্পর নিকটবর্ত্তী জনপদ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, তাহা কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের চতুর্থসর্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে লৌহিত্যনদের (আধুনিক ব্রহ্মপুত্র?) উভয় তীরে এই উভয় জনপদ অবস্থিত ছিল (২৮)। সমুদ্র-গুপ্তের পূর্ব্বোল্লিখিত এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে "কামরূপ এবং ডবাক" ঐ সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তস্থিত জনপদ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। রামায়ণের "প্রাগ্জ্যোতিষ" আরব অথবা পারস্য সাগরে উপরিস্থ কোন দ্বীপ অথবা সাগরসন্নিহিত কোন প্রদেশ বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার সহিত পূর্ব্বদেশের কামরূপ-প্রাগ্জ্যোতিষের কোন সম্বন্ধ ছিল না; অথবা ঐ পুরাতন দেশের কোন রাজা প্রাচ্যভূমিতে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রাচীন জনপদের নামে উহাকে অভিহিত করিতেও পারেন। এরূপ নূতন উপনিবেশের প্রাচীন নামকরণের অনেক

(২৫) মহাভারত, সভাপর্ব, ২৬শ অধ্যায় (বোম্বাই)।

(২৬) ঐ ঐ ৩০শ অধ্যায়।

(২৭) মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়, ২১শ এবং ২২শ শ্লোক। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সময়ে পশ্চিম সীমা সংকুচিত হইয়া "এসিরীয়া" বা অসুরদেশের "কালকবন" পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। পাণিনিসূত্রের ২।৪।১০ম সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(২৮) রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ, ৮১ হইতে ৮৩ শ্লোক।

দৃষ্টান্ত জগতের সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় (২৯)। মহাভারত এবং হরিবংশের বর্ণিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ সম্ভবতঃ পূর্বোত্তর দিকে বহুবিস্তৃত রাজ্যবিশেষ ছিল এবং পরে কালিকা-পুরাণের এবং তন্ত্রগ্রন্থাবলীতে বর্ণিত "কামরূপ" সেই বহুবিস্তৃত প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যেরই সঙ্কুচিত ভগ্নাবশেষ বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, আমাদের "বাঙ্গালার" সহিত এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ অথবা কামরূপের প্রতিবেশ-সম্বন্ধ ভিন্ন বিশেষ কোন আত্মীয়তা যে কোন কালে ছিল, তাহা বোধ হয় না; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা অনাবশ্যক। পশ্চিমদিকের জনপদ-সমূহের সহিত আমাদের যে নৈকট্যতর এবং গাঢ়-তর আত্মীয়তা অথবা সম্বন্ধ ছিল, তাহা পরে দেখিতে পাইব।

আমাদের "বাঙ্গালা" অথবা "গৌড় বঙ্গ" বলিতে, আমরা এই "বৃহত্তর বঙ্গ" বুঝিয়া থাকি; এবং সেই জন্য এই প্রস্তাবের ভৌগোলিক সীমার ভিতর বর্ত্তমান "আসাম," "বেঙ্গল" এবং "বিহার ও ওড়িশা" এই তিনটি প্রদেশেই থাকিবে! উত্তরে হিমালয় পর্বতের মধ্যস্থিত "ভোটান্ত" সিকিম এবং নেপাল রাজ্য পশ্চিম উত্তরে বর্ত্তমান "যুক্তপ্রদেশ," মধ্যভারত এবং মধ্যপ্রদেশ, বেরার দক্ষিণে বঙ্গসাগর, দক্ষিণ পশ্চিমে মান্দ্রাস প্রদেশ এবং পূর্ব দিকে বর্মা প্রদেশকে এই বাঙ্গালার চতুঃসীমা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই চতুঃসীমার ভিতরে অতি প্রাচীন উচ্চ (লাল) এবং পার্বত্যভূমি হইতে সমুদ্রগর্ভ হইতে নূতন উত্থিত "দেয়াড়" অথবা চর-ভূমি আছে। সকল সময়ে এই বৃহৎ দেশ যে কোন এক বিশেষ রাজা অথবা রাষ্ট্রের অধীন ছিল, তাহা নহে; বরংচ, অনেক পূর্বকাল হইতে দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন এবং অর্দ্ধস্বাধীন রাজা অথবা

(২৯) আমাদের দৃষ্টান্ত, উত্তর-পশ্চিমের "কাম্বোজ" এবং পূর্ব উপদ্বীপের কাম্বোজ" অথবা "কাম্বোডিয়া।" উত্তরমথুরা (Muttra) এবং দক্ষিণ মথুরা (Madura) উত্তর কোশলের "অযোধ্যা" এবং শ্যামদেশের "অযোধ্যা" ইত্যাদি। নূতন দৃষ্টান্ত,—New york, New London, New Holland প্রভৃতি অনেক আছে—তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সামন্ত রাজারা দেশ রক্ষণ ও পালন করিতেন এবং কখনও কখনও এক এক জন অধিকতর পরাক্রমশালী হইয়া সার্বভৌমত্ব অথবা চক্রবর্তিত্ব লাভ করিতেন।

ভূগোলের কথা আমাদের প্রস্তাবের মুখবন্ধমাত্র, সুতরাং এই পর্যন্তই যথেষ্ট। আগামীবারে বাঙ্গালার সভ্যতা এবং তাহার বয়সের কথা লইয়া আলোচনা করিব (৩০)।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

(৩০) আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ অতি পূর্বকালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে—

(ক) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে,—

(খ) তাহার পরে সাধারণতঃ "প্রাচ্য," "পৌরস্ত্য" অথবা "প্রাচী" (Prasii) নামে এবং বিশেষতঃ কর্বট, ওড্র, তাম্রলিপ্ত অঙ্গ, পুণ্ড্র, সমতট, ডবাক, (ঢক্ক বা ঢাকা ?) ও কামরূপ নামে।

(গ) গৌড়মণ্ডল এই সাধারণ নামে ;—

(ঘ)—রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, (বঙ্গাল), বগড়ি, মিথিলা, ঝাড়খণ্ড কামরূপ ইত্যাদি নামে।

(ঙ) পালরাজগণের সময়ে ও তাহার পর নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন নাম সংযুক্ত জনপদ রূপে এবং পরে।

(চ) মোগল সময়ে "সুবে বাঙ্গালা" (বাঙ্গালা, বেহার এবং ওড়িশা) নামে পরিচিত ছিল। ইংরাজের সময়ের Bengal Presidency প্রথমে খুব বড় ছিল, ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এখন বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রদেশ (Political Province) স্বরূপে গভর্ণর সাহেব বাহাদুরের শাসনাধীন হইয়াছে। Mr. G. R. Grierson সাহেবের Linguistical Surveoy of India, vol. V. Part I পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার (Fly leaf) এবং ১১শ পৃষ্ঠার বামদিকে যে দুইটি মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে আমাদের উদ্দিষ্ট "গৌড়বঙ্গ" অথবা "বাঙ্গালা" দেশের ভৌগলিক অবস্থার সম্বন্ধে ধারণা করিবার বেশ সাহায্য হইবে।

হারাণো-স্থর।

—:*:—

আগে যে গান গেয়ে গেছে

সে স্থর যেন আসে আমার কাণে,

যে পথে সব চলে গেছে

সে পথ জাগায় আশা আমার প্রাণে।

সে ভাষা রয় সঙ্গোপনে,

গন্ধ যা বয় সমীরণে!

বিশ্ব ছেপে যে স্থর বহে

সবাই আমায় টানে কিসের টানে!

দৃষ্টি যে সব হারিয়ে গেছে

বিশ্বেরি এই দৃষ্টি-চমক পেয়ে;—

যে কথা সব হারিয়ে গেছে

ব্যাকুল সবই কথার দমক পেয়ে!

যে গাথা অই নদীর কূলে,

পাহাড়, বনের বক্ষমূলে,

সে সব গান আজ নূতন হয়ে

আসে নূতন মূর্ত্তি জলে নেয়ে!

হারিয়ে-যাওয়া সকল হাসি

আজ যেন রে লুটায় কূলে কূলে!

কান্না সব আজ মুখর হ'য়ে

ভুবন মাঝে উঠছে দুলে দুলে!

গগনে আজ কি মহোৎসব ?
আমায় নিতি ডাক্‌ছে মানব !
সবার আশিস্ মাথায় আমার
সবার স্নেহ হৃদয় দেছে খুলে।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

খুনী।

পাড়াপড়সী আমায় বলে অবতার, খবরের কাগজ-ওয়ালারা বলে, দানবীর, আর সরকার উপাধি দিলেন রাজা।

পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্য পেয়েছিলাম—যে এসেছে তাকে দুহাতে বিলিয়েছি,—নেও, নেও, যার যা দরকার নেও ; দুঃখী তোমরা, অভাবগ্রস্ত তোমরা, নেও। রিক্ত হতে পারলে আমি যে বাঁচি। সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ হোক, আমি হাল্‌কা হই।

সব একে একে ছাড়ছি, হাল্‌কা তো হচ্ছি নে। সে পাথর তো সরে না। এ যে খুনীর অন্তরের রক্ত আঁকা পাষাণ—বন্ধুর উষ্ণশ্বাসে উত্তপ্ত—সতীর অভিশাপে সন্তপ্ত।

সরকার বাহাদুরের আইন পুলিশে সব খুনীকেই কি ধরতে পারে? সমাজ কি সব দুর্বৃত্তকে শাসনের আমলে আনতে পারে? আমি সক্কলের চোখে ধূলো দিয়েছি। কিন্তু সে চোখে কি দিতে পারব? সে যে বিশ্বজোড়া চোখ, নাড়ীনক্ষত্র-জানা চোখ।

আজ জীবনের শেষ কিনারায় এসে জীবনটাকে মনে হচ্ছে যেন নিশীথ রাতের এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন,—ফুলের ভেতর থেকে যেন দৈত্য বেরুল,—মধু যেন কণ্ঠে গিয়ে বিষ হয়ে উঠল। সে কেমন শুনবে?

তখন আমার সেই বয়স যে বয়সে সমস্ত সংসারটা একটা গোলাপের মত ক্রমে ক্রমে পাপড়ি মেলতে আরম্ভ করে, রঙে চোখ ভরে যায়, গন্ধে নেশা আসে,—আর সমস্তই যেন এক রঙীন স্বপনের জালে জড়িয়ে যায়!

আমার তাই হয়েছিল। রূপের তৃষায় ভাবের নেশায় আমি এক স্বপ্নরাজ্য রচনা করেছিলাম। তাতে আমি হয়েছিলাম রাজপুত্র; খুঁজে বেড়াতাম কোথায় আমার হৃদয় রাণী, রাজকুমারী।

এক দিন জ্যোৎস্না রাতে সোণার কাঠির পরশ প্রাণে-মনে অনুভব করলাম। দেখলাম আমার রাজকন্যা, পরীর মত বাতাসে ঢেউ তুলে উড়ে গেল,—ভাসা ভাসা তার চোখ দুটী, গোলাপের মত ঠোঁট দুখানি, মুক্তার মত হাসি, মেঘের মত চুল। আমি পাগল হলাম।

সত্যি আমি পাগলই তো হয়েছিলাম। স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমানা রেখা হারিয়ে গিয়েছিল। যৌবন কী বিষম! যৌবন সুধার নির্ঝর, গরলের কূপ, আলোর ধ্রুবতারা, আঁধারের আলেয়া, যৌবন সুন্দর,—যৌবন ভয়ঙ্কর, যৌবন জীবন—যৌবন মৃত্যু।

সে ছিল ছেলেবেলা হতে আমার বন্ধু,—তোমরা যাকে প্রাণের বন্ধু বল তাই। প্রাণ দিয়ে সে আমায় ভালবাসতো। ফুলের আনন্দ যেমন বাতাসে নাচা, পাখীর আনন্দ যেমন আকাশে গাওয়া, তার আনন্দ ছিল তেমনি আমার ভালবাসা। আমিও তাকে খুব ভালবাসতাম, ভয়ঙ্কর ভালবাসতাম। সন্ধ্যার ছায়া নিবিড় নিভৃতে নদীর তীরে ঘুরে ঘুরে দুজনে দুজনের হৃদয়ের কথা বলাবলি করতাম,—দুজনে হাসতাম, কাঁদতাম।

বন্ধু আমার ছিল কল্যাণের মূর্ত্তি, শান্তির কেতু, বিবেকের বাণী। স্বপ্নেও ভেবেছিলাম না তার সঙ্গে আমার কখনো ছাড়াছাড়ি হবে। কিন্তু সংসারের বিচিত্র বিধানে তাও হল। এক দিন বন্ধু আমাদের গ্রাম চিরকালের মত ত্যাগ করে তাদের দেশে চলে গেল।

বিহ্বল হয়ে এক বছর কাটালাম। আমার সময়-বিহঙ্গের পাখা যেন খসে গিয়েছিল—আর উড়তে পারে না, গান গায় না। হৃদয়ে আমার কত কথা জমে উঠল, কত ফসল ফলে উঠল। কাকে আমার বোঝার ভাগ দেব? আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। ঠিক এমন সময়ে বন্ধুর চিঠি পেলাম—"ভাই, আমাকে কি ভুলে গেলে? একবার আমাদের দেশে এস না—আমাদের দরিদ্র কুটীর দেখে যাও।" পর দিনই আমি বেরিয়ে পড়লাম বন্ধুর উদ্দেশে।

প্রত্যূষে রেল হতে ষ্টেসনে নামলাম। যেখান থেকে দুই ক্রোশ গেলে বন্ধুর গ্রাম। পায়ে হেঁটে চললাম। তখন শরৎকাল। কি সুন্দর প্রভাত! চারদিক যেন নবীনতায় ঝলমল করছে। আকাশের সোণার আলো, ধরিত্রীর সবুজ উৎসব, আর বাতাসের উন্মাদ শিহরণ আমাকে মাতিয়ে তুলল। আবার স্বপ্নরাজ্যে আমি পথ হারালাম। ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে চললাম—আকাশের অসীম নীলিমায় সাদা সাদা মেঘগুলি যেমন চলছিল। আবার ও কি দেখি? ওই না সেই আমার রাজকন্যা? সেই চোখ দুটি, সেই হাসি,—ধানের শীষের উপর দিয়ে লঘু আলতাপরা পাদুখানি ফেলতে ফেলতে আমার আগে চলছে, অঞ্চল লুটিয়ে পড়ছে, কুন্তল হাওয়ায় দুলছে। আমি ছুটলাম। "ওগো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, পালিও না।" আমার চোখে ধাঁধা লাগল। প্রজাপতির মত সে উড়ে গেল।

কখন এসে গ্রামে পড়েছিলাম জানি নে। বন্ধু সামনে এসে হো হো করে হেসে উঠতে আমার চমক ভাঙ্গল। সে আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল।

কি সুন্দর ছোট্ট বাগানটি। বন্ধু আমাকে এক শেফালী গাছের ছায়ায় বসাল। আমার মন ছাঁৎ করে উঠল—অবিশ্বাসী বন্ধু! আমারই প্রভাতের সর্ব্বস্ব চুরি করে এনে এখানে গোপন করেছ! প্রভাতের সব আকাশ তো এখানেই উঁকি মারছে, সব বাতাস তো এখানেই ছুটাছুটি করছে, শ্যামল ক্ষেতের সব হর্ষ তো এখানেই জমে উঠেছে। মাথা আমার এলোমেলো হয়ে গেল, মন আমার এক অদ্ভুত সন্দেহ-দোলায় দুলে উঠল—তবে? তবে আমার রাজকুমারী? তাকেও কি বিশ্বাসঘাতক চুরি করেছে? আমার মাথা দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল।

ও কি? ঠিক তো তাই! গৃহ হতে কে ওই নেমে আসে ওর হাত ধরে?—ওই তো সেই চোখ সেই হাসি, সেই কেশ, সেই আলতামাখা পা দুখানি, সেই গতি, সেই ভঙ্গিমা! বুক আমার দপ্ দপ্ করতে লাগল, মাথা রি-রি করে উঠল।

লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে? ও কে?"

"আমার বৌ।"

চীৎকার করে উঠলাম "তোমার?—তোমার?—"

মাটি যেন আমার পা থেকে সরে গেল। সমস্ত আকাশ বিভীষিকাময় ধূসরবর্ণ ধারণ করল, বাতাসের নিঃশ্বাস ছুটে এসে ভীমরুলের হুলের মত আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধতে লাগল, ফুলগুলি চোখের

সামনে উল্কাপিণ্ডের মত ঘুরতে লাগল। নিঃশ্বাস আমার বরফের মত জমে উঠে কণ্ঠরোধ করল। আমি ছুটে বেরুলাম।

তিক্ত, তিক্ত, সব তিক্ত, সব কুৎসিত। বন্ধু?—না—মায়াবী, রাক্ষস, শত্রু। আমার সমস্ত অস্তিত্ব বিষে জরতে লাগল, জ্বলতে লাগল।

এর পর এক মাসও কাটে নাই,—খবর পেলাম শত্রু মরেছে—একদিনের কলেরা রোগে।

ওঃ কি উল্লাস আমার। চোখের সামনে যা দেখি তাই উল্লাসে নাচছে—যেন দানবের তাণ্ডব—প্রেতের অট্টহাস্য। আমার বক্ষঃস্থলের পিণ্ডীভূত গরলরাশি যেন লক্ষ লক্ষ ফণা বিস্তার ক'রে বিশ্বসংসার গ্রাস করতে ছুটল,—আমাকেও গ্রাস করতে এল। ভয়ে আমি আত্মহারা হলাম, চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম—ওগো কি বীভৎস, কি ভয়ঙ্কর, কে আছ, আমাকে বাঁচাও।

কি বলছ তোমরা? বন্ধু আমার রোগে মরেছে? হাঃ হাঃ! কিছুই জান না তোমরা—মূলে ভুল। আমিই আমার নিঃশ্বাসের বিষে তাকে খুন করেছি, তাকে হত্যা করেছি। সন্তানের দৃষ্টি সতী স্ত্রীকে অপমান করেছে, তার সর্ব্বনাশ করেছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

শ্রীসুধীরকুমার গোস্বামী।

অবসান।

—:*:—

ফুরায় যদি সকল আশা—স্বপন গেল টুটি'
কি আর হবে প্রদীপখানি জ্বালি,'
পরাণ বৃথা শ্রান্ত হ'লো চরণে তব লুটি'
অন্ধ আঁখি অশ্রুধারা ঢালি'।
শূন্য হৃদি লইয়া বারে বারে
অতিথি আমি হ'য়েছি তব দ্বারে
তবুও তুমি চাহনি তুলি' আনত আঁখি দুটী—
বুঝি না আমি—আমার কি যে ত্রুটি

তোমারি শুভ লুকান যদি আমারি অবসানে
নিমেষে তবে নিভুক দীপখানি,
যেমনে যায় নিশার দীপ নিভিয়া অভিমানে
ধরণী 'পরে আলোর ধারা আনি'।
জীবনে মোর এত যে আয়োজন—
কে বলে—বৃথা হয়েছে সমাপন ?
ধন্য হবে পূর্ণভাবে পথেরই মাঝখানে—
ধন্য আজি জীবন অবসানে।

শ্রীরেণুকা দাসী।

নিরাপদ ধর্ম্ম।

—:*:—

আজ বহু দিন পর নবরত্নের সভা বসিয়াছে। পণ্ডিতজীর গন্ধমাদনতুল্য বহু শিখরসমন্বিত বনাকীর্ণ কলেবর আজ গৈরিকমণ্ডিত। নীলাচল হইতে সন্ন্যাস লইয়া ফিরিয়া আসার পর হইতে তাঁহার আয়ত চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, বদনে ধ্যানী বুদ্ধের গাম্ভীর্য্য, ওষ্ঠে শঙ্করের বৈরাগ্য, নাসিকায় শুকদেবের ঔদাস্য, হস্তে হুঁকা, কণ্ঠে অনর্গল কথামৃত। একে পণ্ডিতজী, তাহার উপর গৈরিক, সভা তাই আজ ভক্তিসন্ত্রস্ত ভয়বিক্ষুব্ধ উদ্‌গ্রীব। পণ্ডিতজীর সামনে বসিয়া ক্যাবলাকান্ত একটুখানি চিনিমাখা সরস হাসি নবোদ্গত গোঁফের আগায় মাখাইয়া হাত কচলাইতেছে আর প্রশ্ন করিতেছে।

ক্যা। আজ্ঞে, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, যীশু, মহম্মদ আদি মহাপুরুষেরা এমন সব অমৃতময় বাণী জগতে ছেড়ে দিয়ে গেছেন ; কিন্তু কোন্ আবাগীর ব্যাটা তা' মানে ?

প। কালের প্রভাব, বাপু হে, কালের প্রভাব। বুদ্ধ কনফিউসিয়াস জন্মেছিলেন সে তো আর চারটিখানি বছরের কথা নয়, এসব মহাপুরুষ সনাতন হোন আর নাই হোন বহু পুরাতন তো বটেনই। তাঁদের কথা ছেড়ে দাও, এই খৃষ্টীয় সভ্যতার বিংশশতাব্দীতে প্রভু যীশুর কথাই যে রকম জরাজীর্ণ ও অচল হয়ে এয়েচে তা' ভাবতে গেলে বুদ্ধি থ হয়ে থাকে।

ক্যা। কেন এমন হয়?

প। বলেছিই তো, বাপু; কালের ভেল্কি হয়কে নয় করে, আর নয়কে হয় করে। সত্য যুগেই কেবল ধর্ম্ম ছিলেন পূর্ণ অর্থাৎ চতুষ্পদ, ত্রেতায় তিনি হলেন ত্রিপদ অর্থাৎ খঞ্জ, দ্বাপরে হলেন দ্বিপদ অর্থাৎ পঙ্গু আর এই পাপতাপ আধিব্যাধি পূর্ণ কলিতে হচ্ছেন ক্রমশঃ একপদ অবস্থা থেকে একেবারে নিরাপদ (পদহীন) বা অচল। এই হচ্ছে ক্রমবিকাশ বা Theory of Evolution, কালপুরুষের গদার এলোপাতাড়ি বাড়ি, যার ঘায়ে তোমার ফুলশয্যার চেলী-মোড়া নোলকপরা রসের পুঁটলীটি হয়ে যায় কুব্জপৃষ্ঠ মুব্জদেহ জরার পুঁটলী। এই কালের শক্তিই হচ্ছেন মহামায়া কালী, মায়ের এই অঘটনঘটনময়ী লীলা বড়ই Cataclysmic। তাঁরই ঘাথায় এখন বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ সবাই একেবারে Back number হয়ে পড়েছেন, তাঁরই কটাক্ষে কলিতে একপদ ধর্ম্মপুরুষ এতদিন ব্যাঙের মত hop করতে করতে চলছিলেন আর এখন সেরেফ পেটে হাঁটছেন। এখন মানুষ তাই বিদ্যা শেখে পেটের জন্য, দেশ উদ্ধার করে পেটের জন্য, বিবাহ করে পেটের জন্য, আমার মত গৈরিক ধারণ করে পেটের জন্য, তোমার মত আইডিয়া ভাঁজে তাও অন্নচিন্তা চমৎকারার তাড়নায় ঐ সেই পেটেরই জন্য।

ক্যা। এ আপনি কি বলছেন? ধর্ম্মের স্থান কোথায়? সে কি পেটে?

প। হাঁ হে বাপু। শাস্ত্র মান তো?—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

আমাদের এই চিরব্যাদিত গহন জঠরদেশ ছাড়া আর এমন অতলস্পর্শ গুহা কোথা পাবে? আগে ধর্ম্ম থাকতেন মাথার ওপর, তখন মানুষ তাই ছিল সব ত্রিকালদর্শী জ্ঞান ও শক্তির অবতার; তার পরে ধর্ম্ম নামলেন মাথার মধ্যে তখন উপনিষদের যুগ গিয়ে বঙ্কিমের যুগ এল, বুদ্ধি কচকচির ফলে তন্ত্রপুরাণ ন্যায় বেদান্ত সব রচনা হ'লো। তার পর মা কালীর কটাক্ষে

ইঙ্গিতে ধর্ম্মপুরুষ নামলেন হৃদয়ে, তখন মানুষ নেবে কেঁদে দশায় পড়ে নদে শান্তিপুর ডুবিয়ে দিলে। আর এখন ধর্ম্মদেবতা মানুষের বক্ষস্থল থেকে ঝুপ করে ঐ উদররূপ মহা গর্ত্তে নেমে পড়েছেন, তস্য ফলং "অন্নচিন্তা চমৎকারা, বুদ্ধি হয় দিশেহারা।" এই পৈটিক ধর্ম্ম বশতঃ এখনকার জীবের শুধু পেটকা ওয়াস্তে কনষ্টেবলী থেকে মিনিষ্টারী অবধি এমন অকার্য্য নেই যা' করণীয় নয়।

ক্যা। ধর্ম্মের ব্যভিচার হয়েছে বটে, ধর্ম্ম স্বয়ং তো চিরকালই সত্যি, ধর্ম্মই সনাতন ?

প। তুমি যে ধর্ম্মের কথা বলো তা আপাততঃ পুরাতন ও অচল।

ক্যা। কিসে ? দেখিয়ে দিন—ধরুন বাইবেলের Ten Commandments দশ আজ্ঞা, যেমন Thou Shalt not kill—এ তখনও সত্যি ছিল আর এখনও সত্যি। ভগবান বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধী অবধি ঐ এক অহিংসার কথাই বলে এসেছেন।

প। বেশ তো, তার পরে চারদিকে কি দেখছো ? যীশুর প্রিয় শিষ্যদের স্তন বেয়ে মানব জাতির জন্য দুগ্ধ ধারা ক্ষরণ হচ্ছে কিনা ? হাউইটজার আর মেশিন গান দশ আজ্ঞার কোন আজ্ঞার মধ্যে পড়ে ? বুদ্ধের শিষ্য চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যামের ওরা গো মহিষাদি থেকে উচ্চিংড়ি অবধি সব রকম জীবকে পরম প্রেমে উদরস্থ করে কিনা ? মহাত্মা গান্ধী অহিংসার বাণী দেশে ছেড়ে দেবার পর থেকেই হিন্দু মুসলমানে বেশি বেশি হিংসা আরম্ভ হয়েছে কি না।

ক্যা। (নিরুত্তর)।

কটিক। আর—চুরি করা মহাপাপ—Neither shalt thou steal, পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও মিথ্যা কথা বলিবে না—Neither shalt thou bear false witness against thy neighbour, মাতৃবৎ পরদারেষু—Neither shalt thou commit adultory, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ—Neither shalt thou desire they neighbour's wife. neither shalt thou covet thy neighbour's house, his field or his ox, or his ass। দেখেছেন পণ্ডিতজী কি শক্ত নিয়ম, পাড়াপড়সীর কিছুই ছোঁবার জো নেই, কি তাদের ঘরের বৌ ঝি, কি ধন দৌলৎ, এমন কি গরুগাধা ঝি বামুন এস্তক অস্পৃশ্য।

প। ও সব এখন ঘুঁঘুড়ির ট্যাঁকে গেছে, ওসব ধর্ম্মের এখন ঠিক উল্টোগুলি চলছে। অরসিক Moses এর ঐ দশ আজ্ঞা বাহাল রেখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে গেলে আজ কাল যে

কোন ইংরাজ বা ফরাসীর জীবন দু'দিনে শ্মশান হয়ে যাবে। এই ঘোর কলিতে যে অপোগণ্ড নিরেট বুদ্ধি জীব অহর্নিশি সত্য কথা বলবার দুঃসাহস রাখে তার অদৃষ্টে লেখা আছে শ্রীঘরে জামাই আদর কিন্তু যে ক্ষণজন্মা পুরুষকে বাকসিদ্ধি বলে ভেবে চিন্তে আর মিথ্যে কথা বলতে হয় না, উদরাময়ের লক্ষণের মিথ্যা মুখ দিয়ে আপনি বেরোয়, তার অদৃষ্টে—

(সুর করিয়া)　　　　"এদিক ওদিক দু'দিক রেখে
　　　　মেরে ছিল দুধের বাটি।"

তারপর দেখ পরদ্রব্যে হস্তক্ষেপ করার নিষেধাজ্ঞা তাও কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি বাণিজ্যনীতি আর কি সমাজনীতি সর্ব্বত্রই সমান উপেক্ষিত—more observed in its breach, বরঞ্চ পরদ্রব্যে আত্মবৎ বুদ্ধিই একালে সেরা কথা। পরদ্রব্য বিষয়ে এই পরম নৈষ্ঠিক সাধু ব্যবহারের ফল দেখো রাজনীতিতে এম্পায়ার, অর্থনীতিতে ক্যাপিটাল (মূলধন), বাণিজ্যে insolvency (গণেশ উল্টানো), আর সমাজে ডাইভোর্স আদালত। পরের জমি না নিলে তুমি কি দিয়ে এম্পায়ার গড়বে? পরের টাঁকে হ্যাণ্ডবিল প্রস্পেক্টাস্ মারফৎ না হাত বুলোলে তুমি কি দিয়ে লিমিটেড কোম্পানী খুলবে? তার পরে বড় বাজারে মা লক্ষ্মীর সন্তান ঐ মাড়োয়াড়ী মহলে জিজ্ঞেস করে দেখ গে ক'বার বিয়ের বাতি জ্বাললে ব্যবসায়ী লাখপতি হতে পারে। তার পর য়ুরোপের দিকে চেয়ে দেখো পরকীয়া রসের এত বড় বৃন্দাবন আর কোথায় আছে? স্বামী আর স্ত্রী হরণ অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে বার কতক মুখ বদলানো যাতে খুব অনায়াস হয় তার জন্যে ও-সব দেশের সমাজকর্ত্তা মনু পরাশরেরা নিত্য নূতন কত বিধিই না গড়ছেন। স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি—যে কোন দুষ্কুল থেকে স্ত্রীরত্ন আহরণ করবে, আহরণ অসম্ভব হ'লে হরণ করবে। পাশ্চাত্যে আর কিছু দিন পর পরস্ত্রী বলে কোন পদার্থ থাকবে না, এখনই ও দেশের শ্রেষ্ঠ মনিষী Bernard Shaw বলছেন—"Marriage is popular because it combines the maximum of temptation with the maximum of opportunity"—সব চেয়ে বেশি লালসা আর তার পরিতৃপ্তির সব চেয়ে বেশি সুবিধা ও অবসর যে অবস্থায় আছে তার নাম বিবাহ, এবং এই কারণেই বিবাহ এত চল হয়েছে। শুনলে তো?—দেখে যাও, বাপুরা সব, অপরংবা কিং ভবিষ্যতি।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

খোদার দান।

অনেক দিনের কথা—মুসলমান-রাজ্যের কোন এক যুগে, বাদসার প্রাসাদের সন্নিকটেই ছিল একটি মস্‌জিদ্‌। সেখানে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হ'ত,—বিশেষতঃ জুম্মার দিনে। সেই মস্‌জিদের সোপান-শ্রেণীর এক কোণে দুইটী বৃদ্ধ ফকির পাশাপাশি বসে, তাদের ভিখারি-জীবনের সকরুণ আবেদন জানাত—ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার করে ভিক্ষা চাইত। একটি, তার ভিক্ষাপাত্র সাম্‌নে ধরে চীৎকার করে বল্‌ত—'হে খোদাতালা, হে বাদ্‌সার-বাদ্‌সা—আল্লা,—তুমি দান দাও,—তোমার এই অনশন-খিন্ন অধম সন্তানকে।' দ্বিতীয় ফকিরও ঠিক তেমনি সুরে চীৎকার করে বল্‌ত—'হে দুনিয়ার মালিক, হে বাদ্‌সা আকবর, ফকিরের অভাব পূর্ণ কর,—ভিক্ষা দাও। তোমার অসীম রত্ন-ভাণ্ডারের একটি কণা তার পক্ষে যথেষ্ট।'

এক জুম্মার দিনে, রাজকার্য্যের গুরুভার নামিয়ে, দশের সঙ্গে দুনিয়ার মালিকের পদে প্রাণের প্রার্থনা জানাতে বাদ্‌সা ছদ্মবেশে মসজিদে এসে উপস্থিত। ভক্তিনত প্রাণে বাদ্‌সা তখন নম্র, দশের সঙ্গে প্রাণ মিলাতে ব্যগ্র। মস্‌জিদে তিনি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন—এমন সময় শুন্‌তে পেলেন—প্রথম ফকিরের চীৎকার-ধ্বনি! কী ঐকান্তিক নির্ভরতার সহিত জানাচ্ছে সে তার প্রাণের প্রার্থনা,—ভিক্ষা,—আত্ম-দুঃখ-নিবেদন! ঠিক সেই সময়ই দ্বিতীয় ফকিরের করুণ-কণ্ঠে—তাঁহারই নামোচ্চারিত হয়ে উঠল—'হে বাদ্‌সা আকবর—ভিক্ষা দাও!'

প্রার্থনা শেষে বাদ্‌সা ফিরে গেলেন প্রাসাদে। প্রাণে জাগছিল তাঁর তখন ফকির দুটির কণ্ঠোচ্চারিত, ভিক্ষার আবেদন। মনে মনে একটা সঙ্কল্প করে, তিনি ডাকলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে। আভূমিনত সেলাম করে সে দাঁড়াল। বাদ্‌সা অতি গোপনে,—আদেশ দিলেন। অনুচর নিস্ক্রান্ত হয়ে গেল। বাদ্‌সা উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপন মনে বল্লেন,—'এবারে দেখতে চাই ভগবান্‌ কোন্‌টি সত্য।'

(২)

সন্ধ্যা সমাগত। সূর্য্যদেব তখন তাঁর রক্ত-রাগ-রঞ্জিত-বসনাঞ্চলখানি ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চিম গগনপ্রান্ত হতে বিদায় নিচ্ছিলেন। দূর বনান্তের মাথার উপর কৃষ্ণ যবনিকাখানি কে যেন অলক্ষ্য-হস্তে টেনে দিচ্ছেন। ভক্তগণ একে একে মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করছে! জন কোলাহল থেমে গেছে, কেবল মোল্লা তখনও অপেক্ষা করছেন—উপাসনান্তে ভগবানের নাম নগরবাসীকে শুনাতে,—আজান দিতে! ফকিরদ্বয়ও মনে করছিল, 'এই বার উঠি',—এমন সময় বাদ্‌সার অনুচর ভৃত্য-সংভিব্যাহারে এসে উপস্থিত। সে দ্বিতীয় ফকিরের নিকট গিয়ে তাকে বিস্ময়ের অবকাশ না দিয়ে বল্লে—'বাদ্‌সার দান গ্রহণ কর ফকির, তিনি শুনেছেন তোমার প্রার্থনা! পাঠিয়েছেন এই ভোগ্য সামগ্রী; তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর!'

ফকির বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলে—একখানি বৃহৎ মৃৎপাত্রে বহু প্রকারের রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য-সম্ভার। সুমিষ্ট সুগন্ধে স্থানটি আমোদিত হয়েছে! আনন্দ-কম্পিত বক্ষে ফকির রাজ-অনুচরকে অভিবাদন করল। যিনি এই দান দিয়েছেন,—সেই বাদ্‌সার উদ্দেশে সেলাম ও তার পরিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সে গ্রহণ করল—তাঁর অসীম দয়ার দান। তার এতদিনের আশা, এতদিনের কাতর প্রার্থনা আজ সফল! সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরিপূর্ণ প্রাণে বলে উঠল—'জয় আকবরের জয়!' বার বার জানাতে লাগল তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

বিবিধ খাদ্য-সম্ভার দেখে বুভুক্ষু প্রাণ তার বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করতে চাইল না। সমস্ত দিনের ক্ষুধিত আত্মাকে সে তৃপ্ত করতে প্রবৃত্ত হল। অন্তরে তার ধ্বনিত হতে লাগল ধন্য 'আমি ধন্য! কত দয়া তোমার বাদ্‌সা—নইলে কি তোমার এত সুনাম! দীর্ঘজীবি হও, দীর্ঘজীবি হও!'

প্রচুর খাদ্য,—একার পক্ষে অতিরিক্ত। আত্মতৃপ্তির পর তার মনে পড়ল—সঙ্গী ক্ষুধিত ফকিরের কথা। সঞ্চয়ের পক্ষপাতী নয় ফকিরের প্রাণ বলেই হোক্ বা এতদিনের আশা আজ তার পূর্ণ সে-আনন্দে, তার আনন্দের অংশ অন্যকে দিয়ে আত্মতুষ্টি সাধনের জন্যেই হোক্, সে প্রথম ফকিরের নিকট গিয়ে অবশিষ্ট খাদ্য তার সম্মুখে রেখে বল্ল—ভাই, বাদ্‌সা আমার প্রার্থনা শুনেছেন,—পাঠিয়ে দিয়েছেন এই রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য। আমি কৃতজ্ঞ হয়েছি, তুমিও

গ্রহণ কর বন্ধু ! আমার দুঃখ ঘুচেছে,—একদিন যিনি শুনেচেন,—অন্য দিনও তিনি শুন্‌বেন ! ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চিন্ত হও ; আহার্য্যের জন্যে আর আমাদের ভাবতে হবে না। তাঁর দানে পুষ্ট হয়ে আজ আমি খালাস্ ! অবশিষ্ট সমস্ত খাদ্য তোমায় দিচ্ছি,—তুমি তৃপ্ত হও ভাই।'

প্রথম-ফকির কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ কর্‌ল—বন্ধুর দেওয়া পাত্রখানি। বলে উঠ্‌ল,—'বাদ্‌সা আকবর তোমার জয় হোক্। আর যিনি বাদ্‌সা আকবরেও অধীশ্বর,—এই দীন-দুনিয়ার মালিক আল্লা, তাঁর পদে নিবেদিত হক্ অন্তরের আনন্দ-মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা ! দীন ফকির আজ তোমার দয়ার দান গ্রহণ কর্‌তে পেয়ে ধন্য,—আজ সে তৃপ্ত !'

নামাজের আজানে মস্‌জিদ্ মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। ফকির মস্‌জিদ্ পানে ছুট্‌ল। থাক্ এখন তার ক্ষুধার অভাব-অভিযোগ ; কিছুক্ষণের জন্যে সত্যের শান্তিময়ের পবিত্র স্নিগ্ধ-সান্নিধ্য অনুভব করুক্ সে।

নমাজ-অন্তে ভোজনে বসে সে দেখলে,—খাদ্যের নীচে স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে শতাধিক স্বর্ণ-মুদ্রা ! বিস্ময়ে-আনন্দে ফকির হতবাক্ ! আনন্দাশ্রু প্লাবিত হয়ে তখন সে বলে উঠ্‌ল, 'এ কি অপরূপ লীলা তোমার পিতা ! এ যে আশার অতিরিক্ত দান ! কাঙ্গাল ফকির সে, তার আশা অল্প ! বন্ধুর হাত দিয়ে যে দান আজ পাঠিয়েছ, তা তণ্ডুলকণা হলেও তুলনা ছিল না. আর এ যে রাজভোগ,—ধনীরও আকাঙ্ক্ষিত ! তোমার দান বলেই তা গ্রহণ কর্‌লাম,—আল্লা কমবেশী জানি নে। আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা—লও আমার আনন্দ ! আনন্দে আজ আমি পূর্ণ—তোমার আনন্দের দানে সার্থক !'

(৩)

পর দিন আবার দুই ফকির এসে বসেছে—মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণে। আজ আর ছিল না তাদের ভগবানের নিকট বা মানুষের নিকট খাদ্য দ্রব্যের প্রার্থনা,—সকরুণ চীৎকারধ্বনি। আজ তাহারা পরিপূর্ণ তৃপ্ত-হৃদয় ! প্রথম ফকির বল্‌ছিল—'ধন্য আল্লা,—ধন্য বাদ্‌সা—বিশ্বের বাদ্‌সা, তোমার বিশ্বের ভাণ্ডার হতে বাদ্‌সার হাত দিয়ে আমার ক্ষুধিত আত্মার জন্য খাদ্য প্রেরণ করেছ ! তোমার অসীম দয়া প্রাণে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছি ! নাও আমার কৃতজ্ঞতা ! দুঃখ-দৈন্য আমার দূর হয়েচে—তোমার দেওয়া অন্নে,—তোমার দেওয়া স্বর্ণে ! জীবন ধন্য হে প্রেমিক, তোমার প্রেমে।' দ্বিতীয় ফকির বল্‌ছিল—'মঙ্গল হোক্ বাদ্‌সা আকবরের ! ক্ষুধিতের

মুখে তুমি অন্ন দিয়েছ! বাদ্‌সার ভাণ্ডার অক্ষয় হোক্! দীন-দুঃখীর কাতর প্রার্থনা তুমি শোন—তুমিই আল্লা—তুমিই খোদা!'

সেদিনও ছদ্মবেশে বাদ্‌সা এসেছিলেন—মস্‌জিদে। শুনলেন তিনি ফকিরদ্বয়ের কৃতজ্ঞতা-গীতি! প্রাসাদে ফিরে, অনুচরকে দিয়ে ডাকিয়ে নিলেন দ্বিতীয় ফকিরকে। বাদ্‌সার জয়-ঘোষণা ক'রে ফকির প্রবেশ করল সেখানে।

বাদ্‌সা তাকে সম্বোধন করে বল্‌লেন—শোন তোমার বন্ধু কি বলে খোদাতালার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে! সে এতদিন প্রার্থনা করে এসেচে—তাঁর দান। সে পেয়েছে তার প্রার্থিত দান; আজ সে কি বল্‌ছে শোন—'আল্লা আজ তোমার দেওয়া অন্নে, তোমার দেওয়া স্বর্ণে, আমার দুঃখ দৈন্য ঘুচেচে আমি ধন্য! সত্যই সে আজ স্বার্থক! আর তুমি চেয়েছিলে—বাদশা আকবরের নিকট—আমার নিকট দুঃখের আবেদন জানিয়ে ভিক্ষা! আমি প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করতে, যথাসাধ্য করেছিলাম! দিয়েছিলাম—মৃৎপাত্রে খাদ্য দ্রব্যের নিম্নে—শতাধিক স্বুবর্ণ মুদ্রা! কিন্তু তখন দেবতা বুঝি দেখে হেসেছিলেন—কার—ধন, আমি দেবার কে? দেবার মালিক তিনি! এ দানের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি, তার জন্য;—যে তাঁতেই একান্ত নির্ভর করছে! আমার হাত দিয়ে তোমার হাত দিয়ে,—তিনিই দিয়েছেন—তাই তাকে শতাধিক স্বর্ণমুদ্রা! তোমার ধনলোলুপ প্রাণ জান্‌তেই পারে নি ফকির,—দেবার মালিক একমাত্র তিনিই যিনি এই দুনিয়ার মালিক! মানুষ যে তাঁরি, তিনিই তাঁর মঙ্গলময় দান পাঠান মানুষের হাত দিয়ে! মানুষ মালিক নয়, বাহক -সেবক মাত্র।*

---

* একটি প্রচলিত গল্প অবলম্বনে লেখকের এই প্রথম উদ্যম

বাড়তি টাকা ও চড়া দর।

আমাদের দেশে দৈনিক বিনিময়ের কাজ চালাইবার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা গভর্ণমেণ্ট তৈয়ারী করাইয়া দেশে চালাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ক্ষেতের ফসল উঠিলে, কেনাবেচা যখন বাড়ে, রপ্তানী বাণিজ্যের যখন ধুম পড়িয়া যায় তখন তো অর্থের পূর্ব্ব পরিমাণে কুলায় না। টাকার টান তখন বাড়িয়া যায় অনেক। কাজেই গভর্ণমেণ্ট তখন নূতন টাকা তৈয়ারী করাইয়া দেশের ভিতর চলতি টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেন। এই বাড়তি টাকার সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র কেনাবেচা সুবিধা মত চলিয়া যায়। কিন্তু, ক্ষেতের নূতন ফসল উঠার দরুণ কেনা বেচা যাহা বাড়িয়াছিল, রপ্তানীর যে ধুম পড়িয়াছিল, ছয় মাস পরে তাহা যখন কমিয়া যায়, তখন সে টাকাটা যায় কোথায়? কেনাবেচা বাড়িবার দরুণ গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ টাকাটা বাড়াইয়া দিলেন, কেনাবেচা কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলে এই বাড়তি টাকাটার তো আর বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হয় না। তখন তো চলতি টাকার পূর্ব্ব পরিমাণেই দেশের বিনিময় কাজ চলিয়া যায়। তাহা হইলে তখন এই বাড়তি টাকাটা কি হয়? ইহা তিন উপায়ে বাজার হইতে সরিয়া পড়িতে পারে।—(১) এই বাড়তি টাকাটা যাহাদের হাতে থাকে তাহারা হয়তো উহা ব্যাঙ্কে আমানত রাখিতে পারে, অথবা উহা গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানায় নানা উপায়ে আসিয়া জমা হইতে পারে। (২) উহা বিদেশে চালান হইয়া যাইতে পারে। (৩) অথবা উহা গলাইয়া লোকে অন্য প্রকার অভাব মিটাইতে পারে।

বিদেশের বণিক বা মহাজনকে যদি ধাতুমুদ্রা দিতে হয়, তাহা হইলে সে তো আমার জাতীয় মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে না। সে তখন মুদ্রাতে যতটা ধাতু আছে বাজার দর অনুসারে তাহার যাহা মূল্য হয় সেই হিসাবে উহা গ্রহণ করিবে। আমাদের টাকা দেশের ভিতরে কাজ চালায় ষোল আনার, কিন্তু উহার মধ্যে রূপা থাকে ষোল আনার চেয়ে ঢের কম। কাজেই আমাদের দেশী টাকা রূপার দরে বিদেশী বণিককে দিতে গেলে, অথবা গলাইয়া অলঙ্কার ইত্যাদি বানাইতে গেলে লোকসান ছাড়া লাভ নাই। সুতরাং এই দুই উপায়ে বাড়তি টাকাটা বাজার হইতে সরিয়া পড়িতে পারে না। আর বাকী থাকিল প্রথম উপায়ে সরিয়া পড়া।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা অত্যন্ত কম। দেশের বেশীর ভাগ হইল গ্রাম। ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই আমাদের দেশের চৌদ্দ-আনি পল্লীবাসীর। সুতরাং এই বাড়তি টাকাটা যে ব্যাঙ্কে বা গভর্ণমেন্টের খাজাঞ্চিখানায় আসিয়া জমা হইবে সে সুযোগও কম। কাজেই এই বাড়তি টাকার বেশীর ভাগই দেশময় ছড়াইয়া থাকে। এই অবস্থাটাকেই মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন—"The situation is like that of a soil which is waterlogged, which has no efficient drainage and the moisture from which cannot be removed."

বিনিময়ের প্রয়োজনের চেয়ে যদি দেশে চলতি টাকার পরিমাণ বেশী হয়, তাহা হইলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে। কেমন করিয়া? সে তত্বটা সুযোগ জুটিলে বারান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

বয়াটে
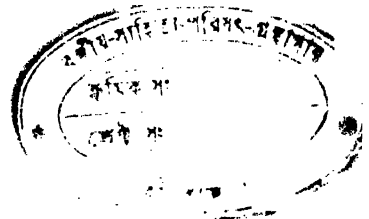
প্রথম।

(গাঁয়ে) এক

খ'ড়ের পাঠশালার ইস্কুল-পালানো ছেলের দলের পাণ্ডা ছিল ন'ব্নে ওরফে নবনীতমোহন আর মণ্টু ওরফে মন্টিথ ছিল তার সঙ্গী। সঙ্গীকে কাঁধে ক'রে ন'ব্নে সকাল থেকে সারাদিন "শত্তুরের" মুখে ছাই দিয়ে গাঁ ময় ডাং পিটিয়ে বেড়াতো।

এই অপহৃতা ডানপিটে ছেলেটার উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গাঁয়ের সাধারণ পাঁচ জনের কিন্তু কোনো অভিযোগ ছিল না;—বরং কাজে-অকাজে যখন-তখন তাকে ডাকের আগে খাড়া আপন জেনে—নব্নেকে তারা ভালই বাস্তো—সবাই।

ঠানদি'দের সে ছিল হাতের লাঠি। হবিষ্যি ঘরে কলাপাতা কিম্বা বাঁশচিরে চেলা ক'রে দিতে হবে—অম্নি ন'বনের খোঁজ। দিনে দশবারই হয়তো বাজারে বরাত পড়্ছে—ঠান্দি'দের

নব্‌নে-ঘোড়া অমনি টগবগিয়ে ছুটলো। টুকটাক খুঁটিনাটি, এটা সেটা ফুট-ফরমাসে, ষষ্ঠী পুজোর কলা কি হরির লুটের বাতাসা—মালার থলের আঁংটা বা ঠঁট, বঁট, চচ্চড়ির খোড়, বড়ি খাড়া যোগাতে নবীন কানাই হাসিমুখে হাজির আছেন। ঠাকুরদা'দের ন'ব্‌নে ছিল গুড়ুক-বরদার—আর মিষ্টিমুখে ডাক দিলে সে সকলেরই—দিন-মজুর। কচি বউ যে লুকিয়ে বাপের বাড়ী চিঠি লিখ্‌বে—ন'ব্‌নে তার পত্র-নবিশ। দু' মাইল দূরে ডাক্তারের বাড়ী থেকে ওষুধ আন্‌বে কে—না ন'ব্‌নে। রোগীর ঘরে চোপর রাত ব'সে জাগ্‌তে হবে—তাও ন'বনে। আবার সখের যাত্রার দলে সে ছোট গন্ধাসুর—বারোয়ারী পূজার হুজুগ জাঁকাতে—ন'ব্‌নে একের নম্বর—পচা-পুকুরের পানা তুলে ফেল্‌তেও সেই অগ্রনী। তার কাছে বামুন বাগ্‌দী, হিন্দু, মুসলমান বিভেদ ছিল না—'কানাই ভাই, ন'ব্‌নে' ব'লে ডেকে যে যাই কর্‌তে বলুক—কিশোর ন'ব্‌নে বুক ফুলিয়ে তখ্‌খুনি তাতে রাজী।

ঐ কাঁচা বুকের আবডালে একটা প্রকাণ্ড প্রাণের সাড়া পাওয়া যেতে ব'লেই বোধহয় গাঁয়েরও পাঁচজনও তাদের মনের পাশে ন'ব্‌নেকে আসন পেতে দিয়েছিল। কিন্তু সকলের প্রাণে আবার "ছোঁড়ার" এ সৌভাগ্য সহ্য হ'তো না। তাই টেরা কান্তি চক্রবর্ত্তী, গণপতি চক্লাদার, বলাই সরখেল এমনি জন কতক নিষ্কর্ম্মা, নিন্দাবাজ, লোকের ন'ব্‌নে ছিল দুই চোখের বালাই। এঁরাই ক'টী নাকি ছিলেন—গাঁয়ের সমাজের চাঁই—অতি সাত্ত্বিক লোক—কারণ টেকো মাথায় তেলোয়—কারোই একগাছিও চুল ছিল না। হাঁ—না কথাতেই "হরি শ্রীমধুসূদনের" নাম ক'রে ধর্ম্মের ধ্বজাখানি কোনোমতে খাড়া রেখেছিলেন। তাঁরা নইলে—গাঁয়ের ধর্ম্ম এতদিনে হনোলুলু কি জুগো শ্লোভোকিয়ায় নির্ব্বাসিত হ'ত—শিব, শালগ্রাম সব বোধ হয় একদিনে জমাট বেঁধে—সাঁড়ায় পুল কি কোনো কেণ্টিলিভার ব্রিজের থিলেনে পাথর হ'য়ে থাক্‌তো। ছেলে বুড়ো সকলের ওপরেই এঁরা অনাহুত মুরুব্বিয়ানা চাল দিয়ে টিকির জোরে সমাজ টিঁকিয়ে রেখেছিলেন—নয়তো সে কোনদিন—ফিরপোর হোটেলখানাই হ'য়ে যেতো। আর গাঁয়ের ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে বেচারী পরার্থপরদের দুই চোখের পাতা তো সারারাত্তেও এক হ'তে পেতো না। তাঁরা মালার থ'লের আঙুল পুরে ত্রিসন্ধ্যা পরের ছেলের মন্দচর্চ্চায় অষ্টোত্তর শত কৃষ্ণনাম জপ করতেন—কখনও আবার তাদের ভাবনায় ফুঁপিয়ে

ফাঁপিয়ে উঠে "ওহো—আহা" আওয়াজ ক'রতে ক'রতে মালার খ'লেটা শূন্য ক'রে তুলে কাঠির মতন শুকনো চোখের কোণাটাই মুছে নিতেন।

ন'ব্নে এঁদের নাম দিয়েছিল—"খোয়াড়ে বলদ।" টেরা কাস্থির ওপর ছিল তার—ভয়ানক রাগ। কাস্থিটাই ছিলেন এ-কটা রত্ন-মাণিকের শিরোমণি। তিনি শুধু ছেলেদের জন্যে ভেবেই অভিভাবকের কর্ত্তব্য শেষ ক'রতেন না—যখন তখনই পাকা বিরিশি সিক্কে ওজনের কীল, ঘুঁষি, কানমলা ক'ষে দিয়ে—তাদের শাসন ক'রে তবে ছাড়্তেন। নবনীতমোহনও সে বুনো ওলের বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা জান্তো—সে কাস্থির গাছের ডাব ঝুনো হ'তে দিতো না—বাড়ীর বাগানের যত চারাগাছ গোড়াশুদ্ধু কেটে নিকেশ ক'রে দিত। ফাঁক পেলেই কাস্থির পালশুদ্ধু গরু ধ'রে নিয়ে গিয়ে দু' মাইল দূরে খোয়াড়ে দিয়ে আসতো।

ন'ব্নের প্রধান শত্রু ছিল ভুঁড়িমোটা, টিকি ঝোলানো বেঁটে, মোটা একটা জীব। সেটা খড়ের চৌপাঠীর মহীরাবণ মহিম পণ্ডিত। মার চেয়েও যেমন তার বোনের দরদ বেশী তেম্নি ন'ব্নের পড়াশুনার চিন্তায় তার বাবার চেয়েও মহিম ছিলেন বেশী উদ্বিগ্ন। ন'ব্নেকে তার নামের মার্কামারা কেরোসিন বাক্সটার ওপর গর হাজির দেখ্লেই মহিম, জোয়ান জোয়ান জন চারেক ছেলে পাঠিয়ে দিত ন'ব্নেকে শূন্যে শূন্যে নিয়ে আসবার জন্যে। তারাও অন্যমনস্ক, অসাবধান ন'ব্নেকে হঠাৎ চিলের মত ছোঁ দিয়ে নিয়ে যেই পাঠশালায় হাজির ক'রে দিত—মহিম অম্নি গুড়ুকটা খুঁটি ঠেস দিয়ে রেখে গর্জ্জে লাফিয়ে উঠে হাঁক ছাড়্লেন—"কিরে ইস্কুল পালিয়ে—ষণ্ডা মার্কামি করা হয়—বুঝি?" সঙ্গে সঙ্গে সে সোওয়া হাত লম্বা খেজুর ছড়ি—নব্নের পিঠের ওপর সপাং সপাং শব্দ তুলে দিল—ন'ব্নেও ডুক্‌রে চেঁচিয়ে উঠ্লো—"ও রে বাবারে বাবা!—মহিম মেটেল পিঠের হাড়্‌গুলো খোয়া ভাঙ্লে রে—বাবা!" মহিম রাগে একেবারে নিসপিস হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্লেন—"কি-রে বেটা, মহিম্ মেটেল?"—আবার পিঠের ওপর ছড়ির দ্রুত আঘাতের শব্দ—সপ্—সপ্—সপাৎ।

কিন্তু এ নির্ম্মম শাসনের কড়া আঘাতগুলো নব্নের পিঠের ওপরেই কাল শিরের নীল হ'য়ে উঠ্তো ছাড়া—তার মনের ওপর কোনো দাগ রেখে যেতে পারতো না। এই রকমের হরদম মারপিটে—ন'ব্নেকে পড়াশুনায় মনোযোগী না ক'রে—বরং পণ্ডিত আর তার জোয়ান ছাত্রদের বিরুদ্ধে তাকে বিদ্রোহীই ক'রে তুল্লো। সে উপায় ঠাওর ক'রতে লেগে গেল—কি

রকম ক'রে এদের জব্দ করা যায়। রেমো, খেবলু, ছলিম আর চে'টুকে নিয়ে সে এক দল পাকালে। কুমোর বাড়ী থেকে এক তাল মাটী নিয়ে এসে মারবেলের মত গোল গোল গুলি তৈরি ক'র্‌লে—বাঁশ কেটে চেঁছে খুব মজবুত মতন এক বাঁটুল গ'ড়্‌লে।

দলের চারজনই ন'ব্‌নেকে সর্দ্দার ব'লে ডাক্‌তো—দুপুরটা হ'তেই সর্দ্দার মিত্তির বাড়ীর পেছনে আমবাগানে দল নিয়ে গিয়ে ব'স্‌তো। চার সাঙাত চার কোণায় প্রহরী খাড়া থেকে দেখ্‌তো—মহিম পণ্ডিতের গাঁট্টা গোট্টা ছেলের দল—খবর্‌দার না এসে পড়ে। সর্দ্দার ইতিমধ্যে মাঠ থেকে গোটা দুই ঘোড়া ধ'রে এনে দুই দু'জন ক'রে তার ওপর তুলে—হর্স রেস দিত—কি বোসের সার্কাস ক'র্‌তো। যে "ফাষ্ট" হ'তো মিত্তির বাড়ীর ছোট ঠানদির কাছ থেকে মোয়া, মুড়কী কি নারকেলের নাড়ু চেয়ে এনে—তাকে "প্রাইজ" দিয়ে খেলাটাকে বেশ লোভনীয় ক'রে তুলেছিল।

এই রকম একদিন খেব্‌লু পূব দিকে পাহারায় আছে—সর্দ্দার গেছে—ঘোড়া ধ'র্‌তে!—এর ভেতর—ঝোপে ঝোপে গা ঢেকে আস্তে আস্তে কারা যেন এগিয়ে আস্‌ছে! ওরে ওই চার জনই তো রে! ঐ যে মাথার চুল দেখা যাচ্ছে!—টুক ক'রে বনতুলসীর ঝোপটার ওপর দিয়ে মাথাটা একটুখানি উঠে প'ড়েছে যে! ঐ তো মহিম পণ্ডিতের—"সিভিল গার্ডের" দল! খেবলু দেখেই তার দলের সাবধান শব্দ উচ্চারণ ক'রে উঠ্‌লো—"চিচিং ফাঁক!" সঙ্গে সঙ্গে আঙুল তুলে সেই দিকটা দেখিয়ে দিলো। ন'ব্‌নে হাওয়ার মতন ছুটে এসে দাঁড়িয়েই—ঝাঁ ক'রে সেই লক্ষ্যে—টং করে বাঁটুল ছুঁড়ে দিলে। অম্‌নি কে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"বাবারে গেলুমরে—মেরে ফেল্লেরে।"

এদিকে ন'ব্‌নের সাঙাতের দল—সর্দ্দারের তারিফ ক'রে হাততালি দিয়ে—"ঠিক লেগেছেরে ঠিক ব'সিয়ে দিয়েছে" ব'লে হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌লো। ন'ব্‌নে একটুখানি মুচ্‌কী হেসে জবাব দিলে—"দেখ্‌লি তো—একেবারে টাঁই ক'রে টিকি সই ক'রেছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক টিকি সই"—ব'লে চেংটু হো হো ক'রে হেসে—আর একদফা হাততালি দিয়ে নিলে।

এর মধ্যে ঝোপের ভেতর খুব "সর্ সর্" শব্দ হ'তে লাগ্‌লো—কা'রা যেন দৌড়োচ্ছে। ন'ব্‌নে—ওদিক পানে তাকিয়েই বল্লে—"ঐ রে—তিন বেটা পালাচ্ছে—দেখেছিস—ভীরুর দল—চল্ চল্ দেখিগে তো—ওর যদি সাংঘাতিকই লেগে থাকে।"

অমনি সদাজাত ন'ব্নে দৌড়ে গিয়ে দেখে—শুক্নো ঝরা পাতার রাশের ওপর বেচারা কাত হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে। বাঁটুলের গুলি তার পিঠে লেগেছিল—গোল হ'য়ে খানিকটা জায়গার চামড়া থেঁত্লে লালচে ছোপ মেরে উঠেছে—রক্ত জ'মে জায়গাটা ফুলে উঠেছিল। ন'ব্নে তার পাশে ব'সে প'ড়েই—হুকুম ক'র্লে—"এই রেমো—খেব্লো দৌড়ে শীগ্গির জল নিয়ে আয়।" ওরা জল আন্তে ছুটে গেল—ন'ব্নে তার পিঠে হাত বোলাতে লাগ্লো। কাপড় ভিজিয়ে খেবলু জল নিয়ে এসে চিপে চিপে খানিকটা জলের ধার দিলে—যেদো অনেকটা আরাম বোধ ক'রল। সে উঠে ব'স্তেই ন'ব্নে তার হাত দুখানা ধ'রে ব'ল্লে—"আমায় ক্ষমা কর্ যেদো—তোর ওপর আমার মাইরি কোন রাগ ছিল না—যত রাগ ঐ ভুঁড়েল মহিমটার ওপর,—বল্ ক্ষমা ক'র্লি তো ভাই।"

যেদো ব'ল্লে—"হুঁ।"

ন'ব্নে ব'ল্লে—"এই রেমো—যেদোকে আজ তিন গণ্ডা পেয়ারা আর দু'গণ্ডা লিচু দিবি বুঝ্লি?"

রেমো ব'ল্লে—"ভুঁড়ে মহিমের গাছ থেকে।"

ন'ব্নে জবাব ক'র্লে—'হুঁ। বেমালুম!"

এর মধ্যে কোথায় ছিল ঢেরা কাহ্নি—বনবাদাড় ভেঙ্গে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে নব্নের হাত চেপে ধরেই—প্রথম ঠাস ঠাস তিনটে চাপড় বসিয়ে দিয়ে—বল্লে—"চল—মহিমের কাছে। বজ্জাত ছেলে বাঁটুল মেরে মানুষ-খুন করা শিখছ? দেখাচ্ছি আজ মহিমকে দিয়ে মজা।" বলে ন'ব্নেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল্লো।

তারপর আবার এক পত্তন-মারামারি-নব্নের পিঠে—হাড় একজায়গায় মাস একজায়গায় ক'রে মহিম তার সুশাসন কর্লে। নব্নেও তথ্খুনি অমনি বেরিয়ে এসে কাহ্নিকে শাসিয়ে গেল—"যাবে না—আমাদের পাড়ায়—বাঁশতলার রাস্তায়? যেয়ো-না আজ—বেঁড়ে কুকুর লেলিয়ে দোব—মাংস ছিঁড়ে খাবে।"

কাহ্নিও মনে মনে একটু ভীত হ'য়েই বাড়ী গেল।

ন'ব্নে পিঠব্যথা, ব্যথা আর পেটভরা খিদে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াতেই—সৎমা হাঁক দিয়ে উঠলেন—"কি রে শত্তুরের পেটের ব্যাটা—বাড়ী এসেছিস্ মুখপোড়া লজ্জা করলো

ঝাঁড়ি গিল্‌তে আস্‌তে ? সারাদিন আম বাগানে মস্তানি গোস্তানী ক'রে—পরের ছেলের পিঠে খাঁটুল মেরে এখন এসেছিস আমার হাড়-গোড় তোর চোদ্দ পুরুষের মাস চিবোতে ? বেরো হাড়হাবাতে হারামজাদা—"

ন'ব্‌নে সে গাল গায়েও লাগালে না, তাচ্ছিল্যে হেসে বেরিয়ে গিয়ে ন'ঠানদির কাছ থেকে এক আঁজল মুড়ি চেয়ে নিয়ে খেয়ে—তাঁর টাকরাসে পৈতের সুতো কাটতে লাগলো। চাবুকের ঘায়ে পিঠের কাটা গুলোর মুখে তখনো ঝিরি ঝিরি রক্ত বেরোচ্ছিল—ন'ঠান দি দেখে ব'লে উঠ্‌লেন—"আহা—লক্ষ্মীছাড়া অপহস্তা মহিমে এমন ক'রে মেরেছে রে—হ্যাঁ ?"

নব্‌'নে মুচকী হেসে বল্লে :—"হ্যাঁ ঠানদি"—তার পরেই মুখ গম্ভীর ক'রে ব'ল্লে—"জান ঠান্‌দি—সব দোষ ঐ শালার—"

ঠান্‌দি—আরো দুবার "আহা আহা" ক'রে জিজ্ঞেস করলেন :—"কার রে দোষ কানাই ?"

ন'ব্‌নে জবাব দিলে—"ঐ শালা কাহ্নি—অতবড় পাজি আর দুটা নেই ঠান্‌দি! এদিকে ধর্ম্ম ফলিয়ে বেড়ায়—ওদিকে তো বুড়া মাকে না খাইয়ে মেরেছে—বিধবা বোন্‌টাকে দিয়ে দাসীবাঁদীর মত খাটিয়ে ত নেয়ই তার ওপর মেথরাণীর কাজ করায়—একমুঠো ভাতের জন্যে না তার এই খোয়ারী—আহা বেচারি !"

ঠান্‌দি বল্লেন সত্যি রে নব্‌নে ওটা রাক্ষস—ব্রহ্মদৈত্য—ওর পরকালে নরককুণ্ডে পোকা হ'য়ে পচ্‌তে হবে।"

ঠান্‌দির মুখের "ব্রহ্মদৈত্যি" কথাটা নব্‌নের মাথার ভেতর গিয়ে তড়াক ক'রে খেয়ালের মুখে দেয়ালী জেলে দিলে যেন। সে ঠান্‌দির সুতো কেটে দিয়েই—খেবলুর কাছে গিয়ে একটা কি যুক্তি এঁটে এল।

তার পরদিন—কাহ্নি গেছ্‌লো—কান-সোনায় ঝিওে ষষ্ঠী না কি কোন সুবচনী ব্রত করাতে নব্‌নে জান্‌তো—তার ফির্‌তে দু'দণ্ড অন্ততঃ রাত হবে।

বাঁশঝাড়ের তলা দিয়েই পথ—চার পাশের বড় বড় গাছের নিবিড় পত্রচ্ছায়ায় জায়গাটা ঘুরঘুট অন্ধকার। কাহ্নি এক হাঁড়ি দই গামছায় বেঁধে নিয়ে হাঁই হাঁই করে আস্‌ছে। হঠাৎ বাঁশঝাড়ের ভেতর কি যেন ঝুর ঝুর ক'রে গুঁড়োর মতন কতকগুলো ঝরে প'লো—সঙ্গে সঙ্গে একটা কি কট্‌কট কটাৎ শব্দ পাঁচ সাতটা বাঁশের গায় ঠক্‌ঠকিয়ে উঠ্‌লো। কাহ্নি একটু

থমকে দাঁড়িয়েই—আবার যেই চলতে আরম্ভ ক'রেছে অমনি বাঁশ বনের ভেতর থেকে—কে নাকি সুরে ডাক্‌লো—"ও কাঁহিঁ কাঁহিঁ"। কাহ্নিতো শুনে থরথরি কাঁপুনি। বাঁশবন থেকে আবার বল্লো—"কঁইরে কাঁহ্নি—আঁমায় তোঁ খাঁশা দঁই খাঁওয়াঁলি নেঁ—আঁজ বাগে পেঁয়েছি আঁজ তোঁর মাঁথাঁ খাঁব।"

কাহ্নির একবার "রাম" বলেই তার পরের "রামের" "রা-ও" আর বেরোলো না—ওরে বা—আ—আ—করেই—একেবারে ধপাস্!

ন'ব্‌নে শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ব'ললে "আরে চক্কোত্তি খুড়ো যে—কি হয়েছে কি হয়েছে?" কাহ্নির মুখে রা নেই। ন'ব্‌নে খুব গোটা কত ঝাঁকি মেরে ডাক্‌লে চক্কোত্তি খুড়ো চক্কোত্তি খুড়ো"—

কাহ্নির একটুখানি সংজ্ঞা ফিরে আস্‌তেই সে তু "উ উ উ" বা-বাপক্ষ করে আবার চুপ্! ন'ব্‌নে ভাবলে—কাহ্নি বেটা ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছে। তাড়া তাড়ি ছুটে গিয়ে বাড়ীথেকে এক গাড়ু জল নিয়ে এসে তার চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগলো—একটু পরে কাহ্নির জ্ঞান হলে—ধরাধরি করে তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে বাতাস-টাতাস করে ঠাণ্ডা করলে। কাহ্নি বললে—"ভূত তার দই খেতে চেয়েছিল—তা দেয় নি বলে আজ তার মাথা খেতে এসেছিল।" ন'ব্‌নে কোনো মতে হাসি চেপে বল্‌লে—"কিচ্ছু নয় চক্কোত্তি খুড়ো, ও আপনার মনের ভুল—চলুন তো লণ্ঠন দিয়ে দেখি কোথায় ভূত।"

কাহ্নি বল্‌লে "আরে সেকি আর এতক্ষণও সেখানে আছে ও ব্রহ্মদৈত্যির বাঁশঝাড় ওখানে ছা-পো নিয়ে চারটে ব্রহ্মদৈত্যি থাকে—সেই ঠাকুরদের আমল থেকে শুনে আস্‌ছি।"

নব্‌নে বল্‌লে—"তা থাক খুড়ো, চলুন আমি আপনাকে বাড়ী এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"চল্ বাবা নব্‌নে"—তুই আজ প্রাণে বাঁচালি বাবা—কিন্তু নব্‌নে—দইখানা একেবারে পড়িয়ে গেছে রে।"

নব্‌নে প্রাণের হো হো হাসিটা দাঁত মুখ খিঁচে চেপে নিয়ে বল্‌লে "ভালই হয়েছে খুড়ো, ব্রহ্মদৈত্যি ঐতো দই খেলে আর আপনাকে কিছু বলবে না।"

বাড়ীর ভেতর ওদিকে রায় বাঘিনীর গুরু-গর্জ্জন শোনা যাচ্ছিল। নব্‌নের সংমা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নব্‌নেরই চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার কর্‌ছিলেন কারণ তার ভাতের কাঁড়ি আগলে রাত দুপুর অবধি কে ব'সে থাক্‌বে ?

কাঙ্খি আর নব্‌নে এমন সময় সদর আঙিনা থেকে ভেতরে এসে পড়্‌ল। কাঙ্খির বাড়ীতে যাবার ভেতর বাড়ী দিয়েই সোজা পথ। নব্‌নেকে দেখেই—ডাকিনী মায়ের ক্রোধ মাথায় উঠ্‌লো তিনি বলে উঠ্‌লেন— "কীঃ—গিল্‌তে হবে না আজ ?—বাপ বাঁদী কিনে এনে ছ না কি যে তোমার জন্যে হাঁড়ির গলা ধরে সারারাত বসে থাক্‌বো! গিল্‌বি তো গিলে যা—নইলে ও পিণ্ডির কাঁড়ি দেব আস্তাকুঁড়ে ফেলে।"

কাঙ্খি বল্‌লে—"বৌঠান শোন আগে বাঁশঝাড়ে ভূত—"

সংমা জবাব কিছু না দিতেই নব্‌নে বল্‌লে—"গিল্‌বো না—দাওগে না আস্তকুঁড়ে ফেলে—কুকুর, শ্যালও খাবে। ঐ একই কথা,—আমিও যা কুকুর-শ্যাল ও তাই।"

কাঙ্খি বল্‌লে—"আরে শোন না, বৌঠান!"

মা বল্‌লেন—"সে কথা কি একবার বল্‌তে রে বেইমানের গুষ্টির ঠুঁটো, সতীনের পেটের আঁটকুড়ে কাঁটা, আমার গা-জ্বালার জড়া—তুই শ্যাল শ্যাল শ্যাল; কুকুর তুই; আসিস কেন লেলিয়ে লেলিয়ে পাতরা মারতে ?

নব্‌নে বেপরোয়ার মতন উত্তর দিলে—"গিলি তো আমার বাবার পয়সায়—তোমার বাপ, খুড়ো, চোদ্দপুরুষের ট্যাঁকে তো হাত পড়ে নি—অমন কপ্‌চাও কেন সব সময় ?"

কথা শুনে—সংমা "ওরে বাবারে" ব'লে একটা ডিগ্‌গির ছেড়ে আকাশের বুক ফাটা গর্জ্জন ধ্বনির মত একটা বিকট আওয়াজে কাঙ্খিকে ডেকে বল্‌লে—"দেখ্‌লে তো ঠাকুর পো", পাড়ার লোকে মনে কর্‌লো একটা খুন খরাবত বা ভয়ানক কিছুই হ'য়ে গেল।

কাঙ্খি এতক্ষণ দু এক কথা ব'লে নব্‌নের ওপর এ গালির গুলি বর্ষণ মনে মনে উপভোগই কর্‌ছিল এবার জবাব ক'র্‌লো "দেখ্‌ছি তো—বৌঠান,—দেখে আমার ভূতের হাতে খোয়াড়ীর কথা অবধি ভুলে গেলাম।"

সংমা বল্‌লেন—"ভূত, ভূতগো ঠাকুরপো, পীরদানার ছানা আমাকে খাবে—আমার ছেলেটাকে খাবে"—

নব্‌নে তার দুইহাতে কাস্থির ডান হাতখানা টেনে বল্‌লে—"আসুন চক্কোত্তি খুড়ো আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

ওরা যেতে লাগ্‌লো সংমা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলেন—"আজ ছাই দোব আসিস্—আভরার ঝাঁড়ি ধরে দোব—হারামজাদা, বজ্জাত, নচ্ছার।"

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে নব্‌নে খেতে বস্‌লো যখন তার মনে তখন রাগ কি লাঞ্ছনা কিছুই ছিল না। একটু আগের ঘটনাটাকে আস্‌তে আস্‌তেই সে রাস্তার হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু সংমা নব্‌নের ওপর আজ ভীষণ প্রতিশোধই নিলেন। ভাতের থালাখানা সাম্‌নে দিয়ে আর কিছু না বলে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালেন—চোখের পাশ দিয়ে তাঁর পৈশাচিক হাসি নির্দ্দয় খেলা খেল্‌ছিল।

নব্‌নে দেখ্‌লে সত্যি ক'রেই একথালা ছাই। বেচারী নীরবে সংমার মুখের পানে একবার উপায়হীনেরে মত উদাস চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিটা তুলে তাকিয়ে ধীরে ধীরে রান্নাঘরের বাইরে এল। সংমার মনে কিন্তু নব্‌নের নীরবতা একটা বিকট উপেক্ষার মত রূঢ় হ'য়ে লাগ্‌লো—তিনি চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"চল্‌লি যে খেলিনে? তোর গুষ্টীর পিণ্ডি চটকে গিল্‌লি না? বড় যে বাপ তুলিছিলি কই ডাক্‌না তোর বাপ্‌কে দেখি!"

নব্‌নে আর বরদাস্ত করতে পার্‌লে না! কথা শুনে থ' ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে ঝড়ের মত ঝটিতি পা থেকে এক পাটি খড়ম খুলে নিয়ে—"বেটি, আজ খড়ম মেরে তোর এক পাটি দাঁত ভেঙে দোব দেখি, তোর কোন্ বাবা, আমার ঠেকায় ব'লে খড়ম নিয়ে তাড়া ক'রে ছুটে আস্‌তেই সংমাও ভয়ে বিস্ময়ে দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে দোর খিল বন্ধ ক'রে দিলেন।

তার একচালাখানার ভেতর ফিরে এসে সারারাত জেগে ব'সে নব্‌নে অনেক কথা সব ভাবলে, খানিকক্ষণ নিজের মনেই ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদ্‌লে, তারপর অবসন্ন দেহ-মনে ঘুমিয়ে পড়লো যখন তখন ভোরের হাওয়া দিতে শুরু করেছিল। উঠ্‌তে নব্‌নের ঢের বেলা হয়ে গেল। উঠেই বাঁশঝাড়ে কাস্থির মাম্‌দো ভূতের কথা নিয়ে হাসাহাসি করবার জন্যে খেবলুর বাড়ীর দিকে চল্‌ল। গত রাত্রের দুর্ঘটনার কথা তখন আর তার মনে নেই—খিদের কষ্টটাও তেমন কিছু বোধ হ'চ্ছিল না।

বাড়ী থেকে বেরিয়েই শুনলো গাঁয়ের সদর হালট থেকে আওয়াজ আসছে—“বাত ভাল্—ও করি—বিষ, ব্যথা ঝাড়ি—চুঙ্গি লাগাই—লৌ চুষি—বা—আ—আত ভাল—

নব্‌নে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখে এক বেদে আর তিন বেদেনী চ'লেছে—বাত ভা-আ-আ-লো হেঁকে। তাদের বগলে এক একটা ক'রে ঝোলা—বেদেনীদের মাথায় আবার ঝাঁপিও আছে—এক একটা। সব পেছনের বুড়ো বেদেনীটা একটা কালো মিস্‌মিসে উল্লুকের ছানা টেনে নিয়ে চ'লেছে—সেটাও ঐ লৌ-চু-উ-উষির সঙ্গে সঙ্গে এক একবার “হুক্ হুক্ হুক্ হু-উ উ-ক্” করে চেঁচিয়ে উঠছে।

উল্লুকের বাচ্ছাটা দেখে নব্‌নের বড় ভাল লাগলো—তা'র ভারি ইচ্ছে হল—ঐ বাচ্ছাটা কেনে। অনেকক্ষণ ওদের পেছনে পেছনে গিয়ে জিগ্‌গেস ক'রলে “ও বেদেনি;—এ হুক্কুটা তোর কত দিনের রে ?”

“ছ মাসের বাবু”

“বেচ্‌বি?”

“বেচ্‌বে—কত দাম দিতে পারিস্‌ ?”

“কত চাস ?”

“ছ' টাকা।”

“আচ্ছা তুই একটু খানি দাঁড়া। আমি ওটা কিন্‌বো—ছ'টাকাই দোব—কিন্তু খবরদার আর কারুকে বেচিস্‌নি।” ব'লে নব্‌নে তাড়াতাড়ি ছুটে বাড়ীতে গিয়ে তার নাগপুরী ছিটের ডবল ব্রেষ্ট কোটটা নিয়ে এল। বড় সখ ক'রে—মাস খানেক আগে বাবার কাছে অনেক ক'রে চেয়ে চেয়ে টাকা নিয়ে কোটটা নব্‌নে তৈরি ক'রেছিল। কানু কাকার আবার কোটটা দেখে খুব পছন্দ হ'য়েছিল—কিন্তু নব্‌নে প্রাণ ধ'রে সেটাকে এক টাকা লাভ নিয়েও বেচতে রাজী হয়নি। আজ এক টাকা লোকসান দিয়েই—দৌড়ে গিয়ে কানু কাকার কাছে ছ'টাকায় তার সাধের কোটটা বিক্রি ক'রে—সেই টাকায় উল্লুক কিনলে। বেদেনী—টাকা গেঁজের পুরে বা-আ-আত ভা-আ-আ-লো করতে তার রাস্তায় চ'লে গেল।

ন'ব্‌নে উল্লুক কাঁধে ক'রে একছুটে একেবারে ন'ঠানদির বাড়ী। “ঠানদি, দেখ আমি একটা উল্লুক কিনেছি—শীগ্‌গির এক ছড়া কলা দাও।”

চাঁনদি হেসে উঠে বল্লেন :—"বেশ ক'রেছিস,—এতদিনে একটা মনের মতন সঙ্গী পেলি—যাহোক"।

উল্লুককে কলা খাইয়ে ন'ব্‌নে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চ'ল্‌লো—রহিম পণ্ডিতের বাড়ী। মনে মনে ব'ল্‌তে বলতে গেল—"থাম্‌ না ভুঁড়েল রহিম, তোমার কলাঝাড় এবার এই উল্লুক দিয়ে শেষ কথাবো না।"

পণ্ডিত তো উল্লুক দেখেই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লেন—আবার একটা উল্লুক নিয়ে এসেছিস্—বেল্লিক, বজ্জাত—কাল তোকে লাগাবো—দশছটা—আর উল্লুককে পাঁচ।"

নব্‌নে ছোট্ট ক'রে—পণ্ডিত যেন শুনতে পায় ও আবার পায় না—এমনি ভাবে "আর উল্লুক তোমার ভুঁড়িতে মারবে ছ'খাম্‌চা" ব'লে সেখান থেকে ছুটে রাস্তায় নেমে এসে উল্লুকের পিঠে একটা আদরের থাবড়া মেরে ব'ল্লে গা-না বেটা,—"নিমেষেরি তরে—সরমে বাধিল—বলি, বলি, বলা হ'ল না"—গান-গা। উল্লুক আদরটাকে অত্যাচার মনে ক'রে খোঁ খোঁ ক'রে উঠ্‌লো।

এর মধ্যে ছেলের পাল তার পেছনে জুটে গিয়েছিল।

খেবুল ছলিম চেংটু, রেধো, মেধো সবাই এসে উল্লুককে খেঁচাচ্ছিল—উল্লুকের উত্তরে মুখ ব্যাকা ক'রে ভিরকুটি ক'রে উঠ্‌তেই ওরা এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে হৈ হৈ শব্দে গাঁয়ের চারদিকে গমগম আওয়াজ তুলছিল। নব্‌নে তাদের শাসন ক'রে, বুঝিয়ে মানিয়ে, থামিয়ে রাখ্‌ছিল ;—ভয় দেখাচ্ছিল—"এই দ্যাখ্‌ চাঁটি মেরে মাথা ভেঙ্গে দোব—জানিস—উল্লুক যদি পালায়।"

ক্রমে ছেলের দল আর উল্লুক এবং তার নতুন প্রভু নব্‌নে বৃহস্পতি মুনিয়ার ডেরার কাছে এসে পৌছুলো। গোলমাল হৈ চৈ শুনে সস্ত্রীক বৃহস্পতি বেরিয়ে এসে হেসে ব'লে উঠ্‌লেন—"আর দেখো হো ঠওয়াকা মাতারি"—

ঠওয়াকা মাতারি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"আরে হাঁহো—এ দাদা, ইতো হনুমন বুঝার।"

বৃহস্পতি সংশোধন ক'রে ব'ল্লে—"নেই নেই হো—কারা বান্দর।"

"হাঁ হাঁ বান্দর" ব'লে—ঠওয়া মাতারি তাঁর নেংড়া পায়ের ওপর টেঙস পেড়ে উঠে কোমরের ওপর টুকু জৈবৎ দুলিয়ে তুল্‌লেন আর বৃহস্পতি বাঁ পায়ে খেঁচিয়ে তার কাছটাতে এগিয়ে দাঁড়ালেন।

—এই বৃহস্পতিটী কোন্ শীতে একদিন যেন ছাপরা জেলা থেকে মাটী কাটতে এই গাঁয়ে এসে একটী কুঁড়ে বেঁধে বাসা ক'রে ব'সেছিলেন। ক্রমে বিঘে দুই জমি দখল ক'রে নিয়ে—আরো দুই হিন্দুস্থানী জুটিয়ে তাদের ওপর জমিদারী চালাতে সুরু ক'রলেন। খাজনা টাজনা যা—তা ঐ দুই বেটা গোবেচারী দিত—তিনি বিনি খরচায় বহাল-তবিয়তে খাসা বাস ক'রতেন। ব'ললে ব'লতো—"দুই বিঘা দুই ধুর জমি আছে কিনা—হামিতো ঐ ধুরে সে থাকি।"

বৃহস্পতির পোষা ছিল পাঁচটী। একটী স্ত্রী—নেংড়া। একটী ছেলে—নুলো। গরু একটী—বেঁড়ে; ঘোড়া একটী সামনের পা টেনে ফেলতো—আর একটী ছাগল—কানা। তিনি নিজে—ডান পাটা আধ বিঘতটাক ছোট ব'লে বাঁ দিকে বেঁকিয়ে নেংচিয়ে চলেন। নবনেকে বৃহস্পতি কিন্তু বড় ভাল বাসতো—"খোকা বাবু" ব'লে ডেকে বাঁশ কেটে লাঠি তৈয়ার ক'রে দিত—বাঁটুলের বাকারি চেঁচে দিত—দোলনা দোলাবার জন্যে—দড়ি পাকিয়ে দিত। নবনেও তার ছাগল, গরু, ঘোড়ার তখির্ তদারক ক'রে—বন্ধুত্ব বজায় রাখতে ভুলতো না।

উদুক দেখে বৃহস্পতি ব'লে—'এ খোকা বাবু,—ইসকো হাম—কুস্তি শিখায়েগা।"

"হাঁ হাঁ বাজী হোবে" ব'লে তাঁর গিন্নি হো হো ক'রে দাঁত বার ক'রে হেসে উঠলেন।

নবনেও হেসে উঠে ব'ললে—"গুড মর্ণিং মাদাম—সাটার ডে।"

নবনে বৃহস্পতির নাম রেখেছিল—"সেণ্ট থার্স ডে"—আর তাঁর গিন্নির নাম ছিল শনিচরী—নবনে তাকে ক'রেছিল—"মাদাম সাটার ডে।"

সেণ্টের বাড়ী ছাড়িয়ে খেবলুদের দোর গোড়ায়—এসে নবনে ব'ললে "খেবলু আজ উদুকের নামকরণ হবে দুপুরে আমবাগানে,—তোরা সব যাবি।"

বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে নবনে—খেতে বাড়ীর দিকে চ'ললো। হঠাৎ গেছে রাত্তিরের কথা মনে প'ড়তেই কে যেন তার বুকের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বি এক খানি কুকরি চালিয়ে দিলে। সেই থালা ভরা ছাই!—আজো খেতে গেলে সৎমা যদি থালা ভ'রে ছাই বেড়ে দেয়! বেচারীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে এলো। কিন্তু কাপড়ের খুঁটে চুপিচুপি আবার সে জল মুছে নিয়ে—নিজের মনেই একবার হেসে খেবলুদের বাড়ী ফিরে এসে তার সঙ্গেই খেতে ব'সে গেল।

তা'পর দুপরবেলা—অনেক সার্কাস, হস'রেস, সখের যাত্রাগান, বহুরূপী সং হবার পর—উল্লুকের নাম রাখা হ'ল। নব্‌নে নাম ঠিক ক'রে ব'ল্লে—"ওর বাঙ্গলা নাম মণ্ট—আর সাহেবী নাম—মণ্টিথ।

সেই মন্‌টিথ্‌ই নব্‌নের সঙ্গী। সুতরাং সেটা মানুষ নয়—উল্লুক।

দুই

মাস দুই আর নব্‌নে বাড়ীতে গেল-ও না—খেলোও না। এবাড়ী সেবাড়ী যখন যেদিন যেখানে সুবিধে পেত পেটের তাগিদ মিটিয়ে নিয়ে,—উল্লুকটাকে কাঁধে ক'রে দিনমান টো টো ক'রে বেড়াতো। রাত্তিরে যেখানেই হ'ক—যা'ই হ'ক—চেটাই কি সতরঞ্চি—তারই ওপর প'ড়ে বেহুঁসে ঘুমোতো। সকাল হ'লেই সঙ্গীটাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়তো গাঁয়ের রাস্তায়। হরি কামারের কুয়োয় নেবে তার কলসী তুলে দিয়েছিল ব'লে—সে নব্‌নের প্রাণের সঙ্গী সেই উল্লুকটার জন্যে সরু একগাছি শেকল গ'ড়ে দিয়েছিল। রাত্রিরে সেই শেকল দিয়ে তাকে নিজের পাশেই; ঘরের থামে টামে বেঁধে রেখে ঘুমোতো। সকালে উঠেই শেকলগাছা খুলে দিয়ে জল নিয়ে খুব ক'রে উল্লুকের গলাটা ড'লে তার বাঁধন ব্যথা লঘু ক'রে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌তো। কত ক'রেই যে সে উল্লুককে নব্‌নে আদর ক'র্‌তো!—"আহা!—তোর লেগেছে" ব'লে দুঃখ ক'র্‌তো—পশু হ'য়ে জ'ন্মেছিল ব'লে তার কপালের মন্দ ভেবে আক্ষেপ ক'রে—বিধাতাকে আপন মতলবী ব'লে গালাগালি দিতেও ছাড়্‌তো না। ঈশ্বরের একচোখো ভালবাসা ব'লে তাঁকে—সে অস্বীকার ক'র্‌তেই চাইত—স্পষ্ট ব'ল্‌তো যে "নইলে কাঙ্খিকে তিনি ক'র্‌লেন মানুষ—আর মন্‌টিথ হল উল্লুক।"

যতদিন গাছে ফল-ফলারি ছিল "মণ্টূর" পেট ভ'রে খাবার অভাব হ'লো না। ন'ব্‌নেকেও খাওয়ার ক্লেশ তেমন পেতে হয় না—দুঃখ কি দরদ কিছু যে তার মনের কোন্ গোপন প্রান্তে বিষম একটা অনুভবের বিষ ছড়িয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনাও একটু ছিল না। তার মা'ত এতদিন বালাই গেছে মনে ক'রে বেশ নিশ্চিন্তই দিন-রাত কাটাচ্ছিলেন। বাবাও অনেক দিন ছেলের বিশেষ কিছু খবর-বার্ত্তা করেন নি। শেষ-মেশ অনেক দিন পরে ব'লে ক'য়ে আবার

তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। সৎমা ব'ল্‌লে—"নিজের থাক্‌বার নেই ঠাঁই শঙ্করার মাকে মাঝে শোয়াই—হায়রে বলিহারি যাই ছেলে! আবার একটা উল্লুক জুটিয়ে কাঁধে ক'রে ঘোরেন—ওর পাত্‌রা কে যোগাবে ?"

ন'ব্‌নে সে কথার আর কোনো জবাব ক'র্‌লে না। চির পুরোণো সেই গালি গালাজ, গজবী কাঁদাকাটীর কলরোল আর বিমাতার ঝঙ্কৃত—ঝাঁঝাল ভঙ্গী ভড়ংএর ভেতরই ন'ব্‌নের কৈশোরের পলিত দিনগুলা একটানা কেটে গেল—আস্তে আস্তে দেহ-মনে তার পুষ্পিত রেণু মধু নিয়ে যৌবন আসন্ন হ'য়ে দেখা দিল—কানে কানে এখন কে যেন অজ্ঞাত কি যেন সে কল্প-লোকের রঙিন কথা চকিতে শুনিয়ে স্বপ্নে-দেখা রূপসীর মত চম্‌কিয়ে রেখে পালিয়ে যায়।

এর মধ্যে ন'ব্‌নের বাবার শক্ত অসুখ হ'ল। সে ব্যাধির হাতে তিনি আর নিষ্কৃতি পেলেন না—তাঁর সে দ্বিতীয় পক্ষের প্রগল্‌ভ,—বয়সী স্ত্রী আর নানা দুঃখে অশান্তিময় সংসার ফেলে চির-শান্তির রাজ্যে চলে গেলেন।

ন'ব্‌নেই হ'ল—এখন বাড়ীর কর্ত্তা। সৎমা আর দিন কতক তাকে কিছু বল্লেন না—শেষে আবার যেমন—তেম্‌নি আরম্ভ হ'ল।

নব্‌নে এখন একেবারেই স্বাধীন। তবু যা হোক একটু আধটু বাধা বাঁধন এতদিন তাকে কিছু অন্ততঃ আট্‌কে ধ'রে রেখেছিল। আজ সে সব ভেঙে চুড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে গিয়েছে। এখন সে তার—আর তার সেই উল্লুকটা। উল্লুককে কাঁধে ক'রে গাঁয়ের প্রত্যেক বাড়ী, বাঁশ ঝাড়, কলা-ঝোপ, তাকে চিনিয়েছে। কাঙ্খির মুখে-হাতে আঁচড়িয়ে, কামড়িয়ে মণ্টু তার প্রভুর সঙ্গে এক হ'য়ে—টেরির সঙ্গে রীতিমত শত্রুতা আরম্ভ ক'রেছে। কাঙ্খিকে দেখ্‌লেই—মণ্টু এখন "খ্যা খ্যাখ্যা" ক'রে তেড়ে কামড়াতে যায়—কাঙ্খি অম্‌নি হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে মারে এক ঘা—মণ্টুও ফাঁক দেখ্‌লেই লাফিয়ে গিয়ে দেয় কামড় বসিয়ে। কাঙ্খি তখন ন'ব্‌নের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'রে গালাগালি দিয়ে সুবিধা পায়তো—তারই কান ম'লে দিয়ে—মনটিথের ওপরকার রাগের শোধ নেয়।

ন'ব্‌নের বাবা মারা যাবার পরদিন থেকেই তাদের বাড়ী কাঙ্খি ঠাকুরের যাতায়াতও কিছু ঘন ঘন আর নৈত্যিক হ'য়ে দাঁড়ালো—মন্দলোকে তাকে নৈমিত্তিক ব'লে মন্তব্য কর্‌তেও ছাড়্‌লে

না। ন'ব্‌নের কানেও একথা গেল—সে কেবল মন্টুর কানে কানে কথাটা ব'লে হাউ হাউ ক'রে একবার কেঁদে উঠ্‌লো। যারা শুন্‌লো তারা ভাব্‌লো—বাবার শোকে কাঁদ্‌ছে। শুধু মনটিথ বুঝলো যে স্বর্গগত আত্মার অতি হীন অপমানে ন'ব্‌নে কাঁদ্‌ছে।

কাঙ্খিঠাকুর ন'ব্‌নের সংমার সঙ্গে সারাদিনই যেন কি গুজুর গুজুর ফিসির ফিসির করে। একদিন আবার বসন্ত কাকার কাছে গিয়ে তার কানে কানে কি একটা কথা ব'লে এল। দু'জনেই খুব এক চোট হাস্‌লেন। বসন্ত কাকা ছিলেন গাঁয়ের একটী নিষ্কর্ম্মা তরুণ বাবু ;—ন'ব্‌নের সব কন্দীর অন্ধি সন্ধি তিনি অনেক জান্‌তেন—ন'ব্‌নে তাকে আত্মীয় ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌তো।

কদিন পরে বসন্ত কাকা একদিন কথায় কথায় ন'ব্‌নেকে উৎসাহ দিয়ে ব'ল্লেন :—"নবু, ছেলেবেলা আমরা যেমন মাষ্টার মশায়দের নামে পদ্য তৈয়ের ক'র্‌তুম এই মনে করে—"নিধুমাষ্টার ছোট লোক, তার দু'টো ঢেলা চোখ"—সেই রকম আমাদের গাঁয়ের একটা পদ্য লিখ্‌লে কিন্তু মন্দ হয় না—তুই লেখ্‌ না।"

ন'ব্‌নের মাথায় কথাটা চট্‌ ক'রে গিয়ে একটা যেন নেশার ঢেউ খেলিয়ে গোলাপী হ'য়ে লাগ্‌লো। সে ব'ল্ল—"আচ্ছা"। সেই রাত্তিরেই তার লেখা হ'য়ে গেল :—

> "পোষ্টমাষ্টার দাঁতচন্দ্র মারেন খিঁচুনি,
> বড় বাবুর ধর্ম্মভান পায়রা বগ্‌বগুনি।
> মেঝকর্ত্তা কোলা ব্যাং ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঁং
> কাপ্তেনী চুল প্রাণেশ বাবুর খাট পায়ের ঠ্যাঙ্‌।

ইত্যাদি আরো অনেক—সে প্রায় তিন পাতা।

সকালবেলা ছুটে গিয়ে ন'ব্‌নে বসন্ত কাকাকে পদ্য প'ড়ে শোনালে। বসন্ত কাকা "বাঃ বেশ হ'য়েছে—চমৎকার নবু—তুই যে একজন রবি ঠাকুররে"—এই সব ভাল ভাল কথা ব'লে ন'ব্‌নের খুব তারিফ ক'র্‌লেন। ন'ব্‌নেরও মনে যেন একটা কি সার্থকতার আনন্দ—কেমন যেন মিঠা একটা অনুভব—হঠাৎ জেগে উঠে—তার নিজেকে, চারিদিকের যা কিছু—মাথার ভেতরটা—যেখানে চিন্তার ঝিলিমিলি কাজ-করা স্বপ্নের জাফরি-বুনানি হয়—সেইখানে—বেশ

লাগ্‌তে লাগ্‌লো। ন'ব্‌নে ভাব্‌লো—এখন থেকে সে পদ্যই লিখ্‌'বে—সে সত্যি ক'রেই—রবি ঠাকুর হবে।

এই রকম কল্পনার অশোক কুঁড়ি ফোটানো রঙখেলা মাস্তিষ্কে নিয়ে—বসন্ত কাকার কাছে এক ছিলিম তামাক খেয়ে রায়-বাড়ীর বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে—সরু পায়-হাঁটা রাস্তায়—কবিতার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ন'ব্‌নে ও-পাড়ার দিকে ফিরে যাচ্ছিল—উল্লুক বন্ধু মণ্টুটী ছিলেন—কাঁধের উপর সিংহাসনে। আম-বনের ভেতর একটা ছোট ঝাঁকড়া আস্‌সেওড়া ঝোপের কাছে এসেছে যখন—কে যেন পাশ থেকে ডাক্‌লে—"শুন্‌লে—নবনি।"

ন'ব্‌নে চকিত হ'য়ে তাকাতেই দেখ্‌লে—সে তার মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে চেয়ে র'য়েছে। ঠোঁট ঘিরে, চোখের কোণায় মুচকী হাসি খুব সরু বিজলী ফালির মত চকিত খেলা খেল্‌ছিল। তরুণী সে। সুন্দর মুখখানা। উদ্‌লো মাথায় চুলের রাশ এলানো—দু'একগাছা কপালের পাশ দিয়ে ঝুলে এসে গালের উপর ঝুম্‌কো বেঁধে উঠেছিল। কালো চোখ দুটী। চুল পেড়ে ধুতি একখানা প'রেছিল—হাতে সরু সরু দু'গাছা চুড়ি আর কিছু গয়না নেই।

ন'ব্‌নে থ'মকে থেমে যেতেই—সে ব'ল্‌লে—"ন'ব্‌নে, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—তাই দাঁড়িয়ে আছি।"

"তা' এখানে কেন কিরণ,—ময়নাকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেই পারতিস্‌।" ব'লে ন'ব্‌নে কিরণের মুখের দিকে আবার চাইলে। কিরণ ব'ল্‌লে—"না—বাড়ীতে সে কথা বলা যাবে না—সে অনেক কথা—তোমার কাছে কত কথা যে ব'ল্‌তে ইচ্ছে করে।"

"বেশ তো—তা বলিস। দুঃখ হয়?—মনটা ভাল লাগে না? স'য়ে যাবে—জানিস নে কি ঝাঁটা-লাথিটা আমার স'য়ে গিয়েছিল।"—

খুব আস্তে "ঝাঁটা লাথি আর এ"—ব'লে কিরণ মুখের ওপরকার চূর্ণ চুলের গোছাটা আল্‌গোছে একটুখানি দোলা দিয়ে দিলে। ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"তা বল,—এখন কি কথা ব'লবার জন্যে দাঁড়িয়ে র'য়েছিস্‌?"

কিরণ ব'ল্‌লে—"কি কথা? বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? আচ্ছা আমি কেমন দেখ্‌তে নবনি?"

"আশ্চর্য্যি এ প্রশ্ন তোর" ব'লে হেসে উঠে ন'ব্‌নে আবার ব'ল্লে—"বেশ দেখ্‌তে।" তা'পর মণ্টুর দিকে মুখটা তুলে তাকে ব'ল্লে—"বেশ দেখ্‌তে—নারে মণ্টু?"

মণ্টু বাঁ হাতের দুটো আঙুলে পিঠের বাঁ পাশটা একবার চুল্‌কিয়ে নিয়ে এ প্রশ্নের—কবুল জবাব দিলে।

কিরণ হঠাৎ একটুখানি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেই ব'ল্লে—"বেশ দেখ্‌তে—না? এ দেহ এ ভার আর সহ্য না—বুকের ভেতর কিসের একটা কি যেন সাড়া অনবরত শিউরে শিউরে উঠ্‌ছে—কি যে ইচ্ছে করে—না কি যে ইচ্ছে করে তা ব'ল্‌তে পার্‌বো না—ছিঃ লজ্জা করে। আমি একখানা চিঠি লিখে তোমায় পাঠিয়ে দোব—মাথা খাও সবটা প'ড়ো" ব'লে কিরণ ছুটে চ'লে গেল।

ন'ব্‌নে ভাব্‌লো—ও কি পাগল হ'য়ে গিয়েছে? তারপর ভাব্‌লো—না। তবে ও কি ব'ল্লে? ও ব'ল্লে যা—তাও নবনী বুঝলো। তারো তো মনের কুঞ্জবনে ফাল্গুন দিনের ফুল ফুট্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল—নব যৌবনের আগমনী খবর দিয়ে মর্ম্মের বিতানে কবেইত কোকিল ডেকে গিয়েছে। ন'ব্‌নের মনে হ'ল—বেশ দেখ্‌তে কিরণ! নিজে সে আমায়—তার রূপ আর হৃদয় দুটো ব্যক্ত ক'রে দেখিয়ে বুঝিয়ে—তার ভরা যৌবনের বন-ভবনে আজ অতিথি ব'লে ডেকে নিয়ে—যা কিছু তার সর্ব্বস্ব—নিঃশেষ ক'রে সঁপে দিতে চায়। আমারও যেন কি একটা ইচ্ছে ক'চ্ছে—এত সহজে—তাকে পাওয়া যাচ্ছে—সে পাওয়ায় না···জানি কি আনন্দ!

ঠিক সময়ে চিঠি এল। "প্রিয়তম" ব'লে ডেকে কিরণ তাতে তার কি চাই—কি ইচ্ছে করে স্পষ্ট ক'রে লিখে দিয়েছিল। কেঁদেছিল—সেধেছিল—মিনতি ক'রে ভিক্ষে চেয়েছিল—যদি বেশী কিছু না হয়—একবার শুধু—"তুমি আমার" ব'লে সে পরিপূর্ণ যৌবন মঞ্জুরিত দুখানা হাত নবনীর গলার উপর দিয়ে বিলোলিত ক'রে দেবে—আর সে তার দুখান ঠোঁটের হাসির ওপর ফুল ফুটিয়ে তুল্‌বে—পলাশ-কলির মত গাঢ় রক্ত বরণ—পদ্মদলের মত ফিকে নয়।

ন'ব্‌নে চিঠি পেয়ে কিরণের সঙ্গে দেখা ক'র্‌লে—তাদের খিড়্‌কি-পুকুর-ঘাটে ছিপ ফেলে মাছ ধরার আছিলায়। কিরণ এল—পিপাসা নিয়ে—ব্যগ্র বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"সে হয় না কিরণ।"

মুখটা গম্ভীর ক'রে চোখের কোণে বাঁকা চাউনি একটা চেয়ে কিরণ চ'লে গেল।

ন'ব্‌নে বাড়ী ফিরে দেখে—কাঙ্গি ঠাকুর তাদের দাওয়ায় ব'সে আছে। সে খবর দিলে—কি যেন খুব জরুরী কাজে—অনঙ্গ তাকে ডেকে গেছে।

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"যাচ্ছি।"

এর মধ্যে বসন্ত কাকা এসে খুব কিন্তু-মিন্তু ভাব দেখিয়ে ব'ল্লে—"ওরে নবু, সে কাগজটা তো খুঁজে পাচ্ছিনে রে।"

ন'ব্‌নে সেটাকে মোটেই গুরুতর কথা মনে না ক'রে উত্তর দিলে—"কোথায় হয়তো প'ড়ে গিয়েছে—দেখ্‌বোখন দু'জনে খুঁজে। চলুন—অনঙ্গদা ডেকে গেছে কেন—শুনে আসি।"

মণ্টুকে কাঁঠালগাছের একটা সরু ডালের সঙ্গে বেঁধে গাছেই তুলে দিয়ে, ন'ব্‌নে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এল। রাস্তায়ই অনঙ্গদা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ব'ল্লেন—প্রাণেশদা ন'ব্‌নেকে ডেকেছেন—পোষ্টাফিসে—খুব জরুরী—এখুনি যেতে হবে। ন'ব্‌নে জিগ্‌গেস ক'রে জানতে চাইলে কি এমন জরুরী। অনঙ্গদা জানালেন—"রিজিয়া" থিয়েটার হবে—তাই ন'ব্‌নেকে বিশেষ দরকার।

ন'ব্‌নে শুনে একবার লাফিয়ে হেসে—আনন্দ ক'রে ব'ল্লে—'থিয়েটার? বাঃ—আমি—রিজিয়া।'

অনঙ্গদা ব'ল্‌লে—"পারবি ত?"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"পার্‌বো না?—দেখ্‌বেন কি রকম ম্যাজেষ্টিক্যালি অ্যাক্ট করি।"

কথায় বার্ত্তায় ওরা এসে ডাকঘরের কাছে পৌছুলো। প্রাণেশদা সেখানেই ছিলেন। অনঙ্গদা হেসে প্রাণেশদার দিকে তাকিয়ে ব'ল্লে—"এই নিন্ দাদা, আপনার আসামী—রিজিয়ার পাঠ নাকি খুব Majestically act ক'র্‌বে।"

প্রাণেশদা—"তা তো ক'র্‌বেই" ব'ল্‌তেই পোষ্টমাষ্টারবাবু তাঁর ওপর পাটীর দুটো উঁচু দাঁতে নীচের দুটো নীচু দাঁতে ঘ'সে কড়মড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"পাজি, হারামজাদা, এ সব কে লিখেছে?"

তাঁর হাতে সেইপদ্যের কাগজ।

ন'ব্নে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে বসন্ত কাকার মুখের দিকে একবার তাকালো। বসন্ত কাকা কাশলেন—আর মেঝ-কর্ত্তা গ'র্জ্জে উঠে ব'ল্লেন—"বল না হে, কে লিখেছে—এ পদ্য ?"

ন'ব্নে গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দিলে—"আমি।"

সক্কলেই ব'ল্লেন—"হ্যাঁ—তা আমরাও জানি—কিন্তু কেন লিখেছ ?"

"শুধু খেয়ালে—আমি যা লিখেছি—সত্যি ক'রেই আপনাদের তা—ভাবিনে।"

"আর সাধুগিরি দেখাতে হবে না—ফাজিল বোম্বেটে—খড়ম মেরে দাঁত ভেঙে দোব" ব'লে পোষ্টমাষ্টার ন'ব্নের দিকে এগোতেই—আর দু'জন তাকে রুখ্লেন। এর মধ্যে কাঙ্গি ঠাকুর দৌড়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে ব'ল্তে লাগ্লেন—"শুধু তাই নয়—আরো আছে।"

এই টুকু ব'লে একবার থেমে একটু দম নিয়ে নিলেন—তারপর আবার ব'ল্লেন—"আবার প্রেম আরম্ভ ক'রেছেন—ভদ্র লোকের কুলে—কলঙ্ক দেবার চেষ্টা।"

কাঙ্গি ঠাকুর একখানা চিঠি প্রাণেশদার হাতে দিলেন। কিরণ সে চিঠি ন'ব্নের লিখেছিল।

কাঙ্গি ব'ল্লেন—"ন'ব্নের বিছানার নীচে ওর মা—এই চিঠি পেয়েছে ।"

সবাই তখন এক সঙ্গে ব'লে উঠ্লেন—'দেখি দেখি।"

প্রাণেশদা ব'ল্লেন—"না থাক,—এ চিঠির কথা নিয়ে বেশী নাড়া চাড়া করবার দরকার নেই। কিন্তু নব্নে, তুমি এর কোনো জবাব দিয়েছ ?"

"না" ব'লে নব্নে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

"জবাব দেবে মনে ক'রেছ ?"

"না।"

"ওঃ! অল্প কথা বলেন—বেটা খুব দার্শনিক" ব'লেই কাঙ্গি ক'সে ন'ব্নেকে এক চড় বসিয়ে দিল। অম্নি সঙ্গে সঙ্গে এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। মণ্টুকে কে যেন এর মধ্যে খুলে দিয়েছিল। সে গলায় শেকল মেকল জড়িয়ে একেবারে পোষ্টাফিসে এসে হাজির। কাঙ্গিরও চড় মারা—মণ্টু একেবারে তার সুমুখে।—দেখেই তো কাঙ্গি "হেই হেই এইও এইও" ক'রে

উঠ্‌ল ; মণ্টু ও সেটা তাকেই তিরস্কার মনে ক'রে এক লাফে গিয়ে কাঙ্খির ঘাড়ে লাফিয়ে উঠে পিঠের ওপরটা কাম্‌ড়িয়ে ধ'র্‌লে। কাঙ্খি তো পরিত্রাহি চীৎকার—"ওরে রক্ষা কর—রক্ষা কর" ডাক্‌। ন'ব্‌নে তাড়াতাড়ি মণ্টুকে টেনে ছাড়িয়ে এনে জোরে এক চাপড় মার্‌লে। কাঙ্খি উল্লুকের গ্রাস থেকে উদ্ধার পেয়েই লাফিয়ে তার প্রভুকে উল্লুক পোষার অপরাধে আর এক চাপড় দিতে এগোবার উপক্রম ক'র্‌তেই মণ্টু এমনি "খোক্‌খো—খো" ক'রে খেঁকিয়ে উঠ্‌লো যে কাঙ্খি ত্রাসে তিন রশি তফাৎ স'রে খাড়া।

সকলেই তখন ন'ব্‌নেকে এক কথায় ব'লে দিলেন :—"ন'ব্‌নে গাঁয়ে তুমি সবারি ভালবাসা পেয়েছিলে—কিন্তু তোমার এই ব্যাপারে—সে ভালবাসা তুমি হারালে। গাঁয় কোনো বাড়ী আর তুমি যেতে পাবে না—তোমার সঙ্গে ছেলে পিলেদের মেশা পর্য্যন্ত মানা। এই কথা মনে রেখে চ'ল্‌বে।"

মণ্টুটীকে কোলে চেপে নিয়ে ন'ব্‌নে বাড়ী ফির্‌লো। আজ ঐ তার একমাত্র সঙ্গী। আজ আর তার কেউ আপন নেই—কোনো দিনই ছিল না—তবু এতদিন পরকে আপন ক'রে নিয়ে—বুকখানাকে লোহার বাঁধনে শক্ত ক'রে শত ব্যথা নিপীড়িত জীবনের লাঞ্ছিত দিন রাত্রিগুলো নিশ্চিন্ত, উদাসীন ভাবেই কাটিয়ে দিয়েছে। কোনো আঘাতের অভিযোগই মনোবেদনায় ঘনিয়ে তুলে নিজের জীবন-যাত্রাকে একান্ত দুর্ব্বহ ক'রে নেয় নি—আজ সকলের ধিক্কৃত এ নিঃসহায় জীবনের বোঝা তার কাছে বড় বেশী ভারি ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। সান্ত্বনার মধ্যে ঐ মূক, মূঢ় পশুটী। তাকেই বুকের কাছে নিয়ে সন্ধ্যা অন্ধকার হ'য়ে আস্‌তেই ন'ব্‌নে আজ শুয়ে প'ল। মণ্টুর গলায় আজ আর বাঁধন নেই—নিজের সবল দু'খান শিরা-সুবলিত বাহুর বাঁধনে—মণ্টুকে একান্ত আপনার ব'লে ন'ব্‌নে আজ জড়িয়ে নিয়েছে। তার মনের চিরন্তন ক্ষুধিত ও পাষাণ ফলকের উপর যত দুঃখক্ষোভের কঙ্কালসার কাহিনী অব্যক্ত লিপিকায় [illegible] হ'য়ে ছিল—সে সবই যেন এত কাল পরে আজ অক্ষরিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

"মণ্টু ভাই—আমার যে কি ব্যথা" ব'লে—মণ্টুর বুকের ওপর মুখখানা রেখে ন'ব্‌নে উপুড় হ'য়ে প'ল। মণ্টুর—হৃৎপিণ্ডটার দ্রুত চঞ্চল গতি স্পন্দন বুঝি ন'ব্‌নের প্রাণে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একটা কিছু আশার বাণী শুনিয়ে গেল। সে উঠে ব'স্‌লো।

তখন অনেক রাত্তির। দূরে একটা হুতোম পাখী ডাকছিল—"ধুম্—ধুধুম্—ধুম্।" ন'ব্‌নে—শুনে একবার হাঁকলো। তারপর মন্টুকে কাঁধে নিয়ে সেই অন্ধকার রাতে বেরিয়ে প'ল। তার পরদিন থেকে আর কেউ ন'ব্‌নেকে খ'ড়ের সরহদ্দে দেখ্‌তে পেলে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্য সাধনা

——:০:——

(আলোচনা)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই 'পরিচারিকা' মাসিক পত্রে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে এক অভিনব শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিয়া "সাহিত্য ও সমাজ নামক" এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া মন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; মনে করিয়াছিলাম বাংলা সাহিত্য যে পদক্ষেপে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, তাহাতে এ অতি অল্পকালের মধ্যেই এক বিশ্ববরেণ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপদে অধিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু এই দুই তিন বৎসরের মধ্যেই সাহিত্যে বিশেষতঃ উপন্যাসে এমন এক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে যে সে আশার সফলতা ক্রমশঃই সুদূরসম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় সাহিত্যের প্রবীণরথী স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার নিজের সময়ের সাহিত্যের অবস্থা আলোচনা করিয়া সক্ষোভে যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ সে কথাই ভাবিতেছি, বুঝিতেছি সেই কল্যাণকামী দেশপ্রাণ পুরুষের সখেদোক্তির অবসর এখনও সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই;—বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ উপন্যাসের অনেকাংশই এখনও "অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য।" কবি রবীন্দ্রনাথ ও ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা এ যুগের বিশেষ সম্পদ্ হইলেও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের দুরবস্থা এখনও পূর্ব্বের মত সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের এত সাধের সাহিত্য মন্দির দিন দিন

সাধনা বর্জ্জিত—অসত্যভাষীরা প্রলাপে অধিকতর মুখরিত হইতেছে ; শ্রদ্ধাযুক্ত সাধনারত ভক্ত সাহিত্যসেবক আর দেখিতে পাইতেছি না। সুলভ যশের মোহ, অর্থের লালসা হৃদয় হইতে শ্রদ্ধাকে বিদূরিত করিয়াছে, ভক্তির স্থান আত্মম্ভরিতায় ও অহমিকতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

আমরা বিস্মৃত হইয়াছি যে, সকল প্রকার সাফল্যের জন্য, সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্থির, অবিচল, ঐকান্তিকী সাধনা আবশ্যক। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে যেমন অবহিত চিত্তে জ্ঞানের সন্ধানে নিমগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য, যোগীর পক্ষে যেমন চিত্ত-বিক্ষেপকারী বিষয় হইতে আত্মাকে নিরুদ্ধ করিয়া একাগ্রতা সহকারে ধ্যেয় বস্তুতে সংযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, সাহিত্যসাধকেরও সেই প্রকার সত্যের দর্শন অনুভব ও প্রকাশে ব্যাপৃত হইতে হয়। সাহিত্য-সাধনা অন্য সর্ব্বপ্রকার সাধনার মতই কঠোর। জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে সত্যদর্শী হইলেই চলে, যোগীর সাধনা সত্যদর্শন ও সত্যাশ্রয়ে সাফল্য লাভ করে, কিন্তু সাহিত্যসাধকের মনস্কাম সত্যদর্শন, সত্যাশ্রয় ও সত্যের প্রকাশ এই ত্রয়ের মিলনে সিদ্ধ হয়। সাহিত্যিক একাধারে দ্রষ্টা, বোদ্ধা ও স্রষ্টা, একাধারে জ্ঞানী, যোগী ও শিল্পী।

সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর-স্পর্শ শূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥"

পাশ্চাত্যরসজ্ঞ কলাবিৎ পণ্ডিতগণও সাহিত্যকে "Divine Idea"র প্রকাশ কিম্বা "Criticism of Life" প্রভৃতি বলিয়াছেন। সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় বা সাহিত্যিকের কর্ত্তব্যাবধারণ বিষয়ে জগতের বড় বড় পণ্ডিতগণ অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু উপরে উদ্ধৃত আর্ষ বাক্যটীর ন্যায় অপরূপত্ব ও মহত্ত্বের ব্যঞ্জনা, বোধ করি, আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। সাহিত্যিকের গুরুতর দায়িত্ব বিষয়ে এই অপূর্ব্ব বচনটীর অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট বচন আর সৃষ্ট হইয়াছে কিনা সন্দেহের বিষয়। "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ"—সাহিত্যের আনন্দ ব্রহ্মাস্বাদ জনিত আনন্দের সহোদর স্বরূপ। ব্রহ্মধ্যানরত যোগীর ব্রহ্মজ্ঞানলাভে হৃদয়ে যে অপরূপ পুলকের, অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়, সাহিত্যরসপিপাসু ব্যক্তিরও সাহিত্যসাধনায় "সত্যশিবসুন্দরে"র "সচ্চিদানন্দে"র সাক্ষাৎলাভে সেই প্রকার অসীম রসবোধ ঘটে।

শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মাস্বাদজনিত আনন্দকেই আনন্দের পর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসাধনার আনন্দ এই অসীম বিমল আনন্দেরই সহোদর।

যে সাহিত্য "সত্যশিব সুন্দরে" সাক্ষাৎলাভ দ্বারা প্রাণে ব্রহ্মের, অনন্তের যোগাস্বাদ উপনীত করে সে সাহিত্যের সৃষ্টি কি বিশাল অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর সাধনার ফল, সকল সাহিত্যসেবককেই উহা উপলব্ধি করিতে হইবে। সাহিত্যিকের এই গুরুতর দায়িত্ব স্বীকার করিয়াই জগতে সকল কবি অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন—সাধনা বলেই জীবনের মর্ম্মের কথাগুলি, সত্যনিচয় প্রকাশ করিয়া ঋষির পদে উন্নীত হইয়াছেন। এই গভীর সাধনা কালিদাস ভবভূতি মধুসূদন বঙ্কিমের ছিল, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী ব্রাউনিংএর ছিল। কালিদাস ভবভূতিপ্রমুখ কবিগণের কাব্যারম্ভে বাগ্‌দেবীর বন্দনা কেবলমাত্র অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী গতানুগতিকতা নহে, ঐ অর্চনার ও বন্দনার মধ্যদিয়াই স্বীয় সঙ্কল্পিত ব্রতের প্রতি কবিপ্রাণের অপার নিষ্ঠা, ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে। মধুসূদন যখন কল্পনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

—"রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

কবিপ্রাণের—নিত্যাচরিত—সাধনা—সঙ্কল্প—ঐ কথায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই—'সাধনা' পত্রিকাই চিরদিন তাহার সাক্ষী থাকিবে।

এই সাধনাতেই কবি শিল্পী জীবনের সত্যের দর্শনলাভ করেন, কবির কল্পনা ইহাতেই উদ্দীপ্ত হয় এবং বাক্য "বাণীতে" (Message) রূপান্তরিত হইয়া আনন্দের উৎসরূপে নিত্য বিরাজিত থাকে। সত্যসৃষ্টি, সত্যপ্রকাশ, সত্যের সহিত-অন্তরের পরিচয় স্থাপনে যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি। কল্পনা সত্যে রসের সংযোগ করে এবং সত্য এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়। সত্যের উপরই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, ভাব সাধনাই সাহিত্যের রসসৃষ্টি, তুরীয় কল্পনাই কবির, শিল্পীর সহচরী।

এই সাধনার বলেই কবি বা শিল্পীর সহিত বিশ্বের এক নিগূঢ় সম্বন্ধ 'সহধর্ম্মিতা' ও 'সহমর্ম্মিতা' প্রতিষ্ঠিত হয়। অব্যর্থ্য কল্পনার সাহায্যে তিনি জীবনের,—সত্যের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং বিশ্বের মর্ম্মবাণী তাঁহার সৃষ্টিতে ধ্বনিত হইয়া উঠে,—এক সমগ্র সত্য অখণ্ড ভাবে বাক্যের মধ্যে দ্যোতিত ও ব্যঞ্জিত হয়।

বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্বংস এক নবীন সৃষ্টির সূচনা মাত্র প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া শেলী যে অপূর্ব্ব আশার কথা বলিয়াছিলেন, "If winter comes, can spring be far behind ;" সত্য এবং সৌন্দর্য্যের একত্বানুভব করিয়া কীটস্ যে মহাসত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"Truth is beauty and beauty truth"; সন্ধ্যারাগরক্তিম ঝিলমের বক্ষের উপর প্রসারিত নিবিড় নিস্তব্ধ অন্ধকারের মাঝে "শূন্যের প্রান্তরে" বলাকাকুলের পক্ষবিধূননে "শব্দের বিদ্যুচ্ছটায়" রবীন্দ্রনাথের মনে যে মহাসত্য জাগিয়াছিল,—এ চির-চঞ্চল বিশ্ব এক সার্থকতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, যে চাঞ্চল্যের বিরাম নাই, যে অনুসন্ধানেরও অবধি নাই, যে সার্থকতা অনন্তের অঙ্কে প্রসুপ্ত, যাহার প্রাপণ অনন্ত সাধনাসাপেক্ষ—এই অনন্ত প্রয়াস নিয়ন্তা যে মহাসঙ্গীত তাহার বাক্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল—

"ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্যে নিখিলের পাখার এ গানে
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এই গভীর সত্যানুভবে ও প্রকাশেই কাব্যের সৌন্দর্য্য; কাব্যের সত্য—এইখানেই সৌন্দর্য্য ও সত্যের মিলন। এই সৃষ্টিতেই "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ" অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ প্রতিপন্ন।

সাধনার বলেই এই গভীর সত্যানুভব ও সত্যপ্রকাশ সম্ভাবিত হয়। প্রত্যেক কবিরই এক "বাণী" আছে। সাধনায় যে সত্যের সহিত কবিপ্রাণের পরিচয় স্থাপিত হয় বাক্যে তাহা প্রাণময় রূপ ধারণ করে। কেবলমাত্র মধুর শব্দ চয়নে এক বিচিত্র শ্রুতিসুখাবহ ঝঙ্কার সৃষ্টিতে কবির সাধনা সার্থকতা লাভ করে না—তাহার কাব্যের মধ্যে চিত্ত আলোড়ন করিতে পারে, হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তির আনন্দ বিধান করিতে পারে এমন এক বাণীকে ধ্বনিত হইয়া উঠিতে হইবে। তাহার কাব্যে এমন এক বাণীকে ধ্বনিত হইতে হইবে—যাহা গাম্ভীর্য্যে সাগরের সঙ্গীতের মত, প্রসারতায় ও মহিমায় এই নীলানন্ত আকাশের মত, যে বাণীর আঘাতে কল্পনার দিগন্তদৃষ্টিসঞ্চারী বাতায়নমালা উন্মুক্ত হইয়া যায়—মহাসাগরের বক্ষোত্থিত এক বন্ধনহারা মুক্ত মলয় অপূর্ব্ব বার্ত্তা লইয়া বিশ্ববাসীর প্রাণে অমৃতত্বের স্পর্শদান করে।

রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

জগৎ তখন এক মহাবাণী শুনিতে পাইল। নবীন বঙ্গের সাগ্নিক কবি যখন গাহিলেন—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর, প্রলয় নূতন সৃজন বেদন
আসছে নবীন জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।"

জগৎ এক বিপুল আশাময় আশ্বাসপূর্ণ বাণী শুনিতে পাইল। এই প্রকার বাণীর মধ্যদিয়াই কবির সাধনালব্ধ ধন নানা ছন্দে নানা রসে অভিষিক্ত হইয়া বিকশিত হয় এবং বিশ্ববাসীর—চিরকালের এক আনন্দের বস্তুতে পরিণত হয়। এই প্রকার বাণীই আমাদের আঁধারময় জীবনপথে আলোক-বর্ত্তিকার কার্য্য করে,—জীবনের বড় বড় তত্ত্বগুলির সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় নিগূঢ় পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। এই প্রকার বাণীর মধ্যেই "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধনাতেই কথাসাহিত্যেও সত্য প্রকাশিত হয়। মানব জীবন কথাসাহিত্যের প্রধান উপাদান। সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, আশা নৈরাশ্য, দ্বন্দ্ব নির্ব্বাণ প্রভৃতি জীবনের প্রাত্যহিক অনুভূতি ঘটনার সংস্পর্শে জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর অপরূপ ছায়াপাত করে। মানবের সহিত মানবের সম্বন্ধ, সমাজের সহিত জাতির সহিত, নিজের ব্যক্তিত্বের সহিত—ভগবানের সহিত, মানবজীবনের বিচিত্র বিভিন্ন দিক কথাসাহিত্যে রসধারায় পুষ্ট হইয়া উঠে। আবার অদৃষ্টের কঠোর পীড়নে মানবজীবনের অশেষ ক্লেশ ও নির্য্যাতন, বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে ভাবুকতার মর্ম্মান্তিক যাতনা, নিষ্ফল কমনার ঘোর ব্যর্থতা নানা ঘটনার মধ্যে কথাসাহিত্যে তরঙ্গায়িত ও উদ্বেলিত হয়। ঘটনা পরম্পরায় সহিত চরিত্র বিকাশের—সুসমঞ্জস ও নিগূঢ় মিলনেই কথাসাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা।

এই যে বিশ্বময় প্রেম-বুভুক্ষু নরনারীর—অশ্রান্ত অনন্ত লীলা, যার অমৃতহলাহলময় মাধুর্য্য অনাদি কাল হইতে বিশ্ববরেণ্য কবিদিগের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সে প্রেম-স্বপ্নের অপূর্ব্ব সঙ্গীতরসধারা "পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, অভিসার প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন" প্রভৃতির মধ্যে নিত্য উৎসারিত আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে, মানবজীবনের সেই প্রেমলীলা কথা-সাহিত্যের এক প্রধান বস্তু। কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্ষপীয়রের রোমিও জুলিয়েট, বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর এই অপূর্ব্ব লীলাময় প্রেমসম্পদ ধারণ করিয়া ধন্য, অমর হইয়া

রহিয়াছে। এই প্রেমই সাহিত্যের সম্পদ—কাম নহে। দৈহিক সম্ভোগেই যার পরিতৃপ্তি, অতিপ্রাকৃত দৈহিক সুখলাভই যার একান্ত লক্ষ্য সেই কাম যথার্থ সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে না। কামবর্জ্জিত প্রেম জগতে দুর্লভ, সাধারণ মানবের জীবনে কামের স্থান অস্বীকার করা কঠিন কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষ্য সমগ্রতার মধ্যে প্রেমের ইঙ্গিত। আমাদের উচ্চতম বৃত্তির—চরিতার্থতা সাধন সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পকলার উদ্দেশ্য। কাম সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না—এই জন্যই বর্ণনার নিপুণতায় অভিনব, সুন্দর হইলেও কালিদাসের—'শৃঙ্গার রসাষ্টকম্' প্রভৃতিকে সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। সুদূরপ্রসারী, মানব চরিত্রের অন্তর্দর্শী গভীর সহানুভূতি, জীবনের বিসালিতার প্রতি স্থিরদৃষ্টি ও ইঙ্গিত, মানবের উচ্চতম বৃত্তির চরিতার্থতা প্রভৃতির সাহায্যে রসসৃষ্টি প্রকৃত সাহিত্যের পদে উন্নীত হয়।

আমাদের বর্ত্তমান অধিকাংশ কথাসাহিত্যেই সত্য প্রতিষ্ঠায় বিফল হইয়া, জীবনের বিশালতার প্রতি স্থির স্পষ্ট ইঙ্গিত হারাইয়া মিথ্যা, অসার্থক হইয়া পড়িতেছে। কথাসাহিত্যের অবাধ সৃষ্টিতে সাহিত্যক্ষেত্র ভারাক্রান্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু কালের সর্ব্বধ্বংসী শক্তি পরাভূত করিয়া বিরাট মহীরুহরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে এ প্রকার উপন্যাস বা নাটকের সৃষ্টি বেশী হইতেছে না। কেবলমাত্র ক্ষীণপ্রভ খদ্যোতিকার সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে, উজ্জ্বল, ভাস্বর জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হইতেছে কম।

সাধনাহীনতাই এই অবনতির কারণ। সাধনা সংকল্পে সংযম প্রদান করে, কর্ত্তব্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করে, শিল্পীকে স্বীয় ব্রতের মহত্ত্ব গৌরবের প্রতি অবহিত করে। সাধনাহীন সংযমহীন বাংলা সাহিত্যের শিল্পী উদ্দাম যৌনলীলার নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিতেছে, জন্মাপরাধী ও জন্মাপরাধিনীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, বংশানুক্রমের প্রভাব বিচারে মনোযোগী হইতেছে, অতিমানুষ, অমানুষ দানবীয় চরিত্র সৃষ্টিতে প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু শরচ্চন্দ্রের সেই বিশাল সহানুভূতি বা অনভিভবনীয় উদারতা যাহা তাঁহার চরিত্রহীন ও চরিত্রহীনার সৃষ্টিকেও অপূর্ব্ব শিল্প গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল সাধনহীনতা বশতঃই তাহা তাঁহারা লাভ করিতে পারিতেছে না—স্পর্শমণির 'পরশ" বঞ্চিত বর্ত্তমান সাহিত্য মৃত্তিকাই থাকিতেছে, সুবর্ণে পরিণত হইতেছে না।

সাধনার অভাব বশতঃই আধুনিক অনেক ঔপন্যাসিকই, নানাপ্রকারে শক্তিশালী হইয়াও যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছেন না। এই যুগের নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যেই

আমরা শিল্পীর পরিচয় অধিকতর পাই। শ্রীযুক্তা নিরুপমা, অনুরূপা, ইন্দিরা, শৈলবালা, সীতা, শান্তা, প্রভাবতী, প্রভৃতির সৃষ্টিতে সাধনার ভাব সমধিক পরিস্ফুট, জীবনের মহত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত ও প্রতিভাত. বাঙ্গালার প্রাণের শাশ্বত সত্যগুতি—পশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে যাহার চিরন্তন রূপ ও মাধুর্য্য অপহৃত হয় নাই, রক্তাক্ত জীবন পথের দ্বন্দ্বময় কোলাহল যে সত্যগুলিকে মূক মৌণীতে রূপান্তরিত করিতে পারে নাই—যাহা প্রাণের গোপনপুরে এখনও শতগুঞ্জরণে গুঞ্জরিত হয় সেই সত্য এই সাধনারতা পূজারিণী নারী ঔপন্যাসিকদের লেখনী মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বাংলার সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে নারী-হৃদয়ে যে নবীন আশা ও উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে, কঠোর সমাজের পীড়নে নিপীড়িত, নির্য্যাতিত বাংলার নারী, সমাজে ও জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠায় জন্য যে কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এই সাধনারতা পূজারিণী নারী ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিতে সেই আশার কথায়, উৎসাহের বাণীতে মুখর। নারীহৃদয়ের সুস্নিগ্ধ শাতল প্রেম আর নবজীবনলাভপ্রয়াসে আশার উজ্জ্বল দীপ্তি এই নারী ঔপান্যাসিকদের সৃষ্টিকে এক অপরূপ আলোছায়ায় মণ্ডিত করিয়া বাংলাসাহিত্যের চির সম্পাদে উন্নীত করিয়াছে। সার্থক তাঁহাদের সাধনা।

হে বাংলার নবীন সাহিত্য-সেবিগণ, বাংলা সাহিত্যের ঋত্বিকবর্গ—জাগ্রত হউন, প্রবুদ্ধ হউন। সাধনার সাহায্যে হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা করুন, চিরসুন্দরের আরাধনা করুন, স্বীয় ব্রতের প্রতি অপার নিষ্ঠা পোষণ করুন, বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইবে, সত্যে সাক্ষাৎলাভ ঘটিবে, ঐশী অনুপ্রেরণায় বাক্যে সত্যের মন্দির গঠিত হউক। মনে রাখিবেন সাহিত্য এ ধরায় সত্যের আলোক, সত্যের উজ্জ্বলতম আভা—"Heaven's light on Earth, Truth's brightest beam." (Shelley) মনে রাখিবেন, সাহিত্যের রসসৃষ্টি এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফল,—সাহিত্যের আনন্দ "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর"।

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

সালকাবারী।

—:※:—

সালতামামী—"তামাম্ শোধ" আজ জীর্ণ পুঁথির পলিত পাতায়,
কচি, কোমল বুকের শ্যামল—লিখ্‌বে হরফ হালের খাতায়।
সন-পহেলা—রঙ কুহেলা রূপ খেলা তার যৌবনে—
নত রোজে কোন্ খোস খেয়ালী রেশমী ফাঁসের জাল বোনে।
বকেয়া বাকী হিসাব ক'রে নিকাশ ক'সে নামিয়ে দেওয়া—
ক'খান পাতাই ঝরিয়ে দেবে কাল বোশেখির ঝ'ড়ো হাওয়া ?
জেব কিছু তাই—আন্‌ছি টেনে—অতীত হাসি গন্ধ গীতি ;
নতুন বাঁশীর সুরে সুরে সেই পুরোনো বর্ষ-স্মৃতি।

বাঙলা ভাষায় থোড়া বহুৎ খান 'তিরিশেক' কাগজ মাসকাবারে বাহির হয়। সবগুলিরই মলাট আছে। মলাটের উপর পট। যে দুই একখানার নাই—ভাগ্যও তাদের বিগুণ ; আকার—খানকতর বইএর মতন, বেশীর ভাগই খাতার মতন—আর বাকীগুলি চটীর মতন। এ চটী বাঁ কি ডান্‌পাটীর নয়—পুঁথি পত্রিকার পরিচয়ে যে চটী প্রয়োগ করা হয়—তাই।

মলাটের কোলে—বিজ্ঞাপন ;—যেমন আঙিয়া কি জাঙিয়ার কোলে—'লাইনিং' বা আস্তর। কাগজগুলি ফানুসী. ফ্যাসনের হর কিসিম এবং নয় রঙা। কারো বা সফেদ পাতায়—সুরমায় টানা কালো ছবি—"বেগম বাহার"—কারো বিজ্ঞাপনে—"কন্যাদায়ের প্রতীকার।" কেউ বাজান ভজার বাশী,—কারো আবার সাহিত্যের কাইজার হাউটজার "কামান শ্রেণীর জলদ-গম্ভীর হুঙ্কারে"—"রাণী ইউজিনির বৈঠকের" "উলঙ্গ বায়স্কোপ"ও কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। "স্বাস্থ্যে"—"নিকার বিবি";—"পরিচারিকা," "উ—হু—হু শীতে কাঁপছো কেন ?" না—"বিধিলিপি।" ইহাকে রামধনু, ইন্দ্রধনু বা প্রবাসী—হইলে ফুলধনু—যা ইচ্ছা হয় বলিতে পারেন—কেউ আপত্তি করিবে না।

এই বয়সে কম্ সাড়ে সাত গণ্ডা কাগজের বড়জোর গণ্ডাটেক—পাঠ্য,—খান পাঁচ ছয়—অর্দ্ধপাঠ্য,—আরগুলো অপাঠ্য। বন্ধুরা হয়ত এ স্পষ্ট সত্য বলার "অকাট্য" পুরস্কার লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু আমরা—নাচার।

ইহার উপর আবার বিষ-ফোঁড়া—অরুণ, তরুণ, কিরণমালা গোছ ঢংএর হাতের লেখা মাসিক। রক্ষা যে—ইহাদের দৈনিক জন্ম এবং দৈনিকই মৃত্যু;—প্রত্যেক কলেজের এক একখানা ম্যাগাজিন বা বারুদখানা হইল এই সব ভ্রূণ-সাহিত্যের খোকা-সংস্করণ।

এত কাগজের কুলকুলুজীর ঠিক ঠিকুজী খুঁজিয়া সালকাবারীর খতিয়ান খাড়া করিবার আমাদের সময় ত নাই-ই ধৈর্য্য এবং সাধ্যেরও অভাব। সুতরাং যে ক'খানা পদবীওয়ালা কাগজ হাতের কাছে হুঁকের ভেতর পাইয়াছি—তাহারই একটা খস্ড়া জাবেদা দিব।

এ বৎসর যে কাগজগুলি আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে তাহাদের নাম নীচে লিখিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহাদের কোনো খানাই গজমুণ্ড হইয়া যায় নাই। আমরাও টেরা গ্রহের দুর্নাম হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

কাগজের নাম :—

প্রবাসী, শান্তিনিকেতন, ভারতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাসিক বসুমতী, বঙ্গবাণী, নব্যভারত, প্রবর্ত্তক, উপাসনা, প্রাচী, পল্লীশ্রী, মাতৃমন্দির, পরিচারিকা, উদ্বোধন, প্রতিভা, সৌরভ, বিকাশ, কল্লোল, রবি, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসমাচার, পঞ্চপ্রদীপ, সন্দেশ, আমার দেশ, শিশু-সাথী খোকা-খুকু। ইহা ছাড়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, সাহিত্য-সংবাদ, সংহতি, (পাক্ষিক) সম্মিলনী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কৃষিসম্পদ জীনবাণীর নাম করা যাইতে পারে।

অর্চ্চনা, কৃষক, কমলা, ব্রহ্মবিদ্যা,—এই রকম আরও খানকতক মাসিক আছে—সন্ধান পাইয়াছি কিন্তু চাক্ষুষ হয় নাই।

ইদানীং সাপ্তাহিক সমাজে "পৈতা লইয়া"—কুলীন হইবার জোর চেষ্টা চলিতেছে! এক একখানা মলাটের মুখোস আঁটিয়া অনেক ক'খানা সাপ্তাহিকই মাসিকের ভড়ং ধরিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'বিজলী'ই সম্ভবতঃ বুনিয়াদি অভিজাত। 'নয়ান জোড়ের' বাবু নয় ত? এই

বিজলীরূপ আর্ল অব অক্সফোর্ডের স্রষ্টা উপাধিহীন—শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তারপর—"নবযুগ" বাঁশরী, নবসঙ্ঘ,—হালের মহিলা। এমন কি গত-যৌবনা এড্‌ুকেশন গেজেটও এই বুটীদার আনারসী সাড়ীর মোহ কাটাইতে পারেন নাই।

এগুলির মধ্যে "বিজলীই" সত্য গুণে গৌরবেও সম্ভ্রান্ত। বাঙলার একমাত্র সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, মনীষী নলিনী গুপ্ত; স্বয়ং বারীন্দ্র, কাজী পল্টন নজরুল ইসলাম, ও ইরাণী রূপকথক সুরেশ ইত্যাদির দামী লেখায়, ইহার পৃষ্ঠাগুলি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পূর্ণ থাকে। সম্প্রতি বিজলীর কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস ছাপিবার পাট বিজলী হইতে তুলিয়া লইয়াছেন—তাহাতে আমরা খুসী না হইলেও—নববিধানের প্রতিবাদ করি না।

কাগজগুলির বেশী কখানারই কলিকাতায় মোকাম—এবং "রেয়নে ওব্‌য়ালা বি উঁহুইকে হ্যায়"। রাজধানীর আওতায় বাড়িয়া উঠিতেছে। বলিয়া চাল, চাঁক এবং চেকনাই তিনটারই পুরামাত্রায় অধিকারী। সত্যকার অন্তরশ্রীর সন্ধান—মাথা খুঁড়িয়া মরিলে—তু: একখানার অন্তরালে যদি এক আধটুকু মিলে। কলিকাতার বাহিরে জন্ম এবং জীবন—এমন যে কখনা কাগজের খোঁজ করিতে পারিয়াছি তাহাদের নাম সাকিন নীচে লিখিলাম।

"প্রতিভা"—ঢাকার, "পল্লীশ্রী" মৈমনসিংহের, "সৌরভ"—সাকিন তথা। "প্রবর্ত্তক"—ফরাসী বাঙ্গলা চন্দননগরের। "পরিচারিকা" কুচবিহার হইতে বাহির হয়। "রবি"—আগরতলার ত্রৈমাসিক। "শান্তিনিকেতন"—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—বোলপুর হইতে প্রকাশিত। "বঙ্গসাহিত্য"—বেনারসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—রেঙ্গুনের সচিত্র মাসিক—"স্বাবলম্বী"।

বয়সে ভারতী প্রবীণা। ৪৮ বৎসর শেষ হইল। প্রবাসী পঁচিশে পড়িয়াছে। মানসীর "কৈশোর-যৌবন দুঁহু মিলি" গেছে। ১৭ বৎসর। ভারতবর্ষ—কৈশোর কাটাইয়া উঠিতেছে—এইবার তের। স্বাস্থ্য-সমাচারের—"বার কিম্বা তের নয়-পুরোপুরি চোদ্দ।" প্রবর্ত্তক ও পরিচারিকার সমানই বয়স—৯ বৎসর। বঙ্গবাণী ৪ বছরের। বসুমতী, সংহতি, পল্লীশ্রী, স্বাস্থ্য ইত্যাদির এখনও আঁতুড়ের গন্ধ যায় নি—কিন্তু মা ষষ্ঠীর মাদুলী গলায় বাঁধিয়াছে—বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

যে দেশে ম্যালেরিয়া এবং কালা-আজর আটপৌরে—আটকোড়েতেই উকি দিয়া যায়—কারণ গোয়ালে গাই নাই মায়েরও মাই নাই—সেখানে "স্বাস্থ্য", "স্বাস্থ্যসমাচার" প্রভৃতি কাগজের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন করি। "স্বাস্থ্যে"র যে কয়টী প্রবন্ধ আমরা পড়িয়াছি—প্রত্যেকটীই প্রশংসার যোগ্য। স্বাস্থ্য-সমাচার—বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনে বহু সুসমাচার দিতেছে। শুধু বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তাঁহাদের প্রবন্ধটীর সহিত আমরা একমত নই। যে রকম যুক্তিই দেখান না কেন—বাল্যবিবাহ সমাজ ও জাতির পক্ষে শুভকর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস না। অবশ্য যৌবন "গোঁয়াইয়া" বিবাহ হওয়াও উচিত নয়। মেয়েদের কম পক্ষে—চোদ্দ হইতে ষোল এবং ছেলেদের ২৩ হইতে ২৭এর মধ্যে বিবাহের আমরা পক্ষপাতী। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে বর ক'নের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সন্দেশ, শিশুসাথী, আমারদেশ এ কয়খানি—আমাদের—"হাঁতি হাঁতি—পা পা"—"কে যাবে নায়ে—লাল জুতুয়া পায়ে" ইত্যাদি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। ক'খানাই প্রায় তাদের সমবয়সী। "সন্দেশ" একটু বাড়িয়া চলিয়াছে—হাকিম বা পুলিসের ছেলের মতন নাদুস-নুদুস। এ ক'খানি কাগজ—খোকা-খুকীদের দপ্তরখানায় শুধু আসা যাওয়া করিয়াই যে রেহাই পায় তা নয়—সেখানে যখন-তখন গড়াগড়ি—তারপর তাঁহাদের মর্জ্জি-মোতাবেক ছেঁড়া খুঁড়ির উপদ্রব পর্য্যন্ত নীরবে সহ্য করে। "সন্দেশ"—সফেদ খুব—মিঠাও বহুৎ। শিশুসাথী' সাথীর সেরা—খোকাখুকুতো গুলতানী করিয়া ফিরে। "আমাদের দেশ" "ধনুর্ভঙ্গ" দেখাইবার আগে "কারমাকারের" নিপুণ হাতের নিখুঁৎ খোদাই—চিত্তরঞ্জনের প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্ত্তিটী দিয়াছেন। এখানে দেশবন্ধুর একটু সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলে বেশ হইত। মাসের পর মাস ছেলেমেয়েদের জন্য ইহারা অনাবিল রস-মধুর অফুরন্ত দান লইয়া শিশুদিগের কল্প রাজ্যে, মনের খোরাক পরিবেশন করিতে হাজির হইতেছে। আমরা এই সকল "শিশুসাথীর" দীর্ঘ নিরোগ পরমায়ু কামনা করি। তারা তিনমাথা হইয়া বাঁচিয়া থাক্—মাথার চুল "শনের নুড়ি" হউক।

মাতৃমন্দির মায়েদের কাগজ। চরখায় ইহার প্রণাম মন্ত্র "ওম্" আঁকা হইয়াছে। পার্শ্বে সেবা ও পালনের করুণাময়ী কল্যাণমূর্ত্তি। রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণা। শালি ধান্য ঢেঁকীতে কোটা হইতেছে। চরকার চরণ নিয়ে সুলোচনা—পুস্তক লইয়া বসিয়াছেন—বোধহয় "গল্পের আরম্ভ" পড়িতেছেন—কারণ মাতৃমন্দিরের ছয়মাসের হিসাব খতাইয়া দেখিলাম ২৫টী ছোট গল্প

বাহির হইয়াছে। ইহা ছাড়া আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, কথা, কথিকা ত আছেই। "তরুণীর ঘাড়ের নীচে বাঁ পাশে আঁচলখানা ব্রোচ্ দিয়া আঁটা"—সুতরাং "গল্পের-আরম্ভ" যে পড়িতেছেন সে কথা নিঃসন্দেহ। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "প্রত্যাবৃত্ত" উপন্যাসখানির জায়গায় জায়গায় বেশ লাগিল। "সেবিকা"র "সর্ব্বস্ব বিলিয়ে"—শশুরকে সন্তানরূপে পাওয়াই এ বৎসরের শেষ সংখ্যার শেষ পংক্তি—বোধহয় হাল সালে বাকীটুকু জমিবে ভাল। কিন্তু কাগজখানি যেমনটী ঠিক হওয়া আর যতখানি যেমন করিয়া চলা দরকার—তা বোধহয় চলিতেছে না। বাঙ্গলার মাদের যে চিন্তা ও জ্ঞান চর্চ্চায় বাঙ্গলারই গণ্ডীর ভিতর মণ্ডুক হইয়া থাকিতে হইবে—আমাদের এমন বোধহয় না। সারা বিশ্বের নারী জাতি, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার মধ্যে নারীর নিজস্ব—নারীত্বের বিকাশ—মাতৃত্বের "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মহিমা—এ সকলের সহিত পরিচিত হইবার বাঙ্গালী মাদিগকে প্রচুর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মাসিক পত্রিকাগুলি সে পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তারপর স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য, সন্তানপালন ইত্যাদি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা অবশ্য—হাওয়াগাড়ীতে ওড়না ওড়ানো স্বাধীনতা "পাশ্চাত্য কাল্চার" বলিয়া প্রাচ্যের আমরা যাহাকে যখন তখন গালাগালি দিয়া থাকি—সে কথা বা সে কাল্চার আনিয়া দিতে বলিতেছি না—পাঠক যেন ভুল করিয়া আমাদিগকে মুষলের ঘায়ে মুষড়িয়া মারিবেন না।

সংহতি "শ্রমজীবী সম্প্রদারের মুখপত্র" কিন্তু তাহা লিপি ও জ্ঞানজীবীদিগের জন্যও প্রচুর মালমসলা সরবরাহ করিয়া থাকে। সংহতির সবগুলি প্রবন্ধই পাঠ্য এবং উৎকৃষ্ট। "বাঙ্গালী ভাইয়া" শৈলজানন্দের উপন্যাস উল্লেখ যোগ্য, "ইজ্জৎ" গল্পটী বেশ। মজুরের "পিঠভর" বোঝা আর "পেটভর" ক্ষুধার কথা—আরও করুণ অশ্রুধারার ভিয়ান দিয়া—বেদনা সিক্ত করিয়া তুলিতে পারিলে ভাল হয়! বেশী লোক সংহতি পড়েন না—কিন্তু আমরা সকলকেই কাগজখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বর্ত্তিকা উজ্জ্বল শিখায় জ্বালাইয়া তুলিতেছিল। হঠাৎ রাজ-শাসনের দমকা ফুঁ-এ শিখাটী নিভিয়া গিয়াছে। জাতির মেরুদণ্ড গড়িয়া অন্ধকারে হাত ধরিয়া, পথ দেখাইয়া লইবার জন্য শ্রীযুক্ত মতিবাবু সন্ন্যাসীর ব্রত বরণ করিয়া লইয়া গুরু তপস্যা করিতেছিলেন—আমাদের বিশ্বাস তাহা ব্যর্থ হয় নাই—সে সাধনা ব্যর্থ হইতে পারে না।

এখন যে সকল কাগজ পদ পদবী ছুইয়েরি দাবী করে তাহাদের কথা আরম্ভ করি।

সব দিক দেখিয়া বিচার করিলে—"প্রবাসীকে"ই এ বৎসরে প্রকাশিত মাসিকগুলির মধ্যে প্রথম স্থান ও পরম না—হ'ক চরম মর্য্যাদা দিতেই হয়। বিষয় সকলের বস্তু-মান ও দাম সোজা কথায় দর ও কদর অনুসারে স্থান বিভাগ করিয়া দিবার প্রথা প্রবাসীই প্রথম প্রবর্ত্তন করিলেও—"পঞ্চশস্য", "কষ্টিপাথর", "বেতালের বৈঠক", বিবিধ প্রবন্ধ ইত্যাদি কয়েকটী আদিম আমলী,—মামুলী বিভাগ ছাড়া—সকল অংশনামা—শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যে পথ দেখাইয়াছিলেন—বাকী মাসিকের দু'একখানেরতও সেই সূত্র ধরিয়া—প্রবাসীর দেওয়া মূল কাঠামটীর উপরেই ইচ্ছানুরূপ যোগ-বিয়োগে বিজ্ঞান প্রজ্ঞান, গল্প উপন্যাস, ইত্যাদি অংশে গড়িতের কাজ চালাইতেছেন। মোটামুটি বাঙ্গলার নামকরা মাসিক ক'খানায় যে যে কথা তথ্য বা টপিক্সের উপর লেখা বাহির হয়—আমরা তাহার পরিচয় দিতেছি—

(১)	গল্প—উপন্যাস—	পয়লা নম্বর।
(২)	প্রবন্ধ—	দশমিশালি, সাতরঙা।
(৩)	চয়ন, পঞ্চশস্য, নিখিল—প্রবাহ—	তার-বেতার অর্থাৎ তাল-বেতালের মেলা।
(৪)	সাময়িক বা বিবিধ প্রসঙ্গ—	মাসকাবারী মোটাকথা।
(৫)	দৈনিক বা সাপ্তাহিকের চুম্বক—	আঠা ও কাঁচি বিভাগ।

কথাগুলির নম্বরওয়ারী মৎলব বাতলাইয়া না দিলে অর্থাৎ সরল ব্যাখ্যা না করিলে দশজনে ঠিক ওয়াকিবহাল হইতে পারিবেন না। সুতরাং :—

পয়লা নম্বর :—বিতং করিয়া দেখানো নিষ্প্রয়োজন। ইহাই "লাইট" বা হাল্কা সাহিত্য—পল্কা ইহার চালচিত্র—কাঠাম—বাটাম। এই ডিস্পেস্‌সিয়া অর্থাৎ অজীর্ণের এপিডেমিকে গুরুবস্তু হজম হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই এমন লঘু, মুখরোচক পথ্যের ব্যবস্থা। তাই এই চড়্‌তি বাজারেও "পয়লা নম্বরের" চাহিদা চা'ল ডালের চেয়েও বেশী। সে কথা পরে বলিব।

নম্বর দোয়েমে—গরু চুরি হইতে বৈষ্ণব বন্দনা ; কিছুরই অভাব নাই। সঙ্গীত শিল্প, রূপ, গন্ধ, ইতিহাস, বিষ-স্ফোটক, বিস্ফোরক, চাল কয়লা সবই পাওয়া যায়—প্রাত্যহিক এবং প্রচুর।

তিনের নম্বরের কথাতো আর বলিতেই নাই। "পাহাড়ের উপর ডিগবাজী" খাইয়া উঠিয়াই "এরো প্লেনের ল্যাজের উপর নৃত্য" তারপর "কুকুর পুলীস" কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি মনে করুন যে লোকটা এ সব করিল, তার দেহের বহর আড়াই হাত, ভুঁড়িটী মোটর গাড়ীর বনেটের মত—হাসিবেন না আরো আছে—ব্যায়ামের শেষে চার কোটী বৎসরের হংসডিম্বে জলযোগ। পড়িতে পড়িতে আপনি পাথর আর লিখিতে লিখিতে আমি হিম। "লিটারারী ডাইজেষ্ট অর্থাৎ হংসডিম্ব কি অশ্বডিম্ব বিচার করিও না হাতে আসা আর গলাধঃকৃত হওয়া।

লিটারারী ডাইজেষ্ট "পপুলার সায়েন্সের—দৌলতে—হজমের প্রশ্ন ত উঠিবেই না কোনো আবগারীর দারোগাও গ্রেপ্তার করিবে না।

চারের শিরোনামায় ভাল-মন্দ, সত্য মিথ্যা সবরকম কথাই খোস খেয়াল মত টীকা টিপ্পনী দিয়া বলা হয়।

পঞ্চম—আঠা ও কাঁচি বিভাগ অর্থাৎ দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজ হইতে খবর কাঁচি দিয়া কাটিয়া আঠা লাগাইয়া আঁটিয়া লওয়া। যেমন একটি খুব ভাল ছেলে ডায়রী রাখিত। মাষ্টার মহাশয় একদিন সন্ধান নিয়া দেখেন ছোকরাটী এই আঠাও কাঁচি বিভাগের অ্যাপ্রেন্টিসি করিয়াছেন। ডায়রীর আগাগোড়া পাতা কয়খানাই তাঁর দিদির "কোর্টসিপ ডায়রী" হইতে কাটিয়া নিজের খাতায় আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় পড়িলেন—'পিপাসিত আমার ওষ্ঠের উপর' ইত্যাদি এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোকরারও পৃষ্ঠের উপর—সপাং সপাৎ।

অতঃপর ষষ্ঠ—হিসাব খাতে শ্রীমতী কবিতা। এ বেলায়, বাঙ্গলার বাণী, মা ষষ্ঠীরও বাড়া দয়াময়ী হইয়া বসিয়াছেন। বিড়াল কুকুর আর একবারে কটিই বাচ্চা প্রসব করে ? কবির ঘরে পদ্ম খুকী ঘণ্টায় আসিতেছে একএক ডজন। বিবাহের প্রীতি-উপহার হইতে আরম্ভ করিয়া, দৈনিক মাসিক, ত্রৈমাসিকের পাতায় পাতায়—এই কন্যারা নাচিয়া ফেরেন সংখ্যায় যাঁহারা অগণ্যা এবং বেগে বন্যা।

অবান্তর কথা অনেক বলিলাম এখন কাজের কথা আরম্ভ করি আর তার প্রমাণী নজীর দি পাই—দু'একটা দেখাইতে চেষ্টা করি!—

ছোট গল্প :—তবলা, বেহালাওয়ালা, বিজ্ঞাপনের মাসিক নীচে আর উপরে "প্রবাসীকে" রিলে—আমরা এমন একখানি কাগজও পাই না—যাহাতে অন্ততঃ একমাসেও একটীও ছোটগল্প াপা হয় নাই। প্রবাসীতে গল্প বাহির হইয়াছে—এ বৎসরে ৪৭টী, ভারতবর্ষে ৫২টী, াসিক বসুমতীর ছয় মাসের খতিয়ান কষিয়া দেখিয়াছি—গল্প উঠিয়াছে ২৬টী। বঙ্গবাণীতে কছু কম কিন্তু বাদ নয়; ভারতীও থোড়ায় ছাড়েন নাই—আশ্বিন পর্য্যন্ত ১৬টী। আশ্বিন র্থাৎ পূজার সংখ্যা—মানসী ও বসুমতী যেন উদাম মাঠ পাইয়া গল্পের ঘোড়-দৌড় ছাড়িয়াছেন— ক হারে জেনে"—এই ভাব। মানসীর ঘোড়া—বারটী;—বসুমতী তাঁহাকে তিন ধাপে ারাইয়াছেন—তিন ঘোড়ায়। প্রবাসীর ৪৭টী গল্পের ১৬টী অনুবাদ, মর্ম্মানুবাদ বা ভাবানুবাদ াকীগুলি মৌলিক। নানা কাগজের অসংখ্য গল্পের অধিকাংশই মৌলিক। অনুবাদে প্রবাসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গল্প দিয়াছে—তাহার সব কয়টীই প্রায়—কৌলিক।

এইবার কষিয়া দেখি এ "কথা"র সোনা—খাঁটি কি খাদ।

পদ্য লেখার মত গল্প লেখাও আজকাল পোষাকী সাহিত্য চর্চ্চার মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। লে বাঙলায় একটীও প্রথম শ্রেণীর গল্প বাহির হয় না। মামুলী সেই কানুন বা "ক্যানোন" ানিতে গিয়া গল্পের হিসাবে এ বৎসরেও ডিম্ব বা বিম্বই বেশী প্রসূত হইয়াছে। এ দেশের াবহাওয়া যেন প্রথম শ্রেণীর গল্প সৃষ্টির অনুকূলই নয়। ছে ট করিতে গিয়া লেখক হয় গল্প ারাইয়া ফেলেন নয় তো গল্প রাখিতে গিয়া—আকারে বা গুণে নয়—মূলেই ছোট হইয়া বসেন। বিওয়ালা কেউ যদি ছোট গল্পের ছবি এক একখানা টানিয়া তোলেন তাহা হইলে চেহারাটা াড়ায় কতকটা এইরূপ :—আমার চার বছরের ছোট বাচ্চু—বাবুটী যেন তার বাবার ধুতি; াঞ্জাবী এবং দাদার জুতা পরিয়া ছড়ি হাতে খাড়া হইয়াছেন—অথবা "দেশবন্ধু" যেন— মহাত্মার" খদ্দরের ফতুয়াটীর একটা হাতা কোন মতে মনিবন্ধের সরহদ্দ পার করিবার জন্য াপ্রাণ টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন (নমস্য দেশ-নেতৃগণের চরণে আমার শ্রদ্ধানত প্রণাম) পমাটা আরো মানানসই হইত যদি স্যর আশুতোষ আজ বাঁচিয়া থাকিতেন। (স্বর্গীয় মুক্ত

আত্মার মহিমার কাছে নত ক্ষমা নিবেদন করি) অনেক স্থলেই গল্পের 'বাপ-মায়া'—গল্প বলিতে গেলে "অ্যাঁ-অ্যাঁ—তারপর তারপর" এই রকম করিয়া বলিয়া অতিকষ্টে শেষে পৌঁছান।

আসল কথা হইতেছে—ছোট গল্প হইবে—ছোট এবং গল্প। জীবনের একদিনের কোনো বিশেষ অনাথরঃ বা এক ঘণ্টার একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আভাসে শুধু রেখা টানিয়া ঘটনাটাকে রূপ দিতে হইবে—এমন করিয়া বলিতে হইবে যেন সিনেমার পর্দার উপর ফুটিয়া উঠা ছবির মত নর-নারী প্রাণহীন ও মূক না হয়—আশে পাশের সত্য, সচল, জীবন্ত মানুষই যেন তাহারা আত্মীয়ের মত নিত্য-নিয়ত আসে যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইদানীন্তন দুই অঙ্কের নাটকগুলির কথা বস্তু ছোট-গল্পের উৎকৃষ্ট উপাদান। ট্রাজিডি, কমেডি বা ফার্স কি গড়িয়া উঠিবে—তাহা লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রকাশ বৈচিত্র তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিবে। এ সম্বন্ধে অন্য সময় বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা থাকিল।

এ বৎসর—প্রবাসীতে একজনও প্রবীণ গল্প লেখকের সন্ধান পাই নাই। নবীনেরাই প্রবাসীর গল্পের মৌজা ইজারা লইয়া বসিয়াছেন। যথা—হেমেন্দ্রলাল রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার ইত্যাদি। বিভূতিভূষণ এবং বৈদ্যনাথের গল্পগুলি মন্দ লাগে না। হেমেন্দ্রলালের "পুরীর ডায়রী"তে ডায়রী জমিয়াছে বটে কিন্তু তাঁহার "বন্ধুর আগমনের" মত প্রাণের দুয়ারে সাড়া দিয়া যাইতে পারে নাই। ডায়রী যদি পড়েন—রজতের ডায়রী—বৈশাখের ভারতীতে—"বুরকার" নীচে দেখুন। ভাষার যে একটা মদির সাবলীল গতিছন্দ, চঞ্চল-স-লীল নৃত্য ভঙ্গিমায় হৃদয়ের সবখানি আনন্দে ভরিয়া একটা গন্ধময় স্বপ্ন রাজ্য গড়িয়া দিতে পারে "ভারতীর" মধ্যেই সে যাদুর সন্ধান চিরকাল পাওয়া যায়। যুগল—প্রফুল্লই গল্প লেখেন। প্রফুল্ল বসুর "কষ্টিপাথরে" সোণা কণা যায়। বঙ্গবাণীতেও "দাদু"টী বেশ—চুমোটীও সরস কিন্তু—আরক্ত নয়। যতীন্দ্রবাবুর শিহরিয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। মানসীতে ফকীর চট্টোপাধ্যায়, পাঁচু ঘোষের খোঁজ পাইলাম। উপাসনায়ও ফকীরবাবুকে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। মাণিক ভট্টাচার্য্য বসুমতীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মহা প্রয়াণে বাঙ্গলা ভাষা একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হারাইল। "শেষ পাঠের" মত গল্প আর কে তর্জ্জমা করিয়া দিবে? মোহিনীবাবুর "আসামীর কাঠগড়ায়" "চারুবালা" ইত্যাদি গল্প প্রশংসার যোগ্য। মোহিনীবাবুর ভাষা নূতন। স্পষ্ট কম—কিন্তু 'সাজেষ্টিভ খুব। ভারতবর্ষে নরেন্দ্রদেবের

"গরমিল" বাহির হইয়াছে। বোয়ার্ণস'র "Nowly maried Couple" নাটকের কথা বস্তু লইয়া লিখিত। 'এই নরওইজান চিত্র কথকের অপূর্ব্ব দুই অঙ্ক নাটকখানি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাহির হয়। গল্পটী খুব চমৎকার—নরেন্দ্রবাবুর হাতে তাহা ভালই জমিবে আশা করি। ইবসেন ও বোয়ার্ণসন (Bjornson) সমসাময়িক। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বোয়ার্ণস' সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পবিত্রবাবুর "কবি-মানস"—সিয়েঙ্কিউইজের অনুকরণে লেখা গল্প। কিন্তু পবিত্রবাবু দেখিলাম—"সিয়েঙ্কিউইজ"কে নরওয়ের লেখক বলিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি পোলীস। তাঁহার ভুবন-বিখ্যাত উপন্যাস—"কো ভাডিজ।" ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাসে সিয়েঙ্কিউইজ নোবেলের সাহিত্য পুরস্কার পান। "নাইটস্ অব্ দি ক্রস্" তাঁহার আর একখানি অপূর্ব্ব উপন্যাস। জুদারম্যানের ভাবালম্বনে—"টেয়া" নাটক লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত প্রমথলাল রায়। জুদারম্যান কৃতী জার্ম্মাণ উপন্যাসিক ও নাট্যকার। "Song of Songs" তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস। প্রবাসীতে "পূজার সংখ্যায়" "রক্তকরবী" বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এ আর একখানি "মরমী" নাটক। রক্তকরবীর লালগুচ্ছটী কিন্তু যক্ষপুরীর জালাবরণে ঢাকা— সেইখানেই নাটকের—মরম। সকলের ব্যথায় দরদী—নন্দিনী দ্বারে দ্বারে মন বিলাইয়া ফেরে— অপরূপ, চমৎকার। আমাদের মনে হয় যুগে যুগে প্রণয়-তৃষ্ণা নন্দিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে ফাল্গুণের ফুলেল হাওয়ায় রঙিন্ ওড়্না উড়াইয়া মনে মনে বিপ্লব তুলিয়া যায়—কিন্তু সেও সার্থক হইতে পায় না—তৃষাও সকলের অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। ইহার বেশী বলা আমাদের ধৃষ্টতা ও অপরাধ। প্রবাসীই এবার রবীন্দ্রনাথের সকল গীত-গল্পের অধিকারী—সকল কবিতার ভাণ্ডারী হইতে পারিয়া ধন্য মানিয়াছেন। যাত্রা পথের প্রত্যেকটী কবিতা এক একটী মহাসৃষ্টি। ঝড়, আকন্দ, কাঙাল, যাত্রী,—কোন্‌টা—না? বরার্ট ব্রাউনিং বলিয়াছেন—তাঁর যন্ত্রের তিন সুরে ঘা দিয়া তিনি যে চারের সুরটী গড়িয়া তোলেন—তাহা সুর নয়—"which is not a note— a star"—একটী নীহারিকা। ব্রাউনিংএর সেই পরিকল্পনার বাস্তব মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি। বেণীভাঁতের অনুকরণে ননীমাধব চৌধুরী লিখিয়াছেন—"অনিচ্ছায়।" মন্দনয়।

উপন্যাস:—এ বছর উপন্যাস বাহির হইয়াছে প্রবাসীতে তিনখানি বরং বলি সওয়া দুইখানি। কারণ হেমেন্দ্রবাবুর "বেনোজলের" মোটে শেষের দুই অধ্যায় ২৬।২৭—বৈশাখে

বাহির হয়। উপেন্দ্রবাবুর রাজপথ চৈত্রে শেষ হইল। সবকথা পরে বলিব। "বামুন-বাগ্দী"তে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত, সমস্যাটী লইয়াছেন গুরুতর—লিখিবারও ক্ষমতা আছে—এখন দেখি কানাই বাগ্দীর জন্য মহেশ্বরী বিশ্বে কোন্ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যান। ভারতবর্ষে মোটামুটি হিসাবে ৭ খানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে—কোনো কোনো খানি "খ্রামাম শোধ" করিয়া দিয়াছে কোনোখানি চলিতেছে। শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর "নববিধানের" গোড়ার দিকটা চমৎকার যৌবন দিনের শরৎচন্দ্র পাঠকের মনে আসিয়া দাঁড়ান। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক সমান হারে উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারেন নাই। উপেনবাবুর "অমলা" বাহির হইয়াছে। শশীনাথের মত সকল দিক দিয়া জমাট নয়; সৌরীনদার এ বয়সের "পিয়ারী"—কতখানি ভরাট করিয়া দিতে পারিল—তা বই শেষ হইলে দেখাইব। মানসীতে প্রভাতবাবুর "সত্যবালা।"—"আশাহত"—জগদীশ বাজপেয়ীর বই। নগবালা যেমন কাঠখোট্টা নাম তেম্‌নি ফুটি ফাট্টা ভাষা। বঙ্গবাণীর "দেবত্র"—উল্লেখ যোগ্য। "পথেরদাবী" এখনও মেটে নাই। বসুমতীতে শরৎবাবুর "জাগরণ" চলিতেছে দেখা গেল। রাখালদাসবাবুর "অনুক্রম" ভারতীতে বাহির হইতেছে—বেশ; সৌরীনবাবুর "বাবলা" শেষ হইয়া বাজারে বাহির হইল। সৌরীনবাবুর ও হেমেন্দ্রবাবুর উপন্যাসের—"অবাক-জলপান" বা গ্রীষ্মে মিঠে বরফের মতন কাট্‌তি।—মণীন্দ্রবাবুর "স্বপ্ন" স্বপ্নের মতই বর্ণ-রঙিন—কিন্তু ফানুসের মতন ফাঁকা নয়। নরেশবাবুর "রাজগী" আষাঢ়ে আরম্ভ হইয়াছে। ঝরঝরে ভাবেই চলিতেছে।

এ বৎসর সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত, ইতিহাস, জঞ্জাল—"প্রাঞ্জাল" সব রকমেরই হাজারো প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের প্রবন্ধে বিশ্ব সমাজ ও সাহিত্যের তথ্য এবং তত্ত্ব দুইই প্রচুর পাওয়া যায়। যে কোনো কাগজ খুলিলেই তাঁহার লেখা চোখে পড়ে। মধুর ভাষায় তিনি যাদুকথা লেখেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত "বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষৎ" এ বহু ভাবিবার কথা বলিয়াছেন। সাহসী যদি কেউ থাকেন তাঁর প্ল্যানটী ধরুন, বাঙ্গলার কল্যাণ হইবে! "নয়া জার্ম্মানী"তে বহু জ্ঞাতব্য কথা বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে চাট্ ও চাট্‌নী—চিন্তা ও রঙ কোনোটারই অভাব নাই। ভারতীর "ব্রাহ্মণ যবনে বাদ আছে চিরকাল"—সকলেরই পড়া উচিত। সঙ্গীতের উপর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত দিলীপ রায়ের প্রবন্ধগুলি—বাঙ্গলা মাসিকে প্রায় নূতন কথা। "সবুজপত্রে" গানের উপর

বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে বটে কিন্তু "সবুজপত্র"—অকালে ঝরিয়া গিয়াছে। এ আক্ষেপ শুধু প্রমথ বাবুর নয়—ক্ষতি হইয়াছে দেশের। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবুর বসুমতীতে প্রকাশিত শঙ্কর ও আলোর প্রশংসার যোগ্য ঐতিহাসিক নিবন্ধ। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্রের বলাকা ও বের্গেস—সুচিন্তিত সমালোচনা। বের্গস'ঁর গতিবাদের সহিত আমরা একমত নই। বের্গস গতিটাই শুধু জীবনে দেখিয়াছেন—কিন্তু জীবনের—যে চরম পরিণতি ও পরম স্থিতি আছে। সত্য পরিবর্ত্তনশীল নয়—সত্য শাশ্বত—তাহাই "ভুভুর্ব্বস্ব" তবে "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সতস্যাপহিতং মুখম"—সেই হিরণ্ময় জাল ছিন্ন করিয়া সত্য যুগে যুগে গতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। সে প্রকাশ নূতন হইতে পারে—কিন্তু নূতনের প্রকাশ নয়। শিশিরবাবু নিপুণতার সহিত তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন এবং গতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ও বের্গস'ঁয় কোথায় তফাৎ তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষের উপনিষদ ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ—সরল, মধুর, সুন্দর। বিবিধ প্রসঙ্গে রামানন্দবাবু অনেক সত্য কথা বলেন। আবার দু একটা টেরা কথাও বলেন। টেরা আর কড়া কিন্তু এক জিনিষ নয়। আশুতোষের সম্বন্ধে বলার মধ্যে প্রাণ না থাকায় প্রকাশ অনেক স্থানে অস্পষ্ট এবং আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। চিত্তরঞ্জনের উপর তিনি বিলক্ষণ চটা বলিয়া বোঝা যায়। জ্যৈষ্ঠমাসে কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট হইতে ডেরা ডাণ্ডা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবু "ছেলেদের পাততাড়ি" গুটাইয়াছেন—তা ভাবনা নাই; "পঞ্চশস্যই" আছে। ছেলে লোহার কল বা নানা ঢংএর মোটরগাড়ী খাইয়া বাঁচিয়া বাড়িয়া উঠিবে। আর্টের উপর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র রায়ের দুইটী প্রবন্ধই স্বচ্ছ, সাবলীল, নির্দ্দোষ ও নীরোগ। প্রথমটী Artএর Ideal দ্বিতীয়টাতে তাহার পরিণতি। বস্তু সেখানে "কনসামেট সেভেন্থ" এ গিয়া লীন হইয়াছে। চন্দন-নগরের প্রীতি এ বৎসরের মাসিকে এপিডেমিক লাগিয়াছে দেখিলাম।

বহুচর্য্যার অর্থাৎ অনেক বিষয়ের আলোচনায় ভারতবর্ষের গৌরব। ভারতীর ভাষা উপভোগ্য। বসুমতীর "পুরাতন-পঞ্জিকা"—এবং দিন-পঞ্জী বেশ। বঙ্গবাণীর আশুতোষ সংখ্যা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে থাকিবার জিনিষ। "প্রবাসীর" "অহং" টুকু বাদ দিলে—মনোজ্ঞ। "শান্তিনিকেতনে"—সোহংএর সাধনা-বার্ত্তা অনেক শোনা যায়।

দৈনিকগুলির মধ্যে "বসুমতী" চমৎকার। খবর, কথা, সম্পাদকীয় লেখা সবই ভাল। আনন্দবাজার বাঙ্গলায় আর একখানা দৈনিক। অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংস্করণও জোর চলিতেছে। সঞ্জীবনী, সময় হিতবাদী, বঙ্গবাসী ইত্যাদি বহুদিনের সাপ্তাহিক। আর বলিবার জানা ভাব। যা বলিলাম তার জন্যক্ষমা ভিক্ষা করি।

"চক্রবর্ত্তী।"

(নব পর্য্যায়)
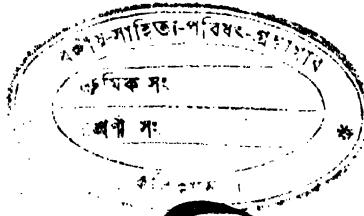
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল।	২য় সংখ্যা।

হিন্দু-মুসলমান।

ভারতের আছে একটা বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা, একটা বিশেষ কাল্‌চার (Culture)। সেই শিক্ষাদীক্ষা, সেই কাল্‌চারের বনিয়াদ যে হিন্দুত্ব তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু বনিয়াদ কেন, বনিয়াদের সাথে সাথে সাধারণ গড়নটিও যে দিয়াছে হিন্দুত্ব, এ কথাও না মানিলে সত্যেরই অপলাপ হইবে। ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার মূল প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির মোটামুটি ধারা অন্য কথায়, স্বভাব ও স্বধর্ম্ম হিন্দুত্বের মধ্যে। গায়ের জোরে কি অন্ধ উত্তেজনার বসে কিংভয়ের দরুণ যাহাই বলি না কেন, ইহাই হইল গোড়ার সত্য। অবশ্য সেই সাথে এ কথাও ভুলিলে চলিবে না কেন, ইহাই হইল গোড়ার সত্য। অবশ্য সেই সাথে এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে উত্তরকালে আরও অনেক জাতি অনেক ধর্ম্ম তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া মূল হিন্দু স্বভাব ও স্বধর্ম্মে অনেক নূতন রূপ, নূতন ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া ধরিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান

পূর্ণাঙ্গ দেহ গড়িয়া ধরিতে এই রকম বড় ছোট বহু উপকরণের প্রয়োজন হইয়াছে। তবুও আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে সুর দিয়া ভারতের জীবন-প্রতিভা হিন্দু উন্মেষ করিয়াছিল তাহা আজও অব্যহত, তাহার উপরে আর কেহ যতই নূতন বা বিভিন্ন ধরণের আলাপ, গমক, মূর্চ্ছনা খেলাইয়া তুলুক না কেন।*

তাই বলিয়া আবার আমাদের সিদ্ধান্ত এমন নয়,—এই যে হিন্দুত্বের বনিয়াদ ইহা হইতেছে সে হিন্দুত্ব আধুনিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যাহাকে হিন্দুত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন। ব্রাহ্মণ-সভার হিন্দুত্ব আসল হিন্দুত্বের একটা ধারা বা প্রকরণ মাত্র প্রকৃত পক্ষে উহা হিন্দুত্ব নহে, উহা হইতেছে হিন্দুয়ানী। ভারতের শিক্ষাদীক্ষা প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে যে হিন্দুত্বে তাহা এত উদার, এত গভীর যে সেখানে শুধু বৌদ্ধ, জৈন বা চার্ব্বাকধর্ম্মও যে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে এমন নয়, তাহার মধ্যে গ্রীক, মোসলেম ও খৃষ্টীয়ান শিক্ষাদীক্ষারও আসন হইয়াছে। ফলতঃ, এই হিন্দুত্ব বলিতে আমরা কেবলই হিন্দুজাত, হিন্দুআচার বুঝি না ; এই হিন্দুত্ব প্রধাণতঃ হইতেছে মনের প্রাণের একটা বিশেষ গড়ন, অন্তরাত্মার একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এমন কি, জাতে হিন্দু না হইয়াও, ভাবে এই হিন্দু হওয়া যায় ; আবার জাতে হিন্দু হইলেই ভাবেও যে এই হিন্দু হওয়া যায় এমনও নয়।

বিশেষ ধর্ম্মের একটা ছাঁদ এই রকমে যে এক একটি দেশের শিক্ষাদীক্ষায় থাকিয়া যায়, তাহার নিদর্শণ আমরা অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও লক্ষ্য করিতে পারি। একটি ধর্ম্মই দেখি একটি দেশগত কাল্‌চারের প্রধান সুরটি দিয়াছে, অন্যান্য ধর্ম্ম ভিতর হইতে উদ্ভূত আর বাহির হইতে আগত হউক, তাহারা সেই একটিরই অনুগত হইয়া সেই একটিকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ভারতের পক্ষে যেনন বিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুত্ব, ফরাসীদেশের পক্ষেও সেই রকম "কাথলিক"-ধর্ম্ম ও "কাথলিক"ত্ব। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান (Religion) বা জাত হিসাবে ফরাসী বেশীর ভাগই হইতেছে

---

* সম্প্রতি দেখিলাম আমার বক্তব্যটি জনৈক মুসলমান লেখক কর্তৃক মূলতঃ সমর্থিত হইতেছে। গত ফাল্গুনের (১৩৩১) "বঙ্গবাণী"তে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন মহাশয় বলিতেছেন, "হিন্দু সভ্যতা এই বাঙ্গালী সভ্যতার মূল, বৌদ্ধ সভ্যতা ইহার কাণ্ড, মুসলমান সভ্যতা ইহার শাখা প্রশাখা এবং ইংরেজ সভ্যতা ইহার পত্রপুষ্প বিকাশ।"

কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত এই কথার উত্তর আমরা ইঙ্গিত করিতেছি না, আমরা বলিতেছি এই যে, ফরাসীর শিক্ষাদীক্ষা, তাহার মানস সত্তা কাথলিক ভাবে অনুপ্রাণিত। তাহার শিল্পে, তাহার সাহিত্যে, এমন কি তাহার আচারব্যবহারের মধ্যেও যেখানে কাথলিক মতবাদ বা অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে সেখানেও বস্তু হিসাবে না হউক, ভঙ্গী হিসাবে—ফুটিয়া উঠিয়াছে "কাথলিক"ত্ব,—কাথলিক "রিলিজন" নয়, কিন্তু কাথলিক "কাল্‌চার।"† ফরাসী দেশে কাথলিকের বৈরী প্রোটেষ্টাণ্ট ছিল, চূড়ান্ত প্রোটেষ্টাণ্ট কালভিন-পন্থী ছিল, কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মানুষ্ঠান মানে না যে স্বাধীন চিন্তার উপাসক (Free Thinkers) তাহাদের জন্মই ফরাসী দেশে ; তবুও মনে প্রাণে ফরাসী হইতেছে কাথলিক। জাতে বা মতবাদে যাঁহারা কাথলিক নয়, তাঁহাদেরও ধাতুর মধ্যে পাই কাথলিকত্বের ছন্দ। প্রোটেষ্টাণ্ট চতুর্থ হেন্‌রি (যাঁহাকে ফরাসীরা বলে Henry the Great) ফরাসীদের রাজা হইবার জন্য নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে আহুত হইয়া যে দিন বলিয়া উঠিলেন—Paris vaut bien une messe (পারী-নগরীর মূল্য যদি হয় কাথলিক মতে একটু উপাসনা, তবে ত সস্তাতেই কিস্তিমাৎ)। সে দিন তিন শুধু মুখেই বটে কাথলিকজাত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অজানিতে সেই সাথে সাথে অন্তরের মধ্যে ফরাসীর দেশ-ধর্ম্ম কাথলিকত্বই বরণ করিয়া লইলেন।

জাপানকে আমরা বৌদ্ধ বলিয়া জানি—সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খুবই, তবুও বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা জাপানী শিক্ষাদীক্ষার আসল বনিয়াদ নয়। জাপানের শিক্ষা-সাধনা, যে শিক্ষা-সাধনা জাপানের জীবনের ধারা গড়িয়া তুলিয়াছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা আসিয়াছে জাপানের নিজস্ব সিন্তো (Shinto) ধর্ম্ম হইতে। জাপানের পিতৃপুরুষ প্রজা, জাপানের বুসিদো (Bushido), জাপানের স্থিরবীর স্বভাব, প্রভৃতি জাপানের যাহা জাপানত্ব সবই সিন্তোধর্ম্মের

---

† যেমন মনীষী রেণাঁ (Renan) সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন যে এই ভল্‌তেয়ার (Voltaire)-পন্থী নাস্তিক যদিও কাথলিক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তবুও তাঁহার প্রাণে ছিল কি একটা কাথলিকত্বেরই সুর—শোভনতা, শালীনতা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, অনুচরের বৈদগ্ধ্য, চিন্তার চাতুর্য্য (T'âme ecclesiastigue : une âme de douceur, de finesse, de meances)। এই সদ্‌গুণই ফরাসীর জাতিগত গুণ।

দান এরূপ বলা অত্যুক্তি হইবে না। বৌদ্ধধর্ম্ম সিন্তোধর্ম্মকে গ্রাস করে নাই, সিন্তোধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্ম সেখানে সিন্তোধর্ম্মেরই একটা অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয়র্লণ্ড জাত হিসাবে বেশীর ভাগ কাথলিক। কিন্তু আইরিশ প্রতিভা ফরাসীর মত কাথলিক কালচারে নয়। আয়র্লণ্ডের প্রাণের ছন্দ আরও অতীতে। তাহার কেল্টিক শিক্ষা সাধনায়, প্রাচীন ড্রুইডদিগের ধর্ম্ম। আলষ্টার প্রদেশের সহিত আয়র্লণ্ডের যে দ্বন্দ্ব তাহা কেবল রাজনীতিক নয় এমন কি ধর্ম্মাচার বা জাত বিষয়কও নয়। সে দ্বন্দ্বের মূলে আছে দুইটি পৃথক কালচারের অমিল। আলষ্টার হইতেছে ইংরাজদের উপনিবেশ—আলষ্টারবাসীরা ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত, তাহাদের দেহ আয়র্লণ্ডে থাকিলেও, তাহাদের মনপ্রাণ তাকাইয়া আছে লণ্ডনের দিকে। আংগ্লো-সক্সেন ও কেল্টিক কালচারের এই সংঘর্ষ ও অসামঞ্জস্যই আয়র্লণ্ডের গৃহবিবাদের মূলে!

আমাদের ভারতেও দেখি এই রকম একটা ঘটনা ঘটিতেছে। ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় একটা সজীব বৃহৎ গোষ্ঠী। ভারতের হিন্দু প্রতিভার অন্যান্য ধর্ম্মের বা শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ছিল ও আছে, তবে সুক্ষ্ম ধরণে, সীমাবদ্ধ আকারে। কিন্তু মোসলেম শিক্ষাদীক্ষা হিন্দুত্বের উপর প্রভাব ছড়াইয়াছে যেমন, তেমনি নিজের একটা পৃথক সত্তাও জাগাইয়া রহিয়াছে। মোসলেম ভারতবাসী হইয়াও ভারতের বৃহৎ আর্য্য বা হিন্দুজাতের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। ইহাতে আপত্তির বা দোষের কিছু নাই। কিন্তু অভিযোগ স্বভাবতই আসে তখন যখন দেখি যে, যে ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানের কৃতিত্ব অনেকখানি তাহাকে স্বীকার করিতে তাঁহারা চাহেন না। ধর্ম্মের বা জাতের জন্য নয়, কিন্তু কালচারের জন্যও তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন ভারতের বাহিরে কোথাও—আরব; আফগানিস্থান, পারস্য বা তুর্কির দিকে। তাহা দেখিয়া মনে হয় মুসলমানেরা বুঝি বাস্তবিকই "নিজ বাসভূমে পরবাসী।"

হিন্দু মুসলমান সমস্যার ইহাই গোড়ার কথা। ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার ধারাকে মুসলমান অনুসরণ করিতে চাহিতেছেন না, ভারতের মধ্যে থাকিয়া বিপরীত ও বিরোধী একটা শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন করিতে চাহিতেছেন। ভারতের শিক্ষাদীক্ষার ধারায় হিন্দুত্বের প্রাধান্য এই যে বাস্তব সব, ইহাকে একান্ত অস্বীকার করিতে না পারিয়া, সহ্যও করিতে পারিতেছেন না। অথচ কার্য্যতঃ যে উভয় শিক্ষাদীক্ষার যে একটা মিল হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সে ইঙ্গিত

দেখিয়াও তাঁহারা দেখিতেছেন না। তাজমহলে মুসলমানের প্রাণের ছন্দ মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অভারতীয়, এমন কি অহিন্দুও হইয়া পড়ে নাই। যে কালচার জন্ম দিয়াছে কোণারক, অজন্তা, বহাবল্লিপুরম্ সেই কালচারেরই ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাজমহলে। হিন্দু চন্দ্রগুপ্ত আর মুসলমান আকবর উভয়েই ভারতের যে নিজস্ব বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিভা তাহারই প্রতীক!*

আমাদের বাঙ্গলা দেশের কথাই ধরি না কেন। বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষা—সে হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক—কি হিন্দুত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত নয়? ধরুন বাঙ্গালীর ভাষা। মুসলমানদের মাতৃভাষা কি? বাঙ্গলা। সে বাঙ্গালা কি সংস্কৃত হইতে আসে নাই—অন্ততঃ আরবী বা ফারসী হইতে যে আসে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলায় আরবী ফারসী কথা যাই থাকুক, তাহার গঠন হইতেছে আর্য্যভাষার গঠন, তাহা হইয়াছে আর্য্য শিক্ষার দীক্ষার যন্ত্র—তাহাতে 'সারাশনে' শিক্ষাদীক্ষার গড়ন বা প্রাণ নাই। বাঙ্গালী মুসলমানেরা যখন লিখিতে বসেন তখনও তাহার মধ্যে পাই পোনের আনা হিন্দু বা আর্য্য ভাব ও ভঙ্গী! এই যে বাস্তব সত্য—fact—এটিকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, ইহার উপর রাগ করিয়াও কোন ফয়েদা নাই।

ভারতের অন্তরাত্মার আছে যে একটী বিশেষ ধারা, যাহার উৎস হইতেছে হিন্দুত্ব (আবার আমরা বলি সে হিন্দুত্ব হিন্দুয়ানীর সহিত এক করিয়া ধরা যায় না), তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, ভারতকে যাহারা আপনার বলিয়া মনে করিবে তাহাদিগকে সেই ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে হইবে। বিভিন্ন রকমে তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিয়া সেটিকে বিচিত্র সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কখনই চলিতে পারি না। মুসলমানের সম্মুখে আজ এই প্রশ্ন—ভারতবাসী হইয়া এই ভারত প্রতিভা, ভারতধর্ম্মকে তিনি অনুসরণ করিতে চাহেন কি না।

---

* আকবর ছিলেন উদার দূরদর্শী, তাই তিনি ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার যে হিন্দু বনিয়াদ তাহা স্বীকার করিয়া তদনুসারে তাঁহার গঠনের কাজ সব করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনরায় আনিতে চেষ্টা করেন হিন্দু বিরোধী সুতরাং ভারতের ভারতত্ব বিরোধী একটা বিভিন্ন ও বিপরীত কার্য্যধারা।

ভারত প্রতিভার গোড়ার সুর যদি হিন্দুত্বই হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রকৃতিদত্ত জিনিষ, তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিবার উপায় নাই।

মুসলমানেরা তাঁহাদের মুসলমানত্ব অটুট রাখিবার জন্য কেন যে ভারতের বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিবেন, হিন্দু বনিয়াদের সহিত তাঁহাদের চিরবিরোধ যে কেন থাকিবে, অজ্ঞান-প্রসূত অন্ধ গোঁড়ামী ছাড়া তাহার আর হেতু নাই। মুসলমানের মুসলমামত্বও একটা অবিকল্প অব্যভিচারী, নিরেট কাটা ছাঁটা বস্তু নয়—তাহার মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক অদল বদলের অবকাশ আছে। খুব সাধারণভাবে মুসলমানজাতের এক শিক্ষাদীক্ষা হইলেও দেশ হিসাবে সেই শিক্ষাদীক্ষাও রকমফের যে না হইয়াছে এমন নয়। তুর্কির মুসলমানত্ব, মিশরের মুসলমানত্ব, আরবের মুসলমানত্ব, পারস্যের মুসলমানত্ব, আফগানের মুসলমানত্ব সবই এক জিনিষ নয়। মোসলেম শিক্ষাদীক্ষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই যে সব দেশের নাম করিলাম তাহার প্রত্যেকটিতেই দূর অতীতে ছিল এক একটা বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম্মকর্ম্মের ধারা—কোথাও তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া, কোথাও তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া দেশ হিসাবে মুসলমান হইয়াছে বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন ছন্দ। সেই রকম ভারতের মুসলমানও, ভারতীয় হিন্দুত্বের সংস্পর্শে আসিয়া, পরে আর একটা নূতন, ভারতের অনুরূপ প্রকৃতি, তাহাতে মুসলমানত্ব খর্ব্ব হইবে কেন? মোগল চিত্র শিল্প ভারতেরই আপনার জিনিষ, তাহার মধ্যে হিন্দুত্বের ছায়া আছে বলিয়া, তাহা নিছক আরব শিল্প নয় বলিয়া কি মুসলমানের পরিত্যাজ্য? ইউরোপের ও আমেরিকার সকল দেশই হইতেছে খৃষ্টধর্ম্মী, কিন্তু তাই বলিয়া কেহই শিক্ষাদীক্ষার জন্য পালেস্তিনের দিকে তাকাইয়া রহে নাই। প্রত্যেক দেশেই খৃষ্টের ধর্ম্ম তৎ তৎদেশ অনুযায়ী এক একটি পৃথক কালচারের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইংরাজ, ফরাসী বা জার্ম্মণী খৃষ্টভক্ত হইয়াও নিজের নিজের দেশের মাটির ঋণ আলাদা আলাদা কালচার গড়িয়া তুলিয়াছে—ইহুদী শিক্ষাদীক্ষাকেই কেহ তাহারা মানুষের চরম আদর্শ বলিয়া আঁকড়িয়া ধরে নাই।

সুতরাং কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, একই দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মাচার বা জাত থাকিতে পারে কিন্তু সেই দেশের একত্ব অখণ্ডত্ব বজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন এক শিক্ষাদীক্ষা, এক কালচার, আর কালচারের ঐক্য, আচারের বৈচিত্র্যের সহিত একসাথেই থাকিতে পারে—উভয়ের মধ্যে

দ্বন্দ্ব যে অনিবার্য্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এক হিন্দুসমাজেই ত দেখি কত বিভিন্ন আচারের সম্প্রদায় স্থান পাইয়াছে। 'ব্রাহ্ম', 'আর্য্য', 'শিখ'—ইহঁারা অনেকেই হিন্দু নামে পরিচিত হইতে চাহেন না। তবুও কালচার হিসাবে ইহঁারা হিন্দুস্থানের, ভারতের বৈশিষ্টকেই অনুসরণ করিয়াছেন, অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। তাই আমরা আশা করি ভারতীয় মুসলমানেরাও তাঁহাদের প্রাণের মোড়, মনের বঁাক, দৃষ্টির ভঙ্গী ফিরাইয়া ধরিবেন। ভারতের আছে যে একটা সজীব প্রাণ, একটা নিজস্ব শিক্ষাধরা, একটা অনুভূতি বৈশিষ্ট (জর্ম্মণেরা যাহাকে বলে "Weltanschauung"—World-view)—ভারতের মাটির আছে যে একটা বিশেষ গুণ তাহার সহিত সমচ্ছন্দে মুসলমানকেও চলিতে হইবে। শুধু মুসলমান বলি কেন, সকল ধর্ম্ম সকল জাত সকল গোষ্ঠী সকল সম্প্রদায়কেই—এমন কি গোঁড়া হিন্দুকেও সেই দেশগত প্রতিভার যন্ত্র বা প্রণালী যথাসাধ্য হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতের অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠিত যে বৃহৎ হিন্দুত্বে; তাহাকে গোঁড়া হিন্দুয়ানীর গণ্ডীতেও আবদ্ধ রাখা যাইবে না। গোঁড়া হিন্দু হউন আর গোঁড়া মুসলমান হউন, সেই বৃহৎ আর্য্য বনিয়াদি—যাহার একটা উপধারা হইয়াছে গোঁড়া হিন্দুয়ানী, যাহা মুসলমানের একটা আসল মুসলমানত্বও অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারিয়াছে—তাহাকে সকলেই মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবেন। নিছক হিন্দুয়ানী বা নিছক মুসলমানী যদি কেউ চাহেন—কালচার হিসাবেও—তবে তিনি সাময়িক বিশৃঙ্খলা বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারেন হয়ত, কিন্তু পরিণামে তিনি যে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন তাহাতে ঘোর সন্দেহ।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

নূতন পরিচয়।

—:*:—

নূতন ক'রে এ পরিচয়—
আজ্‌কে প্রিয়া তোমার সাথে
অনন্দেরি উৎসবেতে
ধরা দিলেম তোমার হাতে।
সাম্‌লে নিয়ো চপল চরণ
আমার সারা জীবনমরণ
তোমর চলা কর্‌লে বরণ
একটি ক্ষণের নয়ন পাতে।

এমনি করে মিলন মাঝে
জীবন সারা কাট্‌তো যদি
মায়া-পূরীর পুলক টানে
শুকিয়ে যেতো অশ্রু-নদী।
তরুণ তব কাজল চোখের
রঙিণ ভাষা মর্ত্ত্য-লোকের
মুছ্‌তো রবি দুঃখ শোকের
পরশ দিল কোন্‌ দরদী

জমাট করা অভিমানের
ব্যথার গানে এতেক দিনে
কারণ বিণা আঘাত দিচি
তোমার সারা মনের-বীণে।

ভুল করেচি সকল নিশায়
আঁখির মায়া করলে কি সায়
অন্তরে মোর আঁধার মিশায়
লইনি বুকে তোমায় চিনে।

উদাসী মন ছুট্‌তে ছিল
সঙ্গে লয়ে ভুলের বোঝা
তাহার মাঝে অজ্ঞাতে যেন
চল্‌তে ছিল তোমায় খোঁজা।
আস্‌লে আমার জীবনকূলে
অতীত দিনের সকল ভুলে
পথের বেদন দিলে তুলে
—অভিমানের নয়ন বোঁজা!

তোমার সাথে এ-অভিনয়
চল্‌বে কি গো সকল যুগে!
ক্ষণেক পরে হান্‌বে ব্যথা—
বাজ্‌বে মোরে গভীর দুখে।
যখনি এই মিলন মেলায়
পুলক মাতে রঙিণ খেলায়—
এমনি তোমার অবহেলায়
রঙ্‌ টুটে যায় তরুণ বুকে।

অনেক দুখের সাধন পরে
আস্‌লে যদি জীবন-রাণী
নির্ভয়ে মোর কান্নাহাসি
দিলাম তোরে সকল খানি।

কর্‌চি তোমায় এই মিনতি
দোঁহার মনের মদন রতি
মহোৎসবে মাত্‌বে যদি
যেয়ো না তায় আঘাতে হানি।

হে মোর চপল পলাতকা
তোমায় আমি বাস্‌বো ভালো
বুকে আমায় সাপ্‌টে ধরে
চুমোয় ঠোঁটে মদির ঢালো।

রুদ্ধ মনের অন্ধ কোণে
আমার আলোক এমন ক্ষণে
মুগ্ধ-নয়ন-বাতায়নে
লও গো প্রিয়া—ঘুচ্‌বে কালো।

তোমার সাথে হউক যেন
মনের বিয়ে নূতন করে
হউক ইহা সত্য নিবিড়
পরিণয়ের বাঁধন গড়ে।

রচ্‌বে কাঁকন ফুলের মালা
কুঞ্জ ছায়ায় বাসর জ্বালা
মোদের বিয়ের বরণ-ডালা
বনের দেবী তুল্‌বে ধরে।

ক্ষতি কী তায় এক্‌লা দোঁহে
রচ্‌বো সেথা মায়ার পুরী
ভয় করো না, অতিথ্ নব
আন্‌বে বয়ে হাসির নুড়ি।
রিক্ততারি কোন্ আহবে
তারাই মোদের সঙ্গী হবে
অজান্ দেশের খরচ ক'বে
ক্রোড়ে থাকি অ-ফুট কুঁড়ি।
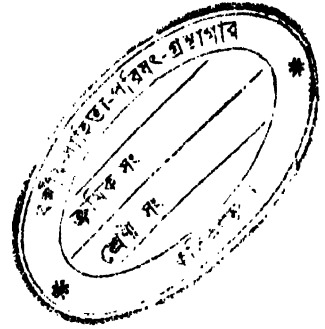
বন্দে আলী মিয়া।

চাঁদের অমিয়া

-:*:-

সারাদিনে একবারটী পাশে এসে বস্‌তে পারি নি, মুখের কথায় এতটুকু পুলক দিয়ে প্রাণ তোমার রঙিয়ে তুলবার অবসর পাই নি।

এই নালিশটাই যে আজ তোমার বুকের মাঝে বড় হয়ে' উঠে গোপন ব্যথায় গুমরে ফির্‌চে, তুমি বুঝতে দাও বা না দাও—এ আমি বুঝে নিয়েচি। আর এই ব্যথার অভিমানেই যে

আপনাকে আড়াল করে'—তুমি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসেচ, এও আমি ধরে' ফেলেচি।

কিন্তু না গো, আর আমি আপনাকে দূরে ফেলে রাখচিনে। দিনের কাজ ফুরিয়ে, ফেলে এসেচি, ঘরকন্নার ভাবনা-চিন্তে চুকিয়ে দিয়ে এসেচি, সংসারের ভালো-মন্দের সকল জ্বালা-জঞ্জাল সংসারেরি একধারে নামিয়ে দিয়ে বেঁচেচি, নাও—এবার আমায় কাছে টেনে নাও—তোমার পায়ের কাছে—তোমার কোলের কাছে—যেখানে তোমার মন আমার সত্যিকার খোঁজে ব্যাকুল হয়ে' উঠেচে—সেই তোমার অন্তরতম অন্তরের কাছেই তুমি আমায় টেনে নাও প্রভু! তুমি আমায় টেনে নাও—মনের সমস্ত আনন্দ দিয়ে, তোমার পায়ের তলা জুড়ে' আমি বসে' যাই, তোমার প্রসন্ন দৃষ্টির জ্যোৎস্নাকাশের ছায়ায় আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে আমি লুটে পড়ি। তোমার চারদিক জুড়ে' আমি এলিয়ে পড়ি—তোমার কোল ছেয়ে' আমার চুল এলিয়ে পড়ুক, তোমার বুক জুড়ে' আমার বুকের পরশ গলে পড়ুক—আমার দু' হাতের ছোঁয়া তোমার গলার মালা হ'য়েই দুলে' উঠুক।

মুখ-ভরা বন্ধুর হাসি নিয়ে' সোনার রাত এসে' আমাদের শিয়রের পাশে দাঁড়িয়েচে। ঐ জান্‌লা মেলে' বাইরের পানে চেয়ে দেখ, তার বুকের বসন চিরে' অনাদি কালের অমৃত ক্ষরে' পড়্‌চে। নীলাকাশের নীল হাতের মুঠো থেকে তার জপ-মালা কেড়ে' নিয়ে, বিশ্ব-ধরিত্রী হঠাৎ কোন্ ধ্যান-ধারণার অতীতের নাম জপেই মৌন হয়ে গেচে। যে দিকে যতদূরে আমি চাইচি—কেবল তাই দেখচি—তোমার কোলে মাথা রেখে যা দেখতে আমার সাধ হয়—দৃশ্য ও রূপের যে ঐশ্বর্য্যকে আমি মনের মাঝ থেকেই কামনা করি। ঐ চাঁদের আলো-লাগা টুক্‌রো মেঘ, নীলিমার নীল রং, এই উদাসিনী রাত্রি, এই ফুলের গন্ধ-মাখা মাতাল হাওয়া—এ-যেন আমার এই আনন্দ-অভিসারের শুভ লগ্নে তেত্রিশকোটী দেবদেবীরই নিজের হাতে-রচা আশীর্ব্বাদের মাঙ্গল্য। পরিপূর্ণ মিলনের এই শুভক্ষণে দুখানি অধরের রক্ত-অমৃত চুমুক দিয়ে দুখানি অঙ্গ কী দুঃসহ পুলকেই না শিউরে উঠচে।

তুমি হয় ত ভাবচ—সারাটী দিন আমি কি করে' দূরে সরে' রই—কি করে' সংসারের কাজে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে তোমায় ভুলে' থাকি। তোমার মুখপানে চেয়ে এই কথাটী আমিও ভাবচি। ভাবচি যার পরশ পেতে গো' সর্ব্বাঙ্গ আমার অহোরাত্র ব্যথিয়ে রইচে, ফুল যেমন

ভোরের আলোর পথ চায়—তেমনি যার পথ চেয়ে বুকের মাঝে নিরালা কোণে বিরহী আত্মা আমার সর্ব্বক্ষণ চোখেমুখে লাল হয়ে রয়েচে—সেই জনকে আমার সংসারের কোন্ আনন্দে ভুলিয়ে রাখি, সর্ব্বেন্দ্রিয়কে সর্ব্বদেহকে কোন্ সান্ত্বনায় বেঁধে রাখি।

কিন্তু আছে প্রভু, সান্ত্বনা আমার আছে। নিজের মনের ভাবনা থেকেই সান্ত্বনা আমি খুঁজে পেয়েচি। কিন্তু নিজের মন থেকে তুমি হয় ত এ খুঁজে পাবে না—এ নালিশের এ মীমাংসা তোমায় হয় ত নিজে থেকে ধরা দেবে না। তাই আপন মনের এই সত্যকেই তোমায় আমি আজ শোনাব।

এর জবাবে সবার আগে আমি বোল্‌ব—ঐ যে তুমি ভাবচ—ঘরের কাজে লেগে আমি তোমায় ভুলে' যাই—সংসারের সহস্র-কর্ম্মের আবর্জ্জনার স্তূপে তোমায় হারিয়ে ফেলি—এই কথাটাই তুমি ভুল করে' ভাবচ। আমি ভেবে দেখেচি—আমি বুঝে দেখেচি প্রিয়তম—ঘর-কন্নার সর্ব্ব-অনুষ্ঠানেও আমি তোমার মিলনকেই উপভোগ করি। তুমি আমায় এনেচ—সে ত তোমারই ঘরে প্রভু! আমি তার কাজ করে যাই সে ত তোমারই কাজ,—আর তা করি সেও তোমারই ইচ্ছায়। এই ঘর-সংসারে আমার চার-দিক্ জুড়ে' যাঁরা রয়েচেন তাঁরা তোমারই প্রিয়জন—আমি তাঁদের সেবা করি—সে সেবায় তোমারই অন্তরের আনন্দ বিধান করি। এম্‌নি করে' এই আমার প্রত্যহের কর্ম্মোৎসবে—আমি তোমার কাজই করে' যাই—ছোটবড় সকলের সেবায় তোমার ইচ্ছাকেই সফল করি। এই কর্ম্ম ও সেবার মহানন্দে আমি তোমার খুসী-মুখ দেখি, তোমার কথা মনে ভাবি;—এম্‌নি করে' তোমা থেকে ছাড়া থেকেও তোমার পাশেই রয়ে যাই—না পেয়েও তোমায় আমি পেয়ে যাই।

সাগরের ঢেউ কখনো তার কূলে গিয়ে আছড়ে পড়ে কখনো ঠিক তার বুকের মাঝখানে এসেই থম্‌কে দাঁড়ায়। কিন্তু কূলে এসেই তার মনে হয় না সে সাগর থেকে ছাড়া হয়ে' গেচে', আর মাঝ-সাগরের কোণটুকু পেয়েও সে ভাবে না এই তার সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষণের থাক্‌বার ঠাঁই, এর বাইরে গেলেই সাগরকে সে হারিয়ে ফেল্‌বেই। সে জানে সিন্ধুর বিপুল রাজ্যের সবখানেই তার খেলাঘর, এ খেলাঘরের যেখানেই সে থাক্ না কেন—সে সাগরের কোলেই রয়ে যাবে। জন্মমরণের পরমতম পাওয়া আমার, তুমি সেই মহাসিন্ধুর রূপেই ত আমার চোখে বেজে উঠেচ। তুমি আমার অসীম পারাবার, আর আমি সে তোমারই বুকের ঢেউ,—তোমারই মাঝ থেকে—

তোমারই নিঃশ্বাসে জেগে উঠেচি। কথনো তোমার বাইরে তোমার সংসারের কূলে গিয়ে আছড়ে পড়চি, কথনো ব্যাকুল হয়ে ফিরে এসে তোমার অন্তরের মাঝে লুকিয়ে বস্‌চি। কিন্তু তোমায় ছেড়ে বাইরে গিয়েই ভাবতে পারিনি—তোমার আমি হারিয়ে ফেলেচি—অন্তরের অন্তরতম ঠাঁইটুকু পেয়েও মনে করি নে—এ আসন হারিয়ে ফেল্‌লেই তোমা থেকে ছাড়া হয়ে যাব'।

আর জীবনের ভালোমন্দ দিয়ে এই তোমার ঘর-সংসারকে তোমার ভিতর বাহিরকে আমি কত সুখেই যে আগলে রেখেচি—সে আমি বুঝোতে চাইনে। আমি জানি এ বুঝোতে গিয়ে ভাষা আমার হা'র মেনেই যাবে। জীবনে যাকে কামনা করে ছিলুম—দুচোখ আমার অহরহ তার রূপেই ত আজ ভরে' রই চে। যার মুখ চেয়ে বুক ভরে উঠেছিল,—তারি মুখে চোখ রেখে আজ বস্‌তে পেয়েচি—তাই ত আমার এ আনন্দ। তারি সংসারকে বুক দিয়ে জড়িয়ে রাখতে পেয়েচি—তাই ত আমার এত সুখ। কিন্তু এ আমার প্রাণের সুখ—আমারই থাক্‌!

কিন্তু কোন্‌ মিষ্টি ভাব্‌না বুকে করে ঐ চাঁদ অমন শিউরে' উঠ্‌লো গো! সোণার বুকের কোন্‌ কথাটী বল্‌তে গিয়ে তার রূপের ঠোঁটে কাঁপন এল? আজ অঝোর-ঝরেই তার রূপ আর রং ঝরে পড়্‌চে, আপন মনের খুসী আর খামখেয়ালের লীলার গাঙে কাঁচা সোণার দেহ-খানি ভাসিয়ে দিয়ে কোন্‌ অজানার বুকে সে ভেসে চলেচে! সে বুঝি আজ সাত সাগরের সুধার মদই চুমুক দিয়ে' এসেচে গো! তাই কি তার চোখ-দুখানি অমন নেশায় ঢুলু ঢুলু? বুক আর মুখখানি অমন মিষ্টি মধুর কাঁপণ-লাগা নেশার ঘোরে, সে তার গায়ের সবটুকু আঁচল উড়িয়ে দিয়েচে, মনের-বীণার সবগুলো তার খুলে' দিয়ে বসেচে। বুকের কাছে হাত দিয়ে দেখ, ঐ তার হাসি খুশী সুধা আর সুরের রেশ লেগে বুকের-রক্তের রাঙা মায়া আমার ঝড়ের-ঝাপ্টা-লাগা গঙ্গাজলের মতই দোদুল দোলে দুলে' উঠ্‌লো—ফুলের মত ফুলে' উঠ্‌লো। সেই দোলের তালে তালে পা ফেলে' পাঁচ পরাণের মাঝখানে, সে কোন্‌ পাগ্‌লা ভোলা আমার বুকের কাছে এসে বস্‌লো—কোলের বীণায় কোন্‌ কাহিনী বাজিয়ে তুল্‌তে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো।

প্রথম যৌবন এসে' যখন গায়ে আমার তার সোণার কাঠি ছুইয়ে দিয়ে—অঙ্গ বেয়ে' যখন রূপ রস, ঝরে রং চাক থেকে মধুর মতই ঝর্‌-ঝরিয়ে ঝরে' পড়্‌তে লাগ্‌লো—কতজনই না এই

দেহটাকে আমার কামনা করে' বসেছিল। কত চোখের লুব্ধ দিঠি আমার সাম্‌নে পিছে চারধারে জ্বলে উঠ্‌লো, কত প্রাণের স্নেহ-নিবেদন ভ্রমর-গুঞ্জনের মতই আমার কাণে কাণে বাজ্‌তে থাক্‌লো। সবারই মুখে এককথা—তারা আমায় চায়—তারা আমায় মানস-আসনের রাণী কর্‌বে। সকলের পানে চেয়ে শেসে ওপরের দিকে আঁখি তুলে—যাঁর লীলা জেগে' উঠেচে—তাঁকেই ডেকে বল্লুম—"এ আঁধার ঘুচিয়ে দাও প্রভু, তোমার সত্য-আলোয় আমার সত্যকে চিনে নিতে দাও।'

যার পানেই চাইলুম—তাকে দেখেই প্রাণ আমার মাথা নেড়ে' বল্লে—'না গো না—এ তোর কেউ নয়, মনের মাঝ থেকে তুই যাকে চেয়ে রেখেচিস্ এদের কেউ তোর সে নয়।'

তবে সে কে গো? জীবন যোবন যাকে ধ্যান দিয়ে ভেবে ফির্‌চে, আঁখি যাকে দিঠি দিয়ে খুজে ফির্‌চে, চোকে-দেখার আগে যার স্বপন চোকে লাগ্‌চে—কে গো সে? আমার অন্তরের কুঞ্জ যার পূজার ডালা ভরে রেখেছে, আনন্দ আর প্রেমের জ্যোৎস্না দিয়ে আমার মন যার অভিসার রাত্রি রচে রেখেচে, যার বাঁশী শুন্‌বে বলে প্রাণ আমার ঘর ছেড়ে বাইরের যমুনা তীরে কলস-কাঁখে নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছে—কে গো সে? আমি ভোরের আলোয় যার হাসি দেখি, হাওয়ায় যার বাঁশী শুনি, ভুবন ভরে' যার আসার কথাই আমার কাণে কাণে বেজে যায়—সে আমার কে গো?—সে আমার কোন্ দেশে?

প্রাণ বল্লে—তার নাম জানিনে, দেখ্‌লে চিনি, জানিনে—দাঁড়ায়—কোন্ দেশে তার ঘর—যদি সে সাম্‌নে এসে' দাঁড়ায়—চিনে' নিতে পারি।

তবে এস আমার সুন্দর, আমার জীবন মরণের কামনার ধন, দুঃখসুখের সাগর-ছেঁচা মাণিক আমার তুমি এসো। মন তোমাকেই চাইচে, প্রাণ তোমারই গান গাইচে, চোক তোমারই পথ চেয়ে জাগ্‌চে। আমি তোমার বিরহী, আমি তোমার পিয়াসী, আমি তোমায় বঁধু—আমি তোমায় ডাক্‌চি—তুমি এসো, আমি তোমায় দেখে চিনে' নেবো—চোখের জলের অভিষেকে হৃদয়ে বরে নেব।

চাঁদের আগুন দ্বিগুণ হয়ে' উঠ্‌লো গো! সে আগুন তারায় তারায় ছড়ালো; সে আগুন ধারায় ধারায় ঝরে' পল!

তারপর সেই সকালটা—সে আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে। তোমার নতুন ডাক্তারী পোষাক পরে' ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্চিলে তুমি। তোমার কোঁকড়ানো কালো চুলে ভোরের আলো লেগেচিল। সারাপথ চলে 'এসে' ঘোড়াটা আমাদের বাড়ীর পাশে কি জান কেন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে অনিমেষে চেয়ে ছিলুম। পেছনে আমার ললিতা সই দাঁড়িয়ে। ঘোড়া থেকে নেমে' দাঁড়োতেই পোড়া চোখে চোখ লাগ্‌লো। বিজলীর ঝলক-লাগা দেহ-খানি কোন মতে সাম্‌লে নিতেও চোকে মুখে ঘেমে উঠ্‌লুম।

পেছন থেকে গা টিপে' সই বল্লে—'বাঃ—কি হোলো রে?' 'যাঃ' বলে চকিতে মুখ সরিয়ে নিলুম।

বুকের মাঝ থেকে প্রাণ বলে' উঠ্‌লো—'চিনেচি গো চিনেচি, আলোর লেগে' ফুল জাগে, চাঁদের লেগে' অমিয়া জাগে, ঐ পায়েই নারীজন্ম লুটিয়ে দিতে জীবনে জেগে' উঠেচি।

হঠাৎ একখানা লঘু মেঘের মায়া লেগে চাঁদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠ্‌লো যে!

কিন্তু প্রাণের এ গোপন কথা আমার আর ত কেউ জান্‌লো না। বাবা আমার বরের খোঁজে উঠে' পড়ে' লাগ্‌লেন। আমার রূপ যাদের চোখে মোহ এনে' দিয়েছিল—তারা তখন একে একে বাবার কাছে হাজির হয়ে' একসুরে বল্‌তে লাগ্‌লো—তারা কিছু না নিয়েই আমায় নিতে চায়। ক্রমে তাদের সংখ্যা এত বেড়ে' উঠ্‌লো—বাবা হঠাৎ ভেবে উঠতে পাল্লেন না—আমায় কার হাতে বিলিয়ে দেবেন। একদিন কিন্তু বাবার মনের সকল গোল থামিয়ে আমার এই প্রণয়ী-দলের একজন চট্‌ করে' ঠিক্‌ করে' দিলে সত্যি আমায় কোন্‌খানে সঁপে' দিতে হবে। পাঁচশ টাকার চারখানি নোট বাবার হাতে গুঁজে' দিয়ে সে বল্লে—'এরা কিছু না নিয়ে নিতে চায়, আমি কিছু দিয়ে নিতে চাই।'

বাবা যে খুব গরীব ছিলেন এ কথা আমি স্বীকার করিনে, বরং বোল্‌ব তাঁর দারিদ্র্যের চেয়ে টাকার লোভটাই ছিল বেশী। অবাক মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে' শেষে নোটগুলো গ্রহণ করে' তিনি বল্লেন—'আচ্ছা।'

কথাটা যখন কানে এল—ভয়ে' আৎকে উঠে' কাঁদতে বস্‌লুম। ললিতা এসে' শুনে অবাক হয়ে' বল্লে—কি! শেষে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ব'ল্ল—"তুই কাঁদিস্‌ নে সই, তোর জীবনের আমি এমন ভুল কথ্‌নো হ'তে দোব না।"

. চাঁদ আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেচে গো। মেঘের সঙ্গে এমনি ধারা লুকোচুরি খেল্‌তেই আজ বুঝি তার কেটে যাবে সারা রাত।

কাকা থাক্‌তেন মফঃস্বলে। এরই মধ্যে তিনি যেদিন ফিরে এলেন—ললিতা তাঁর কাছে এসে' কি-কি সব বলে' গেল। কাজে ব্যস্ত ছিলুম, ইচ্ছে থাক্‌লেও শুনতে পেলুম না। যাবার সময় আমার সঙ্গে একটী কথা না বলে'—দূর থেকেই আমার দিকে চেয়ে একটুখানি কেবল হেসে' সে চলে' গেল। আমি অবাক্ হয়ে' কত কি যে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম মনে মনে!

এর দুদিন পরে এক রেতে বাবা কাকাকে ডেকে বল্লেন—"এই মাসেই কিন্তু মেয়েকে পার করা চাই।"

কাকা বল্লেন—"চাই ত—এখন থেকেই আয়োজন করা ঠিক।"

বাবা বল্লেন,—"না—অবিশ্যি এত শিগ্‌গীর আমি বলি নে, টাকা পয়সার ত আর চিন্তা নেই—যা সে দিয়েচে, তাতেই হবে।"

কাকা ধীরে বল্লেন—টাকা পয়সার চিন্তে আছে, একটু মোটা রকমেরই ব্যয় করতে হবে—একে ডাক্তার, তাতে ছেলে মানুষ।

বাবা কথাটা অবিশ্যি বুঝ্‌তে পাল্লেন না, তিনি তাই ভ্রূ বেঁকিয়ে প্রশ্ন কল্লেন—"কি বল্‌লে—ডাক্তার কে?"

কাকা শান্ত স্বরে বল্লেন—ডাক্তার—শিশির ডাক্তার, বিমল মিত্রের ছেলে। তার সঙ্গেই স্মৃতির বিয়ে ঠিক হয়ে' গেচে যে।

অন্যদিন হ'লে এ সংবাদে বাবা আনন্দে লাফিয়ে না উঠে' পার্‌তেন না। তাঁর নিজের—তাঁর মেয়ের এ সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে' নিতে তিনি অধীর হয়ে' উঠ্‌তেন। কিন্তু আজ তিনি এ খবরে এতটুকু খুসী না হয়ে' বিরক্তির স্বরে বলে' উঠ্‌লেন—শিশির ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েচে—কি রকম। অনন্ত যে কতগুলো টাকা দিয়ে গেল সেদিন, সে গুলোর কি হবে?

কাকা আগের মতই শান্ত-স্বরে বল্লেন—"সে-গুলো ফিরিয়ে দিয়ে এলেই চল্‌বে।"

দুপুর বেলা সই এলে' তার গলা জড়িয়ে ধরে' বল্লুম—"কাকাকে তুই এ কথা কি করে' বল্‌তে পাল্লি গো?"

সই মিষ্টি হেসে আমার চিবুক ধরে' বল্লে—এ কথা বল্‌তে ত তেমন ভয় রাখিনে সই, কিন্তু যাকে না পেলে' সব হারাতে, তাকে হারিয়ে যে সারাজনম কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলোতে, সেইটে ভাব্‌তেই যে ভয়ে আঁৎকে উঠি বেশী।"

সন্ধ্যা বেলায় তুলসীর মূলে, দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে' প্রণাম ক'রে' বল্লুম—"ঠাকুর যা শুন্‌লুম—তা যেন সত্য হয়!"

একি সেই প্রাণ-ঢালা প্রার্থনারই উন্মাদ শক্তি—যার জোরে আজ এম্‌নি মুখোমুখী বস্‌তে পেয়েচি?

কিন্তু ঐ চাঁদ দেখা যে আমার ফুরুলো না গো! জন্ম থেকে ঐ চাঁদকে যে কত ভালোবাসি—সে কেবল আমিই জানি। এসো—জান্‌লাটার কাছে আর একটু সরে বসি। এই এখান থেকে অনেকখানি আকাশ, অনেকগুলো তারা আর চাঁদের সবটুকুই দেখা যাচ্চে। সমস্ত আকাশটা জোয়ারের জলের মতোই থরথরিয়ে কাঁপ্‌চে, আর তার ঢেউ লেগে চাঁদ-তারাগুলো, স্রোতের ফুলের মতোই ভেসে যাচ্চে। নীচে আমি তোমার কোলে মাথা রেখে বসে আছি, আর ওপরে ঐ চাঁদের কোলে মাথা রেখে' অমিয়া ঘুমিয়ে আছে। হাঁ গো আমি তোমায় যেম্‌নি করে' পেয়েছিলুম তেম্‌নি কি অমিয়াও ঐ চাঁদকে পেয়েছিল! যত তারা হ'ত বাড়ালো খালি-মুঠোয় ফিরে' গেল,—শেষে চাঁদ এসেই ত তাকে বুকে করে তুলে নিলে।

অনন্তের অন্তরে, সে কোন্ স্বপন-ঢাকা নীল সাগরের পারে ঐ অমিয়ার জন্ম হয়েছিল। সেখানে কুন্দ আর মন্দারের বনে বনে বেড়িয়ে মনে মনে গান গেয়েই ত তার সারা-বেলা কেটে যেতো। কখনো সে আনমনে সাগর-পারে এসে বস্‌ত—রং-বেরংয়ের ঝিনুক কুড়িয়ে তার আগুন-বরণ সোণার আঁচল ভরে' ফেল্‌তো। তারপর ভরা আঁচল তুলে নিয়ে দখিন হাওয়ার পথে হাসি-গান আর ফুলের-গন্ধের বুকে আপন ঘরে সে মিলিয়ে যেত। যেতে যেতে তার মুক্তার মালার মতো কেশপাশ খুলে পড়্‌ত, আঁচল-বাঁধা ঝিনুকের দু-একটি খসে পড়্‌ত, তার মিষ্টি হাসির সরমহারা আমেজ লেগে অসীমের গোপন মরম মধুর হ'য়ে উঠ্‌তো।

অনন্তের অন্তরে হাসি খেলার ফাঁকে কখন যৌবন এসে তার মরমের দোরে সাড়া দিলে। তার তরুণ তনুর আবেগে আর আগুনে, সে যৌবন গালা সোণার মালার থরে চাঁদের আলোর

মতই ছড়িয়ে প'ল। তখন রূপ রং রসে রাগে রক্তে আর লালিমার নেশাভরা চোখের মতই সে থর্ থরিয়ে কেঁপে উঠ্‌লো, অসীম লালসা তার বুকে বুকে ফেনিয়ে উঠ্‌লো। টগ্‌বগিয়ে কেঁপে ওঠা প্রাণের দোরে হাত রেখে সে দেখ্‌লে—কি যেন তার চাই—কি যেন তার পেতে হবে। কি চাই, কাকে পেতে হবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার অরুণ আঁখি করুণ ঘুমে জড়িয়ে এল। অনন্তের অন্তরে কুন্দ-মন্দার কিশলয়ের শয়নে যৌবনের মোহে অমিয়া ঘুমিয়ে পল।

ঘুমের ফাঁকে স্বপন তার চোখে এল। স্বপনে যেন সে জেনে নিলো কি চাই তার, কাকে তার পেতে হবে।

সৃষ্টির প্রভাতে আকাশ তখন নূতন জন্ম পেয়ে' নীল আবেগের মতোই বিশ্বের মাথার ওপর ছড়িয়ে গেচে। চাঁদ তখনো জাগে নি—ধরণী তখনো জলধির বুক চিরে উঠে বসে নি। অকাশে তখন আলোকময়ীর কানের ফুলের মতো সহস্র সোণার তারা কেবল জেগে উঠেচে।

এমনি কালে সে এক কোন্ নিশুৎরেতে, টিপি টিপি পা ফেলে আকাশের বিপুল প্রাঙ্গণে অমিয়া এসে দাঁড়ালো। চোখে তার কাঁচা ঘুম ভাঙার রেখা, মুখে তার কাকে খুঁজে পাওয়ার মিষ্ট ব্যাকুল ভাব! তার রূপের রোশ্‌নাই তারায় তারায় চমক লাগালো—তার আলোর-বাঁধা খোপার ঝিলিক দিকে দিকে পুলক জাগালো—তার অরুণ বরণ আঁচলের দোল অঙ্গে অঙ্গে তড়িৎ ছুটালো। যত তারা খানিক তার আলোক-রচা উজল ব্যাকুল মুখখানির পানে বাক্যহীন অনিমেষে চেয়ে রইল,—নীল অসীমের সীমায় সীমায় উপ্‌চে পড়া তার অরূপ রূপের ভরা গাঙে মাতালপারা হারিয়ে রইল। তারপর এককালে সবাই একসাথে চকিত হয়ে উঠে হাত তুলে ডাক্‌লো—"ওগো স্বপনের দেবি, ওগো মরমের রাণি—"

নক্ষত্র সভার সেই সহস্র সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে অমিয়ার মাথা নেমে এল। তার মনে হোলো সে ভুল ক'রে এপথে এসে পড়েচে। কিন্তু তখনি তার স্বপনকে সে মনে করল,—এই ত, এমনি কালো আকাশের নীচে, নীল সিন্ধুর ফণার মাথায়, শাদা-মেঘের কুঞ্জ আড়ালে তার প্রিয়ের আঁখির আলো তার নয়নে লেগেচে—এই ত যে দেখেছিল।

নক্ষত্র-লোকের বুক চিরে' আবার রব উঠ্‌লো—এস 'ওগো ভুবন-মনমোহিনী ওগো নিশীথ রাতের অবোসর প্রেম-পসারিণী তোমার অভিসার লেগে হেথায় লক্ষ আঁখি জাগে। গোপনে

শিউরে উঠে অমিয়া কি বল্‌তে চাইলে। তার বুকের বাণী মরম চিরে বেরিয়ে আস্‌তে মরমে জড়িয়ে পল। বল্‌তে গিয়ে তার অরুণ অধর একবার শুধু কেঁপে উঠ্‌লো। আর সেই কাঁপন লেগে' তার চপল চাউনি মধুর হোলো, তার আলোর কবরী এলিয়ে পড়্‌ল, তার জ্যোতির আঁচল খুলে' পড়্‌ল,—সে ব্যাকুল হোলো, সে বিব্রত হোলো, সে লাজে—সসঙ্কোচে জড়িয়ে প'ল। আর তার এই ভাব, এই রূপ, এই ছন্দ, চারদিকের মাতাল মনকে দ্বিগুণ মাতিয়ে তুল্‌লো। তারা অধীর হলো, তারা অবশ হোলো তা'র নয়ন-ফেলার তালে তালে তাদের বুকের শোণিত দুল্‌তে লাগ্‌লো, তার খোপার গন্ধ ভেসে আসার ছন্দে ছন্দে তারা মত্ত বাসনায় কাঁপতে লাগ্‌লো। ক্রমে কেউ তাকে মগ্ন হয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো কেউ তাকে মুগ্ধ হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কেউবা ছুটে এসে তার চরণের পুষ্পিত আলোকের শীতল শয়নে লুটে পড়্‌ল। আবার কেউ অধীর আবেগে উদগ্র হোলো, কেউ বা দুর্ব্বার লালসার বিপুল বাহু মেলে তাকে আলিঙ্গনে বাঁধতে ধেয়ে এল। অমিয়া নীচে অসীম সিন্ধুর সলিল-শয়নে মূর্চ্ছে প'ল।

মহানীলাম্বুর গোপন গেহে-শুক্তিমুক্তার প্রদীপ-জ্বালা ঘরে হিরণ বরণ পূর্ণিমার চাঁদ ত তারি প্রতীক্ষায় ঘুমিয়ে ছিল। তাই অমিয়ার মূর্চ্ছা-লাগা তরুণ-তনুর তরল বাসনা যখন তারি বুকে গিয়ে ভেঙে পড়্‌ল, সে যুগান্তের যোগীর সাধনার সিদ্ধির মতোই তাকে মরমের মরমে টেনে নিলে।

তারপর নীল সাগরের নীল বুক চিরে যেদিন অমিয়াকে হৃদয়ে নিয়ে চাঁদ উঠে এলো,—নক্ষত্র-লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে উঠ্‌লো—'ওগো মহারাণি, ওগো মহিমময়ি ঐ আসনে আজ তোমায় বস্‌তে দেখে হাজার আঁখি আর ফিরূচে না—আনন্দ আর মার্জ্জনার অশ্রুজলে অঝোর ঝরেই ভেসে যাচ্চে।'

হেমন্তকুমার বসু।

নিষ্ঠুর।

—:•:—

এত নিষ্ঠুর হ'তে পার তুমি
স্বপনে সে কথা ভাবি নি কভু,
কত অনাদর করিয়াছ মোরে
সমাদর আমি করেছি তবু ;
ঘৃণাভরা হাসি হাসিয়াছ তুমি
বিদ্রূপ মোরে ক'রেছো কত
তবু আমি তব চরণের তল
মাথাটী আমার করেছি নত।
নয়নে আমার হেরিয়া অশ্রু
হাসিয়া ব'লেছো—"করিয়া ছল
আমারই হৃদয় জিনিয়া লইতে
নয়নে ভরেছো অশ্রুজল।"
হায় রে নিঠুর! পাষাণ রে তুই!
এতটুকু মায়া নাহি কি প্রাণে,
অশ্রু হেরিয়া অশ্রু ফেলিতে—
তাও তোর আঁখি নাহি কি জানে?
ঘৃণা কর মোরে—নাহি ক্ষতি তায়
চিরদিন শুধু কাঁদিতে দিয়ো,
হাসিয়া কাঁদায়ে সুখ যদি পাও
হাস চিরদিন পরাণ-প্রিয়।

শ্রীরেণুকা দাসী।

কতকটা বাহিরের বস্তু ;—পুংশিক্ষাও স্বকীয় আত্মিক শক্তি দ্বারা ইহাকে স্বীকার করিয়া, জীবনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতেছে না। ইহা এখনও একটা বাহ্য ছাপ,—একটা কলঙ্কের মত। স্ত্রীশিক্ষাতেও এই বাহিরের জিনিষটা প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ বিমুখ হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষা বিস্তারের ফলে স্ত্রীশিক্ষায় এই বিজাতীয় ভাবের সার্ব্বভৌমিক ও বিশ্বজনীন স্বরূপটা প্রবেশ করিবেই। কিন্তু এই প্রবেশ—দাসের গৃহে প্রভুর প্রবেশ নয়, ভিখারীর গৃহে রাজার আগমন নয়,—বন্ধুর কুটীরে বন্ধুর আমন্ত্রণ। এখানে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের ছড়াছড়ি থাকিবে না, থাকিবে কেবল প্রেম, প্রীতি, ও স্বস্থ বিদগ্ধতার আদানপ্রদান। বাহির হইতে স্ত্রীশিক্ষার স্কন্ধে সে ভাবটা চাপাইয়া দিলে, শিক্ষা সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। স্ত্রীশিক্ষার অন্তর হইতে যখন আমন্ত্রণের শক্তি উদ্ভূত হইতে থাকিবে, তখনই গ্রহণ ও অভ্যর্থনা সার্থক হইবে। সমগ্র দেশের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা পৃথক ভাবে পরিচালিত হইলেই, এইরূপ যথার্থ উন্নতি সম্ভব হইবে।

(গ) স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সামাজিক সহানুভূতি আবশ্যক, তাহা সমাজের উচ্চ ও মধ্যস্তরের সর্ব্ববিভাগ ও উপবিভাগ হইতে লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। সেই কারণে যে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই নীতির অনুসরণ বর্ত্তমান পুংশিক্ষায় অসম্ভব। দেশীয় বিদগ্ধতা, দেশীয় অন্তঃপুর, এবং সম্ভব হইলে দেশীয় ব্রহ্মচর্য্যকেও এই স্ত্রীশিক্ষার পরিচালনে এমন স্থান প্রদান করিতে হইবে, যাহা নানা রাষ্ট্রীয় কারণে পুংশিক্ষা সংগঠনে একেবারে অসম্ভব বিবেচিত হইতে পারে। এই জন্যও স্ত্রীশিক্ষাকে পুংশিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিতে হইবে।

(ঘ) নানা কারণে মধ্য-শিক্ষার শেষ স্তরে এবং অন্ত্যশিক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার আলম্বন হইতে পারে না ; অন্ততঃ স্যাড্‌লার কমিশনের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ কোন কারণ অনুমান করা যায় না। স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যের আলোচনা হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী ও পুংশিক্ষা একই অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইলে, দুই বিভাগের শিক্ষায় দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থা হওয়াই উচিত।

(ঙ) মাতৃ-ভাষার সাহায্যে শিক্ষা, শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ;—সকল সভ্যদেশেই এই সত্যটী স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের পুংশিক্ষায় এ সম্বন্ধে সমগ্র ভাবে পরীক্ষা করাও যখন সহজ হইবে না, তখন স্ত্রীশিক্ষার এরূপ চেষ্টা সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলে, পরোক্ষভাবে সমগ্র দেশীয় শিক্ষার প্রভূত উপকার হইতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার খুব অল্প। এই উপায়ে যদি শিক্ষাবিস্তারের উপায় হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এই পরীক্ষাকে সার্থক করিবার নিমিত্ত খুব অনুকূল ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্ত্রীশিক্ষার পৃথক পরিচালনদ্বারাই এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

মহিলা বিদ্যামহাপীঠ।

স্ত্রীশিক্ষা পরিচালন সম্বন্ধে যে তত্ত্বগুলি উপরে আলোচিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা পরিচালনের অবয়বটী নিরূপণ করা কতকটা সহজ হইবে। সমগ্রদেশের জন্য একটী মহিলাবিদ্যা-মহাপীঠ স্থাপিত হওয়া উচিত। কলিকাতার কোন মহিলা-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া, এবং ক্রমে ক্রমে শৈশব, আদ্য, মধ্য, অন্ত্যশিক্ষা, কুমারাগার, বিধবাশ্রম, শিল্পশালা, শিক্ষণ শিক্ষা, বীক্ষণ বিদ্যালয় (Demonstrative School) চিকিৎসা শিক্ষা, প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত অঙ্গই এই বিদ্যালয়টীর সহিত সংযুক্ত রাখিয়া, একটী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই শিক্ষায়তনটীই হইবে বাঙলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার বিদ্যামহাপীঠ (University)। মহিলা-বিদ্যামহাপীঠ, স্ত্রীশিক্ষামহামণ্ডল প্রভৃতির কার্য্যালয় এইখানেই স্থাপিত হইবে। বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শৈশব, আদ্য ও মধ্য শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলেও, এই বিদ্যামহাপীঠেই কেবল অপরাপর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতায় যদি এরূপ একটী মহিলা শিক্ষায়তন গঠিত হয়, তাহা হইলে নবদ্বীপের ন্যায় তীর্থস্থানেও আর একটী বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়।

স্ত্রীশিক্ষা পরিচালন।

স্ত্রীশিক্ষার শৈশব, আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যস্তর একই পরিচালনের অন্তর্গত করা সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। কোন সভ্যদেশেই এরূপ চেষ্টা হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও শৈশব ও মধ্য

শিক্ষার পরিচালক থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা সম্পূর্ণরূপ পৃথক। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারও খুব সামান্য। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের স্ত্রীশিক্ষা বিভিন্ন পরিচালনের অন্তর্গত করিলে, চেষ্টা বিক্ষিপ্ত হইয়া, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির অন্তরায় উৎপাদন করিবে। স্ত্রীশিক্ষার এই শৈশব অবস্থায় একটী কেন্দ্র শক্তি দ্বারা সমগ্র স্ত্রীশিক্ষা পরিচালিত হইলে, সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক। এই নিমিত্ত দেশের সমগ্র স্ত্রীশিক্ষার ভার থাকিবে একটী মহামণ্ডলের (Court) উপর। ইহার সভ্যেরা সমাজের উচ্চ ও মধ্য স্তর হইতে বিভিন্ন উপায়ে নির্ব্বাচিত হইবেন, এবং দেশীয় সমাজের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিই এই মহামণ্ডলে স্থান পাইবেন। নির্ব্বাচনই হইবে শিক্ষা পরিচালনের ধমণী-স্বরূপ। সমাজের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই ধমণী সম্প্রসরিত হইয়া, স্ত্রীশিক্ষাকে সমগ্র সমাজ শরীরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত রাখিবে। প্রত্যেক তিন বা পাঁচ বৎসর অন্তর এই মহাসভা নুতন করিয়া নির্ব্বাচিত হইবে। নির্ব্বাচন-প্রণালী, সভ্য সংখ্যা ও সভ্যের গুণাগুণ প্রথমতঃ বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইলেও, নবগঠিত মহাসভা এ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন করিবে। যাহাতে এই সভায় দেশের সকল শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর মতামত অনুসারে শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এত বড় একটী সভা কর্ত্তৃক সভার নির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। সেই জন্য মহামণ্ডলের সভ্যগণ নিজেদের ভিতর হইতে একটী বিদগ্ধমণ্ডল (Academic Council) গঠন করিবেন। এখানেও নির্ব্বাচন হইবে মণ্ডলরীর ভিত্তি। দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার পরিচালনের ভার ইহার উপর অর্পিত থাকিবে। এখানে শিক্ষিত পুরুষ অপেক্ষা শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অধিক হওয়া এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদগ্ধতাকে সমান স্থান প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। মহিলা বিদ্যামহাপীঠ এবং দেশের নানা স্থানের স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষয়িত্রী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ, দেশীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীগণ, দেশীয় প্রাচ্য বিদগ্ধতার অধ্যাপক ও মৌলবিগণ, এবং দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞগণ, নিজেদের ভিতর হইতে মহামণ্ডলে যে সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন, মহামণ্ডল তাঁহাদিগের মধ্য হইতে, বিদগ্ধমণ্ডলের সভ্য নির্ব্বাচিত করিবে। কি প্রণালীতে বিদগ্ধমণ্ডলের সভ্য নিব্বাচিত হইবে, এবং মণ্ডলরীর কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে, মহামণ্ডলেই সে সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে।

এই বিদগ্ধমণ্ডলই একদিকে মহামণ্ডলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এবং অপরদিকে দেশীয় স্ত্রীশিক্ষাপরিচালনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

এইরূপে সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শিক্ষা সমস্যা সমাধানের ভার বিদগ্ধমণ্ডলের উপর ন্যস্ত থাকিলেও দেশব্যাপী শিক্ষার সকল অনুষ্ঠানের প্রত্যেকেরই একটী স্বাধীন সত্ত্ব স্বীকৃত হইবে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ভার থাকিবে দুইটী সমিতির উপর,—একটী শিক্ষা সমিতি এবং অপরটী পরিচালন সমিতি। অনুষ্ঠানের শিক্ষয়িত্রীরা মিলিত হইয়া শিক্ষা সমিতি গঠন করিবেন। স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত আভ্যন্তরীণ সমস্যা এই শিক্ষাসমিতিতে মীমাংসিত হইবে। অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছাত্রীগণের অভিভাবকেরা এবং শিক্ষা সমিতির সভ্যাগণ সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া, অনুষ্ঠানের পরিচালন সমিতিগঠন করিবেন। এই পরিচালক সমিতি স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত বাহ্য সমস্যার এবং সাধারণ ভাবে ইহার আভ্যান্তরীণ সমস্যার সমাধান করিবে। প্রত্যেক সমিতির সহিত একটী পরামর্শ সভা সংযুক্ত থাকিবে। অভিভাকদিগের প্রত্যেক প্রতিনিধি স্বীয় অথবা পরিচিত কোন ভদ্র পরিবারের একজন বয়ঃস্থা গৃহিণীকে এই পরামর্শ সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করিবেন। পরামর্শসভার প্রত্যেক সভ্যার অনুষ্ঠানের অন্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে। সভ্যাগণ শিক্ষয়িত্রীগণের কর্ম্মের সমালোচনা করিবেন না। স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে পরিচালন সমিতিকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানই, এই পরামর্শ সভার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এখানে বলাই বাহুল্য যে স্ত্রীশিক্ষার সকল প্রকার অনুষ্ঠানে যাহাতে মহিলাদিগের সহাভূতি লাভ হয়, সেইদিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং এরূপ চেষ্টা ফলবতী হইলেই, দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্ভব হইবে।

স্ত্রী শিক্ষার পরিচালন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যাহা বলা হইয়াছে, অন্তঃপুর শিক্ষা ও বিধবা-শ্রমের পরিচালনেও তাহা প্রযোয্য। কিন্তু বিধবাশ্রম সম্বন্ধে একটী কথা বলা প্রয়োজন। নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজের বিধবাদিগের ভিতর বৃত্তিশিক্ষার প্রচলনই এই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া এখনকার অন্তঃপুরে সংবংশজাতা হিন্দু বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের স্থান হইতে পারে। ইঁহারাই আশ্রমের পরিচালয়িত্রী হইবেন। কিরূপে এরূপ মহিলাদিগের সাহায্য লাভ ঘটিবে, তাহা মহামণ্ডলের একটী প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইবে। অপরাপর শিক্ষয়িত্রীরা সপরিবারে

আশ্রমের বহির্দেশে বাসোপযোগী স্থান পাইলেই, আশ্রমের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত সম্ভব হইবে। প্রধানতঃ দেশের অগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষিতা মহিলাদিগকে আশ্রমের বিধবাদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের ভিতর যে দেশমাতৃক ভাব বিকশিত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, বিধবাশ্রমটী সার্থক করিয়া তুলিতে, যে ত্যাগ ও যে সেবার ভাবের প্রয়োজন হইবে, দেশীয় শিক্ষিত সমাজ সেই ত্যাগ ও সেই সেবা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত তাঁহাদিগেরই নিকট আশা করিতে পারে। আমাদের গৃহ নানা প্রকার কুসংস্কারের ধূলিকণায় পরিপূর্ণ। কিন্তু যে গৃহে তাঁহাদের মত কথিত কাঞ্চনের উদ্ভব, সেই গৃহের ধূলিরাশির অন্তরতম প্রদেশ স্বর্ণরেণুর স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। তাঁহারা কি এই ধূলিকণাগুলি মাতৃভূমির স্নেহের দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন না? তাঁহাদেরই পরশ স্পর্শে লৌহ কাঞ্চন হইতে পারে,—তুচ্ছ, পরিত্যক্ত ধূলিকণাও স্বর্ণরেণুতে পর্য্যবসিত হইতে পারে।

অর্থ সমস্যা।

উপরে স্ত্রী শিক্ষার যে মূর্ত্তিটী কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা গড়িয়া তুলিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। তবে প্রচলিত প্রথামত বিলাস ভবনের অনুরূপ শিক্ষা মন্দিরগুলিতে এই দরিদ্রদেশের যে অর্থের অপব্যয় হয়, দেশের লোকের উপর স্ত্রী শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিলে, অর্থের এই অপব্যয়টা কিছু কম হইবে। দেশের লোকেরাও এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবিক কতকটা গোলামি মনোভাব অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু যদি যথার্থ লোকমতের উপর স্ত্রীশিক্ষা গঠন করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই অর্থনাশ নাও ঘটিতে পারে। স্ত্রী শিক্ষার মন্দিরগুলি সমাজের ও গার্হস্থ্য জীবনের অনুকূল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যয় সম্বন্ধে এইরূপ প্রাচ্য সংযমের দৃঢ়তা অবলম্বিত হইলেও, স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে। এ সম্বন্ধে আমার একজন পূজনীয় আত্মীয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি প্রচুর সংগঠন ও পরিচালন শক্তি সম্পন্ন একজন স্বনামধন্য কর্ম্মীপুরুষ ছিলেন। এই শক্তি ব্যবহারের সময় তিনি প্রায়ই বলিতেন, "ভাজা খাবে ত তেলের খরচ।" তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আমিও বলি,—দেশীয় সমাজ যদি স্ত্রী শিক্ষায় উন্নতি চায়, এবং এই উন্নতির বাসনা যদি সমাজের কোন বিশিষ্ট অংশেও তীব্র হইয়া থাকে, বোধহয়, অর্থের অভাব হইবে না। ছাত্রী দত্ত

বেতনের সামান্য আয়, রাজামহারাজের ও জমিদার মহাজনের বড় বড় দান ত আছেই,—দেশীয় শিক্ষা বিভাগ হইতেও যথেষ্ট আশা করা যায়। যদি লোকমতের উপর স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্ত্রীশিক্ষায় যদি এই লোকমত স্বাধীনতা ও পৃথক পরিচালনের পক্ষপাতী হইয়া সমগ্র দেশের জন্য একটী পৃথক মহিলা-বিদ্যামহাপীঠ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়,—এই লোকমত বিদ্যামহাপীঠের অতিরিক্ত সরকারি আধিপত্যের বিরোধী হইলেও,—রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার হইতে যথোপযুক্ত অর্থলাভ ঘটিবেই;—অবশ্য যদি সরকারী শিক্ষা দপ্তরে দেশবাসীদিগের মতামতের কোন যথার্থ মর্য্যাদা থাকে। আরো একটী কথা। ব্যক্তিগত-গার্হস্থ্য-জীবনে আমরা যে সংসারিক অভাবটী তীব্র ভাবে অনুভব করি ইহার তীব্রতাই এই অভাব পূরণের কারণ হয়। অর্থাভাব খুব বেশী দিনের জন্য অভাব পূরণের অন্তরায় হয় না। অবশ্য অভাব বোধ খুব তীব্র হইলেই এরূপ হয়। স্ত্রীশিক্ষাও যদি এরূপ তীব্র সামাজিক অভাব বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইহার ও অর্থসমস্যার সমাধান হইবে। এখনই না হয়, কিছু দিন পরেও হইবে। স্ত্রীশিক্ষার নব-সংগঠন দ্বারা দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ অভাব বোধ তীব্র করিয়া তোলাই এই আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

নদীয়া দর্শনে।

এই কি সে দেশ? পূত যেই ভূমি নিমাই-চরণ করিয়া স্পর্শ;
কোথা' সে ভারত গৌরবময় মধুরতা ভরা মহাআদর্শ।
শিখিল যেখানে এ মহাজগত ত্যাগই জীবনে প্রধান মন্ত্র।
ধরণীর মাঝে নাম শুধু সার ধরিল স্বমুখে এ মহাতন্ত্র।
আজি নদীয়ার কিছু নাহি আর কেবল একটু' গরিমা অংশ
আছে সকলের মুখপানে চেয়ে এখনো পূর্ণ হয় নি' ধ্বংস

আজো ভাগীরথী সেই স্রোতস্বতী তেমতি সাগর সকাশে ধায়,
তেমনি তরণী বাহিতে বাহিতে নাবিক বেহাগে মধুর গায়।
সলিলে তাহার কত সাধু দ্বিজ করে অবগাহি' শীতল গাত্র,
কোথায় জননী ? সেদিনের মত গাহে না ত' কেহ সে মহাস্তোত্র।

আজি নদীয়ার কিছু নাহি আর কেবল একটু' গরিমা অংশ
আছে সকলের মুখপানে চেয়ে এখনো পূর্ণ হয় নি' ধ্বংশ ॥

আজিও মিশিছে 'খড়ে'র সলিল ভাগীরথী কাল সলিল পাশে ;
তেমনি ত' দিগ্‌-দিগন্ত হ'তে আজো কত শত ভক্ত আসে ;
যদিও আজিকে প্রতি দেবালয়ে কীর্ত্তন সদা হ'তেছে গান,—
কিন্তু কোথায় সে দিনের মত ভক্তি-মাখান মধুর তান ?

নদীয়ার কিছু নাহি আর কেবল একটু' গরিমা অংশ
আছে সকলের মুখপানে চেয়ে এখনো পূর্ণ হয় নি' ধ্বংশ ॥

এই নদীয়ায় স্থাপিয়াছিলেন 'সার্ব্বভৌম' বিদ্যা মঠ ;
যাঁহার শিষ্য-প্রভায় আজিও দীপ্ত বঙ্গ-গগন-তট।
নদীয়ার সেরা যেখানে নিমাই প্রেমের ধর্ম্মে রচিল গান,—
ইতর ভদ্র ধনী দরিদ্র সকলের যেথা সমান মান।

আজি নদীয়ার কিছু নাহি আর কেবল একটু' গরিমা অংশ
আছে সকলের মুখপানে চেয়ে এখনো পূর্ণ হয় নি' ধ্বংশ ॥

নব্য-ন্যায়ের 'কাণা-শিরোমণি' 'রঘুনন্দন' নব্য-স্মৃতির,
আজিও পালিছে অর্দ্ধ ভারত সমাজ বিধান 'বাপুর পাতি'র।
'গোপন-বৃন্দাবন' বলি যার খ্যাতি ছিল এই ভুবন মাঝ—
যাদের গরবে গর্ব্বিতা তুমি কোথায় তাহারা গিয়াছে আজ ?

আজি নদীয়ার কিছু নাহি আর কেবল একটু' গরিমা অংশ
আছে সকলের মুখপানে চেয়ে এখনো পূর্ণ হয়নি' ধ্বংশ ॥

কিসের দুঃখ উদয় অস্ত প্রকৃতির গতি কে রোধে তায়,
আজি যে উন্নত বিধির বিধানে কালি সে আবার বিলয় পায় !
আজি নদীয়ার দীন দশা হায় ! বিধির শানিত কৃপাণ স্পর্শে
কে বলিবে কালি এ নবদ্বীপ উঠিবে না পুনঃ হাসিয়া হর্ষে।

আজি নদীয়ার কিছু নাহি আর কেবল একটু' গরিমা অংশ
আছে সকলের মুখপানে চেয়ে এখনো পূর্ণ হয় নি' ধ্বংশ ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(নীহারবালা দেবীর পরলোক গমনে)

ইংরাজি সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই যে উনবিংশ শতাব্দীর কথা-সাহিত্য কয়েকজন রমণীর অসামান্য প্রতিভায় অপূর্ব্বরূপে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল, আমাদের বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস বিভাগেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আমরা যদি পুলক ও গর্ব্ব অনুভব করি তাহা হইলে বোধ হয় তাহা অসঙ্গত হইবে না। হয় ত জর্জ্জ ইলিয়টের শক্তি লইয়া এখনও কোনও বঙ্গনারী আমাদের সাহিত্যে আবির্ভূতা হন নাই ;—সে শক্তি এখন পর্য্যন্ত কেবল রবীন্দ্রনাথে ও শরৎচন্দ্রে প্রকটিত হইয়াছে। হয় ত বঙ্গমহিলার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশের পথে অন্তরায় হইয়াছে এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও স্বর্ণকুমারী হইতে আরম্ভ করিয়া নিরূপমা অনুপমা প্রমুখ যে

সকল স্থলেখিকা আমাদের সাহিত্যে অপার্থিব আনন্দালোক বিকীরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা বঙ্গবাণীর কমকণ্ঠে অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার রূপে চিরকাল শোভা পাইবেন।

জননী বঙ্গভাষার এই অপুর্ব্ব কণ্ঠমালা হইতে একটি মুক্তা আজ সহসা কালের কঠিন আঘাতে খসিয়া পড়িয়াছে। কথাটা হয় ত ঠিক বলা হইল না। কারণ এ ত সাধারণ পার্থিব বস্তু নহে। ইহা চক্ষুর অগোচর হইলেও ইহার দ্যুতি যে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতে থাকে। এ মুক্তা কি খসিয়া পড়িয়া বাগ্দেবীর কণ্ঠাভরণ অঙ্গহীন করিতে পারে? হয় ত তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই, হয় ত তাহা অস্ফুট কুসুমের ন্যায় দেবতাচরণে নিবেদিত হইবার পূর্ব্বেই বাদল বায়ে ঝড়িয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে প্রতিভা-কুসুম ফুটিতে না ফুটিতে আজ 'ঝরেছে ধরণীতে জনি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

এ কথা যে কতদূর সত্য তাহা যাঁহারা স্থলেখিকা নীহারবালা দেবীর লেখার সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর ন্যায় তিনি হিন্দুঘরের বালবিধবা ছিলেন। সাংসারিক সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অবসর বিনোদনস্বরূপমাত্র সাহিত্য চর্চ্চা করিবার তিনি অবকাশ পাইতেন। আর তাঁহার বৈধব্য পীড়িত নিরানন্দ জীবনে ইহাই বোধ হয় একমাত্র আনন্দ ও শান্তির প্রস্রবণ স্বরূপ ছিল। কিন্তু তিনি ত সাধারণ মেয়ে ছিলেন না; প্রতিভার ফল্গুধারা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল। যখন এই অন্তঃসলিলা প্রবাহিনী সাহিত্যসৃষ্টিতে তাহার নির্গমন পথ পাইল তখন তাহা গল্পে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাহিত্যামোদিগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! এ প্রবাহ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। মৃত্যুর খরকর স্পর্শে এ ধারা অকালে শুষ্ক হইয়া গেল। দুর্ভাগ্য আমরা, অল্প বয়সেই তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল। আমাদের সকল আশা উন্মুলিত হইয়া গেল।

ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে পরিচারিকায় আমি তাঁহার প্রথম গল্প 'মোতিয়া' পড়িয়া মুগ্ধ হই। ইহাই তাঁহার প্রথম গল্প কি না জানি না। কিন্তু ইহাই হইল তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। এই অন্ধ বালিকা মোতিয়ার কাহিনী এমনই একটা কাব্য সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া লেখিকা পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন যে সেই একটি গল্পে আমি তাঁহার ভক্ত হইয়া

পড়ি। তার পরে বিভিন্ন মাসিক পত্রে যখনই আমি তাঁহার কোন গল্প পাঠ করিয়াছি তখনই বিমল আনন্দলাভ করিয়াছি, কখনও হতাশ হই নাই।

প্রায়ই দেখা যায় যে ছোট গল্পে যাঁহারা সিদ্ধহস্ত, উপন্যাসে তাঁহারা সেরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন না। কিন্তু নীহারবালার ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; গল্পে ও উপন্যাসে তিনি সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস সাধারণতঃ আমি পড়ি না। কিন্তু নীহারবালার উপন্যাস সম্বন্ধে আমাকে এ নিয়ম ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। 'পরিচারিকায়' প্রকাশিত 'তটিনী' উপন্যাসটি আমি মাসে মাসে সাগ্রহে পাঠ করিতাম এবং লেখিকার সুকৌশল ঘটনা বিন্যাস ও নারীহৃদয়ের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ দেখিয়া মনে মনে-তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতাম। 'ভারতী' পত্রিকায় 'রিক্তা' নামে তাহার আর একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

অল্পদিনের সাহিত্যসাধনায় তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য নিতান্ত কম নহে। আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি আমাদের উপস্যাস বিভাগের সমধিক পুষ্টি সাধনে যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি উপন্যাস ক্ষেত্রে যশস্বিনী ইন্দিরা দেবীকে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে নিজ অঙ্কে টানিয়া লইয়াছিলেন। ইন্দিরা দেবীও সবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামিয়া ছিলেন, এবং দু একখানি মাত্র স্বরচিত উপন্যাস আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার কিন্তু সেই দু একখানি উপন্যাসেই তিনি তাঁহার ভগিনী অনুরূপা দেবী অপেক্ষা অধিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গসাহিত্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আজ আবার নীহারবালার বিয়োগে সে ক্ষতি বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। আমরা আর কি বলিব?—'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।'
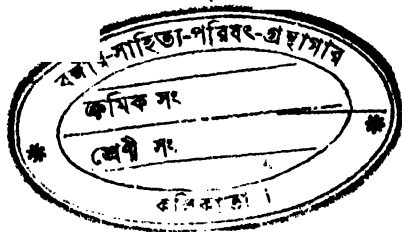
শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ

-:০:-

দ্বিতীয় প্রস্তাব, বাঙ্গালার সভ্যতা এবং তাহার বয়স।

অনেক বড় বড় পণ্ডিত বাঙ্গলাদেশকে নূতন গঠিত এবং উহার সভ্যতাকে নূতন রচিত বলিয়া থাকেন। ভূবিদ্যা শাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাদেশ দক্ষিণাপথের মালভূমি অপেক্ষা নূতন বটে। কিন্তু, সেই নূতন—কতকালের নূতন? আমাদের মতে, অঙ্ক ধরিয়া সেই কালের বয়স স্থির করিবার উপায় নাই। হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর গৌরীশঙ্কর, (যাহা আমাদের দেশের সকলের কাছে পাদরী এভারেষ্ট সাহেবের নামে "মাউণ্ট এভারেষ্ট" নামে বিখ্যাত!) সমুদ্রবক্ষ হইতে ২৯,০০২ ফিট উচ্চ, একথা নিম্নশ্রেণীর পড়ুয়ারাও জানে। এই সাড়ে পাঁচ মাইল পর্বতশৃঙ্গও নাকি এককালে সমুদ্রের ভিতর ডুবিয়াছিল, এবং পরে পৃথিবী পৃষ্ঠের পরিবর্ত্তনের ফলে ঐরূপ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সে যে আজি হইতে কত কোটি অথবা শত কোটি বৎসর আগে হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? যিনি বলিবেন, তিনি "সাহসী" সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের মত সামান্য বুদ্ধির মানুষের কাছে সে কথা অতিশয় দুর্বোধ। তাহার পর, যে সময়ে হিমালয় সাগরগর্ভ হইতে উঠিয়াছিলেন, তাহার যে কত কোটি বৎসর পরে, সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দিলীপ-পুত্র ভগীরথ এদেশে গঙ্গাদেবীকে আনিয়াছিলেন, তাহাই বা কে বলিবে? গঙ্গাদেবীর সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষি বলিতেছেন,—

"কৈলাস শৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময় প্রাণী এবং ওষধিময় 'গৌর' নামে এক গিরি আছে। উহা হরিতালময়,—উহার শৃঙ্গগুলি হিরণ্ময়। উহা এক দিব্য মণিময় শুভগিরি। উহার পাদদেশে রমণীয় কাঞ্চন-বালুকাময় দিব্য এক সরোবর আছে। তাহার নাম বিন্দুসরঃ; রাজা ভগীরথ সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই রাজর্ষি গঙ্গার নিমিত্ত তথায় বহুবৎসর বাস করেন। 'মদীয় পূর্বপুরুষগণ গঙ্গাজলে প্লাবিত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন,' রাজর্ষি ভগীরথ মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই সেখানে গঙ্গার আরাধনা করেন। দেবী ত্রিপথগা প্রথমতঃ সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। .... গঙ্গা সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষঃ, বিদ্যাধর,

কলাপগ্রাম, পারদ, খস, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভরত, পঞ্চাল, কাশী, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ, সুহ্মোত্তর, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত এই সকল শুভ **আর্য জনপদের ভিতর** দিয়া বহিতে বহিতে বিন্ধ্যপর্বতে প্রতিহত হইয়া লবণ বা দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন" (১)।

এই দেশগুলির মধ্যে, "মগধ, অঙ্গ, সুহ্মোত্তর বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত" এই কয়েকটি জনপদের নামে আমাদের প্রয়োজন। গঙ্গানদী যে বিন্ধ্যপর্বতে প্রতিহত হইবার কারণেই উত্তর বাহিনী হইয়া বারাণসী বা কাশী নগরীকে পবিত্র করিয়াছেন, তাহা "ইণ্ডিয়ার" যে কোন মানচিত্র খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর বিন্ধ্যপর্বতমালার পূর্বাংশই যে বর্তমান রাঢ়দেশের পূর্বদিকে গঙ্গানদীর "পাহাড়" বা "পাড়" স্বরূপে বিদ্যমান্ আছে, তাহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। পূর্ববঙ্গের উত্তরে যে "গারোপাহাড়" (এবং তাহার অংশ স্বরূপ ভাওয়াল বা মধুপুরের 'গড়') দেখা যায়, তাহাও যে এক সময়ে বিন্ধ্যপর্বতমালার সহিত সংযুক্ত ছিল না, তাহা বলা যায় না।

গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর দ্বারা আনীত পলিমাটির দ্বারা যে গৌড়-বঙ্গের, বিশেষতঃ মধ্যবাঙ্গালার অনেক স্থান গঠিত অথবা সমুদ্রের নিকট হইতে অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম এই পাঁচটি জনপদ (মোটামোটি আমাদের বাঙ্গালা দেশ) যে অতিশয় প্রাচীন এবং সে প্রাচীনতার কাল কোন খৃষ্টাব্দ অথবা শকাব্দের অঙ্ক দ্বারা মাপিতে পারা যায় না, তাহা নিশ্চয়। রামরাজ্যেরও বহুপূর্বে এই সকল দেশ সভ্য ভব্য মানুষে পূর্ণ হইয়াছিল। পাদরী এভারেষ্ট, সার চার্লস লায়েল এবং সেনাপতি ষ্ট্রাচি প্রমুখ সাহেবেরা অনেক বড় বড় হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে নদ নদী দ্বারা আনীত পলিমাটির দ্বারা বাঙ্গালাদেশ গড়িতে চৌদ্দ পনের হাজার বৎসরেরও অনেক অধিক সময় লাগিয়াছে।

---

(১) বায়ুপুরাণ, ৪৭ অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫১ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ, ১২১ অধ্যায়, মহাভারত (১) আদিপর্বের ৬ অধ্যায় ইত্যাদি। রামায়ণ, বালকাণ্ডের ৪৩শ সর্গে (বঙ্গবাসী) ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার আনয়ন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি রাণীগঞ্জের নিকট প্রাপ্ত প্রাচীন বৃক্ষের প্রস্তরাবশেষ সম্বন্ধে বর্তমান প্রস্তাবের ত্রয়োদশ (১৩) সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বাঙ্গালাদেশের বয়স সম্বন্ধে Sir W. W. Hunter সাহেবের Imprial Gazatteer of India, Vol VI. India Ch I. দ্রষ্টব্য।

পুরাণ-পাঠে আমরা জানিতে পারি যে (২) অযোধ্যা-নাথ দশরথ রাজার সমসাময়িক এবং এবং বন্ধু অঙ্গরাজ লোমপাদ (তাঁহার পদদ্বয় লোমে পূর্ণ ছিল বলিয়া তিনি এই নাম পাইয়াছিলেন ?) দশরথ ছিলেন এবং তাঁহার ঊর্ধতন সপ্তমপুরুষ "বলি" নামক এক রাজা ছিলেন। এই বংশ চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত যযাতি রাজার পুত্র (শার্মিষ্ঠার দ্বিতীয় পুত্র) অনু হইতে (কেবল হরিবংশে এই বংশও পুরু হইতে সম্ভূত হইয়াছে লেখা আছে) প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই "বলি" রাজার রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দেবীর গর্ভে, এবং প্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমা-গৌতমের আশীর্ব্বাদে (বা ঔরসে) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ. সুহ্ম, পুণ্ড্র এই পাঁচটি পুত্র জন্ম এবং তাঁহাদের নাম হইতেই অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং কলিঙ্গ এই পাঁচটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদের নামকরণ হয়। উক্ত ঋষির ঔরসে এবং সুদেষ্ণা রাণীর এক দাসীর গর্ভে বিখ্যাত বৈদিক ঋষি "কক্ষীবানে"র জন্ম হইয়াছিল।

উক্ত বলি-রাজের পুত্র অঙ্গ স্বদেশেই নিজ নামে রাজ্য চালাইতে থাকেন এবং তাঁহার পুত্র দধিবাহন, তাঁহা হইতে দিবিরথ, দিবিরথ হইতে ধর্মরথ, তাঁহা হইতে চিত্ররথ উৎপন্ন হন। অযোধ্যারাজ দশরথে সখা অঙ্গরাজ লোমপাদ-দশরথ এই চিত্ররথের পুত্র। এই অঙ্গরাজ দশরথের প্রপৌত্র 'চম্প' রাজা নিজের নামানুসারে "চম্পা"নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক ভাগলপুর (মুসলমানদের 'বাঘেলপুর' এবং পরে ইংরেজের প্রথম আমলে 'বগলীপুর') নগরের নিকটে প্রাচীন "চম্পার" অবস্থান এখনও লোকে নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। এই চম্প হইতে দশম বা একাদশ পুরুষে অঙ্গরাজ অধিরথের জন্ম হয়,—যিনি পৃথা বা কুন্তীর 'অপবিদ্ধ' (পরিত্যক্ত) পুত্র কর্ণকে গঙ্গা গর্ভে পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অধিরথ প্রকৃত পক্ষে ছুতার বা সূত্রধর ছিলেন না, পরন্তু মুকুটধারী রাজাই ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিতা বৃহন্মনা নামক রাজা ভুল করিয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করার জন্য, উক্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহ "বিজয়"কে লোকে 'সূত' (৩) বলিত। সেই দোষের কারণেই এই বংশের দুর্নাম রটে

(২) বায়ুপুরাণ ৯৯ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ৪৮ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ১৭-১৮ অধ্যায়, হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব, মহাভারত, আদিপর্ব ১০৪ অধ্যায়।

(৩) মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, ১১শ শ্লোক। ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় পুরুষের ঔরসে 'সূত' জাতির উৎপত্তি হয়। অন্যান্য স্মৃতির মতও তাহাই। এই দোষ ধরিলে যদুবংশের

এবং অধিরথ "সূত" এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; নতুবা জাতিতে তিনি "ছুতার" বা "সূত্রধর" ছিলেন না। যাহাই হউক, অঙ্গরাজ্যের নাম যে রামরাজ্যেরও পূর্ব হইতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মগধরাজ্য এবং তাহার বসুবংশীয় সম্রাটগণের তত্ত্ব রামায়ণের বালকাণ্ডেই পাওয়া যায়।

বঙ্গ-রাজ, সুহ্মরাজ, কলিঙ্গরাজ এবং পুণ্ড্রাজ সম্বন্ধে ও পৌরাণিক সংবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। মহাভারতের যুদ্ধের অনেক পূর্বে, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেরও অগ্রে মগধরাজ জরাসন্ধ প্রাচ্য জনপদসমূহের সম্রাট্ ছিলেন এবং অঙ্গ বঙ্গাদি দেশের নরপতিগণ তাঁহার সহায় বা মিত্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সাধারণতঃ কৃষ্ণদ্বেষী থাকিলেও, কৃষ্ণের মাতুল কংসের শ্বশুর মহারাজ জরাসন্ধ এবং কৃষ্ণের অন্যতম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুণ্ড্রাজ বাসুদেব [ইনিও বসুদেবের পুত্র (৪)] এই দুইজনই তাঁহার ভয়ানক শত্রু ছিলেন। প্রাগ্-জ্যোতিষাধিপ ভগদত্তও কৃষ্ণের বিপক্ষ ছিলেন;—ভগদত্তের পিতা নরক কৃষ্ণের হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ জরাসন্ধের সহিত তাৎকালীন প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য এবং দক্ষিণাত্য বহু ভূপতি একযোগে কৃষ্ণকে মথুরায় অবরোধ করেন এবং তিনি তথা হইতে অপহৃত হইয়া দক্ষিণাপথে গেলে সেখানেও উঁহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিষাদরাজ একলব্যের [ইনিও কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র (৫)] সহিত একযোগে দ্বারকানগরও অবরোধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ হস্তে পৌণ্ড্রক বসুদেব নিহত এবং একলব্য পরাস্ত হইয়া সমুদ্র

প্রথমেই এই দোষ প্রবেশ করিয়াছে, যেহেতু যদুর মাতা দেবযানী ব্রাহ্মণ শুক্রচার্যের কন্যা এবং তাঁহার পিতা যযাতি বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজা।

(৪) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী সুগন্ধীর গর্ভে "পুণ্ড্র"র (বসুদেবের) জন্ম। তিনি যদুবংশীয় হইয়াও পরে অনুবংশীয় "পুণ্ড্র"বংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। পুরাণে এরূপ এক বংশ হইতে বংশান্তরে প্রবেশেরও আরও দৃষ্টান্ত আছে। (বায়ুপুরাণ, ৯৬ অধ্যায়)।

(৫) বায়ুপুরাণের মতে বসুদেবের অন্যতমা পত্নী "বনরাজী"র গর্ভে কপিল বা একলব্যের জন্ম কিন্তু হরিবংশের মতে (হরিবংশ পর্ব) বসুদেবের তৃতীয় ভ্রাতা দেবশ্রবার পুত্র নৈষাদি একলব্য। ইনি বাল্যে নিষাদগণ কর্তৃক অপহৃত (অথবা কোন কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্ররূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।)

পথে পলায়ন এবং আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের কৌশলে জরাসন্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীমের হস্তে নিহত হইবার পরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। মাহাভারত এবং হরিবংশে এই সকল পৌরাণিকী কথার বিস্তৃত বর্ণনা আছে এবং তাহার প্রমাণ প্রয়োগ দেখান অনাবশ্যক।

বঙ্গরাজ চন্দ্রসেন এবং সমুদ্রসেন (দুই জনেই) প্রাচ্যদেশের অন্যান্য রাজগণের সহিত দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে বিবাহার্থ নিমন্ত্রিত এবং উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজসূয়ের প্রাক্কালে এই উভয় বঙ্গরাজ (সুহ্ম পুণ্ড্র, অঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং কর্বটাদি প্রাচ্যদেশের অন্যান্য রাজার সহিত) মহাবীর ভীমের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পরে মহাভারতের যুদ্ধে যে কৌরব পক্ষে যোগদান করত বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাভারতের পাঠক তাহা অবগত আছেন। মহাভারত যুদ্ধের পূর্ব্বে যে এই সকল দেশের রাজা কুলীন-ক্ষত্রিয় স্বরূপে আর্য্যবর্তের সর্বত্র পরিগৃহীত হইতেছিলেন, তৎ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মগধ সম্রাট্ জরাসন্ধ তৎকালে সূর্য এবং চন্দ্রবংশীয় যাবতীয় নৃপতির মাননীয় এবং শীর্ষস্থানীয় নেতৃরূপে পুজিত হইয়াছিলেন (৬) দেখিতে পাওয়া যায়।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম এই পাঁচজন রাজপুত্র কতকালের লোক ছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এই স্থানে দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা যে বৈদিক দীর্ঘতমা গৌতম এবং কক্ষীবান্ ঋষির সমসাময়িক তাহা দেখা গিয়াছে। সাহেবদের অনুকরণে বেদের বয়স নির্ণয় করিবার শক্তি আমাদের নাই। এই পাঁচজন রাজপুত্র যে ত্রেতাযুগাবতার রামচন্দ্রের অন্ততঃ পাঁচ সাত পুরুষ পুর্বগামী ছিলেন, তাহা রামায়ণ এবং পুরাণ গ্রন্থাবলী হইতেও জানিতে পারা যায়। বায়ু এবং মৎস্যাদি পুরাণের বয়স কত, তাহার নির্ণয় করিবার একটু চেষ্টা করা যাউক।

বৈদিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ এবং যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে "ইতিহাসঃপুরাণং" উক্ত হইয়াছে (৬)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আচার্য সনৎকুমারের

(৬) মহাভারতের সভাপর্বের অন্তর্গত রাজসূয়ারম্ভ পর্বে, রাজসূয়যজ্ঞার্থী যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ সম্রাট্ জরাসন্ধের কথা বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "রাজা জরাসন্ধ সম্প্রতি যাবতীয় সূর্য এবং চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন। প্রতাপবান্ চেদিরাজ

নিকট শিক্ষার্থী নারদ নিজ অধীত বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন যে তিনি "ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, আথর্বণ (চতুর্থবেদ), **ইতিহাস পুরাণ** (পঞ্চমবেদ), পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, এবং সর্পদেবজনবিদ্যা" অধ্যয়ন করিয়াও মনে শান্তি পান নাই এবং যাহাতে তিনি লোকের হাস্য হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন (শান্তি পাইতে পারেন) সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন। সনৎকুমার বলিলেন যে, ঐ সকল বিদ্যার (অপরা বিদ্যার) দ্বারা শান্তি পাওয়া যায় না, কেবল ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই শান্তি পাওয়া যায়; তাই তিনি শিষ্য নারদকে ব্রহ্মবিদ্যারই উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন যে আর্দ্র বা ভিজা কাঠ হইতে যেমন অগ্নির নানারূপ ধুম উঠে, সেইরূপ এই মহাভূত (ব্রহ্ম) হইতে তাঁহার নিঃশ্বাসের মত (বিনা প্রযত্নে, স্বতঃই) এই ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, আঙ্গিরস অথর্ববেদ, **ইতিহাস, পুরাণ,** বিদ্যা, উপনিষৎ সমূহ, শ্লোক, সূত্র সমূহ এবং তাহাদের ব্যাখ্যা সকল উদ্গত হইয়াছে। (৭)

শিশুপাল তাঁহার সেনাপতি; করূষাধিপতি দন্তবক্র, মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক, যবনরাজ করভ মেঘবাহন, আপনার (যুধিষ্ঠিরের) পিতৃবন্ধু ভগদত্ত, **বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাত দেশের রাজা পৌণ্ড্রকবাসুদেব,** এবং আমার শ্বশুর ভীষ্মক পূর্ব, পশ্চিম উত্তর এবং দক্ষিণের যাবতীয় রাজা (এক আমাদের পিতা ও আপনার মাতুল বসুদেব ভিন্ন) সকলেই জরাসন্ধের ভক্ত এবং তাঁহাকে সম্রাট স্বরূপে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার ভয়ে আমরা মথুরা হইতে পলায়ন করত সমুদ্রতীরস্থ দ্বারাবতীর দুর্গ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি ইত্যাদি।" সভাপর্বের ১৪শ অধ্যায় হইতে ১৯শ অধ্যায় পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(৭) "স হোবাচর্গ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদ৺ সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্য৺ রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যা৺ সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি ॥২॥" ছান্দোগ্য, সপ্তমপ্রপাঠক প্রথম খণ্ড॥ "স যথা দ্রৈন্ধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং

ইতিহাস এবং পুরাণকে শ্রীশঙ্করাচার্য অন্যান্য বেদের ব্যাকরণ শাস্ত্র অর্থাৎ বুঝাইবার শাস্ত্র বলিয়াছেন (পূর্ব পৃষ্ঠার ৭ম সংখ্যক পাদটীকা দেখুন)। আচার্যদেব এ সম্বন্ধে ব্যাসদেবেরই পদানুবর্ত্তী হইয়া স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন, নূতন কোন কথা বলেন নাই। পুরাণ এবং মহাভারত না পড়িলে বেদের অনেক স্থলের অর্থই বুঝিতে পারা যায় না। বেদব্যাস নিজেই বলিয়াছেন যে ইতিহাস এবং পুরাণ শাস্ত্র হইতে বেদার্থের তাৎপর্য বোধ করিতে হয় ; এবং অল্পবিদ্য (পুরাণ ও ইতিহাস শাস্ত্রে অজ্ঞ) ব্যক্তির নিকট হইতে বেদ ভীত হন এবং ভাবিয়া থাকেন যে 'এই ব্যক্তি আমাকে মারিবে, অর্থাৎ এই ব্যক্তি অর্থ না বুঝিয়া অনর্থ করিবে' (৮)। আমরা নিত্যই দেখিতে পাইতেছি যে বেদব্যাসের এই আশঙ্কা অমূলক নহে। পুরাণ এবং রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস শাস্ত্রে অজ্ঞ এরূপ বহু য়ুরোপীয় এবং এদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত বেদশাস্ত্রের যে কত দুর্দশা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহা বলা যায় না।

অনেকে বলেন যে উপনিষদাদি বৈদিক গ্রন্থে যে ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্রের কথা আছে, সে আমাদের আঠারো মহাপুরাণ এবং রামায়ণ মহাভারত শাস্ত্র নহে। তাঁহাদের উক্তির অনুকূলে যে কি প্রমাণ আছে, তাহা আমরা জানি না। আমাদের পুরাণ শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি

বা অরেইস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস **ইতিহাসঃ পুরাণং** বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥১০॥" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪র্থ ব্রাহ্মণ পঞ্চম অধ্যায় এবং পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়॥ এই উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়া শ্রুতিতেও ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে। আচার্যপাদ শঙ্কর ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যমুখে, উক্ত "ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমবেদং" অংশের ভাষ্যে বলিতেছেন "বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণমিত্যর্থঃ। ব্যাকরণেন হি পদবিভাগশঃ ঋগ্‌বেদাদয়োজ্ঞায়ন্তে"—অর্থাৎ বেদ সমূহের ব্যাকরণ (বুঝাইবার শাস্ত্র) হইতেছে পঞ্চমবেদ ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ শাস্ত্র।

(৮) "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ॥ ২৬৭ ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।
কার্ষ্ণং বেদমিমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্বার্থমশ্নুতে ॥ ২৬৮ ॥ আদিপর্ব, প্রথম অধ্যায়।

যে (৯) প্রত্যেক চতুর্বর্গের প্রতি দ্বাপরেই এক এক জন ঋষি চতুর্বেদ এবং পুরাণেতিহাসের সঙ্কলন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কলির অব্যবহিত পূর্বেই যে দ্বাপর যুগের অবসান হইয়াছে, ঐ দ্বাপরের শেষ ভাগে পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি বেদ এবং পুরাণেতিহাসের সঙ্কলন করিয়া নিজ শিষ্যগণকে উক্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। যুগে যুগে এইরূপ বেদ ও পুরাণেতিহাসের সঙ্কলন কর্ত্তাকে "ব্যাস" বলে এবং সেই হিসাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বর্তমান যুগের ব্যাস। ব্যাস এবং তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারাই পুরাণ ও ইতিহাস রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির সঙ্কলিত অথবা প্রচারিত বলিয়া আমাদের দেশে চিরাগত প্রবাদ অথবা ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে। পূর্বকালে মৌলিকপুরাণ একখানিই ছিল বলিয়া ব্যাসদেব সংবাদ দিয়াছেন।

সময়ের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের ফলে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় পুরাণেও নানা প্রকার অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। পাঠক মহাশয় যে কোন পুরাণ খুলিলেই তাহার পরিচয় পাইবেন। তবে আঠার পুরাণ অথবা রামায়ণ মহাভারত "নূতন" নহে। ডাক্তার উইলসন সাহেব এবং "তৎপাদানুধ্যাত" ৺অক্ষয়কুমার দত্তজ প্রমুখ লেখকেরা যে বলিয়াছিলেন যে কোন পুরাণই খৃষ্টীয় নবম অথবা দশম শতাব্দীর পূর্বগামী নহে, সে মত অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। "অত্যন্ত নবীন" বলিয়া কথিত "ভবিষ্যপুরাণ"ও খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দের প্রাচীন বলিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পৌরাণক রাপসন সাহেব মত দিয়াছেন (১০)। আমাদের কালেজে বি, এ, উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ডাক্তর ম্যাকডোনাল্ডের "সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে" স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে বর্তমান হরিবংশ সমেত লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের পূর্বেও সশরীরে বিদ্যমান্ ছিল এবং এই লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত পাঠ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে তাম্রশাসনের (দলিলের) দ্বারা ভূমিদান করা হইত। ৺বঙ্কিমবাবুর "প্রক্ষিপ্তবাদ" সম্বন্ধে অনেক কথাই আবার নূতন করিয়া লেখা উচিত। বায়ু পুরাণের উল্লেখ কেবল মহাভারতে নহে, মনুসংহিতায়ও

(৯) বায়ুপুরাণ, ৬০ ষষ্টিতম অধ্যায়। অন্যান্য মহাপুরাণেও এই সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণের ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে পুরাণ পূর্বে একই ছিল।

(১০) The Cambridge History of India, Vol. I. (1922).

আছে। মৎস্যপুরাণের উল্লেখও মহাভারতে দেখা গিয়াছে (১১)। গুণাঢ্য, ভাস, শূদ্রক কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, দণ্ডী এবং বাণভট্ট প্রমুখ মহাকবিগণ রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণকে অবলম্বন করিয়াই নিজ নিজ কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করত অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ মহাভারত এবং মনুসংহিতাদি আর্য গ্রন্থ যে পাণিনি-মুনি প্রণীত ব্যাকরণ অপেক্ষাও প্রাচীন এবং উহারা সকলেই যে খৃষ্টজন্মের বহুপূর্বকাল হইতে বিদ্যমান্ আছে, তাহা এখন দেশীয় এবং বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। উইলসন এবং ম্যাকস্‌মুলারের সমসাময়িক অনেক ভ্রান্তি চলিয়া গিয়াছে এবং সত্য স্বয়ং স্বপ্রকাশ হইতেছেন। বহুপূর্বেই বোম্বাইএর ডাক্তার মহামহোপাধ্যায় সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় পুরাণের প্রাচীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সম্প্রতি বিলাতের পণ্ডিতগণও উহা স্বীকার করিতেছেন। এদেশে অনেক পুরাতন ভুল এখনও গোল পাকাইয়া বেড়াইতেছে বটে, উহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। পাদরীরা পূর্বে বলিতেন, (গোঁড়ারা এখনও বলেন) যে খৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ পূর্বে ভগবান্ পৃথিবীর এবং আদিম নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে অদ্য হইতে ৫৯২৯ বৎসর পূর্বে পৃথিবীরই সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা পৃথিবীর কোন ঘটনাকেই খৃষ্টপূর্ব চারিসহস্র বৎসরের পূর্বে লইয়া যাইতে সাহস করেন নাই; তাই, য়ূরোপীয় খৃষ্টান, পণ্ডিতেরা ভয়ের সহিত বলিয়াছিলেন যে ঋগ্‌বেদের জন্ম খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে হইতে পারে না। যাঁহারা খৃষ্টান্ পাদরী মহাশয়দিগের এই গণনা বেদবাক্যের মত (অথবা তাহারও বড় বলিয়া) মানিতেন, তাঁহাদের নিকট আসল বেদবাণী অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আমাদের মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুযায়ী (১২) "আজ হইতে ১,৯৬,০৮,৫৩,০২৬ বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরই অদ্য হইতে ১২,০৫,৩৩,০২৬ বৎসর পূর্ব হইতে চলিতেছে" এ কথা

(১১) বায়ুপুরাণের উল্লেখ, মহাভারতীয় বনপর্ব, ১৯১তম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক, মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৪২শ শ্লোকে এবং মৎস্যপুরাণ সম্বন্ধে মহাভারতীয় বনপর্বের ১৮৭তম অধ্যায়ের ৫৭—৫৮ শ্লোকে পাওয়া যাইবে।

(১২) মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৬৪ হইতে ৮০ শ্লোক। প্রত্যেক মহাপুরাণেই এই প্রসঙ্গ আছে।

বলিলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের এদেশী শিষ্যগণ যে এই গণনাকে গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কালডিয়া এবং বাবিলোনিয়া দেশের পুরাতন ঐতিহ্যেও কুড়িলক্ষ বৎসরের প্রাচীন কথা আছে বলিয়া সাহেবেরা বিদ্রূপাত্মক উক্তি করিয়া সে সকল কথা উড়াইয়া দিয়াছেন। এই সকল উপহাসের ভয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই ;—৺বঙ্কিম বাবু ভয়ে ভয়ে মহাভারতের যুদ্ধকে খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দের অপেক্ষা অধিক পুরাতন বলিতে পারেন নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক ভূতত্ব, প্রত্নতত্ব এবং নৃতত্বশাস্ত্রের আলোচনার ফলে ক্রমশঃই পুরাতন কুসংস্কার কাটিয়া যাইতেছে। মিশরের সভ্যতা ইতঃপূর্বেই খৃষ্টজন্মের দশ সহস্র বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল এবং বড় পিরামিড্ বাইবেলের জলপ্লাবনের গল্পের সন তারিখেরও পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। নৃতত্ব বিদ্যার কল্যাণে মনুষ্যসৃষ্টির কাল ত দশ বিশলক্ষ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। পরাধীন ভারতের প্রাচীনতা ইতঃপূর্বে স্বীকৃত হয় নাই কিন্তু এক্ষণে ভারতের প্রত্নতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ সার জন মার্শাল সাহেবের শ্রীমুখ-পঙ্কজের আশীর্বাদে ভারতের সভ্যতাও কৌলীন্য-লাভ করিয়াছে (১৩)। তিনি বলিয়াছেন যে সম্প্রতি তাঁহার প্রত্নতত্ব বিভাগের কর্মচারিগণের পরিশ্রমের ফলে সিন্ধু সৌবীর এবং পঞ্চনদ প্রদেশে যে সকল প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার প্রারম্ভ প্রাগ্-ব্যাবিলিনিয়ান যুগকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে। তাঁহার মতে ভারতী সভ্যতার এইবার **খৃষ্টপূর্ব সপ্তম হইতে নবম সহস্র অব্দের ও পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইবে।**

---

(১৩) Sir John Marshall, Director General of Archaeology in India expressed great enthusiasm for the recent discoveries at Mahan-jo-Daro and Harappa. The discoveries, he believed, extend the History of Indian Civilisation to ascertainable eras of Pre-Babylonian times. The discoveries, up till now, have brought them to nine buried cities,…there may be still three or four or five more ancient cities buried under the portions which still remains un-excavated. They would bring them to some where near 7000 to 9000 B. C. The Bengalee, January 29, 1925 (Dak Edition).

আঃ কি আনন্দ ! সার জন মার্সেলের এবং মিঃ এইচ ডি, কোগান সাহেবের জয় হউক। য়ুরোপীয়গণ আমাদের গুরুর গুরু ; তাঁহাদের অনুমতি না পাইলে আমাদের কিছুই পবিত্র হয় না। এখন বোধ হয়, মহাভারতের যুদ্ধকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০০ অব্দের প্রাচীন বলিলে আর "মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। আমাদের শাস্ত্রের সর্ব্বত্র প্রমাণ রহিয়াছে যে ঐ মহাযুদ্ধ বর্ত্তমান কলির প্রারম্ভে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এবং আমাদের দেশের যে কোন প্রচলিত একখানি পঞ্জিকা খুলিলেই দেখিতে পাইব যে এই কলিযুগ অদ্য হইতে ৫০২৬ বৎসর পূর্ব্বে মাঘীপূর্ণিমার দিন হইতে প্রবৃত্ত অর্থাৎ গত ২৬শে মাঘ তারিখে নূতন ৫০২৬ কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজ পণ্ডিতগণ যখন পাঁতি দিয়াছেন যে বর্দ্ধমান-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কুড়ি কোটি বৎসর পূর্ব্বেও বড় বড় গাছ সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়াছিল, তখন ঋষিগণকে আর কেহ উপহাস করিলে ন্যায্য ও শোভন হইবে না।

ভূবিদ্যা-শাস্ত্রের কল্যাণে প্রাচীন কুসংস্কার ক্রমশঃ কেমন কাটিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিলে সত্যান্বেষিবিদ্যার্থিজনের মনে প্রকৃতই বড় আহ্লাদ হয়। গত বৎসর রাণীগঞ্জের কোন কয়লা খনির নিকটই রেলপথের পার্শ্বের খাদে একটী অতি প্রাচীন অথচ অতি বৃহৎ বৃক্ষের দীর্ঘ কাণ্ড প্রস্তরীভূত (Fossil) অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল এবং কর্তৃপক্ষ অতিশয় যত্নের সহিত ঐ গুঁড়িটি কলিকাতার যাদুঘরে লইয়া গিয়া লোকের দেখিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ভূবিদ্যা-বিৎ পণ্ডিত (এবং ভারতীয় আকর ও ভূবিদ্যাসমিতির গত বৎসরের সভাপতি) মিঃ এইচ, ডি, কোগান সাহেব সম্প্রতি বলিয়াছেন যে ভূবিদ্যা বিশারদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে আজ হইতে আনুমানিক ২০ কুড়ি কোটি বৎসর পূর্ব্বে "গণ্ডোয়ানা" মহাদেশে ঐ বৃক্ষটি জীবিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। সাহেবের উক্তি এই :—"The fossil tree recovered only last year from a railway cutting in the Gondwana formation in the Raniganj Coal-field, and now on view in the Indian Mussum. This tree was estimated by Geologists *to have lived some two hundred million years ago* on the old Gondwana Continent.........."The Bengalee, February 8, Sunday, 1922. (Dak Edition.) The Italics are ours. (লেখক)।

বেদব্যাস মহাভারতের সমসাময়িক ঋষি ; তিনি মহাভারত রচনা করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার শিষ্য বৈশাম্পায়নকে পড়াইয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রপৌত্র মহারাজ জনমেজয়ের অশ্বমেধযজ্ঞ উপলক্ষে উহা পঠিত হইয়াছিল। বায়ুপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণ জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের রাজত্বকালে প্রচারিত হইয়াছিল (১৪)। রামায়ণ মহাকাব্য মহাভারতেরও অনেক পূর্বে প্রণীত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় আসল রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণগুলি যে খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব হইতেই বিদ্যমান্ রহিয়াছে (অথবা ছিল) তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, অনেক পুরাণগ্রন্থেরই যে অঙ্গহানি ঘটিয়াছে এবং আসল ব্যাসরচিত পুরাণ এক্ষণে দুর্লভ, তাহাও আমাদের স্বীকার্য। আমরা এ সম্বন্ধে এই বলিতে চাহি যে সময়ের পরিবর্তনের নিমিত্ত পুরাণগ্রন্থের অনেক অংশ লুপ্ত, কোনও কোন অংশ পরিবর্তিত এবং তাহার সহিত পশ্চাদবর্তী কালের ঐতিহাসিক বার্তা যুক্ত বা গ্রথিত হইলেও উহাদের মধ্যস্থিত চিরাগত ঐতিহ্য-প্রবাহের প্রক্রমভঙ্গ হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণুপুরাণের ঐতিহাসিক নূতন অংশও যে খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দের (গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়) অপেক্ষা নব্যতর, তাহা বোধ করিবার কোনও কারণ নাই। পুরাণের বর্ণিত নদনদী এবং দেশ প্রদেশের বর্ণনা যে অতিশয় প্রাচীন, তাহা আমরা স্বীকার করি।

এই রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীর বর্ণিত মগধ, মিথিলা, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং কাকরূপাদি দেশগুলি সেকালে সভ্য অথবা অসভ্য ছিল। রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখিতে পাই অঙ্গদেশে লোমপাদ দশরথ রাজত্ব করিতেছিলেন এবং তিনি রামচন্দ্রের পিতা অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের সখা ছিলেন। মিথিলায় সেই সময়ে সীতার জনক মহাজ্ঞানী জনক রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রাচীন উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী রাজর্ষি জনকের স্তুতিবাদে পূর্ণ বলিলেও চলে ; তাঁহার সময়ে মিথিলা যে "সভ্য" ছিল, তাহা না বলিলেও হয়। অঙ্গরাজ দশরথের বিচক্ষণ মন্ত্রীরা রূপগুণবতী গণিকাদিগকে পাঠাইয়া বনবাসী তপস্বীযুবক ঋষ্যশৃঙ্গকে

(১৪) বায়ুপুরাণ, ৯৯তম অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ৫০ তম অধ্যায় (নামান্তর অধিসোমকৃষ্ণ)।

ভুলাইয়া আনিয়া রাজকন্যা শান্তার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া "ঘরজামাই" করিয়াছিলেন। রামায়ণের এই অংশ (১৫) পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পাওয়া যায় যে ধনজন-বেশ-বিলাসে অঙ্গরাজ্য খুবই "সভ্য" ছিল।

মহাভারতে এবং হরিবংশে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজগণের অনেক বার্তা পাওয়া যায়। এই সকল রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সভায় সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ;—ইহাদের বলবিক্রমেই পরাক্রান্ত যাদবেরা শ্রীকৃষ্ণ বলদেব কর্তৃক রক্ষিত হইয়াও পৈতৃক শূরসেন অথবা মথুরা রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতের মহাযুদ্ধেও ইঁহারা যোগদান করতঃ ক্ষাত্রবীর্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচ্যদেশ সেই সময়ে যে কত সভ্য ছিল, তাহা মহাভারত পাঠ করিলে উত্তমরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে (১৬)।

"সভ্যতা" শব্দের অর্থ কি ? যাহাতে সমাজের অধিকতর মানুষের অধিকতর "সুখ" হয়, তাহা করিতে পারাই সভ্যতার উদ্দেশ্য। এই সুখ-বৃদ্ধির মাপকাঠি অথবা মানদণ্ড হইতেছে সমাজের ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের অবস্থা। "মোক্ষ" লাভ অবশ্য চরম পুরুষার্থ অথবা তুরীয় বর্গ বটে, কিন্তু উহা সামাজিক অবস্থা অথবা সভ্যতার উপর নির্ভর করে না ; ব্যক্তিগত সাধন, ভজন ও তপস্যা অথবা চেষ্টা দ্বারাই উহা লাভ করিতে পারা যায়, সুতরাং "মোক্ষলাভের" বিষয় সাধারণ সভ্যতার অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয় না।

ধর্ম এদেশে মানব সমাজের জীবন যাত্রার মূলগ্রন্থি। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম অথবা ইষ্টাপূর্ত যাবতীয় সামাজিক মঙ্গলের অথবা সুখের নিদান, সুতরাং সভ্যতার প্রধান মানদণ্ড। পূর্ব প্রস্তাবে নির্ধারিত গৌর বঙ্গের ধর্ম-সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে,

---

(১৫) রামায়ণ, বালকাণ্ড নবম সর্গ লইতে দশম সর্গ।

(১৬) মহাভারতের আদিপর্ব, (স্বয়ংবর পর্ব) এবং সভাপর্বের দিগ্‌বিজয় পর্ব, রাজসূয়-পর্ব, এবং বিশেষতঃ ৫১ হইতে ৫৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই ৫১ অধ্যায়ে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রাজগণ কর্তৃক উপাহৃত দ্রব্যাদির বর্ণনা করিতেছেন।

রামায়ণের দশরথের সমসাময়িক মিথিলাধিপতি জনকের রাজধানী বৈদিক বিবিধ যজ্ঞের উৎসবে নিত্যই পূর্ণ থাকিত। বিখ্যাত যাজ্ঞিক ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ দশরথের জামাতা এবং রাজধানীর অধিবাসী ছিলেন সুতরাং অঙ্গরাজ্যেও বৈদিক যজ্ঞ বিধিমত চলিত, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গৌড় বঙ্গের অন্যত্র ঐ সময়ে বৈদিক ধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। মহাভারতের সময় মগধরাজ জরাসন্ধ এ দেশের সম্রাট্; মহাভারতের সভাপর্বে শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিতে পাই যে তিনি ভগবান রুদ্রের যজ্ঞ করিতেন এবং রুদ্রের নিকট একশত রাজাকে বলিদান দিবার সঙ্কল্প করিয়া ৮৬ ছিয়াশী জন রাজাকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং বাকী ১৪ চৌদ্দজনকে ধরিতে পারিলেই ঐ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের নীতি বলে ভীমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধ নিহত হওয়ায় তাঁহার ঐ ক্রুর সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ ৮৬ জন রাজাকে কারামুক্ত করত তাঁহাদিগকে যুধিষ্ঠিরের মিত্রপক্ষভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই "রাজমেধ" পশুপত যজ্ঞের কথা হইতে কালিকাপুরাণোক্ত নরবলির কথা মনে পড়ে। কালিকাপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে রাজার পক্ষে শত্রুরাজ-পুরুষ অথবা রাজপুত্রদিগকে বলি দেওয়াই শ্রেষ্ঠ কল্প। এই সংবাদ হইতে তান্ত্রিকতা এবং তাহার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত "অনার্যতা"র গোলযোগ উপস্থিত হইবে এবং গৌড়বঙ্গের অধিবাসীরা যে মূলতঃ অনার্য বা Non-Aryan তাহার বিলাতী আশঙ্কা আসিবে। রুদ্র, শিব, সূর্য্য এবং অগ্নি এবং তাঁহাদের শক্তি উমা, একানংশা, তারা কালী করালী—প্রভৃতি দেবদেবী যে বৈদিক কুলীন, পরন্তু তান্ত্রিক অনার্য (অকুলীন) নহেন, (১৭) তাহা মহীসুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুদ্রপট্টন শ্যামশাস্ত্রী বি, এ, এবং আমাদের হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত জজ সার জন উডরফ বাহাদুর প্রমুখ বিদ্বদ্‌বর্গের পরিশ্রমের ফলে সুপ্রমাণিত হইয়াছে। আমরা সে সকল প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া সময় ও স্থান গ্রহণ করি না। তান্ত্রিক-কালের রচিত ৫১ পীঠমালার মধ্যমণি-স্বরূপ কামাখ্যা পীঠ এবং তাহাদের অনেকগুলিই যে এই গৌড়বঙ্গের চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত, তাহা সকলেই জানেন। গুপ্তপ্রেস ও পি, এম বাক্‌চি প্রভৃতির পাঁজিতেও তাহাদের

---

(১৭) "আর্য" শব্দের সংস্কৃত কোষ সঙ্গত অর্থ, মহাকুল, কুলীন, সাধু, এবং সজ্জন। তন্ত্রশাস্ত্র বেদ-বিশেষ, বেদ হইতে পৃথক্ নহে।

সংবাদ ছাপা হইয়াছে। এই তান্ত্রিক পীঠমালা সতীর দেহাংশচ্ছেদ এবং সেই সকল ছিন্ন অংশের পতন স্থানের আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে। তাহার অনেক পূর্বে, যে সময় এই সতীদেহ-চ্ছেদনের আখ্যায়িকা প্রচলিত হয় নাই, এ দেশে, অষ্টোত্তর-শত পীঠের প্রসিদ্ধি ছিল। প্রাচীন মৎস্যপুরাণে (দেবীভাগবতমহাপুরাণেও) এই ১০৮ পীঠের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে আমাদের কথিত গৌড়বঙ্গে নিম্নলিখিত পীঠস্থান নির্দেশ দেখা যায়,—যথা—

বিমলা—পুরুষোত্তমে, (প্রাচীন ওড্র, বর্ত্তমান ওড়িশা দেশে)।
পাটলা—পুণ্ড্রবর্ধনে, (প্রাচীন পুণ্ড্র, বর্তমান রাজসাহী বিভাগে)।
অরোগা—বৈদ্যনাথে, (প্রাচীন সুহ্ম বা ঝাড়খণ্ড, বর্তমান সাঁওতাল পরগণা)।
কীর্তিমতী—একাম্রে, (১৮) (প্রাচীন সুহ্মের অংশ, বর্তমান ওড়িশা দেশে)।

বৈদিক পশুযাগ এই সকল প্রাচ্যভূমিতে প্রবল ছিল বলিয়াই মগধ এবং মিথিলা প্রদেশ হইতেই উহার প্রতিবাদ উত্থিত হইয়া থাকিবে। প্রাচীন ন্যায় দর্শনের সূত্রকার মহর্ষি গৌতম মিথিলা দেশেরই নিবাসী ছিলেন। তাঁহার বংশীয় বিখ্যাত চণ্ডকৌশিক মগধরাজ জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথের পূজা পাইয়াছিলেন এবং উক্ত ঋষির প্রসাদেই জরাসন্ধের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে ঐতিহ্য পাওয়া যায়। চণ্ডকৌশিককে মহর্ষি কক্ষীবানের বংশজ বলা হইয়াছে। গৌতমের পূর্ব নাম দীর্ঘতমা এবং তিনিই কক্ষীবান ঋষির (এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পাঁচ রাজপুত্রেরও) পিতা ছিলেন। প্রাচীন মিথিলা দেশেই জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এবং বৌদ্ধ মহাশ্রমণ গৌতমের জন্ম হইয়াছিল। মগধ অঙ্গ, সুহ্ম (ঝাড় খণ্ড অথবা রাঢ়) এবং গৌড়দেশে জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের যে বিশেষ প্রভাব ছিল, তাহা এক্ষণে সুপরিচিত হইয়াছে। রাঢ়ের প্রসিদ্ধ নগর "বর্ধমান।" তথায় বাস করার জন্য মহাবীরকে "বর্ধমানস্বামী" বলিত অথবা তাঁহার নাম "বর্ধমানস্বামী" হইতে ঐ নগরের নামকরণ হইয়াছিল কিনা তাহা বলা কঠিন। "বৃহৎ-সংহিতা" এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে বৌদ্ধজাতক গ্রন্থাবলীতে "বর্ধমান" জনপদের উল্লেখ

(১৮) মৎস্যপুরাণ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, দেবীভাগবতমহাপুরাণ, সপ্তমস্কন্ধ, ত্রিংশ অধ্যায়।

(বঙ্গবাসী)

আছে। গৌড়বঙ্গে জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাবের অনেক গল্প আছে। চৈনিক তীর্থযাত্রিগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতেও গৌড়বঙ্গের নানাস্থানে জৈন, বৌদ্ধ এবং বৈদিক-তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তের "বর্গভীমা" দেবী এবং কামরূপের "কামাখ্যা"ও অল্প প্রাচীনা নহে। বিখ্যাত ফ্লীটের গুপ্ত-লিপি-সংগ্রহ হইতে তান্ত্রিকদের দেব-দেবীগণের পূজার্চনার প্রভাবের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। বৈদিক-তান্ত্রিক-বৌদ্ধ-জৈনাদি ধর্মসম্প্রদায় এক বিশাল আর্য ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখাপ্রশাখা স্বরূপে যে গৃহীত হইত, তাহা বরাহ-মিহির প্রণীত "বৃহৎসংহিতা" এবং তদপেক্ষা প্রাচীন ও নবীন বহু পালী, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নানা সম্প্রদায়ের নানা পুস্তক হইতেই জানিতে পারা যাইতেছে। য়ুরোপের পণ্ডিতেরাও এখন এই তথ্য স্বীকার করিতেছেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়।

মগধের জরাসন্ধ বংশীয় রাজগণ গিরিব্রজ (রাজগৃহ, আধুনিক "রাজগির", পাটনা জেলার বেহার সবডিভিজনে) নগরে প্রায় এক সহস্র বৎসর রাজত্ব করার পর শিশুনাগ বংশ এই সাম্রাজ্য অধিকার করেন। নাগবংশীয় অজাতশত্রুর সময়ে (গৌতমবুদ্ধের জীবিত কালে) গঙ্গাতীরে পাটলিপুত্র অথবা কুসুমপুর নগরের পত্তন আরম্ভ হয় এবং তাঁহার পৌত্র অথবা প্রপৌত্র উদায়ী (উদধি, উদয়ন অথবা উদাসী) গিরিব্রজ পরিত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রেই রাজধানী করেন। নাগবংশের পর নন্দবংশ ও মৌর্যবংশ এই সাম্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। মৌর্যবংশ হইতে এখনকার "ঐতিহাসিক"—বা Historical কাল আরম্ভ হইয়াছে। মৌর্যেরা জৈন এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। মৌর্যদিগের পরে শুঙ্গ অথবা মিত্রবংশ এই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যামিত্র (পুষ্পমিত্র) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার পর কাণ্বদিগের রাজত্ব কাল। অন্ধ্ররাজগণ ও শুঙ্গ ভৃত্য বা শুঙ্গদিগের পুরোহিত বংশীয় এই কাণ্ব (কণ্ব গোত্রীয় ব্রাহ্মণ) দিগের নিকট হইতে সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং পরে উহা (খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে) গুপ্তবংশের হস্তে যায়। গুপ্তবংশীয় মহারাজ সমুদ্রগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দের বিখ্যাত গৌড়পতি শশাঙ্ক এই গুপ্তবংশেরই দায়াদ ছিলেন। শশাঙ্কের সময়ে কামরূপে ভগদত্তবংশীয় রাজা কুমার ভাস্করবর্মার অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই সময়ে কন্যোজের বর্ম বা মৌখরিদিগের আত্মীয় স্থানেশ্বরের বর্ধণ বংশীয় হর্ষ আর্যাবর্তের এবং চোল, চৌলুক্য, চোড়, চালুক্য অথবা শোলাঙ্কী বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশী

দক্ষিণাপথের চক্রবর্তিত্ব করিতেছিলেন। এ সময়েও জৈন, বৌদ্ধ এবং বৈদিক তান্ত্রিক প্রভৃতি নানা নামে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত আর্যধর্মের ভক্ত এবং অনুষ্ঠাতৃগণ বেশ আত্মীয়ভাবে পাশাপাশি বাস করিতেছিলেন। আধুনিক শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দের ন্যায় কচিৎ বৌদ্ধ-বৈদিক দ্বন্দ হইলেও দেশের সাধারণ রাজা অথবা ভূস্বামিপ্রমুখ ধনীদিগের গৃহে রামকৃষ্ণ ও শিবদুর্গার প্রতিমার সহিত বুদ্ধ এবং জিনের নানাবিধ প্রতিমা সমান রূপ ভক্তির সহিত পূজিত হইতেছিলেন। বাণভট্ট তাঁহার "হর্ষচরিতম্" এবং "কাদম্বরী" কাব্যে এ সম্বন্ধে তাৎকালীন সাম্প্রদায়িক ধার্মিক আচার ব্যবহারের সুন্দর প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

এই প্রাচ্যদেশে অর্থ এবং কাম এই দ্বিবর্গের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ কৌটিল্যের অর্থসূত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, গ্রীক মেগাস্থিনিশ, এরিয়ান ও পেরিপ্লাস-রচয়িতা এবং রোমান্ প্লিনি প্রমুখ পণ্ডিতের নামে প্রচারিত পুস্তকাবলী হইতে পাওয়া যায়। রাজনীতি অর্থনীতি এবং বাণিজ্যনীতি সেকালে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে শ্রীযুক্ত শ্যাম-শাস্ত্রী ও মিঃ জসওয়াল এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বিদ্বদ্‌বর্গের পরিশ্রমের ফলে দেশের অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। গৌড়-বঙ্গের সেই ক্ষৌম (Linen বা ছালটির কাপড়) এবং তসর-গরদ কার্পাস বস্ত্রের অথবা স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কার ইত্যাদির কাহিনী কহিয়া কিংবা সিংহপুর রাজপুত্র বিজয়সিংহ হইতে আরাম্ভ করিয়া "চম্পাই" নগরের চাঁদ সওদাগর এবং "উজাবনী" নগরের ধনপতি এবং তৎপুত্র শ্রীপতি সওদাগরের সিংহল-পাটন যাত্রার গীত গাহিয়া সময় ক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের মতে, পূর্বে জাপান হইতে পশ্চিমে মিসর পর্যন্ত সমস্ত দেশ (এবং ইন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি মহাদ্বীপ ও যবদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্রদ্বীপ সমুহ সমেত) পূর্বে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হইত; সুতরাং, মিশরীয়, ক্যাণ্ডিয়, ব্যাবিলোনীয়, মিডীয়, পারসীক, যবন চীনীয়, ও ভারত-সাগরীয় সকল সভ্যতাই মূলত মহাভারতীয়। সেইজন্য, আমাদের পক্ষে, ব্রহ্ম, শ্যাম, আনাম, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, সুমাত্রা অথবা জাপানের উপনিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পারস্য দেশে, পঞ্চনদে, পাটলিপুত্রে, গয়ায়, গৌড়ে, গান্ধারে, মথুরা, মদুরা, সিংহল, শ্যাম, সিন্ধুসৌবীর এবং যবদ্বীপে (বর-বুদারে) একই প্রকার সভ্যতার নিদর্শন পাওয়াই আমরা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। গয়ায় "মাগধ" গৌড়ে "গৌড়ীয়", একাম্রে (ভুবনেশ্বরে), কনরকে, যাজপুরে এবং পুরুষোত্তমে (পুরীতে) "উৎকলীয়" এবং দাক্ষিণাপথে

"দ্রাবিড়"—ইত্যাদি "নামকরণ" আমাদের মতে সমীচীন নহে,—উহারা সমস্তই "মহাভারতীয়।" সভ্যতার ইতিহাসে গৌড়বঙ্গ মহাভারতের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা অর্বাচীন অথবা অকুলীন নহে।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

গ্রীষ্ম।
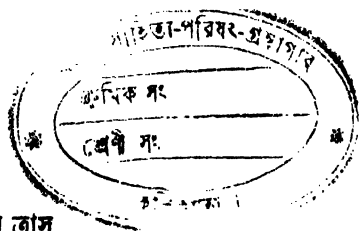
-ঃ০ঃ-

খাণ্ডবেতে পেট ভরেনি সর্ব্বনেশে ক্ষুধার ত্রাস
রুদ্র রাহুর মূর্ত্তি নিলে করবে বুঝি বিশ্বগ্রাস
ত্রিলোচনে ভষ্মঠাকুর পালিয়ে এল ধরার মাঝ্
ফাগুন সে যে মোহন সাজে অঙ্গহীনের ছদ্ম সাজ্
কার্‌সাজি তার খাট্‌বে নাকো ভাঙ্‌তে হ'ল সুখের ঘর
ধাপ্পাবাজীর খুনখরাবী অগ্নিদাহ কামেশ্বর।

পথিক যে আজ দীঘল পথে চরণ নাহি ফেলে গো
মন্ত্রমাখা বৃক্ষছায়ে বদ্ধ মায়ার জালে গো
তপ্ত ধূলি গর্জ্জে ওঠে গুমরে কাঁদে অন্তরে
দীর্ঘশ্বাসের বাত্যা যে রে সবুজ ঘাসের প্রান্তরে
ডুক্‌রে কাঁদা গভীর শোকে মহী-মায়ের আর্ত্তস্বর
আঁচরে দিল কালোমেঘের অশ্রু সজল ও-অন্তর।

অত্যাচারে শিউরে উঠে কালবোশেখী মেঘের ছাপ্
রুদ্র রবির অট্টহাসে মার্‌ল বিষাদ কালির চাপ্
সে যে করুণ মর্ম্মভেদী কালো মেঘের আর্ত্তনাদ্
বন্ধনে সে রাখ্‌তে নারে নীল আকাশে মায়ার ফাঁদ
আর্ত্তনাদে উল্লাসে গো কালোমেঘের বজ্র গান
জয়ের তরে মৃত্যু যে রে পরের লাগি আত্মদান।

আজকে এল কী ব্যথাতে রক্তমেঘের বুকের বান
অশ্রুগলা দরদখানি এ যে ধরার ব্যথার দান
তুফান ওতো নয় রে ওরে ওযে মেঘের দীঘল শ্বাস
আস্‌ছে তেড়ে জুড়িয়ে দিতে দগ্ধ ধরার বিকল ত্রাস্
ও তোর নয় জমাট জটায় গুমট্ মেঘের কোমল হাস্
ওযে তড়িৎ নৃত্য-পাগল কালবোশেখীর জয়োল্লাস।

আলোক যে আজ ডুব দিয়েছে কাজল মেঘের অন্তরে
নিঝুম ধরা তন্দ্রামাখা কালবোশেখীর মন্তরে
গ্রীষ্ম যে আজ ভীষ্মরথী মেঘের শর-শয্যাতে
বন্দীরে আজ বদ্ধ যে আজ পাণ্ডুমেঘের রাজ্যেতে
তবু কি তার মৃত্যু আছে রক্তবীজের বংশ গো
দেবকীরে নির্য্যাতিতে সে যে-ধরায় কংশ গো।

কোথায় ও রে কৃষ্ণবাদল আয় রে ছুটে আয় রে আয়
গ্রীষ্ম অসুর নিদয় করে বসুন্ধরা যায় রে যায়
এ যে করুণ এ যে কাহিল এ যে ধরার আর্ত্তনাদ
লাঞ্ছিতার ঐ ব্যথার পরে বিছিয়ে দে তোর সজল ছাদ
বক্ষ পোড়া ধরামায়ের দে-না ওরে বুকের বল
ছিটিয়ে দে তার ব্যথার পরে অতল স্নেহের শান্তিজল।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

বয়াটে।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়।

(নিরুদ্দেশে)

(এক)

তার সম্বল—পিঠের কাছে ছেঁড়া—কিন্তি ময়লা একটা গেঞ্জি, হাত ঢোলা আধ ময়লা জামাটা ; মোটা একখানা চাদর আর জোলার বোনা চারখানা গামছাখানা গুছিয়ে নিয়েই ন'ব্‌নে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিল। চটী জোড়াটা ছিল এক হাতে ;—পরম বিত্ত তার 'নোটবুক' বা 'ডায়রীর' খাতাখানাও জামার ঝোলা পকেটে পুরে নিতে ভুলে যায় নি।

নিরুদ্দেশে পথের একা পথিক ন'ব্‌নে—মণ্টুকে কাঁধে নিয়ে বাড়ীর নীচে—রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো। "নিশুতি রা'তে" ঘুমে মৌন গাঁখানির চারদিকে একটা নিঝুম স্তব্ধতা ঝিম ঝিম ক'চ্ছিল—যেন। ঘন-অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে ন'ব্‌নের গা-টা একবার ছম ছম ক'রে উঠ্‌লো। হঠাৎ মণ্টু তার কাঁধের আসনের উপর ঠিক হ'য়ে ব'সে নেবার জন্যে ন'ব্‌নের পিঠে'র এক কোণায় ডান পাটা দিয়ে একটুখানি চেপে দিলে। কিসের ভয় ?—ন'ব্‌নের বুক সাহসে সোজা—দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। চল্ মণ্টু,—আর কি—তুই আর আমি ;—চল্ ভাই,—আর দেরী কি ?—হঠাৎ আকাশ ও ধরণীর গাঢ় নীরবতাকে একটা থম্‌থমে গম্ভীর শব্দে কাঁপিয়ে তুলে—পাখীটা আবার ডেকে উঠ্‌লো—"ধুম্-ধুধুম্-ধুম্।" ন'ব্‌নে খুব লক্ষ্য ক'রে কান পেতে শুনে বুঝ্‌লে—পাখীটা বসন্তর ঘরের মট্‌কার ওপর ব'সে ডাক্‌ছে! বসন্ত ? বসন্ত কাকা ?—

বসন্তই তো আজ ন'ব্‌নেকে গাঁ-ছাড়া ক'র্‌ছে!—কাঞ্ছি আর ওর-ই তো সব কারসাজী! কাঞ্ছি শালা তো চিরকালের পাজি—কিন্তু বসন্তও ? বসন্তকাকাও কাঞ্ছির সঙ্গে যোগ দিয়ে—আজকে এই লাঞ্ছনা আর অপমানের বোঝা তার মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে—অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচ্‌কী হাস্‌লে ? বসন্ত—এতবড় সয়তান ? এর শোধ নিতে হবে—বসন্তর আজ সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো।

বসন্তর ওপর রাগ ন'ব্‌নের মাথায় উঠে তাকে হঠাৎ ক্ষেপিয়েই দিলে বুঝি! আস্তে আস্তে ন'ব্‌নে—মালাকরদের বাড়ীর বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। সে ঘরে রাতে কেউ শোয় না—সদর দরজা খোলাই থাকে। আতস-বাজীর ব্যবসা করে তারা। মাচার নীচে কলসী পোরা বারুদ তৈরী থাকে। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ঘরের এককোণা থেকে একটা নারকেলের মালা খুঁজে নিয়ে কলসী থেকে মালা ভ'রে বারুদ নিয়ে ন'ব্‌নে বেরিয়ে এল। বাঁশের অনেকগু'লো বাকারী তাদের ঘরের সাম্‌নে চেঁচে—ঘর বাঁধবার জন্যে তৈরি ক'রে রেখেছিল। জামা চাদর জুতো সব জড়িয়ে বগলতলায় চেপে—বাকারী আর বারুদের মালা এক হাতে নিয়ে—ঝোপের ধারে ধারে সরু রাস্তায়—পা টিপে টিপে গিয়ে ন'ব্‌নে বসন্তর বাড়ীতে পৌছোলো। ঘরের চারদিকে তার শুক্‌নো বনের বেড়া দে'ওয়া। বেড়ায় বাঁধা একটা বাকারীর সঙ্গে ঐ বাকারীখান ঠেসে বসিয়ে দিয়ে তার আর একটা মাথা—একটা মানুষ সমান

উঁচু করঞ্জাগাছের মাথায় রাখ্‌লে। তা'পর মালা থেকে বারুদ নিয়ে বরাবর বাকারীখানার ওপর দিয়ে বেড়া অবধি বারুদ পেতে গেল। ন'ব্‌নে জান্‌তো—বসন্তদের কাছারী ঘরে—হাঁড়ির ভেতর তুষে ধোয়ানো ঘুঁটের আগুন থাকে। আস্তে আস্তে—খুব আস্তে—ঝরা পাতার ওপর পা প'ড়ে মচ্‌মচ্‌ শব্দ যেন—না হয়—এমনিই সতর্ক সাবধান হ'য়ে ন'ব্‌নে—ঘরে গিয়ে বাঁশের চিম্‌টেয় ক'রে একটুক্‌রো আগুন নিয়ে আবার ফিরে এল! এইবার শোধ! বসন্তর অপরাধের উচিত শাস্তি—ওর ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া। করঞ্জাগাছটার সাম্‌নে দিয়েই গাঁয়ের বাইরে মাঠে বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা চ'লে গিয়েছে। ঘুঁটেখানা বারুদের ওপর দিয়েই ঐ পথে ন'ব্‌নে ছুটে পালাবে—একেবারে মাঠের মাঝখানে। আগুন জ্বলে উঠ্‌লে হৈ. চৈ ক'রে ঘুম ভেঙে উঠে লোক এই দিকেই দৌড়োবে—তাকে ধরে কে? কোনো পাপ হবে না—যে আমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র জমাতে পারে তাকে ঘর-ছাড়া কি ঘর-পোড়া ক'র্‌লেও কিছু অপরাধ হবে না—আমার! ব্যস—সোজা বিচার! ন'ব্‌নে ফুঁ দিয়ে আগুনের ওপর জ'মে ওঠা ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলে চিম্‌টের মুখ আল্‌গা ক'রে—কেবল বারুদের ওপর জ্বলন্ত আঙ্গরা-খানা—ফেল্‌বে—হঠাৎ—মণ্টুটা ডেকে উঠ্‌লো—"হুক্‌, হুক্‌, হুকক্‌ হুককু—হু-উ-উক্‌"—। সব পণ্ড ক'র্‌লে বেটা হনুমানের বাচ্চা উল্লুক, খচ্চর; বাঁদর, গাধা—উঃ—কি পাজী? মণ্টুর গালে খুব পাঁচ সাতটা থাবড়া মেরে ন'ব্‌নে তাকে কাঁধে ক'রেই মাঠের দিকে দৌড়োলো। এক্ষুনি হয়তো বসন্ত উঠে প'ড়বে যদি বারুদ দেখে—সর্ব্বনাশ! উল্লুকের ডাকতো শুনেছে—আমাকে নিশ্চয় এসে ধ'র্‌বে—সব কথা বেড়িয়ে প'ড়্‌বে!

ন'ব্‌নে এক ছুটে মাঠে পৌঁছে আবার মণ্টুর গালে চড়াতে লাগ্‌লো! আমার সঙ্গে এমন ক'রে শত্রুতা সাধ্‌লি বেটা উল্লুকের ছা। মেরেই ফেল্‌বো তোকে আজ! মার—মারের ওপর মার! মণ্টু ব্যথায় ক্যাঁ ক্যাঁ ক'রে কেঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! ন'ব্‌নে তবু মারে!—হঠাৎ এবার যেন বেচারী নেতিয়ে প'লো। "অ্যাঁ!" ন'ব্‌নে ভাব্‌লো—"না না মরে যাবে! আহ্লা!" নিমেষে ন'ব্‌নের আর রাগ নেই! "লেগেছে? বড্ড লেগেছে তোর মণ্টু!" ব'লে সর্ব্বাঙ্গে তার সমব্যথায় ন'ব্‌নে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলে। ব্যাথাটা বুঝি তারও পিঠে টাটিয়ে উঠ্‌লো, অনেকক্ষণ ধ'রে কাপড়ের আঁচল দিয়ে মণ্টুর সারা গাটা মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লো! আদর করলো—চুমো খেলো! মরিস্‌ নি মণ্টু, তুই মরিস্‌ নি ভাই—তুই আমায় ছেড়ে যাস্‌নে—তুই যে শুধু বিশ্ব সংসারে আমার একজন আপন তোকে বুকের

কাছে ক'রে আমি যেন মার কোলে—বন্ধুর বুকের পাশে শুয়ে ঘুমোই! মনে মনে এই কথা ভাব্‌তে লা্‌গলো।

এমনি খানিকটা আদরে শুশ্রূষায় মণ্টুও চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো। তাকে কাঁধে নিয়ে ন'ব্‌নে ছমছাম নিশীথের গভীর আঁধারের ভেতরই মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ের রাস্তার শেষ মাথায় এসে প'ল।

আর একটু গেলেই গাঁয়ের শেষ। দূরে গাছগুলোর মাথায় মাথায় অন্ধকার যেখানে জমাট বেঁধে কালো হ'য়ে ছিল—ন'ব্‌নে সেইদিকে তাকিয়ে অতদূর থেকেও চিন্‌লে—ওই তো রায় বাড়ীর কদমগাছ—বড় বাবুদের বাগানের মুচিকন্দ ফুলের গাছের মাথাটা পাতায় পাতায় একটা বিরাট ছাতার মত গোল হ'য়ে ছড়িয়ে ঝাঁকরা বেঁধে উঠেছে। তার মনের ভেতর একটা কান্নার কাতরতা আর্ত্ত দুঃখে গুম্‌রিয়ে উঠে বুকভাঙা ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠ্‌তে চাইল। ঐ সব গাছের তলায় তলায় নিত্য সন্ধ্যা সকালের খেলা-ধুলা যে তার বয়েসের দিনগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বড় হ'য়ে বেড়ে উঠে চিরন্তন কালের স্মৃতি-চিহ্ন ন'ব্‌নের এই কিশোর-জীবনের পরিচয়-পৃষ্ঠা কখনো লিখে দিয়েছিল। তাকে মুছে তুলে ফেল্‌বার যো নেই—কিন্তু তার গৌরব কর্‌বার অধিকার থেকেও আজ বসন্ত আর কান্তি ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে বঞ্চিত ক'র্‌লে। বসন্তর এরপর এ অন্যায়ের প্রতিশোধ কিন্তু নে'য়া হ'ল না। মণ্টুটা বাদ সাধ্‌লে! ন'ব্‌নে একটু থেমে কি যেন ভেবে দেখ্‌লে! চট্‌ ক'রে তার মাথার ভেতর থেকে একটা যেন ঝিম্‌ ঝিমে ভাব বেরিয়ে গিয়ে মাথাটা তার একেবারে হালকা পাতলা ক'রে দিল। আবার একটুখানি দাঁড়িয়ে ভেবে ন'ব্‌নে মণ্টুটাকে—দুই হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে চেপে নিয়ে বল্‌লে—"মণ্টু, বন্ধু—তুই আমার দেবতা! তুই ভগবান! উঃ—আজ কি পাপের হাত থেকে তুই আমায় বাঁচিয়েছিস্‌!—আমি কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম! কি পিশাচের কাজ আমি ক'র্‌তে গিয়েছিলাম! ছি! ছি! "ভগবান! ভগবান!" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—ন'বনে—পায় পায় এগিয়ে এসে রাস্তার শেষে দাঁড়ালো। সে একটা চৌরাস্তা। বড় রাস্তাটা সেইখান থেকেই দু'দিকে দুই সহরে চ'লে গিয়েছে। ডানধারে গেলে মহকুমায় পৌছোনো যায়—বাঁধারের রাস্তা জেলায় গিয়ে শেষ হ'য়েছে। ন'ব্‌নে দাঁড়িয়ে একবার একটুখানি ভাব্‌লে—এখন কোন্‌ পথ ধ'রে কোথায় যাবে! মণ্টুকে কাঁধ থেকে নাবিয়ে দিয়ে বল্লে—মণ্টু, কোন্‌ দিকে যাব? যা তুই এগো—যে দিকে তুই যাবি—আমিও

সই দিকেই যাবো—যা”—ব’লে মণ্টুকে একটু ঠেলা দিলে। মণ্টু বাঁধারের রাস্তায় স’রে গিয়ে দাঁড়ালো। ন’ব্‌নে ব’ল্‌লে—“বেশ তাই চল—জেলায় যাই।”

আবার মণ্টুকে কাঁধে তুলে নিয়ে নবু চ’ল্‌তে লাগ্‌লো। মাঠের ভেতর দিয়ে পথ—চারিদিকে জনপ্রাণী নেই—শুধু অনন্ত কালো অন্ধকারের ভেতর সোজা সরল ঐ রাস্তাটাও বুঝি অনন্তেরই দেশের যাত্রী। ওপরে আকাশ স্তব্ধ নীল—তার দূরান্তে বিছিয়ে যাওয়া ছায়াখানা নীচে ধানে ধানে সবুজ ক্ষেতগুলোর ওপর আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে প’রে—যেন রাতের কালোটাকে আরো গাঢ়ো ক’রে তুলেছে। একলা পথিক ন’ব্‌নে—তারা যে নিরুদ্দেশ যাত্রি,—মাথার ওপর দিয়ে পেঁচাটা চঁচিয়ে উড়ে গেল,—ন’ব্‌নের বুকটা একবার ছঁ্যাৎ ক’রে উঠ্‌লো! পথ-হারাণো হালকা হাওয়ায় আচম্বিত দোলা লেগে ধানের গাছগুলো গুচ্ছে গুচ্ছে জড়িয়ে গিয়ে সর সর শব্দ ক’রে উঠ্‌ছে—বুঝিবা একটা বুনো শুয়োর—এক গোঁয়ে এগিয়ে ছুটে আস্‌ছে;—ন’ব্‌নে চম্‌কে উঠে দু’হাত পিছিয়ে দাঁড়ালো! আবার চুপ;—চারিদিকে একটা শুধু গম্ভীর, স্তব্ধ স্থিরতা;—ন’ব্‌নে দুই হাতে মণ্টুর ঘাড়টা এঁটে, চেপে জড়িয়ে নিতেই বুকের সাহস তার দশগুণ বেড়ে উঠ্‌ছে—আবার চ’লেছে সে সোজা সুমুখ পানে। এম্‌নি ক’রে রাত শেষের তরল আবছায়া-নীলেছোপানো নীচোলখানা মুখের ওপর থেকে ক্রমশঃ সরে গিয়ে সকাল বেলার আসন্ন আলোয় দিগন্ত ফরসা হ’য়ে এল। ন’ব্‌নের আর এখন একটুও ভয় নাই—আশে পাশে গাঁয়ের ভেতর জীবন নিয়ে জেগে ওঠার সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। লাখো-হাজার পাখী একসঙ্গে কলরব ক’রে ডেকে উঠ্‌লো। ন’ব্‌নে সমানে চ’লেছে। আর বেশী রাস্তা বাকী নাই। সহরতলীর কোলাহল তার কানে এসে জানিয়ে যাচ্ছিল জেলায় সে খুবই কাছে এসে প’ড়েছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই বা তার কি সার্থকতা? তার এ যাত্রার কি শেষ ঐ সহরেই? কি জানি!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ন’ব্‌নে সহরে পৌঁছোলো। তখন হেমন্তের বেলা রক্তরাগ নিয়ে বেড়ে উঠেছে। সারা রাত্তির হেঁটে হেঁটে শ্রান্ত পা দু’খানা বিষম ভারী হ’য়ে উঠে ঝিম্ ঝিম্ ক’চ্ছিল। চঠির ভেতর অনায়াসে থাকতে অনভ্যস্ত পা দু’খানিকে সে অতি কষ্টে টেনে ফেলে তখনও চ’ল্‌ছিল। গায়ে জামা দিয়ে গলায় চাদরখানা সহরে ঢোকবার আগেই জড়িয়ে নিয়েছিল। জুতো জোড়াটা গামছা দিয়ে মুছে পরিষ্কার ক’রে নিয়েই পায় দিয়েছিল—কিন্তু জেলার রাস্তায়

লাল ফাগে সে তখনই তো আবার আপনি রঙিন হ'য়ে উঠেছে! মণ্টুকে কাঁধের আসন থেকে নাবিয়ে শিকল বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নিদ্রাহীন পথ-চলার শ্রান্তি সারা মাথায় দেহে ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠে ন'ব্নেকে একেবারে অবসন্ন ক'রে তুল্লে,—আর এগোতে পারে না—সে। পাশে—একটা বাড়ীর সাম্নে চার পাঁচটা আমগাছে কুঞ্জের মত বীথি গ'ড়ে উঠেছে, তার মাঝখানে কচি ঘাসে ছাওয়া সবুজ একখানি আঙিনা—ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা। ন'ব্নে, একটা গাছতলায় গিয়ে বিশ্রামের জন্যে ব'সলো। মণ্টুকে পাশে ব'সিয়ে শিকলগাছটা হাতে জড়িয়ে রাখ্লে।

ছুটী ছেলে চ'লেছিল—দৌড়োতে দৌড়োতে—তাদের মা পাঠিয়েছিলেন—তাড়াতাড়ি গিয়ে গরম মস্লা কিনে আন্তে। ছোট ছেলেটী হাতের তেলোয় পয়সা চারটা নাচাচ্ছিল—আর বড়টী ব'ল্তে ব'ল্তে চ'লেছিল—"Show me your head." ছোট ছেলেটী জবাব দিচ্ছিল—"তোমার মুণ্ডু দেখাও।" হঠাৎ ছোট ভাই ব'লে উঠ্লো—"দাদা দাদা, উল্লুক দ্যাখ্।"

"কই রে?" ব'লে দাঁড়িয়ে উল্লুকটা দেখেই ছু'জনে এসে ন'ব্নেকে একসঙ্গে প্রশ্ন ক'র্লে :—"এই, এ উল্লুক তোমার?"

ন'ব্নে উত্তর দলে :—"হ্যাঁ।"

"ও—ড্যাঙ্চাতে পারে?"

ন'ব্নে ব'ল্লে—"খুব পারে।"

"কই দেখি"—ব'লে— উল্লুককে নিজেই একবার মুখ ভিরকুটী ক'রে দেখিয়ে ব'ল্লে—এই উল্লুক—"দেখি, তোর ভিংচুনী দেখি।"

হেসে ন'ব্নে ব'ল্লে—"পয়সা দিতে হবে কিন্তু।"

ছোটটী ব'ল্লে—"ইঃ, বে—না তোমার উল্লুক"—হু—হু—এই উঃ—উঃ কুঃ—"ক'রে" আবার উল্লুককে ভেংচিয়ে উঠ্লো। মণ্টু লেজের পাশটা একবার চুলকিয়ে—একটুখানি খ্যা খ্যা ক'রে উঠ্লো।

পথিক ছু'এক জন উল্লুক দেখে চলার পথে হঠাৎ থেমে মজা দেখে যাচ্ছিল। লোক এসে বেশ জ'মে গেল। কিন্তু বাড়ীর যাঁরা কর্ত্তা—কি ছেলে পিলে তাঁরা ভেতরের দিকে অনেকটা দূরে ছিলেন তখনো বুঝি খপর পান নি। তাই কেউ আসেন নি। মণ্টু এতক্ষণে ন'ব্নের

ঘাড়ের ওপর চ'ড়ে— তার চুল বাছা সুরু ক'রেছিল—আর ন'ব্‌নের মনে রাজ্যের দুর্ভাবনা তার উল্লুকের গায়ের রঙের মতই মিশমিশে কালো-রেখায় একখানা ঝিলমিলি জাল বোনা জটিল ছক কেটে যাচ্ছিল।

এর ভেতর ধাঁ ক'রে এক ব্যাপার ঘ'টে গেল—ন'ব্‌নে সে রকম চিন্তা স্বপ্নেও করে নি। এই বাড়ীর বাজার সরকার—চাকরের মাথায়—সকাল বেলাই বাজার করে তরীতরকারী বোঝাই চেঙারীটা তুলে দিয়ে—চাকরের আগে আগে আস্‌ছিলেন। উল্লুক আর ন'ব্‌নেকে দেখে—খানিকটা কৌতুহল—খানিকটা মেজাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লেন—"কে হে ছোক্‌রা তুমি, কোথায় থাক! এ উল্লুক কার?

ন'ব্‌নে জবাব দেবার আগেই—তার ঘাড়ের ওপর থেকে মণ্টু এক লাফ দিয়ে উঠে—একেবারে চাকরের মাথায়—চেঙারীর ওপর। মর্ত্তমান কলা এক ছড়া চেঙারীর ধার দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। মণ্টু লাফের সঙ্গে সঙ্গে কলার ছড়াটী দুই হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে লাফিয়েই নেবে—গোটা দুই এক সঙ্গে মুখে পুরে দিলে। "করিস কি করিস কি?" ব'লে বাধা দিতে গিয়েও ন'ব্‌নে মণ্টুকে ঠেকিয়ে রাখতে পাল্লে না। চাকরটা হাঁ হাঁ হেঃ হেঃ ক'রে উঠ্‌লো। ছেলেরা আর লোকগুলো সব হাততালি দিয়ে হেসে উঠ্‌লো।

সরকার তো চ'টে—অগ্নিশর্ম্মা। গলার আওয়াজ একেবারে গাধার গানের স্বাভাবিক গা-এ চড়িয়ে তুলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"কোথাকার বকাটে বোম্বেটে ছোকরা হে তুমি—একটা উল্লুক নিয়ে এসে—এই কেলেঙ্কারী ঘটালে। এখন উপায়?"

ন'ব্‌নে জবাব দিলে—"উপায়—নিরুপায়।"

ন'ব্‌নে খুব গম্ভীর ভাবে সত্যি কথা বল্লেও—সরকার চেঁচিয়ে ব'ল্লে—"আবার ঠাট্টা করা হ'চ্ছে?—মারবো এক চড়—মুখ থেঁতো ক'রে দোব।"

ন'ব্‌নে সমানই গম্ভীর স্বরে জবাব দিলে—"তা দিলেও—"নিরুপায়।"

"আ রে এতো বড় বেলেহাজ ছেলেরে বাপু—চল তোমার মজা দেখাচ্ছি।" ব'লে সরকার ন'ব্‌নের হাত চেপে ধ'রে—চাকরটাকে ব'ল্লেন—"নিয়ে আয় ঐ উল্লুকটাকে টেনে।"

চাকর টান মারে—মণ্টু পেছন পানে চেপে বসে। আবার টান—মণ্টু একেবারে—শক্ত স্থির স্থাণুর মত। চাকর ব'ল্লেন—"আরে এ দাদা,—ইতো পাথ্থল বুঝায়,— চল। হা আও—এ শুওরোয়া!"

আবার টান—উঁহু—মণ্টু অনড়। ছেলেদের আবার হাস আর হাততালি।

সরকার হুকুম ক'র্লেন—"টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আয়।"

জোরে টেনে অনেক কষ্টে চাকরতো মণ্টুকে হিঁচড়িয়ে নিয়ে চ'ল্লেন—সরকার ন'ব্নেকে ধ'রে নিয়ে—'সদর দালানের' বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি ক'রে ব'লে উঠ্লো—"এইবার টেরটা পাওয়াচ্ছি, ছোট বাবু বেরোলেই হয়।"

চাকরটা ব'ল্লে "কেলা খানেমে বড়া মজা।"

সরকার সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে—"হ্যাঁ বড় মজা;—ব্যাটা আবার একটা উল্লুক নিয়ে ঘোরেন; এগিয়ে দাঁড়া;—এইখানে সাম্না সাম্নি দাঁড়া"—ব'লে ন'ব্নেকে জোর একটা হাঁটুর গুঁতো দিয়ে—সামনে দু'তিন ধাপ এগিয়ে দিলেন। ন'ব্নে দুঃখে একটু হেসে উঠ্লো।

চেঁচামেচি শুনে বাবুর দল—ছোটবাবু, বড়বাবু, ন-বাবু, একজন তরুণবাবু আর একটী পরিপূর্ণ কিশোর বয়সী বালা বেরিয়ে এলেন। সবাই এক সঙ্গে জিগ্গেষ ক'রলেন—"কি হ'য়েছে, হ'য়েছে কি সরকার মশাই?"

তরুণ বাবুটী খবর ক'র্লেন—"ও উল্লুকটা কোথায় পেলি—ওটা কার্রে—ছুট্টু?"

ছুট্টু জবাব দিলে—'এহি শুওরোয়াকা হোগা।" ছুট্টু ন'ব্নেকে দেখিয়ে দিলে। মণ্টু তরুণের মুখ পানে চেয়ে শুধুই যেন কেন খো খো ক'রে উঠ্লো।

সরকার, বাবুদের বুঝিয়ে দিলেন—এই ছোকরার উল্লুক—ছুট্টুর চেঙারী থেকে থাবা মেরে নিয়ে সব কলা খেয়ে ফেলেছে।

তরুণ বাবুটী ব'ল্লেন—"সব কলা খেয়েছে?—ওকে পুলীসে দিয়ে দিন্!"

মণ্টু আবার খো খো ক'রে উঠ্লো—ন'ব্নে ভাব্লো কারণ কি;—তরুণী মিষ্টি ক'রে একটু খানি মুচকী হেসে ব'ল্লেন—"কলা খেলে উল্লুক, আর পুলীসে যাবে ছোকরা!"

"হাঁ of course—অবিশ্যি—ও যে উল্লুকের ওনার—মানে মালীক।" "ভিসাস ক্যারেকটারের এমন বদ্‌খত্‌ জানোয়ার রাখে!" ব'লে তরুণ বাবুটী কিশোরীর মুখের দিকে তারিফের মত চাইলেন।

"ওনার মানে মালীক তা আমি জানি—কিন্তু পশুর খেয়ালের খেসারৎ যদি পশুর মালীকের দেয়াই আইন হয়—"

বাধা দিয়ে ছোক্‌রা বয়স বাবুটী ব'ল্লেন—"হ্যাঁ তাই আইন।"

"হতে পারে কিন্তু তা হ'লে—তোমার ক্যারেকটারের জন্যে—যদিও পুরোপুরি ভিসাস নয়—মেশো মশায়েরও—"

বড়বাবু এইবার—"থাম্‌ থাম্‌ তোরা আরম্ভ কর্‌লি কি?" ব'লে সবাইকে থামিয়ে—ন'ব্‌নের দিকে ফিরে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লেন—"এ উল্লুক তোমার?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উল্লুক কলা খেয়েছে?"

ন'ব্‌নে জবাব দেবার আগেই কিশোরীটী পাশ থেকে ব'লে উঠ্‌লো—'উল্লুক তো কলা খায়ই।"

"আঃ! কি আপদ! থাম্‌না রে বাপু!" ব'লে বড়বাবু তার শাসন ক'র্‌লেন।

ন'ব্‌নে জবাব দিল—"হ্যাঁ উল্লুক হঠাৎ লাফিয়ে উঠে থাবা মেরে কলা নিয়ে গোটা কত খেয়েছে। আমি সাবধান ক'রেও তাকে ফিরিয়ে রাখ্‌তে পারি নি। বড্ড অন্যায় হয়ে গিয়েছে। দোষ আমারই, কেন্‌ না উল্লুক রাহাজানি ক'র্‌লেও আমি উল্লুকের মালীক। অপরাধ স্বীকার ক'র্‌ছি—আমার কান দুটী ম'লে দিয়ে—দু'থাবড়া বসিয়ে ছেড়ে দিন। যা লোকসান হ'য়েছে আপনার তা তো আর উঠে লাগ্‌বে না—কেন না আমার একটা কাণা কড়িও সম্বল নেই যে কলার দাম দিয়ে দোব।"

ছোক্‌রা বাবুটি ব'ল্লেন :—"কি রকম অসভ্য হে তুমি? বল—কান ম'লে দু' ঘা বসিয়ে দয়া ক'রে ছেড়ে দিন।" মণ্টুটা হঠাৎ মুখ ভেংচিয়ে উঠ্‌লো "মণ্টু লোক চিনে" মনে মনে এই কথা ভেবে ন'ব্‌নে জবাব দিলে—"মাপ ক'র্বেন আমায়—"

"তা ব'ল্‌তে পার্‌বো না—কান ম'লে ছেড়ে দে'য়া মানে দয়া করা নয়।"

"ঠিক বলেছ Thank you"

ব'লে তরুণী ডাক্‌লেন :—"অনু, সতু, শীগ্‌গির আয় উল্লুক দেখ্‌বি তো আয়।"

বাড়ীর ছেলের দল ছুটে বেরিয়ে এসে "উল্লুক, উল্লুক, হুক্কুরে—বাঃ কেমন কালো দেখিছিস্ দাদা" ইত্যাদি বলাবলি ক'রে উল্লুককে ঘিরে দাঁড়ালো। কানু ছট্টুর হাত থেকে শেকল গাছা টেনে ছিনিয়ে নিয়ে ব'ল্লে—"এই ছট্টু—যা তুই বাজার নিয়ে ভেতরে যা—উল্লুক আমার কাছে থাক্‌বে।"

সতু বড় বাবুর ভুঁড়িটার হাত বোলাতে বোলাতে আবদার ধ'ল্লে—"জ্যাঠা মশাই, হুক্কুটা আমার দাও ;—আমি ওটা নোব।"

বড়বাবু ব'ল্লেন—আচ্ছা আচ্ছা হবে,—দাঁড়া দেখ্‌ছি।" তা'পর ন'বনেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি এখানে কোথায় থাক ?"

"কোথায়ও না—আজই আমি—এই সকালেই—এখানে এসেছি, বোধ হয় রাস্তায়ই সারাদিন থাক্‌তে হবে—রাত্তিরের কথা তো ভাবিই নি।"

ছোক্‌রা বাবুটী ব'লে উঠ্‌লেন :—"তার মানে ?—তুমি চোর না গুণ্ডা ?"

"দুটোর কোনোটাই না—কেউ নেই আমার ; গাঁ-য় থাক্‌তে না পেরে সহরে এসেছি।"

ছোটবাবু খুব বাঁকা দৃষ্টিতে ন'ব্‌নের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কি করতে এসেছ ?"

"তা জানি নে।"

বড় বাবু ব'ল্লেন—"তোমার তা হ'লে এখানে কেউ আত্মীয় নেই ?"

"আজ্ঞে না।"

"লেখা পড়া কিছু জান ?"

"Royal Reader III"—বানান মানে মুখস্থ ;—"বোধোদয়" আর "চারুপাঠ" প'ড়েছি। চারুপাঠ অনেক জায়গার বুঝি নে—বোধোদয় বেশ বুঝি—রবিবাবুর কৈশোরক প'ড়েছি।"

ছোক্‌রা জিজ্ঞেস করলেন :—"আর ম্যাথেমেটিক্স—মানে অঙ্ক ?

"মিশ্র ভাগ, লঘুকরণ।"

ছেলেরা আবার বল্লে :—"জ্যাঠা মশাই, উল্লুকটা আমরা নোব।"

বড় বাবু একটু ভেবে—ন'ব্‌নেকে ব'ল্লেন :—"দেখ হে, তোমার যখন এখানে কোথায়ও থাক্‌বার জায়গা নেই,—কি করবে তাও জান না—তখন বরং আমার এখানেই তুমি থাক ; এই ছেলেদের একটু পড়াবে টড়াবে,— ওদের সঙ্গে উল্লুক নিয়ে খেলা ক'র্‌বে।"

ছোট বাবু ভয়ানক প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লেন—"আপনার যেমন কাজ নেই—বিবেচনা নেই যেই আসুক থাক আমার বাড়ী! আর উল্লুক নিয়ে খেলা ক'রে যে ওরা শুদ্ধ উল্লুক হ'য়ে দাঁড়াবে।"

"হ্যাঁ—এমনিই তো ছোঁড়াগুলো উল্লুক: হ'য়ে উঠেছে"—ব'লে ছোকরা বাবু ছোট বাবুর মুখের পানে চাইলে।

তরুণী ব'ল্লেন :—"অন্ততঃ তাদের দাদা বাবুটী তো উল্লুক হ'য়েইছেন বটে।"

"দেখ্ মারবো কিন্তু লক্ষীছাড়া মেয়ে অনেকক্ষণ থেকে যা ইচ্ছে তাই ব'লে যাচ্ছিস" ; ব'লে ছোকরা চোখ বেঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে তর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লেন।

তরুণী হেসে ব'ল্লেন—"আরে উল্লুকের বাকী কি,—গ্রাউনিং অ্যাণ্ড হাউলিং।"

বড় বাবু "আঃ হাঃ আরে তোদের নিয়ে যে কি করি" ব'লে ন'ব্‌নেকে সরাসরি হুকুম দিয়ে দিলেন—"না, হে ছোক্‌রা, ওদের কারো কথা তোমার শোন্‌বার দরকার নেই,—ঐ বাইরের ডিস্‌পেন্‌সারী ঘরে তুমি থাক্‌বে কিন্তু উল্লুকটাকে দেখে শুনে রেখো।"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে "আমার পেট কিন্তু দুটো।"

"হ্যাঁ একটা তোমার আর একটা তোমার উল্লুকের,—তা মেশো মশাই জানেন" ব'লে তরুণী হেসে ভেতর চ'লে গেল।

ন'ব্‌নে অনাহুত এখানে এই অপরিচিত গৃহে অযাচিত আশ্রয় পেয়ে মনে মনে ভগবানকে প্রাণভরে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলো না। সরকার মশাই তাকে ডিস্‌পেনসারীতে নিয়ে গেলেন। ছোক্‌রা বাবুটী পেছনে পেছনে ছুটে এসে ব'ল্লে—ওহে ছোক্‌রা—মামা বাবু একটা কথা ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছেন—তোমার আরও একটা কাজ ক'র্‌তে হবে বুঝ্‌লে ?"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"বুঝ্‌লাম না তো।"

"আমি যখন শিকারে যাব আমার বন্দুক টন্দুক ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে আর "গেম"গুলো কুড়িয়ে কাঁধে ক'রে আন্‌বে।"

ন'ব্নে জবাব দিলে—"যে আজ্ঞে—সে আমি খুব পারবো—আমিও বাটুল ছুঁড়তে জানি ;—একটা বাটুল গ'ড়ে নোব—পাখী টাখী মারা যাবে।"

ন'ব্নের মনটা সত্যিই একবার আহ্লাদে নেচে উঠ্লো।

বাটুলে কি আর পাখী মারা যায় হে' ব'লে খুব গৌরবের মুখভঙ্গী ক'রে বিজ্ঞ ছোকরাটী মৃদু হেসে চ'লে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই ন'ব্নে দেখ্লে ছট্টু মহাতু তামাক ধ'রিয়ে তার "নারিয়েলমে" খুব পুটুর পুটুর টান্তে সুরু ক'রেছে। সারা রাতের পর এতক্ষণে তামাকের গন্ধটা তার কাছে যেন অমৃতের সুরভ ব'য়ে নিয়ে এল। ছট্টুর কাছ থেকে ক'ল্কেটা চেয়ে নিয়ে চোখ বুঁজে ক'ষে একটা দম দিতেই—কপালের নীচেটা একটুখানি ঢুলু ঢুলু ক'রে এলো বটে কিন্তু সকল শ্রম, তার পথ হাঁটার যা কিছু অবসাদ কোথায় নিমেষে উড়ে গেল। নিস্তেজ শিরা-ধমনীগুলোর ভেতর দিয়ে যেন একটা টাট্কা রক্তের প্রবাহ তরতরিয়ে ব'য়ে গেল।

ওদিকে অমু, সতু, কানু বাবুরা সব পড়াশুনা ভুলে মণ্টুকে নিয়ে খেল্তে লেগে গেছে—কেউ তাকে বেগুন এনে দিয়েছে খেতে—কেউবা কাছে যেতে সাহস না পেয়ে দূর থেকেই আলু কি পটল ছুঁড়ে মারতে লাগ্লো ;—মণ্টু দু' একবার খ্যাঁ খেঁ্যা শুধু ক'রে উঠ্লো—কিন্তু খামচা মার্লো না কাউকেই।

দু দশ দিনে আস্তে আস্তে ন'ব্নে এইখানেই কায়েমী রকম আস্তানা গেড়ে ব'সে গেল। তার কাজে ব্যাবহারে বাড়ীর মেয়েদের ক'ছেও সে আদর স্নেহ পেতে আরম্ভ ক'রেছে। ছোট বাবুরও ফুট ফরমাস কাজকর্ম্মটা ন'ব্নেকে দিয়ে বেশ চ'লে যায় তিনিও তার ওপর খুব খুসী। কেবল ছোক্রা বাবুটী ন'ব্নের ওপর ভারী চটা। ন'ব্নে তার ডাক শুন্লেও এড়িয়ে চ'লে যায়—গালাগাল ক'ল্লে জবাব করে না। পান চুরুট এনে দিতে ব'ল্লে অস্বীকার করে—বলে "ছেলে মানুষ, ভদ্দর লোকের ছেলে তোমার আবার চুরুট খাওয়া কেন ?"

ছোকরা বাবু বাগে পেলেই ন'ব্নের কান ম'লে দিয়ে পালায়—ন'ব্নে দয়া ক'রে সে অপমান সহ্য করে!

ছোকরাটী রোজই তার মামীকে বলে—"ও আপদ রাখা কেন! তা ও একলা নয় আবার একটা উল্লুকের বালাই নিয়ে ফেরে।"

মামী জবাব করেন—"কেন রে তোর ছোঁড়ার ওপর অমন নেক-নজর ? বেশ তো বাপু ছেলেটা ! কোন গোলমালে নেই, ছেলেদের নিয়ে পড়ার শোনায়, আপন মনে থাকে, তার ওপর তোর কেন অমন আড়ি বাদ ?"

"ওঃ তা জান না বুঝি—মামী মা,—উনি চান ন'ব্‌নে হবে ওর "কুটবর" হুকুমের ছোক্‌রা নোকর, ন'ব্‌নে তা রাজী নয়।" ব'লে বেলা মানে সেই কিশোরীটী ছোক্‌রা বাবুর মুখ পানে এমন ক'রে তাকায় যে ছোকরা তার ভেতর একরাশ সত্যি কথার সরল মানে অনেকখানি বুঝ্‌তে পারে। সে তখন থেমে যায় বটে কিন্তু ন'ব্‌নে আর বেলা দু'জনের ওপরেই রাগ তার ক্রমশঃ ঘনিয়ে জমে ওঠে। এই রকম ক'রে সে-রাগ শেষে শত্রুতায় গিয়ে দাঁড়ালো।

ন'ব্‌নে অবিশ্যি কোনো দিনও বেলার মুখের পানে চোখ তুলেও তাকায় না—কিন্তু বেলা যা তা কথায় যখন তখন ন'ব্‌নের পক্ষ হ'য়ে ছোক্‌রা বাবুর সঙ্গে লড়াই ক'রে তার কথা নিয়ে তাকে জব্দ কর্‌বার ফাঁক পেলে ছাড়ে না, এইগুলোকে ছোক্‌রা—তরুণ তরুণীর মনের পিয়াল বনে ফুলের রেণু ছড়িয়ে দিয়ে "পুষ্প ধনু"র যাদুখেলা ব'লে ভুল করে,—ওদের চোখে চোখে বুঝি রূপের নেশা লেগে—তার রঙের স্বপ্নখানা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবারই ফিকির ফাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। সে তাই ন'ব্‌নেকে বেলার সঙ্গে কথা কইতে দেখ্‌লেই ধ'ম্‌কে বার ক'রে দেয়—বেলা যদি তাকে চুলের ফিতে মাথার কাঁটা, কি ক্রোসে সুতো বা ব্লাউজের লেস এনে দিতে বলে—ছোক্‌রা শুন্‌তে পেলেই ওপর টপ্‌কা এসে প'ড়ে বলে—"না ন'ব্‌নে, ওসব তোমার আন্‌তে হবে না—ও আমি এনে দোব।"

ন'ব্‌নে মুচকী হেসে চলে যায় কিন্তু বেলাও জিদ ক'রে তার কারুর কারবারের মাল-মস্‌লা সাজ গোজের টুক টাক ন'ব্‌নেকে দিয়েই আনায়। ছোকরা বাবুটী যখন জান্‌তে পারে একটা বিস্ফোরকের বিষ জ্বালায় তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে ;—কিন্তু সাহস করে কিছু স্পষ্ট ক'রে খুলে ব'ল্‌তে পারে না। বেলা—ছোক্‌রার অকারণ অন্তর্জ্বালাটা মনে মনে উপভোগ ক'রে আপন মনেই আনন্দিত হয়। সে প্রয়োজনে শুধু নয় অপ্রয়োজনেও ন'ব্‌নেকে ডেকে হেসে, আদর ক'রে কথা বলে ;—ছোক্‌রার হৃৎপিণ্ডটার ওপর নির্ম্মম আঘাতে অলক্ষিতে বিষের বাণ হেনে যায় যেন।

তিনজনের এই মন নিয়ে টানাটানি খেলার মধ্যে ন'ব্‌নের নির্ব্বিকার জীবন মাস পাঁচ ছয় বেশ কেটে গেল। ছোকরা বাবুর ঈর্ষ্যা-জ্বালা ন'বনের বুকে কোনো জ্বালামুখী সৃষ্টি ক'রে দিতে বা আগুনের ফুল্‌কী ছড়িয়ে গিয়ে মনটাকে তার তপ্ত ক'রে তুল্‌তে পারে নি, কারণ পরের মনের খবরাখবরে ন'ব্‌নের এতটুকুও আসে যায় না—তার মনটা সে সবখানি মণ্টুকে বিলিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন ছোক্‌রাবাবু রেশমী ডোরে বেড় দেওয়া একটা সৌখীন নকাশী কাটা কাগজের বাক্সে এক পাঁজা ফুলদার লেস নিয়ে এসে—বেলাকে ডেকে ব'ল্লে—"বেলা, দেখ্—কি চমৎকার লেস নিয়ে এসেছি তোর জন্যে।"

বেলা এসে লেস দেখে—একটুখানি—ঈষৎ একটুখানি অম্‌নি—ঠোঁটের কোণায় রিশের মত লেশমাত্র লেগে থাকে—এমনি হাসি হেসে ব'ল্লে—"ও: এই লেস—ও তো আমার ঢের আছে, তা ছাড়া কাল ন'ব্‌নে যা এনে দিয়েছে পারসীদের দোকান থেকে—সে চমৎকার ;—দেখ্‌বে ?"

লহমায় জ্বলে উঠে ছোক্‌রা ব'ল্‌লে "না কক্‌খনো দেখ্‌বো না ; ন'ব্‌নে যাই এনে দিক তাই চমৎকার সব বুঝি! আচ্ছা আমি দেখে নিচ্ছি!" ব'লে রাগে গর গর ক'র্‌তে ক'র্‌তে সে বেরিয়ে গেল। বেলা হো হো ক'রে হেসে উঠে—"আশ্চয্যি যা হোক—যাচ্ছ কেন শোন—।" ব'লে ডাক্‌লো।

বাইরে থেকে রাগে ভারী গলায় জবাব শোনা গেল—"না।"

ইতিমধ্যে মণ্টুটা যেন কি খেয়ালে কোন্ ফাঁকে গিয়ে ছোক্‌রার টেবিলের ওপর উঠে বসে দোয়াতটাকে কাত ক'রে ঢেলেছেন—তা'পর—লেজ দিয়ে লেপে এক কলাহীন কালোরঙের তৈল-চিত্র এঁকে দিয়ে ব'সে ব'সে মুখ দিয়ে পেটের পাশটা চুলকোচ্ছিলো; ছোক্‌রা তো ঘরে এসে দেখেই একেবারে বোমার মত ফেটে প'ড়লো। বেলার কাছে অপমানের রাগটা ন'ব্‌নের ওপরেই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল, এখন এই উল্লুকের এমন অমানুষিক গুরু অপরাধের বোঝা তার ওপর চেপে পড়ে সব রাগ এক সঙ্গে পর্ব্বতাকার হ'য়ে ন'ব্‌নেকে পিষে থেঁতো ক'রে দেবার জন্য ছোক্‌রাকে উন্মাদের মত উত্তেজিত ক'রে তুল্‌লে। সে সজোরে মণ্টুকে টেনে মেঝেয় নামিয়ে—নালবাঁধা বুলডগী চেহারার চোঁয়াড়ী জুতো শুদ্ধু পায় উল্লুকটাকে প্রাণপণ এক লাথি মার্‌লে।—

উল্লুক খোলা দরজা দিয়ে ছিট্‌কে এসে বাইরে প'ড়ে যন্ত্রাণায় বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। ঘরে ছোক্‌রার গুলি পোরা বন্দুক তৈরিই ছিল—সে চট্ ক'রে বন্দুকটা তুলে নিয়ে "ওর উল্লুক খুন ক'রে বেটাকে তাড়াবো—উল্লুকের বুকের রক্ত বার ক'রে ওর বুকের পাঁজরা ভাঙ্‌ছি দাঁড়াও।" মনে মনে এই কথা ব'লে আর একবারও না ভেবে একটুও বুঝে না দেখে—ধাঁ ক'রে গুলি ছুড়ে দিলে দম্ ক'রে একটা আওয়াজ হ'য়ে বন্দুকের নালের মুখে খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে গেল।

ন'ব্‌নে মণ্টুর গলায় অস্বাভাবিক রকম ভয়াবহ চীৎকার শুনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আস্‌ছিল—সে এসে প'ড়তে না প'ড়তেই গুলি খেয়ে হতভাগা মণ্টুর কণ্ঠের আওয়াজ জন্মের মত বন্ধ হ'য়ে গেল ;—বাইরে ঐ থানটায় ঘাসের ওপর সে ঢ'লে প'ড়েছে—ন'ব্‌নে নিমেষে পিশাচের মত বিকট চীৎকার ক'রে লাফিয়ে গিয়ে ছোক্‌রা বাবুর ঘাড়ের টুঁটি চেপে ধ'র্‌লো ; রেলের লোহার মত শক্ত তার বজ্রমুষ্ট ছুঁড়ে—নাকে মুখে পাঁচ, সাতটা ঘুঁষি ব'সিয়ে দিলে। নাক দিয়ে ঝ'ল্‌কে ঝ'ল্‌কে রক্ত বেরিয়ে এল। ন'ব্‌নে চেঁচিয়ে ব'ল্লে—"আজ তোকেও মণ্টু যে-পথে গিয়েছে সেই পথে পাঠাবো—ডাকাত, খুনে—পাজী! পরের ওপর বাবুয়ানা ফলিয়ে নবাবী দেখাও—আমিও তোমার টুঁটি চেপে মেরে ফেলে খোদার ওপর খোদ্‌কারী ক'র্‌বো।"

ন'ব্‌নে প্রাণপণ জোরে ওর টুঁটিটা চেপে ধ'র্‌লে—একবার "ওঁয়া গাঁ" ক'রে আর তার কোনো আওয়াজ বেরোলো না ; চোখ দুটো ঢেলা ঢেলা হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছিল।

নিমেষের ভেতর এত সব কাণ্ড ঘ'টে গেল। বন্দুকের শব্দ আর কোলাহল গোলমাল শুনে বাড়ী শুদ্ধু সব লোক "কি হ'ল—কি হ'ল—কর কি—কর কি!" ব'লে সেখানে এসে ভিড় ক'রে জমা হ'য়েছিল।

বেলা দেখেই বুঝ্‌লে কি কাণ্ড ঘ'টেছে। ন'ব্‌নের হাতের শক্তি কি তা বেলা জান্‌তো—সে দেখেছে হাতের ঘুঁষি মেরে ন'ব্‌নে বিনা আয়াসে গণ্ডা গণ্ডা নারকেল ছাড়িয়ে দেয়। সে বুঝ্‌লো আর একটু থাক্‌লে—ছোক্‌রা বাবু ম'রে যাবে। তাড়াতাড়ি ছোক্‌রার হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিয়ে বেলা ন'ব্‌নেকে ব'ল্লে—"ছিঃ ন'ব্‌নে!—ছাড়।"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে,—"আজ ওকে শেষ ক'র্‌বো।"

"পিশাচ যে—পশু যে, সেই পশু মারে—মানুষ যে সে পিশাচকেও মারে না—ছেড়ে দাও ন'ব্‌নে।"

ন'ব্‌নে বেলার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ছোক্‌রাবাবুর ঘাড় ছেড়ে দিলে। আচম্বিতে যেন—বাঁধ ভেঙে বন্যার জল তার দুই চোখ ভ'রে উছ্‌লিয়ে এল। বুকের ভেতরটা টুটে ফেটে প'ড়বে—বুঝি—হাহাকার ক'রে ন'ব্‌নে কেঁদে উঠ্‌লো। নেই নেই তার যে মণ্টু নেই। চেঁচিয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে মণ্টুর বুকের যেখানটা থেকে তখনও রক্ত ঝর্‌ছিল—সেইখানটায় গিয়ে আছাড় খেয়ে প'ড়্‌লো। "মণ্টুরে ভাই,—আজ, এতদিনে তুই ছেড়ে গেলি? মা-নেই, বাপ নেই, বন্ধু নেই—ভাই স্নেই আমার যে কেউ নেই। সব ছিলি তুই আজ যে—সে তুইও নেই—মণ্টু আমার নেই"—ব'লে মরা মণ্টুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

বড় বাবু ছোক্‌রা বাবুকে ঠেলে ঘরের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে সেখান থেকে স'রে গেলেন। আর যাঁরা এসেছিলেন—তাঁরাও কেউ বিশেষ কিছু ব'ল্লেন না। বেলা গিয়ে ন'ব্‌নের হাত ধ'রে তুলে ব'ল্‌লে—ছিঃ, অমন ক'রে—কাঁদে না—ন'ব্‌নে—এস—উঠে এস।"

"উঠে কোথায় যাব?—আমার মণ্টু যে নেই"—ব'লে ন'ব্‌নে আবার কেঁদে উঠ্‌লো। বেলা তাকে বাড়ীর ভেতর টেনে নিয়ে গেল। অনেক্ষণে কষ্টটা কিছু ক'মে এলে ন'ব্‌নে উঠে নিজেই একখানা কোদাল নিয়ে গিয়ে—একটা কবর খুঁড়ে মণ্টুর শেষ সৎকার ক'র্‌লে। তার পরদিনই বেলার কাছে ভিক্ষা চেয়ে পাঁচটা টাকা নিয়ে ন'ব্‌নে সে বাড়ী ছাড়্‌লে।

বেলা ঈষৎ ভিজে-আসা চোখের পাতা দুটো সাড়ীর কোণাটা তুলে অলক্ষ্যে মুছে নিয়ে, ব'ল্‌লে—"ন'ব্‌নে কোথায় যাবে তুমি—নিরুদ্দেশে কোন্ সুদূরে?"

"সুদূরের পিয়াসী আমি—ম'র্‌তে যাচ্ছি। তবু যদি বেঁচে থাকি আপনার টাকা পাঁচটা শোধ ক'র্‌বো।" ব'লে ন'ব্‌নে মাথাটা কেন যেন নীচু ক'র্‌লে।

বেলা ব'ল্লে—"টাকা পাঠালেও নোব না"—

"ঋণের ব্যথা যে—আমার মনে খোঁচা হ'য়ে থাক্‌বে।"

"তাই থাক্"—ব'লে বেলা চ'লে গেল। ন'ব্‌নেও সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে প'ল—কারো মানা শুন্‌লে না।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মাসকাবারী।

—:*:—

বৈশাখের পয়লা খাতা মহরৎ করিয়া বাঙালী বণিকেরা হালে সাল সুরু করেন। বাঙলা মাসিকেরও অনেক ক'খানারই পয়লা পাতায় ঢোলে না হোক ডাগর হরফে দস্তুর মত সহরৎ দিয়া বৈশাখেই বছর আরম্ভ করা হয়। যথা—প্রবাসী, মানসী, বসুমতী ও বলা চলে—মাতৃমন্দির স্বাস্থ্য, সঞ্জীবনী, এডুকেশন গেজেট ইত্যাদি। কোনোখানায় বা সদর মানে মলাটের গায় চিরকুট লটকাইয়া বিজ্ঞাপন জারি করা হয়; কোনোখানায় আবার অন্দরের আবরু-আড়ালে সন পহেলার নকীব বাজিয়া উঠে। ভারতবর্ষ আগোয়া "নোটীশ" দিয়া বলিয়া দিয়াছেন—আষাঢ়ে বাদল ধারায় সদ্য স্নাত তাঁহাদের নববর্ষ আসিতেছে। বঙ্গবাণীর নূতন বৎসর ফাল্গুনে। বসুমতী কেবল বলিয়াই ছাড়েন নাই লড়াইয়ের আল্টিমেটাম বা চূড়ান্ত পত্র দিয়া তাঁহাদের ভাষায়ই বলি—মাসিক সাহিত্যের "হাইপোলাইট" অর্থাৎ "আমাজোন" রাণী সকল মাসিককে "প্রতিযোগিতার কুরুক্ষেত্রে" আহ্বান করিয়াছেন। মুখবন্ধ বাঙালীর গলাবন্ধের মত অপ্রয়োজনে জড়াইয়া উঠিতেছে সুতরাং আর না হয় তো বা শেষ মেষ ফাঁসি লাগিয়া যাইবে।

দৈনিক বা সাপ্তাহিক খবর হরকারা কেউবা "চং"-ঘুঁড়ির মতন ঢাউস-তায়ের দু দু পাঠ কাগজ জুড়িয়া কেউবা গেজেট কিম্বা ফাইলের আকারে বই গাঁথিয়া কেউ দু'একখানা হয় তো ইংরিজী পাঠশালার পড়ুয়াদের মামুলী খাতার আকারে খাতা গড়িয়া দেশের খবর ঢের বলিয়া গিয়াছেন। কথা কাহিনীও শুনাইতে ভুলেন নাই—সঞ্জীবনী তো "মুক্তার মালাই" দোলাইয়া দিয়াছেন। সে সকল অত লিখিবার আমাদের স্থানাভাব। তাই তাঁহাদের দেওয়া খবর দু'একটা তুলিয়া দিয়া এ পাঠ শেষ করি—আমাদের এইটাই আঠা ও কাঁচি বিভাগ :—

অজ্ঞাত নামা দাতা—কোন ব্যক্তি কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল স্কুলে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (সঞ্জীবনী)

** ** ** ** **

দেশনায়ক চিত্তরঞ্জন রসারোডের আবাস ভবন ট্রাষ্টিদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া এই কথা বলিবার সময় মহাত্মা গান্ধীর হৃদয় ভাবাবেশে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। "এখন তিনি বলেন,—আমি জানি, দেশবন্ধু তাঁহার ঐশ্বর্য্যের শেষ নিদর্শনও হস্তচ্যুত করিতে সঙ্কল্প করিয়া রসারোডের বাটী ছাড়িয়া দিয়াছেন—আমি জানি তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য এখনও ভাল হয় নাই"—তখন তাঁহার কণ্ঠ-বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছিল। মহতের প্রতি মহতেই সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। (দৈনিক বসুমতী)

** ** ** ** **

বরিশাল হইতে প্রকাশিত "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকার বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। মফঃস্বলে এত দীর্ঘ কালের আরো কোন মাসিক বঙ্গদেশে নাই। (সঞ্জীবনী)

** ** ** ** **

নারী-শিক্ষা সমিতি জানাইতেছেন যে বড় লাট লর্ডরেডিং এবং তাঁহার পত্নী বিলাত যাত্রাকালে বিদ্যাসগর বাণীভবনের জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়ায়ছন।

(সঞ্জীবনী)

রূপলাল মল্লিকের বাড়ীর একটী নৃত্যের বর্ণনায় "লেডী হিবার বলিয়াছেন—যে নর্ত্তকীর বেশ যেন লজ্জা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহাদের পা দুখানি ছাড়া আর সকল অঙ্গই পরিচ্ছদে আবৃত। লেডী হিবার আরও বলেন যে তিনি ইংলণ্ডে বা অন্য কোথায়ও এরূপ শ্লীলতা পূর্ণ নৃত্য দেখেন নাই। (বিমান বিহারী মজুমদার বিজলী হইতে),

এই প্রাচ্য নৃত্যের আদর্শ। এই আদর্শ ছিল বলিয়াই—বেহুলার নাচে অশ্রুর বৃষ্টি নামাইয়া দেবতার হৃদয় গলাইয়া দিবার কল্পনা সম্ভব হইয়াছিল।

** ** ** ** **

চুঁচড়ার রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (এডুকেশন গেজেট)

** ** ** ** **

"প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষম শোক পাইয়াছেন। তাঁহার প্রিয় কুকুর ভেলু, কুকুর লীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং যাইবার সময় এতদিনের প্রতিপালককে দংশন করিয়া গিয়াছে।" (দৈনিক বসুমতী)

নীচের সংবাদটী মাসিক হইতেই তুলিলাম যদিও দৈনিক কাগজগুলিতেও সময় মত এ খবর বাহির হইয়াছিল। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম, এ পরীক্ষার যাঁহারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদান করিয়াছেন—তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমতী সুনীতিবালা চন্দের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীতে ভারতীয় ভাষা সমূহের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি হিন্দু সংসারের বিবাহিতা মহিলা। সমস্ত গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যে সামান্য অবসরটুকু পাইতেন সেই অবসরে পড়াশুনা করিয়া—তিনি এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।" (মাসিক বসুমতী)

"সার নীলরতন সরকার ডায়মণ্ডহারবারের নিকট নিজ পৈতৃক বাসগ্রামে একটী মধ্যম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ছাত্রদিগকে জমী দেওয়া হইবে—তাহারা তাহাতে কৃষিকার্য্য করিবার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে।" (দৈনিক বসুমতী)

বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমান বিধবার তালিকা :—

বয়স	হিন্দু-বিধবা	মুসলমান-বিধবা
১—৫	১৪৩৯	১৪০৬
৫—১০	৮৭৫১	৭৫৫৯
১০—১৫	৩৮২২৩	২২৪৮০
১৫—২০	৯৬৪৭০	৫২২৭৯
২০—২৫	১৫১০৮৬	৭২৫৯৮
২৫—৩০	২০০৭৯০	১২৪৪৬৯

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত—দৈনিক বসুমতী।)

লঘু সাহিত্য :—

জীবনের প্রতিদিনকার ছোট বড় নানা ঘটনা যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যে দানা বাঁধিয়া উঠে তাহাই লঘু সাহিত্য। হালকা হাতের পলকাটা কাজ কিন্তু তাহা হীরার জমির উপর ভাবের ভারী বুটি তুলিয়া কারু করা। মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার যে সত্য জড়-জগৎকে সচল ও সজীব করিয়া রাখিতে পারিয়াছে—লঘু-সাহিত্যের মধ্যে তাহারাই মূল-সুরের ধ্বনি 'শোনা' যাইবে—বাঁচিয়া থাকার মূল রাগিণীটা সে প্রকাশের মধ্যে সাড়া দিয়া উঠা চাই। যে বস্তু লইয়া লঘু সাহিত্য তাহা পুরাতন বা শাশ্বত সত্য হইতে পারে কিন্তু অভিব্যঞ্জনীয় তাহাকে অভিনব সৃষ্টি বলিয়া দেওয়া চাই। বাঙলা লঘু-সাহিত্যে কিন্তু আজকাল তেমন বস্তুর সন্ধান খুবই কম পাওয়া যায়। একই ধরণের গল্প—তাহা হালকা হইতে পারে কিন্তু হাওয়ায় উড়িয়া উঠিয়া নেহাতই হাঔএর মত চকিতে টুটিয়া পড়ে। গড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়া গভীর একটা কিছু—গম্ভীর কোনো বাণী—সত্য কোনো সন্ধান—তারা যেন দিয়া যাইতে পারে না।

এ মাসে দেখিলাম বড় বড় কাগজগুলিতে গল্পের দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। এ দুর্ভিক্ষ অ-পাওয়ার নয় অ-জন্মার। আমরা নাম করা ৫খানা কাগজের হিসাব লইয়াছি। যথা—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী, বঙ্গবাণী, বসুমতী ৫খানি কাগজে গল্প বাহির হইয়াছে মোট ১৬টী। তার মধ্যে চারটী তর্জ্জমা আর ১২টী মৌলিক। মৌলিক গল্পগুলি সবই যেন কেমন গোড়া আলগা মোগলাই পায়জামার মত ঢিলে ঢালা ভাব—সাকীর কাঁচুলীর মত আঁট সাঁট নিরেট নিটোল নয়। বৈরাট্যের প্রশ্নই তো করি না। প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী পথের দেখার—Premise বেশ লইয়াছেন—থিসিস্‌টী বেশ। Deductionএ আবশ্যক সিদ্ধান্তও নির্ভুল হইয়াছে। ছোট গল্পের চমৎকার বস্তু,—রেল ষ্টেশনে মিনিট কতক আলাপ সালাপ জীবনের ছোট গোটা কত মুহূর্ত্তের দশ বারটা কথা। কিন্তু বরাবর অংশটা যেন কেন সমানে জমিয়া উঠে নাই—সে কি রেলে নাকে মুখে গোঁজা তাড়াতাড়ি বলিয়া? না—মেয়েটীতো বেঞ্চের উপর বেশ কায়েমী রকমই বসিয়া গিয়াছিলেন। তবে ত্রুটি ঘটিয়াছে বোধহয় ফরমাসি তৈরি বলিয়া। ফরমাস দিয়া খাসা দৈ মেলে অবাক সন্দেশ পাওয়া যায়—পিছনে বোতাম আঁটা মনের মত কাটের ঢিলে ফিট করা ব্লাউজ কি চুড়িদার পাঞ্জাবী হয়ত তৈরি হয়। কিন্তু ফরমাসে ছোট গল্পও গড়ে না—ফরমাসি ভালবাসাও জমে না। এ দুটোর মধ্যেই

জ্ঞান কেমন মুষড়িয়া পড়ে। নায়িকাটীকে শান্তা দেবী ইচ্ছা মতন পাশ দেওয়াইয়া লইয়াছেন— তাহা অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু খানিকটা অস্বাভাবিক। রেলে উঠিয়া "শারীর স্থান" বা "অ্যানাটোমীর" নোট মিলাইতে মিলাইতে চলিলেন—ওটা "প্যাথোলজী" বা অমনি আর কিছু লিখিলে কোনো শ্রেণীর পাঠকের মনেই—ঘা মারিবার মতন বেহদ্দ হইতে পারিত না। "নিশান" স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথের "পোস্তমাস" লেখা। বিখ্যাত রুশীয় লেখক "গার্স্‌ঁ।"র অনুবাদ—চমৎকার। ভাষায়—যাদু খেলিয়া হয় তো যায় নাই—কিন্তু গল্পে আর ভাবে—অপূর্ব্ব; রক্তে রাঙানো নিশানখানা। ধনী প্রভুর অনাচার অবিচারে বিদ্রোহী বন্ধুর পাপের কালি ধুইয়া ফেলিবার জন্য দীন-মজুরের বুক ছেঁচা সে খুন—যেমন টাটকা, তেমনি লাল, তেমনি উষ্ণ। একটা অবহেলিত জীবনের—পূরাপুরি ট্র্যাজিডী কিন্তু উদার, মহান্ মহিমময়—আবার সেই বিদ্রোহীর অপরাধ স্বীকারের মধ্যে—সমাপ্তিটী কী গরীয়ান। গার্স্‌ঁ। ছিলেন—নয়া রুশীয়ার তরুণ শিল্পী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠস্থানে আমরা দেখিতে পাই— লিওনিদ্ আঁদ্রিভকে। কিন্তু তাঁহার—এ মর্য্যাদা লাভের প্রচুর সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল— গার্স্‌ঁার লেখা। বাঁচিয়া থাকিলে—টলষ্টয়ের ত্যক্ত স্থান গার্স্‌ঁাই দাবী করিয়া লইয়া দখল করিতেন—নিঃসন্দেহ। সমাজদার সাহিত্য—পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—"Garshin was an unquestionable geinus"—অর্থাৎ গার্স্‌ঁার প্রতিভার প্রশ্ন করা চলে না। কিন্তু তরুণ দিনের অরুণিমা তাঁর চোখে মুখে কাঁচা থাকিতেই অকালে "That brilliant Garshin died insane in 1888"—উন্মাদ রোগে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়ে। জুয়ানী ইংরাজীর (আইরিস) তর্জ্জমা—বাঙলা ছাঁচে ঢালিবার কি দরকার ছিল? ভারতবর্ষের "শিকারে"—তেমন কিছু বিশেষত্ব নাই বরং "রক্তের টানে" লেখার ভঙ্গীতে মুন্সীয়ানা আছে। বসুমতীর সরোজবাবুর "কোন্ পথ্"—একেবারে ত্রুটি বিহীন বলিতে পারি না। কিন্তু গল্পটী আমাদের বেশ লাগিয়াছে। বঙ্গবাণীর সাগরিক ও নাগরিক শ্রীযুক্ত নরেশ সেনের এ বয়সের খামখেয়ালী। তার মোটামুটি কথা—

"জগতে দরিদ্র-রূপে ফিরি দয়া তরে
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

অত কথা বলিয়া এইটুকু প্রমাণ করিবার কোনো দরকার ছিল না। "আলোকের ঝরণা ধারায়" মন্দ নয়।

মানসীর "সতী"—মেমের মেয়ে। সতীর দেশেও বার্থার ট্রাজিডীটা করুণ লাগিবে।—কিন্তু "কুমুদের বন্ধুর" মতন নয়। সে-ই খাঁটি ট্রাজিডী—প্রাণ হারাইয়া ট্রাজিডী নয়—প্রাণ রাখিয়া ট্রাজিডি।

মাতৃমন্দিরে—এ মাসে রুশীয়ার রাণী—পিটার দি গ্রেটের পত্নী ক্যাথারিণার জীবনের প্রথম অধ্যায়টা গল্পের আকারে দেওয়া হইয়াছে। মেয়েলী কলমের হইলেও লেখাটী অতিরিক্ত রকম পুরুষালি। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সমসাময়িক "সুরভী" পত্রিকায় বহু পূর্ব্বে এ আখ্যায়িকাটী বাহির হইয়াছিল। বাঙ্গলায় ক্যাথারিণার জীবন-কাহিনী বোধহয় সেই লেখকই প্রথম শুনাইয়াছিলেন। অন্য ছোট গল্পের কথা বিশেষ কিছু বলিবার নাই। প্রত্যাবৃত্ত উপন্যাস চলিতেছে ভালই।

উপন্যাস—এ মাসে প্রবাসীতে "নষ্টচন্দ্র" উপন্যাস আর ভারতবর্ষে ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "ওর মধ্যে পাগল কে" অনুবাদ বড় গল্প আরম্ভ হইল। আর কথানারই "পুরোণো" পড়েনের উপর টানা 'বোনা' চলিয়াছে। "নষ্টচন্দ্র" শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্লটটী পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। আরম্ভটা মন্দ হয় নাই। দুই ভাই দেখিয়া "হল্‌কেন" মনে পড়ে। আরও খানিকটা দেখিয়া বলিতে পারিব—কেমন। সৌরীনবাবুর "পিয়ারী" বেশ জমিয়া উঠিতেছে।

মামুলী নিয়মের মাসিকের বাঁধি-গৎ নানা-বিষয়িনী প্রবন্ধমালা এ মাসেও বাহির হইয়াছে। দর্শনের উপর দুইটী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শনভাগের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর অভিভাষণ—ভারতীয় দর্শনের মূল ধারা প্রবাহ। প্রবন্ধটী প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয়টী ভারতবর্ষে অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের বেদ ও বিজ্ঞান। প্রমথ বাবু "অদিতি"র কথায় বেদের হেঁয়ালী তুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—অদিতির রহস্য বুঝিতে Physicsএ কুলায় নাই Mata-physicsএ উঠিতে হইয়াছে। জগতের গোড়ার কথা যাহা চৈতন্য—"সর্ব্বব্যাপী চিৎ পদার্থ" তাহাই ultimate Reality সুতরাং প্রমথবাবু ঠিকই বলিয়াছেন—তাহাকে বুঝিতে Physicsএ কুলায় না—Meta-physicsএ

উঠিতে হয়। প্রবন্ধটী মোটের উপরে ভাল। কিন্তু আর একটু বিস্তৃত ও সরল হওয়া দরকার ছিল। পণ্ডিত বিধুশেখরও এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই ঋগ্বেদের (১০, ৩, ৮) সূক্ত তুলিয়া বলিতেছেন—"এইখানে সৃষ্টির চিন্তার সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা উদিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন দ্যুলোক, ভূলোকের সৃষ্টি পর্য্যন্তই নয়—তাহার পর আরো আছে—যিনি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিতেছেন।" এ প্রবন্ধে প্রবীণ শাস্ত্রী মহাশয় মনীষার উন্মেষ শুধু নয় জ্ঞানতত্ত্বের ক্রম-বিকাশ বা Evolutionটা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। গোড়া হইতে বিচার করিয়া বিভিন্ন জ্ঞানী-দিগের বাণী দ্বারা—পরমসত্য সে পরমার্থের সত্তা ও অস্তিত্ব যে আছেই বেশ জোর করিয়া তাহা বলিয়াছেন। অতি সারবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখায় পড়িবার যোগ্যতা ইহার আছে। ভারতবর্ষের এবার গতির চাঞ্চল্য কিছু বেশী দেখা গেল। যে কয়টী প্রবন্ধ তার সব কয়টীই প্রায় ভ্রমণবৃত্তান্ত। একটী ইতিকথার কপোতবৃত্তি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের অস্ত্রিয়া। ইহার খানিকটা ইতিহাস বাকীটুকু পথ চলার ছন্ন আভাস। তবু লেখাটায় জানিবার কথা আছে। "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক" লইয়া বড় বেশী কাসুন্দী ঘাঁটা চলিয়াছে। ও-বালাই লইয়া অত টানাটানি কেন—বাচ্চা "বিলাই"এর মত বস্তাবন্দী করিয়া একেবারে খেয়াঘাটে বিসর্জ্জন দেওয়াই ভাল। পথ চিনিয়া আর বাড়ী ফিরিতে পারিবে না।" নারী-প্রসঙ্গে ইসলাম মুহম্মদ আবদুল্লাহের এ প্রবন্ধটী প্রত্যেক হিন্দুর শুধু নয়—প্রত্যেক মুসলমানেরও পড়া উচিত। প্রবাসীতে এমাসে কল-কারখানা, ডাক্তারী হকিমী, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য রূপরেখা, স্মৃতি হদিস সব রকমের প্রবন্ধই ছাপা হইয়াছে। পঞ্চশস্যের মাঠে হঠাৎ অজন্মা দেখিলাম। আরও দু' এক মাস দেখিয়া বলিতে পারিব এ আগাছার জড় কায়েমীই মরিল কি না। কষ্টি পাথরটী চৎকার—ইহাতে সোণা শুধু নয় বোধ হয় হীরাও কষা যায়। কারখানা বাদী ও স্বাচ্ছন্দ্য বাদী—অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ। 'মহত্তর ভারত' মণীষী রামানন্দ বাবুর প্রবন্ধ—উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ খুব ভাল লাগিল কিন্তু বড় ছোট। পূজনীয়া আচার্য্য জায়া—চুম্বকে নয়—বেশ বিস্তৃত করিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমাজের গল্প আমাদের আরও কিছু শুনাইবেন বলিয়া শুধু আশা নয়—দাবী করি। মনের রোগ—ডাক্তারী কথা—ছুঁৎমার্গ সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য। রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাত্রীর ডায়রী। যিনি লিখিয়াছেন—তিনি যে বরেণ্য তাহা না বলিলেও চলে তবে যাঁহারা ছাপিয়াছেন আর যাঁহারা পড়িতেছেন তাঁহারা ধন্য—একথা বলিতেই হইবে।

আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম :—

"বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তির দিক নয়; যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক। যেখানে আলো, ছায়া, সুর যেখানে নিত্য-গীত, বর্ণ-গন্ধ, যেখানে আভাস-ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ব বাউলের এক তারার ঝঙ্কার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে, যেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ্ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্য, গানে, ছবিতে তারি জবাব দিতে দিতে পথে চলে, তেমনি তারাই গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গীতে বিষয়ী লোক আপন খাতাঞ্চিখানায় ব'সে যখন তা শোনে তখন অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে বিষয়টা কী? এতে কি আছে—এতে কী প্রমাণ করে?" নিজের মনটা যখন বৈরাগী হয় নি তখন বিশ্ব-বৈরাগীর বাণী কোনো কাজে লাগে না।"

"আনমনা গো আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর
মালাখানি আন্‌বো না।"

ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের "খৃষ্টান তীর্থরাজ পাদোহ্বা" উপভোগ্য ভ্রমণেতিহাস। ইহা কেবল যাত্রাপথের গড্ডালিকা কথা নয়—জ্ঞাতব্য হিসাবে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পাদোহ্বা ইতালী দেশের একটী পুণ্য স্থান। অবশ্য ইহা হিন্দু মতের কাশী বা মুসলমান মতে হজের মত তীর্থ নয়;—খৃষ্টানি মতে—বাবা তারকনাথ কি বৈদ্যনাথ! খানিকটা উদ্ধৃত করিলে কথাটা ভালরকম বুঝা যাইবে।

"........... খৃষ্টানদের দেবালয়গুলা আমাদের মঠ-মন্দিরের মতই উপাসকদের ভক্তির চিহ্ন-স্বরূপ বহুবিধ 'কাঞ্চনমূল্যং' পাইয়া থাকে।

মঙ্গল-কামনা করিবার জন্য ক্যাথলিক নরনারীরা আন্তোনিয়োকে পূজা করে। আন্তোনিয়োর নামে 'মানত' করা—আন্তোনিয়োর মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিতে আসা—সেই পূজারই অন্তর্গত। জার্ম্মাণদের গৃহিণীপণা সম্বন্ধে বিনয় বাবু বলিতেছেন:—

"জার্ম্মাণদের রান্নাঘরে প্রবেশ করিলে আগন্তুক মাত্রের আনন্দ হয়। দেখা যায় নুন, চিনি, ঘি চর্ব্বি, মসলা আটা, তরকারী ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিষ যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। ভাঁড়ের গায় ছাপার অক্ষরে প্রত্যেক জিনিষের নাম লেখা থাকে।

"প্রত্যেক পরিবারের গিন্নিই অতিথিকে নিজ রান্না ঘরটা দেখানো এক চরম গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকে। অত উচ্চশিক্ষিতা নারীও হেঁসেল-ঘরের রাণীরূপে নিজের কৃতীত্ব জাহির করিতে লজ্জা বোধ করে না।"

"গিন্নিদের বিদ্যালয় জার্ম্মাণীতে, অষ্ট্রিয়ায় বিশেষ ইজ্জদজনক প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বড়ঘরের মেয়েরাও হাতেকলমে গিন্নি হইতে শিখে।"

মাতৃমন্দিরের "বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী" প্রবন্ধে পুণ্যময়ীর জীবনের অনেক কথা লেখা হইয়াছে। সুন্দর। আমরা একটী তুলিয়া দিলাম।

ভগবতী দেবী অনেক সময়ে তাহাদিগকে (মাতুলালয়ের নিকটস্থ দুঃস্থ পরিবারের লোকদিগকে) আহার্য্য দিয়া সাহায্য করিতেন। ইহাতে ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সকলে রাগ করিতে পারেন মনে করিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক দিন বলিলেন "মা পরের বাড়ী থাকিয়া এরূপ করা ভাল নয় তোমার মামা রাগ করিতে পারেন"। ভগবতী দেবী তাহাতে উত্তর করিলেন "যদি তিনি কিছু বলেন তাহা হইলে তাঁহাকে একটা চরকা তৈয়ারী করাইয়া দিতে বলিব। চরকায় সুতা কাটিয়া যাহা পাইব তাহা দিয়া এই দুঃখীদের আহার্য্য কিনিয়া দিব।"

"বর্ত্তমান রুশ সাহিত্য"—শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর লেখা উনিশ শতাব্দীর শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত রুশীয় লেখকদের অতি চুম্বক পরিচয়। কথা গুলির মধ্যে বুদ্ধদেব বাবুর নিজস্ব খুব কমই আছে। "কুরু-পাটকিনের" "রুশ সাহিত্য" এবং "ফেলপ্সের" রুশীয় ঔপন্যাসিকদের উপরলিখিত রচনাবলীতে" (Essays on Russian Novelists) এ কথাগুলি সবই প্রায় বলা হইয়াছে। গার্সঁ্যার কথা ইঁহারাও উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। বুদ্ধদেব বাবুতো শুধু নামটী লিখিয়াই খালাস।

ম্যাকিসম গোরকী শক্তিশালী লেখক। তাঁহার প্রতিভা খেলিয়াছে ছোট গল্প রচনায়। বড় উপন্যাসের বেলা গোরকীর ছোট গল্পের ওস্তাদি হাতও যেন অচল। সবগুলি উপন্যাসই তাঁর বিরাট সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা। তাঁহার নাটকের মধ্যে ও লীলা শৃঙ্খলার সূত্র বাঁধন বড় শিথিল। (Lower Depths) ও এ ত্রুটি এড়াইতে পারেনাই সমালোচকরা গোরকীর কথা বলিতেছেন—কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ের মতন গোরকীর প্রতিভা যেন বিশ্বকে কেবল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিতে চায়। বুদ্ধদেব বাবু প্রবন্ধের আরম্ভে ইউরোপীয় সাহিত্যের কথায়--সঙ্ক্ষিপ্ত একটু মুখবন্ধ করিয়াছেন। মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড একখানি সিম্বলিক নাটক ঠিক মরমী কিন্তু নয়। আমাদের মতে পেলিয়াস ও মেলিসাণ্ডা মেটারলিঙ্কের শ্রেষ্ঠ রচনা—তাহার মধ্যেই মেটারলিঙ্কের নিজস্ব মরমী নীতিটার সন্ধান পুরাপুরি পাওয়া যায়। বেশী করিয়া বলিবার স্থানাভাব। বুদ্ধদেব বাবু আর একটা ভুল করিয়াছেন। জোয়ান বোয়েরে নোবেল প্রাইজ পান নাই। ক্লুট হামসুনের সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক হইলেও তাঁহার সহিত জন বোয়েরে নামোল্লেখ করা হয় না। বোয়েরে আসিতেছেন পরে। ইবসেন, বোয়ার্নসঁ, লাই এবং কিলাণ্ডের মৃত্যুতে নরওয়ে সাহিত্যের একটা যুগ শেষ হইয়া যায়। হামসুন হইতে তাহার পরের যুগ আরম্ভ—কথাকথক বলিয়া তাঁহার সহিত নামোল্লেখ করিতে হইবে—হামসুই কিস্কের। বিস্তারিত পরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। বসুমতীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বঙ্গভাষার ইতিকথায় প্রমাণ করিতেছে—আচার্য্য শুধু রাসায়নিক বা চরকা-ঋত্বিক নন্—সাহিত্য-ঐতিহাসিকও বটেন। শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষকদিগের পড়া উচিত।

"চক্রবর্ত্তী"

গ্রন্থ-পরিচয়

সখের সয়তান—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত ও ১০২।৩ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০৬ পৃষ্ঠা কাগজ ও ছাপা ভাল। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সখের সয়তানী, সখের গোয়েন্দা-কাহিনী,—তার উপর আবার যুবক-যুবতীর প্রেমের আমেজে জলুস,—চিত্তাকর্ষক। দুটী যমজ ভাই, দেখিতে ভাবভঙ্গীতে ঠিক একই রকম, একই যুবতীর জন্য পাগল,—গোলকধাঁধাঁ,—প্রেমিকারও সময়ে বুঝা দায়—কে আসল কে নকল—কে প্রেমিক কে পিশাচ! প্রতিদ্বন্দ্বী পিশাচ—ভ্রাতৃহত্যা করিতে নিজেই নিজের বাণে হত হইয়াছিল। আপদ চুকিলেও সমস্যা ঘুচে নাই, অনেক কাণ্ডকারখানার পর রহস্যের সমাধান। পরিণামে নায়কনায়িকার পরিণয়—মিলন! সুখের কথা! সময় কাটাইবার মত বইখানা বেশ। এ শ্রেণীর উপন্যাসের চরিত্র সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
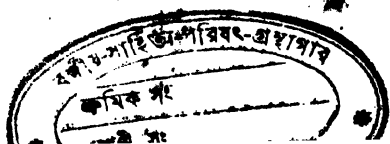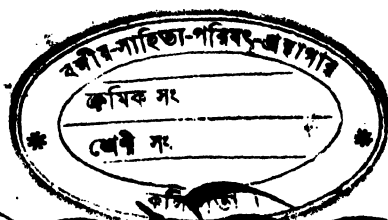
'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩৩২ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

বাণীর উদ্বোধন

-:*:-

বাণীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে আজ আমরা সকলে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাদের এই দীন-জনোচিত অর্চ্চনা সার্থক করুন।

বাণীর চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই পশ্চিম দেশীয় গর্ব্বিত কবি কিপ্লিংএর কথা। কিপ্লিং বলিয়াছেন The East is East and the West is West. এ কথা যে ভ্রান্ত তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া উহার সবটুকুই ভ্রান্ত বলিয়া ধরা অন্যায়। ধর্ম্মের মন্দিরে, পূজা-অর্চ্চনায় প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়দের যে একটা বৈশিষ্ট আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মন্দির প্রান্তে কিম্বা কোন দেব-দেবীর চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলে হিন্দুর প্রাণের এক অজানা প্রদেশে এক নূতন অস্পষ্ট প্রেরণা জাগিয়া উঠে আর হৃদয়ে অনুভূত হয় এক নূতন আনন্দ। ইহা

নিছক কল্পনা বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু তাহা অবহেলা করিতে পারে না। এই ধর্ম্মের দিকটা ফরাসী পণ্ডিত পিয়ারী লোটি বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। পবিত্র বারাণসীর নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পিয়ারী লোটি দেখিলেন হাজার হাজার নরনারী গঙ্গা-স্নানে পবিত্র দেহ হইয়া গভীর বিশ্বাস ও একাগ্রতার সহিত ভগবানের বন্দনা করিতেছে। সেই দিন হইতে পিয়ারী লোটির মনে ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর ভাবে অঙ্কিত হইল।

কিন্তু অনেক পণ্ডিতের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ধর্ম্ম ও পূজা একেবারে বাজে জিনিস। কেবল তাহাই নয়, ইহারা আমাদের পৃষ্ঠের বোঝা হইয়া, হস্তপদের বন্ধন হইয়া, প্রাচীনের সহিত আবর্জ্জনার সহিত আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে "Loaded with all the shackles of rite, ceremonial, sacred metus etc" বলিয়া উপহাস করেন তাঁহারাও যে গর্ব্ব ও অজ্ঞতার বন্ধনে পড়িয়া ভ্রান্ত দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল পূজা অর্চ্চনার মধ্যে একটি নিষ্ঠা, পবিত্রতা, সংযম ও ভক্তির ভাব আছে তাহা অন্য কোন প্রকার উপাসনার মধ্যে পাওয়া যায় না। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন—"Blessed are the pure in heart for they shall see God. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness for they shall be fulfilled." এই যে অন্তঃকরণের পবিত্রতার কথা বলা হইল, এই যে পবিত্রতার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হইল ইহা কি আমরা আমাদের পূজা অর্চ্চনায় দেখিতে পাই না? ঈশ্বরানুভূতি বা ভগবৎ প্রেমই যদি ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে আমাদের পূজা অর্চ্চনাকে ধর্ম্ম বলিলে বিশেষ অন্যায় হয় না, কারণ পূজা অর্চ্চনা ঈশ্বরানুভূতি ও ভগবৎ প্রেমের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যদি ধর্ম্মের নামে প্রতারণা করিতে বসি, কিম্বা ধর্ম্মের নামে আমরা যাহা করি তাহার মধ্যে যদি সত্যং শিবং সুন্দরম্ এই ত্রিসত্যের মূর্ত্তি দেখিতে না পাই তাহা হইলে সে প্রতারণাকে সে কার্য্যকে ধর্ম্ম বলা নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টকর। আজ আমরা এখানে যে অর্চ্চনা করিতে সমবেত হইয়াছি তাহাতে যদি আমাদের প্রাণের যোগ না থাকে, শুধু তামাসা দেখিবার নিমিত্তই যদি আমরা সমবেত হইয়া থাকি তাহা হইলে শতবার বলিব এ অর্চ্চনা অর্চ্চনা নয়, ইহা একটা বিরাট আত্মপ্রতারণা—ধর্ম্ম নামের একেবারেই অযোগ্য।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝেন না বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না তাঁহারা যে কোন পূজা দেখিয়া বলিবেন—কৈ তোমরা ত পূজা করিলে না, শুধু নাচিয়া গাহিয়া তামাসা দেখিয়া গলাবাজী করিয়া মিষ্টি মুখ করিয়া চলিয়া গেলে। পূজা যা' তা'ও করিল তোমাদের ঐ মৌন পুরোহিত—তোমাদের Agent বা প্রতিভূ। আইন আদালতে উকিল মোক্তারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মের মন্দিরে উকিল মোক্তার লইয়া আসা—এ ঘোর কলির কাজ!

এইরূপ কথা শুনিয়া বাস্তবিকই মনে হয় হয়ত আমরা বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত খেলা করিয়া তামাসা দেখিয়া নিজেকে প্রতারণা করিয়াই আসিয়াছি। কিন্তু ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় আমরা যথার্থই ধর্ম্মের পথে চলিয়াছি, অধর্ম্ম বা প্রতারণার পথে চলি নাই। বৈদিক যুগে বৈদিকছন্দে বৈদিকমন্ত্রে দেবদেবীকে আহ্বান করিয়া পূজার্চ্চনা করিবার বিধি ছিল। এখনও আছে। তেমনই অবোধ্য আরবী ভাষায় নমাজ করিবার বিধি আছে। কিন্তু বৈদিক ভাষা বা আরবী ভাষা হিন্দু মুসলমান কয়জন ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন এবং কয়জনে উহাদ্বারা সরল ভাবে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন? প্রাচীন কালে যাঁহারা পূজা করিতে সমবেত হইতেন তাঁহারা সকলেই বোধ্য ভাষায় ভগবানের জয়গান করিতেন। সেই প্রাচীনের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান দাঁড়াইয়া আছে। সেই প্রাচীনের কথা বর্ত্তমান এখনও বুকে করিয়া বসিয়া আছে। প্রাচীনকে ছাড়িয়া বর্ত্তমান টিকিতে পারে না। এই প্রাচীনের সহিত বর্ত্তমানের যে টান এই যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস আমাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছে তাহার চিহ্নই আমরা দেখিতে পাই আমাদের পূজা অর্চ্চনায়। ঐ যে মৌন পুরোহিত বৈদিক ছন্দে বৈদিক মন্ত্রে ভগবানকে আহবান করিয়া আমাদের দৃষ্টি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিক হইতে আকৃষ্ট করিয়া অতীতের দিকে ফিরাইয়া দেন তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় প্রাচীনকে সম্মান করিবার জন্য, আমরা যে অতীতের নিকট কতখানি ঋণী ও কৃতজ্ঞ তাহাই জানাইবার জন্য আমরা পূজা অর্চনা এইরূপে পুরোহিত দ্বারা করাইয়া থাকি। যে কল্পনা ভগবানের শক্তিকে মূর্ত্তিময়ী করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছিল, যে শিল্পি সেই কল্পনাকে পার্থিব বস্তুর আবরণে ঢাকিয়া মনোহর বেশে সাজাইয়া স্থান ও কালের গণ্ডির মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন আর যে ঋষি সেই কল্পনা ও মূর্ত্তিকে কবি ও শিল্পির আলয় হইতে

সাদরে লইয়া আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে ও দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈদিক সাধনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই নমস্য বরেণ্য। ইঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইবার নিমিত্ত হিন্দু এখনও পূজা করিতে মূর্ত্তি গঠন করে আর সেই মূর্ত্তিকে বৈদিক মন্ত্রে পুরোহিত দ্বারা পূজা করে আর নিজে দূরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখে কে যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। বিস্ময় ভক্তি ও আনন্দ রসে তাহার মন ভরিয়া উঠে। ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না যে দেবতা সে পূজা করিতে উপস্থিত, উহা বাস্তব না অবাস্তব, বর্ত্তমানের না অতীতের।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে ভাল পুরোহিত, পূজার উৎকৃষ্ট উপকরণ এবং সুন্দর ও যথার্থ মূর্ত্তি হইলেই পূজা অর্চ্চনা সুসম্পন্ন হয়। আর খাওয়া দাওয়া, মিলিয়া মিশিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে আনন্দ করা এবং পূজার উপকরণ সংগ্রহ করা ইত্যাদি পূজার ও ধর্ম্মের সহিত তত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট নহে। ইহা অনেকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এই জন্যই অনেক সময় পূজার প্রধান উদ্যোক্তাকে পুরোহিত বলেন, "আপনি মহাশয় এ ঘরে আসিবেন না, ঠাকুর আছেন।" অর্থাৎ পূজা করিবার অধিকার সে মহাশয় ব্যক্তির নাই, আছে কেবল মাত্র ঐ পুরোহিতের। পুরোহিত যদি মনে রাখিতেন সকলেই ভগবানের সন্তান, চিত্তশুদ্ধিই শুদ্ধি নামের যোগ্য আর ভগবানে ভক্তিই পূজার প্রধান অঙ্গ তাহা হইলে ভগবানের ভক্তকে অমন করিয়া তিনি তাড়াইয়া দিতে পারিতেন না। পুরোহিতের পূজাই যদি কেবল মাত্র পূজা হইত, ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে জন কতক ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র হিন্দু নরনারী পূজা ও ধর্ম শূন্য হইয়া পড়িত। ভগবৎ প্রীতির জন্য যাঁহারা মিলিয়া মিশিয়া আনন্দ করেন পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন তাঁহারাই মূল পূজারী, তাঁহাদের মানসিক পূজাই প্রকৃত পূজা, পুরোহিতের পূজা নাম মাত্র, উপলক্ষ মাত্র প্রাচীনের প্রতি সংযোগ স্থাপন করিবার নিমিত্ত, প্রাচীনকে সম্মান করিবার নিমিত্ত। ভগবান যদি বাক্যের সাহায্য ব্যতীত মনের ভাব না বুঝিতে পারেন তাহা হইলে তিনি কেবল মাত্র বাক্যবাগীশ মানুষের ভগবানই হইতেন, জীবজন্তুময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভগবান হইতে তিনি পারিতেন না। সেই সাহস করিয়া বলিতে পারি যাহারা মিলিয়া মিশিয়া আনন্দ করেন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন ভগাবান তাঁহাদের মনের কথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারেন এবং তাঁহাদের আন্তরিক পূজা

সদয় হইয়াই গ্রহণ করেন। সুতরাং পূজা আমরা সকলেই করি, পুরোহিতের উপর ভার দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখি না।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা হইতে আপনারা যেন না বুঝেন যে আমি পুরোহিতের নিন্দা করিতেছি বা পুরোহিতদ্বারা পূজা অর্চ্চনা করার নিন্দা করিতেছি। পুরোহিতকে নিন্দা করিতে পারে, অপরের দ্বারা পূজা অর্চ্চনা করা ভ্রান্তিজনক বলিতে পারে এমন ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা আপনারা জানেন। সে ধর্ম্মে গুরু পুরোহিতের বালাই বোধ হয় প্রথমে ছিল না, শুধু সদাচার পালন করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যাইত। কিন্তু দুই দিনের মধ্যেই বৌদ্ধগণকে পুরোহিত স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধের শরণ না লইলে ধর্ম্মের শরণ পাওয়া যাইত না। বর্ত্তমানে বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে পুরোহিতের প্রয়োজন ও আধিপত্য ষোল কলায় বিরাজিত। খৃষ্ট ধর্ম্মেও খৃষ্টের শরণ না লইলে উদ্ধার হইবার বা ধার্ম্মিক হইবার ব্যবস্থা নাই। জগতের লোক পাপী। সেই পাপের সমস্ত ফল ও কর্ম্ম নত মস্তকে বহন করিয়া যিশু নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সুতরাং যিশুর শরণ লইলেই পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবে। অন্যের সাহায্য ব্যতীত বরাবর ভগবানের নিকট যাওয়া আমাদের মত লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আধুনিক খৃষ্টীয় সমাজে ধর্ম্মকার্য্যে পুরোহিতের প্রাধান্য কোন অংশে কম নয়। মধ্য যুগে তাঁহারাই একরকম দেশের একছত্র সম্রাট ছিলেন। জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদিতে পুরোহিত না হইলে খৃষ্টানদেরও চলে না, আমাদেরও চলে না। মুসলমান ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা সেই একই প্রথা দেখিতে পাই। অবোধ্য ভাষায় নমাজ পড়িতে হয়, মোল্লার দ্বারা আজান দিতে হয়, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদিতে মোল্লা দ্বারা কোরাণ পড়াইতে হয়, মহম্মদকে খোদাতাল্লার প্রধান পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মুসলমান ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সকলকেই ব্যক্তিগত হিসাবে, প্রকাশ্য ভাবে উপাসনা করিতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এ অধিকার একহাতে প্রদান করিয়া অন্য হাতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। আপনারা জানেন অধিকাংশ মুসলমান আরবী ভাষা জানেন না, অথচ সেই ভাষায় নমাজ না পড়িলে তাহাদের উপাসনা ভগবানের নিকট ও মহম্মদের নিকট পৌছিবে না ইহাই ধারণা। আপনারা ইহাও জানেন যে মুসলমানদিগকে খলিফা স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ খৃষ্টানদের পোপের মত একজন ভগবানের প্রধান পুরোহিত স্বীকার করিতে

হয়, সুতরাং এই বিজ্ঞানের যুগে এখনও এমন ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই যাহাতে পুরোহিত প্রথা নাই বা অপরের সাহায্যে ভগবানের দ্বারে পৌছিবার নিয়ম নাই।

এই রকম পূজা অর্চ্চনা করিয়া এবং পূজার প্রধান অঙ্গকে হীন অঙ্গ বিবেচনা করিয়া আমাদের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে শাস্ত্রেই ধর্ম্ম। এ ধারণা যে কেবল আমাদেরই আছে তাহা নহে—ইহা পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যেই বিরাজিত। কোনও হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমার ধর্ম্ম কি, সে বলিবে বেদ উপনিষদ গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র। কোন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তোমার ধর্ম্ম কি সে বলিবে কোরাণ ইত্যাদি। তেমনই খৃষ্টানকে তাহার ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বাইবেল দেখাইয়া দিবে। কিন্তু প্রাচীন কালের খানকয়েক পুঁথি এবং তদানুষঙ্গিক আচরণ বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস্তবিকই ধর্ম্ম কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে অবশ্য হিন্দুকে যে শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে হয়, আর মুসলমান খৃষ্টানকে যে তাহাদের কোরাণ বাইবেল মানিয়া চলিতে হয় সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই ভাল। তথাপি প্রশ্ন উঠে এই মানিয়া চলাটাই বর্ত্তমান মানুষের ধর্ম্ম কি না ?

ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহাই বুঝি না কেন আমাদের মানিতেই হইবে যে ধর্ম্ম জিনিষটা প্রাচীনতম যুগ হইতে চলিয়া আসিলেও অশোক প্রভৃতি বড় বড় রাজা মহারাজার সাম্রাজ্যের মত নিবিয়া যায় নাই। ধর্ম্ম তাহার প্রাণ লইয়া বেশ টিকিয়া আছে। সহজ কথায় ধর্ম্ম একটা living অর্থাৎ জীবন্ত বস্তু। কিন্তু আমরা জানি জীবন মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। জীবিত যে সে চলিবেই—হয় সে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে নয় সে অবনতির দিকে গড়াইয়া যাইবে, এক যায়গায় সে কখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে না। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কেবল মাত্র অতীতের ধর্ম্ম গ্রন্থ, আচার অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। তবে ইহা সত্য যে ঐ সকল গ্রন্থ ধর্ম্মের ইতিহাসের পক্ষে অর্থাৎ History of Religionএর পক্ষে বড়ই মূল্যবান। আরও একটা কথা এই সঙ্গে উল্লেখ করা ভাল। বর্ত্তমান মানবধর্ম্ম যে প্রাচীন শাস্ত্রের ধর্ম্ম নয় একথা হইতে ইহা কখনই বুঝা উচিত নয় যে প্রাচীনকে পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানকে সম্যক বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত যে একটিকে বাদ দিয়া কোনটি বুঝা যায় না। বর্ত্তমানের গায় যথেষ্ট অতীতের ছাপ লাগান থাকে। অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে বলিয়াই বর্ত্তমান। তেমনই আবার বর্ত্তমান আছে বলিয়াই

ভূত ও ভবিষ্যৎ। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে প্রাচীন শাস্ত্রের ধার আমরা ধারি না। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে প্রাচীনকে নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান জাগিয়া থাকিলেও বর্ত্তমান ও প্রাচীন এক নয়। উহাদের মধ্যে তারতম্য যেখানে সেখানেই বর্ত্তমানের প্রাণ ও বিশিষ্টতা। যাঁহারা ধর্ম্মের কথায় প্রাচীন শাস্ত্রকে দেখাইয়া দেন তাঁহারা ধর্ম্মের এই প্রাণ ও বিশিষ্টতার প্রতি যথেষ্ট অবমাননা করেন; এবং মানুষের ক্রমবিবর্ত্তন ও মানব মনের নব নব সৃষ্টি কুশল শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গতানুগতিকতার বা অনুকরণপ্রিয়তার প্রশ্রয় দিয়া বসেন।

কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র না জানিলে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা কঠিন। সেই জন্য প্রত্যেক পূজার প্রাচীন স্বরূপ অবগত হওয়া প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই কর্ত্তব্য। কিন্তু পূজা পার্ব্বনের সংখ্যা নগণ্য নহে, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে অনুপযুক্ত সামর্থ লইয়া প্রত্যেক পূজার প্রাচীন তত্ত্ব আলোচনা করা অসম্ভব। সেই জন্য আমি এই প্রবন্ধে কেবল সরস্বতী পূজার প্রাচীন তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

আপনারা জানেন হিন্দুর প্রধান দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অথবা রুদ্র। এই ত্রিমূর্ত্তি যাহারা পৃথক বা isolated বলিয়া ভাবেন তাঁহারা সম্যক বুদ্ধিমতার পরিচয় প্রদান করেন না। জগতের দিকে নিতান্ত অবহেলায় দৃষ্টিপাত করিলে তিনটি চিরন্তন সত্য আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়। এই তিনটি সত্য হইল জন্ম বা সৃষ্টি, মৃত্যু বা সংহার এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী জীবন বা স্থিতি। খৃষ্টের জন্মিবার দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষি এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং লোক চক্ষুর সম্মুখে এই সত্য মনোহর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশ্ব-রূপের এই তিনটি মূর্ত্তি, দিক বা form দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং চিরকালের জন্য আর্য্য গাথার মধ্যে ঐ তিনটি সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিশ্বরূপ বা বিশ্বসত্যের মধ্য দিয়াই বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি বা স্বরূপ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় বা লোকের গোচরীভূত হয়। সুতরাং আর্য্য ঋষি যে এই তিন বিশ্ব সত্যকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। কিন্তু কালক্রমে যখন বৌদ্ধগণের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়া হিন্দুগণ মূর্ত্তি পূজার প্রচলন করিলেন তখন এই তিনটি সত্যের তিনটি বিভিন্ন মূর্ত্তি গঠন করিতে হিন্দুগণ বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইঁহারা যে সেই একই ভগবানের বিভিন্ন দিক তাহা আর্য্যগণও জানিতেন,

মধ্যযুগের হিন্দুগণও জানিতেন, বর্ত্তমানের হিন্দুগণও জানেন—জানেন না কেবল সেই সব পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে এখনও পুতুল পূজা বা বহুদেব পূজা বলিয়া নাক সিটকাইয়া নিন্দা করেন। পূর্ব্ব সংস্কার বা Prejudice হইতে মুক্ত হইয়া যদি হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করা যায় তাহা হইলে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দুধর্ম্ম পুতুলপূজাও নয়, বহুদেববাদও নয়, ইহা পূর্ণ একেশ্বরবাদ। ভগবানের শক্তি ব্যতীত হিন্দুর কোন দেবতাই সামান্য একটি কার্য্যও করিতে পারেন না। আমরা যেমন live, move, and have our being in God তেমনই দেবতারা live, move and have their being in God—অর্থাৎ আমরা যেমন ভগবানে প্রতিষ্ঠিত, দেবদানব যক্ষরক্ষ ইত্যাদিও ভগবানের প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা কেনোপনিষৎ পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন গল্পের মধ্য দিয়া উপনিষদ্‌কার দেখাইয়াছেন ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি কোন দেবতাই সামান্য একটি তৃণও দগ্ধ বা উত্তোলন করিতে সমর্থ নহেন অর্থাৎ ভগবান হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে সকল দেবতাই শক্তিহীন বা পদার্থশূন্য হইয়া পড়েন।

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথাই বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং যোগ চক্ষু লইয়া অর্জ্জুন বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া কহিয়াছিলেন,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।

অর্থাৎ হে দেব, আমি তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত অর্থাৎ যাহা হইয়াছে পদ্মাসনস্থিত ভগবান ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি।

এই একেশ্বর বাদ এবং তদানুষঙ্গিক সর্ব্বেশ্বরবাদ বা Pantheism কেবল যে পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষের ঋষিগণই আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে। অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণও ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। প্লেটো প্লটিনাস, স্পিনোজা বার্কালি, ফিক্‌টে হেগেল প্রভৃতি এই রসের রসিক ছিলেন। সুবিখ্যাত ইলিয়াটিক দর্শনের পুরোহিত Xenophanes, Parmenides ইয়োরোপে এই মন্ত্রের প্রথম প্রচারক। তাঁহাদের মুখ হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল "God is all eye, all ear

all thought God is everything and what we call change is but an appearance, an illusion and there is in reality neither origin nor decay. The eternal being alone exists."

Parmenides কহিয়াছেন "Being can only be conceived as eternal, immutable, infinite and unique. There is for the thinker but one single being the All-One in whom all individual differences are merged. The being that thinks and the being that is thought are the same thing."

এই যবনাচার্য্যের মুখে বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের কথা শুনিয়া সকলের বিস্মিত হইবারই কথা। যাঁহারা হিন্দুর প্রতি কার্য্যে গ্রীক সভ্যতা ও চিন্তার ধারা দেখিতে পান তাঁহাদের এই সকল culture contact ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

এই Pantheism বা সর্ব্বেশ্বরবাদ যিশুখৃষ্টও প্রচার করিয়াছেন। "I and my father are one" যিশুখৃষ্ট অনেকবারই কহিয়াছে। আর "Christ is living in every man and working suffering and being crucified through the ages" যিশুর শিষ্য প্রশিষ্যগণ অনেকবারই কহিয়াছেন। রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র ঘোষ C. I. E. কাব্যরত্ন, দর্শনশাস্ত্রী মহাশয় Calcutta Review নামক পত্রিকায় খৃষ্টধর্ম্মের Pantheistic aspect সপ্রমাণ করিয়ায়ছন।

কিন্তু বৈদেশিক দার্শনিকগণ, যথা, Martineau এই Pantheismকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মার্টিনো কহিয়াছেন "The tendency which gives rise to Pantheistic characteristics is so foreign to our prevailing English genius that it is not easy to awaken much sympathy with it or to give a clear inpression of the theory it has enacted."

এই সকল দার্শনিক Pantheism বলিলেই বুঝেন, জগৎ একেবারেই মিথ্যা বা স্বপ্ন পাপপুণ্য, ঘরবাড়ী, সংসার, সুখ দুঃখ কিছুই নাই। এই রকম Pantheism সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন এরূপ কোন দার্শনিকের সাক্ষাৎ পাওয়া এখন পর্য্যন্ত দুর্লভ। শঙ্কর-বেদান্তে আমরা যে মায়াবাদের কথা পাই, সে মায়াবাদও "জগৎ ব্রহ্মোপি" বলিয়া স্বীকার করে, জগৎকে মিথ্যা

বলিয়া উড়াইয়া দেয় না। পণ্ডিতপ্রবর কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় বেশ ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন যে শঙ্কর জগৎকে অলীক স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, জগৎ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ব্রহ্ম হইতে জগতের পৃথক সত্ত্বা নাই ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। Pantheism অর্থে উপরে সর্ব্বেশ্বরবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দটি Pantheismএর সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। Pantheismএর অর্থ all=god এবং god=all. দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আর সীতার স্বামীর মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য নাই তদ্রূপ জগৎ এবং ভগবানে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং জগতের অতিরিক্ত কোন ভগবান নাই। বেদান্তের "তৎ ত্বমসি" That thou art অর্থাৎ তুমি হও তিনি হইতে Pantheism সিদ্ধান্ত করিলে ন্যায় শাস্ত্রের আইন অবমাননা করা হয়। আপনারা জানেন "সকল মনুষ্যই মরণশীল।" এই বাক্য হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি কতকগুলি মরণশীল সত্ত্বা হয় মানুষ অর্থাৎ Some mortals are men. কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তে যদি কেউ বলেন All mortals are men তাহা হইলে আপনারা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। সেইরূপ That thou art ঘুরাইয়া ভগবান হন তুমি বলা অন্যায়। বেদান্তের এই তৎ অর্থাৎ that অসীম, অনন্ত, কিন্তু তুমি সসীম। যদি তৎ বা thatকে ত্বম বা thouএর মত সসীম ধরা হয় তাহা হইলেই উহা হইতে Pantheism পাওয়া যায়। কিন্তু তৎ বা thatকে সকলে অসীম বা অনন্তই ধরিয়া থাকেন। সুতরাং তত্বমসির বিশুদ্ধ তর্জ্জমা That thou art না হইয়া In that thou art হওয়া উচিত। শব্দানুগতিক বা literal তর্জ্জমা অনেক সময় যে শুদ্ধ হয় না তাহা সকলেরই জানা আছে। ভাবানুযায়ী তর্জ্জমা করিলে আমি যে ভাবে তত্বমসির তর্জ্জমা করিলাম উহাই আসিয়া পড়ে। সুরতাং উহা হইতে Pantheism না পাইয়া আমরা পাই Panentheism বা Concrete Monism. এই মতে সকলেই ভগবানের মধ্যে বিরাজিত ধরা হয়। All=God না বলিয়া এই মতে All are in God বলিয়া ধরা হয়। ক্রজে, হেগেল, ফ্লাইডেরার প্রভৃতি সকলেই এই মন্ত্রের প্রচারক। যাঁহাদিগকে Pantheist বলিয়া অবজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাঁহাদের মতগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে Panentheism হইয়া পড়ে।

কথায় কথায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে অনেকদূর আসিয়া পড়িলাম। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এই তিনটি দেবতা পৃথক নহেন। ইহাঁরা সকলেই বিশ্বেশ্বরের তিনটি বিশেষ

দিক। এবং ইহারা যে শুধু কল্পনাপ্রসূত তাহা নহে। কারণ যে তিনটি মহাসত্য এই তিনটি দেবতায় প্রকটিত তাহা আমরা জগতের সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে দেখিতে পাই। বারানসীর Central Hindu Collegeএর ট্রাষ্টীরগণ যে Advanced Text Book of Hindu Religion and Ethics নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য আছে।

"These Supreme forms of Ishvara, separated by their functions, but One in Essence, Stand as the Central Life of the Brahmanda, and from and by them it proceeds, is maitnained, and is indrawn. Their functions should not be confused, but their unity should never be forgotten অর্থাৎ এই তিনটি দেবতাই যে একই ভগবানের বিভিন্ন প্রকৃতি তাহা যেন আমরা কখনই না ভুলি।

ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মা হইলেন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু হইলেন রক্ষাকর্ত্তা আর রুদ্র বা শিব হইলেন সংহারকর্ত্তা। সংহারের মত দুঃখময়, অমঙ্গলময় কার্য্যও যে শিবময় বা মঙ্গলময় ভগবানের দ্বারা সম্ভাবিত হইতেছে তাহা কেবল মাত্র হিন্দুধর্ম্মই স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে দুঃখ ও অমঙ্গলের বোঝা হয় মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, নয় শয়তান বা আরি মানের মত দুরন্ত দেবতার মস্তকে আরোপ করিয়া ভগবানের অসীমত্বের চতুর্দ্দিকে গণ্ডি টানিয়া দিয়াছে। ইয়োরোপীয় অনেক দার্শনিক এখন পর্য্যন্তও মঙ্গলময় ভগবানের সহিত দুঃখ দৈন্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের সহিত সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম দর্শন বুঝিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে সে সমস্যার একটা সুরাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই তিনটি দেবতার বিশ্বরাজ্যে কার্য্য করিবার প্রচণ্ড শক্তি বিরাজমান। হিন্দুগণ উহাদের নিজ নিজ শক্তিকে দেবীরূপে কল্পনা করিয়া anthropomorphismএর পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মনুষ্য সমাজে বিবাহ প্রথা আছে। দেবতা সমাজে না থাকিবার কারণ কি? তাই, হিন্দু শিবের স্ত্রীর নাম দিলেন উমা, বিষ্ণুর স্ত্রীর নাম দিলেন লক্ষ্মী আর ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম দিলেন সরস্বতী। ইহারা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের স্বামী হইতে কোন প্রকারেই ভিন্ন বা পৃথক নহেন—

ইহারা তাহাদের নিজ নিজ স্বামীর শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে এই দেবী সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুকে যতখানি anthropomorphic দেখা যায় ততখানি anthropomorphic হিন্দু বাস্তবিক নয়। এই anthropomorphism বা মনুষ্যভাবাপন্ন দৃষ্টি যে অসঙ্গত তাহা হিন্দুগণ বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই দেবদেবী সম্পর্কে যখনই হিন্দুগণ কিছু বলিয়াছেন তখনই তাহার মধ্যে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষকে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাই যাহা কিছু জানিতে হয় এই জ্ঞান বুদ্ধির খোলস সে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং ন্যূনাধিক anthropomorphic তাহাকে হইতেই হইবে। হিন্দুর বাহাদুরী এই যে যেখানেই দেবদেবী সম্পর্কে মানবোচিত ভাব আসিয়া পরিয়াছে সেখানেই হিন্দু আধ্যাত্মিক জগতের রং আনিয়া সেই মানবোচিত ভাবের গায় লাগাইয়া তাহাকে অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি, উমা শিবের শক্তি আর লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে ও ভগবানে কোনও প্রভেদ নাই। সুতরাং লক্ষ্মী সরস্বতী উমাতে এবং ভগবানে কোন প্রভেদ নাই।

এই সরস্বতীর স্বামী লইয়া অনেক গণ্ডগোল আছে। সৃষ্টি করিতে জ্ঞানের প্রয়োজন সুতরাং ব্রহ্মার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলেন। কিন্তু বিশ্ব পালন করিতে হইলে বেশ ভাল রকম বিদ্যার প্রয়োজন। সামান্য একটি আফিস চালাইতে যে কতখানি বিদ্যার প্রয়োজন তাহা আপনারা জানেন। সেই হিসাবে অনুমান করিয়া দেখুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাইতে কতখানি বিদ্যার প্রয়োজন। সুতরাং সরস্বতীকে পরবর্ত্তী আর্য্যগণ বা হিন্দুগণ বিষ্ণুর স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিয়া বসিলেন। লক্ষ্মী সরস্বতী যে দুর্গার মেয়ে আর বিষ্ণুর স্ত্রী তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। কারখানা চালাইতে বিদ্যা ও ধনের প্রয়োজন, তেমনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাইতে বিষ্ণুর সরস্বতীকেও চাই লক্ষ্মীকেই চাই। তথাপি সরস্বতী যে ব্রহ্মাণী বা ব্রহ্মার স্ত্রী এ কথার নিদর্শনও অনেক হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সরস্বতীকে আবার ব্রহ্মার কন্যারূপেও কল্পনা করা হইয়া থাকে। রুদ্রের বা শিবের স্ত্রীরূপেও সরস্বতীকে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাহার সাক্ষী সরস্বতীর রুদ্রাণী নামে। কাহাকে সংহার করা উচিত, কাহাকে সংহার করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই এ জ্ঞান মহেশ্বরের থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং শিবের শক্তিকে সরস্বতী বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

কিন্তু এ কল্পনা এখন অপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। শিবের সহিত সরস্বতীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে এখন সকলেই একটু কুণ্ঠা বোধ করেন। বিদ্যার প্রয়োজন সকল দেবতারই আছে। সেই জন্য প্রত্যেক দেবতার শক্তিকেই বা স্ত্রীকেই সরস্বতী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। এই জন্য সরস্বতীর স্বামী সম্বন্ধে হিন্দু ধর্মে একটা বিশেষ গণ্ডগোল আছে।

প্রাচীন হিন্দুমতে সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রীও ধরা হইত আবার কন্যাও ধরা হইত। এই জন্য ব্রহ্মা ও সরস্বতীর মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা দেব সমাজে নিন্দনীয় ছিল। উইলসনের গ্রন্থে দেখিতে পাই বাঙ্গলার বৈষ্ণবগণ একটী গল্প দ্বারা এই বিবাহ বিভ্রাটের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সরস্বতী প্রথমে বিষ্ণুর স্ত্রী ছিলেন। লক্ষ্মী এবং গঙ্গা বিষ্ণুর অপর দুইটি স্ত্রী ছিলেন। ফলে সতীনদের মধ্যে ভীষণ কলহ উপস্থিত হইল এবং বিষ্ণু দেখিলেন তিন স্ত্রী লইয়া টিকিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন। সেই জন্য বাধ্য হইয়া তিনি গঙ্গাকে প্রদান করিলেন মহাদেবকে আর সরস্বতীকে প্রদান করিলেন ব্রহ্মাকে। এইরূপে পিতা হইয়াও ব্রহ্মা সরস্বতীর পতি হইয়া পড়িলেন। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল সরস্বতী কোন যৌন সম্পর্কজাত কন্যা নহেন। তিনি ব্রহ্মার মস্তক হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মার পিতৃত্ব এক অলৌকিক রকমের পিতৃত্ব।

জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপেই সাধারণতঃ সরস্বতী পূজিত হন এবং বেদমাতা বলিয়াই তাঁহাকে আমরা আহ্বান করিয়া থাকি। দেবাক্ষরের আবিষ্কর্ত্রী বলিয়াও তাঁহাকে আমরা জানি। যদিও আমরা এমন দ্বিভূজা সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকি তথাপি সরস্বতীর চতুর্ভূজের কথাই আমরা প্রাচীন কল্পনাতে পাইয়া থাকি। এই চারি হস্তের এক হস্তে তালপত্রের পুস্তক, অপর হস্তে অক্ষমালা, আর একটিতে ডমরু এবং অপরটিতে পুষ্প বা কমল। সুতরাং প্রাচীন কল্পনায় বীণা রঞ্জিত হস্তের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দেবী সরস্বতী মনুষ্যের মধ্যে এই পৃথিবীতেই বাস করেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান ব্রহ্মলোকে। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পার্শ্বেই বিরাজিত থাকিয়া তিনি পূজা অর্চ্চনা গ্রহণ করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালী ভক্তের ভক্তির বন্ধনে পড়িয়া তাঁহাকে স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইতে হইয়াছে।

ঋগ্বেদের সময়ে সরস্বতীকে নদীরূপে পূজা করা হইত, আবার দেবীরূপেও পূজা করা হইত। আর্য্যগণ তখনও গঙ্গারতীরে আসিয়া পৌছেন নাই, গঙ্গার মহিমাও তত দেখেন নাই। তখন

তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান নদী ছিল সরস্বতী। ঋগ্বেদে গঙ্গার নাম দুইবার মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে অথচ সরস্বতীর উল্লেখ ঋগ্বেদে বহুবার দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে এক সরস্বতীর সহিত পরিচিত ছিলেন। আবেস্তার মধ্যে সে সরস্বতীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন ইরানী ভাষায় সংস্কৃত সরস্বতী শব্দ হরকাইতি (Haraquiti) হইয়া পড়ে। এই নামই আমরা আবেস্তায় পাই। এই হরকাইতি নদীর বর্ত্তমান নাম হেলমেণ্ড (Helmend), ইহা আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সরস্বতী নদীর সহিত পরিচিত তাহা মধ্য পথে অন্তঃসলিলা, পশ্চাতের দিকে ব্যক্ত এবং মূল সরস্বতী নামে বিখ্যাত এবং সম্মুখের দিকে ঘ.ঘর নামে পরিচিত। কিন্তু এই সরস্বতীই বৈদিক যুগের সরস্বতী কিনা সে সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই সরস্বতীকে বৈদিক কবি ও ঋষিগণ সপ্তসিন্ধুর প্রধানসিন্ধু, সপ্তভগিনীর প্রধানভগিনী, এবং সপ্তমাতার প্রধান মাতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আর্য্যগণ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে সরস্বতীর যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার ইংরাজী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

With great noise of waters, bringing nourishment, Sarasvati breaks forth ; she is to us a firm bulwork a fortress of brass. Like to a warrior in the chariot race she speeds along, the Sindhu (river) leaving all other waters far behind. Sarasvati comes down the purest of streams, from the mountains to the Samudra ; bringing wealth and prosperity to the wide world, she flows with milk and honey for those that dwell by her banks."

Ragozin তাঁহার সুপরিচিত Vedic India নামক গ্রন্থে কহিয়াছেন—In early Vedic times there was only one river that justified such a description—the Indus. Indeed this passage has led to the positive identification of the Sarasvrti as the Indus." অর্থাৎ এরকম বর্ণনা একমাত্র সিন্ধুনদের প্রতিই প্রযোজ্য। সুতরাং কোন সন্দেহই হইতে পারে না যে আর্য্যগণ সরস্বতী বলিতে Indus বা সিন্ধুকেই বুঝিতেন। বর্ত্তমানে আমরা যে সরস্বতীর সহিত পরিচিত খুব ভাল অবস্থার সময়েও উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী রূপ গ্রহণ করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। সেই জন্য Ragozin কহিয়াছেন—"Even in its

early and palmier days this Sarasvati could never have possessed much importance. Nor is it possible that this Sarasvati should ever have been described in such superlative terms" বেদে সরস্বতী সম্বন্ধে আরও আছে "flashing sparkling, gleaming in her majisty, the unconquerable. the most abundant streams, beautiful as a handsome, spotted mare, rolls her waters over the levels."

সরস্বতী সম্বন্ধে এই রকম কথা শুনিয়া সন্দেহ করা অন্যায় যে ইনি সিন্ধু হইতে বিভিন্ন। বেদের সময়ে সিন্ধু নদী অর্থেই ব্যবহৃত হইত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নদীকেই সিন্ধু বা the river বলা হইত। সরস্বতী শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জলময়ী। সুতরাং সরস্বতীর সহিত সিন্ধুর সাদৃশ্য যে ষোল আনা তাহাতে সন্দেহ নাই। যেটুকু বা সন্দেহ থাকে তাহা অথর্ব্ববেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ১০০ নং সূক্ত পড়িলেই চলিয়া যায়। এই সূক্তে তিনটি সরস্বতীর উল্লেখ আছে। এই তিনটি সরস্বতীর একটি আমাদের বর্ত্তমান ক্ষীণকায়া সরস্বতী, অপরটি আবেস্তার হরকাইতি এবং বর্ত্তমানের হেলমেণ্ড এবং তৃতীয়টি বৈদিকযুগের সরস্বতী বা সিন্ধু বর্ত্তমানের Indus.

আর্য্যগণ এই নদীরূপিণী সরস্বতীকে পূজা করিতেন। কালক্রমে আর্য্যগণ সরস্বতীকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে নদী হইতে পৃথক রূপে কল্পনা করিয়া বসিলেন। এইরূপে প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্যগণ অগ্নি, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি অনেক দেবতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। সরস্বতীও সেই একই প্রণালীতে ভক্ত আর্য্যগণের কল্পনার বন্ধনে ধৃত হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে বাচ নাম্নী আর একটি দেবীর সাক্ষাৎ পাই। এই বাচ নাম্নী দেবী অর্থাৎ বাক্‌দেবীতে আর সরস্বতীতে কোন প্রভেদ নাই। ভাষা জননীর আশীর্ব্বাদ থাকিলে বক্তার কথা যেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া যায়, নদীর জলও তদ্রূপ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া যায়। নদীর জলের সহিত ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই—"A rich, a free, an easy flow of words, fluency of speech, torrent of eloquence" ইত্যাদি শব্দ ইংরাজীতে পাই। এ রকম অনেক কথা যে আমাদের ভাষাতেও আছে তাহা উপস্থিত সভ্যবৃন্দের বক্তৃতা তরঙ্গ

হইতে জলের মত সহজ ভাবে বুঝিতে পারিবেন। জলদেবীকে আর্য্যগণ কেন যে বাকদেবীতে পরিণত করিলেন অনেকের মতে তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। কিন্তু ইহা আমরা বেশ ভাল করিয়াই জানি যে সরস্বতীকে জলদেবী রূপে আর্য্যগণ যেমন সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়াছিলেন বাকদেবীরূপেও তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। বাক্‌দেবী সম্বন্ধে যে কথা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭১ সূক্তে আছে তাহার ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সূক্তটি সম্বন্ধে Ragozin কহিয়াছেন,—"The beauty, dignity and ennobling uses of speech could scarcely be appraised with finer feeling or apter touches." অর্থাৎ বেদকে যাঁহারা চাষার গান বলেন তাঁহারা যে বুদ্ধিমানের কাজ করেন না তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

1. Man with their earlist utterances, gave names to things and all which they had lovingly treasured within them, the most excellent and spotless was disclosed. ....4. One man, seeing, sees not Vach; another hearing, hears her not; to another she willingly discloses herself, as a will attired and loving wife displays her person to her husband.

5. One man is said to be secure in her favour—and he is not to be overwhelmed in poetical contests; another lives in unprofitable brooding: he has only heard Vach, and she is to him without fruit or flower. . ...

8. When competing priests practice devotion in sayings born of the spirit's might, one lags far behind in wisdom, while others prove themselves true priests.

9. One sits and produces songs like blossoms; another sings them in loud strains; one discourses sapiently of the essence of things; another measures out the sacrefice according to the rite.

10. And friends are proud of their friend, when he comes among them as leader of poets. He corrects their errors, helps them to prosperity, and stands up, ready for the poetical contest."

ইহার বাঙ্গলা দিতে পারিলাম না, আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। তবে আশা আছে—আপনারা উহা হইতে বুঝিতে পারিবেন এই সূক্তটি কেমন সৌন্দর্য্য ও গরীমামণ্ডিত।

এই বাকদেবী সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে এক অদ্ভুত বিবরণ আছে। যজ্ঞের সময় বাকদেবী স্বর্গীয় গাভীরূপ গ্রহণ করিয়া কহিলেন—আমাকে কুচরিত্র ব্যক্তিগণ অবহেলা করিতেছে—"I, Vach, the skilled in speech, who assist all pious practices, I the divine Cow who has come from the gods, I am neglected by evil minded man."

Ragozin বলেন কোন কৃপণ রাজার দানকুণ্ঠায় অসন্তুষ্ট হইয়া কোন পুরোহিত এই শ্লোক রচনা করিয়া তাহার কুচরিত্রের কথা আর্য্য-সাহিত্যে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। একথা সত্য হইলে ঋগ্বেদের সময়েও যে অর্থলোভী পুরোহিতের অভাব ছিল না এবং দুষ্টবুদ্ধি গোঁসাই পুরোহিতের প্যাঁচটুকুও যে ঐ যুগের কেউ কেউ জানিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ সকলেই ভাবেন কেবল বর্ত্তমান কালেই অর্থাৎ কলিযুগেই পুরোহিত অর্থলোভী এবং যজমান যাগযজ্ঞ পূজা অর্চ্চনায় দেয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে নানা প্রকার চালাকি ও প্রতারণা করিয়া থাকেন। এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্তিজনক তাহা কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধ দোহো নিরিন্দ্রিয়াঃ
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান স গচ্ছতি তা দদৎ॥

অর্থাৎ যে সকল গো জন্মের মত জলপান করিয়াছে, জন্মের মত তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, জন্মের মত দুগ্ধদান করিয়াছে এবং সন্তান প্রসবে আর সমর্থ নহে, সেইরূপ গোগণকেই নচিকেতার পিতা বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে দান করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি অসুখময় লোক সমূহে গমন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। পিতার এই অসৎকার্য্য দেখিয়াই নচিকেতার বিবেক বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এমন যুগ নাই যাহার ভাল মন্দ দুই দিকই না থাকে।

কেমন করিয়া সরস্বতী নদদেবী হইতে বাক্‌দেবীতে পরিণত হইলেন তাহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা J. Muirএর Original Sanskrit Texts, নামক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ৩৩৮

পৃষ্ঠায় পাই। তাঁহার মতে "When once the river had acquired a divine Character, it was quite natural that she should be regarded as the patroness of ceremonies which were celebrated on the margin of her holy waters, and that her direction and blessing shonld be invoked as essential to their proper peformance and success. She connexion, she was thus brought with sacred rites, may have led to the further step of imagining her to have an influence on the composition of the hymns which formed so important a part of the proceedings and of identifying her with Vach, the Godess of speech." অর্থাৎ জলদেবীরূপে সরস্বতীকে পূজা করার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ ভাবিলেন যে যে সকল যাগযজ্ঞ নদীতীরে সম্পন্ন হয় তাহা সরস্বতীর সাহায্যেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক যাগযজ্ঞের যথাযথ প্রণালীতে সম্পাদনের নিমিত্ত ও সাফল্যের জন্য সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ ও সহায়তা প্রার্থনা করা আর্য্যগণ অবশ্য করণীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরে দেখা গেল সময় সময় এই সরস্বতী বন্দনা অতি সুন্দর হয় আবার কখন কখন ইহা একেবারেই কর্কশ হইয়া পড়ে। সেই জন্য আর্য্যগণ ভাবিলেন সরস্বতীর কৃপা হইলেই বন্দনা ভাল হয় আর সেই কৃপার অভাব হইলেই বন্দনা মন্দ হইয়া পড়ে। এইরূপে জলদেবী হইতে সরস্বতী বাকদেবীতে পরিণত হইলেন। মুয়ার সাহেব আর কহিয়াছেন—It is difficult to say whether in any of the passages in which Sarasvati is invoked, even in those where she appears as the patronage of holy rites, her character as a river goddess is entirely left out of sight"—অর্থাৎ সরস্বতী এমন বন্দনা পাওয়া কঠিন যাহাতে তাঁহার জলদেবীত্বের কোন ইঙ্গিত নাই। সুতরাং বাক্‌দেবী যে পূর্ব্বে জলদেবীরূপে বিরাজ করিতেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এইবার সরস্বতীর নানা রকম কল্পনার কথা আপনাদিগকে বলিব। মহাভারতে দেখিতে পাই সরস্বতীকে বেদমাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণে দেখি বাক্‌দেবী ইন্দ্রপত্নীরূপে বিরাজিতা এবং ইহঁারই মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং ইহঁারই আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য বেদপ্রণেতা ঋষিগণ ও দেবগণ সর্ব্বদা লালায়িত। মৎস্যপুরাণ দেখি সরস্বতীর

অনেক নাম, যথা—শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী। বরাহপুরাণেও একই দেবীকে গায়ত্রী, সরস্বতী, মহেশ্বরী ও সাবিত্রী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কিন্তু স্কন্দপুরাণে সরস্বতীকে গায়ত্রী হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী ছিলেন। কেমন করিয়া গোপকন্যা গায়ত্রী ব্রহ্মার স্ত্রী হইলেন তাহার বিবরণ আমরা স্কন্দপুরাণেই পাই। পুষ্করতীর্থে দেবতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন। সকল দেবতাই উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন না কেবল দেবীগণের মধ্যে একজনও। কিন্তু ব্রহ্মার স্ত্রী না হইলে যজ্ঞ হইতে পারে না, সেই জন্য একজন পুরোহিতকে সরস্বতীর নিকট পাঠান হইল। দেবী সরস্বতীর: তখনও গৃহকর্ম্ম সমাপ্ত হয় নাই, বেশভূষাও পরিধান করা হয় নাই। আরও বিশেষ করিয়া লক্ষ্মী, ভবানী, গঙ্গা, স্বাহা, ইন্দ্রাণী ও অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে একজনও তখন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছেন নাই। সুতরাং সরস্বতী পুরোহিতকে কহিলেন, একাকিনী তিনি সভা মধ্যে যাইতে পারিবেন না।

পুরোহিত ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, সরস্বতী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত আছে, তিনি এখন আসিতে পারিবেন না। কিন্তু আপনার স্ত্রী উপস্থিত না থাকিলে এ সকল যাগযজ্ঞে কোন ফলই ফলিবে না।

সরস্বতীর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন, "যাও যেখান হইতে পার আমার জন্য একটি স্ত্রী অতি সত্বর সংগ্রহ করিয়া আন।" সুতরাং ইন্দ্রকে কুমারী নারীর অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইল। কিছু দূর দিয়া ইন্দ্র দেখিলেন একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী গোপবালা মাখনের ভাণ্ড লইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র তাঁহাকেই ধরিয়া সভা মধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দেবগণ! যদি আপনাদের অভিমত হয় তাহা হইলে আমি এই গোপকন্যা গায়ত্রীকে বিবাহ করি। বিবাহিতা হইয়া ইনি বেদমাতা হইবেন এবং জগতের পবিত্রতার কারণ হইবেন।

দেবতারা সম্মতি দিলেন এবং ব্রহ্মার সহিত গায়ত্রীর বিবাহ হইয়া গেল, এবং বিবাহের পর গায়ত্রীকে সরস্বতীর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হইল। এমন সময় বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের স্ত্রী দ্বারা পরিবৃত হইয়া দেবী সরস্বতী সভায় আগমন করিলেন। পুরোহিতগণ তখন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। গায়ত্রীকে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া সরস্বতী সকলই বুঝিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, "আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমাকে

পরিত্যাগ করিয়া তুমি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিলে! তোমার কি পাপ বোধ নাই! তোমার কি লজ্জা নাই! তোমার এই জঘন্য কার্য্যের জন্য ত্রিলোকবাসী যে তোমাকে উপহাস করিবে!” ব্রহ্মা বিনয় বচনে কহিলেন, “দেবী, এই অপরাধটি মার্জ্জনা কর। আর কখনও আমি তোমার মনে কষ্ট দিব না। তুমিত জানই সপরিবারে ধর্ম্ম-আচরণ করিতে হয়। তুমি আসিলে না, তাই বাধ্য হইয়া আমাকে এই গায়ত্রীকে বিবাহ করিতে হইল। ইন্দ্র ইহাকে আনয়ন করিয়াছেন এবং বিষ্ণু ও রুদ্র ইহঁাকে আমার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন।”

সাবিত্রী বা সরস্বতী ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া দেবতাগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে কহিলেন তোমার জন্য কেউ মন্দির স্থাপন করিবে না, সম্বৎসরে একদিন ব্যতীত তোমাকে কেউ পূজা করিবে না। ইন্দ্রকে কহিলেন, “তুমি গোয়ালিনীকে লইয়া আসিয়াছ, এই জন্য শত্রুগণ তোমাকে পরাজিত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাদের দেশে লইয়া যাইবে আর তোমার অমরাবতী শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিজীত হইবে।” বিষ্ণুকে কহিলেন, “তুমি গায়ত্রীকে সম্প্রদান করিয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে মনুষ্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তোমার শত্রুগণ তোমার স্ত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। আর গোপের ঘরে জন্মিয়া অনেকদিন ধরিয়া তোমাকে গরু চরাইতে হইবে।” রুদ্রকে সরস্বতী কহিলেন, “তোমার পুরুষত্ব লোপ পাইবে।” অগ্নিকে কহিলেন, “তোমাকে পবিত্র, অপবিত্র সকল বস্তুই ভক্ষণ করিতে হইবে।” সমবেত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে কহিলেন “এখন হইতে তোমরা কেবল অর্থলোভের জন্য যাগযজ্ঞ করিবে, ধর্ম্মার্থে আর পূজা অর্চ্চনা করিবে না। এই লোভের জন্যই তোমরা তীর্থক্ষেত্রে ও দেবালয়ে যাইবে। পরান্নেই তোমরা উদর পূর্ত্তি করিবে, নিজ গৃহের অন্নে তোমাদের অরুচি জন্মিবে। পূজা অর্চ্চনাও তোমরা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না।”

এই অভিশাপ প্রদান করিয়া অন্যান্য দেবীগণের সহিত সরস্বতী সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু অন্যান্য দেবীগণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সভাস্থলে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতী কহিলেন, “হে লক্ষ্মী, আজ হইতে কোথাও তুমি স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। যাহারা পাপী, নিষ্ঠুর, অসত্যবাদী, ঘৃণ্য, অসভ্য এবং নির্ব্বোধ, তুমি তাহাদের নিকটেই থাকিবে। হে ইন্দ্রাণি! নহুষ স্বর্গ বিজয় করিয়া তোমাকে তাহার সেবা করিতে বলিবে। এবং ঐ ঘৃণিত বাক্য শ্রবণ করিয়াও তোমাকে

বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।” ইহাতেও সরস্বতীর অভিশাপ শেষ হইল না। তিনি দেবীগণকে কহিলেন, “তোমরা পুত্র কন্যা হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইবে।”

বিষ্ণু সরস্বতীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। কিন্তু সরস্বতী চলিয়া গেলে গায়ত্রী সকলকে অভয় প্রদান করিয়া সরস্বতীর অভিশাপ অনেক মৃদু করিয়া ফেলিলেন। এবং গায়ত্রীর এই আশীর্ব্বাদের জন্যই Phalus worship সৃষ্ট হইল। ব্রাহ্মণগণ দেবতার সম্মান পাইলেন এবং বিষ্ণু তাঁহার স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন।

পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই এই স্ত্রী পুরুষের দন্দ্ব বিষ্ণু চক্রে পড়িয়া মিটিয়া গেল। বিষ্ণু ও লক্ষ্মী সরস্বতীকে ফিরাইয়া আনিলে গায়ত্রী সরস্বতীর পদতলে পতিত হইলেন এবং ব্রহ্মা কহিলেন, “এই গায়ত্রী সম্বন্ধে তোমার আদেশ কি?” সরস্বতীর ক্রোধ চলিয়া গেল। গায়ত্রীকে সাদরে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া সরস্বতীকে কহিলেন, “স্বামীর আদেশ মান্য করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী স্বামীর সান্ত্বনাস্থল না হইয়া রাত্রিদিন তাঁহরে সহিত কলহ করিয়া বেড়ায় আর সর্ব্বদা অনুযোগ প্রদান করে সে তাহার স্বামীর আয়ুক্ষয়ের কারণ হয় এবং মৃত্যুর পর সে নিজে নরকে যায়। সুতরাং আইস আজ হইতে আমরা উভয়েই ব্রহ্মার পরিচর্য্যা করি। গায়ত্রী কহিলেন, “আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনার কন্যা স্বরূপে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।”

আপনারা এই পুরাণ বর্ণিত কাহিনীতে বর্ত্তমান সময়ের অনেক আভাষ পাইবেন এবং সে জন্য পুরাণকারের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না।

বাণীর রূপের মধ্য দিয়া প্রাচীন কবি ও শিল্পি কি বিশ্বতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হিন্দু মাত্রেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। বারান্তরে দেবী সরস্বতীর এই রূপতত্ত্ব আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আজ এইখানেই বাণীর চরণে প্রণাম করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইতেছি।*

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

* মুঙ্গেরের বাণীমন্দিরের পঠিত।

ভুলে কি ?
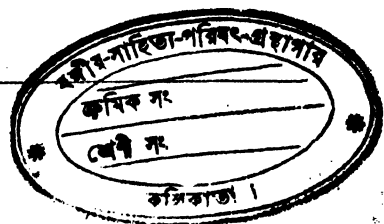
ভুলে কি গো আসিয়াছি
এ পথে ?
তবু ফিরে যাওয়া মোর
হবে না কো কিছুতে।
জানি না কো অবশেষে
কোথা যা'বো কোন দেশে—
কেহ কি গো মৃদু হেসে
ডেকে লবে নিভৃতে ?
মনে হয় কে যেন গো
ডাকে মোরে এ পথে।

সবে ডেকে বলে—ওগো
এ কি এ !
বুঝি না তো—কেন যাও
মরীচিকা পানে যে !
শুনি না ত কারো বাণী
শুধু মনে মনে জানি—
কে যেন গো প্রাণখানি
আজি টানে অদূরে ;
বুঝিবে না কেহ আজি
ডাকে মোরে কি সুরে !

পাখী ডেকে বলে—'যারে
ছুটিয়া,
তোরই পরশনে ফুল
উঠিবে রে ফুটিয়া।"
ডাকে মোরে দূরাকাশ
নদী দেয় আশ্বাস
ফোটা কুসুমের বাস
থাকি থাকি লুটিয়া
বলে—"তব পরশনে
রবে ফুল ফুটিয়া।

ভুলে আমি আসি নাই
এ পথে,
ওই দূরে ডাকে মোরে
নিরালা সে নিভৃতে।
ওগো তুমি মোরে ডাকি
বাহু দিয়া রাখ ঢাকি'
শান্তির রেখা আঁকি'
দিয়ো মোর বুকেতে—
মনে হয়—ভুলে আমি
আসি নাই এ পথে।

শ্রীরেণুকা দাসী।

বয়াটে।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(দুই)

ন'ব্‌নে ঠিক ক'র্‌লে—একেবারে ক'ল্‌কাতায় গিয়ে উঠ্‌বে। অত বড় সহরে সেই লক্ষ লোকের মাঝখানে—মাথা গু'জে থাক্‌বার তারো একটু স্থান হবেই নিশ্চয় !

খানিকটা ইষ্টিমারে—বাকীটা রেলে চ'ড়ে বেপরোয়া ন'ব্‌নে বুক ফুলিয়ে এসে ক'ল্‌কাতায় নাব্‌লো। সেখানে তার দিদিমা আছেন—চেনা জানা—আশে পাশের গাঁয়ের বাল্যবন্ধু দু'চার জনও তো ক'ল্‌কাতায় থেকে লেখাপড়া করে।

দিদিমা বড় গরীব; ছোট মামা তাঁকে ভক্তি তো করেই না—খেতেও দেয় না। তবু এ সহরে সেই তার প্রথম আশ্রয়—সেইখানে গিয়েই প্রথম উঠ্‌তে হবে।

দিদিমার বাড়ী শেয়ালদা থেকে বেশী দূর নয়—সেখানে গিয়ে সে পৌঁছোলো যখন, তখন বাড়ীতে কেউ ছিল না—বাইরের দোরে তালা বন্ধ।

এইবার গোড়ার সে অতিরিক্ত উৎসাহ খানিকটা একটু দ'মে এল। সে ভাব্‌লে—"কি আপদ ! এরা সব গেল কোথায় ?"

অনেকক্ষণ ধ'রে ন'ব্‌নে ঘরের সাম্‌নে ছোট রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। এ-পাশ ও-পাশ, দু'চার বার পায়চারী ক'র্‌লে কিন্তু দিদিমা তো এলেন না। ন'ব্‌নে আর দাঁড়াতে পার্‌লে না সেইখানে ব'সে প'ল। সন্ধ্যা অন্ধকার হ'য়ে এল। এখন কোথায় যাবে ন'ব্‌নে ? যদি দিদিমা আজ না ফেরেন ! কিম্বা দিদিমা সহর ছেড়েই কোথায়ও চ'লে গেছেন—তার ঠিক কি ? আরও খানিকক্ষণ গেল—ঘণ্টা দুই হয়তো। ওপরে দিদিমার একজন ভাড়াটে থাকতেন ন'ব্‌নে তাঁকে আরও দু'একবার এখানে দেখেছিল। তিনি বেড়িয়ে ফির্‌ছিলেন যখন ন'ব্‌নেকে দেখ্‌তে পেয়ে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে—কি যেন মনে ক'রে নিলেন তার পর ব'ল্লেন—নবনী ?"

"হ্যাঁ" ব'লে ন'ব্নে তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লো।

"কখন্ এলে ?"

"এই তো আজই ; তা দিদিমাকে তো দেখ্‌ছি নে।"

"তিনি কলুটোলা গিয়েছেন বিয়েতে,—আস্‌বেন এক্ষুণি বোধহয় ; তুমি ভাল আছ ত ?"

"আছি।"

"বেশ" ব'লে ভাড়াটে বাবুটী পাশের দোর ঠেলে ওপারে চ'লে গেলেন। ন'ব্নে ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ দিদিমার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রইল। কিন্তু কই দিদিমা! রাস্তার কষ্টে, 'ক্ষিধে তেষ্টায়' ন'ব্নে বড্ড শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। বিছানা বাক্স তার তো কিছুই ছিল না যে বাইরে রাখ্‌লে ভয় আছে। সে একা ; একখানি মোটা কাপড়। একটী জামা গায়ে,—মোটা চাদর একখানা—তা তো ঘাড়ের ওপরেই ছিল। পকেট থেকে 'হিতবাদী' দিয়ে জড়ানো গামছাখানা বা'র ক'রে কাগজখানা বিছিয়ে গামছা আর চাদর জড়িয়ে বালিস ক'রে মাথায় দিয়ে রেয়াকের ওপরেই শুয়ে প'ল। ক্লান্ত দেহে শুয়ে ন'ব্নে খুব ঘুমোলো। তা-পর গাঢ় গভীর সে ঘুম তার ভাঙ্‌লো—দিদিমার কড়া কথা কানে গিয়ে। তখন ভোর হ'য়ে গিয়েছিল। দিদিমা—বিয়ে বাড়ী থেকে ত'খনি ফির্‌লেন। শেষ রাতে বিয়ের লগ্ন ছিল তাই এত দেরী।

ন'ব্নে হাত বুলিয়ে চোক ক'চ্‌লিয়ে নিয়ে উঠে ; গিয়ে দিদিমাকে প্রণাম ক'র্‌লে। দিদিমা ব'ল্লেন—"তুই কখন এলি—আবার ম'র্‌তে—অ্যাঁ ?"

একবার একটু হেসে ন'ব্নে বল্‌লে—"ম'র্‌তেই এসেছি দিদিমা কাল সারা রাত এই রেয়াকে শুয়ে ছিলাম।"

"তাতো থাক্‌বারই কথা, অপহৃতা যারা তাদের জন্যে ভগবান এই করেন ; পড়া নেই শোনা নেই, বালাই আপদ! দূর! দূর! কেন তুই এলি এ বাড়ীতে মর্‌তে যা আজই আবার ফিরে বাড়ী যা।"

ব'লে দিদিমা—আঙুল দুলিয়ে চ'লে যাওয়া দেখবার ভঙ্গী ক'র্‌লেন।

একবার হাস্‌বার চেষ্টা ক'রেও—ন'ব্নে পার্‌লো না—তার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে এল। কিছু খায়নি প্রায় দুদিন ; হঠাৎ দিদিমার কথায় যেন পেটের সে ক্ষিধে মনের বিষ জ্বালায়

চেয়েও দারুণ হ'য়ে জ্ব'লে উঠ্‌লো। সে ব'ল্‌লে—"বাড়ী ফিরে যাওয়া আর হবে না দিদিমা—তারা আমায় গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"অ্যাঁ তাড়িয়ে দিয়েছে? আর তুই কিনা এসে জুটলি আমারি 'স্কন্ধে?' নাব্ নাব্ নাব্ বাড়ী থেকে।" ব'লে দিদিমা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। ন'ব্‌নে ভাব্‌লো—"কি দোষ আর সৎমার—এ দিদিমা যে তার আপন মায়ের মা—ও'রই রক্ত যে ন'ব্‌নের শিরায় শিরায় বইছে! সৎমা তবু ছাই দিয়েছিল খেতে—কিন্তু দিদিমা যে কিছুই দিল না! এবার ন'ব্‌নে দুঃখে কেঁদে না উঠে মুচ্‌কে হেসে বাড়ী থেকে রাস্তায় নেবে এল। মণ্টুকে খুন ক'রে মেরেছে—সে দুঃখও তো স'য়েছে! সাম্‌নে চল্‌তে চল্‌তে ন'ব্‌নে পিছন পানে তাকালে একবার—দিদিমা যদিই ডেকে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু—না—তার কি আর সে কপাল! নইলে মণ্টু ম'র্‌বে কেন—সে বাড়ী তার ছাড়্‌তে হবে কেন? ন'ব্‌নে স্পষ্ট বুঝেছিল এ বিশ্ব সংসারে সে একা—আর এরা সবাই তার শত্রু।

খানিকদূর গিয়ে দেখে—একটা ফুলুরির দোকান। এতক্ষণ ভাব্‌তে ভাব্‌তে চ'লেছিল ক্ষিধেটা ভুলেছিল যেন। দোকানটার সাম্‌নে এসে হঠাৎ ভাজা বেগুণিগুলো দেখেই তার মনে হ'ল শুকিয়ে কুঁকড়ী লেগে যাওয়া পেটটার মধ্যে তার আর কিছুই নেই—শুধু ক্ষিধে। তার সঙ্গে সেই পাঁচটাকার বাকী পয়সা কিছু তখনো ছিল। একেবারে দু আনার বেগুণি কিনে ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেলে। রাস্তার পাশে কল ছিল সেখানে জল খেয়ে এতক্ষণে যে একটু ঠাণ্ডা হ'ল। এবেলার মত নিশ্চিন্দি!" কিন্তু কাজ তার কি? এ সহরে সে কি ক'র্‌তে পার্‌বে? যখন আর কিছুই ক'র্‌তে পারে না তখন বেড়ানোই তার কাজ। মানিকতলা দিয়ে হেদো তারপর বিড্‌ন স্কোয়্যার; বিড্‌ন স্কোয়্যার থেকে শোভাবাজার ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে শেষে ষ্ট্র্যাণ্ড। ষ্ট্র্যাণ্ড থেকে হাওড়ার পুল। হাওড়ার পুল থেকে বড় বাজার! মাড়োয়ারীদের মস্ত মস্ত তিন চার তলা বাড়ীগুলো। লোকজনের ভিড়। মাঝে মাঝে দুটো একটা উঁচু, মোটা ষাঁড় ফুটপাথের ওপর শুয়ে র'য়েছে। ন'ব্‌নে হাঁটছে আর তার মনে কত কি আকাশ পাতাল কথা স্বপ্নের মত ছবি হ'য়ে এসে ফুটে উঠ্‌ছে। ন'ঠান্‌দি, মহিম ভুঁয়েল,—বন্ধু খেব্‌লু;—খড়ম মার্‌তে এসেছিল—দাঁতাল পোষ্টমাষ্টার;—মণ্টু—ন'ব্‌নের চোখে জল এল;—"বেলা"—"বেলা"টার কি দয়া!—হঠাৎ যদি এই রাস্তার পাশে—ঐ বাড়ীটার রোয়াকের ওপর "বেলা"

দাঁড়িয়ে রয়েছে—দেখ্‌তে পেতো ! এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ন'ব্‌নে চ'লেছে মাথার চুলে তেল নেই,—স্নান করে নি ; শরীর শুকিয়ে রুক্ষ হ'য়ে গিয়েছিল—তার ওপর অনাহার। গা হাত পা ক্লান্তিতে ভারী হ'য়ে উঠেছিল—তবু তাকে হাঁটতেই তো হ'বে—এ যে ক'ল্‌কাতার রাস্তা ! এখানকার পথে কেউ দাঁড়ায় না—সবাই চলে।

আর একটু এগোলো—সদর রাস্তার পাশে সে একটা গলির মোড় ! একটা লোক হাত জোড় ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে—"ছু' গণ্ডা পয়সা বাবু এ সময় দিলে বৃথা হবে না—শেষ কাজ বাবু—গঙ্গার ঘাটে দেবার খরচা নেই—ছু' গণ্ডা পয়সা দিয়ে যান বাবু।"

ন'ব্‌নে দেখ্‌লে—একটী মেয়ে মানুষের মৃত দেহ ;—কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা। লোকটা তার স্বামী ,—স্ত্রীর শেষ সংকার করার পয়সা নেই—তাই ভিক্ষা চাইছে। ন'ব্‌নের প্রাণে বড় ব্যথা লাগ্‌লো। নিঃসম্বল তার পকেট থেকেও ছু'টো পয়সা তুলে নিয়ে লোকটার হাতে দিলে। মরাটা দেখে ন'ব্‌নের কান্না এল—কি তার মনে হ'ল—"মণ্টুরে !" ব'লে কেঁদে ফেল্‌লে !

চোখের পাশটা জামার তলাটা তুলে মুছে আবার ন'ব্‌নে চ'ল্‌লো। অনেকক্ষণ চ'ল্‌লো। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। রাস্তার লণ্ঠনগুলো সব কর্পোরেসনের মজুরেরা জ্বেলে দিয়ে গেল।

সহরের লোক চলা-চল তখনো সমানেই চ'ল্‌ছিল। ন'ব্‌নে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে কলেজষ্ট্রীট দিয়ে "ওয়েলিংটনের" দিকে—আস্‌ছিল। অন্যমনস্কে আকাশ পানে চেয়ে হাঁট্‌লেও—যেন এতক্ষণ একবারও হুঁচোট খেয়ে পড়ে নি—কেবল ছু'এক জনের গায় গায় ধাক্কা লেগে গেছে। এইবার প্যারিচরণ সরকারের গলির মুখে একজনের পিঠের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থম্‌কে থেমে গিয়ে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে আবার চ'ল্‌বে—এমন সময় শুন্‌লে—সেই গলা সেই লোকটাই চেঁচাচ্ছে—"ছু'গণ্ডার পয়সা বাবু এ সময় দিলে বৃথা হবে না—" ইত্যাদি। ন'ব্‌নে স্বর লক্ষ্য ক'র সেই দিকে তাকিয়ে দেখে গলির ফুটপাথটার ওপর কাপড় ঢাকা মরা। সে ভাব্‌লো—"সে কি ?—ও গঙ্গায় যাবে যদি তবে পিছিয়ে আবার এখানে এল কেন ?" কারণ কিছু ঠিক বুঝতে না পেরে ঐ লোকটার পাশ দিয়ে ন'ব্‌নে তাড়াতাড়িই হেঁটে চ'লে গেল—যেন লোকটা তাকে দেখে চিন্‌তে না পারে—অথচ সে ব্যাপারটা বুঝ্‌বার সুবিধা পায়। খুব তীক্ষ্নদৃষ্টি দিয়ে—বেশ ক'রে তাকিয়ে তার যেন মনে হ'ল রাস্তার পাশে জ্বেলে দে'য়া আলোয় সে দেখ্‌তে পেলে মড়ার পা-টা একবার একটুখানি ন'ড়ে উঠ্‌লো। ন'ব্‌নে ভাব্‌লো—"অ্যাঁ ? একি তা

হ'লে—লোকটার একটা প্রকাণ্ড দমবাজী? ভিক্ষের ব্যবসাদারী?"—খানিকটা চ'লে গিয়ে আবার ফিরে এসে নব্‌নে—ঠিক মড়াটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—চোখের পলক্‌ফেলার সময়টুকুর ভেতর দেখ্‌না দেখ্‌ টক্‌ ক'রে মড়ার মুখের ওপর থেকে কাপড়টুকু সরিয়ে দিলে। যেমন কাপড় ফেলা অন্‌নি মড়া তড়াক্‌ ক'রে উঠে প'ড়ে চল্‌তে লাগল—তাড়াতাড়ি তার পেছনে সেই লোকটাও—ছুট্‌ আর কি!

ন'ব্‌নে আপন মনেই হো হো ক'রে হেসে আবার চ'ল্‌তে লাগ্‌লো! সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—এই তো কল্‌কাতার ব্যাপার—মরণ নিয়ে খেলা ক'রেও দিনের রুজি-রোজগার যোগাড় করে এখানে। কিন্তু—এখন আমার উপায় কি? রাত্তিরও হ'ল—রাত্তিরের কি ব্যবস্থা? সারারাত তো আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো যাবে না। হয় তো পুলীসে ধ'র্‌বে। একবার ভাব্‌লো—চ'লে যাবে জ্ঞানবাবুর বাসায় কি কমলদের মেসে কিন্তু দিদিমা যেমন তাড়িয়ে দিলে তারাও যদি তেম্‌নি চিনেও—চিনিনে ব'লে দোরের বার ক'রে দেয়!—সে তা হ'লে বড় অপমান!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে আর একটু এগিয়ে একটা মোড়ের কাছে খুব বড় একটা বাড়ীর গায়—দেখে একখানা পোষ্টার মারা র'য়েছে। লাল-নীল হরফে বড় বড় ক'রে লেখা :—

মিনার্ভা থিয়েটার! মিনার্ভা থিয়েটার!!

১৩ই চৈত্র শনিবার।

রাত্রি ৮টায়—

দ্বিজেন্দ্রলালের

নূতন পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

সাজাহান সাজাহান সাজাহান

তারপর—

হীরার ফুল পাষাণে প্রেম

দরিয়া

সমস্ত রাত্রি অভিনয়।

পরদিন রবিবার

ইত্যাদি।—

ন'ব্‌নের হঠাৎ মনে প'ল—সেদিনই তো তেরই তারিখ শনিবার। সারারাত অভিনয় হবে। বেশ ত থিয়েটার দেখেই আজকের রাতটা কাটানো যাক্। পকেট থেকে সবগুলো পয়সা বা'র ক'রে এনে গুণে দেখ্‌লে—বার আনা দেড় পয়সা আছে। সেই তার পৃথিবীতে যা কিছু সাত রাজার ধন মণি-কাঞ্চন। কিন্তু আজই যদি এই সব—একরাতেই খরচ ক'রে নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলে—তা হ'লে কাল? সর্ব্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব সে সকালে থিয়েটারের বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াতেই যে বেঁচে থাকার বড় বালাই তার শক্ত মুঠিতে চেপে ধ'র্‌বে। খাওয়া খাওয়া। কি খাবে? কাল-পরশু, তারপর দিন,—কিন্তু তারপর দিন? সেই একই কথা! তখন ম'র্‌তে হবে না খেয়ে,—দুর্ভিক্ষ না হ'লেও ক্ষিধেয় পেট শুকিয়ে এইখানে রাস্তায় প'ড়ে তাকে ম'র্‌তে হবে—পরশু না হয় তারপর দিন কিম্বা তারপর দিন। সেই তারপর দিন না হয় কালই হ'ক। তবু আজ জীবনের শেষ—আনন্দের গান দুটো শুনে আসি। থিয়েটার দেখার সুযোগ হয় তো এ জীবনে আর নাও হ'তে পারে।

ন'ব্‌নে সিম্‌লাষ্ট্রীট দিয়ে এসে আবার মাণিকতলায় প'লো। ইচ্ছা বরাবর গিয়ে ডান হাতের গলি দিয়ে একেবারে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ীর পাশে গিয়ে উঠ্‌তে। ডানধারের ফুটপাথে একটা বাড়ীর সাম্‌নে লেখা র'য়েছে—"ব্রাহ্মণের হোটেল।"—সেখানে ভাত বিক্রী হয়।

ন'ব্‌নে বরাবর ভেতর ঢুকে প'ড়ে—একজনকে জিজ্ঞেস করলে—"এক বেলার চার্য্য কত?"

"সে বল্লে—দশ পয়সা থেকে এক টাকা, দেড় টাকা অবধি আছে—যেমন চান।"

"আমি দশ পয়সার খবার চাই—এখুনি দিতে পার্‌বে?" ন'ব্‌নে প্রশ্ন ক'রে লোকটার মুখের দিকে তাকালে।

সে বল্লে—"হ্যাঁ বসুন ঐ বারান্দায়—ও ঝি,—এক গেলাস জল দাও বাবুকে।"

ন'ব্‌নে খেতে ব'স্‌লো। পেট ভ'রে ভাত খেল—ডাল, চচ্চড়ি মাছের ঝোল—কি রকম রান্না হ'য়েছিল—তার স্বাদ বোঝ্‌বার তার শক্তিও ছিল না সময়ও ছিল না। সে কেবল গরাসের পর গরাস পাকিয়ে গিলে গেল। তারপর পুরো দুফেরো জল খেয়ে—ঠাকুরের হাতে দশটা পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেল থিয়েটারে।

তরুণী রঙ্গিনীরা রস-বিলসিত দেহ-ভঙ্গিমায়; লঘু চরণের লাস্য-লীলায় রুণুঝুনু নূপুর শিঞ্জনে; আঁখি পলকের পুলক-বিভঙ্গে—রূপের পশরা ফিরি করা ব্যবসাদারীর যত রকম কুৎসিত বিজ্ঞাপন

হ'তে পারে—তাই করলে। তাদের মুখের ওপর হাতের কাঁকণ বালায়, বুকের ওঠা-পড়ায় বিজলী আলোক আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ল—মূর্চ্ছনায়, মূর্চ্ছনায় সুর চড়িয়ে নায়িকা গান গাইল, তার হাতের ফুলের মালা দোদুল দোলে দোল খেয়ে উঠলো, বাঁশী বেজে গেল,—হাসি এসে খেলে উঠ্‌লো দর্শকদের ওষ্ঠাধরে। বাহোবা দিল, তারিফ ক'র্‌লো সকলেই—কেউ আরো কত কি ব'ল্ল—যা ব'ল্ল তা দিয়ে আর দরকার নেই !

ন'বনে কি ব'সে ব'সে এই আলো গান, হাসি অভিনয় দেখ্‌লে শুন্‌লে ? না। সে কেবল ভেবে ভেবে সারাটা রাত পুইয়ে ফেল্‌লে। এ তরল আনন্দ লঘু মন নিয়ে উপভোগ কর্‌বার স্বপ্নে দেখা দিন আর তার নেই। তার যে সকাল হ'য়ে আস্‌ছিল। রাত শেষ হ'চ্ছিল—আর ন'ব্‌নের মনে শঙ্কা ও হতাশা ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সকালবেলা ;—কাল ; দিন তার আলো জাগরণ, কাজ কোলাহল নিয়ে জেগে উঠ্‌বে। গাড়ী, ঘোড়া, বাবু, বুড়ো, খোঁড়া, ভিখিরী সবাই চ'ল্‌বে শুধু সেই বুঝি আর সামনে চল্‌তে পার্‌বে না—তাদের সঙ্গে। তার সকালবেলা কাল যদি আর না হ'ত।

কিন্তু কাল হ'ল ! সকলের সঙ্গে ন'ব্‌নেও বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। তারা গেল যার যার বাড়ীতে—ন'ব্‌নে যাবে কোথায় ? বিরাট সহরের কলরব-মুখর প্রকাণ্ড রাস্তা সব প'ড়ে রয়েছে—তার যাবার জায়গার অভাব কি ? চিৎপুর দিয়ে বেণ্টিংষ্ট্রীট হ'য়ে বরাবর চ'লে গেল গড়ের মাঠে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ইডেন গার্ডেন। বাগানের ভেতর ঢুকে একটা ঝোঁপের কাছে গাছ তলায় ব'সে ব'সে—শেষে শুয়ে প'লো। কেউ কিছু ব'ল্লে না, বাধা দিলে না কেউ। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে প'লো। উঠ্‌লো যখন বেলা তখন গড়িয়ে গিয়েছিল ন'ব্‌নে উঠে আবার হাঁটতে লাগ্‌ল। রোদ মাথায় করে চ'লে এসে আবার মাঠের ভেতর মনুমেণ্টের কাছে ব'সে প'ল। খানিকক্ষণ সেখানে ব'সে থেকে আবার উঠ্‌লো—হাঁটতে লাগ্‌লো। হাঁটতে হাঁটতে মিউজিয়ামের কাছেই গেল। সেখান থেকে আবার ফির্‌লো। ফিরে কোথায় যাবে ! আজও তো আবার সন্ধ্যে হ'য়ে আস্‌ছে, রাত্তিরে কি উপায় ক'র্‌বে ? আজ কি যাবে জ্ঞানবাবুর বাসায় ! জ্ঞানবাবু তাদের গাঁয়ের বাবুদের জামাই। ক'ল্‌কাতায় ক'ব্‌রেজী পড়েন। কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে সে কবিরাজের বাড়ী। দেখি রাত্তিরটার মত যদি জায়গা হয় ভেবে চ'ল্‌লো কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটের দিকে। থিয়েটার দেখে ফির্‌ছি ব'লে ডেকে জ্ঞানবাবুকে জাগাতে

হবে। হেদোয় এসে অনেক ভেবে রাত অবধি ব'সে থেকে আবার বেড়িয়ে এল রাস্তায়। বারটা অবধি কাছাকাছিই হাঁটাহাটি ক'রে,—নিশীথ যখন নিঝুম মোহে অন্ধকারের ভেতর মাথা তুলে পিশাচের মত দাঁড়িয়ে উঠা বাড়ীগুলোকে নীরব স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল। ন'ব্‌নে সেই সময় সেই বাড়ীতে গিয়ে ডাক্‌লে—"জ্ঞান বাবু, জ্ঞান বাবু।" ভেতর থেকে জবাব এল না কিছুই। এবার কড়াটা ধ'রে জোরে নাড়া দিয়ে—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে "জ্ঞান বাবু, জ্ঞান বাবু।

এবার ভেতর থেকে উত্তর এল জিজ্ঞাসায় "কে?"

"আমি নবনী।"

"অঁ্যা কে? নবনী?"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"হ্যাঁ নবনী—ন'ব্‌নে।"

ভেতর থেকে জ্ঞানবাবু ব'ল্লেন—"ওঃ! কি মশাই! খবর পেয়েছি আমাদের কাছে আর আপ্‌নি না আসেন কর্ত্তারা তাই চান—বুঝেছেন?"

ন'ব্‌নের মনে হ'ল মাথাটা বুঝি কেটে প'ল। সে জোর পায় রাস্তায় নেবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো! গাঁয়ের তাঁদের সঙ্গে যে কি শত্রুতা করেছি?—সেইটেই তো সমস্যা।

একজন পাহারাওয়ালা একটা আলোর খুঁটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝোমাচ্ছিল সে কান্নার আওয়াজে চ'ম্‌কে উঠে ব'ল্ল—"রোতা কাহে!"

ন'ব্‌নে চট্‌ক'রে চোখ মুছে ফেলে ব'ল্লে—"না কিচ্ছু না।" পাহারাওয়ালা আর কিছু না ব'লে আবার চোখ বুঁজ্‌লো। ন'বনে আরো খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে দেখে "বোস কোম্পানীর" "পোর্টিকোর" নীচে জন দুই লোক রাস্তার ওপর শুয়ে র'য়েছে। সে আর হাঁট্‌তেও পারছিল না। গামছাখানা বিছিয়ে ঐ খানেই শুয়ে প'ল।

সকালবেলা ন'ব্‌নে আর যেন উঠে দাঁড়াতে পারে না। ক্ষিধেয় তার সারা শরীর কাঁপ্‌ছিল। কিন্তু ওখানে ব'সে থক্‌লেও তো চ'ল্‌বে না—এখুনি লোক জন চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বে; দোকানদারেরা ঘরের দোর খুল্‌বে—এখানে আর নয়। সে উঠে আস্তে আস্তে যেতে লাগ্‌লো। একটা মুড়ীমুড়কীর দোকান থেকে তিন পয়সার মুড়ীমুড়কী কিনে চ'লে চলেই খেলে। ঐ দুটো মুড়ী পেটে গিয়েও শরীরে যেন একটু বল পেলে। সে হাঁট্‌তেই লাগ্‌লো।

কিন্তু আজ বড় কাহিল লাগ্‌ছিল। বেশীদূর যেতেও পাল্লে না। গোলদীঘিতে এসে ব'সে রইল। তিন পয়সার মুড়ীমুড়কীতেই সেদিন গেল। রাত্তিরে শোবার জন্যে সেই রাস্তায় "বোস কোম্পানীর" দোকানের কাছে এল। একটা লোক তখন বিছানা বিছোচ্ছিল—সে ব'ল্‌লে—"এই হিঁয়া মৎ শোও—তুমারা শোনেকো আস্তে ই 'পোর্টিকো' নেহি হ্যায়।"

বুকটা ন'ব্‌নের যেন ব্যথা ক'রে উঠ্‌লো।—বুকের ওপর দুখান হাত চেপে নিয়ে—সে ফিরে গেল শেয়ালদা ষ্টেশনের দিকে। সেখানে নানা দিকের যাত্রী দু' চার জন তখনও "ওয়েটিং সেডে" ব'সে ছিল। কেউ বা শুয়েও ছিল। ক্লান্তিতে ন'ব্‌নের মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে যেতে চাইছিল সে ব'সে থাক্‌তে আর পাল্লে না—একখানা পাথরের বেঞ্চের ওপর শুয়ে প'ল সে রাত্তির তার সেখানেই কাট্‌লো।

আবার তার পর দিন। এই তার পরদিনের আসার সাম্‌নে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়ে শাসন ক'রে তাকে ফিরিয়ে দেবার প্রতিটুকু শক্তিও ন'ব্‌নের নেই। এই তার পর দিনের খেয়ালের আসরে পালা খেলায় প্রাণটাকে বাজি রেখে ন'ব্‌নে ক্রমাগত হার মেনে খেলেই চ'লেছে। তারপর দিন আবার তারপর দিন। আজ এই তিন দিন ন'ব্‌নের পেটে দানাটীও পড়ে নি। ষ্টেশনে শুয়ে থাকে রাত্তিরে সকালে উঠে এদিক ওদিকে যতক্ষণ পায়ের ওপর দেহটাকে খাড়া রেখে পারে—ঘুরে বেড়ায়। যখন আর পারে না ফিরে আসে শেয়ালদা যাত্রীদের বিশ্রামের ঘরখানিতে। যেন সেও কোথাকার যাত্রী। তারই যে যাত্রা সত্যিকার,—মরণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জীবনযাত্রা তার জোর ক'রে টেনে চ'লেছে, রাক্ষসী ক্ষুধার করাল গ্রাসের ভেতর নির্ব্বিকারে আত্মসমর্পণ ক'রে।

সন্ধ্যাবেলা—গা মাথা তার ট'ল্‌তে লাগ্‌লো যেন মদ খেয়ে নেশা লেগেছে। ন'ব্‌নে অনেক কষ্টে ঘরের বাইরে এসে কলের নীচে মাথা এগিয়ে দিয়ে মাথাটা ধুয়ে নিলে। তারপর আঁজল পুরে তিন চার আঁজল জল খেয়ে আবার ফিরে এল সেই পাথরের বেঞ্চখানার ওপর। যাত্রীরা সব যে যার মত টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠে চ'লে গেল। দশটার পর ভিড় একেবারেই ক'মে গে'ছে। তিন চার জন লোক এদিক ওদিক শুয়েছিল ন'ব্‌নেও তাদের একজন।

হঠাৎ একটা হিন্দুস্থানী তিন সেলাই দে'য়া পাঞ্জাবী গায় দিয়ে প্রকাণ্ড পাগড়ীটা মাথার ওপর জড়িয়ে নিয়ে এসে ন'ব্‌নেকে ঠেলা দিয়ে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লে—"এই তোম্ কাঁহা যায়ে গা?"

ন'ব্‌নের তো আর ঘুম ছিল না চোখে। পেট জ্ব'লে যাচ্ছিল, চোখ বন্ধ ক'র্‌লে সে আঁধার ভ'রে সব কেবল খাবার জিনিষ, ময়রার দোকান দেখ্‌তে পায় আর অম্‌নি ক্ষুধা সমস্তটা শরীরের ও'পর দিয়ে একটা তীব্র জ্বালা স্পন্দিত ক'রে তুলে তাকে, পরের মুহূর্ত্তেই অসাড় অবসন্ন ক'রে ফেলে। সে কথা শুনেই জবাব ক'র্‌লে—"কোথায়ও যাব না ভাই, এইখানেই শুয়ে আছি।" শুক্‌নো কণ্ঠের ভেতর শীর্ণ সে স্বর জড়িয়ে অস্পষ্ট হ'য়ে গেল।

হিন্দুস্থানী বল্‌লে'—"ওঃ তোম্‌-ওহি বোম্বেটিয়া হ্যায়! পকেট মার্‌কে খুব উড়াতা! বা বা! আভ-চল থানেমে।" ব'লে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

থানার ঘরের ভেতর বড় দারোগাবাবু, ছোট দারাগাবাবুর সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলেন—আর মুন্সী মানে রাইটার কনেষ্টবল একপাশে ব'সে ডায়রী লিখ্‌ছিলে।

হিন্দুস্থানী ঘরে ঢুকেই ন'ব্‌নের পরিচয় দিয়ে দিলে—"এহি হুজুর পকেট-কাট্‌ কাল দো তিন আদমীকী পাকেট মার দিয়া।"

ন'ব্‌নে একবার ঢোক গিলে চেষ্টা ক'রে গলাটা একটুখানি ভিজিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লে—"দারোগাবাবু, সত্যি-কথা বিশ্বাস ক'র্‌বেন?"

রেল-পুলীসের বড় বাবুর লোহার মত শক্ত মনটাও ন'ব্‌নের গলার ভেতর আট্‌কে যাওয়া মিনতি ভরা নিবেদনে একটু নরম হ'ল। তিনি বল্লেন—"কি কথা?"

"আমি গাঁট-কাটা নই, ভদ্রলোকের ছেলে—সহরে রাতের জন্য কোথায়ও আশ্রয় না পেয়ে ষ্টেষণে এসে শুয়েছিলাম।"

"কিন্তু তুমি নাকি কালও এখানেই ছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ আজ চারদিন হ'ল রাতে এখানে থাকি;—আমি পাঁচদিন আগে বাড়ী থেকে এসেছিলাম—আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে—কিন্তু তাঁরা আমার থাক্‌বার জায়গা দিলেন না—ফিরে যে কোনোখানে যাব—সে টাকাও আমার নেই।"

দারোগাবাবু শুনে ব'ল্‌লেন,—"কি খাও?"

"যা দু চার আনা ছিল এ কদিন তাইতে খেয়েছি।"

"হুঁ:—আচ্ছা তোমার বাড়ী, ঘর, ঠিকানা, থানা সব বল।"

ন'ব্নে তার ঠিকানা লিখিয়ে দিলে বড় দারোগাবাবু বল্লেন—"যাও বেরিয়ে ষ্টেষণ থেকে—শেয়ালদা'র সীমানায় তুমি থাক্‌তে পারবে না।"

ন'ব্নে ব'ল্লে—"আজকের রাতটা ষ্টেষণে থাক্‌তে দিন্ না দয়া ক'রে দারোগাবাবু।"

বড় বাবু উত্তর দেবার আগেই ছোট বাবু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—"তাহ'লে ঐ ঘরে থাক্‌তে হবে হে।"

সেটা ষ্টেষণের থানার গারদ-ঘর। ন'বনে চোখ ভরে জল নিয়ে বড় দারোগা বাবুর দিকে তাকিয়ে বল্লে—"আচ্ছা যাচ্ছি—নমস্কার।"

পেছন ফিরে দরজার কাছে এসেছে যেমন—বড় বাবুর মনে বুঝি একটু দয়া হ'ল—তিনি ডেকে বল্লেন—"ওহে,—দেখ—আচ্ছা আজ রাতের মত থাকগে ষ্টেষণে কিন্তু কাল সকালে যেন এর কাছাকাছিও তোমায় দেখা না যায়।"

"আপনার এমন দয়া দারোগা বাবু!" বল্‌তে বল্‌তে ন'বনে স‌ত্যি করেই কেঁদে ফেল্‌লো—ক্ষিধের তার স্নায়ুজালের ভেতর একটা তড়িৎ-প্রবাহ অস্থির আবেগে কাঁপছিল। দারোগা বাবুর এই কথায় অনুভবের একটা নতুন সাড়া বাইরে থেকে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে সে আবেগটাকে বুক-ফাটা অশ্রুধারায় ঝরিয়ে গলিয়ে দিল।

ন'বনে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে—ভাবতে লাগলো—"শেষ হল—এও ফুরালো, তবু শ্রান্ত দেহে বসে থাকবার জায়গা ছিল—কাল তাও থাকবে না। শেয়ালদা ষ্টেষণে আসা আমার বারণ; আবার যদি আসি হয় তো ওরা আমায় হাজতে আটকাবে—আমার "বিনি-দোষে" জেল হবে। কিন্তু সে কি বেশী কষ্ট? এই ক্ষিধের যন্ত্রণার থেকে কারার বাঁধন বুঝি বরণ করে নেওয়া সুখের, ওরা তো সেখানে আমায় দুবেলা খেতে দেবে। নাঃ ত'ও তো হবে না কিন্তু কাল কি করবো, এই এত বড় সহরের বুকে নিশ্চিন্তে শুধু বসে থাক্‌তে পারি—এমন একটু জায়গাও যে আমার নেই! কি করবো! আর সয় না!—পারি নে আর বরদাস্ত করতে, কিন্তু কই বুকটা তো "তবুও হঠাৎ" তার ভেতরের চলা থামিয়ে দিচ্ছে না! যা'ক্ যা'ক হৃদ্‌-পিণ্ডের গতি ধাঁ করে থেমে যাক্—আমি উদ্ধার হই—মুক্তি পাই এ যন্ত্রণার হাত থেকে!

সেই থেমে যাবার শুভক্ষণের আশায়—প্রতীক্ষায় শুধু আমার চেয়ে থাক্‌বার অধিকার আছে, তাকে জোর করে থামিয়ে দেবার হাত তো আমার নেই—আমি যে মানুষ!

তা' হ'লে কা'ল? হাঁ—মনে হয়েছে। গড়ের মাঠে যাব—মনুমেন্টের তলায়। পারি যদি—কেউ যদি বাধা না দেয়—ঐখানেই রাত্তিরে শোব—কিন্তু খাব কি—ওর কাছাকাছি তো জলের কলও একটা নেই!

আবার ক্ষিধের জ্বালা,—এক সঙ্গে যেন হাজার বৃশ্চিক তার দেহের ভেতরে বাইরে বিষ ছড়িয়ে কাম্‌ড়ে গেল। সে গায়ের ওপর দিয়ে হাতখানা একবার বুলিয়ে নিয়ে উঠে বস্‌লে—তখন ফর্‌সা হয়ে গিয়েছিল।

শৈবণে আর নয়। সে চল্‌তে লাগলো—মাঠের পানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে দম সংগ্রহ করে নিলে। মাঠেরকাছে এসে একটু থেমে আবার মৃণাল বাবুর বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলে। গেছে বছর কল্‌কাতা এক্‌জিবিসন্ দেখতে এসে একজন ধনী-ঘরের ছেলের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়েছিল—সে না-কি কোথাকার রাজপরিবারের ছেলে! তার কাছে চল্‌লো। যদি সে চারটা টাকা ধার কি ভিক্ষে দেয়—ভিক্ষে! হাঁ—যদি দয়া করে ভিক্ষেই দেয় তবে চলে যাব—এই কল্‌কাতা ছেড়ে। এখানকার ঐশ্বর্য্য শুধু ঐ বড় বড় উঁচু কার্ণিস তোলা গম্বুজ ওড়ানো বাড়ীগুলোর ভেতর জমা আছে। নিরন্ন ভিখারী দুবেলা দুমুঠো জোটবার খরচ দু'গণ্ডা কড়ি এখানে খুঁজলেও মেলে না। পাড়া-গাঁ এর চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে অতি গরীবও উপোস করে না। তার শত্রু প্রতিবেশীও না-খেয়ে আছে জানতে পার্‌লে দু'কুন্‌কো চাল অন্ততঃ তাকে দিয়ে আসে। মাঝের-গাঁয়ে তো কত বার কত দিন থিয়েটার কর্ত্তে গিয়ে বেশ থেকেছি—নাই-ই গেলাম নিজের গাঁয়ে—সেই মাঝের গাঁয়েই ফিরে যাব! তারা চারটি খেতে আমায় দেবেই নিশ্চয়।

এই ভেবে ন'বনে ল্যান্সডাউন রোডের সেই ধনী বাড়ীতে গিয়ে—দোরে দাঁড়ালে। দারোয়ান বল্লে—বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। ন'বনে দারোয়ানকে বল্লে—"ভাই, একটি-বার মোটে দেখা চাই—আমার বড্ড জরুরী কাজ—আমাকে তিনি চেনেন—বল নবনী দেখা করতে চায়।"

দারোয়ান কি ভেবে ভেতরে ঢুকে তখ্‌খুনি আবার ফিরে এসে বল্লে—"যান্ ভেতরে।"

মৃণালবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। ন'ব্‌নের ময়লা জামা কাপড়। তেলহীন উস্কখুস্ক চুল—'ক্ষিধের' শীর্ণ শরীর—মুখের রঙ্ পিংসে হ'য়ে গেছে—হাতের আঙুলগুলোতে ময়লা ব'সেছে—

আঙুলের ডগায় রক্তের লেশও নেই। মৃণালবাবু জিগ্‌গেষ ক'র্‌লেন—"কি কথা তোমার ?"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"আমায় চারটে টাকা ধার দেবেন ?" ন'ব্‌নে একটুও মুখবন্ধ না ক'রে সোজাসুজি তার নিবেদন জানালে। মৃণালবাবু অবাক হ'য়ে গিয়েছেন যেন এই রকম ভাব দেখিয়ে বল্লেন—"টাকা ধার দোব—তোমাকে ?"

ন'ব্‌নে হাত দুখান অনিচ্ছায়ই যোড় ক'রে ভিক্ষুকের মিনতি নিয়ে ব'ল্‌লে—"না হয়—ভিক্ষে দিন।"

মৃণালবাবু বড় লোকের মামুলী দস্তর হাসি হেসে ব'ল্লেন—"ভিক্ষে কি অত সহজেই পাওয়া যায় হে ছোক্‌রা ? ময়লা সুড়ী কাপড় জামা প'রে এসে হাত পাত্‌লেই বুঝি একেবারে চারটে টাকা এসে হাতে প'লো—বেশ তো 'ব্যবসা' আরম্ভ ক'রেছ হে—যাও !"

যাও !—হ্যাঁ—যাবই তো মৃণালবাবু, আপনার এখানে থাক্‌বার আমার কি কিছু দাবী আছে ! আপনি 'মানুষ'—সেটা সত্যি কথা—কিন্তু এ শতাব্দীর সহরে বড় মানুষের কাছে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার মনুষত্ব আশা করে যে—সেই শুধু হতভাগা নয়—সে নির্ব্বোধ। কিন্তু আমার জেলার বড় বাবুটী—? না তিনি দেবতা।

এই ভাবতে ভাবতে ন'ব্‌নে হঠাৎ কি একটা যেন মনে ক'রে ধাঁ ক'রে ব'লে ফেল্‌লে—"মৃণালবাবু আমায় চাকর রাখ্‌বেন ?"

"চাকর রাখ্‌বো তোমায় ? কেন টাকা চুরি ক'রে পালাবার জন্যে ?"

ন'ব্‌নে আত্মমর্য্যাদা আহত অভিমানে, ক্ষোভে অপমানে চৌচির হ'য়ে ফেটে প'ড়্‌লো—সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"চুরি ক'রে পালাবো ?" চুরি ? আজ চারদিন খাইনি—যদি না খেয়ে ম'র্‌তেও হয়—"

"চারদিন খাও না—সত্যি ? তা হ'লে বেঁচে আছ কি ক'রে ?"

"বেঁচে কি আমি আছি সত্যি—মৃণালবাবু ? বেঁচে আছি ? হ্যাঁ বেঁচে আছি—রাস্তার কলের জল পেট পুরে খেয়ে—জলে এখনও বেঁচে আছি।"

মৃণালবাবু একটুক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে ব'ল্‌লেন—"আচ্ছা এখানে চারটী খেয়ে যাও আজ"—

"না" ব'লে ন'ব্‌নে উন্মাদের মত দৌড়িয়ে বাড়ীর বা'র হ'য়ে রাস্তায় এল। তার মাথার ভেতর তখন সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। এই মুখর রাজধানীর ঘন কলরব যেন একেবারে নীরব হ'য়ে গিয়েছে—এই বাড়ী ঘর দোকান পাট, বিজ্ঞাপনের কাগজ, গাড়ী ঘুড়ীর সগর্ব্ব সশব্দ যাতায়াত কিছুই যেন নেই। এমন দিনের বেলায় আলোর প্লাবন স্পষ্ট পরিষ্কার চারিদিক বুঝি গাঢ় একটা অন্ধকারের ঘন কালো আস্তরণের নীচে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। ন'ব্‌নে নেই—ন'ব্‌নে ব'লে কেউ কোনো দিন ছিল না। সে দুই হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে ব'সে প'ল। চোখ দুটোর পাতা দুখান প্রসারিত ক'রে খোলা ছিল কিন্তু ন'ব্‌নে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিল না।

এই রকম প্রায় দশ মিনিট। তার পর মনে আবার চিন্তা ফিরে এল, মাথার ভারিটা হাল্কা হ'য়ে গেল ;—ন'ব্‌নে উঠে আস্তে আস্তে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে একটা খাবার দোকানের কাছে এসে খানিকটা দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে তাকিয় খাবারগুলো সব দেখ্‌লে। খাবার দেখে বুঝি ক্ষিধে একটু কম্‌লো। নিরুপায় আজ সে চ'ল্‌লো—রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে। সেইখানে তার মাঝের গাঁয়ের বন্ধু যতীন মেসে থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। তার কাছে গেল—টাকা সে নিশ্চয়ই পাবে। যতীন ন'ব্‌নেকে সত্যিই ভালবাসে। আর মাঝের গাঁয় ফিরে যাবার জন্যেই সে "টাকা চায়!"

"মেসে"—বরাবর ওপরে উঠে যতীনের ঘরের দিকে গেল। যতীনের এ ঘরে সে গত বছর এক মাসের বেশী থেকে গিয়েছে। মেসের অন্য ছেলেরাও কেউ কেউ তাকে চিন্‌তো। তখন তো ভালও বাস্‌তো।

ঘরে ঢুক্‌তে যেতেই কমলের সঙ্গে দেখা—কমল হেসেই "কি হে নবনী যে।" ব'লে হঠাৎ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে যেন তার মুখ জামা কাপড়ের দিকে তাকালো।

ন'ব্‌নে বুঝতে পার্‌লো ব'ল্ল—"ভাই আর ব'লো না তোমাদের ক'ল্‌কাতার কথা—কেবল কালি আর ধুলো জামা-কাপড় রাখা চলে না—একদিনে 'কিষ্টি' হ'য়ে যায়।"

কমল ব'ল্লে—"তা সত্যি"—"তুমি কবে এলে? যতীনও বেরিয়েছে।"

"দিন-চারেক হ'ল এসেছি—যতীন ফিরবে তো শীগ্‌গিরি? আমি একটু বসি।"

"ব'সো" ব'লে কমল চ'লে গেল। ন'ব্‌নে ঘরের ভেতর ঢুকে যতীনের টেব্‌লের কাছে চেয়ারের ওপর ব'স্‌লো! অনেকক্ষণ যতীন ফির্‌ল না। কাগজ-খাতাগুলো অন্যমনস্কে নাড়া-

চাড়া ক'রতে ক'রতে দেখে—খাতাগুলোর ও পাশে একটা মনিব্যাগ! টাকা আছে নিশ্চয় ওতে! মনিব্যাগটা তুলে নিয়ে খুললো। দেখে একটা টাকা আর দুটো পয়সা র'য়েছে। ন'ব্নের পেটের ভেতর ২।৪ মিনিটের জন্য ভুলে যাওয়া মূর্চ্ছিত ক্ষুধার জ্বালা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে "চাই চাই" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্লো। ন'ব্নে ব'ল্লো উঃ ক্ষিধের কি কষ্ট!

এ টাকা আমি নিয়ে যাব। নিজেদের ভেতর টাকাটা তুলে নিয়ে ন'ব্নে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঁড়ি ব'য়ে নেবে রাস্তায় এল। প্রথম যে দোকানটা পেলে সেইখানেই ব'সে চার আনার খাবার খেয়ে পেট পূরে জল খেলে। জলের আর কোনও স্বাদ এখন তার মুখে লাগে না। তবু জল খেয়ে একটু সুস্থ হ'লে পেটের ভেতরটা বার কত নাড়া দিয়ে উঠ্লে সে জোর ক'রে চোখ মুখ বুঁজে মুখের ওপর কুঁচকিয়ে তুলে—সেটা সাম্লে নিলে। দোকানের বেঞ্চ ছেড়ে উঠ্তে যাবে এর ভেতর একটা কালো বছর আষ্টেক বয়সের ছেলে এসে দোকানদারের কাছে একখানা গজা ভিক্ষে চাইলে ব'লে "সারাদিন কিছু খাই নি—দাও না দোকানি, একখানা গজা।"

দোকানী "যা যা পালা—বেটা গজা খাবে।" ব'লে ধ'ম্কে দিতেই ন'ব্নে কিছু না ব'লে হাত থেকে দোকানীর ফিরিয়ে দে'য়া তিনটে সিকির একটা "ছোক্রার সাম্নে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে গেল। দোকানী একটু যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল—মিনিট দুই—ন'ব্নে ততক্ষণে দৃষ্টির আড়াল হ'য়ে গেল।

হ্যারিসন রোড় পোষ্টাপিস থেকে একখানা পোষ্টকার্ড নিয়ে ন'ব্নে তার পকেট থেকে "উড্ পেন্সিল"টা বার ক'রে চিঠি লিখ্লে—"যতীন, তোমার একটা টাকা আমি চুরি ক'রে এনেছি—চোরের সঙ্গে তোমার মত সচ্চরিত্রের বন্ধুতা থাকা উচিত নয় তাই আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না। ইতি—

ন'ব্নে।"

চিঠি ডাকে ফেলে—ন'ব্নে কলেজ স্কোয়্যারের পানে হাঁটতে হাঁটতে—সেনেট হাউসের সাম্নে এসে থ'ম্কে দাঁড়ালো। খেয়ে দেহটা একটু ভারি লাগ্ছিল বটে কিন্তু মাথাটা অনেকটা পরিষ্কার হ'য়ে গেছ্লো। সে ভেবে ঠিক ক'র্লে—এই তো বেশ শোয়ার জায়গা। সেনেটের

বারান্দায়—ঐ মূর্ত্তিটার পেছনে এসে শোব। ন'ব্নের আহ্লাদে হাসি পেল। সে হাস্লই।

আরো সাতদিন কাট্লো। আট আনায় সাতদিন। আটদিনের দিন থেকে আবার উপোস।

ন'দিন দশদিন গেল। এগারদিনের দিন তার মনে হ'ল কিন্তু উপায় কি? এম্নি ক'রে কি সারা জীবনের দীর্ঘ দিন রাত কাটানো যায়? এ জীবন যুদ্ধের মানে কি? এযে বোকমী! ভয়ানক নির্ব্বুদ্ধিতা! উপায় একটা কিছু ঠাওর করা দরকার—রোজগারের কিছু ফিকির ফন্দী না ক'র্লে—এ সহরে এর কমে চ'ল্বে না! ভগবান! একটা উপায় ব'লে দাও! কি ব'ল্লাম? ভগবান! মিছে কথা! ভগবান কেউ নেই—এ দুনিয়া এম্নিই চ'ল্ছে—আপনি তৈরি হ'য়ে—আপ্নিই চ'ল্ছে। ভগবান কে? কোথায় থাকে? স্বর্গে? স্বর্গই কল্পনা! ভগবান টগবান নেই—শুধু আছি আমি—এই সহর,—ঐ লাটসাহেবের বাড়ী তার লাখো লাখো টাকা মাইনে—মোটরগাড়ী,—সাদা রঙের রেলওয়ে স্যালুন—আর আমার পাঁজরের হাড় চিরোনো 'ক্ষিধে।' কিন্তু উপায় চাই—আমার বেঁচে থাকতে হবে—এই ঈশ্বরের ওপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ একটা আমার নিতে হবে।

কিন্তু উপায় যে কিছুই নেই। আমার দেহ ও আত্মাকে একসঙ্গে টিঁকিয়ে রাখ্বার জন্য দুটী অন্নের সংস্থান কি ক'রে করি।

তাইত! ন'ব্বে খানিকটা চোখ বুঁজে ভাব্লে। উপায় তো আছে একটা! হ'য়েছে—পাওয়া গেছে! মুটেগিরি ক'রে তো দিন গুজরান হ'তে পারে। কিন্তু মুটে হ'তে—আবার কর্পোরেশনের অনুমতি নিতে হয় নাকি! যদি হয় পরে নে'য়া যাবে। আজ থেকেই ব্যবসা আরম্ভ করা যাক। এই পরের ট্রেণেই মোট বইতে শেয়ালদা ষ্টেশণে যাব। পার্বো না? খুব পার্বো! এই তো শক্ত দু'খান হাত—ক'দিনের অনাহারে কিছু শীর্ণ হয়েছে—খেতে পেলেই আবার এতে বল হবে। পুষ্ট ঘাড়—এতে এক মন ভারি বোঝাও আমি বইতে পার্বো। চমৎকার উপায়! কে আমার কানে কানে এসে চুপি চুপি এ উপায়ের বাণী শুনিয়ে গেল কে তিনি? আছেন আছেন ভগবান আছেন। ঈশ্বর,—তুমি আছ। আমার প্রণাম নাও। আজ আমি মুটে,—দিন-মজুর কুলী! তোমার বিধানকে আশীর্ব্বাদ ব'লে মাথায় ক'রে

নিয়েছি—আজও নিলাম। দেখ্‌বো তুমি কেমন দয়াময়—মোট অন্ততঃ দুটো আমায় আজ জুটিয়ে দিতে হবে।

এ কি আশ্বাসের আনন্দ! ভাব্‌তে ভাব্‌তে ন'ব্‌নের শিরার ভেতর ক্ষীণ রক্তের স্রোত জোয়ার খেলে নেচে উঠ্‌লো। সব সেখানকার হতাশ্বাস, এক নিমেষে কোন সুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে অমৃতের ভরা গাঙ সেখান দিয়ে ঢেউ তুলে ব'য়ে গেল। অপরূপ নিষ্কৃতির এ প্রগাঢ় পরিতৃপ্তি। বেঁচে থাকার একটা উপায় হল।

আশায় আহ্লাদে ন'ব্‌নের দেহে সত্যি করেই নতুন বল দিয়ে গেল। সে ছুট্‌লো ষ্টেষণের দিকে। ট্রামের রাস্তর সাম্‌নে ষ্টেষণ ঘরের বাহিরের সিঁড়ির একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ট্রেণ আসার তখনো দেরী ছিল। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল। মনে যে আশা তাকে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য দিয়েছে। হস্ত তাকে সবল ক'রে তুলেছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখ্‌লো একটা বাবু তার পাশ দিয়ে মিঠা গন্ধ ধোঁয়ায় উড়িয়ে সিগারেট টেনে চ'লেছেন। ন'ব্‌নের আজ অনেকদিন পরে ইচ্ছে ক'র্‌লো একটু সিগারেট খেতে। কিন্তু—পয়সা? নেই নেই একটা পাই পয়সাও তো নেই; কিন্তু হবে গাড়ীখান এলেই হয়। সে হয় ত অনেক্ষণ! যদি এখুনি একটা সিগারেট পেতাম। পকেটে তো আমার অনেক দিনের পুরোনো একটা দেশলাই মজুত আছে—যদি একটা সিগারেট কি বিড়ি পেতাম! ধরাতাম এখুনি।

সম্মুখেই রাস্তার ধুলোর ভেতর গড়াচ্ছিল এক টুক্‌রো পোড়া সিগারেট—মস্ত টুক্‌রো প্রায় অর্দ্ধেকটা। সিগারেটটা তুলে নিতে তবু লজ্জা! এদিক ওদিক তাকিয়ে নীচু হ'য়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখ্‌ না দেখ্‌ সিগারেটের টুক্‌রোটা তুলে নিয়ে ধ'রিয়ে জোর টান্‌লে। কিন্তু ক্ষুধিতের মস্তিষ্ক—সেখানে তো জোর ক'রে বল এনে কোন মতে মাথাটাকে খাড়া রেখেছিল—সেও একরকম উন্মাদনা। তামাকের কড়া ধোঁয়া মাথায় গিয়ে নিকোটিন্‌ বিষ তাকে ঘুরিয়ে তুল্‌লো। ন'ব্‌নে ব'সে প'ল। মিনিট পাঁচেক মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে শরীরটা আগাগোড়া ঝিম ঝিম ক'র্‌লো। তারপর স্থির হ'য়ে আবার ন'ব্‌নে উঠে দাঁড়ালো।

গাড়ি একখানা এল। যাত্রীরা ঠেলা ঠেলি ক'রে বেড়িয়ে কেউ গাড়ী নিয়ে, কেউ হেঁটে যার যার যাবার জায়গায় চ'ল্লেন। মুটেরা এক একটা ঝাঁকা নিয়ে হাঁক্‌তে লাগ্‌লো "মোটিয়া লাগে বাবু,—ঝাঁকা মোটিয়া?" যার ইচ্ছে হ'ল বাড়ীর রাস্তার নাম ব'লে দিয়ে তার চেঙারীর

ভেতর মাল তু'লে দিলেন। ন'ব্নের এ ব্যবসায় পহেলা—শিক্ষানবিশী। সে সাহস ক'রে "মুটে চাই" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্তে পার্লো না।—লোকও এল না কেউ—মোটও পেলে না! সব লোকই ত চ'লে গেছে। তবে হ'ল না। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। এমন সময় তার পাশ দিয়ে একজন একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে নেবে এলেন। এ গাড়ীর তিনিই শেষ যাত্রী—বুঝি নেবেছিলেন। ন'ব্নের গা ঘেঁষেই এক রকম নাব্ছিলেন তিনি। তিনি চ'লে গেলে ত—এ গাড়ীতে আর আশা নেই। চ'লে বুঝি গেলেন—ন'ব্নে প্রাণপন চেষ্টায় নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যেন চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্লো "মুটে।" আর কিছু ব'ল্তে পার্লে না।

লোকটী চোখ কটমটিয়ে একবার তাকিয়ে—আরও দু' পা এগিয়ে গেলেন। ন'ব্নে আবার আশা নিয়ে ব'ল্লো—"মুটে লাগে বাবু—আঁ্যা!—না—না—সাহেব।"

ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি তিনি সত্যি ক'রেই বুঝি সাহেব—সাহেবী রঙ, সাহেবী পোষাক। 　　ক্রমশঃ—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বন্ধুবর—

মিঃ জে, জি, ড্রামণ্ড সাহেবের প্রতি *

হে বিদেশী বন্ধু আমার, নওকো তুমি দেশী,
তবু আমার তোমার দিকে টান,
বরেণ্য সে বার্ণস কবির নিকট-প্রতিবেশী,
মূর্ত্ত তুমি তাঁহার মধুগান।

* ইনি ঢাকার কলেক্টার, বঙ্গভাষাবিদ এবং সাহিত্যিক

(২)

নাইক মনে জাতি এবং পদের অহঙ্কার,
সাদা রঙের বড়াই তোমার নাই,
শিখে নেছ আপন করে মুক্ত তোমার দ্বার
ভিন্ জাতি যে সত্যি ভুলে যাই।

(৩)

জবর হাকিম অনেক বছর হাজত দিতে পার
জেতে আবার বৃটিশ সেটা জানো,
তবু তুমি এমন মৃদু অপ্রিয় নও কারও
দেশের প্রীতি বুকের কাছে টানো

(৪)

কর্ত্তব্যেতে নিষ্ঠা এমন, এমন বিবেচনা,
ন্যায়ের প্রতি এমন অনুরাগ,
এমন কোমল, এমন করুণ, এমন মহামনা,
গুণের কথা বলব না আর থাক্!

(৫)

উপন্যাসের রাজার রাজার তুমি স্বদেশবাসী
পরীর দেশে তোমার আনাগোণা,
হস্ত তোমার কার্য্য করে চক্ষে তোমার হাসি
বক্ষে মনে বাণীর আরাধনা।

(৬)

নানান্ কাজের 'কাণপুরেতে' রুদ্ধ আমি আজ
হঠাৎ পেলাম তোমার চিঠিখান্
সুদূর মধুর মিঠে আওয়াজ জাগ্‌লো বুকের মাঝ
চেনা স্কটিস্ ব্যাগ্-পাইপের গান।*

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রুষ কথা-সাহিত্যে ডষ্টয়েভস্কি

(আলোচনা)

বিখ্যাত সাহিত্যরথী ম্যাথু আর্নল্ড রুষকথাসাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"The Russian novel has now the vogue and deserves to have it." রুষকথাসাহিত্যই আজকাল সাহিত্যের আসর জমাইয়া বসিয়াছে এবং তদুপযুক্ত ক্ষমতাও ইহার যথেষ্ট আছে। আমেরিকার একজন বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন—"Russian fiction is like German music the best in the world." রুষকাথাসাহিত্য জার্ম্মেণীর সঙ্গীতের মত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক গোগল, টুর্গেনিভ, টলষ্টয় ও ডষ্টয়েভস্কির মত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমালার প্রতিভালোকে যে কথাসাহিত্যাকাশ আলোকিত, তাহার গৌরব ও মহত্ত্বে সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই।

---

* কানপুরে যখন সিপাহী বিদ্রোহে বহু ব্রিটিশ নরনারী বন্দী ছিল তখন তাহারা স্কটিস ব্যাগ-পাইপের গীত শুনিয়া মুক্তি নিকট জানিতে পারিয়া বড়ই উল্লসিত হইয়াছিল।

রুশসাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয়েই আমাদের কাছে ধরা পড়ে ইহার গভীর বিষাদময় সুর। যে জীবনের চিত্র আমরা সেখানে চিত্রিত দেখিতে পাই, সেখানে আনন্দের দীপ্তি নাই, সুখের রঙীন রেখা বেদনার প্রলেপে বড় অস্পষ্ট, সমস্ত চিত্রখানি জুড়িয়া আছে শুধু বিষাদের মৃত্যুম্লান কুহেলী। পুসকিনের প্রথম বয়সের কবিতায় ও গোগলের প্রথম বয়সের উপন্যাসে যৌবনের আনন্দ ও তরলতা ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু জীবনের প্রথম অধ্যায়ের অবসানেই সে ফুল ঝরিয়া পড়িল, জীবনের বৃন্তে বৃন্তে দুঃখের কাঁটা জাগিয়া উঠিল। টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভ্স্কি প্রভৃতি সকলেই সাহিত্যমন্দিরে বসিয়া যে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছেন—সে ঝঙ্কার প্রাণ-বন-মুগ্ধ-আকাশের তলে এক অখণ্ড মেঘমল্লার।

সাহিত্যে এই গভীর বিষাদরাগিণীর আলাপের কারণ কি? জীবনে যেখানে বিষাদ, সাহিত্যেও সেখানে বিষাদই বাজে। রুষজাতীয় জীবনের ইতিহাস প্রাণের রক্তে ও অশ্রুজলে লিখিত, বর্ত্তমান এক অসহনীয় দুঃখে পরিপূর্ণ, ভবিষ্যৎ এক নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত। সীমাহীন অনুর্বর প্রান্তর, সুবিস্তৃত অরণ্য, কঠোর শীত, প্রকৃতির সহিত মানুষের ভীষণ জীবন-সংগ্রাম, সামাজিক জীবনে দাসবৃত্তি, মোগলতাতারতুর্কীর আক্রমণের প্রবল তাড়না ও মৃত্যু-বিভীষিকা ও সর্ব্বোপরি, প্রতিষ্ঠিত শাসন তন্ত্রের কঠোর নিপীড়ন রুষজাতির জীবন হইতে সকল সুখ, সকল মাধুর্য্য অপহরণ করিয়াছে এবং চিরদিনের মত রুষের মনে নিবিড় দুঃখের এক সুগভীর রেখাপাত করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণেই রুষ-কৃষকের কৌতুক ও হাস্য নির্য্যাতিত নরনারীর ওষ্ঠপ্রান্ত সংলগ্ন কোমল হাসিটুকুর মত বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। রুষকৃষকের নিকট এ জীবন কেবলমাত্র এক দুর্ব্বহ ভার,—ভোগ নাই, কর্ম্ম নাই, আশা নাই, বড় শুষ্ক, বড় কঠোর। দিনের পর দিন এই দুর্ব্বহ ভার সে বহন করিয়া চলিয়াছে, শ্রান্তিজনিত দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে, অবসাদে প্রাণক্ষীণ,—এই রকম এক আশাহীন দীর্ঘপথের যাত্রী এই রুষজাতি।

এই অসীম দুঃখ-সাগর মন্থন করিয়া রুশসাহিত্যিকগণ এক অমৃতভাণ্ড লাভ করিয়াছেন—মানবতার প্রতি সুগভীর দয়া ও সুবিশাল সহানুভূতি। ডষ্টয়েভ্স্কির সেই মহাবাণী—"I did not bow down to you individually but to suffering Humanity in your person." চিরদিন রুষসাহিত্যের অমৃতত্বের বার্ত্তা বিশ্বমানবের নিকট ঘোষণা করিবে। গোর্কি, টলষ্টয়, এণ্ড্রিভ প্রভৃতি সকলেই এই এক মহাবাণীর প্রচারক।

কিন্তু এই বেদনা-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হইলেন ডষ্টয়েভ্স্কি। Suffering is the corner-stone of Russian life, as it is of Russian fiction." এই কথা তাহার সম্বন্ধে যেমন সত্য এমন বোধ হয় আর কাহারও সম্বন্ধে নয়। তাঁহার এই বিশাল দয়া ও সহানুভূতি কেবলমাত্র ভাবুকতা বা সৌখীনতা নয়,—যে জীবনের আদ্যন্ত এক কঠোর দুঃস্থ বেদনার অশ্রুসিক্ত কাহিনী সে জীবনে সৌখীনতার স্থান একেবারেই নাই। জীবনের বেদনা ও দুঃখের হলাহল তাঁহাকে আকণ্ঠপান করিতে হইয়াছিল তবেই তিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। প্রমিথিউসের মত এই মহাবাণীর প্রচারক আজীবন দুঃখতাপানলে দগ্ধ হইয়াছেন বেদনার গৃধ্র কঠোর নখচঞ্চুর আঘাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে কিন্তু তাঁহার বীরহৃদয় মানবজীবনের প্রতি অপার দয়া ও সহানুভূতি কখনও হারায় নাই। সাইবেরিয়ার প্রান্তর হইতে যে দুঃখের বেদনার অভিজ্ঞতা তিনি বহন করিয়া আনিলেন তাঁহার উপরে রুষসাহিত্যের আকাশস্পর্শী বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিল।

১৮৪৫ খৃঃ নিঃস্ব সহায়হীন ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক ডষ্টয়েভ্স্কি প্রকাণ্ড দৈত্যের মত সহর সেণ্টপিটার্সবার্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক সামরিক পূর্ত্ত শিক্ষাগারে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং দুই বৎসর কাল সমর-বিভাগের কোন এক চাকরীতে নিযুক্ত থাকিয়া সাহিত্যে মনোনিবেশ উদ্দেশ্যে পদত্যাগ করিয়া সহরে গমন করিলেন। তাহার পিতা ছিলেন মস্কো সহরের এক দরিদ্র চিকিৎসক, মাতা এক ব্যবসায়ীর কন্যা। জীবনের প্রথম দিন হইতেই দুঃখের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়; এক চিকিৎসালয়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হন (৩০শে অক্টোবর ১৮২১ খৃঃ)। বাল্যকালে পিতার নিকট তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। বাইবেলর ভাব ও খৃষ্টধর্ম্মের সত্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সেণ্টপিটার্সবার্গে আসিয়াই তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস "নিঃস্ব লোক" (Poor Folk) রচনা করেন। সমালোচনার জন্য পাণ্ডুলিপিখানি তাঁহার এক বাল্য-সুহৃদের সাহায্যে কবি Nekrasoffর নিকট তিনি প্রেরণ করেন। সাহিত্যযশোলিপ্সু যুবক অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন অতি প্রত্যূষে যখন ডষ্টয়েভ্স্কি নিদ্রিত, তাঁহার জীর্ণকক্ষের দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল। দ্বার উন্মোচন করিতেই দেখিলেন যে বিখ্যাত কবি Nekrasoff ও তাঁহার বন্ধু দণ্ডায়মান। ডষ্টয়েভস্কিকে দেখিবামাত্র

তাঁহারা উত্তরে আবেগভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বাস্তবিক Nekrasoff লেখকের শক্তি ও প্রাণের পরিচয়ে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাণ্ডুলিপিখানি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন Belinsky, তাঁর নামে নবীন সাহিত্যিকগণ কাঁপিত। Nekrasoff একদিন Belinskyর নিকট যাইয়া বলিলেন—"A new Gogol has been born unto us." অর্থাৎ "গোগলের ন্যায় ক্ষমতাশালী এক নবীন ঔপন্যাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন।" তাচ্ছিল্যের সহিত বিখ্যাত সমালোচক উত্তর করিলেন—"Gogols spring up like mushrooms now a days." অর্থাৎ, "আজকাল ব্যাঙের ছাতার মত পথে ঘাটে গোগলের মত লেখকের ছড়াছড়ি দেখিতেছি।" অতি বিরক্তির সহিত Belinsky Nekrasoffর হস্ত হইতে পাণ্ডুলিপিখানি গ্রহণ করিলেন। একটুখানি পড়িয়াই বিস্ময়ে তাহার মন পূর্ণ হইল; পাতার পর পাতা উল্টাইতে লাগিলেন— অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইলেন। পড়া সাঙ্গ হইলেই তিনি নবীন সাহিত্যিকের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। কম্পিত চরণে যখন ডষ্টয়েভ্স্কি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—Belinsky উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"Youngman, have you understood all the truth of what you have written ? It is the revelation of an inborn gift, a gift from above. Be true to this gift and you will be a great writer." অর্থাৎ "যুবক, যে সত্য তুমি এখানে প্রকাশ করিয়াছ সে সত্য তুমি কি অন্তরের সহিত বুঝিয়াছ ? এক জন্মগত অলৌকিক প্রতিভা তোমার এই লেখার মধ্যে পরিস্ফুট—এই প্রতিভা ঈশ্বরের দান। এই দানের প্রতি চিরদিন অবহিত থাকিও, তুমি এক বিখ্যাত লেখক হইতে পারিবে।" বিখ্যাত সমালোচকের এই ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিকে একটা মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। বিস্মিত পাঠক-সমাজ এক নবীন প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অনুসন্ধান পাইল।

১৮৪৮ খৃঃ হইতে ডষ্টয়েভস্কির জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা। ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহাকে বেদনাযজ্ঞের প্রধান হোতারূপে বরিত হইতে হইবে, যাঁহার হৃদয় বিগলিত করুণোৎস একদিন ব্যথিত নরনারীর মর্ম্মান্তিক চিত্তবেদনার ইতিহাস—সুগভীর বিষাদ লেখায় ও সুশীতল

শান্তিধারায় অপরূপ মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিবে—তার জীবনের সুবর্ণত্ব বিপদের নিকষ পাষাণেই পরীক্ষিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ ডষ্টয়েভস্কির পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃঃ তিনি এক গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল রুষে Socialistic মতবাদের প্রতিষ্ঠা। তিনি ও তাঁহার ২১ জন সহকর্ম্মী রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইলেন এবং ঐ বৎসরেই ২২শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাদের সকলকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য বধ-মঞ্চে নীত হইলেন। চক্ষুর সম্মুখেই প্রাণদণ্ডের আয়োজন চলিতেছিল—এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মরণের পথিক মৃত্যুর বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, বধের জন্য প্রস্তুত অপরাধীর ভীষণ মনস্তত্ব তাঁহার "The Idiot" নামক উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। ডষ্টয়েভ্স্কির সে সময়ের অনুভূত সত্য বক্ষের রক্ত-লেখায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বধের জন্য ঘাতক-সৈনিকগণ বন্দুক উত্তোলন করিয়াছে, আর এক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহাদের প্রাণহীন দেহগুলি ভূতলে লুণ্ঠিত হইবে, এমন সময়ে এক অশ্বারোহী শ্বেত পতাকা উড়াইয়া সম্রাটের ক্ষমার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে সম্রাট্ তাঁহাদিগের সাইবেরিয়াতে চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অদৃষ্ট-চক্রের সেই নিষ্ঠুর দ্রুত আবর্ত্তণে এক বন্দী চিরদিনের জন্য বিকৃত মস্তিষ্ক হইল। ডষ্টয়েভস্কির বন্ধুবর্গের চেষ্টায় রাজাজ্ঞার ভীষণতা তাঁহার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইয়াছিল। কেবলমাত্র চারি বৎসর কাল তাঁহাকে সাধারণ অপরাধীর মত কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার প্রতি এই অনুগ্রহ দেখান হইয়াছিল।

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মুণ্ডিত মস্তক অপরাধিগণ সাইবেরিয়ায় নীত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে অপর একদল রাজদ্রোহীও সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইঁহারা Decembrists নামে খ্যাত। ইঁহাদের পত্নীরাও স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন। উচ্চবংশোদ্ভূতা বিলাসের অঙ্কে প্রতিপালিতা এই নারীর দল স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া যে সাহস, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন নারীজাতির ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল তাঁহারা সাইবেরিয়ার কারাগারগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন এবং নারীচিত্তের সহজাত মাতৃস্নেহদানে অপরাধিবর্গের কঠোর বন্দী-জীবন একটু সহনীয় করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইতেন। এই দলের কতিপয় নারীর সহিত ডষ্টয়েভস্কির সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের নিকট

উপহার স্বরূপ তিনি একখণ্ড New Testament প্রাপ্ত হইলেন। এই পুস্তকখানি তিনি উপাধানের নিম্নে সযত্নে রক্ষা করিতেন। সমস্ত দিবসের কঠিন পরিশ্রমের পর তাঁহার সঙ্গী বন্দীগণ যখন নিদ্রার সুখস্পর্শে শ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা করিত, তিনি বহুবার অধীত এই পুস্তকখানিই বার বার পড়িতেন এবং জীবনের কঠোরতা অম্লান বদনে সহ্য করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতেন।

এই চিন্তাশীল, কল্পনাপ্রবণ ভাবুক যুবক ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত নিকৃষ্ট অপরাধীর সাহচর্য্যে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অধ্যক্ষদিগের উদ্যত দণ্ডের ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া কি গভীর দুঃখে দিনাতিপাত করিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশ্বসাহিত্যের কোন পূজারীর জীবনই বোধ হয় এত দুঃখপূর্ণ হয় নাই। এই সশ্রম কারাবাস-যাপন কালে সামান্য এক অপরাধের জন্য তাহাকে এমন কঠোর দণ্ড প্রদান করা হয় যে তাহার ফলে তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত হন। তিনি আজীবন এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিয়াছিলেন এবং তাহার মনোবৃত্তি ও রচনা এই ব্যাধির প্রভাবে মনস্তত্ব প্রভূত পরিমাণে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃঃ যখন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনারোহন করেন, রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে অনেক অপরাধীকে ক্ষমা করা হয়; ডষ্টয়েভ্স্কিও এই উপলক্ষে ক্ষমা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ দেশবাসীর সমগ্র অধিকার তিনি পাইলেন, সামরিক বিভাগের পূর্ব্বের পদ তাঁহাকে দেওয়া হইল কিন্তু ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি পাইলেন না। অবশেষে ১৮৫৯ খৃঃ সেই অনুমতিও তাঁহাকে দেওয়া হইল। দশ বৎসর কারাবাসের পর তিনি আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কারাবাসের শেষ ভাগে এক পরলোকগত সঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলে তিনি তাহাকে বিবাহ করেন। ভগবান্ যাঁহার জীবনপাত্র ব্যর্থতার তিক্ত-রসে ভরিয়া দিয়াছিলেন বিফল প্রেমের তীব্র যাতনাও তাঁহার অদৃষ্ট হইতে বাদ পড়ে নাই। রুষে প্রত্যাবর্ত্তনের অতি অল্প কাল পরেই ঐ নারী ডষ্টয়েভস্কিকে পরিত্যাগ করিয়া অপর এক প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষকে আশ্রয় করিল। ডষ্টয়েভস্কি ইহাতে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

সেণ্টপিটার্সবার্গে প্রত্যাগমনের পর ১৮৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকার সম্পাদকত্বে ব্রতী ছিলেন। তিনি অচিরেই দেখিতে পাইলেন যে, দেশের উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের

ঝড় চলিয়া গিয়াছে। সমগ্র রুষ কম্পিত হৃদয়ে এ মহামুক্তির অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মুক্তি পথের পথিক রুষজাতি সবলে সামাজিক রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের কারাগার-দ্বারে করাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে শক্তি এতদিন বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ছিল সে শক্তি আজ জাগ্রত হইয়া এক প্রচণ্ড বিপ্লবের সূচনা করিতেছে। এই অন্ধ প্রচণ্ড শক্তির সার্থকতার শেষ কোথায় কেহই জানিত না—কেবল ছুটিবার নেশায় একটা পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষায় জাতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একদল লোক তখন দেশে ছিলেন যাঁহাদের এই মুক্তির স্বপ্ন প্রবল রাজশক্তির রোষে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই দেশে Nihilism আসিয়া দেখা দিয়াছিল—ইহাই যে ব্যর্থ আশার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ভীষণ পরিণাম—তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। দেশের এই নব জাগরণের সূত্রপাতে ডষ্টয়েভস্কিও মাতিয়া উঠিয়লন।

১৮৬৫ খৃঃ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে নানা দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার দ্বিতীয় পত্রিকখানি রাজাজ্ঞায় বন্ধ হইয়া গেল তিনি প্রকাণ্ড ঋণের দায়ে পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার সহকর্ম্মী ভ্রাতা মাইকেল পরলোকগত হন। উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য তিনি দেশত্যাগ করিলেন; প্রথমতঃ জার্ম্মেণীতে ও পরে ইটালীতে যান। মৃগী রোগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শীঘ্রই তিনি রুষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নূতন পুস্তক দিবার আশা দিয়া প্রকাশকদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন। বাস্তবিক এই ভয়ানক দুঃসময়েই ১৮৬৫ হইতে ১৮৭১ খৃঃ মধ্যে তাহার জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস কয়খানি রচিত হয়—Crime and Punishment, The Idiot, The Possessed. এই শেষোক্ত উপন্যাসখানির রচনার ইতিহাস একটু বিচিত্র। ডষ্টয়েভ্স্কি ও টুর্গেনিভ রাজনৈতিক বিষয়ে কোনদিনও একমতাবলম্বী ছিলেন না, এমন কি সাহিত্যিক হিসাবে একে অপরের প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করিতেন। রুষজাতির মনের অধিনায়ক কে হইবেন ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল না। অনেক দিন হইতে Nihilismর সম্বন্ধে একখানি উপন্যাস রচনা করিবার বাসনা ডষ্টয়েভস্কির ছিল, টুর্গেনিভের Father and Sons প্রকাশিত হইলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই The Possessed নামক উপন্যাসখানা লিখিলেন। ১৮৬১ খৃঃ হইতে Nihilism আলোচনা বা

তর্কের গণ্ডি ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। Nihilismর এই বিপ্লবাত্মক চেষ্টাই তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করিলেন। ইহার আবার তিন বৎসর পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পাইয়া টুর্গেনিভ Virgin Soil নামে অপর একখানি উপন্যাস রচনা করিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে জয়ী হইয়াছেন তাহা সুধী সমাজের বিচার্য্য।

১৮৭১ খৃঃ হইতে ১৮৮১ পর্য্যন্ত ডষ্টয়েভস্কির—জীবনের অপর এক অধ্যায় চলিতেছিল। এই বার যেন তিনি একটুখানি সুখ ও শান্তি পাইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। এই বুদ্ধিমতী নারী আর্থিক ক্লেশ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দান করিতে যথাসাধ্য গৃহকর্ম্মে রত থাকিতেন। ক্রমশঃই তাঁহার যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং পুস্তক লিখিয়া যাহা পাইতেছিলেন তদ্দারা ঋণমুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি একখান পত্রিকা প্রকাশ করেন—"The Notebook of a Scribe." এই পত্রিকাতে তিনি রাজনীতি সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সকল প্রকার মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৮৮১ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী রুষ ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। যে প্রাণ রুষের বেদনায় কাঁদিত, রুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য যিনি সাদরে শৃঙ্খল বরণ করিয়াছিলেন রুষ জন সাধারণের প্রিয়, দেশের নবীন যুবকদের উপদেষ্টা ও বন্ধু ডষ্টয়েভস্কির কঠোর কোমল প্রাণের স্পন্দন চিরদিনের মত থামিয়া গেল। আজ রুষে সেই সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জাতির স্বাধীনতার পতাকা মুক্ত আকাশের তলে উড্ডীন হইয়াছে, জানি না বর্ত্তমান রুষজাতি তাহাদের মহাপুরুষদের বিশেষতঃ ডষ্টয়েভস্কিকে স্মরণ করে কি না।

যখনই ডষ্টয়েভস্কির মৃত্যুসংবাদ সহরে প্রচারিত হইল, দলে দলে লোক তাঁহার বাড়ীর দিকে ছুটিল। সকলেই একবার তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য, মৃত আত্মার প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। একরাশি গোলাপের নিম্নে ডষ্টয়েভস্কি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তাহার বদনমণ্ডলের স্বাভাবিক বেদনার চিহ্ন তিরোহিত হইয়াছিল এক স্থির গভীর প্রশান্তির আলোকে মুখখানি উদ্ভাসিত ছিল।

১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁহাকে সমাধিক্ষেত্রে বহন করিয়া সমাহিত করিবার দিন। প্রায় ২০ হাজার লোক শবের অনুগমন করিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বর্গগত আত্মার

প্রতি স্বীয় ভালবাসা ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছিল। রুষের ছাত্রবর্গ এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল এবং সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত বন্দীর নির্য্যাতনের চিহ্ন স্বরূপ কঠোর লৌহশৃঙ্খল মৃতদেহের পশ্চাতে বহন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু রাজার আদেশে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই জন সমুদ্র দর্শনে রাজপুরুষগণ প্রথমতঃ ভীত হইয়া উঠিলেন কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে জনসঙ্ঘের এই উদ্বেলিত শোক ও ভক্তির উৎস রুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। কেবলমাত্র শান্তিরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত রহিলেন। যদিও এই ঘটনার ঠিক একমাস পরেই Nihilist দিগের হস্তে রুষসম্রাট নিহত হন এবং প্রধান মন্ত্রীর প্রাণ হননের জন্য দুঃসাহসিক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু জনসাধারণ ঐ দিন সকল প্রকার বিদ্বেষ ভুলিয়া কেবলমাত্র ডষ্টয়েভস্কিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার উৎসাহেই মত্ত হইয়াছিল। এই বিরাট জন সাগরের মধ্যে রুষের সকল প্রকার জাতির, কর্ম্মীর ব্যবসায়ীর ও ভাবুকের সমাবেশ হইয়াছিল। সমস্ত জাতির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য লইয়া ডষ্টয়েভস্কি শান্তিময় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র জীবনের এই প্রকারে পরিসমাপ্তি ঘটিল।

ডষ্টয়েভ্স্কি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০খানা উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫—১৮৮৬ খৃঃ সেণ্টপিটার্সবার্গে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থাবলী ছয়খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৯৪—৯৫ খৃঃ উহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে Crime and Punishment, The Idiot, The Possessed, Memoirs of a House of the Dead, The Brothers Karemazav, The Poor Folk সমধিক প্রসিদ্ধ।

যথার্থ শিল্প ও সৌন্দর্য্যের দিক হইতে বিচার করিলে ডষ্টয়েভস্কির সৃষ্টিতে অনেক ত্রুটী ও বিচ্যুতি দেখা যায়। তাঁহার রচনা শক্তি অসাধারণ ছিল এবং দ্রুত রচনার জন্যই তিনি আখ্যান বস্তুর শিল্পানুমত অবতারণা ও সুসমঞ্জস গঠনের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহার রচনায় আমরা দেখিতে পাই, যথার্থ শিল্পী ও ভাবুকের অপরূপ তুলিকার স্পর্শের সহিত অতি সাধারণ লেখকের দুর্ব্বল হস্তের রেখাপাত। এই সকল ত্রুটী সত্বেও বলিতে হইবে যে ডষ্টয়েভস্কির উপন্যাসগুলি বিশ্বসাহিত্যের চিরসম্পদ্। তাঁহার রচনা এমন এক গম্ভীর ভাবে অনুপ্রাণিত যে সকল দোষ ও ত্রুটী সেই গাম্ভীর্য্য ও মহাপ্রাণতার নিকট অতি তুচ্ছ

বলিয়া মনে হয়। যেখানেই তাঁহার প্রাণের সহিত গল্পের আখ্যান ভাগের সংযোগ ঘটে সেইখানেই তাঁহার রচনা বাস্তবতার গৌরবে ও রমণীয়তায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। Memoirs of a House of the Dead খানাই ডষ্টয়েভস্কির একমাত্র উপন্যাস সেখানে তাঁহার শিল্পজ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দারিদ্র্যের কষাঘাত জর্জ্জরিত, পদদলিত নিপীড়িত নরনারীর করুণ মনোব্যথার চিত্র অঙ্কিত করাই ডষ্টয়েভ্স্কির প্রিয় ছিল। এই জীবন পথের আশ্রয়হীন যাত্রীদিগের দৈহিক ও নৈতিক দুঃখরাশির তীব্রতা ও কঠোরতা, মানব প্রকৃতির এই সর্ব্বস্বহারা অসহায় ভাবটী পাঠকের নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার হৃদয় অগাধ সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল। সাইবেরিয়াতে যাহারা নির্ব্বাসিত হইত তাহারা সকলেই রাজদ্রোহিতার অপরাধী নহে। ইহাদের মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর চরিত্রের চোর, ডাকাত, খুনী প্রভৃতি সকলই থাকিত। ডষ্টয়েভস্কি ইহাদের ঘৃণা করিতেন না; ইহাদের পাপাশয়তার কথা বর্ণনা করিবার সময় নীতিবাগীশদের ন্যায় ঘৃণায় তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইত না। তিনি তাহাদিগকে ভাল বাসিতেন। এই ভালবাসায় তাহাদিগের প্রতি কোনও অনুকম্পার ভাব কিম্বা তাহাদিগের দুশ্চরিত্রতার প্রতিবাদ কি সমর্থন কিছুই থাকিত না। তাহাদিগের অসহনীয় দুর্দ্দশার জন্য এবং আশাহীন জীবন্মৃত অবস্থার জন্য এক সহজ সবল আন্তরিক ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় মথিত হইত। এইখানেই ডষ্টয়েভস্কির মহত্ব ও গৌরব।

ডষ্টয়েভ্স্কির সর্ব্বপ্রকার উপন্যাস তাঁহার Crime and Punishment. পুস্তকের গল্পাংশ রোমাঞ্চকারী ঘটনায় পরিপূর্ণ। ঘটনার সংস্পর্শে নৈতিক অবনতির জন্য মানব মনের প্রবল আক্ষেপ ও বেদনায় সমস্ত পুস্তকখানি উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাসের নায়ক এক শিক্ষিত যুবক—এক অতি দরিদ্র ছাত্র, নাম Roskolnikoff. আধুনিক প্রচলিত Materialist মতবাদের দ্বারা সে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ইহার ফলে সে খবরের কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। তাহার ভাবার্থ এই প্রকার—মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত উচ্চ ও নীচ! উচ্চ মানবের আদর্শ Napoleon, এই উচ্চ মানবদিগের জীবন যাত্রায় পক্ষে আমাদের সাধারণ নৈতিকতার আদর্শ কোন বন্ধনই সৃষ্টি করিতে পারে না। এই যুবক বহুদিন পর্য্যন্ত অভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে হতাশ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছিল।

সংসারের তাহার বৃদ্ধা মাতা ও এক অবিবাহিতা বয়স্থা ভগ্নী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ইহাদিগের তাহার ভরণপোষণ ও নিজের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ তাহাকেই করিতে হইত। সংসারের অভাব অনটন এক সময়ে এত কঠোর হইয়াছিল যে তাঁহার ভগ্নী এক ঘৃণিত অথচ ধনী বৃদ্ধকে বিবাহ করিয়া, এই প্রকারে আত্মোৎসর্গদ্বারা—দারিদ্র্যের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে মনস্থ করিল। Roskolnikoff এই বিবাহের ছিল বিরোধী। এক বৃদ্ধা ধনী স্ত্রীলোকের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। সে অধিক সুদে টাকা ধার দিয়া অনেক টাকা জমাইয়াছিল। ইহাকে হত্যা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার চিন্তা সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত। এই সময়েই এক বৃদ্ধ, মদ্যপ, অতি দরিদ্র কেরাণীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই কেরাণীর প্রথম বিবাহের এক কন্যা ছিল, তাহার নাম Sonya. ডষ্টয়েভস্কির নারী-চরিত্রের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রঙ্গমঞ্চে বা কথাসাহিত্যে বহুবার বারনারী চরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু এই চিত্রের তুলনায় অন্যান্য সকলই কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।

পিতার অতিশয় মদ্যাসক্তির জন্য ছোট ছোট ভাই বোনগুলি সহ তাহাদিগকে প্রায়ই অনাহারে কাটাইতে হইত। পরিবারবর্গকে এই উপবাসজনিত আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে পথিকদিগের কদর্য্য দৃষ্টির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইত এবং দেহ দান করিয়া কিছু অর্জ্জন করিত। কিন্তু তাহার মন ছিল কুন্দ কুসুমের মত শুভ্র; সংসারের কুৎসিতত্বের স্পর্শে সে প্রতিদিন ঝরিয়া পড়িত এবং প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইত। একজন সমালোচক বলিয়াছেন—She seems to have stepped out of the pages of the New testament. ** ** ** She dies daily, and from her sacrifice rises a life of eternal beauty." এই Sonyaর সহিত Roskolnikoffর পরিচয় হইল। চতুর্দ্দিকের আনুষঙ্গিক ঘটনা ক্রমাগত তাহাকে হত্যার দিকে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সত্য সত্যই সে ঐ বৃদ্ধা নারী ও তাহার ভগ্নীকে হত্যা করিয়া বসিল। ইহাই উপন্যাসের প্রথম অংশ। যে ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া Roskolniksff এই হত্যাকাণ্ড করিল তাহার সৃষ্টি ও বর্ণনা অতুলনীয়। ইহার পরেই তাহার জীবনের Tragedyর আরম্ভ। এই গর্হিত কার্য্যের জন্য জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার মনে হইতেছিল জীবন-সূত্র কোন এক স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, জনসমাজের মধ্যে তাহার আর

স্থান নাই তাহার জীবন স্পন্দনের সহিত এই বিশ্বমানবের জীবন-স্পন্দনের যেন সুরের একটা প্রকাণ্ড অমিল সৃষ্ট হইয়াছে। নিজের আহত বিবেকের তাড়নায়, যে উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিতে না পারায় কলঙ্কের ভয়ে ও আত্মগ্লানিতে সে বিশেষভাবে বিচলিত ও কাতর হইয়া পড়িল। পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া কি প্রকারে নির্দ্দোষ সাজিয়া থাকা যায় ইহাই হইল তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্যই সে পুলিশের সহিত পরিচয়স্থাপন করিল। ঘটনার সৃষ্টি এখানে এমন অপূর্ব্ব—এমন রহস্যপূর্ণ যে পাঠকের মনে স্বতঃই প্রতি মুহূর্ত্তে উদিত না হইয়া পারে না—ওঃ এই বুঝি, এই মুহূর্ত্তেই সব খেলা শেষ হইবে, Roskolnikoff নিজের অপরাধটা বুঝি স্বীকার করিয়া ফেলিবে কিন্তু অপরূপ চাতুর্য্যের সহিত বাক্যজাল ছিন্ন করিয়া সে ছুটিত এবং এই ভয়ঙ্কর খেলা আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিত। এই সব স্থানে গল্প এমন জমিয়া উঠিয়াছে যে পাঠকের নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না। গল্পের ভয়ঙ্কর মনোহারিত্ব সর্পের সৌন্দর্য্যের মত মনকে ভয় ও আনন্দে পূর্ণ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট Porfir ডষ্টয়েভস্কির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ব্যাঘ্র যেমন শীকারের সহিত খেলা করে সে ঠিক তেমন ভাবে Roskolnikoffর সহিত খেলিতে ছিল। সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে একদিন এই অপরাধী যুবক নিজের অপরাধ স্বীকার করিবেই করিবে, Roskolnikoff Sonyaকে ভালবাসিত কিন্তু তাহার অপরাধের চিন্তা তাঁহার ভালবাসা ও অন্যান্য স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলিকে নৈরাশ্যের কালিমায় কলঙ্কিত করিয়াছিল। Sonyaও Roskolikoffকে ভালবাসিত। Roskolnikoffর মনে যে একটা ভয়ানক চিন্তা দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া বসিয়া আছে, নিজের প্রাণের স্বাভাবিক সহানুভূতি বশতঃ Sonya তাহা অনুভব করিল এবং যথার্থ ভালবাসার ধর্ম্মানুসারে সে এই চিন্তার এই দুঃখের ভাগী হইতে চাহিল!

Roskolnikoff নিজের অপরাধ স্বীকার করিল। তাহার নিবিড় মৌনতার মধ্যেও পলকহীন দৃষ্টির মর্ম্মস্পর্শী গভীরতায় Sonya তাহার প্রেমিকের ঐ ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড জনিত অতি তীব্র নৈরাশ্যপূর্ণ অনুশোচনার ভাব দেখিতে পাইল। Sonya কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি—সে জানিত, সে বলিয়া উঠিল,—"We must suffer, and together......pray......expiate,......Let us to the convict prison." প্রায়শ্চিত্তের মহিমা ও উপকারিতায় ডষ্টয়েভস্কির গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। Roskolinkoff

পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পন করিয়া অপরাধের কঠোর দণ্ড সাগ্রহে গ্রহণ করিল। Sonya তাঁহাকে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতে শিক্ষা দান করিয়াছিব। সাইবেরিয়ায় দীর্ঘ সাত বৎসর কারাবাস যাপন করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনলে পূত পবিত্র হইয়া উভয়ে সুখশান্তিময় ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই Sonyaরই পদতলে পতিত হইয়া একদিন Roskolinikoff বলিয়াছিল,—"I did not bow down to you indiridually but to Suffering Humanity in your person." এই উক্তি কেবলমাত্র Roskolnikoffর উক্তি নয় ইহা ডষ্টয়েভ্স্কির উক্তি, পাঠকরও প্রাণের কথা।

Crime and Punishment প্রকাশিত হইলে পর—ডষ্টয়েভস্কির যশঃ সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল। Stevenson পুস্তকখানি পড়িয়া বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলেন। এই পুস্তকখানির সম্পর্কে একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। যাঁহারা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের—"সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"র পক্ষপাতী তাহাদের তর্কের একটা প্রধান যুক্তি এই যে, "বিষবৃক্ষ"—বিষবৎ পরিত্যজ্য, যেহেতু কুন্দের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অনেক বিধবা নারী পরপুরুষাশক্তি শিখিয়াছে ও শিখিবে। নিশ্চয়ই তাঁহারা জানিয়া উল্লসিত হইবেন যে ডষ্টয়েভ্স্কির Crime and Punishmant প্রকাশিত হইলে একজন মস্কোর ছাত্র পুস্তক বর্ণিত ঘটনার অনুকরণে এক সুদখোরকে হত্যা করে। ইহার পরেও রুসিয়াতে এই প্রকার হত্যাকাণ্ড আরও অনেক ঘটিয়াছে বোধহয় অধিকাংশই এই পুস্তক পাঠেরই ফল। মানুষের পাশবিক বৃত্তির যূপকাষ্ঠে এই প্রকার অনেক নরবলি চিরদিন ঘটিয়াছে ও ঘটিবে কিন্তু বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ, কি কৃষ্ণকান্তের উইল, Dostoievskyর Crime and Punishmant আমরা হারাইতে পারিব না, কি হারাইতে চাহি না। "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" বাদীর সম্মার্জ্জনী কেবলমাত্র ধূলিকণাকেই অপসারিত করিতে পারে—পর্ব্বতকে টলাইতে পারে না।

ডষ্টয়েভ্স্কি রুষ জীবন আঁকিয়াছেন চোর, ডাকাত, খুনী, ব্যাধিকাতর,—পতিতা প্রভৃতি সমাজের—অধস্তন নরনারীর দ্বারা তাহার চিত্র পরিপূর্ণ। পাপীর চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু—পাপকে তিনি কখনও—মনোমোহন করেন নাই কিম্বা ঘটনার সমাবেশে তাহার সমর্থনও কখনও করেন নাই। পতিতার আকর্ষণী শক্তি আঁকিয়াছেন সত্য কিন্তু কখনও

ইন্দ্রিয় বিভ্রম উৎপাদন করেন নাই। একজন সমালোচক বলিয়াছেন "He only shows the nude under Surgeon's knife on a bed of suffering."

বাস্তবিকই ডষ্টয়েভস্কির উপন্যাসে এমন একটা সত্যের প্রকাশ অনুভব করা যায় যে তাহাকে Prophet বলিতেও কুণ্ঠা বোধ হয় না। কিছুদিন পর্য্যন্ত ডষ্টয়েভস্কির টুর্গেনিভের যশঃ-রবিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি টলষ্টয়কেও রুষ পাঠক সমাজ ভুলিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিল্পী হিসাবে তিনি টুর্গেনিভ ও টলষ্টয় হইতে অনেক ন্যূন ছিলেন। কিন্তু যখনই ডষ্টয়েভস্কি আমাদের আধুনিক নাগরিক সভ্যতার উপেক্ষিত সন্তানদিগের দুঃখের কথা দারিদ্র্যের নির্য্যাতনের কথা; পাপীর গভীর অনুশোচনার কথা বলিতে যাইতেন, সমস্ত ত্রুটী সত্ত্বেও তার মনের অপার স্নেহের, সহানুভূতির উৎস-ধারায় স্নাত হইয়া চিত্রগুলি বাস্তবিকই অতি সুন্দর, মহান্ হইয়া উঠিত। সমাজের কঠোর পীড়নে সভ্যতার কঠোর নিষ্পেষণে সঙ্কুচিত মানবাত্মার মধ্যে কোথায় সে অপরূপ সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত আছে, তিনি অসীম সহানুভূতির সাহায্যে তাহা দেখিতে পাইতেন এবং প্রকাশ করিতেন। শিল্পী হিসাবে তাঁহার প্রশংসা না হইতে পারে সত্য কিন্তু যে উদারতা ও যে সহানুভূতি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাসগুলিতে সঞ্চিত রহিয়াছে তজ্জন্য ডষ্টয়েভস্কি রুষ সাহিত্যে চিরকাল এক অসামান্য প্রতিভাবান্ লেখক বলিয়া সমাদৃত হইবেন—বিশ্ব সাহিত্যেও বোধহয় তাঁহার স্থান শ্রেষ্ঠ লেখকদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতেই হইবে।

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশগুপ্ত।

প্রকাশ।

—:*:—
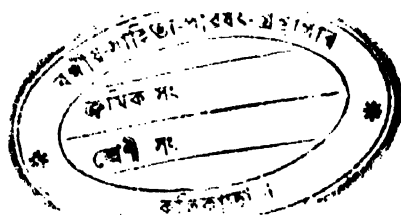
গোপনে কখন ছিনায়ে লইয়া
মোদের মরম বাণী—
দখিনা বাতাস যেন কৌতুকে
করছে কি কানাকানি।
আমি ভেবেছিনু প্রাণের কথাটী
কহিব না আর কারে—
দেখিনু আজিকে প্রকাশ করিয়া
দিয়াছে কে চারিধারে।
ফুল বিকশিল, মুঞ্জরিল ভ্রমর—
বিথারিল উষা আলো,-
আমারে ডাকিয়া কহিছে সকলে
বাসিয়াছ তুমি ভালো।
ভেবেছিনু মোর মানসেই তোমা
মানসী প্রতিমা আঁকি
রাখিব যতনে ব্যথার আদরে
বিপুল পুলকে ঢাকি;
আজিকে তোমার মূরতি আমার
হৃদয় বাঁধন টুটি
ঘনশ্যাম বনে, সুনীল গগণে
উঠে অপরূপ ফুটি;

চারিভিতে হেরি সে মধুর হাসি
সে দুটী নয়ন কালো—
কহিছে তোমারি মতন আমি গো
তোমারে বেসেছি ভালো।

শ্রীস্ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রক্তের ধারা।*

সন্ধ্যা লাগিয়াছে। দত্তগৃহিণী তুলসী তলায় প্রদীপটি রাখিয়া, গলায় আঁচল জড়াইয়া, গড় হইয়া প্রণাম করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন—"খুসী আমার এখন কি করিতেছে?"

তাঁহার এই একমাত্র মেয়েটির হাসি হাসি মুখখানি কি সহজে মন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যায়? অভাগী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া গেল কি না পাড়ার একটা চোঁড়ার সাথে! উঃ আজকালকার নাটক নভেল শিক্ষা দীক্ষা কত সংসারকেই ছারেখারে দিতে বসিয়াছে! মেয়েরা হইতে চায় স্বাধীন!

দুঃখিনী মা খবর পাইয়াছিল যে মেয়েটি আর তাহার শনি কলিকাতার এক নিভৃত গলির মধ্যে বসবাস করিতেছে। কলিকাতার কথা মনে হইলেই ভদ্রলোকের মেয়ের শরীর কাঁটা দিয়া উঠিত। একবার মাত্র তিনি কালীঘাটে পূজা দিবার জন্য গিয়াছিলেন—তাহা আর ভুলিবেন না। উঃ, কলকারখানা, গাড়ী ঘোড়া, লোক জন, হৈ হৈ রৈ রৈ—কি বিষাক্ত হাওয়া রাজধানীর। ইতি মধ্যে একখানা চিঠি তিনি পাইয়াছিলেন—মেয়ে লিখিয়াছে তাহার একটি ছেলে হইয়াছে। খুসীর হাতের লেখা চিঠিখানা তিনি বাক্স হইতে বাহির করিয়া মাঝে মাঝেই পড়িতেন।

* ফরাসী গল্প অবলম্বনে

নাতির শুভাগমন বার্ত্তা তাঁহাতে একটু বিচলিত করিত বটে কিন্তু প্রীত করিতে পারিত না। বুকে পাষাণ বাঁধিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, চিঠির উত্তর দিতে তাঁহার হাত সরিল না।

"উনি নিশ্চয়ই আমার কাজে সায় দিতেন।······কিন্তু, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, মেয়েটার কি এমন দুঃসাহস হইত?"

যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন খুশীর পিতা ভবানীদত্ত সকল পরিবারে আদর্শ মানুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। অশনে ভূষণে কৃচ্ছ্রতা, ব্যবসায়ে সততা, কর্ম্মে ন্যায়নিষ্ঠা তাঁহার শীর্ণ সুদীর্ঘ দেহখানির চারিদিকে একটা গরিমার আভা বিকীরণ করিত—যে দেখিত তাহার মস্তক সম্ভ্রমে আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িত।

ধনী তিনি হইতে পারেন নাই। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি যদিও ছিল যথেষ্ট। তিনি বলিতেন চিকিৎসকের কাজ হইতেছে পরোপকার—অর্থোপার্জ্জন নয়। তাঁহার ঔষধালয় গরীব দুঃখীদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল—দুঃস্থদের বাস্তবিকই তিনি ছিলেন মা বাপ। তরুণ যাহারা ডাক্তার হইয়া আসিত, তাহাদিগকেও তিনি কথায় ও কাজে ঐ উপদেশ দিতে চেষ্টা করিতেন।

সংসার-ধর্ম্মে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়। কাজের ভীড়ের মধ্যে যখন যতটুকু অবসর করিয়া লইতে পারিতেন সে সময়টুকু পত্নীর সহিতই কাটাইতেন। এমন ভাবে, এমন মিলমিশ ছিল উভয়ের মধ্যে—লোকে তাঁহাদিগকে তাই নাম দিয়াছিল "চকোর চকোরী।" এমন স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে গৃহিণী তাঁহার যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দত্তগৃহিণী ছিলেন কোমল, করুণাময়ী; কুলের কলঙ্ক কন্যার সহিতও তাই তিনি সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু মা ও মেয়ের মধ্যে অলঙ্ঘ্য বাধারূপে প্রসারিত রহিল মৃতের সেই কঠোর নিথর দীর্ঘ ছায়া।

"না হতভাগীকে তিনি কখন মার্জ্জনা করতে পারতেন না। বেঁচে থাকলে তিনি যা করতেন আমাকেও তা'ই করতে হবে···সত্যই ত, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আছে?...হায়, তাঁর কথা

স্মরণ করেও কি অভাগী নিজেকে বাঁচাতে পার্‌লে না !···আমাদের দুই কুলে এমন কাউকে ত দেখি না যার চরিত্রে এতটুকু কলঙ্কের দাগ কোন দিন ছিল।...এ হতভাগী তবে এল কোথা থেকে ?"

এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।—"আপনি ?"—"শুনবেন, দুটো কথা আছে আপনার সাথে, একটু নিরিবিলি চাই।"

অপরিচিতার বসনে ভূষণে একটা আতিশয্য, ধরণে-ধারণে একটা সংযমের অভাব দেখিয়া দত্তগৃহিণীর কেমন অশ্রদ্ধা, বিরুদ্ধভাব জাগিয়া উঠিল—ধীরে ধীরে ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। গৃহকর্ত্তার একখানা ছবি দেয়ালে টাঙ্গান ছিল। নবাগতা রমণী তাহার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিল—"তাঁর মতনই বটে, বেশ ঠিক ঠিকই ত উঠেছে।" কথার ভঙ্গীতে আশ্চর্য্য হইয়া দত্তগৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি কখন তাঁর রুগী ছিলেন ?"

রমণী হাসিয়া উঠিল, বলিল—"রুগী ? তা না। তাঁর সাথে আমার কিছু সম্বন্ধ ছিল।"

—সম্বন্ধ ? কি রকম ?

—হ্যাঁ, তাই। বল্‌ব যে কি, বার বচ্ছর ধরে আমাদের জানাশুনা ছিল।

—উঃ। ভগবান !

অভাগিনীর বোধ হইল যেন দেয়াল ঘর বাড়ী সমস্ত পৃথিবীটা হন্ হন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, খাটের বাজু সজোরে ধরিয়া অতি কষ্টে নিজেকে কোন প্রকারে সামলাইতে চেষ্টা করিলেন।

নবাগতা চমকিত হইয়া বলিয়া চলিল—"এ কি !. এ কি ? স্থির হোন্, স্থির হোন্ !... আমার ধারণা ছিল আপনি সবই জানেন।···অপরাধ আমার ক্ষমা করবেন !···তিনি ত আর নাই, ওসবে এখন আর কি এসে যায় ?"

—উঃ ! বটে, বটে ! কিছুই এসে যায় না আর, না ?

নিজের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি নিজেই চমকিয়া উঠিলেন—কাঁপিতে কাঁপিতে, ত্রস্ত ভাবে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন তিনি করিয়া চলিলেন। হঠাৎ কি একটা মাতলামীতে যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিল, একে একে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তিনি অতীতের সেই জঘন্য ইতিহাসটা

সব বাহির করিয়া ফেলিতে সুরু করিলেন—রাগে দুঃখে হৃদয় তাঁহার যতই ফাটিয়া পড়িতে চায় ততই তিনি ঐ সব কথা লইয়া আরও আলোচনা করিয়া চলিলেন।

অপরাধিনীর নিজের মুখ হইতে তিনি সবই—সবই শুনিলেন, বার বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনী। উঃ, বাহিরে ধর্ম্মের মুখোস পড়িয়া এমন ভাবে কেহ কোন দিন কাহাকেও প্রতারিত করিয়াছে? ধর্ম্মের সার, সে গুপ্ত ইতিহাস এতদিন পরে ব্যক্ত হইয়া পড়িল একটা তুচ্ছ স্বার্থের কথায়।

রমণী কি জন্য আসিয়াছে, তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছিল—"আমার নামে তিনি একটা জীবন-বিমা করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানী এখন তা দিতে চাচ্ছে না, নানা গোলমাল তুলেছে। বলছে, তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী যখন আছে...!"

দত্তগৃহিণী কিন্তু কোন কথাই শুনিতেছিলেন না। তাঁহার সোনার স্বপ্ন এক আঘাতে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ একটি চিন্তা সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল—"তাই ত! তাই ত! খুসীর আমার কেবলই দোষ ছিল না। তার এই দুর্ব্বলতার কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছিলেম না..... বুঝেছি, বুঝেছি এখন......লিখে পাঠাচ্ছি, ক্ষমা করলেম তাকে!......অভাগী আমার!..... [illegible]র রক্তে ছিল, সে কি করতে পারে!"

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সভ্যতার আর এক উপাদান ভাষা এবং সাহিত্য। আমাদের দেশের কোন কোন বড় পণ্ডিত ঐতরেয় আরণ্যকের শ্রুতি বিশেষ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈদিককালে "বঙ্গবগধ এবং চের"গণ পক্ষিজাতির ন্যায় অস্পষ্টভাষী ছিলেন,' সুতরাং তাঁহাদের ভাষা আর্য-ভাষা ছিল না।

এই উক্তির "বগধ"কে কেহ কেহ "মগধ" দেশ এবং কেহ কেহ "বাগদী" জাতি সূচক শব্দের আদিম সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পণ্ডিত নহি;—বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যে আমাদের প্রবেশ নাই এবং তজ্জন্য "বৈদিকযুগ" কথার অর্থও ভাল বুঝিতে পারি না। এই উক্তিকে, আমরা, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং কামরূপের উপর প্রয়োজ্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। আর যদিই বা এই উক্তি এই সকল দেশের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া সুপ্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে উক্ত শ্রুতি সেই প্রাচীন সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, যখন এদেশে গঙ্গার আগমন হয় নাই;—অন্ততঃ রামায়ণও রচিত হয় নাই। আমাদের মতে আজ হইতে অন্ততঃ প্রায় নয়লক্ষ বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল (১৯)। যদি নয় দশ লক্ষ বৎসরের অনেক পূর্বে এদেশে অস্পষ্টভাষী অসভ্যলোকের বাস থাকে, থাকুক, সামাজিক ইতিহাস শাস্ত্রের বিদ্যার্থীর পক্ষে সেই অতি-প্রত্ন-যুগের সংবাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আর, দেশের কোন কোন অংশে এখনও কোল সাঁওতাল প্রভৃতি অভদ্র লোক আছে,—তখনও ছিল। তাহাতে মূল বিষয়ের কোন হানি হয় না।

আমাদের দেশের সংস্কৃতভাষা-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান আচার্য (পাণিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের মহাভাষ্যকার) পতঞ্জলি অশুদ্ধ অথবা অস্পষ্ট ভাষা-ভাষিগণকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়াছেন এবং তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি অসুরগণের (আসীরিয়া বা 'অসুর'দেশ বাসিগণের) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে "যাহাতে আমরা 'ম্লেচ্ছ' হইয়া না যাই, সেই জন্য ব্যাকরণ পড়া উচিত (২০)।" তাঁহার

(১৯) এই উক্তি অনেকেই অগ্রাহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু, আমরা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের পদানুবর্তী হইয়া এই কথা বলিয়াছি। মনুসংহিতাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মতে দ্বাপরযুগের কাল পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। রামায়ণ ত্রেতাযুগের গ্রন্থ। যদি ত্রেতাযুগের অন্তিম দিনেও রামায়ণ রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, আজ হইতে ৮,৬৪,০০০ কলিগতাব্দা ৫০২৬=৮,৬৯,০২৬ বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে বলিতে হয় এবং আমরা তাহাই বলিয়াছি।

(২০) ব্যাকরণের মহাভাষ্য; প্রথম আহ্নিক, ২য় পৃষ্ঠা (বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সংস্করণ)।

মতে "অপশব্দকেই ম্লেচ্ছ" বলা যায়। এখন, আমরা দেখিতে চাই যে, সংস্কৃত ভাষার আচার্য্যগণ কি আমাদের এই প্রাচ্য অথবা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্ম-পুণ্ড্র, কামরূপাদি প্রদেশের অধিবাসীগণকে কখনও "ম্লেচ্ছ" অথবা "অশুদ্ধ-ভাষা ভাষী" বলিয়াছেন ?

আমরা দেখিতেছি যে, গৌড়-বঙ্গের কোন অধিবাসীর ভাষার সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যেরা কোনও আক্ষেপ ত করেনই নাই,—অপর পক্ষে তাঁহারা এদেশের ভাষা এবং রীতির জন্য এক নির্দিষ্ট সম্মান-সূচক স্থানের নির্দেশ করিয়াছেন। বৈয়াকরণ পাণিনি স্বয়ং উদীচ্য দেশের অধিবাসী হইলেও (২১) তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের অনেক স্থানে প্রাচ্যমতের এবং প্রাচ্যদেশীয় বিদ্বদ্‌বর্গের যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি উভয়েই প্রাচ্যদেশের তদানীন্তন রাজধানী পাটলীপুত্রের নিবাসী অথবা প্রবাসী ছিলেন। পৌরাণিক সময় হইতে কালিদাসের সময় পর্যন্ত এই গৌড়বঙ্গের সাধারণ নাম "প্রাচ্যই" ছিল, তাহা সকলেরই সুবিদিত আছে। গ্রীকেরাও এই দেশকে "প্রাসি" (প্রাচী) বলিতেন। পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি-প্রণীত ব্যাকরণ সমগ্র আর্য্যাবর্তের সংস্কৃত ভাষাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রাচ্যদেশ সমূহের অন্যকোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল না।

অতি প্রাচীনকালে যে দেশ "প্রাচ্য" নামে পরিচিত ছিল, উহাকে "গৌড়দেশও" বলিত। "গুড়" হইতে "গৌড়" নামের উৎপত্তি, "পুণ্ড্র" শব্দের অর্থও ইক্ষু বিশেষ,—রাঢ়ে ঐ ইক্ষুকে এখনও "পুড়ি আক" বলে এবং কবিরাজ মহাশয়েরা ঐ ইক্ষুর স্বতন্ত্র বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে "পৌণ্ড্রবর্ধন" অথবা "পুণ্ড্রবর্ধন" মহানগরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সেই "পুণ্ড্রবর্ধন"ই "পাটলাদেবীর" পীঠস্থান স্বরূপে প্রখ্যাত ছিল এবং সেই নগরেই বিখ্যাত কার্ত্তিকেয় মন্দির ছিল। কালের পরিবর্তনে সেই মহানগর এক্ষণে প্রত্নতত্ত্বিক পণ্ডিত জনের অতি নিপুণ গবেষণার বিষয় হইয়াছে, কিন্তু এখনও কেহই তাহার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। কাহারও মতে উহা "গৌড়" বা "পাণ্ডুয়া" (মালদহ জেলায়)

(২১) পাণিনি মুনি বর্তমান সীমান্ত প্রদেশ অথবা Frontier Provinceএর অন্তর্গত 'শলাতুর' নগরের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া ঐতিহ্য আছে। ঐ শলাতুর প্রাচীন "গন্ধার" রাজ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন।

কেহ বলেন "মহাস্থানগড়" (বগুড়া জেলায়),—কাহারও মতে উহা বর্তমান "পাবনা।" যাহাই হউক, মালদহ জেলার "গৌড়" নগরও অল্প প্রাচীন নহে। খৃষ্টজন্মের অনেক পূর্ব হইতেই উহার খ্যাতি দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ঔরঙ্গজেব সম্রাটের সময় পর্য্যন্তও উহা একেবারে জনশূন্য হয় নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠানরাজ সুলেমান করবাণীর রাজত্বকালে (১৫৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গা নদীর স্থানচ্যুতি বশতঃ উহা মহামারীতে (ম্যালেরিয়া ?) জনশূন্য হইতে আরম্ভ করে এবং প্রথমে রাজধানী তাঁড়াতে যায়,—পরে আকবর বাদশাহের আমলে সুবেদার মোনাইম খাঁ আবার (১৫৭৫ খৃঃ) গৌড়কে রাজধানী করেন কিন্তু তিনি মহামারীতে মরিয়া যান। রাজা মানসিংহ সুবে বাঙ্গালার রাজধানী "গৌড় হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন (২২)। বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাসের সময়ে গৌড়ই দেশের রাজধানী ছিল এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সময়ে উহা রাজধানীর সম্মান হইতে বঞ্চিত হইলেও, কবির মনে তখনও উহার পূর্ব সম্মান খুব বলবৎ ছিল। গৌড় নগরের সভ্যতা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ অনেক সংবাদ দিয়াছেন। ধ্বংস-প্রাপ্তির পর দুই এক শতাব্দী মধ্যেই গৌড় দুর্ভেদ্য অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও উহা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর একায়ত্ত এবং মানুষের পক্ষে দুর্গম থাকার কথা ইংরাজের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এখন সেই গৌড় নগর কতকগুলি সাঁওতালের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। লর্ড কার্জনের কৃপায় পাঠান-সময়ের কতকগুলি পুরাকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও রক্ষিত হইতেছে; তাঁহার কৃপা না হইলে "গৌড়নগর,"ও বোধহয় "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে"র অনুগমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইত (২৩)। বাঙ্গালার পাল এবং সেন রাজগণের রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ এখন হা হা করিতেছে।

---

(২২) সৈর মুতাখরীন, ষ্টুয়াটের বাঙ্গালার ইতিহাস।

(২৩) গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হইতে ইষ্টকাদি লইয়া লোক মালদহ, রাজসাহী, ঢাকা, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি সহরে লইয়া গিয়া কত বাড়ী ঘর করিয়াছে। লর্ড কার্জনের "পুরাকীর্ত্তি রক্ষার আইনের" দ্বারা এই লুণ্ঠন এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে।

প্রাচীনকালে, সংস্কৃত ভাষায় যখন দেশের সর্বত্র কাব্যাদি রচিত হইত, তখন কতকগুলি প্রসিদ্ধ রচনা রীতির (Styleএর) উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল "রীতি" অথবা রচনা পদ্ধতির মধ্যে "গৌড়ী" এবং "বৈদর্ভী"র সম্মান যে সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তাহা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বিদ্যার্থিবর্গের সুপরিচিত। এই রীতি সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণের মতে সংস্কৃত ভাষার রচনা সম্বন্ধে "পাঞ্চালী, গৌড় দেশীয়া, বৈদর্ভী এবং লাটজা" এই চারিটি রীতি প্রসিদ্ধ ছিল। (২৪)। প্রাচীন বৈয়াকরণ এবং অলঙ্কারবেত্তা বামনের মতে "গৌড়ী, বেদর্ভী এবং পাঞ্চালী" এই তিনটি রীতি এবং ভোজরাজের মতে "বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ীয়. অবন্তিকা, লাটীয়া এবং মাগধী" এই ছয়টি রীতি। কবিরাজ দণ্ডী পাঞ্চালী অবন্তিকা, লাটীয়া এবং মাগধী এই চারিটির অপ্রাধান্য অঙ্গীকার করত "রচনারীতি প্রধানতঃ বৈদর্ভী এবং গৌড়ী এই দুই প্রকার বলিলেই যথেষ্ট" এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (২৫)। সংক্ষেপতঃ, সরলশ্লেষ-প্রসাদ-মাধুর্য-সুকুমারতাদি গুণযুক্তা কোমল-কান্ত-পদাবলীর সাহায্যে গ্রথিত রচনাকে "বৈদর্ভী" এবং "গুরু-গম্ভীর কঠিন শিষ্ট-শব্দ-সম্পদ্-সমাযুক্ত এবং দীর্ঘসমাসবহুল" রচনাকেই "গৌড়ী" রীতি বলিয়া আচার্যেরা স্বীকার করিয়াছেন (২৬)। পাঞ্চালী, লাটী, অবন্তিকা, এবং মগধী প্রভৃতি রীতি এই "গৌড়ী এবং বৈদর্ভী" রীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই আচার্য পদে দণ্ডী ঐ সকল সূক্ষ্ম ভেদ পরিহার এবং দুইটি প্রধান রীতিকেই গ্রহণ করত নিজের অলঙ্কার

(২৪) "বাগ্ বিদ্যা সংপ্রতিজ্ঞানে রীতিঃ সাপি চতুর্বিধা।
পাঞ্চালী গৌড়দেশীয়া বৈদর্ভী লাটজা তথা ॥ ১১ ৩৪০ অধ্যায়,
(বঙ্গবাসী।)

(২৫) "অস্ত্যনেকোগিরাং মার্গঃ সূক্ষ্ম ভেদঃ পরস্পরম্।
তত্র বৈদর্ভ গৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যতে প্রস্ফুটান্তরৌ ॥ ৪০ ॥" কাব্যাদর্শ,
প্রথম পরিচ্ছেদ (এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণ)

বিশ্বনাথ "সাহিত্যদর্পণে" অগ্নিপুরাণের অনুবর্তী হইয়া চারিটি রীতির উল্লেখ করিয়াছেন।

(২৬) কাব্যাদর্শের ৪১শ হইতে ১০১ তম শ্লোক পর্যন্ত আচার্য দণ্ডী বদর্ভী এবং গৌড়ীর বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথ নিবাসী ছিলেন। সেই জন্য

সন্দর্ভ "কাব্যাদর্শ" রচনা করিয়াছেন। এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ হইতে আমাদের মনে হয় যে, গৌড়ী রীতিকে স্থূলতঃ আর্যাবর্তের এবং বৈদর্ভী রীতিকে দক্ষিণাপথের প্রতিনিধি স্বরূপেই আচার্যেরা গ্রহণ করিয়াছেন। কবি কালিদাস প্রধানতঃ "বৈদর্ভী" এবং ভবভূতি-ভারবি-মাঘ বাণভট্ট-শ্রীহর্ষ,—মুরারি-ভট্টনারায়ণপ্রমুখ কবিবৃন্দ "গৌড়ী" রীতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। কবি ভবভূতি বিদর্ভ দেশের পদ্মপুর নগরের নিবাসী হইলেও কিন্তু "গৌড়ী রীতি"কে অবলম্বন করিয়াই স্বকীয় অত্যুত্তম নাটকাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। যে দেশের লেখকগণের রচনার প্রণালী হইতে প্রাচীন কালে এরূপ প্রসিদ্ধ রচনা রীতির (গৌড়ীয়) জন্ম হইয়াছিল, সে দেশের সকল লোকেই যে "কাকের ন্যায় অস্পষ্ট ভাষী" অথবা "ম্লেচ্ছভাষাভাষী" ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। তবে, প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ আর্যনিবাস ব্রহ্মাবর্ত" এবং ব্রহ্মর্ষি দেশের স্থক্ত প্রদেশে মধ্যে মধ্যেও অসভ্য অথবা অভদ্র লোকের বাস ছিল (এবং এখনও আছে।) এদেশেও সেইরূপ ছিল (এবং আছে)।

এদেশের পণ্ডিতেরা ত গুরুগম্ভীর এবং দীর্ঘ সমাসবহুল পদ প্রয়োগে সুনিপুন বলিয়া খ্যাতিলাভ (সুখ্যাতি এবং অখ্যাতি উভয়ই) করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজের সাধারণ লোকদের ভাষা কেমন ছিল; অনেকে মনে করিতে পারেন, তাহারাই পাখীর মত কিচ্‌মিচ্‌ করিয়া কোন

মধ্যে মধ্যে গৌড়ী রচনাকে বেশ এক আধটু উপহাস করিয়াছেন। তিনি রীতির দৃষ্টান্ত দিতেছেন। যথা—

গৌড়ী—"অস্তমস্তকপর্য্যস্তসমস্তার্কাংশুসংস্তরা।
পীনস্তনস্থিতাতাম্রকম্রবস্ত্রেব বারুণী॥ ৮২
ইতি পদ্যেঽপি পৌরস্ত্যা বধ্নস্ত্যোজস্বিনীর্গিরঃ।
অন্যে ত্বনাকুলং হৃদ্যমিচ্ছন্ত্যো জো গিরং যথা॥ ৮৩॥

বৈদর্ভী—পয়োধরতটোৎসঙ্গলগ্নসন্ধ্যাতপাংশুকা।
কস্য কামাতুরং চেতো বারুণী ন করিষ্যতি? ॥ ৮৪" প্রথম পরিচ্ছেদ।

"পৌরস্ত্যা গৌড়াঃ"—প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশচরণাঃ। কালিদাসাদি প্রাচীন কবিও এদেশ বুঝাইতে "পৌরস্ত্যাঃ" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

অসভ্য বা ম্লেচ্ছ ভাষায় (তমিড় বোলীতে ?) কথাবার্তা কহিত। মনে করিতে পারেন কেন, অনেক নবসভ্য হোমরা চোমরা পণ্ডিত তাহাই বলিয়াছেন। এক নবীন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ সন্তান, "বাঙ্গালীর ভাষার বাপও অনার্য এবং মাও অনার্য, সে এক খিচুড়ী"—ইত্যাকার মত প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ-লাভ করিয়াছেন। নব্যেরা এইরূপ বলিতে "সাহস" করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীনেরা তাহা করেন নাই। আচার্য দণ্ডীর মত প্রাচীন ভাষা-বিজ্ঞান-বিদ্ও গৌড়দেশীয় সাধারণ সামাজিক মনুষ্যদিগকে "কাকের মত অস্পষ্ট ভাষী"ত বলেনই নাই, পরন্তু তাহারাও যে সংস্কৃত-সম "প্রাকৃত ভাষা"র ব্যবহার করিত, সংসম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আচার্য দণ্ডী বলিতেছেন,—

"সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥ ৩৩॥
মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নাণাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্॥ ৩৪॥
শৌরসেনীচ গৌড়ীচ লাটী চান্যাচ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥ ৩৫॥
আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষ্বপভ্রংশ ইতি স্মৃতাঃ।
শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশ তয়োদিতম্॥ ৩৬॥"

কাব্যাদর্শে, প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই শ্লোকের টীকাকার-সম্মত মমার্থ ;—"পাণিনি প্রমুখ মহর্ষিগণ কর্তৃক "সংস্কৃত" এই নামে কথিতা এবং ব্যবহৃতা ভাষার নাম 'দৈবীবাণী' যেহেতু দেবগণ উক্ত ভাষায় কথোপকথন (২৭) করিতেন এই জন্য, অথবা উক্ত ভাষা দৈবত-সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই জন্য উহার ঐ 'দৈবীবাণী' নাম হইয়াছে); আর 'সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন (তদ্ভব) সংস্কৃতের সমান (তৎসম), এবং নানাদেশে ব্যবহৃত (দেশী) নানাবিধ প্রাকৃত ভাষা (সংস্কৃত এই 'প্রকৃতি' বা উৎপত্তি স্থান

(২৭) "দেব" শব্দের অর্থ পূর্বে "বিদ্বান্" ছিল। "বিদ্বাংসো হি দেবাঃ।" (শত পথ) ব্রাহ্মণে।

হইতে উদ্ভূত কিংবা 'প্রাকৃত' বা নীচ লোকের ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া এই ভাষার নাম "প্রাকৃত" হইয়াছে) আছে (২৮)। 'প্রাকৃত' ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র দেশে ব্যবহৃত (মহারাষ্ট্রী) ভাষা উৎকৃষ্ট, যাহাতে সুন্দর সুন্দর বাক্যাবলীরূপ রত্নসমূহের সাগরস্বরূপ "সেতুবন্ধ" (কাশ্মীর রাজ প্রবর সেনের কীর্তি 'বিতস্তা' নদীর সেতু সম্বন্ধে কবি কালিদাসের রচিত বলিয়া বিখ্যাত) প্রভৃতি কাব্য আছে। সেইরূপ শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটী এবং তাহাদের মত আরও অন্যান্য প্রাকৃত ভাষা আছে। বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যাহাদের ব্যবহার নাই কিন্তু নাটকাদি কাব্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এরূপ "আভীর" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত অনেক "অপভ্রংশ" ভাষা আছে। "অপভ্রংশ" প্রাকৃত হইতেও সংস্কৃত ভাষার অধিকতর দূরবর্তী।"

(২৮) "প্রাকৃত" এই নাম হইলেও এই ভাষার রচনারীতি "সংস্কৃত" ভাষারই মত, সকলেরই "সংস্কৃত" ভাষার মত ক্রিয়ার বিভক্তি, কারকাদির রূপ আছে এবং উহা দেখিতে শুনিতে সংস্কৃতেরই মত ; এই জন্য কেহ কেহ "প্রাকৃত" ভাষার কেবল "সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন" এবং সংস্কৃতের সদৃশ" এই দুইটী মাত্র ভেদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "আর্ষোত্থনার্ষতুল্যঞ্চ দ্বিবিধং প্রাকৃতং বিদুঃ।" "গৌড়" দেশ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন কীকটবঙ্গদেশয়োরন্তরাল দেশঃ" অর্থাৎ মগধ এবং বঙ্গ দেশের মধ্যবর্তী দেশের নাম "গৌড়" দেশ। শক্তি সঙ্গম তন্ত্রকার বলিয়াছেন,—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম ধৃত।

অর্থাৎ "বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর (পুরী জিলায় অবস্থিত, প্রাচীন নাক "একাম্রকানন") পর্যন্ত দেশকে "গৌড় দেশ" বলে আর এই তন্ত্রের মতে "ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে সমুদ্রান্তরালবর্তী দেশের নাম 'বঙ্গ'।" তন্ত্রের এই বঙ্গ এবং গৌড় দেশ প্রভৃতির সংজ্ঞা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। লেখকের সময়ে লোকে যাহা বলিত তাহাই তিনি লিখিয়াছেন।

আচার্য দণ্ডী অত্যন্ত প্রাচীন। আমাদের দেশে পণ্ডিতমহাশয়গণের মধ্যে একটি চিরাগত প্রবাদ-শ্লোক আছে, তাহা হইতে কবিগণের প্রাচীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি এই,—

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

এই প্রাচীন শ্লোককর্তা মহাকবি দণ্ডীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"জগতে যখন বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি একমাত্র কবি থাকায় 'কবিঃ' এই একবচনান্ত শব্দ ব্যবহার করিত; তাহার পর যখন ব্যাস জন্মিলেন, তখন দুইজন কবি জগতে হইলেন বলিয়া 'কবী' এই দ্বিবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; এখন, হে দণ্ডিন্, তুমি জন্মগ্রহণ করায় যেহেতু দুইজনের অধিক অর্থাৎ তিনজন কবি হইলেন, সুতরাং লোকে 'কবয়ঃ' এই বহুবচনান্ত শব্দের ব্যবহার করিতেছি। এই শ্লোকের কর্তা যিনিই হউন, তিনি যে আচার্য দণ্ডীর প্রাচীনতা এবং কবিত্ব শক্তি এই উভয় গুণেরই প্রশংসা করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। "শব্দ কল্পদ্রুম" অভিধানে কালিদাসকে এই শ্লোকের কর্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু এই অভিমতের কোন প্রমাণ নাই,—সুতরাং তাহার প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য "দশকুমার চরিতের" রচয়িতা এই দণ্ডী এবং "বাসবদত্তার" প্রণেতা সুবন্ধু উভয়েই যে "কাদম্বরীর" এবং "হর্ষচরিত" প্রণেতা বাণভট্টের অপেক্ষা পূর্বগামী, তাহা স্বদেশী এবং বিদেশী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিয়াছেন। দণ্ডী তাঁহার এই "কাব্যাদর্শে" প্রাচীন কাব্য সমূহের মধ্যে প্রাগুক্ত "সেতুবন্ধ" এবং ভূতভাষাময়ী অদ্ভুতার্থা "বৃহৎকথা" (মহাকবি গুণাঢ্য রচিত) ভিন্ন আর কাহারও নাম গ্রহণ করেন নাই। তজ্জন্য, মনে হয় যে, তিনি খৃষ্ট জন্মের অব্যবহিত পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২৮)।

এই প্রাচীন দণ্ডাচার্য এবং তদপেক্ষাও অনেক প্রাচীন "অগ্নিপুরাণে" "গৌড়ী" রীতিকে "প্রাচ্য" দেশীয় সংস্কৃত রচনা রীতির প্রধান প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করায় বুঝিতে পারা যায় যে, গৌড়দেশে খৃষ্ট জন্মের পূর্বেই বিভিন্নরূপ অথচ সুবিখ্যাত একটি প্রৌঢ় রচনা নীতির প্রতিষ্ঠা

(২৮) যাঁহারা কালিদাসকে খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা দণ্ডীকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

হইয়াছিল। আর, উত্তরকালে, মাগধী ও অর্ধমাগধী এই দুই নামে যে প্রাকৃতভাষা পরিচিত হইয়াছিল, প্রাচীনতর কালে তাহারাও বোধহয়, "গৌড়ী" এই সাধারণ নামেই ভারতখণ্ডের সর্বত্র বিখ্যাত ছিল। সম্ভবতঃ, "পালী" নামে পরিচিত প্রাচীন প্রাকৃতের "গৌড়ী" এই নামান্তর ছিল। যেরূপেই দেখা যাউক, ভাষা এবং সাহিত্য হিসাবেও গৌড়বঙ্গের প্রাচীনতা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে (২৯)। প্রসিদ্ধ নানা ভাষাবিদ্ বীমস্ হর্ণলি এবং গ্রীয়ারসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা গৌড়-বঙ্গের প্রচলিত ভাষাগুলিকে সংস্কৃত-সম বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

সভ্যতার উপাদান "সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা"র মধ্যে, সাহিত্যের মোটামুটি সংবাদ আমরা দিলাম। সঙ্গীত সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই প্রচুর হইবে যে বিখ্যাত "ছত্রিশ রাগিণী"র মধ্যে "গৌড়ী" বিশেষ সম্মানের আসনে আসীনা আছেন এবং "বাঙ্গালী"র সম্মানও অল্প নহে। লেখক এবং পাঠকবর্গের অসাবধানতায় "গৌড়ী" অনেক স্থলেই "গৌরী"রূপে পরিচিত হইয়াছেন। গৌড়বঙ্গের অধিকাংশ স্থলেই "ঢ়" এবং "ড়" একেবারে "র" রূপে কথিত, লিখিত এবং পঠিত হইয়া থাকে। অধিক কি "গৌড়" শব্দের জনক স্বয়ং "গুড়"ই অনেক স্থলে "গুর" এবং "খণ্ড" শব্দের অপভ্রংশ "খাঁড়" "খাঁর" (এবং পরে "শুদ্ধ" হইয়া "ক্ষার" হইয়া গিয়াছে! সেরূপ

(২৯) উত্তরকালে প্রাকৃত ভাষা "মাগধী" অবন্তিকবে, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধ-মাগধী, বাহ্লীকা এবং দাক্ষিণাত্যা (মহারাষ্ট্রী) এই সাত ভাগে এবং অপভ্রংশ ভাষা "শকারী, আভীরী, চাণ্ডালী, শবরী, দ্রাবিড়ী ও ভ্রূজ এবং বনেচরী"—এই সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। "অপভ্রংশ"কে "বিভাষা"ও বলিত। শবর-সাঁওতাল প্রভৃতি বনেচরদিগের বিভাষার ত অনেকরূপ ছিল, তন্মধ্যে একপ্রকারকে "ঢক্কভাষা" বলিত। এই সকল "ভাষা" এবং "বিভাষা"র প্রয়োগ নাট্য সাহিত্যে দেখা যায়। "মৃচ্ছকটি" নাটকে মাথুর এবং দ্যূতকর এই দুই পাত্রের মুখে যে ভাষার প্রয়োগ আছে, টীকাকার পৃথ্বীধর উহাকে "ঢক্ক-বিভাষা" বলিয়াছেন। গ্রীয়ারসন সাহেব এই "ঢক্কী" বা "ঢক্কবিভাষা"কে "ঢাকাই ভাষা" (The Magadhi of Dacca) মনে করিয়াছেন।

রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও গৌড়দেশীয় সঙ্গীতবিদ্‌গণের উদ্ভাবিত "গৌড়ী" রাগিণীকে সনাক্ত করিতে আমাদের ক্লেশ পাইবার আশঙ্কা নাই (৩০)।

"কলা"র কথা কহিতে ভয় হয়,—যেহেতু আমরা "কলাবিৎ" নহি। অতিশয় শুভক্ষণে "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির" জন্ম হইয়াছিল। ঐ সমিতির সৌভাগ্যবান্ অনুষ্ঠাতৃবর্গের চেষ্টায় গৌড়ীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যাদি কলাশিল্পের মর্যাদা অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের মতে, পাল-রাজগণের অভ্যুদয়ের সহিতই ঐ গৌড়ীয় শিল্পরীতির জন্ম হয় নাই এবং গয়ার, মগধের, এবং ওড়িশার শিল্পরীতি গৌড়ীয় শিল্পরীতির অনাত্মীয় নহে। প্রাচীন পীঠস্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধনের "পাটলা"দেবীর মন্দির যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের ভাই-বন্ধু দায়াদেরাই একাম্রকাননে "কীর্তিমতী", তাম্রলিপ্তে "বর্গভীমা" এবং বৈদ্যনাথের "অরোগা"দেবীর দেবকুলও প্রস্তুত করিয়াছিল। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার মহাসান্ধিবিগ্রহী রাঢ়ীয় বিখ্যাত বিপ্র বালবলভীভুজঙ্গ ভট্ট ভবাদেবের চেষ্টায় নির্ম্মিত "অনন্তবাসুদেবের" উচ্চ মন্দির ভুবনেশ্বর ধামে "লিঙ্গরাজের" অতুলনীয় মন্দিরের নিকট এখনও সগৌরবে দাঁড়াইয়া শোভা পাইতেছে। তমলুকের "বর্গভীমা"দেবীর প্রাচীন মন্দিরও বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। গৌড়পতি শশাঙ্কের জ্ঞাতিগণের দ্বারাই নাভিগয়া যাজপুরের এবং একাম্রের অতুলনীয় কীর্তিরাজি স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গের যে ওস্তাদেরা গৌড়ের "পাঠান-কীর্তির" জন্মদান করিয়াছিল তাহারা এ দেশের প্রাচীনতর স্থপতি এবং ভাস্করগণেরই বংশধর। বাঙ্গালী জাতি এবং তাহার সভ্যতা উভয়েই বড় প্রাচীন,—তাহাদের বয়স গণিয়া-মাপিয়া বলিবার শক্তি আমাদের নাই। ফার্গুসন, কনিংহাম এবং হাভেল সাহেবেরা আমাদের পূজনীয় পথিপ্রদর্শক হইলেও তাঁহাদের সকল কথা বেদবাণীবৎ সমান সম্মানযোগ্য

---

(৩০) কাশ্মীরের "রাজ-তরঙ্গিনী" নামক ঐতিহাসিক মহাকাব্যে উল্লিখিত গৌড়দেশের রাজধানীস্থিত বিখ্যাত কার্তিকেয়-মন্দিরের নর্ত্তকী কলাবতী কমলা এবং কাশ্মীর-রাজ মহারাজ জয়াদিত্যের প্রণয়-কাহিনীর প্রতি দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে বর্ণিত অসাধারণ রূপবতী এবং কোকিলকণ্ঠি কমলা নর্ত্তকীর গল্প পড়িলে সেকালের গৌড়ীয় সভ্যতার সুন্দর চিত্র মনে জাগিয়া উঠে। উহাতে সাহিত্য-সঙ্গীত এবং কলা এই তিনেরই উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

নহে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্মভূমি এই গৌড়বঙ্গে কবে আমাদের ঘরে ঘরে বাঙ্গালী ফার্গুসন, কনিংহাম এবং হ্যাভেল, জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের এই "প্রাচ্য"ভূমির মুখ এবং মান রক্ষা করিবেন, সেই আশা করিয়া আমরা বসিয়া আছি। সুলক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে সেই শুভদিন আসন্নপ্রায়। ভগবানের প্রসাদে বাঙ্গালীর "আত্ম-বিস্মৃতি" অচিরে লুপ্ত হউক এই প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার প্রস্তাব সমাপ্ত করি। আগামী বারে "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের" কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বন্দী

পলক তরে মিলন মোদের
নীরব জীবন-মন্দিরে
ঘুমের ছোঁয়ায় বুকের তা'র
বোল্ ওঠে না মঞ্জীরে।
অচিন্ আজি শতেক চিনা
বাজ্‌লো না তাই মুখর বীণা
বিজন বনের আল্‌গা পাখী
মন্ পিঁজরায় বন্দী রে।

বন্দে আলী মিঞা।

মাস কাবারী ।

——৹৹——

জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠীর 'তত্ত্ব' লইয়া—পরিচারিকা আসে—আমরা সাময়িক কাগজের মাসকাবারী তথ্য লইয়া হাজির হইতেছি। 'তত্ত্বে' থাকে আম-সন্দেশ, আর তথ্যে পাওয়া যাইবে বড় জোর আমসত্ত্ব, এবার আমের আশা মুকুলেই বিনাশ—সুতরাং বক্‌সীস আমরা চাই না—পয়জোরই শিরোপা বলিয়া মানিয়া লইলাম।

এ বছর গোড়াতেই মৌসুমী হাওয়া দিতে সুরু করিয়াছে—বাদল-ধারার হিসাব কষিয়া ব্যারোমিটারও হিম মারিয়া গেল, কাজেই জ্যৈষ্ঠে মাসিকের আসর ত ঠাণ্ডাই দৈনিকের বাজারও কিছুমাত্র গরম নয়। আমরা খুঁজিয়া পাতিয়া সেই নরম খবরই দু'চারটা তুলিয়া দিলাম। সুরুতেই দুর্ভিক্ষের কঙ্কালসার ছায়া ছবি দেখাইয়া লই।—

"৮ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে—সেই সপ্তাহে কলিকাতায় নূতন সীতাভোগ চাউলের মূল্য প্রতিমণ ৮৷৶০ ও বালাম প্রতিমণ ৭।০ ছিল। ৯ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা হইতে ১২৩৯২ টন (৩৩৪৫৮৪ মণ) চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।" (সঞ্জীবনী) অথচ প্রত্যেকটি জেলায় চাউলের দর চড়িয়া চলিয়াছে; এ দেশের লোক না খাইয়া মরিবে না তো মরিবে কোন্ দেশের?

*　　　*　　　*　　　*

এ মাসের সব চেয়ে বড় সাময়িক খবর মহাত্মাজীর বাঙলা-ভ্রমণ। ২ রা মে হইতে এ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বিক্রমপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, বগুড়া, বর্দ্ধমান, বোলপুর ইত্যাদি নানা স্থানে ঘুরিয়া তাঁহার মহাপ্রেম ও চরকার বাণী প্রচার করিতেছেন। মহাত্মার শ্রম ও চেষ্টা সার্থক হউক। বাঙলা তাঁহার পুণ্য-বাণীর মন্ত্রে দীক্ষা লউক। অস্পৃশ্যতা পাপ, পরস্পরে বিরোধের অপরাধ, রেষারেষির অপবাদ-কলঙ্ক তাহা হইলে দেশ হইতে নিঃসন্দেহ দূর হইয়া যাইবে।

"ঢাকায় মেথরদিগকে মহাত্মা এই উপদেশ দিয়াছেন :—

(১) সকাল সন্ধ্যায় ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবে; (২) মদ্যপান করিও না; (৩) প্রতিদিন স্নান করিও; (৪) মিথ্যা কথা বলিও না; (৫) গোমাংস অথবা শূকরের মাংস খাইও না; চরকায় সূতা কাট এবং খদ্দর পরিধান কর।" (সঞ্জীবনী)

দিনাজপুরে সাঁওতালদিগকে মহাত্মা নিম্নলিখিত অনুশাসন কয়টী দিয়াছেন :—

(১) কখনও তোমরা মিথ্যা কথা বলিবে না; (২) কাহাকেও ঘৃণা করিবে না; (৩) জীব মাত্রকেই দয়া করিবে; (৪) নিজের জন্য কাহাকেও খুন করিবে না; (৫) কাহাকেও কখনো প্রহার করিবে না; (৬) এক ঈশ্বরকে মানিবে; (৭) দেহে ও মনে পরিষ্কার থাকিবে; (৮) মদ খাইবে না; (৯) বেশ্যাবাড়ী যাইবে না—বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া আর সকলকে ভগিনীর মত দেখিবে; (১০) চরকা কাটিবে ও খদ্দর পরিবে।"

(দৈনিক বসুমতী)

তথাগত বুদ্ধের মত আপনার অনুশাসন বাণী প্রচার করিয়া বুদ্ধেরই মত মহাত্মা প্রার্থনা করিতেছেন :—"সুবত্থি হোতু"—সকলের কল্যাণ হউক। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের "দশ শিক্ষা পদানি"—দশ উপদেশ অনুশাসন "অরিয় অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গ"—আটটী আর্য্য সত্য।

* * * *

"আগামী ১৯২৬ সনে পূজার ছুটীর সময় পার্ব্বতীপুর হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত বড় গাড়ী যাইবে। কলিকাতায় রেলে চড়িলে গাড়ী বদল না করিয়াই শিলিগুড়ি পৌছানো যাইবে; ইহাতে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।"

"১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত প্রথম রেল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী কর্ত্তৃক চালিত হয়।"

"১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইষ্ট বেঙ্গল রেল—২০ মাইল চলে।"

"প্রায় ৫ লক্ষ মাইল ব্যাপী রেলপথ সমগ্র পৃথিবীতে আছে।"

(সঞ্জীবনী)

* * * *

"পরলোকগত স্যর আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার গ্রন্থাগারের সমগ্র গ্রন্থ কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৩০০০ এবং মূল্য ৪০০০০৲ টাকা।"

(সঞ্জীবনী)

হায়দ্রাবাদের ডক্টার সৈয়দ মহম্মদ কাসিম জানাইয়াছেন—সেখানকার পুস্তকালয়ে সহস্রাধিক সংস্কৃত হাতে লেখা পুঁথি সংগৃহীত আছে। পুঁথিগুলির অধিকাংশই মৌলিক এবং তালপাতায় লেখা। গ্রন্থকারের নামের মোহর পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সংযুক্ত আছে—ভারতের আর কোথাও সে সকল পুস্তকের অস্তিত্ব আছে বলিয়া জানা যায় না। অনেকগুলি পুস্তক অতি প্রাচীনতম কালে লিখিত। ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও বড় কম নয়। টুটেন খামেন বা নেবুচাড নেজারের কালেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ধর্ম্ম, দর্শন, কলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অস্ত্র চিকিৎসা জ্যোতিষ, খ-তত্ত্ব, করকোষ্ঠী-সামুদ্রিক ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়া পুস্তকগুলি লিখিত। আর্য্যজাতি যে সেই বিস্মৃত আদিম যুগেও পরম সভ্যতার চরমে উন্নত হইয়াছিলেন এ পুস্তকগুলির মধ্যে তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রচুর পাওয়া যায়। ভেষজ উপাদান হইতে পেট্রল বাহির করিবার অতি বিস্তৃত প্রণালী ঐ পুস্তকে পাওয়া যাইতেছে। অনুসন্ধান ও পরীক্ষাও চলিতেছে—এই প্রণালীতে অতি অল্প আয়াস ও ব্যয়ে উৎকৃষ্ট পেট্রল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত করা যাইবে।

(নিউ এম্পায়ারের ইংরাজী হইতে)

* * * *

"শ্রীযুক্ত বিরলা পানিহাটী মিউনিসিপাল সীমানায় নলকূপ বসাইবার জন্য ৮ হাজার টাকা দান করায়—তাঁহাকে পানিহাটীবাসীদিগের পক্ষ হইতে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।"

(দৈনিক বসুমতী)

* * * *

"কল্যাণীয়া কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী এবার রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত (with distinction) বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুণের সাঙ্গোভ্যালী কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কন্যা। ইনি রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী মহিলা গ্রাজুয়েট।"

(স্বাবলম্বী)

লঘু সাহিত্য :—

সব দেশের সাহিত্যের মতন বাঙলা সাহিত্যেরও লঘু দিকটাই ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তবে প্রশ্ন হইতেছে সেটা সুপুষ্টি না দুষ্ট-পুষ্টি! প্রবন্ধ সমালোচনা, রাজনীতি বা সমাজনীতির উপর লেখার তুলনায় গল্প বা উপন্যাস সকল দেশেই অনেক বেশী ছাপা হয় এবং কাটেও বেশ

দর্শনের বই কীটে কাটিলেও প্রেমের কাহিনী বাজারেই কাটে। সৃষ্টির পক্ষে এ কাটতিটা কিন্তু অতি অনুকূল। শিল্পী তাঁর মনের তাগিদে বস্তুর সৃষ্টি করুন আর না করুন পেটের তাগিদে অন্ততঃ বেশ দু' পয়সা আমদানীর খেসারৎ পাওয়া খেয়ালের খাতিরে— কথা-কথকেরা অজস্র কথা অশ্রান্ত লেখনীর মুখে অনর্গল লিখিয়া যান। দশ জনে গালাগালি দেয় আবার পাঁচজনে ভালও বলে, সাল সুমারীতে নিকাশ করিয়া টেঁকেও দু'চার গণ্ডা জমা হয়,—মন্দ কি!

বস্তুতঃ ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় বলিয়া কথা-সাহিত্যের বাজারে যত ভেজাল আর ভুসি মাল চলে এমন আর সাহিত্যের কোনো বিভাগে চলে না। যেমন গরম চাহিদা—তেমনি গরম সরবরাহ। Hot press বেশীর ভাগ সংখ্যায়ই Hot penএর যা ক্রটী দোষ তা তো গল্প লেখকেরা—don't care করিয়াই চলেন। শিল্পকে নিটোল নিখুঁত মনোজ্ঞ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যে সাধনা, যতখানি অন্তর-দানের প্রয়োজন আছে ঠিক ততখানি বা তার আংশিকও মর্ম্ম সঁপিয়া দিয়া কোন লেখক যে গল্প লিখিয়াছেন—সে প্রমাণ দু' একজন বড় লেখকের হিসাব করা চার পাঁচটা গল্প ছাড়া বাকীগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।

সত্য করিয়া কিন্তু—লঘু বলিয়াই সাহিত্যের এ দিকটা পল্‌কা বা ঠুন্‌কো নয়। বিষয়ের জটিলতম সমস্যাগুলির সরল ও মনোমত সমাধান করিয়া দেওয়াই উপন্যাস বা গল্পের মূল লক্ষ্য। আমার মনের গোপন কথাটী—আমার প্রাণের স্পন্দনের মূলে যে সুর-ধ্বনি বস্তুর বিকাশ ও সত্যের পরম যাহা অর্থ, মানব অন্তরের সুখ-দুঃখের চিরন্তন, কালের যে বাণী নিত্য অক্ষরিত হইয়া উঠিয়া পুরাকালের বিশ্বকেও রোজই নূতন কাচ সবুজ রঙে বিচিত্র করিয়া তুলিতেছে তাহাকে চরিত্রে আকার দেওয়া, রক্ত মাংসে গড়া, প্রাণের সাড়ায় সঞ্জীবিত করিয়া "তোলাই" সাহিত্যের এ লঘু দিকের কাজ। কিন্তু তাহা যে সত্য, সুন্দর এবং শাশ্বত, সে কথা প্রমাণ করিয়াও দেওয়া চাই। এখানকার কারখানায় মন লইয়া কারবার—আর সে মন এক জনের বা এক রকমের নয়— বিভিন্ন লোকের নানা হাল চালে গড়িয়া বাড়িয়া উঠা নানা ঢং, ভড়ং, রকম ভঙ্গিমার মন। অথচ স্রষ্টার সৃষ্টিটী হওয়া চাই সকলেরই মনের মত। কেবল রাজারই মার্ব্বেলে গড়া মোকামে রাণীর জহরতে কারু করা গোলাপী ওড়না উড়াইয়া দিলে শিল্পীর চলিবে না—বুরকার নীচে বন্দিনীর মনের ব্যথাও তাঁকে জানাইয়া যাইতে হইবে—সরাইখানার খুবসুরৎ হোটেলওয়ালীর সুরমায় টানা চোখের পাতাটা কেন সে কালো করে আর যে দেখে সেই বা কেন মনের কাজল পাতায়

ছবি আঁকে এ কথাটাও বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। ভিখারিণীর বুকের কান্না—কাঁদিয়া যাইতে হইবে—অবহেলিতার লাঞ্ছনা আহত কঙ্কালসার অন্তর-পঞ্জরখানিও তিনি—না আঁকিয়া পারিবেন না। কাজেই এ বড় শক্ত কাজ; বহুৎ শ্রম—ভারি সাধনা চাই।

নিরপরাধকে অপরাধীর কাঠগড়ায় ফেলিয়া পুলিস পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে—ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করিবেন—বেটা চোর—ঠিক হইয়াছে। আবার ঐ বেচারীর মত হতভাগার মনে করা চাই—ঠিক হইয়াছে—হুবহু 'সত্য' চিত্র। এমনিই দুনিয়ার বিচার বটে!

সকলের মনের কুলুপ-কাটী ঘুরাইয়া একই বস্তু দিয়া দুনিয়াকে তুষ্ট করাই গল্প-কুশলীর মুন্সীয়ানা। অনেক বাজেকথা বলিয়াও আসল কথাটা বোধ হয় বুঝাইতে পারিলাম না—আর একদিন চেষ্টা করিব।

এ মাসে প্রবাসীতে দুইটী গল্প বাহির হইয়াছে দুইটাই মৌলিক। ভারতবর্ষে ৪টী, মানসীতে ৩টী, বঙ্গবাণীতেও ৩টী তার একটী অনুবাদ। বসুমতীতে ৩টী গল্পের মধ্যে একটী অনুবাদ।

আগে মৌলিক গল্পের কথাই বলি।

প্রবাসীতে বিভূতিবাবুর "বিয়েরফুল" ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিল না। উপসংহারের বস্তুটুকু খাঁটি এবং বেশ কিন্তু তাহাকে লাগ মতন ধরিয়া দিতে পারেন নাই। বউদিদির চেয়েও হাওড়ার গাড়োয়ান Real—সুন্দর। ডাকাতির এপিসোডটুকু তেমন জুত সই মতন জমে নাই। খোট্টার গান দু'লাইনে নেশার রেশ আসে—তার "আর এক পেয়ালা চা ভি আনিয়ে দি" বাঙলা কথায় হাসি চাপা কঠিন। ভাষাটী ঝর ঝ'রে। "ভোলা"—কুকুরের গল্প পুকুর ধারে বসিয়া লিচু চুরি করিয়া খাইবার বয়সে এক রকম লাগিতে পারে—এ বুড়া কালে ভয় হয়, কুকুর তো জানোয়ার, ক্যাঁক করিয়া একটা কামড় বসাইয়া দিলেই বাশ!—হয় শিলং নয় কলিকাতা! ট্রাজিডীটুকু দেখাইতে চাহিয়াছিলেন—ভোলার মরণে নয়—তার প্রাণে আর হীরু মানে তার প্রভুর মনে। অতি সাধারণ কথা—নেহাৎ সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের "ক'নে পছন্দ"—নেহাৎ মামুলী মান্ধাতার আমুলী প্লট। মেয়ে-ইস্কুলে থিয়েটার দেখিতে গিয়া অভিনেত্রীর রূপে ভুলিয়া যাওয়া—তিনি আবার শকুন্তলা ইনি হইলেন দুষ্মন্ত মনে মনে অবশ্য—পরে গোঁড়া হিন্দু পিসিমাই—এই মেয়ে ইস্কুলের পড়ুয়া মেয়েটার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়া দিলেন—তার "আব—স্বরূপ"টী শুধু একখানা পাতলা নেটের যবনিকায় আবডাল

করিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হইল। ভাষাটা মন্দ নয় মেয়েলী হাত। মিঠাও বটে।

চাঁদের কলঙ্ক—আছে বটে? আমরাও তা অস্বীকার করি না;—তবু মন্দ না। দাবীহারা নারীর দাবী দাওয়ার গল্পে বিচার চলিয়াছে। "পিউনী জজেরা" ইহার রায় দিবেন—সেই ভাল। নারীর অধিকার লইয়া কাসুন্দী ঘাঁটার পর—এই আর একটা কাঁঠাল কাটিয়া পাঁটা রান্না—ঘি, গরম মসলা আছে—সুধু অজ নয় এঁচোড়! ভাষাতে গন্ধ আছে জায়গায় জায়গায় সিক্ত হইয়া ভারিও হইয়াছে বলা যায়।

মানসীর—মনের দাগ—মনের উপর যাই হোক আঁচোড় পেঁচোড় একটা দাগ রাখিয়া যায় বটে। মানসীর টুপ্তালার মতন খট্টরং ভাষার তুলনায় এ গল্পটার ভাষা অনেক মিহি এবং মোলায়েম বলিতে হইবে। মেয়েটার আত্মহত্যায়—ট্র্যাজিডীকেও হত্যা করা হইল। ওখানে মৃত্যু দেখানো—আর্ট নয় অন্তত: খাঁটি আর্ট নয়। "স্বর্গের" ব্যথা পাঁচুবাবুর গল্প। পাকা হাত। চমৎকার ভাষা খাসা বলিয়াছেন।

বসুমতীর সব গল্পই এক ধরণের। যেমন কেউ বলে "লা"—কেউ আবার "না"—কেউ বা বলে "নৈকা"—আমরা বলি নৌকা—এই যা তফাৎ। অনুবদাটীর কথা পরে বলিতেছি।

বঙ্গবাণী—মাণিকবাবুর নিয়তিতে লেখার ভঙ্গী বৈচিত্র্যের মধ্যে মাণিকবাবুকে পাওয়া যায় কিন্তু উপসংহারে—তিনিও নাস্তি! কি করা যাইবে—লেখকের নিয়তি! রামটহলের বন্দুকে তার নিজের ছেলে হত হইল! জাতি রক্ষা—বিধবা কালীর জাতি রক্ষার কথা। "রিয়াল" কিন্তু ভোলাপ চুয়াস নয়—নিখুঁত ছবি—সুন্দর।

অনুবাদটীর কথা পরে বলিতেছি।

বিজলীর 'পণী' অমলেন্দুবাবুর রাসিয়ান মেয়ের গল্প—বরং বলি পোলীস তরুণীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ আত্মার কথা। অপূর্ব্ব সুন্দর। টীনা "নীলপরী" কি ইরাণী হুরী তা দিয়া আমাদের দরকার নাই। তবে সে জানিত—"পোলাণ্ডের চেয়ে বড় মহৎ দেশ পৃথিবীতে নেই" ট্রাজিডীটা গল্পের, ক্যাটারিণা বা টিনার মরণের মধ্যে নয়—সেই ক্ষুব্ধ, কাতর আহত অন্তরাত্মার মধ্যে "লিও বুঝলে তার আর বিন্দুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট নাই" ট্রাজিডীটা জমিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে উপসংহারের এই লাইনটীতে আর তাহা চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে—শেষের সত্যকথায়—"বরফে পোলাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের অবসান হ'য়ে গেল।"

এ মাসে বঙ্গবাণীতে একটী ও বসুমতী একটী মোট এই ছুইটী অনুবাদ গল্প বাহির হইয়াছে। ছুইটাই স্বর্গীয় কথা-রসিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের তর্জ্জমা। মূল স্প্যানিস গল্পের অনুবাদ। "প্রথম ভালবাসা"—পারদো বাজানের লেখা। বাজান স্পেনের গ্যালিসিয়া প্রদেশের একজন কাউন্টেস। বাজান এ যুগের স্পেনীয় সাহিত্যের একজন অতি শক্তিশালিনী লেখিকা। জীবিত কথা-শিল্পীদিগের মধ্যে মানইজ্জত নাম ও ইনাম পাইয়াছেন চারজন "ভালদেস", গালদোস,—ইবানেজ আর বাজান। বাজান শুধু ঔপন্যাসিক নন্—ইউরোপীয় সাহিত্যের খাঁটি সমজদার, ধীমতী সমালোচক বলিয়াও তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা আছে। বাজানকে রুচিবাগীশ সমালোচকেরা রিয়ালিষ্টিক বলিয়া নাক সিঁটকাইয়া থাকেন। জোলার বস্তুতন্ত্র-বাদ বাজানের লেখার আদর্শ সরবরাহ করিয়াছে বলিয়া অনেকের মত। এ গল্পটীও একটী কিশোরের মনে ছবি দেখিয়া প্রেমের প্রথম বাণহানার কাহিনী। ছবিটী কিন্তু তাঁর বুড়ী দিদিমার যৌবন-দিনের।

বাস্তুশিল্পীর পত্নী বসুমতীতে বাহির হইয়াছে। ত্রুয়েবার স্প্যানিস গল্প হইতে তর্জ্জমা Trueba (১৮২১-৮৯) কথায় পল্লীজীবনের জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। সুন্দর এবং হৃদ্য। বস্তুশিল্পীর পত্নীটীও এই সত্যেরই কতক অংশে সাক্ষ্য দিবে।

বসুমতীতে শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র রায়ের "প্রলয়ের আলো" নূতন উপন্যাস আরম্ভ হইল।

প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাত্রীর ডায়রী অফুরন্ত রস মধু তথ্য তত্ত্ব অপর্য্যাপ্ত বিলাইয়া যাইতেছে,—মাসের পর মাস। তাঁর "তিন বছরের প্রিয়া"—"তিন বছরের বিরহিণী"—ইত্যাদি পড়িয়া Worsdworth-এর Lucy কবিতা মনে পড়ে কিন্তু আমাদের কবি বলিয়া দিয়াছেন—"তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে"—তা'পর—

পূর্ণ চাঁদের মায়ে, বৃহস্পতির দশায়;—
দুঃখ আমার আর সে যে হোক—
নয় সে দাদা মশায়।

আমাদের কবির প্রিয়াকে ঘিরিয়া—"অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়" ইত্যাদি মিষ্টিক রূপ কথা রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে হয়তো—কিন্তু—in Sun and shower—

Worsdworthএর যে অজানা তিন বছর বাড়িয়া উঠিয়াছিল—তার জীবন-কথার মতে মিষ্ট্রিতে ঢাকা পড়িয়া যায় নাই।

"শিক্ষকের আক্ষেপ" শুনিয়া আর কি করিব—নইলে নিজেরই পেটে হাত আর পিঠে হাত! সাঁওতাল জীবন—উপন্যাসের মত মধুর। তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মে গবেষণা ও মেহনত দুয়েরই সন্ধান পাইলাম। রূপ ও আলাপ গানের কথা। বসুমতীতে "বাঙ্গালীর বিবাহ"—ও তাই—সুর রাগিণী ভালই ত। বঙ্গবাণীর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য ও সঙ্গীত শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের লিখিত বিশ্বকবির স্বহস্ত মার্জ্জিত প্রবন্ধ সুপাঠ্য সুমার্জ্জিত। আমরাও বলি—"কেলার মোনি"—কি মধুর সুরে উপপাদ্য ত্রয়ী লীন লয়ে বাঁধা পড়িয়াছে।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ—মন দিয়া পড়িলে উপকার হইবে। ময়ূরভঞ্জের আলপনা ছবির কলা-কাহিনী।—প্রবাসীর ব্লক লইতে থোড়া খরচ নাই। ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহার—রয়েল সোসাইটীর ইতি কথা, উৎকৃষ্ট ও জ্ঞাতব্য।

প্রবর্ত্তক আবার স্বগৌরবে বাহির হইল। এ মাসে আর বলিবার স্থানাভাব।

"চক্রবর্ত্তী"

(নব পর্য্যায়)
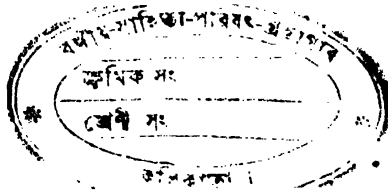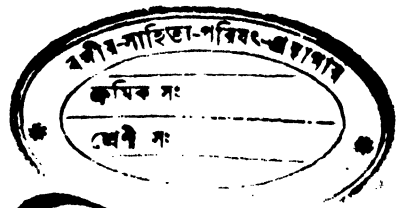
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ।	শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল।	৪র্থ সংখ্যা।

অন্তর-দেবতা।

—:০:—

জাগিছে কঠোর মৃত্যুমূর্চ্ছা গরজি গভীর রবে
রক্তমূরতি দহিছে অনল সুপ্ত শশ্মানশবে।
হেন কত বেশে কত শত দেশে যাপিয়া জীবন শত
না দেখি' উপায় চরণ ধরিয়া হয়েছি শরণাগত।
বল বল প্রভু বল না আমায় কেমনে হৃদয়মাঝে
লুকায়ে রয়েছ গোপনে গভীরে, রয়েছ কেমন সাজে?
জ্বলিতেছে ক্ষীণ মর্ম্মপ্রদীপ গিরিগহ্বর অন্ধ
সেখানে আমার শ্মশান-দেবতা একাকী রয়েছে বন্ধ।

চারিদিকে তার জাগিছে আঁধার টুটিয়া তিমির-রাশি
ফুটিছে কমল-কুমুদ-কুন্দ-নিন্দিত তার হাসি।
থাক্ সে যতনে ভাঙ্গাবো না তার শুভ্র মধুর শান্তি
একদা আকুল আকাশের মাঝে জাগিবে তাহার কান্তি।

(২)

যার লীলাভাস প্রহেলিকা সম গঠিল বিরাট বিশ্ব
থরে থরে তাহে রাখিল সাজায়ে কত সুখময় দৃশ্য—
সুখদুঃখ যার নিয়ম-অধীন সঙ্কেতে তার বটে
উন্নতি আর পতন জগতে সদা সবাকার ঘটে
কত না জাতির চিহ্ন তাহার এক সঙ্কেত মাত্র
কালসিন্ধুর বুকে হল লীন হেরিয়া প্রলয়রাত্র
হেরিলা অদূরে সময়াম্বুধি ফেণরহস্যক্ষুব্ধ
পশ্চাতে তার বাত্যাতাড়িত তরঙ্গগণ লুব্ধ।
অকূল দুর্ব্বার সাগর ভীষণ তবুও আশার ছল,
নহে সে ছলনা, হে মোর দেবতা—দুর্ব্বলের সে যে বল।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খৃষ্টান্ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতীপাচার ও মহৎপূজা।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স (স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো) নিবাসী মার্ক টোয়েন্ একজন পর্য্যটক ও সুলেখক ছিলেন। তিনি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত একাধিক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

একদা তিনি অনেকগুলি আমেরিকানিবাসী ভদ্রলোকের সহিত জাহাজে, নিউইয়র্ক হইতে পবিত্র ভূমি প্যালেষ্টাইন্ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন।

তাঁহারা নানস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে রোম নগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দ্রষ্টব্য স্থান সকল পরিদর্শনের পর বিচিত্র অথচ বীভৎস দৃশ্য ক্যাপুচিন্ (Capuchin) সন্ন্যাসীদিগের মঠ দেখিতে গমন করেন।

ক্যাপুচিন্ সন্ন্যাসীদিগের একটি মঠ, উহার দ্রষ্টব্য স্থান ভূগর্ভে—সোপানাবলীর সাহায্যে তাহাতে উপস্থিত হইতে হয়।

গৃহমধ্যে ছয়টি অংশ বা ভাগ আছে। প্রত্যেক ভাগ বিভিন্ন আকারে সজ্জিত, এই সমস্ত সাজসজ্জা মনুষ্যের অস্থিবারা গঠিত। কোন ঘরের সুগঠিত খিলান, কেবলমাত্র মনুষ্যের উরুদেশের অস্থি সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মিত। কোন গৃহ বা বহু নরমুণ্ড একত্র করিয়া সমচতুষ্কোণ ভিত্তি-বিশিষ্ট ক্রমসূক্ষ্মাগ্র পিরামিডের আকারে রচিত। মুণ্ড সকল যেন বিকট দন্ত বাহির করিয়া হাসা করিতেছে। কিন্তু উহার গঠন নৈপুণ্য অতি চমৎকার। পদের নলীর সম্মুখের দিকের অস্থি এবং বাহুর অস্থি সংগ্রহ করিয়া সেই বীভৎস উপাদানের সাহায্যে স্থপতি-বিজ্ঞান-সম্মত নানা প্রকার সুদৃশ্য কারু-সম্পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোন স্থানে প্রাচীরগাত্রে চূণবালির আস্তরের উপর মনুষ্য শরীরের মেরুদণ্ডের গ্রন্থিল অস্থি সমূহ বক্রভাবে সন্নিবেশ করিয়া দ্রাক্ষালতা রচিত হইয়াছে। মানুষের স্নায়ু এবং অস্থিমাংসযোজক শিরা লইয়া লতার সূক্ষ্মতন্তু এবং জানু-সন্ধির সম্মুখস্থ মুদ্রাকৃতি অস্থি (মালাই) ও পাদাঙ্গুলির নখরের দ্বারা

পুষ্প প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপে সেই অমানুষিক স্থানে মনুষ্যশরীরের দীর্ঘকালস্থায়ী উপাদান সকল সংগ্রহ করিয়া নানারূপ শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যাক্কারজনক ও অস্পৃশ্য উপাদান লইয়া শিল্পী কত শ্রদ্ধার সহিত ঐ সকলের সূক্ষ্মাংশের পারিপাট্য এবং কত মনোযোগের সহিত উহাদিগের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে তাহা ভাবিলে, যেমন তাহার কলাবিদ্যার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, তেমনি তাহার নির্ব্বিকারচিত্তের পরিচয় পাইয়া অবাক হইতে হয়।

মঠের নম্রস্বভাব এক সন্ন্যাসী দর্শকদিগকে সেই সকল দেখাইয়া বেড়াইতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছে ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমরা করিয়াছি।"

তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতে ছিল, কত যেন অহঙ্কারের সহিত তিনি সেই সকল সম্পত্তি দেখাইতেছিলেন। পরিদর্শকেরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাহারা ?"

"আমি এবং ক্যাপুচিন্ সম্প্রদায় ভুক্ত এই মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী ভ্রাতারা।"

"এই ছয়টি প্রকোষ্ঠ সজ্জিত করিতে কতগুলি সন্ন্যাসীর অস্থি আবশ্যক হইয়াছে ?"

"এই সকলে চারি হাজারের অধিক সন্ন্যাসীর অস্থি আছে।"

"এত অস্থি সংগ্রহ করিতে বোধ হয় বহু দিন লাগিয়াছে ?"

"বহু শতাব্দী।"

"ইহাদের মধ্যে কোন সন্ন্যাসীর অস্থি, শিরা ইত্যাদি দেখিয়া আপনি চিনিতে পারেন ?"

"হাঁ অনেককে চিনি।"

পরে একটী নরকপাল অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "এটি ভাই এন্‌সেলমোর—যিনি আজ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন,—ভাল লোক ছিলেন।"

"আর একটী করোটি স্পর্শ করিয়া বলিলেন "এটী ভাই আলেকজান্দারের—আজ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন।"

পরে তিনি একটী মাথা হাতে লইলেন, এবং 'হ্যামলেট' যেমন সমাধি-খনক, Yorick-এর মুণ্ড হাতে লইয়া, অভিনিবেশ সহকারে সেই দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে Yorick-এর বিষয় আলোচনা করিয়াছিল, তিনিও সেইরূপ একাগ্রচিত্তে উহার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

পরে বলিলেন "ইনি ভাই টমাস। এক উচ্চ এবং গর্ব্বিত বংশে এই যুবকের জন্ম হইয়াছিল। এই বংশ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের রোমের সেই সকল প্রাচীন গৌরবের দিন হইতে নিজ আভিজাত্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। অপেক্ষাকৃত নীচ বংশোদ্ভবা এক তরুণীর সহিত এই যুবকের প্রণয় হয়। তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা প্রথমে তাঁহাকে এবং পরে তাঁহার প্রণয়িণীকেও নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তরুণীকে তাহারা রোম নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল! যুবকও প্রণয়িণীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু বহু দূর দেশান্তর পর্যটন করিয়াও আর তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন ভগ্ন হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি আমাদের এই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ে আত্মনিবেদন এবং নিজ পরিশ্রান্ত জীবন ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার পিতামাতা পরলোক গমন করিলেন। বিধাতার লীলা—হঠাৎ সেই সময় এক দিন তাঁহার প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তরুণী এতদিন নানাস্থানে তাহার প্রণয়ভাজনের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল, অবশেষে সে এ প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত—পথে উভয়ের সাক্ষাৎ—যুবকের সন্ন্যাসীবেশ—তবুও প্রণয়ীকে প্রণয়িণীর চিনিতে দেরী হইল না! যথার্থ প্রেম-সূত্রে তাঁহারা গ্রথিত ছিলেন। যুবতী আনন্দ-বিহ্বল উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহার সন্নিহিত হইতেই—সন্ন্যাসী অপার্থিব স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমি যে এখন সন্ন্যাসী! নিরুপায়—নিরুপায়!—যুবক বাক্যস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে সেখান হইতে তুলিয়া মঠে আনা হইল বটে, কিন্তু তিনি আর তারপর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল; এই দেখুন; তাঁর মাথার চুলের রং এই রকম ছিল। এখনও কয়েক গাছা চুল মাথায় লাগিয়া আছে।"

পরে উরুদেশের একখানি হাড় উঠাইয়া লইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "ঐ তাঁরই উরুর হাড়। আপনাদের মাথার উপর প্রাচীরগাত্রে ঐ পাতাটি দেখিতেছেন, উহার শিরাগুলি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁর আঙ্গুলের গাঁইটে ছিল।"

মার্ক টোয়েন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঠের সন্ন্যাসীভ্রাতারা সকলেই কি আশা করেন যে মৃত্যুর পর তাঁদের অস্থি এইখানে এই প্রকারে রাখা হইবে?"

সন্ন্যাসী শান্তভাবে উত্তর দিলেন,—"আমাদের সকলকেই শেষে এইখানে থাকিতে হইবে?"

তিনি মরিলে, তাঁহার অস্থি, শিরা, স্নায়ু ইত্যাদি দেহোপকরণ সংগ্রহ করিয়া, এই স্থানে আবার নানারূপ শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শিত হইবে, এ চিন্তাতে সন্ন্যাসীর মনোমধ্যে কোনরূপ সন্তাপ হইল না। অভ্যাস করিলে সকলই সহ্য হয়।

মঠের স্থানে স্থানে বেশ সাজানো কুঞ্জ-কুটীরের ন্যায় আছে। ঐ সকলের মধ্যে মানুষের হাড়ের বিছানার উপর সন্ন্যাসীদের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদের পরিধানে কালবর্ণের পরিচ্ছদ। বহুদিনে শবগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দর্শকেরা একটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন! তাহার বক্ষের উপর হস্তদ্বয় যুক্তকরে স্থাপিত। মাথায় কেবল দুইগোছা চুল মাত্র। শুষ্ক চর্ম্ম দৃঢ়ভাবে শবে সংলগ্ন হইয়া আছে। চক্ষুর জলীয় অংশ শুকাইয়া গিয়াছে,—সুতরাং চক্ষুদুটি ভগ্ন-প্রবণ ও কোটরগত। নাসিকার অগ্রভাগ খসিয়া গিয়াছে,—সে জন্য নাসারন্ধ্রদ্বয় বা গহ্বর দুইটি ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া হরিদ্রাবর্ণ দুইপাটি দন্ত হইতে সরিয়া গিয়াছে। ফলে, অমানুষিক হাস্যের ছটায় শবের ভীষণ মুখ যেন ভীষণতর বোধ হইতেছে।"

** ** **

আমাদের বোধ হয় যে, বিকাররাহিত্য সম্বন্ধে ইহাদের তুলনায় আমাদের দেশের শব সাধক ও শ্মশানবাসী যোগীরা শিক্ষানবিশ্ মাত্র।

খৃষ্টানদিগের রোমান্‌ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতর মহাপুরুষদিগের পূজা অত্যধিক। মার্ক্ টোয়েন ইতালিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তথায় যিশুখৃষ্টের নামের অপেক্ষা মহাপুরুষদের নাম বা আদর অধিক। সেদেশে মহাত্মাদের মৃত্যু হইলে, অনেক স্থলে তাহারা তাঁহাকে সমাহিত করিত না বা এখনও করে না; বেশভূষায় ভূষিত করিয়া, সিন্দুকের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া দেয়। এই প্রকারে রক্ষিত, বহুদিনের প্রাচীন মহাপুরুষদের মৃতদেহ সে-সকল দেশে এখনও রোমান্ ক্যাথলিক্‌দিগের গির্জ্জা এবং খৃষ্টানদিগের মঠের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্ক্ টোয়েন্ ইতালির শীর্ষদেশে মিলান নগরের সুবৃহৎ গির্জ্জার ভিতর, তিন শত বৎসরের সযত্নে রক্ষিত এক মহাত্মার মৃতদেহ চাক্ষুষ করিয়া নিজ গ্রন্থে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহারা মিলানের প্রকাণ্ড গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহার বিরাট ব্যাপার পরিদর্শনের পর ভূগর্ভস্থ সমাধিমন্দির দেখিবার জন্য নিম্নে অবতরণ করিলেন। গির্জ্জার একজন যাজক তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। ভূগর্ভ অন্ধকার, সেই জন্য যাজকের হাতে বাতির আলো ছিল। ক্রমে তাঁহারা যাইয়া এক গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

এই স্থানে এক অতি সৎ হৃদয়বান ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তির সমাধি আছে। দরিদ্রকে সাহায্য দুর্ব্বলচেতাকে উৎসাহ দান এবং রোগীর শুশ্রূষা করিতে এই মহাত্মার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে কাহারও বিপদ দেখিতেন, তখনি তথায় যাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেন.। তাঁহার হৃদয়, হস্ত ও অর্থ, জগতে সেবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহার জীবদ্দশায় মিলান নগরে একবার মারী ভয় উপস্থিত হয়। অগণিত লোকক্ষয়ে নগর বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল। পিতামাতা পুত্র কন্যাকে, বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। প্রাণভয়ে অতীব আত্মীয়ের কাতরোক্তি কেহ গ্রাহ্য করিল না। যখন নিজ নিজ প্রাণরক্ষার জন্য মানুষ দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে, আতঙ্কে উন্মত্ত হইয়া যে যেখানে পারিতেছে পলাইতেছে, সেই বিষম সময়ে এই নির্ভীক মহাপুরুষ নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া, প্রসন্ন বদনে ও সদয় হৃদয়ে গৃহে গৃহে ঘুরিয়া, ভয়ার্ত্তকে সাহস, বিপন্নকে সাহায্য, দরিদ্রকে আশ্রয়দান ও রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিশ্বপ্রেমের পরিচয় পাইয়া লোকে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে অকপটচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

এই মহাত্মা মিলান নগরের বিশপ ছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত না করিয়া, সেই কক্ষ মধ্যে পাষাণময় শবাধারে, সুদীর্ঘ তিন শত বৎসরকাল সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

যাজকের হস্তস্থিত আলোকের সাহায্যে, শবাধারে দর্শকদিগের দৃষ্টি পড়িল। ঐ মহাত্মা জীবনে যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ঐ সকলের দৃশ্য, গৃহমধ্যে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরগাত্রে রজতধাতুতে ক্ষোদিত রহিয়াছে। পাষাণময় বৃহৎ শবাধারের আচ্ছাদন উন্মোচনের জন্য, উহাতে একটি ভারোত্তোলন যন্ত্র সংলগ্ন আছে। যাজক তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ পোষাকের উপর

জরির কাজকরা অদীর্ঘ একটি পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন; নিজ হাত দুইখানি একবার আড়ভাবে রাখিয়া সসম্ভ্রমে, ক্রুশাকৃতি করিলেন, প'রে ধীরে ধীরে ঐ যন্ত্রটি ঘুরাইতে লাগিলেন। ক্রমে শবাধার দ্বিধা বিভক্ত হইল ও স্ফটিক নির্ম্মিত এক স্বচ্ছ আধার অভ্যন্তরে মহাত্মার মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হইল। স্বর্ণ সূত্রে চিক্কণ কাজকরা, রত্নখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদে উহা আবৃত। মস্তক কালে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াগিয়াছে। গণ্ডদেশে একটি ও ললাটে একটি—দুইটি ছিদ্র আছে; ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত ও বিশ্লিষ্ট হওয়ায় দন্তের দুই পাটিতে যেন ভীষণ হাস্য প্রকটিত হইতেছে। মস্তকোপরি অতি সুন্দর পল্‌কাটা হীরকাবলি মণ্ডিত উজ্জ্বল মুকুট এবং বক্ষোপরি মরকত ও হীরকখচিত ক্রুশ্ (crosses) ও ধর্ম্মাধ্যক্ষের দণ্ড (crozsers) রহিয়াছে।

* * * *

দেশে দেশে এই একই বীরপূজা,—মহতের সম্মান,—মানুষের মন সর্ব্বদাই এক,—স্মৃতির পূজক,—বিশ্বমানবের একই খেয়াল,—বিভিন্ন আকারে হইলেও একই পদ্ধতি। প্রেতপূজা ও স্মৃতিস্তম্ভ—বিশ্বমানবের একই চিন্তাধারার পরিচায়ক।*

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

আষাঢ় নিশায়।

—ঃ*ঃ—

এসেছে ফিরে ওই অঝোর দেয়া
 ফুটায়ে বনমাঝে কদম কুঁড়ি;
খুলিছে দলগুলি কণক কেয়া,
 লীলায় পিচ্‌কারী খেলিছে হুরী।
 মেঘেরা ছুটে গেছে আকাশ পথে
 বিজুলী ছুটে যায় নয়ন হতে
 কাজরী গীত সনে নাচিছে তারা
 হাসিতে ঝরিতেছে ইল্‌সেগুড়ি।

---

* Mark Twain-এর "The Innocents Abroad" হইতে সঙ্কলিত।

শালের বনে বনে মেঘের ছায়া
আঁচল লোটে তার উদাসী বায়
নীপের শিহরণ কিসের মায়া
আজিকে মন-পাখী কোথা সে ধায় !
কাঁদিছে ঝাউবন হতাশে একা
গাহিছে কুহু দূরে, সাজিছে কেকা
মৃদঙ্ করতাল বাজিছে মেঘে
চাতকী উচ্ছ্বাসে সুদূরে চায়।

তটিনী ছুটে চলে অলখ্ পানে
আপনা যৌবন-স্বপন মাতি
অজানা-শিশু ঘুম-পাড়ানী-গানে
চলিছে ঢেউ-শিশু পথের সাথী।
দোদুল দোলে কচি যূথীর পাতা
ফুটিছে বুকে তার প্রাণের গাথা
আকাশে বাজে শাঁখ—বাতাসে হুলু
ডালিম ফুলে ফুলে জ্বলিছে বাতি।

এমন দিনে প্রিয়া কুটিরে এসে
নয়নে বুনেছিলে স্বপন-রেখা
রঙিণ সাজ খুলি মলিন বেশে
গিয়েছ ওই পথে ফিরিয়া একা।
নারীর প্রেম প্রিয়া বুঝি নি কী সে
নিমিষে আলো দিয়া হারালো দিশে
আঁধারে ডেকে আনি নিবিড় ঘন
চুমুর এককণা দিলে না লেখা।

আজিকে কোথা আছো একেলা ঘরে
ব্যাকুল কাঁদিতেছ কাহার লাগি
হেথায় বুকে মোর বেদনা ভরে
পিয়াস-প্রাণে আজ তোমারে মাগি।
কোথায় গেছ প্রিয়া কোন্ সে দেশে
অজানা পরবাসী—দিঠির শেষে
আজিকে এস এস গোপন পায়ে
রয়েছি বসে হেথা রজনী জাগি।

বন্দে আলী।

ক্ষুধাতুর সভ্যতা।

——:*:-

কেও, ক্যাঙালীচরণ, এস এস বাবা, বসো। কি করছি? দেখতেই পাচ্ছ গরুড়াসন করে বসে কলকেয় ফুঁ পাড়ছি। কখন্ কাক চিল ডেকে গেছে, বোসেদের ঐ তালপুকুরের পুব পাড়ে চেয়ে দেখো, দশ ছিলিমের নেশায় লাল ডগডগে চোখখানা রগড়াতে রগড়াতে সূর্য্যিমামা উঠেছেন। এখনও আমার নেশার খোঁয়ারী ভাঙা হয়নি ক। এই হাড় জিরজিরে সরিসৃপ প্যাটার্ণ শরীর, তার গাঁটে গাঁটে বাতব্যাধির একমালি সত্ব আর কণ্ঠে শ্লেষ্মা ঠাকরুণের রসনচোকী; আর বাবা ক্যাঙালী, এ সব নিয়ে আমাতে কি আর আমি আছি। উনিশবছর একাদিক্রমে মসীলেপনের পর এই বার্দ্ধক্যে পেন্সন পাই সতর টাকা সওয়া পাই আনা, ডাইনে

আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, ঘোর কলিতে বাবা ব্রাহ্মণ আর তোমার নামটি হয়ে গেছে একার্থবাচক। এই যে অনশনক্লিষ্ট "ঙ" মার্কা ফ্যালারাম চকোত্তি দেখছো, ইনি হচ্ছেন বিংশ শতাব্দির বাঙালীর এম্‌ব্লেম্,—typical product of Anglo Indian Civilisation; পাশ্চাত্যের দুর্ব্বাসাকল্প দুর্ম্মুখ ঋষি Bernard Shaw যে বলে গছেন,—"Civilisation is a disease produced by the practice of building society with rotten material", তা' বড় মিথ্যে নয়, ক্যাঙাল, মিথ্যে নয়। সুসভ্য পরম কারুণিক, benign এবং মহামহিমান্বিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাল মসলা হচ্ছে এক পাল ফ্যালারাম চক্কোত্তির—ক্ষুধা রাক্ষসীর বাহন বাতরাহুগ্রস্ত এই রকম চির ত্রিভঙ্গ নোট্ অব ইণ্টারোগেশন ফ্যালারাম চক্কোত্তি।

বাবা ক্যাঙাল, হেসো না বাবা, অমন করে বুড়োর কলজেয় আগুণ ধরিয়ে হেসো না, বাপ। আমি তোমায় সত্যি বলছি এ সভ্যতা হচ্ছে মহামায়ার ধোকাঁর টাটি, এটি হচ্ছে মানুষরূপ বলদকুলের সুখের ঘানী, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের সেরেফ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ষ্টল্। গিয়ে লক্ষ্য করে দেখ গে, এককোঁটা সুখরূপ তৈলের আশায় নর-বলীবর্দ্দের দল নাকে দড়ি পরে পরমানন্দে ঘানী টেনে টেনে নিজেদের জীবনান্ত করছে বটে কিন্তু তৈল আর তাদের ভাগ্যে জুটছে না। এই চটকদার সভ্যতার বাজারে গিয়ে চক্ষু মেলে দেখ গে একবার, বাবা, দোকানে দোকানে ব্যাপারীরদল পুরাণো মেকী রঙচটা মাল সব ঝেড়ে মুছে বার্ণিস করে নতুনের নামে চড়া দামে ছাড়ছে। স্পার্টার বীরত্ব ও রোমের সাম্রাজ্য সেই আদিকালের ভীমসেনের গদারই দ্বিতীয় সংস্করণ, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ তো বাবা বুধুর নির্ব্বাণ মুক্তির সেই ছেঁড়া কাঁথাখানারই নামান্তর মাত্র, পার্থক্যের মধ্যে "সর্ব্বং দুঃখং" "সর্ব্বং ক্ষণিকম্" ইত্যাদির গায়ে শঙ্করঠাকুর সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের গোটা দুই তালি মেরে নিয়েছিলেন। আরব দেশের মহাত্মা যিশু যখন টিকি রেখে তেলক কেটে খোল করতাল মৃদঙ্গ সহকারে নবদ্বীপে এসে উদয় হলেন সেই পুরাণ প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতে তখন সে নতুন বার্ণিশ করা প্রেমকে কি Secondhand article বলে কেউ সনাক্ত করতে পেরেছিলে? অতদূর যেতে হবে কেন? হালেই দেখ না আমাদের মহাত্মাজীর হাত-সাফাইয়ের তারিফ! যীশুর প্রেমেরই পুরাণ বুকড়ি চালে বাবা বুধুর অহিংসা রূপ অড়র ডাল দিয়ে তা'তে টলষ্টয়ের গরমমশলা যোগে আজ ঝাল কি খাসা নন্‌কো রূপ পক্কান্ন তৈয়িরী করেছেন। সবই বাবা নতুন করে নতুন গিন্নীর রাঁধা পুরাতনের জগা-খিচুড়ী; সবই বাবা

মরা মুর্দোর কাপড়—ধোপার বাড়ী থেকে দিব্যি ধোলাই ও ইস্ত্রী হয়ে রিপুকর্ম্ম ও তালিযোগের পর নতুনের নামে খরিদ্দারের মনহরণ করছে। তাইতো বলছি, বাপু, এ মেকী বার্ণিশ করা সভ্যতায় মানুষ এগোচ্ছে কি পেছোচ্ছে তা বলে কার সাধ্য।

যতই চটকদার করে এ সভ্যতাকে ঘষে মেজে দাও না কেন, এর ভিত হচ্ছে সেই ক্ষুধা আর ক্ষুধা। মানুষ ভাবছে তারা চলছে বড় বড় ভাবের টানে উঁচু উঁচু আদর্শের ডাকে, কতই না মহামন্ত্রের শক্তিতে। তারা বুঝছে না, যে, জীবনের রাজপথে নানান আদর্শের পোষাক ও গয়না-গাটি পরে মানুষ ভুলাতে দাঁড়িয়েছে যারা তারা মায়াবিনী ক্ষুধা রাক্ষসীরই দল। এ কথা না মানো; আচ্ছা, কোন রকম অমৃত পান করিয়ে দিন কতকের জন্যে মানুষের আহার বন্ধ করে দাও, উদর-গহ্বরের দাবানল নিবিয়ে ফেল। দেখবে তা হ'লে শুধু যে হোটেল রেস্তরাঁ ময়রার দোকানই উঠে যাবে তা নয়, এ ক্ষুধাতাড়িত সভ্যতার রথখানির অনেক চাকাই অচল হয়ে পড়বে। চাষ আবাদ ক্ষেত খামার যাবে, মিল যাবে, ফ্যাক্টরী যাবে, রাজার ট্যাঁকশাল বন্ধ হবে, চাকরীর উমেদার উমেদারী ছাড়বে, বরের বাজার মাটি হ'য়ে কন্যাকর্ত্তার শুষ্কমুখে হাসি ফুটবে, সেপাই, পল্টন, পুলিশ পাহারা ঘুচে গিয়ে এম্পায়ার গড়ার মুখে ছাই পড়বে। ভেবে দেখ তো ক্যাঙালীচরণ একবার চারিদিকে কি অনর্থপাতই না ঘটবে! রুলধারী লালপাগড়ী-শাসিত এই নাগরিক সভ্যতার মত আহার নিদ্রামৈথুনশাসিত মানব সভ্যতার বনিয়াদ একদম ধসে পড়বে, বাপু, ধসে পড়বে। শূন্য উদরানলের মহাশক্তিই ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়েছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সে যুগে যা' নতুন বার গড়েছিল তা হচ্ছে ঐ ফরাসী প্রজার উপবাসক্ষিপ্ত জঠরের তিনটি উদ্গার—Liberty, equality, fraternity, (brother-hood) সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। যখনই ক্ষুধার দেশব্যাপী উদয় তখনই নব সভ্যতার ভিত রচনা—উদাহরণ স্বরূপ চেয়ে দেখ আজ রুষ মহারাজের দিকে। সেখানে অন্ন-ব্রহ্মের অভাবে ক্ষুধারাক্ষসীর আত্মপ্রকাশে যখন সারা দেশ লাখ লাখ ক্যাঙালীচরণ ও ফ্যালারামে ভরে উঠল তখন জাগল দেশে নতুন আদর্শ—বলসেভিজম্ প্রোলেটারিয়েটা দস্তবিকাশ, কমিউনিষ্টী হড়ো।

ক্যাঙালী, বাপ, আমার কথায় হেসো না অমন করে। যদি এ ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হয় তোমরা জোরসে পিকেটিং করে আমার গাঁজার বরাদ্দ বন্ধ করে দিও, চীন থেকে আফিং

আর এই শিবের দেশ ভারত থেকে গাঁজার আবাদ উঠিয়ে দিও, আমি তা'তে বাঙ্‌নিষ্পত্তিটুকু অবধি করব না। বাঙলার সোণার চাঁদ বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছলেন মানুষের ধর্ম্ম হচ্ছে আহার নিদ্রা মৈথুন, সে সত্য সুদূর ইংলণ্ড হতে আমেরিকা অবধি বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ সভ্যতার চার আনা বাপু হে দর্জ্জির বাড়ী তৈয়ারী, চার আনা পেলেটি ভীমনাগের বাড়ী গড়া, চার আনা শুধু বাগবৈস্তরী এবং অবশিষ্ট চার আনা হচ্ছে—

ত্বমসি মম জীবনম্‌
ত্বমসি মম ভূষণম্‌
ত্বমসি ভবজলধিরত্নম্‌
দেহি পদপল্লবমুদারম্‌'

এই অন্নের ক্ষুধা, বস্ত্রের ক্ষুধা, নারীর ক্ষুধা, অর্থের ক্ষুধা, দেশের ক্ষুধা, দশের ক্ষুধা, যন্ত্রের ক্ষুধা, মন্ত্রের ক্ষুধা, হাজার হাজার ক্ষুধ-বায়ুর তাড়নায় তাড়িত মানব-সমাজের দিকে বাপ ক্যাঙালী-চরণ একবার চেয়ে দেখো এবং তারপর তোমার দুই কোটরগত চক্ষু মেলে চেয়ে দেখো পিঠে কুঁজ, পেটে খিল, হাত পা নড়ি নড়ি এই ব্রাহ্মণ সন্তান ফ্যালারাম চক্কোত্তির দিকে। তার পরে বুকে হাত দিয়ে আবক্ষ গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল দেখি আমরা এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি। বল দেখি এ সভ্যতা মহামায়ার ফক্কিকার মায়া কি না এবং ফ্যালারাম শর্ম্মা ঐ মায়ার আগে আগে এক মহা বিস্ময়সূচক জীবন্ত নোট অব ইণ্টারোগেশন কি না।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

চোখের মণি।

——✿——

আধো কলরোলের মাঝে 'মা' ডেকেছে খোকা আজি
আনমনা তার মার তাই আজ হচ্ছে নাক কোন কাজই !
কানের কাছে মধুর স্বরে ঘুরছে শিশুর সেই মা ডাকা
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দেওয়া নিখিল ভোলা পুলকমাখা।
মাজ্‌ছিল সে বাসন ব'সে পুকুরঘাটে খিড়্‌কি দোরে
দম্‌কা হাওয়া বইলে গাছের শুক্‌নো পাতা পড়ল ঝরে।'
কান্না যেন ভেসে আসে মর্ম্মরে দূর কানন থেকে
মা ভাব্‌ছে খোকাটী তার কাঁদ্‌ল বুঝি মা মা ডেকে।
বাসন রেখে ঘাটের ওপর ছুট্‌ল তখন ঘরের মুখে
ঘুমন্ত তার শিশুটিরে ধরল চেপে কোমল বুকে।
কচি রাঙা ঠোঁটের উপর খেলো হাজার দুয়েক চুমা
ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে দোল দিয়ে বলে মাণিক ঘুমা।
নিশীথ রাতে চাঁদ উঠেছে নীল আকাশে মেঘের বুকে
বাতায়নের ফাঁকটী দিয়ে জ্যোস্না পড়ে শিশুর মুখে।
কচি মুখের পানে চেয়ে কাটায় মা আজ উজ্জল রাতি—
নিখিল ধরা নীরব সারা নিভিয়ে গেল সাঁঝের বাতি।
উঠানেতে গন্ধ ছোটে বেল যুঁই আর হেনার ঝাড়ে।
কোমল অধর পরশ ক'রে খায় চুমো মা বারে বারে।
মা মা মৃদু গুঞ্জনে ঠোঁট পাপ্‌ড়ি দুটী উঠ্‌লে কেঁপে—
যশোদা মা নীলমণিরে ধরল তাহার কোলে চেপে।

———

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দয়ানন্দ সরস্বতী।

আর্য্য-সমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি জীবিত থাকিলে এখন তাঁহার বয়স শতবর্ষ পূর্ণ হইত। সম্প্রতি সেই উপলক্ষ্যে আর্য্য সমাজে উৎসব হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা অসাময়িক হইবে না বিবেচনা করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছি। ইহাতে কোন লিখিত জীবনচরিত হইতে অথবা অন্য কোন গ্রন্থ হইতে কোন কথা সংগ্রহ করি নাই। ১৮৭৩ অব্দে বারাণসীতে কয়েক সপ্তাহ প্রায় প্রতিদিনই সায়ংকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। তখন তিনি যাহা বলিতেন তাহারই যাহা মনে আছে তাহাই এই প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিব। তিনি যে এ সকল কথা আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা নহে। কাশীর বহু শিক্ষিত হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন; তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহাদিগকেই তিনি সকল কথা বলিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটা কথা বিশ্বেশ্বর পণ্ডা নামক আমার এক গুজরাটী সহপাঠীর মুখেও শুনিয়াছি। দয়ানন্দ সরস্বতী তখন সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কহিতেন না। তাঁহার সংস্কৃত উক্তির যে দুই চারিটা ছোট ছোট কথা মনে আছে তাহা ঠিক্ ঠিক্ উদ্ধৃত করিব।

এক্ষণে ভূমিকা স্বরূপ একটা কথা বলিব। আমার বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে লোকের ব্যক্তিগত শিষ্টাচারের পার্থক্য হইয়া থাকে। যাহারা কেবল পারসী পড়ে তাহারা বিনয়ী, নম্র ও সভ্য হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে আমার আশঙ্কা হয় যে যাহারা কেবল সংস্কৃত পড়ে তাহারা যেন সভ্যতা হইতে কিছু চ্যুত হইয়া থাকে। দয়ানন্দ কেবল সংস্কৃতই জানিতেন সুতরাং তিনি মধ্যে মধ্যে বিরুদ্ধ মতবাদী প্রতিপক্ষের প্রতি আমোদ করিয়া যে ভাষা প্রয়োগ করিতেন তাহা সম্পূর্ণ সভ্যজনোচিত হইত না। একটা দৃষ্টান্ত এখানেই বলি। তিনি মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্টকে উল্লুক ভট্ট বলিতেন। আর আর দৃষ্টান্ত ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

পঠদ্দশাতেই দয়ানন্দের এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে বেদে প্রতিমাপূজার বিধান নাই এবং প্রতিমাপূজার বিধান পুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে আছে সে সমস্তই ভ্রষ্ট। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি পাঠ সমাপন করিয়া যেখানেই যাইতেন সেখানেই পণ্ডিতদিগকে এই বিষয়ে তর্কযুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। একবার মথুরায় গিয়া এইরূপে বহু পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। সেখানকার হিন্দু-সমাজ সেজন্য তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। দুই চার জন তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ইহাদের একজন খুব ধনবান ছিলেন। পাছে শত্রুরা অতর্কিত ভাবে দয়ানন্দকে আক্রমণ করিয়া আহত বা নিহত করে এই ভয়ে তিনি দয়ানন্দের শরীররক্ষার্থ চারিজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। একদিন হিন্দুসমাজ দয়ানন্দকে জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধ বা বিচারে জন্য অমুক স্থানে অমুক সময়ে এক বড় সভা হইবে, দয়ানন্দ সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে কয়েকজন লোক তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে বিপক্ষেরা গুণ্ডা লাগাইয়া তাঁহাকে প্রহার করিবে অথবা একেবারে তাঁহার প্রাণনাশ করিবে বলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সেইধনী এবং তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে সভায় না যাইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাঁহাদের কথা শুনিলেন না। তখন প্রহরী কয়েকজন প্রত্যেকে এক এক তরবারি লইয়া তাঁহার সহবর্ত্তী হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "তোমাদের যে চারিখানি তরবারি আছে তাহার অতিরিক্তও একখানি সঙ্গে লও। আক্রমণের সময়ে একখানা আমার হাতে দিবে। মূর্খদের হাতে বিনা বাধায় মরা অপেক্ষা দুই চারিজন মূর্খকে নিহত করিয়া মরা ভাল। দুই চারিজন মূর্খের বিনাশ হইলেও ভরতখণ্ডের কিছু উপকার হইবে।" (দয়ানন্দ ভারতবর্ষকে ভরতখণ্ড বলিতেন।) সভা হইল, তর্ক হইল কিন্তু মারামারিটা হইল না। বিপক্ষেরা দয়ানন্দের পক্ষের আয়োজন দেখিয়াই তাহাদের দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়াছিল। সভায় বিচারের শেষ ফল আশানুরূপই হইয়াছিল—কেবল গোলমাল গালাগালি ও চীৎকার।

ইহার পর দুই এক বৎসরের মধ্যে দয়ানন্দ বিচারপ্রার্থী হইয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বী লোকেরা ভাবিলেন যে কাশী হিন্দুধর্ম্মের দুর্গস্বরূপ এবং সংস্কৃত বিদ্যারও প্রধান স্থান। কাশীর পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিলে পাষাণপূজা বা

জড়োপাসনার প্রধান দুর্গ জিত হইবে এবং তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে ভরতখণ্ড হইতে পাষাণ-পূজা অপসারিত হইবে। কাশীতে গিয়া তিনি বিচার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কাশীর মহারাজকে সংবাদ দিলেন। কাশী নরেশ ইহাতে উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি দয়ানন্দের মতের সংবাদ এবং অগাধ বিদ্যাবত্তার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি যদি শাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া পাষাণ পূজার খণ্ডন করিতে পারেন তাহা হইলে কেবল যে কাশী নরেশের বিশ্বাসে আঘাত পাইবে তাহা নহে, যাবতীয় হিন্দুই মর্ম্মাহত হইবে যাহা কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। অন্য পক্ষে একজন সন্ন্যাসী যখন বিচার-প্রার্থী হইয়াছেন তখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করাও বড় কলঙ্কের কার্য্য হইবে। এই সমস্ত ভাবিয়াই বোধ হয় কাশী নরেশ প্রলোভন, উৎকোচ, স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা দয়ানন্দকে মত পরিবর্ত্তন করাইবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। প্রথমত তিনি দয়ানন্দকে রাজবাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। দয়ানন্দ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে মহারাজ বলিয়া পাঠাইলেন যে পূর্ব্বকালে কত মুনিঋষিরা রাজাদের আলয়ে গিয়াছেন সুতরাং দয়ানন্দের রাজালয়ে গমনে আপত্তি হওয়া উচিত নহে। দয়ানন্দ উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন পূর্ব্বকালে রাজারাও তপোবনে গিয়া মুনিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন সুতরাং মহারাজের দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় কোন সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে না। মহারাজ তখন বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি শীঘ্রই এক দিন দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইয়া গেল। ক্রমে রামলীলার সময় উপস্থিত হইল। এই সময়ে কাশীতে রামচরিতের অভিনয় হইয়া থাকে। এক ব্রাহ্মণ বালক রাম, এক বালিকা সীতা, কেহ দশরথ, কেহ জনক ইত্যাদি সাজিয়া থাকে। রাম সীতার বিবাহ হয়। শুনিয়াছি সেই ব্রাহ্মণ বালকবালিকার সত্য সত্যই বিবাহ হইয়া যায়। তাহার পর পরদিন রামের অন্যান্য কার্য্যের অভিনয় হয়। সর্ব্বশেষে রাবণ বধ হয়। এই উৎসবের প্রথম দিনই এক শোভা-যাত্রা করিয়া বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত, লোকজন, হাতীঘোড়া, গাড়ীপাল্কী প্রভৃতি লইয়া রাজা দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে রামলীলা দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে জন্য এক সুসজ্জিত হস্তী ছিল। দয়ানন্দ বলিলেন যাহারা রাম সীতা রাবণ হনুমান্ প্রভৃতি কিছুই নহে অথচ রাম সীতা প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা মিথ্যা আচরণ করে; এরূপ মিথ্যা অভিনয় দেখিলে মনুর মতে শত হত্যার পাপ হয়; সুতরাং

তিনি তাহা দেখিতে যাইতে অসম্মত হইলেন। এই আপত্তি শুনিয়া কাশী নরেশ নূতন এক বিপদে পড়িলেন। তিনি পণ্ডিতবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বৎসর বৎসর বহুব্যয় করিয়া এই রামলীলার উৎসব করিয়া তাহা হইলে কি তিনি পাপানুষ্ঠান করিতেছেন? একজন পণ্ডিত নাকি বলিলেন যে বাস্তবিকই মনু এইরূপ কার্য্যকে শত হত্যার পাতক সমান বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মহারাজ আরও শুষ্ক মুখ হইয়া অন্য পণ্ডিতদিগের প্রতি দীনভাবে তাকাইলেন। তখন তাঁহার যাজ্ঞিক মাধবাচার্য্য তৎক্ষণাৎ শাস্ত্র হইতে বহু বচন মুখস্থ পড়িয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে রামলীলার অভিনয় দর্শনে পাপ হওয়া দূরে থাকুক বহু পুণ্যই হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া মহারাজা তখনই তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা এবং এক জোড়া শাল পুরস্কার দিয়া রামলীলা দেখিতে গেলেন।

তাহার পর শীতকাল সমুপস্থিত হইল। কাশীর সেই ভয়ানক শীতেও দয়ানন্দ কোনরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। নিতান্ত অসহ্য হইলে তাঁহার সঙ্গী একটী ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী তাঁহার জন্য খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া দিতেন। দয়ানন্দ তাহাতেই শয়ন করিতেন কিন্তু গায়ে কিছুই দিতেন না। একদা রাত্রিতে সেইরূপ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলেন যে তাঁহার গায়ে এক জোড়া শাল। তখনই পার্শ্বস্থ সেই ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন যে রাজাদেশে তাঁহার লোকে সেই শাল লইয়া আসিয়া এই অনুরোধ জানাইয়াছিল যে তিনি যেন দয়ানন্দের নিদ্রাবস্থায় তাহা দিয়া তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিয়া দেন। ইহাতে কোন দোষ হইবে না ভাবিয়া ব্রহ্মচারী সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ ইহা শুনিয়া সেই শাল দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং ব্রহ্মচারীকে ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।

ইহার অনেক দিন পরে মহারাজা বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি অমাত্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বেদ-বিদ্যার প্রচারকল্পে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। শেষ পরামর্শ স্বামীজীর সহিত হইবে তাহা তিনি যখন রাজধানীতে যাইবেন তখনই হইবে। ইহা শুনিয়া দয়ানন্দ গঙ্গার পরপারস্থ রামনগর নামক কাশী নরেশের রাজধানীতে গেলেন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতির পর মহারাজা তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি বহু ব্যয়ে বেদ

বিদ্যালয়ের আয়োজন করিয়া দিবেন যদি দয়ানন্দ প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে কিছু না বলেন। দয়ানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন তিনি আর ক্ষণমাত্রও রামনগরে থাকিবেন না—তখনই কাশীতে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহাকে বলা হইল যে তিনি রাজ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাঁহাকে পর পারে লইয়া যাইতে নাবিকদিগকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন "আমি যে জীবনে কেবল বিদ্যাভ্যাসই করিয়াছি তাহা নহে, ব্যায়াম দ্বারা শরীরে বল সঞ্চয়ও করিয়াছি—রাজার যে কোন মল্লকে আমি ভূমিসাৎ করিতে পারি এবং এমন সন্তরণ করিতে পারি যে এইরূপ তিনটা গঙ্গা পার হইতে পারি।" এই বলিয়া তিনি বেগে নদীর দিকে চলিয়া গেলেন। রুষ্ট সন্ন্যাসীকে বাধা দিবার সাহস কাহারও হইল না—স্বয়ং রাজারও না। সে যাহা হউক তিনি নদী তীরে গিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। রাজার নিষেধ বলিয়া সকলেই সে বিষয়ে অক্ষমতা জানাইল পরে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা নিভৃত স্থানে একখানা নৌকা দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়া নাবিককে পার করিতে বলিলেন। সে সন্ন্যাসী দেখিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে পার করিয়া দিল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল। তিনি যাইতে যাইতে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সেখানেই থাকিতে লাগিলেন। সেখানেও তিনি কয়েকজন শরীররক্ষক পাইলেন। কে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল সে বিষয়ে আমি যদি কিছু শুনিয়া থাকি তাহা হইলে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। বোধহয় মাজিষ্ট্রেটই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার পূর্ব্বসহচর সেই ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী তাঁহার সহিত পুন মিলিত হইলেন। উভয়ের আহার সামগ্রী প্রত্যহ একজন ধনাঢ্য বণিক্ পাঠাইয়া দিতেন। তাহাতে দৈনিক ব্যয় বোধহয় চারি আনার অধিক হইত না।

কাশীরাজ কিছু অধিক সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি সন্ন্যাসীর প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন সে কথা কাশীময় ছড়াইয়া পড়িল। একজন সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয় বিচার করিতে কাশীতে আসিয়াছেন সেই বিচার এতদিন নানা ব্যপদেশে স্থগিত রাখা হইয়াছিল ইহাও তাঁহার বিবেককে অবশ্যই আঘাত করিয়াছিল। তিনি বিচারসভার অধিবেশনের আয়োজন করিলেন। কমিশনর এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারের সময়ে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগকে জানান হইল না। একদিন মধ্যাহ্নকালে বিচার সভা বসিল। বহু গণ্যমান্য

ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কাশীস্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তামাশা দেখিবার জন্য এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে তাহাদের দ্বারা উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের সমস্ত শাখা ও প্রাচীরের উপরিভাগ পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা আমি আমার সতীর্থ ৺বিশ্বেশ্বর পাণ্ডার কাছে শুনিয়াছি। তর্ককারী পণ্ডিতগণ তর্ক করিবার সময়ে কিরূপে নস্য গ্রহণ করিতেছিলেন তাহার বর্ণনা বিশ্বেশ্বর পাণ্ডা এইরূপ করিয়াছিলেন—প্রথমে তাঁহারা শম্বুক হইতে বাম করতলে খানিকটা নস্য ঢালিয়া লইলেন। পরে উহা দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্য অঙ্গুলি দিয়া খানিকক্ষণ তাড়ন করিয়া অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে নাসিকা-রন্ধ্রে দিতে লাগিলেন। তাড়নের চোটে নস্য মণিবন্ধের গ্রন্থি ডিঙাইয়া এবং কাহার কাহার কনুয়ের গ্রন্থিও ডিঙাইয়া বাম বাহুমূলের কাছাকাছি গিয়া একেবারেই অন্তর্হিত হইল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করে কে? তাঁহারা অনুক্ষণই তর্জ্জনী ও মধ্যমা দিয়া বাহুর সেই স্থান তাড়ন করিয়া নস্য গ্রহণের অভিনয় করিতে লাগিলেন।

বিচার আরম্ভ হইবার দুই এক মিনিট পরে উপস্থিত পণ্ডিতগণের মধ্যে তদানীন্তন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কোঁড়কদী নিবাসী ৺রামধন তর্কপঞ্চানন এই বলিয়া সভা ত্যাগ করিলেন যে বিচারে কাহাকেও যখন মধ্যস্থ নির্দ্দেশ করা হয় নাই তখন ন্যায্য মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই নাই বিশেষ যখন এক পক্ষে একজন, অন্য পক্ষে কাশীর সমস্ত লোক।

যাহা হউক এখন বিচারের কথাটা বলি। কাশীরাজের রাজপণ্ডিত তারাকুমার তর্করত্ন হইলেন রাজপক্ষের মুখপাত্র। তিনি দয়ানন্দকে বলিলেন "আপনি যখন বিচারপ্রার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তখন পূর্ব্বপক্ষ আপনিই করুন।" দয়ানন্দ বলিলেন "বেদে প্রতিমা পূজার বিধান আছে কিনা আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিন।"

তর্করত্ন মহাশয় একে বাঙ্গালী তাহাতে তর্করত্ন। বেদ তাঁহার পড়া ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি সরল উত্তর না দিয়া বলিলেন "কেবল বেদই আমাদের শাস্ত্র নহে—অন্য শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধান আছে।" দয়ানন্দ বলিলেন "অন্য শাস্ত্র সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে। প্রথমে আপনারা বলুন বেদে প্রতিমা পূজা আছে কি না।"

কিন্তু তর্করত্ন এই সরল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। ইহার পরই সভায় গোলমাল আরম্ভ হইল। একসঙ্গে বহু ব্যক্তি দয়ানন্দকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিলেন,

দণ্ডী বিশুদ্ধানন্দ স্বামী মস্ত একটা বক্তৃতা করিয়া ফেলিলেন। দয়ানন্দ সভ্যতার ভাষা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "ত্বংতু কাকভাষাং বদসি" অর্থাৎ তুমি ত কেবল ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিতেছ। এখানে অবান্তরভাবে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। সাধারণত সংস্কৃত কথনে লোকে যেখানে বাক্যালঙ্কার স্বরূপ "তাবৎ" শব্দ প্রয়োগ করে দয়ানন্দ তৎস্থলে "তু" শব্দ প্রয়োগ করিতেন। সে যাহা হউক দয়ানন্দের এই অনুচিত ভাষায় উত্তেজিত হইয়া বিশুদ্ধানন্দ বলিলেন "অহং কাক ভাষাং বদামি পাষণ্ড, ত্বামেকেনৈব দণ্ডাঘাতেন যমপুরী প্রেরয়িষ্যামি।" এই বলিয়া স্বীয় দণ্ড উদ্যত করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা সকলেই দয়ানন্দের বিরুদ্ধে কোলাহল করিতে লাগিলেন। এইরূপ কোলাহল রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। রাত্রি ৮৷৯টার সময়ে মাধবাচার্য্য একখানা কাগজে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখিত একটা শ্লোক দয়ানন্দের হাতে দিলেন। সভাস্থলে একটী মাত্র ক্ষুদ্র প্রদীপ দয়ানন্দ হইতে ৮৷১০ হাত দূরে ছিল। দয়ানন্দ কাগজখানা লইয়া সেই দূরস্থিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে তাহা পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এক মিনিট কি দুই মিনিট গত না হইতেই অর্থাৎ তাঁহার পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য কাশীনরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই ত দেখিলেন মহারাজ, স্বামী উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছেন। আর এখানে থাকিয়া কি ফল? চলুন এখান হইতে প্রস্থান করা যাউক।" রাজা ও সভাস্থ সকলেই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে দয়ানন্দের উপরে ছেঁড়া জুতা, ধূলা, লোষ্ট্র ইত্যাদি বর্ষিত হইতে লাগিল। পরদিনই "দয়ানন্দ পরাভূত" নামে একখানা পুস্তক ছাপা হইয়া বাহির হইল।

দয়ানন্দের বিশ্বাস যে এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। তিনি আয়ুর্বেদে বিষের যে লক্ষণ পড়িয়াছিলেন শরীরে সেই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল—সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা উপস্থিত হইল এবং কণ্ঠ জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি প্রভূত জল পান করিয়া সমস্ত রাত্রি পাদচারণ করিয়া অতিবাহিত করিয়া বিষের ক্রিয়া হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন।

"পাষাণ-পূজকেরা এইরূপেই শাস্ত্র বিচার করিয়া থাকেন।" দয়ানন্দকে বহুবার এইরূপ আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি।

মাধবাচার্য্য যে শ্লোক দয়ানন্দকে দিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে—"পুরাণ বিদ্যা বৈ বেদাঃ।" ইহার অর্থ যে দয়ানন্দ অনুকূলভাবে করিতে পারিতেন তাহা বলাই বাহুল্য।

এই ঘটনার দুই এক বৎসর পরে আমি কাশীতে গিয়া দয়ানন্দ স্বামীকে দেখিলাম। তেজস্বী, মুণ্ডিত মস্তক, দীর্ঘাকার বলিষ্ঠদেহ, তাম্রবর্ণ, কর্দ্দম লিপ্ত, প্রসন্ন মুখ পুরুষসিংহ একখানা চেয়ারে ঋজুভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বহু বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকে কেহ বেঞ্চে কেহ ধরাসনে বসিয়াছিলেন। আগন্তুকেরা সকলেই তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। হিন্দুস্থানীরা কেহ কেহ তাঁহার মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে পাদস্পর্শ করিতেছিলেন। প্রত্যহই এইরূপ হইত। তিনি সকলেরই প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাস্যপরিহাসও চলিতেছিল। তাঁহার ভাষা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত হইলেও তাহা এত সুগম ছিল যে সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। আমার মনে বড়ই দুঃখ হইল যে আমি সংস্কৃতে কথা কহিতে পারি না। কিন্তু তাহা পারিব কি করিয়া? একে ত তাহার পূর্ব্বে কাহাকেও সংস্কৃত কথা কহিতে শুনি নাই তাহাতে পেটে সংস্কৃতের উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তথাপি যখন তখন এক মনঃকল্পিত ব্যক্তির সহিত সংস্কৃত আলাপ করিতাম। দুই তিন সপ্তাহ এইরূপ করিবার পর নিজেই অনুভব করিতে পারিলাম যে দুই চারিটা কথা সংস্কৃতে বলিতে পারিব। পরে একদিন সাহস করিয়া দয়ানন্দ স্বামীর সঙ্গেই সংস্কৃতে আলাপ করিয়া ফেলিলাম। তখন সেখানে আমার অধ্যাপক মহারাষ্ট্রিয় পণ্ডিত হরিভট্ট শাস্ত্রী মানিকর উপস্থিত ছিলেন। আমি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি ঈশ্বর পূজাবাদ প্রচার করেন কিন্তু আপনাকে লোকে যে, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এবং পাদস্পর্শ করিয়া পূজা করে তাহাতে বাধা দেন না কেন?" তিনি হাসিতে হাসিতে কতক আমোদ করিয়া বলিলেন "জড় পূজা করিলে জড়েরই মত বুদ্ধি হয়, আমার মত বুদ্ধিমান্ লোককে পূজা করিলে পূজকের বুদ্ধিও বুদ্ধিমান মানুষের মত হইবে।"

ইহার পর আমি আর কখনও তাঁহার সহিত সংস্কৃত কহিবার চেষ্টা করি নাই।

প্রতিমা পূজা বা জড়োপাসনার কথা প্রত্যহই হইত। একদিন একজন বলিলেন যে মুসলমানেরা কখনই কোন প্রকারে প্রতিমা পূজা বা জড়োপাসনা করেন না। স্বামী বলিলেন

মুসলমানেরা জড়োপাসনা করেন কিনা তাহা একবার তাঁহাদের একটা মস্‌জিদ্ ভাঙ্গিয়া দেখিতে পার।

একদিন একটী মৈথিল যুবকের কি একটা কথায় দয়ানন্দ বলিলেন "তুমি যাহা বলিতেছ সেরূপ কথা বেদে নাই।" যুবকটী বলিল "আপনি কি সকল বেদই পড়িয়াছেন যে এমন কথা বলিতেছেন?" দয়ানন্দ বলিলেন "হাঁ সমস্তই পড়িয়াছি।" যুবক বলিল "তাহা কথনই হইতে পারে না। বেদেই আছে যে অনন্তা বৈ বেদাঃ। বেদ যদি অনন্ত হইল তাহা হইলে আপনি নিঃশেষে সমস্ত বেদ পড়িয়াছেন তাহা কি হইতে পারে?" স্বামী বলিলেন "বিদন্তি যে তে বেদাঃ, জ্ঞানবন্তঃ পুরুষাঃ, ত এ অনন্তাঃ। যুবক বলিল "আপনি বলেন ঈশ্বরের রূপ নাই—তবে বেদে তাঁহাকে সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ ইত্যাদি বলে কেন?" স্বামী বলিলেন সহস্রাণি শিরাংসি যস্মিন্ অর্থাৎ সমস্ত জীব যাঁহাতে স্থিত তিনিই সহস্রশীর্ষ পুরুষ।

সংস্কৃতজ্ঞেরা সর্ব্বই পরস্পরের ভাষায় ভুল ধরিতে চেষ্টা করে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সেই যুবকটীও ক্রমাগতই দয়ানন্দের ভাষার ভুল ধরিতে চেষ্টা করিতেছিল। তিনি তাহাতে খুব এক ধমক দিয়া বলিলেন "ঘুর্ ঘুরায়সে কথম্?" উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

একদিন কাশী কলেজের অধ্যাপক উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ ম্যাক্‌স্‌মুলর কৃত বেদের অনুবাদ হইতে দেখাইলেন যে একটা শব্দের অনুবাদ "লালঘোড়া" করা হইয়াছে। দয়ানন্দ বলিলেন উহা লাল ঘোড়া কথনই হইতে পারে না, উহার অর্থ ঈশ্বর। পরে বলিলেন "গোরণ্ডা রক্তমুখা বানরাঃ সন্তি বেদস্য কি জানীয়ুঃ।" তিনি ইংরেজদিগকে গোরণ্ড বলিতেন।

কাগজকে দয়ানন্দ স্বামী কাগল বলিতেন।

একদিন একজন বলিলেন ব্যাসকাশীতে মরিলে কি সত্যসত্যই গর্দ্দভ হয়? দয়ানন্দ বলিলেন গর্দ্দভা বদন্তি অর্থাৎ গাধারাই এসব কথা বলে।

একদিন একজন তান্ত্রিক তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে তান্ত্রিক এই পরিচয় পাইয়া বাঘে যেমন গরু ধরে দয়ানন্দ সেইরূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তন্ত্রের বহু

ঘোরতর অশ্লীল শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বেচারাকে এমন অপ্রস্তুত করিয়া দিলেন যে তিনি একটা কথাও বলিতে পারিলেন না। দয়ানন্দকে একাধিকবার বলিতে শুনিয়াছি যে তান্ত্রিকা মহাভ্রষ্টাঃ সন্তি।

একদিন কাশীর কবি হরিশ্চন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। উভয়ে অনেক্ষণ কেবল হাসি তামাসাই হইল। কথায় কথায় পরাশরের অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী ইত্যাদি শ্লোকের কথা উঠিল। পরাশরের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া হরিশ্চন্দ্র মুখে মুখে সেই শ্লোকের একটা parody রচনা করিলেন। দয়ানন্দও আর একটা parody রচনা করিয়া সমবেত লোকদিগকে খুব হাসাইলেন।

মাংস ভক্ষণ ও পশুবধ সম্বন্ধে দয়ানন্দের মত এই ছিল যে আহারের জন্য পশুবধ করা যাইতে পারে। কিন্তু বেদে যখন অস্ত্রদ্বারা পশুবধের বিধি নাই তখন কোন জন্তুকে ছেদন করা উচিত নহে। পাশবদ্ধ করিয়া অর্থাৎ ফাঁসী দিয়া হত্যা করাই উচিত যেহেতু বেদে সেইরূপে হত্যা করারই উল্লেখ আছে। বেদে ত শাস্ত্রে যে কলিযুগে অশ্বালম্ভ, গবালম্ভ প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে বেদে যখন এরূপ নিষেধ নাই তখন অন্য শাস্ত্রকার কোথাকার কে যে তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে হইবে? পরে তিনি আর্য্য-সমাজ স্থাপন করিবার সময়ে নাকি এই মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন যে বেদে জীবহত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আর্য্য সমাজ এখন যে দুই দলে বিভক্ত তাহার একদলের লোক আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অন্যদলের লোক তাঁহাদিগকে মাসী-আর্য্য অর্থাৎ মাংসভুক্ আর্য্য নাম দিয়াছেন। মাসী আর্য্যেরা আবার নিরামিষ ভোজী আর্য্যদিগকে বিদ্রূপ করিয়া ঘাসী-আর্য্য নামে অভিহিত করেন।

একদিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রামায়ণে যে শব্দভেদী বাণের কথা আছে তাহাতে কি তাঁহার বিশ্বাস হয়? দয়ানন্দ উত্তরে বলিলেন একবার তিনি পশ্চিমে এক ক্ষত্রিয়দের গ্রামে গিয়া তাহাদিগকে সেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ দেখাইয়া দিল। প্রথমে একটি লোকের চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধিয়া তাহার হাতে একটা গুলিভরা বন্দুক দিয়া এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দিল। পরে একজন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ন্যূনাধিক

ত্রিশ হাত দূরে একটা মাটির হাঁড়ি রাখিয়া আসিল। তাহার পর আর একজন লোক দূর হইতে একটা ছোট ঢিল ছুড়িয়া সেই হাঁড়িতে লাগাইল। হাঁড়িতে শব্দ হইবামাত্র প্রথম ব্যক্তি বন্দুক ছুড়িয়া হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

একদিন হুপর (Hooper) নামে একজন অল্প বয়স্ক ইংরেজ পাদ্রী দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁহার সহিত অতি চমৎকার সংস্কৃতে আলাপ করিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পর দয়ানন্দও তাঁহার সংস্কৃত কথন শক্তির প্রশংসা করিলেন।

সকল দেশীয় পণ্ডিত গিয়াই দয়ানন্দের সহিত সংস্কৃতে কথা কহিতেন কিন্তু বাঙ্গালী পণ্ডিত যদি কখনও কেহ যাইতেনও তথাপি কোন কথা কহিতেন না। কেন না তাঁহাদের সংস্কৃতে কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। কেবল একদিন একটী বাঙ্গালী কবিরাজ গিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃতে স্বামীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন।

এক দিন টিমথি লুথর নামক এক জন বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষক গিয়া স্বামীর সহিত হিন্দীতে আলাপ করিলেন। স্বামী কিন্তু সংস্কৃতেই কথা কহিলেন। উভয়ের মধ্যে একটু তর্ক হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তর্কের পূর্ব্বে উভয় পক্ষকেই কি কি মানিয়া লইতে হইবে সেই কথা উঠিল। স্বামী বলিলেন যাহা কিছুর উৎপত্তি হইয়াছে তাহারই বিনাশ আছে আপনি একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। লুথর বলিলেন যে তিনি একথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন যেহেতু বাইবেলে এঞ্জেলদিগের সৃষ্টির কথা আছে অথচ তাঁহারা যে অমর তাহাও কথিত আছে। সুতরাং তর্ক আর অধিক অগ্রসর হইল না।

দয়ানন্দ একবার বঙ্গদেশে আসিয়া কলিকাতা, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থান দেখিয়া গিয়াছিলেন। গণ্যমান্য বহু বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার পরিচয়ও হইয়াছিল। অনেকের অনুরোধে কলিকাতায় তিনি হিন্দীতে কথা কহিতেন এবং বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে কাশীতে ফিরিয়া গিয়া বাঙ্গালীদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। "বঙ্গীয়া বুদ্ধিমন্তঃ সন্তি" এ কথা তাঁহার মুখে একাধিক বার শুনিয়াছি। সভায় বক্তৃতায় কোন ভাল কথা শুনিলে বাঙ্গালীরা হাততালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন দেখিয়া তিনি বলিতেন বঙ্গীয়া যদা প্রসন্না ভবন্তি তদা হস্তৈঃ পট্ পট্ ইত্যাকারং ধ্বনিং কুর্ব্বন্তি। বাঙ্গালীদের নাম তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা

পদ্মকে পদ্দ বলেন ইহা শুনিয়া তিনি আমোদ করিয়া বলিতেন যে বঙ্গীয়া মৎকারস্য ভক্ষণং কুর্ব্বন্তি। বাঙ্গালীরা সংস্কৃত কথা কহিতে পারে না ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে বঙ্গদেশে সংস্কৃতবিদ্যায়াঃ প্রচার এব নাস্তি।

কেশবচন্দ্র সেনকে দয়ানন্দ কেশব সেন চন্দ্র বলিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন কেশব সেন চন্দ্রঃ শূরবীরোস্তি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সম্বন্ধে হাস্যকর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। একজন "মহা ধূর্ত্তোঽস্তি" আর একজন "বিশ্ববিদ্যালয়স্য অধ্যক্ষোঽস্তি, কিঞ্চিদপি ন জানাতি। ন্যায়রত্নস্য নাস্তি অন্যায় রত্নো বর্ত্ততে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও শূরবীর বলিতেন।

একদিন বৈকালে আমরা অনেকে তাঁহাকে দেখিতে গিয়া শুনিলাম যে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক উদ্যানে আছেন। আমরা সেখানেই গেলাম। গিয়া দেখিলাম তিনি একখানা পাথরের উপরে বসিয়া বাম পদ ঝুলাইয়া দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপরে স্থাপন করিয়া মুদিত নয়নে ধ্যান-রত আছেন। তাঁহার সম্মুখে, বামে এবং দক্ষিণে ন্যূনাধিক এক শত বানর তাঁহাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া তাঁহারই মত ঋজুভাবে বসিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিল তাহাদের চক্ষুও তাঁহার মত মুদিত ছিল কিনা তাহা ঠিক দেখি নাই। আমরা সমীপবর্ত্তী হইলে বানরেরা ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল।

দয়ানন্দের সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি শ্রী, শ্রদ্ধা প্রভৃতি রফলাযুক্ত তালব্য শ বাঙ্গালীদের মতই দন্ত্য স রূপে উচ্চারণ করিয়া স্রী, স্রদ্ধা বলিতেন। কিন্তু ঋকারযুক্ত তালব্য শ ঠিকই উচ্চারণ করিতেন। শৃণুকে স্রূণু না বলিয়া শৃণু ই বলিতেন। মূর্দ্ধন্য ণ কারের উচ্চারণ আমি যেন তাঁহার মুখে দন্ত্য ন কারের মতনই শুনিয়াছি। কিন্তু উচ্চারণ বিষয়ক কথা উঠিলে স্পষ্ট মূর্দ্ধন্য ণ-র উচ্চারণ করিতেন। তখন নারায়ন, গনেশ না বলিয়া স্পষ্ট ভাবে নারায়ণ এবং গণেশ বলিতেন। একটা শব্দের উচ্চারণ তিনি সর্ব্বদাই অশুদ্ধ রূপে করিতেন—করোষি না বলিয়া সর্ব্বদাই করোসি বলিতেন অর্থাৎ ষ কারকে স কার রূপে উচ্চারণ করিতেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।
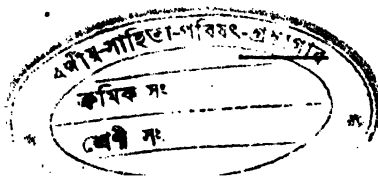
নীরব আশা।

—*—

ও রে আমার নয়ন-তার জীবন-পারের শেষের খেয়া,
আয় রে এবার আঁধার ঘাটে চুকিয়ে যাবো পাওনা—দে'য়া,
নীরব রাতে
বিজন ঘাটে,
প্রাণ যে আমার ব্যাকুলি ছোটে—
শাওন রাতে যায় রে ব'য়ে আঁধার সাঁজের নীরব দে'য়া।

অনেক আশায় ক'রেছিলাম তোমার সাথে আন গোনা
সকাল সাঁজে কথা হ'লো কতই হ'লো জানাশোনা;
আজ একেলা—
নীরব পালা,
আঁখিতে আজ অশ্রুমালা
ভোরের বাঁশীর তান উঠেছে চাইনে আমি পাওনা দেনা।

যৌবন যে এসেছিল, সেই সেদিনের জীবন প্রাতে
প্রাণ যে তখন বিভোর ছিল—তার সে মোহন বাঁশীর সাথে
স্নিগ্ধ হেসে
বস্‌লো পাশে
কইলো না তো কিসের আশে
দীনের নয়ন চিন্‌লো না রে, ফির্‌লো সে গো শূন্য হাতে।

প্রাণের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে ডুক্‌রে ওঠে অশ্রুবারি
দিনের শেষের দেশে এসে আর কি আমি রইতে পারি ?
শূন্য পথে
নীরব রাতে
প্রাণ যে আমার ব্যথায় মাতে
সব হারিয়ে ভাব্‌ছি এবার বিজন রাতে ধর্‌বো তারি !

শ্রীনীপেন্দ্রনাথ বাগচী।

গল্পের মাঝখান।

—o—

বন্ধুটী আমার পুরুষ এবং উকীল। জামাই একজনের বটে কিন্তু "জুনিয়ার" কারো নন্। ছাওলা, রোগা ; লম্বা বলা চলে—বেঁটে বল্‌লে অবিচার করা হবে। গোঁপ রেখে দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেন। চিম্‌ড়ে গড়ন—ভিজে সাড়ী মুচ্‌ড়িয়ে নিংড়ে নিলে—যে রকম হয়—অনেকটা সেই রকমের। নলি নলি হাত পা,—কোনো "অ্যামেচার থিয়েটারে" দুর্ভিক্ষের ভূমিকা নিলে বেশ মানাবে। মুখের ওপর কল্পলোকের কলাশালার চিত্রী কেউ লাল ছোপ ফর্‌সা রঙে অপরূপ আলপনা টেনে না গেলেও—নাক চোখ মন্দ নয় ;—মুখখানা দেখ্‌লে—ভয় বা রাগ হয় না—বরং দয়া ক'রে ভালবাস্‌তেই ইচ্ছে করে।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়—হাজারিবাগে,—"রিফর্মেটারীর" কাছ থেকে যে রাস্তাটা হ্রদের পাশ দিয়ে বরাবর কেনারী পাহাড়ের দিকে চ'লে গিয়েছে—সেই রাস্তার ধারে একটা মহুয়া গাছের তলায়। আমি সুশীলকে সঙ্গে ক'রে হেঁটেই কেনারী পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফির্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেল ;—চা'রধারে তাকিয়ে দেখি—নিঝুম ক্ষেতগুলো

পাশে পাশে, আসন্ন অন্ধকারের আবছায়া কালোয়, সন্ধ্যার মিহি নীলাম্বরীখানার প'ড়েন বোনা সুরু হ'য়েছে।

একটুখানি এগিয়ে এসে দেখি—লাল রাস্তার বুকের রক্ত মাঠের গাঢ় সবুজে মেশামেশি হ'য়ে যেখানে একটা কোন্ অজানা রহস্যের যাদু কথা যুগযুগান্তর ধ'রে কানাকানি ক'রে আস্‌ছে রাস্তার নীচে মাঠের ভেতর সেইখানে কষ্টি পাথরের মত কালো মিশমিশে ছোট্ট এক টুক্‌রা শৈল শিলা। একজন কে তার ওপর ব'সে র'য়েছেন। দৃষ্টিটা তাঁর শূন্যে আকাশ পানে নয়—দূরে দিগন্তের নিবিড় নীল দিয়ে জরদা পরীরা যেখানে আকাশের পটে রঙ্ ফলিয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যার মুখের ওপরকার পত্র লেখা আঁকে—ততদূর অব্‌ধিও যায় নি। তিনি ঐ পাথরটারই চারদিকে আশে পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলেন—আর ভাব্‌ছিলেন বুঝি তিনিই হাজারিবাগে নির্ব্বাসিত যক্ষ এবং অমন মেঘলা দিনের ঘনায়মান সন্ধ্যায়—ও রকমের একান্ত বিরহটা তাঁর নিতান্তই অভিশাপ। পশ্চিম দিকে আকাশের এককোণায় একটুক্‌রো মেঘও কালো হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

টিলাইটীর পাশ দিয়েই পথ। আমি কাছাকাছি এসে খানিকটা ইচ্ছায়—অনেকখানি অনিচ্ছায়—ব'লে ফেল্‌লাম—"নমস্কার।"

ভদ্রলোক "নমস্কার" ব'লে আমার দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ভদ্রলোক না—ব'লে ভুল হবার—চেহারা বা মুখ টুখ যাই কারণ থাক্—ব্যবহারে আর সন্দেহ রইল না। বিশেষতঃ গায়ে জামা, পায়ে জুতো ছিল; মাথার মাঝখান দিয়ে টানা টেরীটা খুবই অস্পষ্ট সুতরাং তাঁকে গুণ্ডা বা বোম্বেটে ব'লে মনে হবারও কোনো সঙ্গত হেতু ছিল না। আমি জিজ্ঞেস ক'র্‌লাম—"আপনার কি কাছেই বাড়ী?"

তিনি আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন—"না, আমি সহরে থাকি—এখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসি—জায়গাটা বেশ—নয়?"

মাঠের মাঝখানে একজন অচেনা তরুণীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল—এমন সময় একা—গা ব'লে তিনি একটুও অনর্থক সন্ত্রস্ত বা শশব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন না—বরং আমার মুখের দিকে শ সপ্রতিভের মতই সরল, স্বাভাবিক ভাবে তাকিয়ে পরিষ্কার কথা ব'লে গেলেন—গলার

ভেতর আওয়াজটা কেঁপে উঠে আট্‌কে গেল না। আমি তাঁর কথায় "বেশ জায়গা" ব'লে জবাব দিয়ে—ডাক্‌লাম "সুশীল এস"। সুশীল খানিকটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল। আমার ডাক শুনে একছুটে অনেকটা এগিয়ে এসে আবার রাস্তার পাশে ছোট ছোট ঝাঁকড়া কাঁটা গাছে হ'ল্‌দে হ'ল্‌দে ফুল ফুটে র'য়েছে দেখে সেইগুলো তুল্‌তে লেগে গেল। আমি আবার ডাক্‌লাম। ব'ল্‌লাম—"সন্ধ্যা হ'ল যে—সুশীল, এস—ফুল আজ থাক।"

"দাঁড়াও না একটুখান আর, চারটে মোটে" ব'লে আরো গোটাকত ফুল তুলে পকেটে পুরে দৌড়তে লাগ্‌লো। যত রাজ্যের কুচি পাথর কুড়িয়ে পকেট ভরতি ক'রেছিল—দৌড়াবার সময় সেগুলোতে ঝুমঝুমি বাজছিল।

এইবার কাছে এসে ব'লে উঠ্‌লো—"দেখ দি, নাইন, টেন, ইলেভেন।"

আমি ব'ল্‌লাম "হুঁ।"

"হুঁ? নয় তা হ'লে—দেখ্‌বে?"

ব'লে সুশীল পকেট থেকে পাথর টুকরো বার ক'রে গুণ্‌তে লাগ্‌লো "ওয়ান, টু, থ্রী"—আমার সদ্য পরিচিত বন্ধুটী ব'ল্‌লেন—"হ্যাঁ—ঠিক; এক্‌জ্যাক্টলী—ইল্‌এভেন্।"

সুশাল হো হো করে হেসে হাততালি দিয়ে বল্লে "হুঁ ইল-এভেন,—কেমন দিদির হ'ার।"

বন্ধু ব'ল্‌লেন—"অবিশ্যি হার।"

আমি ব'ল্‌লাম—"আপনাদেরই জয়; তা এখন কি আপ্‌নি বাড়ী ফির্‌বেন?—আমার একলাটী শুধু সুশীলকে সঙ্গে করে যেতে ভয় হ'চ্ছিল আপনাকে সঙ্গী পেলে বেশ নিশ্চিন্ত যাওয়া যায়।"

বন্ধু ব'ল্‌লেন—"Most Willingly"—তা' পর একটুখানি হেসে আবার ব'ল্‌লেন—"কিন্তু মনে ক'র্‌বেন না যেন—এর ভেতর এতটুকুও গ্যালান্‌ট্রী আছে।"

আমি ধন্যবাদ দিয়ে হেসে চ'ল্‌তে লাগ্‌লাম। সুশীল আমার বাঁহাত ধ'রে চ'ল্‌লো,—বন্ধুটী সুশীলের বাঁধারে।

ডকটার পি, কে রায়ের বাড়ী ডান দিকে রেখে—আমরা বরাবর যেতে লাগ্‌লাম। অনেক কথা হ'ল—রাস্তায়। বন্ধু বল্‌লেন—তিনি বাঙলায় ওকালতী করেন। এখানে

এসেছিলেন হাওয়া বদলাতে। আমি প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করলেও—শেষ পর্য্যন্ত জিগ্‌গেষ করে ফেল্‌লাম—তাঁর স্ত্রী আছেন কিনা। বন্ধু মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে—বাঁকা ক'রে বল্‌লেন—"হ্যাঁ—চাঁদপানা।"

সুশীলটা বড্ড পাজি—ব'ল্‌লে—চাঁদপানা—গোল্?

উনি ব'ল্লেন—কিন্তু "উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা।"

সুশীল ব'ল্‌লে "বুঝতে পেরেছি—গ্নোবের মত।"

তিনি বল্‌লেন—"হ্যাঁ—ঠিক্—কেবল একটু চ্যাপ্‌টা—"

আমি হেসে জিগ্‌গেষ ক'রলাম—"কেন—আপনার কি বউ পছন্দ হয় নি?"

বন্ধু একটুও না হেসে জবাব দিলেন—"খুব পছন্দ হ'য়েছে;—সে সব কথা আর একদিন বল্‌বো—যদি আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবার সুবিধে হয়।"

আমি তখন সাহস করে খোঁজ নিলাম—তিনি কোন্ জায়গায় থাকেন—বাসা কোথায়।

তিনি বল্‌লেন—"ডেরা বলুন;—মোটর আপিসের কাছে"—

"ঐ দোতলা বাড়ীটায়?"

"বরাত আমার! দোতলা বাড়ী? যেমন আমি মহাজন—আমার আত্মীয়টীও তেম্‌নিই রাজা। সে একটা চোরা গলির ভেতর—মাঠের মাঝখানে খোলার বাড়ী। পাশে একটা ইন্দারা আছে—অনেক মেয়ে পুরুষ "হরঘড়ি" সেখানে "পানি" নিতে আসে—আমি একলা একলা ব'সে—তাই-ই দেখি—আর কি করা যাবে?"

সুশীল ব'ল্‌লে—"ওদের জল তুলে দেন না কেন!"

উনি ব'ল্‌লেনা—"দেখ্‌ছোনা ভাই—কি রকম সরু সরু হাত—এতে কি সামর্থ্য আছে যে অত নীচে থেকে জল টেনে তুল্‌তে পার্‌বো?"

সুশীল ব'ল্‌লে—"হাঁা, সত্যি আপান বড্ড রোগা—একটু একটু এক্‌সার সাইজ—ক'র্ত্তে পারেন না?—ডাম্বেল ক'র্‌বেন নয়তো মুগুর ভাঁজবেন কি-না হয় তো—"

"না হয়তো কি?"—

"ঐতো মাঠটা—ঐ গলিটার পাশে! তার ওপারে—পাহাড়, আমি দেখেছি।—ওখানে অনেক গাধা চরে বেড়ায়—আপনি তাই দুই একটা ধরে—মাঝে মাঝে রেস দেবেন—দেখ্‌বেন কি রকম মুটিয়ে যান।"

আমি হো হো ক'রে হেসে—সুশীলকে ধমক দিয়ে ব'ল্‌লাম—"থাম—দুষ্টু ছেলে তুই কেবল যাই-তাই বক্‌তে লেগেছিস্‌।"

বন্ধুর মুখে কিন্তু হাসি নেই। তিনি ব'ল্‌লেন—"যদি প'ড়ে যাই"? সুশীল জবাব দিলে।—"তখ্‌খুনি চ'লে আস্‌বেন—আমাদের বাড়ী—বড়দা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে।"

"আচ্ছা।" ব'লে বন্ধু পকেট থেকে একটা সিগারেট আর দেশ্‌লাই বার ক'রে—ব'ল্‌লেন—"With your permission" যদি কিছু মনে না করেন—আমি একটা সিগারেট ধরাই।"

আমি ব'ল্‌লাম "স্বচ্ছন্দে।"

বন্ধু সিগারেটটা ধরাতেই এই এতক্ষণের হাসিবিহীন কাল মুখে তাঁর বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে আলো ফুটে উঠ্‌লো। চুরুটে জোর একটা দম দিয়েই মুখখানা লীলা-প্রফুল্ল—বিজ্ঞাপনের ছবির মত। এইবার তিনি নিজেই একবার হেসে উঠে বল্‌লেন—"দেখুন—আমার একটা ঘোড়ায় চড়ারও গল্প আছে।"

"সত্যি?—বলুন না।"

"তা তো দু'চার মিনিটে শেষ হবে না—সেও আর এক দিন ব'ল্‌বো—যদি হুকুম করেন।"

আমি বল্‌লাম—হাঁ আলবৎ—এ আরজী মঞ্জুর ক'র্‌বো।"

আমরা বাড়ীর কাছে এসে প'ড়েছিলাম। বন্ধুকে সকালে আস্‌তে বিশেষ ক'রে অনুরোধ জানিয়ে আমরা শুভ রাত্রি নিবেদন ক'র্‌লাম তিনিও "গুড্‌ নাইট ব'লে চ'লে গেলেন।

(২)

সকালে উঠে আমি ট্রের ওপর চায়ের জিনিষ গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। সুশীল খাটো একখানা বেত হাতে নিয়ে—এসে টেবিলের ওপর সপাং সপাং গোটা চার পাঁচ ঘা মেরে জিজ্ঞেষ—

ক'র্‌লে—"মেজদি, তিনি আস্‌বেন না?" বন্ধুর সঙ্গে আমার—সুশীলের ঐ আধঘণ্টায়ই পাকা রকম প্রণয় জ'মে গিয়েছিল। আমি ব'ল্‌লাম—"কি ক'রে বলি বল—সে তাঁর দয়া।"

এর ভেতর নীচে সাড়া পাওয়া গেল। সেই গলা। বন্ধু ডাক্‌ছেন—"সুশীল, সুশীল।" "ওই যে এসেছেন" ব'লে সুশীল হেসে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ট'প্‌কে নেবে গেল।

একটু পরে তাঁর হাত ধ'রে ওপরে এনে হাজির। আমি নমস্কার ক'রে বন্ধুকে ব'স্‌তে ব'ল্‌লাম। তিনিও নমস্কার জানিয়ে ব'স্‌লেন। সুশীল জিজ্ঞেস ক'র্‌লে—"দেখে এলেন—আস্‌বার সময়?"

"কি? দেখে এলাম সুশীল?"

"গাধা চ'র্‌ছে—মাঠে?"

বন্ধু মুচ্‌কী হেসে সুশীলের পিঠে একটা আদরের চাপড় মেরে ব'ল্‌লেন—"গাধা চ'র্‌তে দেখে এলাম না—গাধা সারকাস্‌ ক'চ্ছে দেখে এলাম।"

"সার্কাস ক'চ্ছে?—কোন্‌খানে?"

"পাহাড়ের মত কাপড়ের বোঝা তার পিঠে চাপিয়ে ধোপারা চ'লেছে ঘাটের পানে—আর গাধা গাঁ গাঁ ডাক ছেড়ে—কোনোমতে হেঁটে চ'লেচে।"

"ও—ওই সার্কাস?—না-না আপ্‌নি কিচ্ছু জানেন না—যাবেন আমার সঙ্গে ক'ল্‌কাতায় হার্মষ্টোন সার্কাস দেখিয়ে আন্‌বো।"

চা-টা খাওয়া হ'ল। বড়দার সঙ্গেও বন্ধুর চেনা জানা হ'য়ে গেল। অনেক গল্প ক'র্‌লাম। সুশীল তাঁকে তার বই খাতা, ক্যারোম বোর্ড সব এক এক ক'রে দেখালে। বন্ধুতো ক্যারোম বোর্ড দেখে একরকম লাফিয়েই উঠ্‌লেন। সুশীলকে জড়িয়ে টেনে এনে ব'ল্লেন—"এস সুশীল, খেলি।"

সুশীলও তৈরি। দু'জনে সেই এগারটা অবধি ক্যারোম খেল্‌লেন—বন্ধুর তাতে অরুচি বা শ্রম দেখা গেল না। আমি মাঝে মাঝে কথা ব'লে সুশীলকে খেলা দেখিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আড়ি করতে লাগ্‌লাম।—সে বেলাটা বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

৫

তারপর রোজই যাওয়া আসায় পরিচয় পাকা আর বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো—যদিও তাতে দু'জনের কারো মনেরই বন-বিতানে কোনো কালো পাখী সাড়া দিয়ে যায় নি বা চোখেও কোনো কুহেলি রঙিন রসের নেশা ফাগ নিয়ে খেলা করে নি। অনেক ক'দিনই গেল—কিন্তু এটা সেটা নানান আলাপেই ঘণ্টা আর বেলা গড়িয়ে গিয়েছে—তাঁর সে ঘোড়ায় চড়ার গল্পটা কিন্তু চাঁদপানা বউএর মুখের রূপ-কাহিনীর জ্যোৎস্নায় চমকিয়ে তুলে শুনে ওঠা হ'ল না। আমাদেরও একদিন—সে কথা তেমন ক'রে মনে পড়ে নি—উনিও ইচ্ছে ক'রে বলেন নি।

সে দিন—সন্ধ্যা বেলা বেড়িয়ে ফিরছিলাম। বাড়ীর কাছে এসে—বন্ধু আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সুশীলের হাতখানা নিজের হাতের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বল্লেন—"সুশীল, ভাই, এই দূর বিদেশে—প্রবাসে এসে তোমার আর তোমার সুন্দরী দিদির স্নেহ আদরে দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল—কিন্তু এইবার শেষ—আমার কাল যেতে হবে।"

সুশীল আর আমি একসঙ্গে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লাম—সেকি ?"

তিনি ব'ল্লেন—হ্যাঁ 'তার' পেয়েছি—কালই ছাড়্‌বো"—আমাদের মনের ভেতরে কেমন ক'রে উঠ্‌লেও তাঁকে আর আটকিয়ে রাখ্‌বো কি ক'রে ? তাঁর বাড়ীঘর আছে—স্ত্রী, ছেলে মেয়ে আছে 'ব্যবসা' আছে.—ব্যবসায় পশার আছে যেতে তো হবেই। বল্‌লাম—"কাল আমাদের বাড়ী খেয়ে যেতে হবে।"

সুশীল ব'ল্লে—"আপনার নেমন্তন্ন।"

তিনি ধন্যবাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'র্‌লেন। কিন্তু হঠাৎ একটু চিন্তিত হ'য়ে গিয়ে যেন খানিকক্ষণ কেন চুপ ক'রে রইলেন।

সুশীল জিজ্ঞেস ক'রলে—"কি ভাব্‌ছেন—যাবেন না ?"

"না যেতে হবেই—তাইই ভাব্‌ছি খেতে গিয়ে শেষে দেরী হ'য়ে যাবে না ত ? আবার মোটরের টিকিটও তো কিন্‌তে হবে।"

আমি ব'ল্‌লাম—আমি বড়দা'কে ব'ল্‌বো—তিনি সে সব ঠিক ক'রে দেবেন আপনার কোনো ভাবনা নেই।"

বন্ধু বাড়ী ফিরে গেলেন—সুশীলের আর সে রাত্তিরে পড়া হ'লো না।

(৩)

বন্ধু সকালেই এসে সুপ্রভাত জানালেন। আমরা চায়ের টেবিলে ব'স্‌লাম—সেদিন সরোজিনীদি আর মণ্টু এসেছিলেন 'কালোজামের' বিয়ের খবর ব'ল্‌তে। আমি সকলের সাম্‌নে বন্ধুকে ধ'রে ব'স্‌লাম—"আজ আপনার বউ আর ঘোড়ার গল্প না শুনে ছাড়্‌ছি নি—এই নিন্।"

সিগারেটের টিন্‌টা তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম। বন্ধু একটা সিগারেট নিয়ে মুখে দিতেই রাজ্যের হাসি চোখে মুখে লুকোচুরি খেলে উঠ্‌লো। সকলের কাছে বিনীত ভাবে হুকুম নিয়ে সিগারেট ধ'রিয়ে বন্ধু ব'ল্‌লেন—"ও দুই এক—বউ আর ঘোড়ায় বড় একটা তফাৎ নেই।"

"না—না—এ আপনার স্যাক্রিলেজ"—

"বরং বলুন—স্বামী হিসেবে—প্রিভিলেজ।"

"আচ্ছা তাই মঞ্জুর বলুন" ব'লে আমি—আবার অনুরোধ ক'র্‌লাম। বন্ধু ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—"ল" ক্লাসে পড়ি যখন—মার বড় সখ হ'ল চাঁদপানা বউ ঘরে আন্‌বেন—বাবাও দেখ্‌লেন—সেই ফাঁকে যদি নিতাই বোরেগীর দলিলখানা খালাস করা যায় তবে মন্দ কি! বাঙলা মুল্লুকে বাপেদের মেয়েও খোঁড়া না—আমিও ছেলেটা খোঁড়া না—সুতরাং মাস দু'য়ের ভেতরের আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো ফুট্‌লো। ফলে যে আলোটুকু কুঁড়ের কোণায় ছিল তাও নিভে গেল। কারণ বছর দেড়ের ভেতরেই এক খুকী তা'পর আর এক খুকী তা'পর—"feel the consequence"—ফাইনাল আইন পরীক্ষা দিয়ে—চিৎ বা উপুড় নয়—বাঙলা মতে কাৎ। "বেটার হাফ্" আমায় মনে মাথায় এম্‌নি ক'রেই পেয়ে ব'সেছিলেন যে পরীক্ষার উত্তরের কাগজে এক খাতার ভেতরেই দুই হাফের জবাব লিখে গার্ডকে দিয়ে বেরোলাম। শেষে মনে হ'লো যখন সেই ক্যাম্বাণ সাহেবকে গিয়ে ধ'রে অনেক ক'রে বলা গেল—কিন্তু তিনি সোজাসুজি শুনিয়ে দিলেন—"নাউ ফিল্ দি কন্‌চিকোয়েন্স হোয়াত্ ক্যান আই ডু ফর্ ইউ।" (পাও এইবার টেরটা—আমি তোমার কি ক'র্‌ব!)

"দুই চক্ষু একেবারে স্থির।"　　দুই চোখ কপালে উঠ্‌লো আর নাব্‌লো না

আমি হেসে ব'ল্ ম—"এখনও নয় ?"

"এখন ? এখন তো ক্রমে মাথায় উঠ্‌তে সুরু ক'রেছে।"

সরোজিনী দি জিজ্ঞেষ ক'ল্লেন—"কি রকম ?"

বন্ধু ব'লে গেলেন—"সে খুব সোজা রকম যা সচরাচর দশজনের হ'য়ে থাকে—তাই। ওকালতী পাস ক'র্‌লুম,—অবিশ্যি।—বাঙালীর ছেলে 'একজামিন' পাস ক'র্ত্তে জানি। ফল বেরোবার আগে মাস তিনেক এক গাঁয়ের ইস্কুলে মাষ্টারি নিলাম।—চাঁদপানা বউএর হাল সাকিনে গাদা গাদা প্রেম পত্র লিখে বিরহ কাটানো গেল—আর ছেলে ঠেঙিয়ে ননী মাষ্টারের হাতে আমার পিঠের ওপরকার সেই পুরোণো ঘায়ের সুদ সমেত শোধ তুলে নিলাম। অত্যাচারে অস্থির হ'য়ে এক ছোঁড়া একদিন আমায় শুনিয়েই ব'লে গেল—"আচ্ছা দেখে নোব—আজ রাত্তিরে শোবে না ঘরে ? গোঁপের আদ্ধেকটা কামিয়ে দিয়ে যাব।"

"আমি ভয়ে ভয়ে সেই বিকেলেই নাপিত ডেকে দুদিকেরই গোঁপ কামিয়ে নিলাম ;—পরের দিন বক্তৃতা ক'রে সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম—ওটা অক্সফোর্ডের ফ্যাসন।"

সুশীল ব'ল্লে—"ঐতো আপনার গোঁপ রয়েছে—মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছেন কেন ?"

"আহা—ওটা যে পরে আবার রেখেছি"—

সরোজিনী দি টিপ্‌পনী দিয়ে পাদ পূরণ ক'রলেন—"ওকালতীর আমলে ভারতিকি বজায় রাখ্‌বার জন্যে বুঝি ?

আজ্ঞে হাঁ—আপ্‌নি দেখ্‌ছি অতি বুদ্ধিমতী ঠিক ধ'রেছেন। এখন শুনুন—"আমার চাঁদ মানে পত্নীটী মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি লিখ্‌লেন তাঁর বড় সাধে যেন বাদ না সাধি তিনি উকীলানী হবেন—"

সরোজিনী দি বল্লেন—"যেমন মাতুলানী।"

"আজ্ঞে না—আমি শ্রীকৃষ্ণ নই সুতরাং—যাক সে কথা ;—আর বাবা ভাব্‌লেন—আমি উকীল হ'লেই বাড়ীতে চৌমহলা কুঠী উঠ্‌বে—এবং আমারও মনে হ'ল—মাস খানেকেই সার রাসবিহারী ঘোষের মফঃস্বল এডিসন ব'নে গিয়ে পারিসে—ল্যাঙ্গট কাচতে পাঠাবো।"

"ল্যাঙ্গট ?"

"হ্যাঁ—ল্যাঙ্গোট ; প্যাণ্টলুন আর কিনি কি দিয়ে বলুন ? ভ্যাগ্যিস সেন ম'শায় মানে আমার শ্বশুর—দেড় যোড়া পাশ বালিস আর এক যোড়া ওয়াড় দিয়েছিলেন"—

"ওয়াড় একটা কম দিলেন কেন ?"

"রেশমী সাড়ীতে ঢেকে দিতে হ'য়েছিল ব'লে সেটীর আর লংক্লথের ওয়াড় লাগে নি"—

"ওঃ—সেটী বুঝি"—

"আমার পত্নী"—আমাকে কথাটা শেষ ক'র্ত্তে না দিয়েই—"আমার পত্নী" জবাব ক'রে ব'লে গেলেন—"ছেলেবেলা যখন স্বদেশীর খুব ধুম—লাঠী খেলা-টেলা হয়—তখন পালোয়ানী দেহ গড়্বার জন্যে কুস্তী সুরু ক'র্লাম বুঝ্লেন ? কাজেই একটী ল্যাঙ্গোটও তৈরি করাতে হ'ল—সেইটী তখনও ছিল।"

"দেহখানিও কতকটা পালোয়ানীই র'য়েছে দেখা যাচ্ছে।"

"এটা যা দেখ্ছেন—তা ওকালতীর অতি পশারে। এখন কাছারী তো যেতে হবে—ঐ ল্যাঙ্গোটটীকে থলের মত সেলাই ক'রে—ওয়াড় দুটোর সঙ্গে জুড়ে—একটা দিশী প্যাণ্টলুন ক'রে নিলুম।"

আমরা তো হো হো ক'রে হেসে উঠ্লাম।—বন্ধু ব'ল্লেন—হাস্বেন না—শুনুন।—এইবার খোড়ার গল্প আরম্ভ হবে—তার আগে বলে রাখি—আমাশয়-টামাশয়ে আমার প্যাণ্টলুনটী বড় উপকার দেয়—টেনে পায়জামাটী পরে—একপাটি মোজা দিয়ে কোমরবন্ধ—মানে—বেণ্ট এঁটে নি যদি—একটুও ঠাণ্ডা লাগে না—খুব Comfort.—(আরাম)।

আমি বল্লাম—"এরকম ক'রে ওকালতীর অপমান করা—আপনার উচিত নয়।"

বন্ধু জবাব ক'রলেন—"আমরা কজন হতভাগা আছি বলেইতো—ওকালতীর মান—মর্য্যাদা এতদিনও রয়েছে—সে কথা থাক—এখন শুনুন—মহকুমায় ওকালতী আরম্ভ করলুম—গাঁয়ের যত মুচ্ছুদ্দি এসে—আমার বাসায় কায়েমী রকম ডেরা-ডাণ্ডা গেড়ে বস্লেন। এখন বুঝুন—অবস্থা—আমি বা কি খাই আর তাঁদেরই বা কি খাওয়াই! তাঁদের তো চিং-হস্ত—উপুড় হয়-ই না—উপরন্তু তামাক সিগারেটটাও—আমার পয়সায়—নায়েব—নাজীরদের আসবার

বেলা—লণ্ঠন যাওয়ার বেলা ঠনঠন্। একদিন এক নায়েব ব'ল্লেন—"এ উকীল বাবু—আমাদের বাবুদের নাত জামাই—খুব লোক—পাকা লোক—এই বয়েসেই—কি রকম ফুর ফুর ক'রে ইংরিজী বলেন—দেখেছো—কোথায় লাগে—কৌঁসুলি এঁর কাছে—কিন্তু—কি করি বল—বাবুদের জামাই—ওঁর হাতে টাকা দেয়া মানে বাবুদের অপমান করা—"ইত্যাদি আমি শুনে মনে মনে তাকে স্ত্রীর সম্বন্ধ বিশেষ ব'লে গালাগালি দিয়েই গায়ের ঝাল ঝাড়লাম। যা'হোক—এই রকম অনাহারী ওকালতীর ফলে—কিছু দিনের ভেতরেই ম্যালেরিয়ায় ভুবন অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। কোনোমতে কুইনিন টুইনিনের পেলা দিয়ে—জ্বর ঠেকিয়ে নিতেই—বাবা বল্লেন—"কিছুদিন হাওয়া বদলে এস।" বুঝুন; হাওয়া খেয়ে হাউয়ৈ ব্যবসা করি,—আমার আস্‌তে হবে হাওয়া বদ্‌লিতে। উকীলানীর হাতে তো কিছু দিতেই পারিনি—এইবার তাঁর গলাখানি খালি ক'রে—এইখানে—আপনাদের স্বর্গ রাজ্যে এসে দুদিন জিরোলামই সত্যি। কিন্তু তাই কি নিশ্চিন্ত থাক্‌বার যো আছে—বউএর চিঠির ওপর চিঠি—ভাইটী—আমার পদ্য লিখ্‌তে সুরু ক'রেছেন—কিরকম পদ্য জানেন ত?—

"সবুজ পরী, তুর্কী হুরি ওড়্‌না খানি আস্‌মানী
ভর পিয়ালা পিলাও সাকী, আঙুর সুরা জাফরাণী।"

এখন তাঁর বিয়ে না দিলেই নয়। বউ লিখেছেন ঠাকুর পো আজকাল—"গুল্‌বাগে বুলবুলির মত ফুলের হাওয়ায় ফুর ফুর ক'রে উড়্‌ছেন শেকল বাধ, নইলে প্রাণপাখী ফাঁকি দিয়ে পালাবে—সেই জন্যেই তাগিদ—তাই জন্যেই তার।"

সুশীল ব'ল্লে—"যত বাজে কথা ব'ল্‌ছেন—ঘোড়ার গল্প কই?"—

"এইবার আরম্ভ"—

"চেপ্পে যেতে হবে—অনেক দূর—ঐ ক'টী তো টাকা—কল কৌশলে—কারসাজী ক'রে না গেলে—পোষাবে কি ক'রে? আমার হেড্‌ কোয়াটার মানে আস্তানা থেকে নিয়ারেষ্ট রেলওয়ে ষ্টেশন মবলগে আটাশ মাইল। যানের ভেতর গড্ডালিকা অথবা ত্বর পথে ত্বরিত জান—তুরগ।"

মণ্টু ব'ল্লে—"তুরগ মানে ক্যাঙ্গারু।"

"না ক্যাঙ্গারু যার ওপর চড়ে।"

আমি ব'ল্লাম—"অর্থাৎ আপনি ?"

"ধন্যবাদ।" বন্ধু ব'লে গেলেন—"আমার একটা মক্কেলের—অবিশ্যি প্রকাশ থাকে যে'—বিনি বায়নায় তাকে ঘোড়া চুরির অপরাধে ডিফেণ্ড ক'রে খালাস ক'রেছিলুম—ঐ আমার প্রথম এবং শেষ কেশ জেতা—তা নইলে তো বুঝতেই পারেন—আমি "লার্নেড" উকীল সুতরাং হামেসাই—থ্রি,মান্‌স্‌ ফর এ Chagal"—অর্থাৎ ছাগল হাকিমটা—বি,এস্‌-সি বি-এল—ছাগলের ইংরিজী ভুলে গিয়েছিলেন। যা হোক—বোধ হয় আমার মক্কেলের—সেই চুরির ঘোড়াটাই—বুঝ্‌লেন ?—তিনি—আর্দ্ধেকটা খচ্চর সিকি গাধা আর সিকিটেক ঘোড়া—মানে লেজের দিকটা আর কি! উঁচু খুব বড়—ভেড়ার কি তার চেয়ে আর একটু বেশী—ছোট মোট বাচ্চা ষাঁড়ের সমান। মাঠে মাঠে ছাড়া ঘাস খায় সুতরাং পেটটা পুরো বোঝাই যাট ইঞ্চি নবাব জান ব্যাগের মত ঝুলে নেবেছে—মাটী ছোঁ ছোঁ হ'য়ে যায়। আমার মক্কেলটী বলেন—তাঁর এ পোষা ওটী—খুব কষ্টসহ—ভুটিয়া পনীর মত কাজ দেয়—গাড়ীতেও চলে সোয়ারও নেয়। আমি ব'ল্লাম—"দয়া ক'রে দিন্‌ না ঘোড়াটা আমাকে ধার"—তিনি খুব খুসী হ'য়ে রাজী হ'লেন। যথা সময়ে পঞ্জিকা টঞ্জিকা দেখে—ফুল বেলপাত যাত্রাসিদ্ধি পকেটে গুঁজে—ত্বরিত যানে চ'ড়ে রওনা হ'লাম।—ঐ যে প্যাণ্টলুন—আমার যোধপুরী ল্যাঙ্গোট ব্রিচেস্‌—তাই টেনে টুনে প'রে—একটা কালো ছাতার কাপড়ের কোট ছিল—পকেটের কাছটা সতর বছরের ব্যবহারে একটু ফেঁসে গিয়েছিল—নইলে প্রায় নতুন কোটই তাকে বলা যায়—চকচ'কে ছিল বেশ; সেইটা গায় দিয়ে—বেতের সুটকেস্‌টা সামনে ব'সিয়ে ঘোড়া ছাড়্‌লাম। রশি তিন চার গিয়েই দেখি—পায়ের কাছে পা জামাটা একটু 'হাঁ' হয়েছে। সেখানে রাস্তার পাশেই আমার একটা বন্ধুর বাড়ী—তিনি ইস্কুল মাষ্টার—আমার চেয়েও রোগা—সিঁটকে কিন্তু বজ্জাতের ধাড়ি। তাকে ডেকে একটা সূঁচ সুতো চাইলাম—ইচ্ছে ছেঁড়াটা যুড়ে নোব। সে কিনা মশাই বেরিয়ে এসেই ব'ল্লে—"আরে তোমার মত বেকুফ তো দেখিনি! ওখানে সেলাই কখনো টেঁকে? তার চেয়ে এই পাড় দিচ্ছি—দু দিকে হাঁটু অব্‌ধি পট্টির মতন ক'রে জড়িয়ে নাও—শক্তও হবে—বেশ চ'লেও যেতে পারবে।" যুক্তিটা মন্দ লাগ্‌লো না। আমার ভাইটা—পদ্য ভাব্‌তে ভাব্‌তেই অবিশ্যি—আমার সঙ্গে

এসেছিলেন—নদীপার অবধি এগিয়ে দিতে—তাকে ব'ল্‌লাম—"এই, একখানা কঞ্চি কেটে চাবুক ক'রে দে তো!" বন্ধুটী ব'ল্লেন—"ওকে তো হাফেজ ক'রে করে এগিয়ে নিতে হবে—কাজেই ছড়ি দিয়ে কি হবে একটা বাঁশই কেটে নাও আপেরে কাজ দেবে।"

যা হোক কোনো মতে ঘোড়া নিয়ে তো নদীর ঘাটে পৌঁছুলুম। এখন তো আর হেঁটে গেলে চ'ল্‌বে না—জুতো পায় আছে! আমি ঘোড়ায় চেপে ব'সলাম—সে খচ্চরের ছাটী তো বৃন্দাবন থেকে "পাদমেকং"ও যাবেন না—ভাই রাস ধ'রে টেনে জলে নাবালেন—আমি জুতোশুদ্ধ পা ছুটো উঁচু ক'রে তার ঘাড় অব্‌ধি তুলেছিলুম কারণ সে ত্বরিত যানের পেটটি এরির মধ্যে জলের সঙ্গে ছলাৎ ছপাৎ জল-কেলী ক'র্‌তে লেগেছিল। মাঝ দরিয়ায় গিয়ে—অশ্বতর একেবারে থাড়া! না সাম্‌নে না পিছনে। "দাঁড়াও দাঁড়াও আমি ওকে চালাচ্ছি" ব'লে বন্ধু কোথায় থেকে এক ইয়া মোটা আঁকাসী এনে ঘোড়ার পেছনে জোর খোঁচা দিতে আরম্ভ করলেন। খোঁচা খেয়ে তিনিও পেছনটা ক্রমে নীচু ক'র্‌তে ক'রতে জলের ভেতর একেবারে কুপোকাত—আমি আপাদমস্তক—আর্দ্র। গেরো বুঝুন।

সরোজিনী দি হেসে উঠে ব'ল্লেন—"জুতো প্যাণ্টলুন সব ভিজে গেল?"

ভাগ্যিস সুটকেসটা তখনো ভাই হাতে ক'রে রেখেছিল। "সব।" কিন্তু সে পাড়ের পটি খোলা কি সাধারণ ব্যাপার! ভাই, চাবুকে চাবুকে টিট্‌ বানিয়ে—তাঁকে এপারে এনে তুল্লেন;—আমি ঐ ভেজা কাপড় চোপড়েই অশ্বারোহী হ'য়ে আবার যাত্রা ক'র্‌লুম। এবার তিনি ভাল মানুষের ছেলের মত—বেশ চ'ল্‌লেন। রাস্তায় অনেক পথিক মাথা হেঁট ক'রে সেলাম দিতে লাগ্‌লো—"সাক্কো পাগ্গ!" আমি খুব খুসী হ'য়ে—'এইও এইও হেট্‌ টক্‌ টক্‌' ক'রে টগবগিয়ে খচ্চর চালিয়ে চ'ল্‌লাম। অনেকদূর এসে ইস্কুল। ছেলের দল টিফিনের ছুটীতে বেরিয়ে এসে হল্লা ক'চ্ছিল। আমায় দেখেই টিকেদার সাহেব, টিকেদার সাহেব—ব'লে—চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—মহা হৈ চৈ হাততালি—খচ্চর দিশেহারা হ'য়ে পুচ্ছ উঁচু ক'রে—বেগে দৌড়োবার উদ্যোগ করা—আর এক কাঠে লেগে—উঁচোট খাওয়া—আমি তো দশহাত দূরে ছিট্‌কে গিয়ে পপাত—আর তিনি ভুঁইএ ধপাস। গড়াগড়ি ব্যাপার একেবারে! যা লাগ্‌লো জানেন,—ভয়ানক রাগ হ'ল—ভাব্‌লুম—স্ত্রীর ভাই সেই মক্কেলটার স্ত্রীর ভাইটাকে—খেঁায়াড়ে দিয়ে উপযুক্ত আক্কেল দিয়ে যাই।

ওঃ হোঃ হোঃ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে আমরা ব'ল্‌লাম --"থামুন থামুন আর নয়" --

বন্ধু ব'ল্‌লেন—"আর বেশী নেই।—সে ঘোঁড়ার ভায়রা ভাইটীকে সেইখানেই ছেড়ে দিয়ে সুটকেস মাথায় নিয়ে ঘোড় সোয়ার আমি "কুলী চাই বাবু" হ'য়ে হেঁটেই ষ্টেশনে—তখন গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে—এক বেটা কুলী এসে ব'ল্লে --বাবু দিযিয়ে মাল হাম্‌কো মাথাপর আব্‌গো - পহিলা গাড়ীমে চড়ায় দে'গা—টিকস্ লাইয়ে।" ছুটো ছুট গিয়ে টিকিট এনে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে—তো কুলীকে ব'ল্‌লাম--এই "থর্ড গাড়ীকে" --

"হাঁ হাঁ হোজুর"—ব'লে তিনি তো এক গাড়ীতে আমায় তুলে দিলেন—উঠেই দেখি --যে মশাই—"ইয়া ভুঁড়ি—সওয়া হাতটেক বেঞ্চির বাইরে এসে থল থল ক'চ্ছে –ওঁগ্ ওঁগ্ গোঁয়া—সন্ধ্যা না লাগ্‌তেই—নাক ডাকার শব্দে আমি উঠেই ব'ল্‌লাম—"মশাই মশাই,—উঠুন —উঠে বসুন!"—

"তিনি দিব্যি নির্ব্বিকার।"

আমি আবার বল্‌লাম—"ও মশাই! উঠুন না—যা দেহ দেখ্‌ছি—তাতে তো এ গাড়ী আপনার ব'লে মনে হ'চ্ছে না—উঠুন ব্রেকভ্যানে যান।"

এইবার ভুটো কামরাঙার মত লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আমার দিকে দেখে তিনি ব'ল্‌লেন—"আপনি ভুল ক'রেছে—আপ্‌নিই মেল ভ্যানে যান --বুক পোষ্টের পলিয়ায়।"

কি আর করি—নিরুপায় হ'য়ে ওপাশের বেঞ্চের ওপর গিয়ে ব'স্‌লাম। সঙ্গে একটী হিন্দুস্থানী—মাথায় গামছাখানি বেঁধে—গজল ধ'রেছিলেন—"আ-হারে পরদেশী সাঁইয়া, গেয়া হামারি গই বিদেশে"—"পি-য়া-আ-আ-আ —" ক'র্‌তেই দমকা বাতাস এসে তাঁর গামছাখানি—"আরে হাঁ হাঁ—এ দাদা উড়ায় লিয়া —হো—"জলপান ওয়ালী টীকস্ উস্‌মে যা—"

হনুমানের মত এক লাফ দিয়ে উঠেই—ডেঞ্জার সিগনাল টানা—গাড়ী থেমে গেল। গার্ড এসে—আগাতেই আসামী স্থির ক'রে এক ধমক।—"

বন্ধু আর ব'ল্‌তে পারলেন না—বড়দা এসে তাড়া দিলেন—বেল হ'য়ে গেছে। গল্পের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে উঠ্‌তে হ'ল।

বন্ধু চ'লে গেছেন। অনেক সন্ধ্যা সকালেই—তাঁর কথা আলোছায়ার রঙ খেলার মত মনের ওপর একখানা রঙিন স্মৃতি এনে দিয়ে যায়। বুকের কোনো গোপন কোণায় একটু আধটু ব্যথাও কি আর টন টন ক'রে নাই উঠে।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রকাশের বেদনা।

ভাষা একদিকে ভাব প্রকাশের সহায় আর, এক দিকে আবার তেমনি অন্তরায়। মনের মধ্যে যে কথাটা খেলিয়া চলে ভাষা তাহার একটা মোটামুটি রূপ ব্যক্ত করে একটা সাদামাঠা কঙ্কাল। চিন্তা অনুভব আবেগ যতক্ষণ ভিতরে ততক্ষণ দেখি তাহাতে রহিয়াছে কত রঙ, কত আলোছায়ার খেলা, তাহাতে কত ইঙ্গিত কত আভাস, কত বড় বিপুল সে জিনিষটি; কিন্তু ভাষায় যেই তাহাকে ধরিয়াছি অমনি সেটি হইয়া পড়িয়াছে কেমন নিরেট, কাটাছাঁটা, ছোট সঙ্কীর্ণ। প্রথমতঃ মনের যত কথা বলিতে চাই, ভাষা তাহার সব প্রকাশ করিয়া ধরিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ মনের কথা যে ভঙ্গীতে বলিতে চাই ভাষা সে ভঙ্গী রাখিতে পারে না। ভাষার এই যে অভাব, প্রকাশের এই যে বেদনা—ইহা হইতেই কাব্যের উৎপত্তি।

শিশু যখন মাতৃস্তন্যের জন্য লালায়িত, তখন তাহার অর্দ্ধস্ফুট বাক্য তাহার ভিতরের অভাব আবেগ কতটুকু প্রকাশ করিতেছে? সে বাক্য অপরের কাছে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, দরকারের দাবি ঐ টুকুতেই মিটান যাইতে পারে; কিন্তু শিশুর প্রাণের যে সমস্ত রঙীন জগৎ, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণারই সহিত জড়িত যে দোলায়িত রসায়িত চিত্ত, তাহা কতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঐ উচ্চারিত বর্ণমালার মধ্যে? ভাষার এই অভাব শিশু পূর্ণ করিয়া লইতে চেষ্টা করে তাহার রোদনের ধ্বনি, তাহার অঙ্গ সঞ্চালনের সহায়ে। মানুষও সেইরকম মুখের কথাকে একান্ত করিয়া চলিতে পারে না, তাহার মধ্যে আনিয়া জুড়িয়া দেয় ছন্দ সুর। ভিতরের অনুভব তাহার যত নিবিড় যত সূক্ষ্ম যত বিচিত্র ততই সে ঝুঁকিয়া পড়ে কাব্যের দিকে, গানের দিকে।

বক্তব্যের মধ্যে প্রয়োজনের, অর্থের অতিরিক্ত রহিয়াছে যে একটা অন্তরঙ্গ ভাবলাস্য তাহাকে প্রকট করিয়া ধরিবার জন্য কত রকম কৌশলের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে তাহাই হইতেছে কবির শিল্পীর কারুকলা।

অন্তরের অনুভব যখন অন্তরে জাগ্রত তখন সেখানে কত রকমের ভাব কত বাসনা লইয়া জড়াজড়ি হইয়া আছে। একটি চিন্তা হয়ত সেখানে সকলের উপরে ব্যক্ত, কিন্তু তাহার চারিদিকে আরও কত রকমের চিন্তা অর্দ্ধব্যক্ত, অব্যক্ত ভাবে তাহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার অর্থগৌরবকে নিবিড় বিপুল করিয়া ধরিয়াছে। একটি মূল চিন্তা কেমন সহজে অবহেলায় সমস্ত আধারের মধ্যে, আধারের দূরতম ক্ষুদ্রতম, গুপ্ততম কোণে কোণে কত বহু বিচিত্র স্পর্শের ক্রমলীয়মান প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিয়াছে। স্ফুটবাক্য কি এই সমগ্র মনোভাবের সমস্ত আভাস প্রকট করিয়া ধরিতে পারে? বাক্যের ধর্ম্ম দেখি এক একটি চিন্তা বা অনুভবকে সে পৃথক পৃথক করিয়া কাটিয়া কাটিয়া প্রকাশ করে। জটিল মনোভাবের যে সজীব ঐক্য তাহা সেখানে ধরা দেয় না। তারপর, মনের মধ্যে যে সত্যের যে জোর নাই, ভাষায় মূর্ত্ত করিতে গিয়া দেখি তাহার উপর ততোধিক জোর পড়িয়া গিয়াছে। আশেপাশে থাকিয়া যে সকল অন্য রকম সত্য কোন বিশেষ সত্যকে একাণ্ড করিয়া অত্যধিক হইয়া উঠিতে দেয় নাই, স্থূল ভাষা সেই আনুসঙ্গিক আবেষ্টন সঙ্গে করিয়া তুলিয়া আনিতে অসমর্থ হইয়াছে—মনোভাবের স্বরূপ তাই কথার মধ্যে বাঁধা পড়িয়া বিকৃত হইয়া পরিয়াছে। অন্তরের কথা যথাযথ ব্যক্ত করিতে গিয়া, বিফল হইয়া তাই ত শ্রীরাধিকা দারুণ ব্যথায় বলিতেছেন—

সখি　　কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরূপ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

কাব্য আমাদের কাছে এত রসময় এত মর্ম্মস্পর্শী ঠিক এই জন্য—ভাষার স্বভাবজ দৈন্য কবি তাঁহার ইন্দ্রজালে কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি যতখানি পূরণ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততখানি বড় কবি। গদ্য হইতেছে প্রধানতঃ প্রয়োজনের ভাষা, মোটামুটী ধরণে মনের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে পারিলেই তাহার সার্থকতা। মোটা অর্থের আশে পাশে যে আভাসের আলোছায়ায় ভাবময় জগৎ গদ্য ধরিয়া দেখাইতে চাহে না, এবং হয়ত পারেও না। তাই মানুষ

কাব্যকে আশ্রয় করে। এই হিসাবে গদ্যের ক্ষমতা যতদূর তাহার পরিচয় বিশেষ ভাবে আধুনিক জগতে একমাত্র বোধ হয় আনাতোল ফ্রান্স দেখাইয়াছেন। ভাষার সহায়ে চিন্তার লক্ষণা বা 'ধ্বনি' (nuances) এই অদ্ভুত শিল্পী যেমন ও যতখানি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, ভাষাকে মনোবৃত্তির ক্ষুদ্র ভাঁজে ভাঁজে যেমন অবলীলাক্রমে ইনি পাট করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহার তুলনা গদ্য সাহিত্যে সচরাচর বড় মিলে না। তবুও এই বিষয়ে গদ্য কখন কাব্যের সমকক্ষ হইতে পারে না ? কাব্যের কবিত্ব অর্থই এই বিশেষত্বটুকু।

একটা বিশেষ চিন্তা একটা সুস্পষ্ট কাটাছাঁটা বিশেষ অর্থ মূর্ত্ত করিয়া ধরা, কবির বিশেষত্ব নয়। কবির কবিত্ব সার্থক যখন তিনি দেখাতে পারেন একটা চিন্তা একটা অর্থ। নানা চিন্তা নানা অর্থে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কেমন চেতনার দূর বেলাভূমির প্রান্তে আস্তে আস্তে যাইয়া মিলাইয়া পড়িতেছে। এই কাজ কবি করেন কি উপায়ে ? বাক্যের চয়ন, বাক্যের বিন্যাস, শব্দের ঘাতপ্রতিঘাত, মিল, যতি, গতি—ছন্দের সহায়। কিন্তু শিল্পীর এই যে রকমারি কৌশল, তাহা সত্বেও ভিতরের অনুভবগত জগৎ তাহা কখন কি হুবহু প্রকাশ করা যায় ? প্রকাশের অর্থ হইত রূপ দেওয়া, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ করা, দৃষ্টিকে একটা কিছুর উপর কেন্দ্রীভূত করা, সেই একটা কিছু ছাড়া অন্য সকল বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া, দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া দেওয়া। তাহার ফল ? ভগবান আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, রূপান্বিত করিয়াছেন সৃষ্টির মধ্যে, কিন্তু তাহাতে ভগবান কি আপনাকে ছোট করিয়া খাট করিয়া ফেলেন নাই ? ভগবান আপনার ভগবানত্ব লোপ করিয়া দিয়াছেন যখন তখনই ত সৃষ্টি। ভগবানের স্বরূপ-সত্য তাই সৃষ্টিতে নাই। তাই না সৃষ্টি অসত্য মায়া হইয়া পড়িয়াছে ?

জাপানী কবি এই সত্যটি যেমন বুঝিয়াছে জগতের আর কোন কবিরা তেমন অনুভব করে নাই। জাপানী কবি তাই ভাষার এই স্বভাবগত অভাব স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছে, এই অভাব কখন দূর করিবার নয় বলিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের চলিত ছলা-কলাও সব বর্জ্জন করিয়াছে। জাপানী কবিতায় ছন্দ নাই, বাক্যের বাহুল্য ত' নাই-ই, পুরাপুরি বাক্যও নাই। দুই একটা ছাড়া ছাড়া কথা মাত্র। তাহার সহায়ে মনের সম্মুখে দুই একটা চিত্রের আভাস আঁকিয়া তোলা—ইহাই জাপানী কবিতা। জাপানী কবিতা দিতেছে এই একটা ইঙ্গিত মাত্র, দুই একটা

সূত্রের মুখ, সূচনার খণ্ড। তাহা ধরিয়া নামমাত্র অবলম্বন করিয়া যাহাতে মন আপন ভাবে অবাধে সকল রহস্যে ভরিয়া আপনার জগৎখানি গড়িয়া তুলিতে পারে।

Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter—

এই কারণেই ভগবানের "রসো বৈ সঃ" যিনি তাঁহার পূর্ণ অনুভূতি চেতনার যে স্তরে সেখানে মানুষ নীরব, মূক।

কিন্তু কথা! বলিতে হয়ত অতিমাত্রায় চলিয়া গিয়াছি। ভাষা ভাবের কি রকমে অন্তরায় তাহা দেখাইতে গিয়া ভুলিয়া গিয়াছি কি রকমে তাহা আবার সহায় হয়। প্রকাশের বেদনা, একটা দিক—আবার প্রকাশের আনন্দও তাহা অপেক্ষা কম সত্য নহে। ভাষার, মুখের কথার যে কি ত্রুটী বর্ত্তমান প্রবন্ধের সিদ্ধান্তই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"বিজলী" শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

অনন্তলাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
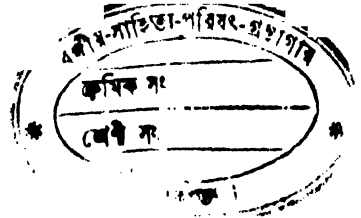
[পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলির সার—অনন্তলাল রতনপুরের জমীদার। ঋণগ্রস্ত হইয়াও দানশীল; ভিতরে কথা ছিল—তাঁর ত্রিকালজ্ঞ গুরুজীর কথায় অনন্তের অগাধ বিশ্বাস; তিনি ভবিষ্যতে গুপ্তধন প্রাপ্তির আশা দিয়া অনন্তলালকে আরও দানশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন—মোটা হাতে নিজেও লুটিতেছিলেন। অনন্তের সভায় মো-সাহেবের অভাব ছিল না—তাদের রকম নানা রকম,—হরিশ ছিল শুভাকাঙ্ক্ষী; আর বিপিন প্রভৃতি খাঁটি মো-সাহেব। জমীদারের জামাতা বনবিহারী লাপকা পায়রা—শ্বশুরের অন্নে পুষ্ট ও বাবু! বনবিহারীর এক দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র, ছেলেটি সুশীল সুবোধও বটে,—দুস্থ—অনন্তের অনুগ্রহে জমীদার বাটীতে থাকিয়া কলিকাতায় কলেজে পঠিত। অনন্তলালের এক বন্ধুকন্যা শিশিরের ছিল সে শিক্ষক;—শিক্ষক ও ছাত্রীতে ভাবটা ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল,—সহানুভূতির অবেজ্ঞ! আশার কুহকে লইয়া সংসার, অনন্তলালের ঋণ ক্রমেই মস্তক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,—প্রায় সংসার অচল—এই সময় শ্রীশ্রীগুরুজীর রতনপুরে আগমন,—অনন্তলাল গুরুদর্শনে কৃতার্থ.—গুপ্তধন লাভের আশায় উৎফুল্ল।]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—-—০——

স্বামীজী গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র অনন্তলাল ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গুরু শিষ্যকে কোল দিলেন; তথায় বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া অনন্তলাল তাঁহাকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন। সেখানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

স্বামীজী আসন গ্রহণ করিলে অনন্তলাল পৃথক আসনে উপবেশন করিলেন। তখন স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বেশি দূরের Railway journey বড় Teasing বড় পরাধীন।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"মাঝে এক যায়গায় নেমে একদিন বিশ্রাম করে এলেই হ'ত।"

"না, যে সময়ে আসবো বলে লিখিচি সে সময় ঠিক রাখ্‌তে হবে ত; নইলে কথা যে মিথ্যে হবে। সে যাক্—সেখানে যাওয়া যাবে কবে ঠিক করেচ?"

"দিন দুই চার বাদে যাওয়া যাবে—কি বলেন? আমার হাতে এখন কিছুই নাই কিন্তু টাকা নিয়ে যেতে হবে ত? দীক্ষা গ্রহণ করতেও কিছু খরচ হবে।"

"হাঁ, তা ত ঠিক্। আর এক কথা—কাশীর কতকগুলি সন্ন্যাসীকে ভোজন করাতে আমার কিছু দেনা হয়েচে। আমার আশ্রমে এখন খরচ বেশি হয়েচে। তুমি মাসে মাসে যে টাকা দাও তাতে সব কুলায় না। সে জন্যে বাজার দেনাও আগে হতে হয়ে আচে।"

"কত দেনা হয়েচে, বলবেন আপনি যাবার সময়ে দিয়ে দেব। আজকাল আমারও হাত সর্ব্বদা খালি থাকে। তবে আপনার আশ্রমে অভাব হবে না। সে দেনা পরিশোধ করে দেব।"

তখন স্বামীজী তৃতীয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত আছে কিনা দেখিতে একবার-ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোমাকে আগেও অনেক বার বলেচি, এখনও বল্‌চি—তোমার জন্য প্রচুর অর্থ—কোন স্থানে সঞ্চিত আচে। সে দিন সমাধিস্থ হয়ে দেখলাম,—সে সময় এখনও হয় নি। যে দিন দান খয়রাতে তোমার এই পৌত্রিক সম্পত্তির নিঃশেষ হবে; সেই দিন সেই গুপ্তধনরাশি তোমার হস্তগত হবে। সে জন্য চিন্তা কোরো না।"

অনন্তলাল কিছুই উত্তর না করিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার পৌত্রিক সম্পত্তি নষ্ট না হইলে. তিনি স্বামীজী কথিত গুপ্তধনরাশি পাইবার যোগ্য হইবেন না। কিন্তু সে ইচ্ছা মনোমধ্যে পোষণ করিবার উপযুক্ত বৈরাগ্য তখনও তিনি উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। সুতরাং এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য বলিলেন,—"এ মহাত্মার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কখন ?"

স্বামীজী বলিলেন,—"এ পরিচয় এক জন্মের নয়। তবে এ জন্মের পরিচয় কিছু দিন পূর্ব্বে কাশীতে হয়েচে। আমি একদিন আশ্রমে কি একটা কাজ করচি এমন সময়ে একজন গিয়ে খবর দিলে যে, একজন মহাত্মা আমার দুয়ারে সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আচেন,—আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে যাবামাত্র তিনি আমার দিকে চেয়ে, হাস্তে হাস্তে বল্লেন,—"কি একেবারে ভুলে গেচ ?"

"আমি তখুনি অন্তর্চক্ষুতে দেখ্‌লাম, এ যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। অমনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। বদরিকাশ্রম থেকে কবে এলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বল্লেন এখন সে স্থান ত্যাগ করে, কিছুদিনের জন্য বাঙ্গলা দেশে আশ্রম করে বাস করচেন। বদরিকাশ্রম ত্যাগ করে এ দেশে বাস করবার কতকগুলি কারণ বললেন। তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ, তোমাকে শিষ্য করা।"

অনন্তলাল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে কি তিনি জানেন ?"

স্বামীজী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"অনেক জন্ম জন্মান্তর হতে তিনি তোমাকে জানেন। তিনি আরও বল্লেন যে তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু মন্ত্রধারী ছিলে। এ জন্মে যে বংশে জন্মেচ, সেই বংশের মন্ত্র অর্থাৎ শক্তিমন্ত্র তোমাকে গ্রহণ কর্‌তে হয়েচে। কিন্তু এ মন্ত্রে তুমি সিদ্ধ হতে পারবে না। আর আর জন্মে বিষ্ণুমন্ত্রে অনেক পরিশ্রম করেচ। এইবার আবার সে মন্ত্র পেলে সে পরিশ্রম সফল হবে। আর সে মন্ত্র তাঁর কাছে তোমাকে পেতে হবে।"

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া অনন্তলাল বলিলেন,—এখন আর অন্য কথায় কাজ নেই, আপনি ভোজন করে বিশ্রাম করুন। রাত্রি অনেক হয়েচে. আপনার শরীরও ক্লান্ত আচে।"

তখন তাঁহার আজ্ঞাক্রমে একজন ভৃত্য স্বামীজীর ভোজনের স্থান জলসিক্ত ও পরিস্কৃত করিল এবং পাচক ব্রাহ্মণ ভোজ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া তথায় রক্ষা করিল। পরে স্বামীজী ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজন শেষ হইলে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া অনন্তলাল অন্দরে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তলালের ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় ইদানী তাঁহার মহাজনেরা যথাসময়ে সুদের টাকা পাইত না, এবং সেইজন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা পুনরায় তাঁহাকে ঋণ দান করিতে অসম্মত হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাঁহার সভাসদ হরিশ সাহার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে সে এই সকল মহাজনের নিকট হইতে পুনরায় টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিতে পারিত। এইজন্য অনন্তলাল তাহার এত বাধ্য। অতি প্রত্যূষে তিনি তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন,—"হরিশ স্বামীজী ত এসেচেন। এখন কিছু টাকা না হলে সেখানে যাওয়া হয় না। তুমি ভিন্ন এ কাজ আর কারো দ্বারা হবে না।

হরিশ বলিল,—"তাই ত, এখন টাকার যোগাড় হয় কোথা থেকে? মহাজনেরা সব চটে আছে।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"কাজ শক্তই যদি না হবে, তা হলে তোমাকে বলব কেন? তুমি না হলে টাকাও হবে না, তুমি না গেলে সেখানে যাওয়াও হবে না।"

হরিশ প্রীত হইয়া বলিল,—"আজ আমি কল্‌কাতায় যাই ত, দেখা যাক কি হয়।"

এই বলিয়া সে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেল। তখন অনন্তলাল কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, আফিম্ ও চা সেবন করিতে গেলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় হরিশ সাহা টাকা আনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি টাকার তোড়া হস্তে হাসিতে হাসিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী, অনন্তলাল, হরিশ সাহা ও একজন ভৃত্য ঘরের কম্পাস গাড়ীতে ভদ্রেশ্বর ষ্টেশনে যাত্রা করিল। গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে দেখিয়া, সকলে বিশ্রামাগারে যাইয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ হরিশ্চন্দ্রের মনে পড়িল, একটিও ছত্র সঙ্গে লওয়া হয় নাই। ভাদ্র মাস, কখন কোথায় বৃষ্টি হয় বলা যায় না। সে বলিল, এ সময়ে ছাতি ফেলিয়া আসা বড়ই অন্যায় হইয়াছে। অনন্তলাল বলিলেন,—"ভয় কি ? বৃষ্টি হবে না। আর যদিই হয়, তবে সে কষ্ট কি সহ্য হবে না ? মানুষ ত কাগজের নয়, যে গলে যাবে। স্বামীজীর ত ছাতি নাই, এঁর কি চলে না ?"

স্বামীজী বলিলেন,—"না হে, তেমন তেমন দেখলে মাঝে মাঝে আমাকেও ছাতি মাথায় দিতে হয়। তা ছাড়া, তোমরা গৃহী, তোমরা আমাদের মত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না।"

"খুব পারব"—এই বলিয়া অনন্তলাল ঘড়ি বাহির করিয়া একবার তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে বলিলেন,—"হরিশ টিকিট লওগে।"

হরিশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তিনি অস্ফুট স্বরে স্বামীজীকে বলিলেন,—"আমার যেন বোধ হচ্চে কে একজন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেচেন ! তিনি কে ?"

স্বামীজী বলিলেন,—"তা আর বুঝতে পারচ না ? যাঁর কাছে চলেছে তিনি।"

অনন্তলাল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ী আসিল—তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময়ে তাহারা চন্দ্রহাট ষ্টেশনে যাইয়া অবতরণ করিলেন। ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে "বিশালা" নামক বন। এই বনমধ্যে স্বামীজী কথিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস আশ্রম করিয়া বাস করিতেছেন।

পূর্ব্ব হইতে মেঘ করিয়াছিল টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। হরিশ তাড়াতাড়ি গরুর গাড়ীর সন্ধানে গেল। কিন্তু গাড়ী মিলিল না। এ সময়ে গাড়োয়ানেরা কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত, গাড়ী বহিতে বাহির হয় না। স্বামীজী বলিলেন, "তবে কি হবে ?"

অনন্তলাল বলিলেন, "চলুন, হেঁটেই যাব। দুক্রোশ বইত নয়।"

স্বামীজী বলিলেন, "জল পড়্‌চে যে! তোমাদের সঙ্গে ছাতি নাই।"

"তা পড়ুগ্‌গে, তাতে আর গলে যাব না। আপনি পার্‌বেন আর আমরা পার্‌বো না?"

তখন সকলে ষ্টেশন হইতে বাহির পদব্রজে বহির্গত হইল। হরিশ একখানি বস্ত্র চারি ভাঁজ করিয়া, তদ্দ্বারা অনন্তলালের মস্তক আবৃত করিয়া দিল। স্বামীজী উত্তরীয়-বস্ত্র নিজ মস্তকে দিলেন।

ষ্টেশন হইতে "বিশালা" বনে যাইতে ভাল রাস্তা নাই। কোন কোন স্থানে অত্যন্ত কাদা। কিছুদূর যাইতে না যাইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। উপরে জল, নীচে কাদা; তাহার উপর কাপড় চোপড় সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। অনন্তলাল বড়লোক;—এরূপ কষ্ট কখনও সহ্য করেন নাই। তা ছাড়া তিনি অহিফেনসেবী; ভিজিতে ভিজিতে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িলেন এবং অতি কষ্টে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তখন স্বামীজীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহারও অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে।

এইবার মহাত্মার অথবা ব্যাস দেবের আশ্রম নয়নপথবর্ত্তী হইল। এত কষ্টেও ভবিষ্যতের আশায় সকলে উৎফুল্ল হইলেন,—আশাই মানুষের জীবন!

ক্রমশঃ—

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

অর্থের মূল্য।

গতবারে* বলিয়াছিলাম যে বিনিময়ের প্রয়োজনের অপেক্ষা যদি দেশে চল্‌তি অর্থের পরিমাণ বেশী হয় তাহা হইলে জিনিষপত্রের দাম যে বাড়ে সেই তত্ত্বটা এবার বলিব! কিন্তু সেই তত্ত্ব সুরু করিবার পূর্ব্বে অর্থের মূল্য কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্।

---

* পরিচারিকা বৈশাখ ১৩৩২ 'বাড়তি টাকা ও চড়া দর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মূল্য কি ?

দ্রব্যের যে শক্তি বা গুণ থাকাতে উহার বিনিময়ে অন্যান্য পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকেই উহার মূল্য কহে। এক মণ পাট দিয়া যদি দুই মণ ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে এক মণ পাটের মূল্য দুই মণ ধান অর্থাৎ পাটের মূল্য ধানের মূল্যের দ্বিগুণ। কিন্তু দ্রব্যের কি গুণ থাকিলে উহার বিনিময়ে অপর দ্রব্য পাওয়া যায়? প্রথম গুণ প্রয়োজনীয়তা;—অর্থাৎ দ্রব্যটি লোকের কোনও অভাব মিটাইবার উপযুক্ত হওয়া চাই। আবশ্যক বোধ করিলে তবে তো লোকে উহা পাইবার চেষ্টা করিবে। কেবল দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেই চলিবে না। উহা অপ্রচুর হওয়া চাই। প্রাণ ধারণের জন্য বায়ু চাই প্রত্যেকেরই, কিন্তু সকল লোকের যে পরিমাণ বায়ু দরকার তাহার তুলনায় বায়ুর যোগান্ অনন্তব বেশী বলিয়াই উহার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও লোকে উহার বিনিময়ে কিছু দিতে রাজী হয় না। পূর্ব্বের দুইটি গুণ ছাড়াও দ্রব্য হস্তান্তর করিতে পারা যায় এমন হওয়া দরকার। দ্রব্যের এই তিনটি গুণ থাকিলে উহা বিনিময় যোগ্য হয়। পাটের এই সব গুণ আছে বলিয়াই পাটের বিনিময়ে ধান, চা'ল, তেল, ঘি, ময়দা, কাপড় ইত্যাদি সকল দ্রব্যই কিছু না কিছু পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এক মণ পাটের বিনিময়ে সকল দ্রব্যই যে একই পরিমাণে বা একই সংখ্যায় পাওয়া যাইবে তাহা নহে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কিছু পাটের বিনিময়ে অন্যান্য সকল দ্রব্যই কম বা বেশী কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় বা পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাকেই পাটের মূল্য কহে। সকল দ্রব্যের পক্ষেই এই নিয়ম। কোনও দ্রব্যের মূল্য কি জানিতে হইলে উহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে কোন্ দ্রব্য কতটা পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিলেই উহার মূল্য জানা যাইতে পারে।

এখানে একটি বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। আমরা আমাদিগের দৈনিক কথাবার্ত্তায় 'মূল্য' শব্দটিকে নানান্ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কখনো হয়তো 'প্রয়োজনীয়তা' বুঝাইতেই মূল্য শব্দ ব্যবহার করি; আবার কোথাও উহার ব্যবহার করি 'বিনিময়-মূল্য' অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ব্যখ্যা করিলাম তাহা বুঝাইতে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে মূল্যের এই দ্বিতীয় অর্থটাই বরাবর মনে রাখিতে হইবে। অর্থাৎ দ্রব্যের যে শক্তি বা গুণ থাকাতে উহার বিনিময়ে অন্যান্য পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকেই উহার মূল্য কহে। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিনিময়ের তুলনা দ্বারাই কেবল কোন্ দ্রব্যের কি মূল্য তাহা স্থির করা যাইতে পারে।

মূল্য কাহাকে বলে তাহা বুঝিলাম। পাটের মূল্য, ধানের মূল্য ইত্যাদি সকল দ্রব্যের মূল্য কেমন করিয়া জানিতে হয় তাহাও দেখিলাম। ঠিক এই উপায়েই আমরা অর্থের মূল্যও জানিতে পারি। কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের পরিবর্ত্তে বিনিময়ে সকল দ্রব্য যতটা পাওয়া যায় তাহাই ঐ পরিমাণ অর্থের মূল্য। এক টাকায় যদি পাঁচ সের চাউল, অথবা দুই সের তেল পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক টাকার মূল্য পাঁচ সের চাউল বা দুই সের তেলই বলিতে হইবে। অর্থের ও দ্রব্যের এই অদল বদলের সম্বন্ধটাকে সাধারণতঃ সমাজে 'অর্থের মূল্য' এই ভাষায় প্রকাশ না করিয়া 'দ্রব্যের দাম' এই ভাষায় প্রকাশ করা হয়। কিন্তু মূল্য ও দামের মধ্যে স্বরূপগত বিভিন্নতা কিছুই নাই আট আনায় এক সের তেল পাওয়া যায়। তেল ও অর্থের এই বিনিময়ের বা অদল বদলের সম্বন্ধটাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি দুই রকম ভাষায়—(১) অর্থের মূল্য হিসাবে, অথবা (২) দ্রব্যের দামের ভাষায়। এখানে আমরা বলিতে পারি আট আনার মূল্য এক সের তৈল ; অথবা একসের তেলের দাম আট আনা। অর্থের ও দ্রব্যের বিনিময়কে দামের ভাষায় প্রকাশ করাই সমাজে চলিয়াছে বেশী। কোনও দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য কি পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিলে যেমন উহার মূল্য জানা যায়, তেম্‌নি কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের বিনিময়ে যতটা অর্থ পাওয়া যায় তাহাকেই সেই দ্রব্যের পণ বা দাম বলা যায়। কোন দ্রব্যকে অর্থের সহিত তুলনা করিলেই তাহার দাম স্থির করিতে পারা যায়। দ্রব্যের যে পরিমাণ বা যে সংখ্যার পরিবর্ত্তে যত অর্থ পাওয়া যায় তাহাই দ্রব্যের সেই পরিমাণ বা সংখ্যার দাম।

অর্থের মূল্য বা জিনিষের দাম

সকল দ্রব্যের মূল্য এককালে বাড়িয়া উঠিতেও পারে না, কমিয়া যাইতেও পারে না। মনে করুন, আগে ১ মণ পাটের বদলে দুই মণ ধান পাওয়া যাইত। তখন এক মণ পাটের মূল্য দুই মন ধান, এবং ১ মণ ধানের মূল্য ½ মন পাট। কিন্তু ½ মণ পাটের বদলে যদি ২ মণ ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে, পাটের মূল্য বাড়িল বটে, কারণ এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ১ মন পাটে ৪ মণ ধান পাওয়া যাইবে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধানের মূল্য কমিয়া গেল। আগে ১ মণ ধানের মূল্য ছিল ½ মণ পাট, এখন হইল দশ সের পাট। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে সকল দ্রব্যের মূল্য এককালে বাড়িয়া বা কমিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু, সকল দ্রব্যের দাম এককালে

বাড়িয়া বা কমিয়া যাওয়া সম্ভব। কারণ যে মাপকাঠি অর্থাৎ যে অর্থের সহিত তুলনা করিয়া আমরা পণ্য দ্রব্যের দাম ঠিক করি, সেই অর্থের মূল্যই যদি কোন কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক জিনিষেরই দামেরও নড়চড় হইবে। আমরা দৈনিক দেখিতে পাই কোনও একটা জিনিষের দাম হয় তো বাড়িয়াছে, আরেকটার দাম কিছু কমিয়াছে, অপর একটা জিনিষের দাম হয়তো ঠিকই রহিয়াছে। এই যে দ্রব্য বিশেষের দামের নানা রকম পরিবর্ত্তন উহার কারণ ওই সব জিনিষের টান্ যোগানের কষাকষি। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে একটা দেশে সব জিনিষেরই দাম চড়িয়া চলিয়াছে অথবা কমিতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে দেশের অর্থের কিনিবার ক্ষমতা কোনও কারণে কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে।

মনে করুন, ১০০ শত কমলানেবুর দাম ৫৲ পাঁচ টাকা। তাহা হইলে, এক টাকায় পাওয়া যাইবে ২০টা কমলানেবু। এখানে কমলা ও অর্থের অদল বদলের তুলনায় এক টাকার মূল্য হইল ২০টা কমলানেবু। কিন্তু কমলানেবুর দাম চড়িয়া যাইয়া যদি শতকরা ১০৲ দশ টাকা হয়, তাহা হইলে, তখন এক টাকায় পাওয়া যাইবে ১০টা নেবু। অর্থাৎ, তখন এক টাকার মূল্য হইবে ১০টা কমলানেবু। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কমলানেবুর দাম শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা থাকাতে এক টাকার মূল্য ছিল ২০টা নেবু, আর দাম চড়িয়া শতকরা ১০৲ দশ টাকা হওয়াতে টাকার মূল্য কমিয়া গিয়া টাকা প্রতি হইল দশটা কমলানেবু। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে জিনিষের দাম বাড়িলে অর্থের মূল্য কমে। তেমনি জিনিষের দাম কমিলে অর্থের মূল্য বাড়ে। দ্রব্যের দাম ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। ঠিক দাঁড়ি পাল্লার মতো। কিন্তু একই ঘটনার এপিঠ আর ওপিঠ।

অবশ্য দুই একটি জিনিষের দাম চড়া বা নরম দেখিয়াই, অথবা কয়েকদিনের বাজার দর যাচাই করিয়াই দামের অথবা অর্থের মূল্যের তেজীমন্দা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দামের তালিকা সংগ্রহ করিয়া তুলনা করিলে তবে সঠিক বলা যায় দামের বা অর্থের মূল্যের গতি কোন দিকে।

আগামীবারে আমরা অর্থের পরিমাণের সহিত জিনিষের দামের সম্বন্ধ আলোচনা করিব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

বয়াটে।

—•—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৃতীয়

(ঘরে বাইরে) এক।

হাতের লাঠিখানা বগলে তুলে ডান হাতে ব্যাগ নিয়ে সাহেব চলেছিলেন। নব্‌নের কথা শুনে আর একবার ফিরে তার পানে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। নব্‌নে বল্‌লে—"নিন্ না সাহেব আমায় মুটে করে—তা'হলে আপনারও ঐ ভারি ব্যাগ বইতে কষ্ট হবে না, আমারও দুটী খাবার জুটবে দিন্ সাহেব ব্যাগটা আমার হাতে।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো ব'লে ফেলে নব্‌নে যেন হাঁপাতে লাগলো। তার একান্ত আবেদনের সে সবিনয় মিনতি সাহেবের অন্তরের মধ্যে গিয়ে তাঁর করুণার ঝরণার মুখেই ঘা দিলে বুঝি! তিনি ফিরে এসে নব্‌নের রক্তহীন, খোলা দুটী চোখের ওপর দৃষ্টিটা সেকেণ্ড চা'র পাঁচ নিশ্চল করে রেখে—তার পর দেহখানা আগাগোড়া দেখে নিয়ে পরিষ্কার বাঙলায় জিগ্‌গেস কর্‌লেন—"আজ কি খেয়েছ?"

"আজকে?" বলে নব্‌নে সাহেবের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। তার সে নির্ব্বাক্ কথার মানে বুঝতে সাহেবের এক নিমেষও দেরী হ'ল না। ছল ছল চোখের সকরুণ মৌন বাণী স্পষ্ট করে বলার চেয়ে সাহেবের কাছে অনেক বেশী খবর ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে দিল। তিনি পকেট থেকে একটা শিকি বার করে নব্‌নের হাতে দিতে গেলেন—নব্‌নে নিল না। সাহেব ব্যাগটা নব্‌নের হাতে দিয়ে বল্‌লেন:—"এস।"

সাহেবের পিছনে ব্যাগ নিয়ে নব্‌নে। সাহেব বরাবর গিয়ে একটা চায়ের দোকানে উঠে জিগ্‌গেস করলেন—"আপনাদের টাট্‌কা দুধ আছে?"

চা-ওয়ালা মুখটা একটু গম্ভীর করে জবাব দিলে—"আমাদের এটা চায়ের দোকান ঘোলের শরবতের দোকান না মশাই।"

সাহেব আওয়াজটা একটু কড়া করে চড়িয়ে বল্লেন—"চায়েও কি আপনারা ঘোল মেশান নাকি মশায়?"

"না চায়ে দুধই দিই অবিশ্যি।"

"তাই জিগ্‌গেস করছি—সে কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্ক্‌—না গাইএর দুধ?"

"তা গাইএর দুধও দিতে পারি।"

"আচ্ছা বেশ কথা; দুনো দাম দোব বুঝলেন? আদ্ধেকটা দুধ আর আদ্ধেকটা চা দিয়ে আমাকে দিন তো।" বলে নব্‌নেকে হাতে ইশারা করে কাছে ডেকে একখানা বেঞ্চ দেখিয়ে দিলেন—ব্যাগটা রাখতে। তা পর বল্লেন—"বসো চা খাবে?"

নব্‌নের ক্ষিধের জ্বালা তো জ্বালামুখীর আগুনের মত দিন রাত্তই জ্বলছে। টি, চপ্‌, কাট্‌লেট্‌ কারীর মধুর গন্ধ রেস্তোর্‌াঁর রান্নাঘর থেকে গরম হাওয়ায় ভেসে এসে পঞ্জর-সার খাওয়ার বাসনাটাকে প্রতি মুহূর্ত্তে স্থূল করে বাড়িয়ে তুলছিল। কিন্তু খাবে যে তার পয়সা কই? সে সাহেবের কথার উত্তরে স্পষ্ট "না" বলে মাথাটা নীচু করলে। সাহেব একটু ঝুঁকে পড়ে তার কানে কানে বল্‌লেন:—"তোমার মজুরী আমি আগোয়া দিচ্ছি।"

নব্‌নে হঠাৎ খুসী হয়ে উঠে বল্‌লে:—"আচ্ছা খাব।"

সাহেব বল্লেন:—"দু'পেয়ালা দেবেন, বুঝলেন।"

"বয়" দুপেয়ালা চা সাম্‌নে রেখে জিগ্‌গেস কর্‌লে—"আর কিছু দোব—ডেবিল মাটন চপ্‌—"

"The devil—" বলে মুচকী হেসে সাহেব বল্লেন—"আচ্ছা স্লাইস ক'রে রুটী,—মাখম বেশী করে দিও।—আর তোমাদের মুরগীর ডিম আছে—?"

বয় বল্লে "আছে।"

"আচ্ছা দুটো হাফ বয়েল" বলে সাহেব তাঁর পেয়ালার চুমুক দিলেন।

খাবার সব এল। নব্‌নে চার দিন পরে আজ খাচ্ছে। গলার ভেতর রুটী আট্‌কে আস্‌ছিল; এক এক সিপ চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে সে কষ্টে খাবার গিল্‌লো। সাহেব তাকিয়ে

তাকিয়ে এক একবার তা দেখলেন—কিন্তু কিছু বল্লেন না।

খাবার শেষ হয় হয় এমন সময় সাহেব রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে জিগ্‌গেস করলেন—“শেয়ালদা থেকে আপনাদের রেস্তোরাঁ হয়ে ঘুরে জানবাজার (কর্পোরেশন ষ্ট্রীট) যেতে কুলী কত মজুরী নিতে পারে মশায় ?”

ম্যানেজার বল্লেন—“তার কি কিছু ঠিক আছে—যা দিয়ে পারেন।”

“তবু, কি দিলে কুলীর ঠকা হবে না মনে করেন ?”

“ছ’ আনা।”

“আচ্ছা, আপনাদের কত হ’ল ?”

“ন আনা।”

“এই রইল” সাহেব দশ আনা পয়সা টেবিলের উপর রেখে বয়কে “There is your বক্‌শিস্‌” বলে ম্যানেজারকে “Good morning জানিয়ে বেরিয়ে এলেন। নব্‌নে ব্যাগটা নিয়ে তাঁর পেছনে চল্‌লো। চার দিনের পরের এই খাবার নব্‌নের পেটের ভেতর দুএকবার ওলট পালট করে উঠলো ; কষ্টে মুখ চেপে খানিকটা হাঁটলে। বমির ভাবটা কমে গেল। তখন গায় একটু যেন বলও এল তার। সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে সমানেই চল্‌তে লাগলো। ব্যাগটা পূরো বোঝাই—বেশ ভারি। হাতে করে আর নিতে না পেরে নব্‌নে ঘাড়ের ওপর তুলে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে যেতে লাগলো। সাহেব ফিরে ফিরে এক একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে ভীম নাগের সন্দেশের দোকান ছাড়িয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথে একটুখা’নি এগিয়ে গিয়েছে যখন পেছন থেকে নব্‌নের ডান হাতের কাছ দিয়ে একখানা ‘ফিটন’ ছুটে এল। নব্‌নে আর গাড়ীতে ‘যোতা’ ঘোড়াটার ভেতর বড় জোর হাত তিনেক জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে। তেজী ঘোড়ার পায়ের লোহা রাস্তার পাথর-ভাঙা বুকের ওপর খট্‌-খটাং শব্দ করে উঠছিল। হঠাৎ “গেল গেল”—বলে রাবড়ীওয়ালাটা চেঁচিয়ে উঠলো ; সবাই তখন চারিদিক থেকে কোলাহল ক’রে উঠলো—“গেল গেল ;”—আর এক সেকেণ্ড—ঘোড়াটা দৌড়ের-মুখে-তোলা সাম্‌নের পা একখানা ফেল্‌বে—আর তিন বছরের সে ছোট ছেলেটী ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়ে গড়িয়ে-আসা চাকার তলায় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। সে একেবারে গাড়ীর সাম্‌নে চেপে এসে পড়েছিল।

এক নিমেষের ভেতর নব'নের দেহে বুঝি শক্তির দেবতা তাঁর দেহের অমানুষিক বল সঞ্চার ক'রে দিয়ে গেলেন—সে, নিঃশ্বাস একটা ফেল্‌তে যতক্ষণ লাগে তারও অর্দ্ধেক সময়ের ভেতর, বিদ্যুতের চমকের চেয়েও বেশী তাড়াতাড়ি ঘাড়ের ব্যাগটা রাস্তায় ফেলে লাফিয়ে গিয়ে—ঘোড়ায় তোলা পাখানার সুমুখ থেকে ছেলেটাকে বাঁহাতে ক'রে একটা ঝেঁট্‌কা টান মেরে তুলে নিলো—কিন্তু ঝোঁকের মুখে নিজের দেহখানা ঠিক খাড়া রাখ্‌তে না পেরে, হুম্‌ড়ী খেয়ে প'ড়ে গেল। কোচ্‌ম্যান যতটা সম্ভব জোরে রাস ক'সে টেনে ধ'রে ঘোড়াটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় রুখ্‌লেও—ঘোড়া বাঁপাখানা ফেল্‌লে—সে পা প'ড়লো—ন'ব্‌নেরই পিঠের ওপর। কিন্তু ছেলের গায় আঁচড়টাও লাগ্‌লো না—ন'ব্‌নে প্রাণপণ শক্তিতে বাঁহাতখানা সটান ক'রে ছেলেটাকে ধ'রে রেখেছিল। সবাই চেঁচামেচি ক'রে উঠ্‌লো—"ধর ধর—হাত ফ'স্‌কে প'ড়লো বুঝি।"

এর মধ্যে সাহেব ঝটিতি এসে ছেলেটাকে ন'ব্‌নের হাত থেকে নিয়ে—পাশের একজন লোকের হাতে দিয়ে তখ্‌খুনি আবার দু' হাত দিয়ে টেনে ন'ব্‌নেকে বার ক'রে আন্‌লেন।

লোকগুলো আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"বেঁচেছে বেঁচেছে দু'জনেই বেঁচেছে।"

ন'ব্‌নের ময়লা কালো জামাটা ছিঁড়ে ফাঁক হ'য়ে গেছলো—পিঠ কেটে রক্ত বেরোচ্ছিল—হাঁটুর নীচে ও উরোতে অনেকখানি গভীর হ'য়েই ছ'ড়ে গিয়েছিল।

সাহেব তাকে টেনে আন্‌তেই ন'বনে নেতিয়ে মাটাতে লুটিয়ে প'ল। ক্ষুধিতের মস্তিকের সকল জ্ঞান এই আকস্মিক উত্তেজনা আর আঘাতে অকস্মাতই লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। সাহেব ন'বনেকে কোলে ব'য়ে নিয়ে রাস্তার পাশের কলের কাছে জলের ধারের মুখে মাথা এগিয়ে ধ'রে এক জনকে ব'ল্‌লেন—"কল টিপে ধর।" ন'ব্‌নের মাথায় জলের ধারা স্নিগ্ধতার অমৃত-ধারা ঢেলে দিল, সাহেব চোখে মুখে জলের ঝাপটা মার্‌তে লাগ্‌লেন—মিনিট দশেকের ভেতরেই ন'ব্‌নের জ্ঞান ফিরে এল, সে চোখ মেলে তাকালো। সাহেব ফুটপাথের ওপর ব'সে কোলের ওপর ন'ব্‌নের মাথা রেখে ব্যাগ খুলে—একখানা চন্দনের হাতপাখা বার ক'রে তাকে আস্তে আস্তে হাওয়া ক'র্‌লেন—খানিকটা। ন'ব্‌নে হাওয়ায় জলে ঠাণ্ডা হ'য়ে বল পেয়ে সহজ জ্ঞানে উঠে ব'স্‌ল। এক লহমা বসেই—ন'বনে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত একসঙ্গে সাম্‌নের

দিকে বাড়িয়ে দুবার ঝাঁকি দিয়ে নিল। তা'রপর সাহেবকে বল্লে—"দিন ব্যাগটা বন্ধ ক'রে—চলুন।"

ফিটনের যাত্রী সাহেব গাড়ী থেকে নেবে এসে এখানেই দাঁড়িয়েছিল। রাবড়ীওয়ালার বউ—তার নাকে জোড়া নং—ছেলেকে কোলে ক'রে কেবল ব'ল্‌ছিল "হা ভগবান,—হে মহেশ্বর, ওমা কালী,—পরের ধন, এ ভাল মা'নষের ছেলের জ্ঞান ফিরিয়ে দাও ঘোড়ার পায়ের তলায় নিজের পিঠ পেতে দিয়ে খোকাকে আমার বাঁচিয়েছে, ওকে তুমি বাঁচাও মা, আমি পাঁচ সিকের পূজো দেব।"

এইবার ন'ব্‌নে উঠে দাঁড়াতেই—সে আর রাবড়ীওয়ালা—তার স্বামী—একসঙ্গে ছুটে এসে—ন'বনেকে ব'ল্লে "যা উপ্‌কার আমাদের আজ ক'ল্লে বাবা—কি দোব তোমায়?"—রাব্‌ড়ী-ওয়ালার বউ ব'ল্লে "কি দোব বাবা।"

ন'ব্‌নে একটু হেসে ব'ল্লে—"খেতে না পেয়ে কোন দিন যদি দোকান গোড়ায় এসে দাঁড়াই—দু চুমুক রাবড়ী দিয়ে আমায় বাঁচিও মা।"

"আমায় 'মা' ব'ল্লি বাবা, আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছিস্—তুইও আমার ছেলে, আয় রাবড়ী খাবি।" ব'লে গয়লা বউ ন'ব্‌নের হাত ধ'রে টান্‌লো।

ফিটনের সাহেব অম্‌নি পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার ক'রে ন'ব্‌নের কাছে বাড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লেন—লো রুপৈয়া রাবড়ী পিও—মিঠাই খাও।"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"সাহেব, টাকার লোভে কি আমি গাড়ীর নীচে ছুটে গিয়েছিলাম? তোমার টাকা আমাকে নয় পারতো যার ছেলে তাকে দিয়ে যাও—আর মা, রাবড়ী আজ খাব না—ক্ষিধেয় আবার যেদিন মরার মতন হব—সেই দিন আস্‌বো—সে হয়তো পরশুই।" ব'লে সাহেবকে ব'ল্লে—"চলুন।"

সাহেব চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছিলেন আর একখানা নোট বইয়ের মত খাতায় সকলের চোখের আড়ালে টের-চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে—কি কি লেখা ছিল তাই এক একবার প'ড়্‌ছিলেন। ন'ব্‌নে এবার তাঁর দিকে তাকাতেই খাতাখানা পকেটের ভেতর পূরে ব'ল্‌লেন—"তুমি কি আর যেতে পার্‌বে?"

"নিশ্চয় পার্‌বো—আর যেতে হবেই আগোয়া মজুরী নিয়েছি।"

"তা আদ্ধেক রাস্তা তো এসেছ!"

"আজ্ঞে না,—চুক্তি ক'রেছি যা, তা শেষ ক'রে করাই নিয়ম। তার আদ্ধেক ক'রে আদ্ধেক মজুরী পাওয়া যায় না—অন্ততঃ দাবী করা অন্যায়।"

এর মধ্যে সেই বউটী ব'লে উঠ্‌লো—"উঃ! পিঠ দিয়ে রক্ত ছুট্‌ছে যে - ও সাহেব রক্ত বন্ধ কর—বন্ধ কর।"

পিঠের কাটাটা দিয়ে সত্যিই রক্ত বেরোচ্ছিল। ন'ব্‌নে তার চাদরখানা চট্ ক'রে ভিঁজিয়ে সাহেবের হাতে দিয়ে ব'ল্লে —"এইটে জড়িয়ে পিঠটা বেঁধে দিন্ না দয়া ক'রে।"

সাহেব আহা উহু কিচ্ছু না ব'লে পিঠটা বেঁধে দিতে দিতে ব'ল্লে —"ছিঁড়ে নিলে ভাল হ'ত, চাদরখানা মস্ত হ'ল। ন'ব্‌নে ব'ল্লে—ছিঁড়ে নিলে ভালই হ'ত কিন্তু আমার যে মুড়ী দেবার আর কোন আবরণ নেই, থাক্; কোনো মতে দিন ঐটে আস্তই জড়িয়ে।"

সাহেব তাই দিলেন। গাড়ীর সাহেবের টাকা পাঁচটা ন'ব্‌নে ত নিলই না—রাবড়ী-ওয়ালাও ফিরিয়ে দিল। তার যা লোক্‌সান হ'ল সেটা সময়।

ন'ব্‌নে আর দেরী ক'রে লোকের ভিড় জমানো বোকামী মনে ক'রে সাহেবের ব্যাগটী তুলে নিয়ে এগোলো। বউটী ব'ল্লে—"যেদিন ইচ্ছে হবে বাবা, কিছু খেতে আসিস্ আমার দোকানে।"

সাহেব হাতের টুপি মাথায় ক'রে আবার চ'ল্‌লেন।

জানবাজারে সাহেবের বাড়ী পেঁছুতে আরও মিনিট পনর লাগ্‌লো।

ন'ব্‌নে বাড়ীর বারান্দায় ব্যাগ নাবিয়ে দিলে। সাহেব ব্যাগ রাখ্‌তে ঘরে গেল; ন'ব্‌নে ফিরে রওনা হ'ল।

সাহেব বেরিয়ে এসে ডাকলেন—"এই পয়সা নিয়ে যাও—তোমার বকসীস্।"

ন'ব্‌নে ফিরে ব'ল্ল—"আমার মজুরী তো আপনি চায়ের দোকানে দিয়েছেন।"

"চায়ের দোকানে সাড়ে চার আনা লেগেছে—আরো ছ'পয়সা তোমার পাওনা,—নিয়ে যাও।"

ন'ব্‌নে সাহেবের কাছে গিয়ে হাত পাত্‌লো, সাহেবে ন'ব্‌নের হাতে একটা টাকা দিলেন। ঝনাৎ ক'রে সানের ওপর টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ন'ব্‌নে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—উঃ মুটেগিরিতেও এত

অপমান ! যে ইচ্ছে সেই ভিক্ষে দেয়—কিন্তু যেদিন—নাঃ॥ সাহেব, ছ'পয়সা আমার পাওনা টাকা দিচ্ছেন কেন ?"

সাহেব খুব গম্ভীর হ'য়ে জবাব দিলে—"বকসীস্ দিয়েছিলাম বাঁকীটা। থাক, তুমি নেবে না যখন নাও ছ'পয়সা।" ব'লে আর এক পকেট থেকে ছটা পয়সা তুলে ন'ব্নের হাতে দিলেন।

ন'ব্নে নিয়ে ফিরে যেতেই সাহেব ডেকে আবার ব'ল্লেন—"দেখ—সেলাম ক'রে যেতে হয়—মুটের ব্যবসায় পাকা যারা ওস্তাদ তাদের এই সেলামটা দিতে ভুল হয় না বুঝ্লে ?"

ন'ব্নে ব'ল্লে—"বুঝেছি ! সেলাম হুজুর।"

"হাঁ—ঠিক যাও।" ব'লে সাহেব মুখ ফেরালেন। ন'ব্নে আবার ফির্লো যাবার জন্য ; আট দশ পা গে'ছে সাহেব আবার পেছন থেকে হাঁক্লেন—"এইও এ মোটিয়া।"

কি ! মোটিয়া ? হ'লামই বা আমি মজুর, তাই ব'লে সাহেব,—এমন 'মোটিয়া মোটিয়া' ব'লে চেঁচাবে—কি অপমান !—মোটিয়া মুটে কুলী—কি অপমান !"

না—এ অপমানকে তো মাথার মণি ভূষণ ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছি—এই অপমানের বর আজ আমার দশ দিনের ক্ষিধের খাবার দিয়েছে—বেরিয়ে যাবার মুখে প্রাণটাকে আবার ফিরিয়ে রেখেছে। ন'ব্নে ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ল্ল—কি ব'ল্ছেন ?"

সাহেব একখানা খাতা দেখিয়ে ব'ল্লেন—"এ খাতাখানা কার—আমি ঐ গাড়ীর কাছে তুমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলে যখন—এখানা কুড়িয়ে পেয়েছি।"

ন'ব্নে লাফিয়ে এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে খাতাখানা ধ'রে ব'ল্লে—"দিন্ দিন্ খাতাটা—ও আমার ; আমারি ওখানা, গাড়ীর কাছে পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছিল বোধ হয়।"

সাহেব ব'ল্লেন—"দাঁড়াও, দিচ্ছি ;—এ সব কে লিখেছে ?" এই ব'লে সাহেব প'ড়্লেন—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু—"

কিন্তু সংমাকে নয় ;—বিধাতার সৃষ্টিতে সংমা এক বেখাপ জিনিষ।

ন’ব্‌নে ব’ল্লে—“ও সব ছাই পাঁশ কথা থাক—দিন্ খাতাখানা।”

“দিচ্ছি”—ব’লে সাহেব আবার প’ড়্লেন—“আমার লেখাপড়া হ’ল না দুজনের জন্যে তার একজন সংমা আর একজন আমাদের মহিম মাষ্টার।

মাষ্টার মশায় মনে করেন তিনি খুব পণ্ডিত আর তাঁর চেয়ে ভাল মাষ্টার দুনিয়ার হ’তে পারে না। যে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা ক’র্‌তে যাক,—তিনি অল্প কথা কইতেন লোক দেখ্‌লেই বই খুলে ব’স্‌তেন আর ব’ল্‌তেন—‘বালকের ন্যায় বেলা ভূমি হইতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।’ এ কথাটা আমরা যারা এর মানে কিছুই বুঝিনে—আমাদেরই শোনাতেন বেশী ক’রে। শুনে ‘না না সে কি কথা মাষ্টার মশায়’—না ব’ল্লেই তিনি চাবুক হাঁকাতেন।

আরে! ছলনায় ছোট হ’য়ে কি বড় হওয়া যায়? আর বেতের বদলে কি ভালবাসা মেলে? চাবুক মেরে যা পাওয়া যায় সেটা মন নয় গালাগাল আর যা বোঝানো হয়—সেটা বিদ্যা নয়—ব্যথা।”

“কি প’ড়্‌ছেন ও সব! দিন না খাতাখানা।”

“আরও আছে দেখছি”—

“মুসলমানকে হিন্দু ঘেন্না করে কি সে মুর্গী খায় ব’লে? তা হিন্দুও তো কাছিম খায়। আর কাছিম মুর্গীর চেয়ে ছোটত নয়ই—বরং বড় ;—তার আরো চার পা।”

“বেশত কথা সব লেখা আছে ;—দেখি এ পাতায়।” ব’লে সাহেব খান পাঁচছয় চিল্‌তে পাতার মাথা গেঁথে বাঁধা, তেলে ধুলোয় ময়লা খাতার আর একখানা পাতা উল্টে আবার প’ড়্‌লেন—“যে কাজ করে—তারো একটা বিবেক আছে— কিন্তু যে কাজ করায়—সে এ-কথাট ভুলে গিয়ে মনে করে—তার কারিগর বুঝি—ক্রমাগত ফাঁকি দিয়েই চলেছে।

প্রশ্ন। গরীব কুলী, মজুরের অশেষ অপরাধের ভেতর সব চেয়ে বড় দুটো কি কি?

উত্তর। ১। তার বাবা গতর খাটিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও—না খেয়ে মরেছে ;—আর—

২। সে পূর্ব্ব পুরুষের সম্পত্তির দখিলকার হয়ে আদালতে নামজারী করিয়ে নেয় নি।

আফ্রিকার গান্ধী—তাঁর নিজের দেশে ফিরে আসেন না কেন? সোনার রাজ্য সেইটে না এইটে?"

সাহেব চোখের পলকে ন'ব্নের ডান হাতখানা তাঁর মোটা চওড়া হাতের ভেতর জাপটিয়ে জড়িয়ে নিয়ে জিগ্‌গেস্ ক'রলেন—"বল, এ কে লিখেছে—তুমি?"

হঠাৎ চম্‌কে গেলে লোকের মুখের ভাব যেমন করে বদ্‌লে বিকৃত হ'য়ে ওঠে—চকিতের ভেতরে ঠিক তেমনি ক'রে বদলানো, অবাক মুখে ন'বনে সাহেবের মুখের পানে চাইল। সাহেব—সেবার জোর ক'রে ব'ল্লেন—"বল কে লিখেছে।"

ন'ব্নে ব'ল্লে "আমি"।

"তুমি আজই নতুন মুটেগিরি ক'র্‌তে বেরিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পেটের ক্ষিধেয়?"

"ক্ষিধের জ্বালায়।"

"ক'দিন খাও না?"

"প্রায় উনিশ দিন।"

"চাকরী ক'র্‌বে?"

"কি চাকরী?"

"বয়" থাক্‌বে—আমার কাছে?"

"বয়?"

"হ্যাঁ; মুটের চেয়ে "বয়" হওয়া কি খারাপ?"

"তবু—মুটে স্বাধীন তার যে স্বাধীনতার সম্মান—"

সাহেব ন'ব্নেকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন। তাঁর প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেগ বুঝি বাধা দিয়ে থামিয়ে রাখতে তিনি পার্‌লেন না, নিমেষে গদগদ হয়ে ঐ আন্তরিক আলিঙ্গনের ফাঁকে সে আবেগ পিতার স্নেহের মত বর্ষার বাদল ধারায় নিঝোরে গ'লে প'ল। তিনি ব'ল্লেন—"রাজী হও ছোক্‌রা,—তুমি আমার স্বাধীন "বয়" থাক্‌বে। একেবারে স্বাধীন—কোন বাঁধন, কোনো

শাসন থাকবে না—আমি চোখ রাঙিয়ে কড়া কথা তোমায় কোনো দিন বল্‌বো না—প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—।"

ন'বনে চুপ ক'রে থাক্‌লো একটু খানি মোটে,—এক মিনেটও না—তার পর বল্লে—

"রাজী আছি।"

"আচ্ছা—এস ভেতরে।"

ব'লে সাহেব ন'বনেকে হাত ধরে ঘরের ভেতর টেনে নিলেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অর্ঘ্য

দুর্জ্জয়-লিঙের দুর্গম শিরে

মৃত্যুঞ্জয়ী, হে মহাতাপস—

সাধনা তোমার ভেঙ্গে দিল হায়

কোন্ নিঠুরের বজ্র-পরশ !

মহেশের মতো ত্যাগী ছিলে তুমি

বলীর মতো করিলে দান ;

হে নীলকণ্ঠ ! কণ্ঠ পূরিয়া

হলাহল শুধু করিলে পান—

জীবন চুয়ানো অমৃত-রসে
গড়িলে নবীন জাতির পাঁতি
জীবন-আহবে চিরজয়ী তুমি
সত্য-সাধনা তোমার সাথী !

দেশ-জননীর নিদেশ মানিয়া
দীক্ষা লইলে ত্যাগের পথে,
বাসনা তোমার পুরাতে বাসব
তুলে নিল তাই আপন রথে !

নন্দন-হৃদি রঞ্জন তুমি
লহ, লহ, ওগো প্রাণের হবি—
নয়নের জলে হে দেব মহান্,
অভিষেক তোমা করিছে কবি।

শ্রীসরোজকুমার সেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

——০——

(এক।)　　স্মৃতিপূজা।

কহিল দেবতা,—
"মরণ মথিত করি' এনেছি অমৃত—
জীবন জাগিয়া আছে বিষ-ভাণ্ডে মোর ;
হবে যদি দুঃখ-শোক, বেদনা বিস্মৃত
সুধা পান কর সুধী—মোছ আঁখিলোর !
মরণ জিনিবে যদি জীবনের রণে—
চুমুকে নিঃশেষ করি কর বিষ পান !"
পুলকে সরস হাসি ক্ষোভ-রিক্ত মনে—
কহিল সে—"দাও মোরে মৃত্যুহীন মান
অশ্রু চাই, দুঃখ চাই, দৈন্য চাই দান,
কণ্ঠ ভরে দাও করি হলাহল পান।"

"যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহক্ষয়ায় জীবসি ॥"

(ঋগ্বেদ)

তোমার যে আত্মা বিশ্ব-নিখিলে ছাইয়া গিয়াছে—আমরা আবার তাহাকে ডাক দিতেছি—তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও বাঁচিয়া থাকুক।

*　　*　　*

কাঞ্চনজঙ্ঘার তুঙ্গ চূড়ায় রক্ত-গোধূলি সহসা ধূসর হইয়া গেল কেন? কন্যা-কুমারীর অলিন্দরূপ বুকের উপর উচ্ছসিত সাগর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। অভিশাপের অগ্নিবৃষ্টি নামিয়া

হরণ আশার সকল ঐশ্বর্য্য ভস্মীভূত করিয়া দিল। এক মহা জ্যোতিষ্কের পতন হইয়াছে—লক্ষ নক্ষত্র কক্ষ হারাইল—তাই বুঝি নিখিল নিশ্চল হইয়া গিয়াছে,—বিশ্ব-ধরণী মূঢ় মূক স্তব্ধ,—বাতাসও বুঝি রুদ্ধশ্বাস! বাঙলার ইন্দ্রপাত হইয়াছে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। শুনিয়াছ বাঙ্গালি? প্রলয়ের দিনের বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়াছ? অস্থিসার দেশ-মাতৃকার পঞ্জর-কঙ্কাল ক'খানির উপর অকস্মাৎ মেরু-চূড়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে—এ অনর্থের বার্ত্তা শুনিয়াছ? যে মহা ঋত্বিকের তপঃশক্তির সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগরিত জাতির জীবনে প্রভাত পুলকিত হইয়া আসিয়াছিল মৃত্যু যে আজ নিষ্ঠুর আহ্বানে জীবন-যজ্ঞের সে ঋষি হোতাকে টানিয়া লইল! তোমার মহাযজ্ঞ পূর্ণ হইল না—সে সংবাদ শুনিয়াছ? বাঙলার বল, বাঙলার মান, দেশের মণি-কিরীট চিত্তরঞ্জন নাই—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই! শুনিয়াছ বঙ্গ! অভাগিনী জননি—চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠ! বিচূরিত বক্ষে করাঘাত করিয়া—মন্দভাগিনি, আজ আছাড় খাইয়া পড়! বাঙালি, চক্ষে কি তোমার অশ্রুধারার সাগর নাই, বক্ষ-মণি হারাইয়া ভারতবর্ষ, এখনও তুমি উন্মাদিনী হইয়া যাও নাই! মৃতবৎসা হতভাগিনী, করাল হাতে কাল যে আজ তোমার বক্ষের শেষ নিধিটী অঙ্কশূন্য করিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল—ধরিয়া রাখিতে পারিলে না? হৃদয়ের মণি—বক্ষের পক্ষপুটে ঘিরিয়া রাখিতে পারিলে না? লিখিয়া রাখ বঙ্গ, লিখিয়া রাখ—ভারত,—বুকের রক্তে লিখিয়া রাখ—২রা আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩২ সাল। তোমার ইতিহাসের একটী গৌরবময় অধ্যায় লেখা হইতেছিল—সমাপ্তির পূর্ব্বেই ২রা আষাঢ় সন্ধ্যা ৫৷৷০টায় তাহা হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। হাহাকারে আকাশ দীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠ ভারত, পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাসে ধূমায়মান মেঘ সৃষ্টি করিয়া বিশ্বভরা অশ্রুর বৃষ্টি নামাইয়া দাও—সকলে মিলিয়া কাঁদুক;—অন্তর-ব্যথা—নয়নাসারের নির্ঝর-ধারায় গলিয়া পড়ুক।—এ রত্ন তোমার গেল—আমার গেল,—চীনের গেল, জাপানের গেল—ইউরোপের গেল—ইংলণ্ডের গেল। এ যে কোহিনুর মণি—প্রলুব্ধ আগ্রহে সারা বিশ্ব ইহার দ্যুতিমান্ গরিমায় গৌরবান্বিত হইবে বলিয়া চাহিয়া ছিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দস্যুর মত মৃত্যু আসিয়া আচম্বিতে সে রত্ন হরণ করিয়া লইয়া গেল! তোমারই বক্ষের উপর হইতে কৌস্তুভ হরণ করিয়া লইয়া গেল—ভারত! ক্ষুব্ধ হৃৎপিণ্ডের বেদনা-ঘন স্পন্দন বুঝি মর্ম্মের চলা তোমার বন্ধ করিয়া দিবে। অভাগিনি, বিশ্ব-বিজয়ী বীর—সপ্ত সমুদ্রের মুক্তামালা জয় করিয়া আনিয়া তোমার কণ্ঠাভরণ গাঁথিয়া দিতে চাহিয়াছিল। পঞ্চ-মহাদেশের

মর্য্যাদা জিনিয়া আনিয়া—তোমার আরতির পঞ্চ-প্রদীপ সে জ্বালিয়া দিতে পারিত—তোমার পূজামন্দিরের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান পূজারীর শক্তিমান্ হস্তে ধৃত পাঞ্চজন্যের আঘাত আরাবে অবাক বিশ্ব যে তোমার চরণে মস্তক অবনত করিয়া আনিত। তোমার বক্ষ-পীযূষে পরিপুষ্ট সন্তান তোমার মা, তোমারই মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়-ফলকে অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া লইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার গৌরব-মৌলিনি, তোমার নিত্য সমুন্নত মস্তকে যুগ-মহিমার মুকুট পরাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিল।—সপ্তরথী বেষ্টিত মহারথী মরণ-ভয়-রহিত সব্যসাচীর সে অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুর শির বিক্ষত করিয়া চিরবিজয়-বিশ্রুত কীর্ত্তি-গাণ্ডীব ধনু হইতে অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতেছিল। একাকী যুদ্ধ করিতেছিল গভীর রণ-সন্ধিস্থলে—সঙ্কট-সঙ্কুল পথ-কূট ;—ভীত সারথী রথ পরিচালনে অক্ষম—অশক্ত। সুধী রণবীর পদাশ্রয়ে সারথীকে নিরাপদ রাখিয়া পূর্ণোদ্যমে একাকী যুঝিয়া চলিয়াছিল,—বিজয়-লক্ষ্মী বিশ্ব-কুঞ্জের নিখিল পুষ্প চয়ন করিয়া জয়ীর কণ্ঠভূষণ বরণ-মাল্য গাঁথিতেছিলেন—কিন্তু সহসা ইন্দ্রপতন হইল—বিশ্বজিৎ মহাযোগী ;—যোগীবর হিমাচলের পাদপীঠতলে লীলা সম্বরণ করিলেন। কি হইল? কে বলিয়া দিবে কি হইল! কার মুখে বাণী আছে—কে বলিয়া দিবে কি হইল! অনাগত যুগ তাহার বিচার করিবে—ভবিষ্যৎ বংশাবলী বলিয়া দিবে কি হইল!

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

—————

(দুই)

চিত্তরঞ্জন বৈদ্য সন্তান। তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি পূর্ব্ববঙ্গে। বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে দাশ-পরিবার-বনিয়াদি ঘর ;—চিত্তরঞ্জন এই বংশের কুলতিলক।

পিতা—ভুবনমোহন দাশ কলিকাতায় আসিয়া আইন ব্যবসায় গ্রহণ করেন। তিনি হাইকোর্টের একজন গণ্যমান্য "এটর্ণি" ছিলেন। কিন্তু ভুবনমোহনের—তুচ্ছ সে পদবী গৌরব। ধন্য ভুবনমোহন—যিনি এমন পুত্রের পিতা—ধন্য তিনি ভুবনমোহন—"দেশবন্ধু" যাঁহার সন্তান!

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—কলিকাতায় চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। ষোল বৎসর বয়সে চিত্তরঞ্জন মিশনারীদের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চার বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধি লাভ করেন—কিন্তু কর্ম্মজীবনে তিনি এ উপাধি কখনও ব্যবহার করেন নাই।

বি-এ, পাস করিবার পরেই ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিবার জন্য চিত্তরঞ্জন বিলাত যান।

পিতার ইচ্ছা ছিল—পরীক্ষার শিরোপা পাইয়া সরকারী তনখায় চাকরিয়া শাসক বহাল হইয়া চিত্তরঞ্জন দেশে ফিরুক। কিন্তু ভুবনমোহনের সে সাধ পূর্ণ হইল না! চিত্তরঞ্জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন বলিয়া যে ভুবনমোহনের আশা ব্যর্থ হইল তাহা নয়—চিত্তরঞ্জনের গৌরব চূড়া মণিময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিধাতা তাঁহার জীবন-যাত্রার অন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। শাসিতের দৈন্য পুণ্য মাথায় লইয়া শাসকের রক্ত চক্ষুর সম্মুখে বিরাট পুরুষের মত দাঁড়াইয়া শাসককেই শাসন করিবার জন্য চিত্তরঞ্জনের জন্ম হইয়াছিল। শাসন সংস্কারের জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। চাকরী ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছিল—চাকরী গ্রহণ করিবার জন্য চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয় নাই। আই, সি, এস পরীক্ষায় চিত্তরঞ্জন উপস্থিত হইলেন—সগৌরবে উত্তীর্ণও হইলেন—কিন্তু চাকরী পাইলেন না। কারণ সাহেবের দেশে থাকিয়া সাহেবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদের তীব্র অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। জন ম্যাকলিন—পার্লামেণ্ট মহাসভার এক সদস্য।—ভারত ও ভারতীয় জাতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি গ্লানিকর বক্তৃতা দেন। তরুণ চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ অন্তরাত্মার মধ্যে—ইংরেজের মুখের যে মিথ্যা কথায় ঘোর অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল তাঁহার আত্মসম্মানের আঘাত লাগিল—জাতীয় মর্য্যাদার অবমাননায় চিত্তরঞ্জন চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। মহামতি রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের সভাপতিত্বে এক সভা আহ্বান করিয়া তীরের ন্যায় তীক্ষ্ণ সত্যবাণীর আঘাতে ম্যাকলিনকে চিত্তরঞ্জন জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন। ম্যাকলিন পরাজিত হইলেন, অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—তাঁহার সদস্য পদ আর রহিল না। দূর বিদেশে একা বাঙালী—সেদিন মাতৃভূমির মান রক্ষা করিয়া কুলোজ্জ্বলকারী কৃতী সন্তানের কর্ত্তব্যপালন করিলেন—কিন্তু এ জয় তাঁহাকে আপাত দৃষ্টিতে বড় অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইল। পাস করিয়াও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট

হইতে পারিলেন না। পরীক্ষার ফল বাহির হইল—চিত্তরঞ্জন দাশ—এ বৎসরের কৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে সর্ব্বনিম্নে স্থান পাইয়াছেন। জীবনের প্রথম দিনে প্রকাণ্ড ব্যর্থতায় বিনিময়ে যও জননীর মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ চিত্তরঞ্জন বিশ্ববিজয়ী বীর।—স্মিত হাস্যে আইন পরীক্ষা দিয়া—ব্যারিষ্টারের সনন্দ লইয়া—চিত্তরঞ্জন গৃহে ফিরিলেন। পিতা কি বলিলেন জানি না কিন্তু বঙ্গজননী বরণডালা হাতে লইয়া সেই দিনই সন্তানকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন—"এস বৎস, স্বাগত।" সন্তানও তাই বলিতে পারিয়াছিলেন—"আমার বাঙলাকে আমি আশৈশব ভাল বাসিয়াছি; যৌবনের সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্বেও আমার বাঙ্গলার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী-মূর্ত্তি আরও জীবন্ত ও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী কিন্তু তাঁহার এ বর-পুত্রের সহিতও "লুকোচুরি" খেলিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায়ই সুধী চিত্তরঞ্জন স্থির, প্রসন্ন, স্থিতধী, বদ্ধপরিকর। জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। তপস্বীর সাধনায়—তিনি আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন—সংহিতার অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইলেন। প্রায় পনর বৎসর জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের দোলাচল অবস্থায় কাটিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙালার ইতিহাসের স্মরণীয় মোকদ্দমা। সরকার শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনিলেন। আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হইল। অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন—আত্মা ও প্রাণ। কিন্তু আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টারদিগের দীর্ঘ নামের তালিকায়—চিত্তরঞ্জনের নামে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না—দশজনে ভাবিল কারণ কি?—জানিত যারা তাহারা বলিল "তাই ত!" আর চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"আমার স্থিতি যেমন সত্য ইহাও তেমনি সত্য যে তাহারা আমার কাছে আসবে—অরবিন্দের পক্ষ আমাকে সমর্থন করিতেই হইবে।"

সে কথা সত্য হইল। সেশনে চিত্তরঞ্জনের ডাক পড়িল। সাড়া দিতে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হইল না। দশ মাস ধরিয়া চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষে আইন-রণে অনবরত যুঝিতে লাগিলেন।

সে কী যুদ্ধ! অক্লান্ত চিত্তরঞ্জন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন—আইনের কূট-সমস্যা মীমাংসা করিয়া—জটিল বেড়া-জাল রচনা করিয়া তুলিলেন—বিখ্যাত আইনজীবী আরল্ডি নোর্টনের ভাস্বর প্রতিভা—বাঙলার অঞ্চল-নিধি এ মরকতের কর্পূর দ্যুতিচ্ছায়ায় ম্লান হইয়া গেল। চিত্তরঞ্জনের বিত্ত নাই—পিতৃ ঋণে তিনি দেউলিয়া—মফঃস্বলে গিয়া মোকদ্দমা লইবার সময় নাই—গুরুতর ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা তাঁহারই হস্তে—বন্ধু অরবিন্দ শৃঙ্খলাবদ্ধ—চিত্তরঞ্জনের আহার্য্যের যদিও বা সংস্থান হয়—ব্যবহার্য্য কিনিবার সঙ্কুলান নাই—ত্যাগবীর গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয় করিলেন—তৈজসাদি এক একখানি করিয়া গেল। অটল, স্থিরকর্ম্মী—অরবিন্দের মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। দেবতার আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইল—হাইকোর্টের বিচারে দোষমুক্ত অরবিন্দের হাত ধরিয়া বিজয়ী চিত্তরঞ্জন আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—দেশের লোক গৌরবে তাঁহাকে বরণ করিল—বিদেশের সুধী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ন্যায়বিচারক; সর্ব্বমনোরঞ্জক বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্স প্রকাশ্যে চিত্তরঞ্জনের গৌরবঘোষণা করিলেন। ঐশ্বর্য্যের দেবতাকে লজ্জায় তাঁহার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া আনিয়া চিত্তরঞ্জনের গৃহে ঢালিয়া দিতে হইল। ব্যবসায় ত্যাগ করিবার সময় চিত্তরঞ্জনের বার্ষিক আয় ছিল আট লক্ষ টাকা। বিলাতের সাইমনও চিত্তরঞ্জনের তুলনায়—অধিক উপার্জ্জন করেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিত্তরঞ্জন দেউলিয়া হইয়াছিলেন—কিন্তু সে ঋণের জ্বালা বুঝি নিশিদিন অন্তর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড জ্বালাইয়া রাখিত। সে ঋণের মেয়াদ ফুরাইয়া দাবী তামাদী হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু চিত্তরঞ্জন জানিতেন—পিতার এ ঋণ তাঁহার দেয়—এ দেনা পরিশোধ করিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য! ভুবনমোহন দুই হস্তে দান করিয়া ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন—চিত্তরঞ্জন প্রাণপণ শ্রমে উপার্জ্জিত অর্থে পিতার সে ঋণ পরিশোধ করিলেন। একদিনে ৭৬ হাজার টাকা ঋণ দিয়া—আদালতে প্রার্থনা করিলেন—"দেউলিয়ার তালিকা হইতে আমার নাম তুলিয়া দেওয়া হউক।" তাঁহার পাওনাদারের কেহ কেহ সহসা একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—ভুবনমোহন ও চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট তাঁহাদের প্রাপ্য টাকার সেই তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া শেষ পাই অবধি সব টাকার এক একখানি চেক তাঁহাদের নামে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিচারপতি ফ্লেচার বলিলেন—"দেউলিয়ার ইতিহাসে এ কাহিনী

অভূতপূর্ব।" আর চিত্তরঞ্জনের উত্তমর্ণগণ অবাক হইয়া গেলেন। এই-ত ধর্ম্মবীর, ত্যাগবীর, বলবীর—চিত্তরঞ্জন।

চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভাও বড় কম ছিল না। বাল্যেই তাঁহার উন্মেষ হইয়াছিল। জীবনের মধ্য দিন পর্য্যন্তও কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের প্রয়াসী হন নাই। চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্য "সাগর সঙ্গীত"—সে বিরাটের অভিনন্দন-গীতি, অনাদির আবাহন, অনন্তের উদ্বোধন। তারপর "অন্তর্য্যামী", "মালঞ্চ", "কিশোর কিশোরী।" "নারায়ণ" তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা।

চিত্তরঞ্জন উৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। "নিউবেঙ্গল" ও "বন্দেমাতরম"এ— তাঁহার নিপুণ লেখনী নিসৃত বহু বিচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

লর্ড কার্জ্জনের অস্ত্রাঘাতে যেদিন চিত্তরঞ্জনের দেশ-মাতৃকার অঙ্গ খণ্ডিত হইল—যেদিন বঙ্গ-ভঙ্গ হইল, ব্যথিত চিত্তরঞ্জন সেইদিন আসিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আপনাকে বিলাইয়া দিয়া কাজে লাগিলেন না। তারপর ভবানীপুর প্রাদেশিক কনফারেন্সে চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন;—যদিও সে সভাপতিত্বও তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে কোনো বিচিত্র অধ্যায় রচনা করিয়া দিতে পারে নাই।

ইহার পর ১৯১৮ সাল। ভারতের শাসন-সংস্কার। ডিয়ার্কি বা দ্বৈত-শাসনের সূচনা। কংগ্রেস মণ্ডপে দাঁড়াইয়া—বাঙলার বীর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—এ শাসন-সংস্কার ভূয়া।

পাঞ্জাবে যেদিন নিরীহ-হত্যার নির্ম্মম অভিনয় চলিতে লাগিল—অত্যাচারে সমস্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত কাঁপিয়া উঠিল, সামরিক আইনের কবলে পড়িয়া নির্দ্দোষ পুরুষ-নারী নির্য্যাতিত হইল; চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস মহাসভার পক্ষ হইতে সেই অত্যাচারের অনুসন্ধান করিতে পাঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এইখানে চিত্তরঞ্জনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মহাত্মা সেই প্রথম সাক্ষাতের কথায় এই ভাবে লিখিয়াছেন—ব্যবসায়ে চিত্তরঞ্জনের পঞ্চমুখ প্রসার আর ইংরাজী বক্তৃতায় ততোধিক মুন্সীয়ানার কথা দূর হইতে শুনিয়াছিলাম। বুকটা কাঁপিতেছিল, ভয়ে ভয়ে কাছে উপস্থিত হইলাম। বড় কম বিস্মিত হইলাম না। আইনে তিনি

সব্যসাচী—তাঁহার মত জানাইলেন যে নিপুণ সওয়াল-জবাবে হাণ্টারকমিটার সাক্ষীদিগকে বাণাহত করিয়া তিনি আসল সত্য বাহির করিলেন—ইত্যাদি।

এই বৎসরেই তিনি অসহযোগের মতাবলম্বী হন। পরের দুইবৎসর মহাত্মার বিশ্বস্ত মন্ত্রশিষ্য হইয়া—অসহযোগ মত প্রচার করেন অসহযোগব্রত গ্রহণ করেন।—১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিপুল—উপার্জ্জন তুচ্ছ করিয়া ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় ত্যাগ করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ধনঞ্জয় ভারতের রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্র অবতীর্ণ হইলেন। পশ্চাতে তুলসী পত্রে মাত্র তুষ্ট নরনারায়ণ—মহাত্মা গান্ধী—গদাপাণি ভীম—মৌলানা সৌকত আলি মহাত্মার পার্শ্বরক্ষী—ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকীও আসিয়া জুটিল। ক্রমশঃ অভিমন্যুর দল আসিয়া ব্যূহে প্রবেশ করিল। তাহাদের অবশ্যম্ভাবী পতন হইল বটে কিন্তু একা পার্থ—ডিয়ার্কি—জয়দ্রথের" সংহার করিলেন—"না যাইতে অস্তাচলে ঐ দিনমণি," সে কথা পরে বলিতেছি।

সরকারী আইন জারী হইল। চিত্তরঞ্জনের প্রাণে তিলমাত্রও শঙ্কা নাই। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে দেশব্যাপী হরতালের আয়োজন করিলেন। রাজশাস্ত্রীর লৌহবন্ধনে চিত্তরঞ্জনকে বাঁধা পড়িতে হইল—অম্লান হাস্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারাবরণ করিয়া লইলেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া চিত্তরঞ্জন স্থির করিলেন—শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিয়া অসহযোগ মন্ত্রে দেখাইতে হইবে—যে এই সংস্কৃত শাসন-তন্ত্র স্বপ্ন-রচিত মায়া-প্রাসাদ। ইহার ভিত্তি নাই, স্থায়ী নাই। প্রাণে স্বরাজ্য দল গঠন করিয়া আপনি তাহার নায়ক হইলেন, তিন তিনবার মন্ত্রী বেতন নাকচ হইল। বাঙলায় দ্বৈতশাসন চলিল না—ভারত-সরকার বাঙ্গলার শাসন পরিষদের হাত হইতে হস্তান্তরিত বিভাগ তুলিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্পোরেসন স্বরাজ্য-দল দখল করিয়া লইল। চিত্তরঞ্জন কলিকাতার "মেয়র"—মনোনীত হইলেন। কর্পোরেশনের সাহায্যে তিনি দেশের গৌরব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল। ভগ্নস্বাস্থ্যেই তিনি স্বভাব-মধুর স্মিতহাস্যে বিনিদ্র অক্লান্ত ভাবে দেশ মাতৃকার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেহ এত ভার আর সহিতে পারিল না ইতি পূর্ব্বেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার সর্ব্বস্ব দেশকে সমর্পণ করিয়া সম্বল-রিক্ত সন্ন্যাসীর তপ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপত্নী,—নিঃস্ব, বৈরাগী তাঁহার এযুগের "সাবিত্রী," বাঙ্গলার "চিন্তা" শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে লইয়া স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং শৈল-শিরে উপস্থিত হইলেন।

১৯২৫ সাল—১৬ই জুন বিকাল প্রায় ৫॥০ টায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, অতর্কিতে চিত্তরঞ্জন মহাপ্রয়াণ করিলেন। বাসন্তী দেবী আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মূর্চ্ছা তোমার ভাঙ্গিতেই হইবে পতিব্রতা, চক্ষে তোমার অশ্রুর নিস্যন্দ নামাইয়া—কাঁদিয়া আকুল হইবার অবসর তো-তোমার নাই। মৃত্যুর দেশ হইতে স্বামীকে ফিরাইয়া আনা চাই। উঠ সাবিত্রি—কটীতে অঞ্চল বাঁধিয়া অগ্রসর হও—যমের সহিত—শমনের সহিত তোমার সংগ্রাম করিতে হইবে। এস, তোমার স্বামীর পরমাত্মা জীবন্ত করিয়া—বাঙ্গলার ঘরে ফিরাইয়া আন ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে সেই শক্তিমানের শক্তি প্রতিষ্ঠা কর শক্তিময়ি, তোমার নয়ন প্রান্তের মুক্তাবিন্দুটী শতমণি প্রভায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া—সান্ত্বনার অমৃত লইয়া এস—আশার হাসি লইয়া এস—তোমার পবিত্র মধুর হাস্যে বাঙালীর অবসন্ন ভগ্নহৃদয় নব আশায় উজ্জীবিত হইয়া উঠুক।

১৮ই মৃতদেহ কলিকাতায় আনিয়া কেওড়া তলার শ্মশানে ভস্মীভূত করা হয়। জাহ্নবী তীরের এ শ্মশান,—বাঙ্গালি, তোমার স্বর্গ, তোমার তীর্থ।

লক্ষ-কোটী লোক সাশ্রুনয়নে শবের অনুগমন করিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কেউ গৃহে থাকিতে পারে নাই। ইংরাজ অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে—পারসী অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে। ধনী অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে—মজুর অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে—সারাদেশ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

চরিত্র-বিশ্লেষণ।

বিশ্ব তাহার চলার পথে থামে না;—পথে সে ক্রমশঃ অগ্রসর হয় আর তার বিকাশের মুখে অতীত কাল অনাদির কোলে হারাইয়া যায়—অনাগত আর অজ্ঞাত থাকে না—বর্ত্তমান মূর্ত্তিমান হইয়া ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট করিয়া আনে—যুগ যায় আবার যুগের সৃষ্টি হয়। যুগেরই ধর্ম্মে জাতি গড়িয়া উঠে—তাহার পুরাতন—প্রাচীন হইয়া পড়ে—নূতনের গঠন

অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন বলিয়া—জাতি ব্যগ্র হইয়া উঠে ;—এই গঠনের প্রয়োজনেই কর্ম্মীরা জন্ম গ্রহণ করেন। নিখিল ধারা পরিবর্ত্তনের মূলে—এই একই সূত্র নিত্যকাল হইতে কাজ করিয়া আসিতেছে। এই নিয়মেই—ভল্‌টেয়ার, রুসো, রোবেসপিয়্যার, গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনি, স্যাভোনারোলা, খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, পার্থ, শ্রীকৃষ্ণ, ম্যাকস্বুইনি, ডিভ্যালেরা, লেনিন-জগলুল ইত্যাদি মহা-মানবেরা দেশে দেশে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মীদের সকলের বাণী এক নয়—কর্ম্মের ক্ষেত্রও এক নয়। একই লক্ষ্যে হয় তো দুই বা বহু বীর কাজ করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের গতি-ছন্দের এক একটা পৃথক-ধ্বনি, সাধনার বিভিন্ন-প্রণালী দেখা গিয়াছে। ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লবের নায়কেরা যে পথে চলিয়াছেন—রুশীয়ার বলশেভিক নেতারা সে আদর্শের অনুসরণ করেন নাই—ডিঃ ভেলেরা যেমন করিয়া লড়িয়াছেন—ভারতে তেমনি করিয়া যে সংগ্রাম চলিতে পারে না। খৃষ্ট আর শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য—ধর্ম্মের সংস্থাপন হইলেও পথ নির্দ্দেশ এক নয়। বুদ্ধ আর লেনিন—দুই জনেই মুক্তির ভিখারী—কিন্তু মুক্তির মূলটা কি দুই জনের এক ? বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন আত্মার মুক্তি—আর লেনিন্ চাহিয়াছিলেন—রাজ-শাসনের বন্ধন হইতে মুক্তি।—লেনিনের শ্রেণীর জন-নায়কেরা বলিবেন—যে আত্মার আত্মস্বত্ত্বা বুঝিবারই স্বাধীনতা ও সামর্থ্য নাই—সে আবার তার নির্ব্বান মুক্তি চাহিবে কি করিয়া। প্রথমে তোমাকে মুক্ত কর—তারপর আত্মার মুক্তি। আবার জাতির মুক্তি আনিবার জন্য যে পথে লেনিন চলিয়াছিলেন—সে পথে চলিলে ভারতীয় নেতার পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী,—তপস্যা তার ব্যর্থ হইবে। আয়ল'ণ্ডের বিপ্লববাদ বাঙলার আবহাওয়ায় বাড়িবার বস্তু নয়। তাই—ভারতের যুগাবতার—বুদ্ধ, চৈতন্য—এ যুগের মহাত্মাগান্ধী, চিত্তরঞ্জন।

চিত্তরঞ্জন অতি শক্তিমান জননায়ক কিন্তু বাহুর সাধনায় এ শক্তি তিনি লাভ করেন নাই। তাঁহার শক্তির উৎস ছিল তাঁহার মনে—হৃদয়-দানের মা-ভৈঃ বল লইয়া তিনি বিশ্বজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। সে জয়-যাত্রার মধ্যে কোনো কৃচ্ছ্রতা, কোনো চাতুরী ছিল না—কোনো ব্যথা বা আঘাত দিয়া তিনি চলেন নাই—আহত হইয়া বেদনাকেই মহিমা বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন।—তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়—

১। বিরাটের স্বপ্রকাশ।

২। সার্ব্ব-জনীন প্রেম।

৩। মুক্তির ব্যগ্রতা।

ছোট যাহা, সঙ্কিপ্ত, গণ্ডীবদ্ধ যাহা—চিত্তরঞ্জনের পরিপার্শ্বেও তাহার স্থান ছিল না। আপনার ব্যাপক অন্তরের মধ্যে তাঁহার যাহা কিছু বাসনা কামনা, প্রার্থনা সাধনা—তাহাকেই তিনি বিরাট আকারে গড়িয়া লইয়াছেন। ভিক্টোরহুগো যাহাকে বলিয়াছেন—"ইমেনসিতে"—মহানের বৃহতের স্বপ্রকাশ—বিরাটের বৈচিত্র—চিত্তরঞ্জনের জীবনে আদ্যন্ত সেই বৈচিত্রের খেলা চলিয়াছে। তিনি প্রিয়ার কানে গান শুনান নাই, গোলাপকে ডাকিয়া তাহার কুঞ্জবনে অতিথি করিবার জন্য ততবড় ব্যগ্র ছিলেন না।—তাঁর অতি ভারাক্রান্ত বন্দী অন্তরাত্মার সর্ব্ববন্ধনহীন মুক্তির সাধনায়—আদি অন্তহীনা বিশাল উদার সাগরের কানে তাঁহার ব্যথ-বুকের অনন্ত সঙ্গীত শুনাইতে বসিয়াছিলেন। তখনই কিন্তু—সাগরের উর্ম্মি-মুখর বক্ষের উচ্ছসিত গুরু গর্জ্জনে অজানা কোনো অনন্ত-লোকের আশাবাণী শুনিতে পাইয়া তাহারই বর্ণে বর্ণে ছন্দে ছন্দে আপনার হৃদয় গাঁথিয়া লইলেন। "সাগর সঙ্গীতের" মন্ত্রবাণী কবির কণ্ঠে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল—

আজি তব গান—
অন্তহীন দিশাহারা উন্মাদের মত
আমার হৃদয় তলে গরজে সতত,
তবে এস, ভেসে এস উন্মাদ আমার
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব ডুবিব আজি প্রলয়-আভাসে,
মরণ আঁধার ভরা আকাশে বাতাসে।"

মহাবীর মরণকে বরণ করিয়া লইলেন।

চিত্তরঞ্জনের চরিত্র যে তিনটী মহীয়ান ত্রয়ীর স্বপ্রকাশ আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ছন্দ, জ্যোতিষাদি যেমন—বেদাঙ্গ ঐ তিনটি ঐশ্বর্য্যের মূল হইতে তেমনি তাঁহার ত্যাগ, অমানুষিক সহিষ্ণুতা, দৈব প্রতিভা, অকৃপণ দান-বৃত্তি-প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। সহজ, সংযত সীমাবদ্ধ যাহা—স্বার্থের কলুষ সেইখানেই কলঙ্কিত হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু সীমাকে এড়াইয়া যাহা অসীমে ছুঁতে চায়—ক্ষুদ্রকে ঘৃণা করিয়া যাহা বৃহতের পূজা করে -অবিদ্যাকে যে বিদ্যা

অপমানে জর্জ্জরিত করিয়া রাখে—মাথা তুলিতে দেয় না সেখানে সবই মহীয়ান ;—নিষ্কলঙ্ক পুণ্যের অভিব্যঞ্জনায় তাহা শুভ্র-সুন্দর, একটা গরিমাদৃপ্ত তপঃশক্তি কোনো কল্পলোকের পুণ্য পুলকে তাহার মধ্যে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে—তাহার মহীয়ান আত্ম গৌরবের কাছে অতি গরীয়ান অভিমানও উন্নত-শির অবনত করিয়া আনে—কিন্তু মলিনিমায় অসিত হইয়া যায় না।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন এই বিত্তের অধিকারী—এই স্বর্গীয় দীপ্তি তাঁহার চিত্ত-লিপিকায় একটা অপরূপ আলোছায়া লীলায়িত করিয়া দিয়াছিল। ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করিয়াছেন যখন—বৈরাট্যের জয় তূর্য্য সঘন-নিনাদিত হইয়া সঙ্কীর্ণতার স্বার্থান্ধ লাঞ্ছনা তখন উদার সম্প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে অতি দানের মহাভারে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে।

এখন দেখা যাউক চিত্তরঞ্জনের এ সকল বৃত্তির মূল ছিল কোথায় ? তাহার সূত্র আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি—

১। বংশ-রক্ত।

২। পিতার সদ্‌গুণাবলী।

৩। তাঁহার উত্তরাধিকার।

১। ভুবনমোহন পরম দাতা ছিলেন। নিজের সকল অর্থ তিনি দুই হস্তে বিলাইয়াছেন—দানে তথাপি তাঁহর তৃপ্তি হয় নাই, ভুবনমোহন দানের জন্য ঋণ করিয়াছেন।

২। ভুবনমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এবং নৈষ্ঠিক আধুনিক ব্রাহ্ম ছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাটা ভুবনমোহনের ভুল হইয়াছিল কিনা—আমরা সে বিচার করিতে বসি নাই কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মধ্যে একটা দৃঢ় সতেজ মনের পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ মনও বিদ্রোহীর মন। প্রচলিত কুপ্রথাগুলি যে যুগে সমাজের অঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া সমস্ত তন্ত্রটাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সেই যুগে আবির্ভাব। কেশবচন্দ্র দেখিলেন জাতিভেদ সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিরোধ আনিয়া ক্রমশঃ এককে অপর হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবে। এই কয়েকটী প্রথার করাল গ্রাসের মধ্যে পড়িলে দেশের জনশক্তি অতিশয় হীন হইয়া পড়িতে কালমাত্র বিলম্ব হইবে না। বিদেশ আপনাদের উদারতায় তোমার আপনকে তাহাদের করিয়া লইয়া আপনারা বলীয়ান হইয়া উঠিবে। সমাজের আর একটা বিত্ত নারী। কৃপণের মণি-

মঞ্জুষায় নিহিত ধনের মত তাহা তোমাদের সমাজেও নিহিত হইয়াই রহিয়াছে—তেমন কিছু প্রয়োজন দেশের কিছু সত্যকার কল্যাণ ভারতীয় নারী দিয়া কিছুই সাধিত হইতে পারিতেছে না। নারীরও যে একটা স্বপ্ন আছে তাহাকে তাহা বুঝিতে দাও। সেও যে শক্তিমতী—একথা বুঝিবার অবসর দিতে যদি তুমি আপত্তি কর—যদি তাহাকে অন্ধ করিয়া অন্ধ কারায় আবদ্ধ রাখিতে চাও তাহা হইলে তোমাদেরই ভবিষ্যৎ বংশাবলীর জন্য বন্দীশালা নির্ম্মিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এই যে একটা অতি বড় দিক ছিল দেশ তাহার কুসংস্কারের বশে সে দিকটাকে বিচারেই আনে নাই। সমাজ দেখিল ইহারা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে—কেশব সেনী খৃষ্টানী ঢংএ বাঙলা বুঝি রসাতলে গেল। অবশ্য একথাও আমি স্বীকার করি—সে যুগের যুগাবতার সেই সকল ধর্ম্মনেতাও মানুষকে, জাতিকে এ কথা তেমন করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ করেন নাই—যেমন প্রাণ ও প্রভূত চেষ্টা করা উচিত ছিল ততখানি চেষ্টা ততখানি মহান্ ত্যাগ, করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন করিবার অবকাশ আছে।

যদি প্রশ্ন উঠে—ধর্ম্মের সঙ্গে—রাজনীতির কোনো সংস্রব আছে কিনা? আমি বলিব অতি অবশ্য আছে। ধর্ম্ম সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে—সমাজ লইয়াই রাজত্ব সুতরাং সমাজতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা অর্থই—রাজনীতি। আত্মার জন্য ধর্ম্ম পুষ্টি লইয়া আসে এ কথা যেমন সত্য—জীবন,—তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবন-যাত্রার বিধি নির্দ্দেশ,—এ সকলেরও মূলে—ধর্ম্ম, ইহারও বিকাশের উপর ধর্ম্মের প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান।

ভুবনমোহন প্রভৃতি সে যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি বর্ত্তমানটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যতখানি খেলিয়াছিল তার চেয়ে বেশী খেলিয়াছিল—ভবিষ্যতের বাঙ্গলা গড়িয়া তুলিবার ভাবনায়। রক্ষণশীলতাকে অতীতের বস্তু বলিয়া ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের জীবনের মন্ত্রে সমাজকে দীক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন।

অদ্যকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইহাই মূল কথা। মহাত্মা গান্ধীর জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে এ সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ছুঁৎমার্গ যে বিষের মত তোমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড়, নিস্তেজ, অবসাদগ্রস্ত করিয়া আনিতেছে—মহাত্মা পুনঃ পুনঃ সে কথা ঘোষণা করিতেছেন। যদি সকলে এক না হয়—তাহা হইলে ভারতের মুক্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

চিত্তরঞ্জন পিতার এই ধী, এই দূর-দর্শন,—সেই মহীয়সী চিন্তার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ, গণ্ডী জ্ঞান তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন আচণ্ডাল সকল জাতিকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিলেন। সার্ব্বজনীন প্রেমের মহাজ্ঞানই তাঁহাকে আপামর সাধারণের নিজস্ব, আপন করিতে পারিয়াছিল। প্রেমে চিত্তরঞ্জন বৈরাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার এক তন্ত্রীর সুর রাগ মৃদঙ্গের মহাতালে ধ্বনিত হইয়া বিশ্বে কেবল কোল বিলাইয়া ফিরিয়াছে। সে প্রেম বিচার করে নাই, পাপীকে ঘৃণা করে নাই—ভ্রান্তকে ভৎর্সনা করে নাই—সকলকে শুধু টানিয়াছে—বুকের কাছে রাখিয়া মর্ম্মের উপর তুলিয়া—পিতার স্নেহ পুণ্যে—যে আসিয়াছে তাহাকেও বরণ করিয়াছে যে আসে নাই—তাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে। তাই তাঁহার স্বরাজ্যদল—সকল হইতে স্বতন্ত্র অথচ জনশক্তিতে পুষ্ট পেশল, শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রেমেই—শ্রীযুক্ত হেমন্ত সরকারকে প্রথমদিন বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়াই সর্ব্বত্যাগী হরিশ্চন্দ্র তাঁহার শ্মশানের সঙ্গিনী শৈব্যাকে বলিয়াছিলেন "বাসন্তি আজ তোমার আর একটী ছেলে এসেছে"—ইত্যাদি। এই প্রেমেরই প্রবাহে—গোপীনাথের মহাপাপের দিকটা তাঁহার বিচার-নীতি হইতে ভাসিয়া গিয়াছিল। এই প্রেমেই তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন।

প্রথম যেদিন ত্রিশ হাজার পরের সন্তান—তাহাদের শিক্ষার সাধনাগার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল—প্রেমিক-নেতা চিন্তান্বিত হইয়া ছুটিলেন। অসুস্থ দেহেও—স্যার পিঃ সি রায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া এই ত্রিশ হাজার সন্তানের জন্য তাঁহারই সুধী হৃদয়ের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ভিখারী চিত্তরঞ্জন করযোড়ে দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"উদ্ধার করুন,—পরের সন্তান আজ আমাকে আপন বলিয়া ডাকিয়া—আমারই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে—উপায় করুন—ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন—আমার শেষ সম্বল বাসগৃহখানি বিক্রয় করিয়া বিত্ত-রিক্ত আমি লক্ষ মুদ্রা আপনার হস্তে দিতেছি—ধরণীর আমি—ধুলিমুষ্টির আমি—উদার আকাশের নীচে—পত্নী, পুত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইব—এই ত্রিশ হাজার সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। ঋষি আচার্য্য, জাতীয় যজ্ঞের এ মহা হোমে হোতা হইবেন—আসুন। এ কথা কি সাধারণ প্রেমিক সহজ প্রেমে কেহ বলিতে পারে? এ ত্যাগ কি মুহূর্ত্তে কেহ করিয়া বসিতে পারে? এ শুধু চিত্তরঞ্জনই পারিয়াছিলেন—আর তাই ভারতের ছাত্র সম্প্রদায়—তাঁহার

মহ মনুষ্যত্বের পূজা দ্বারে—আপনাদিগকে বলির জন্য উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

তাঁহার দান বিধি মানিত না—বাধা-নিষেধের মানা শুনে নাই—মর্য্যাদা বা প্রয়োজনের তুলায় মাপিয়া দেয় নাই,—দিয়া—একবার ভুলিয়াও তাহার নিকাশ কসিয়া দেখে নাই। কর্ণ, দধিচী, শিবী যদি ছিলেন সে যুগের—এ যুগের তাহা হইলে চিত্তরঞ্জন। পুরাণ মহাভারত যদি সে সকল দানবীরের কাহিনী বক্ষে তুলিয়া রাখিয়া থাকে তবে ভারতের ইতিহাসও এ মহাপুরুষের মহাদানের মণিময় কিরীট আপনার গৌরবান্বিত শিরে ভূষণ করিয়া পরিবে।

অক্লান্তকর্ম্মী কর্ম্মক্ষেত্রে নিশিদিন শুধু কাজ করিয়া গিয়াছেন। নিদ্রাকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—ক্ষুধা তাঁহাকে কাতর করিতে পারে নাই—দেহের অবসাদ তুচ্ছ করিয়াছিলেন—আসন্ন মৃত্যুকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া দূরে রাখিয়াছেন—এই মহাকর্ম্মীর বিরাট কর্ম্ম-সাধনার সম্মুখে নিখিল বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে আঁখি বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ছিলেন বাঙালীর চিত্তনায়ক—ভারতের আদর্শ নেতা। সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা, ত্যাগ-পূত বিভূতির মূল্যে ভারতের মুক্তি ক্রয় করিতে হইবে। চিত্তরঞ্জন আপনার কর্ম্মে তাঁহার মরকতোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন—এই মহাবাণীতে ভারতে মুক্তির মন্ত্র ধ্বনিত হইল।

ভারতের প্রাণে তিনি আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাঙালীকে তিনি জাতীয় জ্ঞানের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যে জাতির দেশাত্মবোধ হয় নাই—চিত্তরঞ্জন বুঝাইয়াছিলেন—বিশ্বে সে জাতির স্থান নাই। হৃত-গৌরবার হারা-স্বাধীনতা তিনি ফিরাইয়া আনিয়া মণিমালায় মায়ের কণ্ঠাভরণ গাঁথিয়া দিবার জন্য আমরণ সংগ্রাম করিয়াছেন—সে শ্রম তাঁহার আজ মৃত্যুতে সার্থক হইল। আকণ্ঠ হলাহল পান করিয়াও নীলকণ্ঠ আজ ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিলেন। জাতির সুপ্ত চক্ষুর পত্র উন্মীলিত করিয়া নব জাগরণে তাহার প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। দীনের দুঃখে—তাঁহার দারিদ্র্য ব্রত, দুঃখীর সেবায় তাঁহার নারায়ণ পূজা, আত্মদানের রক্তধারা সে পূজার তুলসীচন্দন। দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্রাটের সন্ন্যাস! শেষে বসনের ভারটুকুও অসহ হইল। চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বসনের ভার সইতে নারি!"

"আজ আমারে নেংটা কর ওগো আমার মনের ধন।"

স্বর্ণস্তূপের উপর—যিনি শয্যা রচনা করিতে পারিতেন—ধূলিতে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন—মুক্তা খচিত উপানহ যাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া ধন্য মানিত নগ্নপদে তিনি ভিখারীর কণ্ঠালিঙ্গন

করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—অভিযুক্তের জন্য কারামুক্তির ছাড় পত্র যিনি বক্তৃতায় দাবী করিয়া লইতে জানিতেন—দেশকে ভালবাসার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া স্বয়ং স্বেচ্ছায় সেই কারা-বরণ করিয়া লইলেন। ইহা, মহান, বিরাট, মহিমময়। সমস্ত জীবনটা চিত্তরঞ্জনের একটা মহিমান্বিত লাঞ্ছনা—মৃত্যুতে তাহা সে প্রসারিত ললাটে গঙ্গা-মৃত্তিকা গৈরিক অনুলিপ্ত তিলক হইয়া রহিল। আজ স্বর্গের আহ্বান—তাঁহার বরণ অভিনন্দনের বাণী আকাশে বাতাসে প্রাণে প্রাণে প্রতি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—

"রাখ রথ শান্ত হও! ওগো রণ শ্রান্ত,
হে মোর বিজয়ীবীর, হে আমার ক্লান্ত।"

বঙ্গবীর দেহ রক্ষা করিলেন—রথের গতি তাঁহার শান্ত হইল।

৪। শোক-তর্পণ।

পূজনীয়া বাসন্তী দেবীকে মহাত্মার প্রথম তার—"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। বিহ্বল হইও না। খুকী যেন অতি শোকে মুহ্যমান না হয়। আমি কলিকাতায় ফিরিতেছি।"

মহাত্মাজীর কথা—"বুকের উপর যখন গভীর ক্ষত টাটাইয়া উঠে লেখনী বিদ্রোহী হইয়া চলিতে চায় না। আজ দেশবন্ধু শুধু কত মহৎ ছিলেন—তাই বুঝিলাম না—বুঝিলাম তিনি কত মধুর ছিলেন। ভারত তাহার শিরোমণি হারাইয়াছে কিন্তু আমরা স্বরাজ লাভ করিয়া সে মণি ফিরিয়া পাইব।"

মহম্মদ আলির পত্র—কাঁদিতে পারিবে না ভগিনি, আমি যে আজ প্রিয়হারা,—অনার্দ্র চক্ষুতে সান্ত্বনা দিয়া আজ আমার ভাঙা হৃদয় তোমারই জুড়াইয়া দিতে হইবে।"

ভাইসরয়ের তার—"এই মাত্র গভীর শোকাহত হৃদয়ে আপনার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম। এই শোকে আমার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত জে এম সেন গুপ্তকে ষ্টিফেনসনের পত্র—"তাঁহার চরিত্রে ক্ষুদ্র কিছু হীন কিছু ছিল না। তাঁহার অভাবে বাঙলা আজ কাঙাল।"

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর তার—"সহ্য কর বোন। আমাদের শোক দুঃসহ ; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। দীর্ঘ পথ চলিতে নিতান্ত অশক্ত একটু সুস্থ হইলেই তোমার কাছে যাইতেছি।"

রবীন্দ্রনাথের তার—"দেশের ক্ষতিতে আমার খেদ আর তোমার শোকে আমার সমবেদনা।"

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গুপ্তের তার—"গভীর আহত। আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামীর তার—"বজ্রপাত তুল্য হৃদয়-ভাঙা সংবাদ। সমস্ত ভারতবর্ষ আপনার সঙ্গে কাঁদিতেছে। শ্রদ্ধাপূর্ণ শোক জ্ঞাপন করিতেছি।"

মহাত্মা অ্যানড্রুজের তার—গভীর শোকে আহত হইলাম। আপনার স্বামী তাঁহার শেষ সম্বল দেশকে উৎসর্গ করিলেন।

পণ্ডিত মালবীয়ের তার—"সংবাদে ব্যথিত হইলাম। আপনার এ ক্ষতি সারা দেশেরই ক্ষতি। যেদিন তাঁহাকে দেশের বড় বেশী প্রয়োজন সেই দিন ভগবান তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ভগবান এ গুরু দুঃখে আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিন্।"

রাজা গোপালাচার—"জাতীয় ক্ষতি কথায় প্রকাশ করা যায় না।"

লালা রাজপৎ রায়—"ভারত তাহার এক শ্রেষ্ঠ সন্তান হারাইল।"

স্যার সুরেন্দ্রনাথের পত্র—"আমার মর্ম্মানুভূত শোক-প্রকাশ গ্রহণ করুন।

মিঃ গার্ভিনের কথা—"এ শোকানুভব আমরা শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত অনুভব করিব।"

শ্রীমতী নাইডু—"রাজা চলিয়া গিয়াছেন—ভারত তাই শোকে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ছিলেন দানে রাজা—ত্যাগে সম্রাট। তাঁহার প্রেম উজ্জ্বল বর্ত্তিকার মত আমাদিগকে স্বরাজের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।"

মোহন যোদ্ধা। (ইংলিসম্যান)—"তাঁহার আত্মীয় এবং যে রাজনৈতিক দলের তিনি নেতা ছিলেন তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের অকৃত্রিম আন্তরিক সহানুভূতি এবং যে গুরু ক্ষতি আজ ভারতবর্ষের হইল সে জন্য আমাদের সমবেদনা।"

আমাদের সহিত দাস সাহেবের অনেক দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চলিয়াছে কিন্তু তাঁহার মতের জন্য বরাবর তিনি মোহন যোদ্ধার মত লড়িয়াছেন। সে যুদ্ধে তাঁহার বিপক্ষতা করিয়াছি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—শ্রীযুক্ত দাস সর্ব্বশেষ ব্যক্তি যিনি আমাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিবেন।"

সমস্ত পৃথিবী চিত্তরঞ্জনের অভাবে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে। তাহার সকল কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আজ তাঁহার পুণ্য স্মৃতির তর্পণ দিনে আমাদের বিনীত নত' সজল ব্যথিত প্রণাম নিবেদন করিতেছি। তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বর্গ হইতে আমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। সে আত্মা পুণ্য হউক, তৃপ্ত হউক; পূর্ণ হউক—মধু হউক।

কুচবিহারে—কুচবিহারেও তাঁহার স্মৃতিপূজা ও আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ১লা জুলাই শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে এক শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যোগেন্দ্রবাবু চিত্তরঞ্জনের জীবন কি শিক্ষা দেয়—এই বিষয় যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে একটী সুবর্ণ পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কুচবিহার সাহিত্য-সভা এ রচনার বিচার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পদকটীও বিতরণের জন্য সভার হস্তেই দেওয়া হইবে।

স্বরাজ-নায়ক।

—:*:—

দীর্ণ করি' দেহবন্ধ হিমাচল-শৈলের শিখরে
লব্ধমুক্তি স্বরাজ-নায়ক
ছড়ায়ে পড়েছে আজি ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে
সজ্জিত সেনানী-তূণে ভরে দিতে শক্তির শায়ক;
কে বলে সে ছেড়ে গেছে ঝেড়ে ফেলে দায়িত্বের ভার?
কে বলে সে চলে গেছে ব্যর্থকাম—ফিরিবে না আর,
কে বলে সে মহাপ্রাণ নাচিয়া আসেনি প্রাণে প্রাণে,
কে বলে রে দেশবন্ধু লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের টানে
মেশেনি দেশের দীপ্ত প্রাণে?
নেভেনি সে হোম-শিখা—জ্বলিয়াছে আরো সমুজ্জ্বল,
প্রাণদানে বাঁচাইতে ধ্যানের ভারতে তা'র
দ্বারে দ্বারে ফিরিছে সে প্রাণবায়ু বিলায়ে নির্ম্মল।

(২)

ছুঁড়ে ফেলি রাজদণ্ড,—প্রেমে বাধি' প্রাণমন খুলে
আপনার জনগণে বিতরিতে মুক্তির আস্বাদ,
নৃপতির এ আদর্শ,—যে-ভারত ধরিয়াছে তুলে
ঘুচাতে জগত হ'তে রাজশক্তি-গর্ব্বের বিস্বাদ,
সেই ভারতেরি শিষ্য, বাঙালী-সন্তান, দেশের স্বরাজ-দলপতি
মরেনি রে বেঁচে আছে, দেশেরি কামনা-মাঝে
বুকে বুকে বিকীরিয়া জ্যোতিঃ।
আনন্দের অশ্রুবাষ্পে, রুদ্ধ আঁখি দেখিতেছি তাই
তুচ্ছ করি' জাতি বর্ণ, তার পুণ্যস্মৃতিতীর্থে দ্বিধাশূন্য মিলিল সবাই
এক বৃন্তে ফুটে-ওঠা পুষ্পগুচ্ছসম, ভাই ভাই!
সর্ব্ব সম্প্রদায় হ'তে দিল তা'রে শ্রদ্ধার অঞ্জলি
করিল রে অভিষেক প্রাণ-গলা আঁখি-জলে
"তুমিই প্রাণের রাজা" বলি'।

(৩)

যে শিরে মুকুট শোভে, রাজশক্তি সেথা আজ নাই।
আছে—তাহা আছে,
দেশপ্রাণ, দেশবন্ধু, স্বাধীন, অমর ঐ সদ্যমুক্ত প্রাণবেগ মাঝে।
শত-শোকসভাতলে দাঁড়ায়ে হৃদয়-বিদ্ধ তাই আজ দেখিতেছি আমি,
সেই মহাপ্রাণ-বেগ হিমাদ্রি-শিখর হ'তে শতধারে আসিতেছে নামি'
ভারতের সমতলে; বক্ষে বক্ষে ঢালি' উর্ব্বরতা,
সমভূমি ক'রে দিতে ভেদ-ভিন্ন হিয়াগুলি, ধুয়ে মুছে সকল ক্ষুদ্রতা।
উঠিতেছে ফুটিয়া রে :চিত্তরঞ্জনের সেই আলোকিত চিত্তের রঞ্জন
বর্ণে বর্ণময় করি' সাজাতে স্বদেশে তা'র,—করি' [illegible] সমস্যাভঞ্জন।

আত্মতেজে বিদারিয়া ভঙ্গুর অঙ্গের কারাগার
বাহির হয়েছে পথে অনঙ্গ সে নেতা আজ
অঙ্গে অঙ্গে করিতে যে চেতনা সঞ্চার।

(৪)

ধ্যানে কবি আঁকে ছবি, প্রাণ তারে দেয় শ্রদ্ধাবান্;
আপন জীবন ধরি' কবির ইঙ্গিতগুলি, দৃষ্টান্তেরে করে জন্মদান
সেই নিত্য,—যে জানে সন্ধান।
জীবন্ত সে দৃষ্টান্তের সমুত্থিত পতাকার তলে
লোকারণ্য-নীড় ত্যজি' ভিড় করি' জনগণ সমবেত হয় দলে দলে।
ত্যাগ, প্রীতি, আত্মনিষ্ঠা, স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে জীবন্ত অটল প্রতীক
চিত্তরঞ্জনেতে ফুটি' পথভ্রান্ত পথিকেরে দেখাইয়া গেল আজ দিক,
ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল স্মৃতি তা'র গাঁথা হয়ে রবে চিরদিন,
বর্ষে বর্ষে জাগাইতে নব নব সাধকেরে রহিবে তা' দীপ্ত, অমলিন।
আজ শুধু এই চিত্রে শ্রদ্ধাভরে করি' নমস্কার
অবিশ্রান্ত সুরে আর অনির্ব্বাণ গানে
যেথা হতে উঠিতেছে যোগাসনা ভারতীর মর্ম্মের ঝঙ্কার
কোটী কোটী আদর্শেতে জ্বলি'
যুগে যুগে মানবেরে অমৃতের পথ দিতে বলি'।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

নিবেদন।

শ্রাবণ ও ভাদ্রের মাসকাবারী একত্র ভাদ্রে লিখিব।

ক্ষমাপ্রার্থী—চক্রবর্ত্তী।

(নব পর্য্যায়)
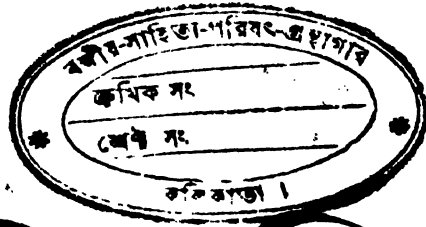
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ

৯ম বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩৩২ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

অসম্পূর্ণ যৌবন।

ছিন্নতন্ত্রী বীণাযন্ত্রে ছন্দহীন সঙ্গীত বোধন
ফিরে কেন জাগালে যৌবন !
পুরাতন ভগ্নস্তূপে অতীতের স্বপ্ন-আবরণ,—
রচি' বৃথা মায়াজাল আরবার করিলে মোচন ;
ভগ্নস্তূপে ঢেলে এলে যেন কোন্ পরশপাথর—
পুনর্ব্বার তাই বুঝি অন্বেষিতে হইলে তৎপর
সন্ধ্যার আলোকে ;
অরুণের পূর্ব্বরাগ রচিলে আজিকে
অপূর্ব্ব পুলকে !

কবে কোন্ ধ্যানরত সন্ন্যাসীরে করিলে স্পর্শন
অসম্পূর্ণ হে হত-যৌবন
তারি শাপ-বহ্নি লাগি' প্রভাতের যাত্রাপথে তব—
ভস্মে পরিণত হোল সীমাহীন অক্ষয় বৈভব ;—
অসম্পূর্ণ যাত্রা তব তাই বুঝি গিয়াছে মরিয়া—
মুঞ্জরিত শ্যামশাখা অকস্মাৎ গিয়াছে ঝরিয়া—
বসন্ত প্রভাতে !
গীতারক্ত আপনারে হেরিলে আপনি
আজি আচম্বিতে ?

কবে কোন্ যুগপ্রান্তে বসন্তের নিরুদ্দেশ মন
ছেয়েছিল তোমারে যৌবন !
সেদিন বন্ধন তব কেন জানি গিয়াছে টুটিয়া,
দীর্ঘ শীত-বক্ষ ভেদি' অন্ধকারে উঠিলে ফুটিয়া ।
সেদিন চৌদিক হ'তে দিগ্দিগন্ত দিয়েছিল ডাক—
সুপ্ত ধরিত্রীর কাণে শুনাইলে অমঙ্গল শাঁখ,
কৌতুক-চঞ্চল ;
বৈরাগ্যের তপোমন্ত্রে উড়ালে গগনে
গৈরিক অঞ্চল ।

রত্নপূর্ণ গুপ্ত কক্ষ দূর হতে সে কোন্ ভবন
ডেকেছিল তোমারে যৌবন !
সেদিনের পূর্ণপাত্র উচ্ছ্বসিল তোমার অন্তরে
হেরিলে অপূর্ব্ব সৃষ্টি নীলাকাশে কাননে প্রান্তরে ;
সেদিনের চিত্তাকাশে উজলিল নবজ্যোতিঃশিখা,
উৎসুক অন্তরে তুমি লিখেছিলে তেজঃ রক্তলিখা

আকাশের গায় ;
অকস্মাৎ বার্ত্তা তারি নিয়ে এলো বেগে
দক্ষিণের বায় ।

অন্তরে জাগিল কেন বন্ধনের সহস্র বেদন —
গতি স্তব্ধ ব্যাকুল যৌবন !
যেই জ্বালাময়ী বিষ পিয়েছিলে আকণ্ঠ পূরিয়া,
সে বিষের পানপাত্র মুহূর্ত্তে কি গিয়াছে চূর্ণিয়া ?
সহসা পথের মাঝে বাজাল কে ঝঙ্কার নূপুর
চকিতে চাহনি হানি' লাগাল কে বিস্ময়ের ঘোর—
নয়নে তোমার ?
অসমাপ্ত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বাজিল
করি' হাহাকার ।

সেদিনের সে উৎসবে আজি কেন করিলে বোধন
আরবার ব্যথিত যৌবন ?
আজিকার শিহরিত ধ্যানমগ্ন শীতের প্রদোষে
অতীত নূতন হয়ে অকস্মাৎ গেল হেথা মিশে ;
মুখরিত উৎসবের যাত্রা তবে করি আজ মিছে —
নিদয় বিধাতা কোন্ যৌবনের সমাধি রচিছে
অনিমেষ চোখে !
শীতল উত্তরবায়ু বারে বারে কর হানে দ্বারে
উৎসুক কৌতুকে !

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ ।

বয়াটে।

—*—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(দুই)

সাহেবের ঘরের ভেতর রূপ, রঙ, আসবাব আয়োজন একরকম ছিল না ব'ল্লেই হয়। ঘরের কোণায় কোণায় ঝুল আর মাকড়শার জালে ধুলো জ'মে, বুটী তুলে গাঁট বাঁধা সুন্দরীর সৌখীন হাতে বোনা ফ্রেমের রুমালের মত দেখাচ্ছিল। তাকেই এ ঘরের ছবি বা শিল্প-সাজ ব'লে ধরে নেওয়া চলে। তিন পায়ের একখানা টেব্‌লের ওপর বই, খাতা, দোয়াত-কলম, একটা ছোট ডাকে পাঠানো প্যাকিং বাক্স, দেশলাই—তার বারুদগুলো সব মাঝে মাঝেই ছ'ড়ে ছ'ড়ে উঠে গিয়াছে। হোলি বাইবেলের কালো বাঁধানোর ওপরটায় চায়ের পেয়ালা রাখার, বাদামী দাগগুলো গোল গোল হ'য়ে র'য়েছে। এক পাশে কোণা ভাঙা একখানা সসার—তার ওপর একরাশ ছাই আর সিগারেটের টুক্‌রো। এ ছাড়া আরো কত হিজি বিজি, আলাই বালাই—ই যে এলোমেলো হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে তার ঠিক নেই। গোল বেতের চেয়ারখানার পিছনকার পায়াটা লোহার পাত মেরে পুটিং দিয়ে আঁটা। হাত দুই ওসার একখানা তক্তাপোষ তার ওপর পাটনাই খেড়োর চিল্‌তে একখানা তোষক পাতা। মাদ্রাজী তাঁতের একখানা বিছানার চাদরে তোষক ঢেকে রাখ্‌বার চেষ্টা ফাঁকে ফাঁকেই ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে কারন চাদরখানা চার পাঁচ জায়গায় গোল হ'য়ে ছেঁড়া। ঘরের এক পাশে রান্না-বান্নার সব সরঞ্জাম। একটা কেরোসিনের বাক্সের ভেতর চাল, ডাল, তরকারী সব খিচুড়ী হ'য়ে মিশে র'য়েছে। ষ্টোভও আছে একটা—আর একটী "কুকার"। একটী টিনে কেরোসিন তেল। চালের বাক্সের পাশে একখানা তক্তার ওপর চায়ের তৈজস-পত্র। একটা চায়ের টিন। তার গায় বেঁকা, কাঁচা হাতের ছোট বড় হরফে লেখা লেবেল আঁটা র'য়েছে—"Best Darjeeling নীচে ব্র্যাকেটের ভেতর (Speciality—flavour)। বর্গার কড়ার সঙ্গে একগাছা নারকেলের দড়িতে খলের পোরা একখানা বেহালা ঝোলানো। আর একপাশে

দৈত্যের ছানার মত মাঝা মাঝি রকম বিরাট একটা কাঠের সিন্দুক। তার ভেতরে কি আছে কে জানে।

ন'বনে ঘরে ঢুকে এক মিনিটের ভেতর সব দেখে নিলে।

তার মনে হ'ল—এ সাহেবও বুঝি তারই মতন একটী "গাঁ তাড়ানো" স্নেহ হারানো মানুষ এক নম্বরের ভ্যাগাবণ্ড তবে তার মতন গরীব নয়। কিন্তু তা যদি হয় বেশ ;—দুজনে মিশ খাবে চমৎকার। ন'বনে এর ভেতরেই বেশ ভাল ক'রেই টের পেয়েছিল এঁর আর যদি কিছু না থাকে তাঁর প্রাণ আছে।

বাইরে তখন সন্ধ্যার আঁধার কালো হ'য়ে আসবার আর বড় বেশী দেরী ছিল না। সাহেব ঘরের ভেতর গিয়েই একটী ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেব্‌লের ওপর রেখে সিন্দুকের কাছে আস্‌লেন। তিনটে তালা মেরে আট্‌কানো তার ডালাখানা চাবি ঘুরিয়ে কুলুপগুলো খুলে টেনে উদ্‌লো ক'রে ফেল্‌লেন। ন'বনে দেখ্‌লো সিন্দুকের ভেতর—পোরা জিনিষ পত্র। সাহেব একটা গেঞ্জি আর একখানা কাপড় বা'র ক'রে ন'বনেকে দিয়ে ব'ল্লেন—"জুতো খোল, ঐ তেল র'য়েছে মেখে কলতলায় যাও, জল ধরা আছে বোধ হয় চৌবাচ্চায়—নেয়ে নাও— কাপড় ছাড়।"

ন'বনে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লো—"কোন দিকে কল? পাইখানা কোথায়?" সাহেব ব'ল্লেন— "নিজের বাড়ী—খুঁজে বার ক'রে নাও।"

ন'ব্‌নে আর কথা না ব'লে বাড়ীর ভেতরের দিকে উঠোনে বেরিয়ে গেল। এদিক ওদিক দু'একবার তাকিয়ে দেখেই টের পেলে কোথায় কল পাইখানা। যা কাজ ছিল সেরে নিলে।

স্নান সেরে ভেতরে এসে দেখে সাহেব তাঁর পোযাক ব'দলেছেন। প'রেছেন একটা ঢিলে পায়জামা—গায় ঢোলা আস্তিনের ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। পায় এক জোড়া লাল রঙের বার্ম্মা স্যাণ্ডাল। সাহেব পাম্প ক'রে ষ্টোভ জ্বাল্‌ছিলেন। কুকারটা আগেই ধ'রিয়ে তাতে রান্নাও তুলে দে'য়া হ'য়েছিল। ন'ব্‌নে ঘরে ঢুক্‌তেই সাহেব ব'ল্লেন—"এই সস্‌ প্যানটায় জল নিয়ে এস চা করা যাক্।

ন'ব্‌নের শরীরে স্নান আর আশ্রয় পাওয়ার আনন্দ নতুন একটা আরাম আর স্বস্তি প্রচুর পরিমাণে এনে দিয়েছিল। না খাওয়ার ব্যথাটা একটু আধটু তখনও পেটের ভেতর

টাটিয়ে উঠ্‌লেও কষ্ট তার একটুও ছিল না। সে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এল। চায়ের জল ষ্টোভের ওপর ফুটতে দিয়ে সাহেব উঠে এলেন—ব্যাগ খুলে কি কি ওষুধ ন্যাকড়া তুলো সব বার ক'রে ন'ব্‌নের পিঠের কাটাটা পাকা ডাক্তারী হাতে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে উপরের ছ'ড়ে যাওয়া জায়গাটায় টিন্‌চার আইওডিন চিত্র ক'রে লেপে দিলেন। ন'ব্‌নে ব'ল্ল—"ও অত কর্‌বার কি দরকার—আপনিই ক'মে যাবে।"

সাহেব ব'ল্ল—"না অসুখে সাবধান হওয়া উচিত—ব্যামোকে বাড়বার সুযোগ দিলে—সে প্রায়ই পেয়ে বসে।"

দুটো পেয়ালায় চা ঢেলে সাহেব ব্যাগের ভেতর থেকে একটা 'ফ্লাস্ক' বার ক'র্‌লেন। তাতে টাটকা দুধ তখনও গরম ছিল। ব'ল্‌লেন—"এ রাত্তিরের জন্যে জমিয়ে রেখেছিলাম তাই রাস্তায় বার করি নি।"

ব'লে সাহেব চায়ে দুধ মিশিয়ে দুটো আধ সেদ্ধ ডিম খোসা ছাড়িয়ে একটা নিজে নিলেন আর একটা ন'বনেকে দিলেন। চা খেতে খেতে সাহেব ব'ল্লেন—এখন একটা রুটিন তৈরি করা যাক—আমাদের কাজের। ঐ দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে এস। ন'ব্‌নে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে উঠে গিয়ে টুকটাক সব গুগিয়ে নিয়ে এল। বুড়ো ব'ল্লেন—"লেখ সকলবেলা ছটা।"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"হ্যাঁ সকলবেলা ছটা—"

"উঠে হাত মুখ ধোয়া এক্‌সারসাইজ ইত্যাদি।"

"হ্যাঁ হ'য়েছে লেখা "ব'লে ন'ব্‌নে আর এক চুমুক চা খেলে।"

সাহেব ব'লে গেলেন—"সাড়ে ছটা থেকে সাতটা—বাসন মাজা—চায়ের জিনিযপত্র ধুয়ে মুছে গুছিয়ে গাছিয়ে নে'য়া। সাতটা থেকে দশটা রান্না। এগারটার ভেতর স্নান খাওয়া শেষ। সাড়ে এগারটা থেকে বাইরের কাজ—সে Practical—কিচ্ছু লেখবার দরকার নেই। বিকেল চারটা অবধি বাইরে।" চারটের সময় ঘরে ফিরে থালা বাসন ধুয়ে রান্না বানা। চা খাওয়া। সময় সন্ধ্যা সাতটা অবধি।

সাতটা থেকে এগারটা নানা আলোচনা।

ন'ব্‌নে লিখ্‌লো। তা'পর জিগ্‌গেষ ক'র্‌লে—আমার কাজ তা হ'লে—বাসন মাজা, রান্না ?

"হুঁ্যা কোনো কোনো দিন—কাজ সব ভাগ ক'রে নে'য়া হবে।"

ন'ব্‌নের মনে একটু একটু রাগ হ'চ্ছিল—কিন্তু সাহেবের জবাব শুনে তা আর বেড়ে না উঠে একেবারে মিইয়ে এল। সে জিজ্ঞেস ক'র্‌লে—"না না আলোচনা কে ক'র্‌বে ?"

সাহেব জবাব দিলেন—ত্রু'জনেই।" ন'ব্‌নে—ব'ল্‌লে—"আমি তো তার কিছুই জানিনে—না জেনে কিসের কথা কি ব'ল্‌বো ?"

"যত দিন ব'ল্‌তে পার্‌বেনা তত দিন শুন্‌বে ?"

"বেশ।"

"তোমার মাইনে কিছু নেই; খাবে, কাপড় চোপড় পাবে, সিগারেট দেশলাইও আমার খরচ। যদি নগদ টাকার কিছু দরকার হয় তখন দোব। বাজার তুমি ক'র্‌বে—বাজারের টাকার হিসেব রাখ্‌তে হবে—বেশী খরচ হ'লে জবাব দিহী চাইব।"

"আচ্ছা।"

এখন খাবার মেনু।

রবিবার—নিরামিষ, শুক্তুনি, ডাল, চচ্চড়ি, ছানার ডাল্‌না, পায়েস।

সোমবার—পোলাও, মাছের কালিয়া মাংস।

মঙ্গলবার—ভাজা, ডাল, মাছের ঝোল।

বুধবার—খিচুড়ী, ভাজা, ধোঁকা, মাছের ডাল্‌না।

বৃহস্পতিবার—ডিম, চপ, কাটলেট, মাটন কারী, পুডিং।

শুক্রবার—ভাত, মাছের ঝোল, টক্‌, দই, সন্দেশ।

শনিবার—দমের ভাত, মুরগীর সুপ, মাছের কোর্ম্মা, টক, দই।

রাত্তিরে—৪ দিন লুচি ৩ দিন রুটী।

ফল—রোজই কিছু কিছু।

ন'ব্‌নে স্তব্ধ বিস্ময়ে সাহেবের কথা শুন্‌ছিল। এক একবার ভাব্‌ছিল—বুঝি ঠাট্টা। সাহেব তা লক্ষ্য না ক'রে ব'লেই গেলেন—"খরচ মাসিক ষাট টাকা; ক্যাসিয়ার— "হ্যাঁ তোমার নামটা কি বয় ?"

ন'ব্‌নে ব'ললো—"নবনীতমোহন চক্রবর্ত্তী ওরফে ন'ব্‌নে।

"ন'ব্‌নে ? all right you are my Protege—I am your Sincere friend" ব'লে সাহেব ন'ব্‌নের হাতখানা ধ'রে খুব জোরে নাড়া দিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। তা'পর বল্লেন In Charge of Cash—নবনীতমোহন চক্রবর্ত্তী।

ন'ব্‌নে ব'ল্ল—"মেনু তো হ'ল রাজভোগের—কিন্তু বাবুর্চ্চী কে ?"

"Dear me" ব'লে সাহেব চেঁচিয়ে উঠে জবাব দিলেন—You and I. I am as good a বাবুর্চ্চী as any one in a first class Establishment—do you see—my boy—বুঝ্‌লে ?"

"বুঝেছি।"

"ব্যস—তা হ'লে all right" ব'লে আবার সেই দমকা স্বচ্ছ হাসি হাস্‌লেন।

ন'ব্‌নে রাত্তিরে ঘরের মেজেয় সাহেবের পাশে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো এ লোকটা কে ? এ যে এক আজগুবি অদ্ভুত লোক। বাবু নয় কিন্তু বাদশাই আছে পূরো ষোল আনা। চেহারা নবাবের মত—মন ফুলের মত। মেজাজ নেইই বোধ হয় একেবারে। সাহেবও নয় কিন্তু বাঙালীও নয়। পারশী হবে কি ? কি জানি।

কিছু ঠিক ক'র্‌তে না পেরে সে, একটা পরী রাজ্যের খেলা ঘরে ভুল ভোলানো স্বপ্নের রঙ্‌ খেলানো পরিকল্পনা একখানা তার জীবনে আজ জীবন্ত হ'য়ে সত্য হ'য়ে আস্‌ছে মনে ক'রে প্রাণে একটা মধুর স্পন্দন নিয়ে—ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ঘুম আজ বেশ হ'ল; চিন্তা নেই ক্ষিধের তাগিদ বা তাড়া নেই আজ সে রাস্তায় নয়—ঘরে।

রুটীন মত কাজ চ'ল্‌বে তারপর দিন থেকে। সে দিন তারা নটা বাজতেই শুয়ে প'ড়েছিল। চারটের সময় ন'ব্‌নের গাঢ় ঘুম তার গায় মনে আরামের সোণারকাঠি ছুঁইয়ে চ'লে গেল।

সাহেব ঠিক ছ'টায় জেগে দেখেন তাঁর ঘরের শ্রী ফিরে গিয়েছে। ঝুল-কালি নেই। টেবিলের ওপরটা ফুল ফুটিয়ে সাজানো। বই খাতা, দোয়াত কলম যা কিছু জায়গা মতন মানান সই ক'রে গুছিয়ে রেখেছে। বাসন-পত্র মাজা সারা। ষ্টোভ আর কুকারটার কালি-ঝুলির কলঙ্ক কোথায় অদৃশ্য হ'য়েছে ধোয়া মোছা,—সোণার মত ঝক ঝক ক'চ্ছে। ভাঁড়ারের দিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; জিনিষ আছে—কিন্তু তার এলোমেলো বিশৃঙ্খলা, সেজে রূপ হ'য়ে

উঠেছে। ন'বনে টেবিলের পাশে ব'সে এক তা কাগজে লাইন টেনে ঘর ক'রে দিনের কাজের তালিকাখানা তাদের বড় বড় হরফে পরিষ্কার ক'রে লিখ্‌ছিল—দেয়ালের গায় মেরে রাখ্‌বে ব'লে।

সাহেব উঠেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখে একবার হো হো হো ক'রে প্রাণ খুলে হেসে উঠ্‌লেন সে হাসির হররা বুঝি মাথার ওপরে ছাদ ফাটিয়ে বার হ'য়ে যাবে।

ন'বনে সাহেবের দিকে একবার মোটে তাকিয়ে একটুখানি হাস্‌লো।

সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন 'টি পটে' চা ঢালা হ'য়েছে। নবনীতমোহন পেয়ালায় চা ছাঁক্‌ছিল।

Breakfast শেষ হ'ল। ন'বনে বাজার ক'রে এল। ঘড়ি ধ'রে কাঁটায় কাঁটায় এগারটায় খাওয়া দাওয়া শেষ। মেনুর সঙ্গে মিলিয়ে সব রান্না ঠিক মতই করা হ'য়েছিল। সাহেবই আজ রাঁধলেন। রাঁধলেন আর ন'বনেকে সব দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে হাতে কলমে শেখালেন। ন'বনে দেখ্‌লো সাহেবের মুন্সীয়ানা হাত পাকা গিন্নীর চেয়েও ত্রস্ত চলে; কাজ হ'চ্ছে যেন কলে। ন'বনে অবাক হ'য়ে দেখ্‌লো; সাহেব বেপরোয়া হাসি বেদম হাস্‌লেন আর সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চ'ল্লেন। ন'বনে খাওয়ার আগে সিগারেট পেল না তার বরাদ্দ দিনে চারটী সিগারেট—তাও দুদিন পরে একদিন বাদ। রব্‌বারে এক বেলা।

ঘরের কড়ায় ডবল তালা চড়িয়ে সাহেব আর তাঁর বয় বেরোলেন বাইরের Practical কাজে,—রুটিনে তার বিস্তারিত কিছু ফিরিস্তি ছিল না। সে দিনের খবর মোটামুটি—এই রকম।

সাহেবের পোষাক পুরোনো। প্যান্টলুন তালি দে'য়া। টাই, বুট, হ্যাট সবই আছে কাট দেখে সাহেব দরজীর তৈরি বলেই মনে হয়। ঘড়ির ইস্পাতের চেন শিকলের মত মোটা কিন্তু ঝক্‌ ঝকে। জুতোর তলায় হাপসোল মারা ওপরে কিন্তু সাপমার্কা কালির রঙ্‌ ঘ'সে ঘ'সে চিকমিকিয়ে তুলেছেন। মাথার চুল পরিষ্কার ক'রে আঁচড়ানো,—চোখে নিকেল ফ্রেমে 'পাস না' চস্‌মা গলায় মোটা কারের সঙ্গে ঝোলানো আর এক যোড়া লেজারাসের দোকানের ব্রেজিল পাথরের বুঝি সে যোড়টী—পড়বার জন্যে।

ন'বনে খোট্টাবাবু। সাহেব ব'ল্লেন আমীরের ঘরের লেড়্‌কার মত সেজে নাও। সে মাথায় সোনালি কাজ করা টুপী বাঁকা ক'রে বসালো। মসলীনের গিলে করা পাঞ্জাবী রঙিন গেঞ্জির ওপর ফুর ফুরিয়ে উড়লো। জরী পেড়ে ঢাকাই ধুতি কোঁচার কাছে ফুলিয়ে মালকাছা মেরে প'রেছে। হাতে পাথর বসানো আংটী তিন চারটে। পকেটে সোনার সিগারেট কেস। বুক পকেটে গন্ধমাখা সাতরঙা রেশমী রুমাল কানে তুলোয় করে আতর গোঁজা।

সাজ দেখে সাহেব "বাঃ বহুৎ উম্‌দা—হুয়া, একদম—নবাবজাদা ;—কিন্তু জড়োয়া—ও সবই ঝুটো বুঝ্‌লে ?" ব'লে তাঁর সেই হো হো গদ্‌ গদ্‌ হাসি আবার হাস্‌লেন—ন'বনেও মুখটিপে না হেসে পারলো না।

ধর্ম্মতলার মোড়ে চৌরঙ্গীর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সে দিনের দৈনিক কাগজ একখানা কিনে প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন থেকেই পড়া সুরু ক'র্‌লেন। আপন মনেই বল্‌লেন—এই যে জাহাজের বিজ্ঞাপন। নিশান উড়িয়ে দিয়েছে ;—তোমার মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে জমানো বাটে ইংরেজের বিজয়-নিশান আঁটা। বাঁ দিকে—"ডোমেষ্টিক"—সাহেব মেমের ঘরের কথা—তার নীচে—"পার্সনেল"—যার যেমন নিজের কাজের বিজ্ঞাপন ;—এই-ই আমি চাই! প্রথমটা "Sweet lord জেসাস্‌কে ধন্যবাদ"—আমার কিছু গেল এল না। তা পরেরটা—না—হ্যাঁ—এই যে তিনের নম্বরে—"Dear old lad, don't be anxious ; things finally settled. Meet sweet I where it leads to downe lands. Monna Vauna" ("ওগো পুরোনো প্রিয়, ব্যস্ত হ'য়ো না ; সব ঠিক ; প্রিয় সে এক ;—তার সঙ্গে দেখা কর—রাস্তা যেখানে "ডাউন ল্যাণ্ডস্‌"—মানে নীচু জমিতে নেবে গিয়েছে (মোন্নাভান্না)।

ছাপা ইংরাজীটার বাংলা তর্জ্জমা ক'রলে—কতকটা এই রকম দাঁড়ায়। ন'ব্‌নে—পাশ থেকে তাকিয়ে দেখে ব'ল্‌লে—"কিন্তু down বানান ভুল লিখেছে—শেষের "e"টা হবে না।"

সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠে—আবার পড়া আরম্ভ ক'র্‌লেন। কত লোক ধাক্কা মেরে গেল,—সাহেবের বুটের কালো, ধুলো ক'রে দু'একজন তাঁর পা-ও মাড়িয়ে গেল—সাহেবের ভ্রূক্ষেপও নেই—তিনি উল্টে পাল্টে কাগজই প'ড়ে চ'ল্‌লেন। ন'ব্‌নে দেখ্‌লো রাস্তায় পথিকের দল—কাজে অকাজে যে জন্যেই হ'ক—ব্যতি ব্যস্ত হ'য়ে ছুটেছে—ট্রাম গাড়ীর

ভেতর লোকের ভিড়, সাহেব পাড়া হ'লেও—দু'চারজন মাড়োয়ারী, চীনে, হিন্দুস্থানীও আছে যাত্রীদের মধ্যে। মেমদের মাথায় রঙদার ছাতা—লম্বা লম্বা তার বাঁটগুলো।

মিনিট দুই মনে মনে প'ড়ে নিয়ে সাহেব ব'ল্লেন—"এবার চারটি সার্কাস আস্‌ছে।"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"খুব পয়সা লুটবে।"

সাহেব আবার ব'ল্লেন—"এ হপ্তায় death rate ক'মেছে"—

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"হাঁ, আমিই ত একজন খুব বেঁচে গিয়েছি।"

সাহেব হেসে জবাব ক'র্‌লেন—"আর একজনকে খুব বাঁচিয়েছ—এই যে সে খবরও উঠেছে দেখ্‌ছি—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বিকেল প্রায় পাঁচটায়—ইত্যাদি—শেষ হ'চ্ছে—একজন কুলী তাকে বাঁচায়।"

ন'ব্‌নে ধাঁ ক'রে ব'লে ফেল্‌লো—"কুলী ?"

সাহেব ব'ল্লেন—"হ্যাঁ ঠিকই লিখেছে।"

ন'ব্‌নে হেসে ব'ল্ল—"ঠিকই লিখেছে !"

"তা'পর—মেয়ে ভোলানোতে দশ বচ্ছর—যাক বাঁচ্চে"—

"শেওড়া ফুলীতে ভয়ানক ডাকাতি—দরকার নেই"---

"ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আসামী জুতো ছুড়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে মারে তার তিন মাস জেল হয়েছে—লোকটা সাহসী।"

"রবিবাবুর কঙ্কাল গল্পটা ইংরিজীতে তর্জ্জমা হ'য়েছে—হ্যাঁ একদিন তাঁর খাতার কথাই বিশ্বসাহিত্যের পাতাগুলো পোরাবে।"

ন'ব্‌নে ব'ল্ল—"নিশ্চয়।"

সাহেব মুখ টিপে হেসে পৃষ্ঠাখানা কাগজের উল্টে নিয়ে ব'ল্লেন—"কংগ্রেসের বিরাট আয়োজন ডেলিগেটদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত—কিন্তু বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন—কেবল ভোল, ও সব ভুয়ো বাবা, ফাঁকা কথা ;—আসল কাজ হবার দিন এখনও আসে নি। যখন আস্‌বে তখন বক্তৃতা হবে কম—সৌখীন খাওয়া শোয়া বন্ধ হবে—এত বড় জাঁকিয়ে বিজ্ঞাপন

দেবারও দরকার ক'রবে না। দিন আসবে—। চুম্বুক কথাটুকু তোমার নোট বই-এ লেখা আছে।"

ন'ব্নে ব'ললে—"ও আমার পাগলামী।"

কিন্তু খাঁটি সত্যি কথা—হুঁ তা'পর Latest Paris fashions Ladies world—all bosh—nonsense—Rubbish কিছু নেই এ কাগজে ব'লে—"ওয়েলিংটনে ছেলে বাঁচাবার খবরটুকু আর সেই মোন্না ভান্নার কাটিং শুধু ছিঁড়ে বাঁকীটা রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মোটা বেতের লাঠিগাছা পায়ের সঙ্গে হেলিয়ে রাখা হয়েছিল সেটাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে দেখ্লেন—বারোটা বেজে গিয়েছে। ন'ব্নেকে বল্লেন—"তাড়াতাড়ি চল—অনেকটা যেতে হবে।"

ন'ব্নে জবাব ক'ল্লে "চলুন।"

সাহেব ঝড়ের বেগে উড়ে চ'ল্লেন যেন ন'ব্নে তাঁর পেছনে তার—বেশী হাঁপাতে হোলো না—কেন না সাহেবের চেয়ে ন'ব্নের দেহ অনেক হাল্কা।

একটা বাজ্তে মিনিট পনর বাঁকী থাক্তে দু'জনে গিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে পৌছলেন। সাহেব ব'ল্লেন—এইখানে একটা অব্ধি দাঁড়াতে হবে—কাগজে তাই লেখা ছিল—আমার "মোন্না ভান্না"—আস্বে—"মোন্না ভান্না বয়।"

সাহেব হো হো হাসি আবার হাস্লেন কিন্তু ন'ব্নে অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের পানে তাকালো—সে ভাব্লো—এ আবার কি?—এ সাহেবের গোপন প্রেম আছে নাকি?

সাহেব ন'ব্নের মনের কথা বুঝেও কিছু না ব'লে আবার হাস্লেন—স্পষ্ট সরল সে হাসি—গুপ্ত প্রণয়ীর মনের পঙ্কিল কলঙ্কে সে হাসি কালো হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। কাঁটায় কাঁটায় যখন একটা—রাস্তার ভেতর দিক থেকে সাহেবেরই মত নধর মোটা একজন লোক বেরিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে সাহেবের এগিয়ে বাড়ানো পরিপুষ্ট হাতখানা চেপে ধ'রে অভিনন্দন জানালেন। সাহেব ন'ব্নেকে ব'ল্লেন—"বয়, আমার মোন্না ভান্না—কেমন চেহারা?—জৌলুস আছে—কি বল?"

ন'ব্নে আরো অবাক হ'য়ে গিয়ে ভাব্ছিল—"এ কী অদ্ভুত।"

ন'ব্নে আশ্চর্য্য হ'য়েই জবাব দিলে—"এই মোন্না ভান্না?"

সাহেব ব'ল্লেন—"বোনি ভায়া,—কেমন রও ?"

ন'ব্নে ব'ল্লে—"কেট্‌লীর তলার মত"—

"ওঃ হো হোঃ" ক'রে সাহেব হেসে উঠ্‌লেন—তাঁর ভায়াও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

এই রকমে মিনিট দুই। মোল্লা ভায়া—এইবার পকেট থেকে এক টুক্‌রো খবরের কাগজে মোড়া বিঘত টাক লম্বা একটা বাণ্ডেল বার ক'রে সাহেবের হাতে দিল।

সাহেব জিজ্ঞেস ক'র্‌লে—"মেয়েটার খবর কি ?"

ভায়া—ব্যাথায় করুণ স্বরে জবাব দিলে—"কাল সন্ধ্যের—শেষ হ'য়ে গিয়েছে।"

"মারা গেছে—পার্‌লে না রাখ্‌তে—বেচারীকে ?" ব'লে সাহেব চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন কিন্তু তাঁর গলার ভেতর আওয়াজ করুণায় গদ্‌গদ হ'য়ে এল।

ভায়া ব'ল্লে—"না—প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু হ'ল না।

"আহা—বেচারী ; ভগবান, এ আত্মা তোমার কোলে পারিজাত হ'য়ে ফুটে থাক্—তাকে বুকে করে রেখো।" তা পর ভায়ার দিকে ফিরে ব'ল্লেন—"হতভাগিনী তার মা ?"—

"অনেক ক'রে বুঝিয়ে শান্ত ক'রেছি।"

"মাতালটা ?"

"নেশা ছেড়ে দিয়েছে—আজ সকালে তাড়ির পেয়ালা দুটো গুঁড়িয়ে চুর চুর করেছে।"

"দেখ যদি একটা আত্মার বলিদানেও ওকে ফিরিয়ে পাও।" ব'লে সাহেব তার হাতখানা ধরে জোরে নাড়া দিয়ে—বিদায় নিলেন। রাস্তায় খানিকটা নীরবে চ'লে—দু'এক বার রুমাল বার ক'রে চোখের কোণটা মুছে মুছে নিলেন। ন'ব্নে তাঁর পাশে হেঁটে চ'লেছিল কোনো কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌বার সাহস পাচ্ছিল না। সাহেবই প্রথম কথা ব'ল্লেন। জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন—"সাহেবী দোকানে জিনিষ কিনেছ কখনো ?"

ন'ব্নে ব'ল্লে—"না।"

সাহেব একটু দাঁড়িয়ে—একখানা ফিটন্ ডেকে—ন'ব্নেকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে ব'স্‌লেন। কোচ্‌ম্যান জিজ্ঞেস ক'র্‌লে—"ঠিকানা ?"

সাহেব ব'ল্লে—"লেড্‌ল।"

হোয়াইট অ্যাওয়ের দোকানের সাম্‌নে লোক জ'মেছিল মন্দ নয়। চটকদার জামা পরা রাঙা রাঙা মেয়ের ছবি—রাঙা জমির কাগজের প্লাকার্ডের ওপর এঁকে বাহারের বিজ্ঞাপন দিয়েছে—ওদের X Mas Sale—মানে বড় দিনের সস্তা—বিক্রী আরম্ভ হ'য়ে গেছলো। দোকানের সাম্‌নে ফিটন থেকে নেমে—ভেতর দিকে সোজাসুজি চ'ল্‌লেন—দরোয়ান লম্বা সেলাম ঠুক্‌লে আধ হাত হেঁট হ'য়ে। সাহেব ন'ব্‌নেকে ইসারা ক'রে পকেট দেখিয়ে দিলেন। ন'ব্‌নে পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে দরোয়ানের হাতে ফেলে দিলে। দরোয়ান দু হাতে আবার সেলাম দিয়ে দরজা খুলে ধ'র্‌লে।

ভেতরে shop girlsদের চঞ্চল চোখ, ফিক করা মিঠা হাসি—চমৎকার ব্যবসাদারী—যৌবনের বিজ্ঞাপন দিয়ে ;—রূপের লেখায় গোলাপ ফুটিয়ে তুলে।

"Good morning Sirs" ব'লে একটি সুন্দরী এগিয়ে এল। ঠোঁটের ওপর রস আর হাসি রস করা কাটছিল।

একখানা কার্ড হাতে দিয়ে সাহেব জবাব দিলেন—"Fair morning miss."

তরুণী বুড়োর দিকে মর্য্যাদার সঙ্গে তাকিয়ে কথার পাল্‌টা উত্তর ক'র্‌লো—Is it not Sir my old love ব'লে হেসে ফেল্‌লো।—

সাহেব ব'ল্‌লেন—But too old a love—I am. There is my young friend here, an Indian Nabab. ব'লে বুড়ো মুচকী হাস্‌লেন।

তরুণী হেসে ন'ব্‌নের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন—My services are always at your Highness' disposal—

সাহেব ব'ল্‌লেন—ফ্যান্সী হ্যাণ্ডকারচিফ্, বুকে, সেণ্ট।"

তরুণী ধাঁ ক'রে আলমারী খুলে রুমাল হর রকমের মেলাই সেণ্ট বার ক'রে আন্‌লো। সাহেব ন'ব্‌নেকে ছটো তুলে দেখালেন। ন'ব্‌নে ঘাড় নাড়ালো সাহেব ব'ল্লেন not to our liking.

তরুণী ব'ল্‌লেন—fifty six Rupees. Sale price per dozen.

বুড়ো গলা চ'ড়িয়ে জবাব ক'রলেন Yes ; but an Indian Nabob don't you see. my silly young lady ?

"Yes, I see" ব'লে তরুণী গিয়ে আর এক আলমারী খুলে জাঁক চমকানো বাহার ভোলা বেসে আরও ১০।১২ টা অঙ্গ প্রসাধনের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এল।

বুড়ো ব'ল্লেন Yes ; ন'বনেকে আর এক সেট দেখালেন—আবার ন'ব্নে ঘাড় নাড়ালো, তরুণী তাড়াতাড়ি আর এক সেট তুলে ন'ব্নের কাছে ধ'রে চোখের কোণার মিঠে ভঙ্গিমায়, মন কেড়ে নেবার মিনতি নিবেদন ক'রে ব'ল্লেন—May it please your Highness—have this one—I am at your Highness' Command সুন্দরী গালে টোল খাইয়ে মুচকী হাস্লো—

সাহেব ঔ—ওয়া গোছের একটা আওয়াজ গলার ভেতরে গোঁঙ্রিয়ে ব'ল্লেন—Let him have that. "Thank you" ব'লে তরুণী packerকে ডাক্লেন।

তা'পর রুমাল। সুন্দরী এক পাঁজা বাক্স নিয়ে এল। বুড়ো অনেকগুলো ওলট পালট ক'রে নেড়ে চেড়ে এক বাক্স বেছে নিয়ে ব'ল্লেন—Don't mind the troubles—Miss ; thank you"

বুড়ো ঠিকানায় bill পাঠাতে ব'লে বেরিয়ে এলেন। সাহেবদের দোকানের লোকই গাড়ীতে এনে জিনিষ তুলে দিয়ে গেল। সাহেব ন'ব্নেকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে ব'সে হাঁক্লেন "রাধাবাজার বেণ্টিঙ ষ্ট্রীট হোকে" গাড়ী চ'লতে লাগলো।

বুড়ো ন'ব্নেকে ব'ল্লেন—এই সব Shop girls sweet and seducing বুঝলে ?

ন'ব্নে ব'ল্লো "বুঝেছি"—

সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠে ফিটনের ঘোড়াটাকে চ'ম্কিয়েই তুল্লেন বুঝি। তারপর একটা দোকানের কাছে এসে হাকলেন —"এইও রোখ।"

গাড়ী থাম্লে—দু'জনে নেমে একটা চীনে সাহেবের দোকানে ঢুকে ব'ল্লেন—"a pair of shoes—here is the measurement"

আফিম-খোর সাহেব টিকি দুলিয়ে ব'ল্লো—"সু, সু কেতা কেতা—ওয়াট প্রাইজ"

"Any price. I want super ior quality—you see"

"বালা বালা good—yes" বলে চীনে ম্যান—আলমারী থেকে এক জোড়া জুতো বার ক'রে এনে মেপে টেপে ব'ল্ল—"বেরিগুড্—ফাইব রুপি।"

সাহেব ব'ল্লেন—"টু" "টু" would you let it go at two ?

চীনে সাহেব মুখ বেঁকিয়ে ব'ল্লে—"two, not good—bad bad ! take bad" বলে সাহেব আর এক যোড়া জুতো আন্‌লো বার ক'রে।

সাহেব ব'ল্লেন—"No not bad I want to have this pair."

"This pair ! then one—একঠো লে যাও--take one"

"You yellow sot, Do you see !" বলে সাহেব, চীনেকে ঘুঁষি দেখালেন।

সে পাকানো মুঠি দেখেই তো চীনে জলে উঠ্‌লো—চেঁচিয়ে ব'ল্‌লো "blow ! blow !: মারেগা ?"

সাহেব জোরে টেবিলটার ওপর একটা আর সেটা তুলে সঙ্গে সঙ্গে চীনের দিকে হাওয়ায় আর একটা ঘুঁসি ঝেড়ে চেঁচিয়ে ব'ল্‌লেন—Yes you will have this. How dare you insult a gentleman ?—Savage.

চীনে যেন কি "কঙ্ক, ফুঙ্ক, নউঙ্ক" ব'ল্‌তে লাগ্‌লো সাহেব ব'ল্লেন—দেগা কি নেই ?—two annas more"

চীনে অম্‌নি জুতো যোড়াটা কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দিয়ে হাত পাতলে ব'ল্‌লে—"লাও টুরুপী টু আনা।"

দাম দিয়ে জুতো নিয়ে সাহেব হুকুম দিলেন—"হাঁকাও রাধাবাজার।"

রাধাবাজারে নেবেই একটা দোকানে ঢুকে সেণ্ট আর রুমালগুলো দেখিয়ে সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—"কত দাম হতে পারে মশায় ?"

"গোটা আশী টাকা হ'তে পারে। এ Laidlawর ত ?"

সাহেব ব'ল্লেন—"হ্যাঁ।"

"কত নিয়েছে ?"

"১৩২৲ টাকা" ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে সাহেব বেরিয়ে এসে রাস্তায় ন'ব্‌নেকে ব'ল্‌লে—"দেখ্‌লে তো সাহেব, আর চীনে দোকান ?—সাহেবরা ডাকাত, চীনেরা বদ্‌মাইস। ভাল মানুষ খ'দ্দের কা'রো চীনে দোকানে উচিৎ দামে জিনিষ কেন্‌বার উপায় নেই।"

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আর এক দোকানে ঢুকে প'লেন। সমস্ত রাধাবাজারে যতগুলো দোকান ছিল এক এক ক'রে ঘুরে ঘুরে নানা রকম দর কসাকসি ক'রে কখনও হেসে কখনও আশ্চর্য্য হ'য়ে কথা ব'ল্লে—চীনের পুতুল; জার্ম্মানীর বাঁশী, টিনের নৌকা, রবারের বল, পেন্সিল কাটা কল বাক্সে মেকারের ছুরী, কোমরের ঘুঙুর, ঘুনসী, ছোট ছোট খেলনা ঘড়ি—তার ভেতর থেকে ঘোরালেই, মুরগী, ষাঁড়, ভেড়া, ঘোড়া, হাতী, উট এই সব একে একে বেরিয়ে আসে—ছোট দোয়াত, জার্ম্মাণ সিলভারের তৈরি খেলা ঘরে রান্না বান্নার হাঁড়ি কুড়ী এই রকম একশ "ভোলের" একরাশ জিনিষ কিনে জুতো টুতো সব শুদ্ধ একটা ঝাঁকায় তুলে নিয়ে গাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন। গাড়ী তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। চারটে বাজে বাজে হ'য়েছিল আর বাইরে নয়—সাহেব ঠিকানা ব'লে হাঁকাতে হুকুম ক'রলেন—কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় দুজনে ঘরে ফিরে এলেন।

কোচম্যানকে চারটে টাকা ফেলে দিলেন—সে সেলাম দিয়ে টাকা তুলে নিয়ে চ'লে গেল।

"সাহেব ন'ব্‌নেকে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লে—"সাধারণ বাঙালীর বাড়ী বুঝ্‌লে ও ব্যাটা কি ক'র্‌ত?"

"চেঁচামেচি আরম্ভ ক'র্‌তো?"

"শুধু তাই নয় গালাগাল—তারপর হয়তো মারামারি—এই দস্তর এ বেটাদের—হাট কোট দেখ্‌লেই ঠাণ্ডা।"

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কুলুপ খুলে দুজনে ঘরে ঢু'ক্‌লেন।

ন'ব্‌নে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লো—"এই খেলনাগুলো কি হবে?"

সাহেব ব'ল্লেন—"হিজিবিজি দিয়ে বাক্সের ফাঁকগুলো পোরাবো।"

সাহেবের সেই হাসি আবার ঘরের চারিদিকে ধ্বনি তুলে ভেসে উঠ্‌লো। ন'ব্‌নে আর কিচ্ছু প্রশ্ন ক'র্‌লে না।

তাঁর মোল্লা ভাল্লাকে সাহেব ব'লে দিয়ে এসেছিলেন—সাতটার সময় এক লাইব্রেরীর লোক এক পাঁজা বই কাগজ দিয়ে গেল! তার ভেতর খবর আর লেখা যত,—চমৎকার রঙে তুলতুলে, তুলির টুককরা টানে—ভঙ্গী ফুটিয়ে, ভাব ফলিয়ে তোলা ছবি তার চেয়েও বেশী। বইএর

দোকানের বিজ্ঞাপন ছিল অনেক। নেপালে কাটামুণ্ডর কোন্ Buddhist Society বুদ্ধদেবের দশ অবস্থার মৌলিক ছবি বিক্রি ক'চ্ছেন তাঁদের কাছে অনেক দুষ্প্রাপ্য হাতে লেখা পালি বই পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষার প্রাচীন পুঁথি—বেদের আসল মূল সংস্করণ তা ছাড়া শীলাজতু, পাহাড়ী ওষুধ ইত্যাদিও অনেক রকম তাঁরা বিক্রি করেন। ইত্যাদি লেখা অতি গোপন বিজ্ঞাপনও একখানা তার ভেতর ছিল। সাহেব ধাঁ ক'রে সেইটে প'ড়ে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌লেন যেন। ব'ল্‌লেন—"এইবার যদি পাই—হংস দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব খবর খুঁটিনাটি সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা, শিক্ষকদের পরিচয়, তাঁদের কলাবিদ্যা—ঋষি-শিল্পী আত্রেয়ীর রঙ মেশানোর অপূর্ব্ব নৈপুণ্য। কি দিয়ে তিনি অমন রঙের ইন্দ্রধনু এঁকে রূপ আর ভঙ্গীর যাদুখেলা খেল্‌তেন কোন সোণার তুলির স্বপন পালকের টানে টানে তা আমার জানা চাই। বুদ্ধদেবের চিকিৎসক জীবকের লেখা মূল বিবরণ কিছু আছে কিনা—তাঁর হাতের লেখা, যদি পাই—আমার চেষ্টা, পরিশ্রম সব সার্থক হয়—পাবই এদের কাছে। ব'লে সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে কাগজ কলম কালি এনে নেপালী ভাষায় এক চিঠি লিখ্‌লেন ন'ব্‌নে অবাক হ'য়ে দেখ্‌লো। চিঠি লেখা শেষ হ'লে নানা আলোচনা আরম্ভ হ'ল। মনের কথা; আত্মার সঙ্গে তার সম্বন্ধ Cosmology, Cosmogony,—বিশ্ব, বিশ্বের কারিকর, তাঁর পাকা হাতের মুন্সীয়ানা নক্সা কাটা ধরনীর শ্যাম-আঁচলের ওপরকার সৌখীন কারু ইত্যাদি—ক্রমশঃ সাহিত্য—তা'পর বিশ্বসাহিত্য—তার প্রাণের কথা মৌলিক লক্ষণ—স্পিনোজার মহাবাক্যে Subspecio auternitatis—বিশ্বের মহাপ্রাণ যা সকল দেশের, সকল কালের সকল জাতির অন্তরের মধ্যে—তারই নিজস্ব আনন্দ হ'য়ে খেলে উঠবে—তাই বিশ্বসাহিত্য। তার পর Mysticism,—"ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি—" এই যে আনন্দ, সেই "কিমিব কিমিব" স্পর্শ পেয়ে প্রাণের যে মধুর অনুভব, সেইটিই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ। বিশ্ব-সাহিত্যে চাই আত্মা, স্বত্বা, জীবন—ত' একেরই আপন নয়—এক দেশের নয়—তা গ্রীকেরও যেমন রোমকেরও তেমনি, ফরাসীর যেমন ইংরেজেরও তাই, ইউরোপের যা—ভারতীয়ের কাছেও সেই একই। ইত্যাদি। সে অনেক রকমের অনেক কথা। নব্‌নে মনোযোগ দিয়ে সব শুন্‌লো। অনেক কথাই বুঝ্‌লো না, বুঝ্‌লো যা বোধহয় মনে রাখলো।

রাত দশটা বাজতেই কার্ণোবিসের লোক একবাক্স রেকর্ড শুদ্ধ একটা গ্রামোফোন নিয়ে এল। গানের কলের গায় সাহেবের একখানা কার্ড আঁটা বাঁ দিকে পেন্সিল দিয়ে দস্তখত "মোন্নাভান্না।"

সাহেব লাফিয়ে উঠে বাজনা নাবিয়েই কলে গান যুড়ে দিলেন। তাই থেকে আরম্ভ হ'ল সুর লয়ের কথা। ইউরোপীয় সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত! সুরের যন্ত্র, তালের যন্ত্র। ইংরিজী বাঙলা মিশোনো সুর ইত্যাদি। ইটালির গৎ গানের সুর না কি—অতি চমৎকার বেহালায় তা মিঠে বাজে।

এই ব'লে সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর বেহালাখানা পেড়ে এনে বিলিতী সুর আর গৎ বাজাতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। সাহেব নিপুণ বাজিয়ে। তাঁর ওস্তাদি-হাতের আঙুলকটা বিদ্যুতের মত তারের গায়ে গায়ে উঠে প'ড়ে যেন স্বর্গ থেকে একটা অমৃতময় সুরের লহর নাবিয়ে—আনলো। প্রথমে সুর কিশোর; ইরাণীসাকীর মুখের ওপরকার রঙ্ লেখার মত, তার পায়েলা পরা লঘু পায়ের গৎ বাঁধা ছন্দের মত রূপকথায় কল্প লোকের লীলা হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লো;—তারপরে সুর আস্তে আস্তে বেড়ে উঠে—করুণ সে, ফুলধনুর পরাণ হরা তনিমা রঙ্গে কোন্ রূপসীর যৌবনে হারিয়ে ফেলা হিয়ার গোপন কথা আপনার অব্যক্তময় ইঙ্গিতে ব্যক্ত ক'রে ব'লে গেল; চারিদিকে কোমল, শুভ্র, রেশমের ডোরে ডোরে ফাঁস-বাঁধা জাল-বুনে—সকল সুরের প্রাণের যে সুর বিশ্বধ্বনির বুকের সুরের লীলা স্পন্দন বুঝি তারই মাঝে এনে বেঁধে আবার তখনই হাওয়ায় হাওয়ায় তাকে উড়িয়ে দিলে তরুনীর অঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া ভেজা হাওয়ার সাড়ীর মত—হাল্‌কা আলো ছায়ায় সে পুলক বুঝি ছুটে গেল অনন্তের পানে আপন-ভোলা।

ন'বনে শুনতে শুনতে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল—সাহেবের বেহালায় যা বাজছিল সেটা গৎ কি নিখিল-কোবিলের কাকলী সুর না দূর-নিকুঞ্জে যুগল-পাখীর মিলন-লগ্নের মিঠা ডাক তা বোঝা যায় না। ঘরের ভেতর বুঝি পাপিয়া গান গাইছে, দোয়েল শিশ দিচ্ছে, ময়না প'ড়ছে—এক সঙ্গে।

বাজনা শেষ হ'লে ন'বনে ব'ল্ল—"এ কি চমৎকার এমন বাজনা আমি শুনিনি কখনো—কিন্তু আমি শিখ্‌বো।"

সাহেবের সেই হো হো হাসি—এবার তিনি হেসে উঠলেন। তা' পর ন'বনের হাতে বেহালা দিয়ে বল্‌লেন—"বাজাও।" ন'বনে একটু একটু বেহালা কেন সব যন্ত্রই বাজাতে পারতো। সাহেবের কাছে আস্তে আস্তে সবই সে ভাল ক'রে শিখ্‌বে ঠিক হ'য়ে গেল। শুতে যাবার সময় সাহেব ন'বনের হাতে একখানা চামড়ার বাঁধানো গিলট ঝাঁকিয়ে তোলা নোট বই দিয়ে ব'ল্লেন,—"যা ইচ্ছে লিখ্‌বে আর কাল থেকে বাইরে যা হবে তার নোট রাখতে হবে। এই নাও পেন্সিল আর ছুরী।" ন'বনে টেবলের ওপর সব গুছিয়ে রেখে—বেহালায় সাহেবের কি মিঠেই হাত উঃ! ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে প'ল।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রকৃতি

(১)

প্রকৃতি গো রমণীয় তনুমাঝে তব
মনোহর,—বিরাজিছে কত নব নব
অনন্ত আকাশ ঘিরি-রক্তাম্বুদরাজী
বিপিনে তোমার বীণা উঠিতেছে বাজি
কুহুধ্বনি-ভেসে আসে সমীরণ সনে
ফুল্ল ফুল গন্ধময়-যূথী উপবনে
কর্পূর-গৌরাভ কভু ধবল আকাশ
করিছে তোমার নব-যৌবন-বিকাশ।

সবিস্ময়ে দেখিতেছি যেন তব মাঝে
অভ্রভেদী শৈলরাজ কোথাও বিরাজে
তরল-কিরণময় চূড়াদেশ তার
উপরে বহিয়া যায় মেঘ-পারাবার॥

(২)

কোথাও বা পিপাসিত অনাদি প্রান্তর
কোথাও ফেণোর্ম্মিময় বিশাল সাগর
মুকুতা-মকর-মীনে পূর্ণ সদা বহে
দেখিতেছি কোথাও বা বহে কি না বহে
চিক্কণ পিচ্ছিল পথে কৃশা গিরি নদী
দেখিলেই মনে হয়—যেন নিরবধি
করিছে বিরহ চিন্তা কৃশ বধূজন
তারি দুই পাশ ঘিরি ক্ষুদ্র পুষ্পবন
কৃশাঙ্গিনী স্রোতস্বিনী বিরহে আকুল
এখনও ফোটেনি তার প্রণয়-মুকুল
অফুটন্ত কলিকার-আঘ্রাণে বিভোর
কবে সে লভিবে দূর নীলাম্বুধি ক্রোড়।

(৩)
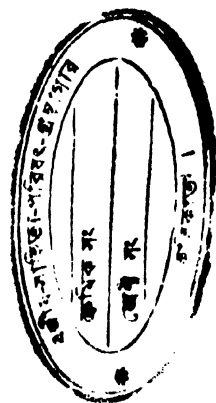
প্রকৃতি গো কভু চারু চন্দ্রিকা প্লাবিত
পূর্ণিমা রজনী রূপে বিশ্ব বিমোহিত

দেখা দেয় করে লয়ে সম্মোহন বাণ
তোমার নয়ন মাঝে, তাহারে নিরখি
পলক বিহীন নেত্রে শুধু চেয়ে থাকি
যৌবনের পানে তার—সেই নিশিথিনী
করবী-কনক-হারে নক্ষত্রের মণি
অগণিত, ধীরে ধীরে করে সন্নিবেশ
অধিক বিস্ময়ে হেরি তব জ্যোৎস্নাবেশ
সে পূর্ণিমা—করে যবে ফুলধনু ধরে
মুহূর্ত্ত বিকল অতি করে সুর-নরে
তব কুঞ্জে আর এক জাগিতেছে নারি
কোকিলা তাহার নাম, কুহু-স্বর তারি
অধিক-আবেশ-পূর্ণ, সেই গীতধারা
করিতেছে বিরহীরে চির নিদ্রাহারা।

(৪)

কখনও মাধব মাস হলে অবসান
বেজে উঠে আষাঢ়ের—অদূর বিষাণ
অকস্মাৎ মসীপূর্ণ আকাশ আবরি
দেখা দেয় মেঘবৃন্দ—তমো বিভাবরী
আনে মর্ত্ত্যে-আহ্বানিয়া, দেখে তব দাস
মেঘ-পরিবেশ পূর্ণ বিক্ষিপ্ত আকাশ
ভ্রষ্ট কুন্তলের মত, কভু সৌদামিনী
নয়ন-বিভ্রমে তার সমগ্র অবনী

করে বিমূর্চ্ছিত প্রায়—গাঢ় অন্ধকারে
জ্বলে বজ্রানল-শিখা ভেদ তমোস্তরে—
বাসুকীর ফণামণি প্রদীপ্ত কিরণে
জ্বলিয়া উঠিছে যেন মণ্ডিত হিরণে

(৫)

তব স্বর্ণ দিনালোক, পাখীদের গান
কোমল-কিরণ-কান্ত তরল-বিমান
তব সন্ধ্যা সমুদ্রের জল কল ধ্বনি
কোথাও তরণীহীনা তব প্রবাহিণী
আমারে করিছে মুগ্ধ সুন্দরী প্রকৃতি
মনে হয় তব সম নাহি রূপবতী।
সারাদিন ঘুরি ফিরি কোথাও রাখাল
দিবা অবসান হেরি লইয়া গোপাল
গোধূলি-ধূসর সাঁঝে চলিতেছে মাঠে
তাহার দু'একটি গান জাগিতেছে বাটে
স্মৃতিপট যেন মনে লাগিতেছে মোর
ঘনাইছে জীবনের অপরাহ্ণ ঘোর।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নারীর কথা

——:*:——

(একখানি চিঠি)

রেঙ্গুন,
২০শে জুন, শনিবার,
১৯২৫।

প্রিয় অমলা,—

বাংলা ছেড়ে মগের দেশে এসেই অনেকগুলি কথায় মনটা ভরে উঠেছে, বিশেষতঃ আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেই, নারীর কথায়। এটা যে তুলনা আর বৈষম্যের ফল তা' বোধ হয় বুঝতে পেরেছিস্। শরৎ বাবুর শ্রীকান্তে যা পড়েছিলাম, ঐ যে ইক্ষুদণ্ডের সাহায্যে বর্ম্মা রমণীর একটী বেয়াদফ্ পুরুষকে কর্ত্তব্য ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া, বাস্তবিক বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে এ কেমন অসম্ভব মনে হয়েছিল। এখানে এসে অবধি আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। এ দেশের নারী অতিশয় কর্ম্মিষ্ঠা ও চতুরা। সংসারের সকল কাজই নারীরা করে, পুরুষ যেন পুংমক্ষিকা (Drone), একেবারে Parasite (পরগাছা)। সংসারের দ্বন্দ্ব কোলাহলের মাঝে এসে নারীর সহজ সঙ্কোচ এখানে অনেকটা ঘুচে গেছে, এ জন্যই আমাদের পক্ষে যে কাজটা অসম্ভব, সে কাজ এরা অনায়াসেই করে উঠ্‌তে পারে। এদের কর্ম্মনিষ্ঠা, সরলতা ও হৃদয়ের সরসতাও বেশ লক্ষ্য করবার জিনিষ।

আমি ভাবছি, আমাদের বাংলার নারী সমাজ যে তাদের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে, এ—কিন্তু একটা বিশেষ শুভচিহ্ন। এই অসন্তোষকেই অবলম্বন করে দেশে নারীর অবস্থার এমন একটা পরিবর্ত্তন আস্‌বে, যার ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে নারী আপনার যথার্থ স্থানটী কোথায় বুঝে সেটী অধিকার করবে। এ পরিবর্ত্তন দু এক দিনের মধ্যে হবার নয়, এর জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বিলাতী Suffragistদের মত আমাদের অনাবশ্যক সোরগোল করারও কোন দরকার নাই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় সমাজে সকল

পরিবর্ত্তনই অতি ধীরে ধীরে ঘট্‌ছে ; জাতি হিসাবে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সবই Evolutionকে অনুসরণ করছে, Revolutionর উগ্রতা আমাদের ধাতে সয় না।

আমি অনেক জায়গায় শুনেছি বিশেষতঃ পুরুষদের মহলে, যে আমাদের এ দেশের মেয়েরা তাঁদের অবস্থাতে একটুও অসন্তুষ্ট নন,—তাঁরা ত দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছেন—সংসারের ঝাটঝঞ্ঝাট কিছুতেই তাঁদের পায় না, এর চাইতে সুখের অবস্থা আর কি হতে পারে। আর একটা কথাও খুব শুনতে পাওয়া যায়, বাংলার নারী-সাধারণ এ সব কিছুই চায় না—কেবল মাত্র কয়েকজন মহিলাই এ সব আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন। যে সব পুরুষ এ কথা বলেন তাঁরা হচ্ছেন, পুরুষতন্ত্রের Bureaucratic. নারীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখাই তাদের স্বভাব। বাংলার কৃষক Home rule বা স্বরাজ কাকে বলে জানে না কিন্তু তাদের দুঃখ দারিদ্র্য বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে টের পায়। এই দারিদ্র্য, ব্যাধিপ্রকোপ প্রভৃতি কারণ বুঝিয়ে দিলে বেশ বুঝতেও পারে। দুঃখ যখন সত্যই আছে, তার প্রতিকার চাওয়াটাও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এর অর্থই হচ্ছে "স্বরাজ" চাওয়া। বাংলার নারীসমাজও তাদের বর্ত্তমান অবস্থাজাত দুঃখ, ক্লেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ করছে। সমাজ নারীকে এমন এক স্থানে বসিয়ে রেখেছে যেখানে তার স্বাধীন ইচ্ছার বা আকাঙ্ক্ষার কোনই মূল্য নাই, যেখানে সে শুধু একটা যন্ত্র। নারীর সাক্ষ্য দ্বারাই নারীর অবস্থা বিচার হতে পারে,—"Bureaucratic eye" যুক্ত পুরুষের দ্বারা কখনই নয়। নারীর এই বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে কতখানি দুঃখ সঞ্চিত রয়েছে, তাঁরাই এটা তীব্রভাবে বুঝতে পারেন, যাদের অনুভূতি প্রখর ও আত্মসম্মান জ্ঞান প্রবল। এই রকম অনুভূতি-সম্পন্না নারীরাই হয়েছেন এ আন্দোলনের নেত্রী। সকল ক্ষেত্রেই এ রকমই হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের দুঃখ ও স্বরাজের আবশ্যকতা যেমন তীব্রভাবে বুঝেছিলেন, অনুভব করেছিলেন, আমরা দশজনে তেমন করি না। এই তীব্র অনুভূতি ছিল বলেই তিনি হয়েছিলেন স্বরাজ প্রতিষ্ঠাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। এ কথা কখনই সত্য নয় যে, যারা কোনও একটা ব্যাপরের নেতা বা নেত্রী, তারাই কেবল সে জিনিষ আকাঙ্ক্ষা করেন, আর কেহই করে না।

যাক্ ও সব অভিযোগের কথা। একবার আমার শাশুড়ীকে আমার স্বামীর কাছে বলতে শুনেছিলুম "দেখ্, মেয়েগুলিকে এমন কিছু শিক্ষা দিস্, যাতে তারা ঘরকন্নাও করতে পারে, কিছু

উপার্জ্জনও করতে পারে। তা'হলে ওদের অবস্থা আর আমাদের মত হবে না। দুটী পয়সা খরচ করতে হলেই তোদের কাছে হাত পাততে হবে না। আজকাল যেমন অবস্থা, তোদের থাকলে ত আমাদের দিবি। আমাদের কি আর তোদের কাছে চাইতে লজ্জা করে না।" নারী জীবনের একটা বড় দুঃখের প্রকাশ হয়েছে এ কথাগুলির মধ্যে। এ দুঃখ শুধু একজনার নয়, এ অধীনতা সকল নারীরই ললাট তিলক। আমার চিন্তার ধারা ক'দিন যাবৎ এ পথেই চলেছে। Home (গৃহ) সম্পর্কীয় সকল কর্ত্তব্য বজায় রেখে নারীর এই আর্থিক অধীনতা কি করে দূর করা যায় তাই শুধু এ ক'দিন ভাবছি।

গৃহ সম্পর্কীয় কর্ত্তব্য বজায় রাখবার কথা বলছি কেন তার কারণ একটু পরেই জানতে পারবি। নারীর জীবনে সব চাইতে বড় কাজগুলি কি, এও আজকাল একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে মনু যা বলে গেছেন তাই আমার সত্য মনে হয় "উৎপাদনম পত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।" সন্তানের জন্মদান পালন ও রক্ষা একান্ত নারীরই কর্ত্তব্য এ কর্ত্তব্য আর কারও দ্বারা করান যায় না। মনুর কথা সত্য হলেও Martin Luther এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তাকে কিন্তু গ্রহণ করতে পারব না। "If a woman becomes weary or at least dead from bearing, that matters not; let her die from bearing, she is there to do it." "যদি কোন নারী সন্তান প্রসব করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা মরেই যায়, তাতে কিছুই আসে যায় না। এ কাজে তার প্রাণ যায় যাক, এই ত তার কাজ।" Luther এর এই কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা উগ্রতা আছে। সন্তানোৎপাদনই যেন নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য—আর যেন তার কিছুই করবার, বোঝবার নাই! বাস্তবিক এ মতটাকে গ্রহণ করলে নারীর ব্যক্তিত্বকে অপমানিত ও পদদলিত করা হবে— নারীকে কথান্তরে সন্তানোৎপাদক যন্ত্র মনে করা হবে।

Martin Luttera দিন অনেক কাল হয় চলে গেছে। কত নূতন চিন্তা, নূতন ভাব পরিবর্ত্তনের ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে নিয়ে সমাজের রাষ্ট্রের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কত পুরাতন আদর্শ ভেঙ্গে গেছে এবং তার স্থানে নূতনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হতেই সমাজে নারী জীবনের আদর্শ অনেক পরিবর্ত্তনের আঘাত সহ্য করেছে। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা বশতঃ জীবিকার্জ্জনের পথ নানাভাবে অবরুদ্ধ হওয়ায় পুরুষেরা এই যুগে নারীর

অবাধ সন্তান প্রসব ব্যাপার বিশেষ অনুকূল মনে করেন না। নারীর পক্ষ হতেও এই বাধ্যতামূলক মাতৃত্বলাভের প্রতিবাদ শুনতে পাওয়া যায়। Ellen key বলেছেন—"The tyranny of the old protestant church which enjoined on women unlimited submission to joyless motherhood * * * * is now being broken." এ সব তর্ক বিতর্কের শেষ কথা এই, সন্তান প্রসব, সন্তান পালন নারীর যে প্রধান কর্ত্তব্য আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এর সঙ্গে আরও বলি যে এগুলিই নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য কখনই নয়।

আমাদের দেশের মেয়েরা নারীর এ প্রধান কর্ত্তব্যটাকে কোনদিনও অস্বীকার করে নাই। এ গুরুতর দায়িত্ব স্বীকার করেই তারা আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা করছে, যা তারা এতকাল পায় নাই কিম্বা পুরুষ তাকে পেতে দেয় নাই। এই আকাঙ্ক্ষার মূলে আছে কেবলমাত্র জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির পরিণতি সাধন ও মানবত্বের বিকাশ। এখন আমাদের দেখতে হবে এই চাওয়ার মধ্যে কোন্ চাওয়াটা ভাল, কোন আকাঙ্ক্ষা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় নারী সমাজের পক্ষ হতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার নিকট একখানি আবেদন উপস্থিত করা হয়েছিল। এ আবেদনের অর্থ, দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীর মতামতের স্থান লাভ। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা' হয়ে থাকে, তাই হয়েছিল ; বাংলার গবর্ণর মহোদয় মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েই কর্ত্তব্যের দায় হতে মুক্ত হয়েছিলেন। আমার মনে পড়ছে, তিনি এ সম্পর্কে ইংলণ্ডের নারী স্বাধীনতার আন্দোলন ও কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সহিত নারীর প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আলোচনাটাকে অনেকখানি প্রাণবন্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। অনেক স্থলেই দেখতে পাই যে এ সমস্ত দৃষ্টান্ত এ দেশের নারীসমাজকে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করার ব্রহ্মাস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্যদেশের দৃষ্টান্ত নিয়ে আমাদের কোনও উপকার হবার আশা নাই। ও দেশে অনেক নারী অবিবাহিত অবস্থায় কালাতিপাত করে কিম্বা দুই চারিটী সন্তানের জন্মদান করেই মাতৃত্বের দায় হাত অব্যাহতি লাভের উপায় অবলম্বন করে। তারপর আর একটী কথা। ও দেশের নারীদের সন্তানপালনরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যই পালন করতে হয় না। সন্তানের জন্ম হলেই তাকে wet nurse-এর নিকট পাঠান হয় ও একটু বড় হলেই শিশু শিক্ষার

উপযোগী কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হবার জন্য ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। এ প্রকারে মার কাঁধ হতে কর্ত্তব্যের বোঝা অনেকটা অপসারিত হওয়ায় অবসর তার হাতে যথেষ্ট থাকে এবং নূতন কার্য্যের অনুসন্ধানে তাকে ব্যাপৃত হতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের নারীর সন্তান-প্রসব সন্তান-পালন ও শিক্ষা-প্রদান সমস্তই করতে হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিযোগিতা করবার মত অবসর তত বেশী থাকে না। এ জন্যই পাশ্চাত্য দেশের নারীর দাবীর সঙ্গে আমাদের দেশের নারীর দাবীর মূলতঃ অনেক পার্থক্য আছে। নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের প্রয়াস আমাদের দেশে এখনও আবশ্যক বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে ব্যগ্রতা বা আগ্রহের বিশেষ কোন মূল্য নাই। আমাদের দেশের নারী সমাজের প্রধান সমস্যা তাদের Parasitism দূর করা। কেবলমাত্র সাধারণ রকমের গৃহকর্ম্ম ব্যতীত আমরা আর কি করে থাকি? আমাদের আশে পাশে অনেক বাড়ী ছিল, কোথাও নারীর দ্বারা কোন প্রকার অর্থোৎপাদক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখতে পাই নাই। আমাদের বাড়ীর কর্ত্তার মুখেও শুনতে পাই যে আমরা যে গৃহকর্ম্ম করি তার Money value ৮।১০, টাকা মাত্র। একটু অবস্থাপন্ন স্বামীর ভার্য্যা যিনি তার উপার্জ্জন একেবারে শূন্য। সত্যই আমাদের বাঙ্গালী মেয়ের Parasitism এ যুগে সম্পূর্ণরূপে বিকসিত। নারীর এই "পরগাছ"ত্ব বশতঃই আমাদের সংসারে এত অনটন, অভাব এবং এ জন্যই আজকালের যুবকেরা বিবাহের বিরোধী হয়ে উঠছেন, আর যারা বিবাহিত তারা বিবাহের সুখ মর্ম্মে মর্ম্মে টের পাচ্ছেন। বিবাহে আর কি বহন করা বোঝায় জানি না, কিন্তু স্ত্রীর গুরুভার যে বহন করতে হয় তা' আমরা আমাদের স্বামী বেচারাদের বেশ টের পাইয়ে দিচ্ছি। কি করে এই অসহায় Parasitism দূর করে অর্থোৎপাদক শক্তির সঞ্চার করা যায় সেই হচ্ছে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিন্তার বিষয়!

নারীর অকর্ম্মণ্যতা ও বিলাসিতা হতেই জগতের সব জাতিরই ধ্বংসের সূচনা হয়েছে। রোম, গ্রীস ও মিশর সভ্যতার পতনের এও একটী বিশিষ্ট কারণ। গ্রীক সভ্যতার চরম বিকাশের সময় গ্রীক নারী অনেক কাজ করত। কেবলমাত্র যে সাধারণ নারীরাই কাজ করত তা নয়, রাণীরা বা রাজকন্যারা জল টানত, নদীতে যেয়ে বস্ত্রাদি পরিস্কার করত, সূতা কাটত ও বস্ত্রবয়ন করত। এই সব নারীর গর্ভেই গ্রীসের মহাবীর, ভাবুক ও শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন। আবার গ্রীকজাতির পতনের প্রথম ভাগের অবস্থা আলোচনা করলে দেখতে

পাই যে নারী সমাজ তখন অলস, অকর্ম্মণ্য ও বিলাসী হয়ে পড়েছিল। নানাবিধ বেশভূষা দ্বারা দেহ সুসজ্জিত করা ও আমোদ প্রমোদের সুযোগ অনুসন্ধান করাই ছিল নারীর একমাত্র কর্ম্ম। কিন্তু গ্রীকপুরুষ তখনও মানসিক পরিশ্রম পরিত্যাগ করে নাই। সে জন্য সন্ধ্যাকালে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণপাতে পশ্চিমাকাশ যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠে, ঠিক তেমনই গ্রীসের পতনের প্রাক্কালে সেখানে কতকগুলি বড় বড় দার্শনিক ও কবির আবির্ভাবে দেশ জ্ঞান গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পুরুষের জ্ঞান চর্চ্চা দেশকে অধঃপতনের করাল গ্রাস হতে রক্ষা করতে পারল না। অবস্থার বৈষম্য বশতঃ পুরুষ ও নারীর মধ্যে এমনই একটা প্রকাণ্ড ব্যবধানের সৃষ্টি হ'ল যে যৌন আসক্তির প্রাবল্য তাকে ঘোচাতে পারল না। জনসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের গভীরতম ও উচ্চতম বৃত্তির সাহচর্য্য হতে বঞ্চিত হয়ে বিশুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ল। নারীর Parasitism গ্রীসের অধঃপতনের মূল কারণ। জাতির উন্নতি বা অবনতি ব্যাপারে নারীর দায়িত্ব কত গুরুতর তা উপলব্ধি করবার জন্যই এ বিষয়ের অবতারণা করেছি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—"Only an able and labouring womanhood can permanently produce an able and labouring manhood, only an effete and inactive male can ultimately be produced by an effete and inactive womanhood."

আমাদের নিজেদের অবস্থা আলোচনা করলে আমরা বেশ বুঝতে পারব যে এ দেশের মেয়েদের "effete and inactive womanhood" ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। পরিশ্রম বিমুখতা, দারিদ্র্য, অবাধ সন্তান জনন ও আলোক বাতাস সংস্পর্শহীনতার জন্যই এ দেশের নারী স্বাস্থ্যহীন, এবং স্বাস্থ্যহীন ও অকাল মৃত্যুর বশীভূত সন্তানের জননী। আমাদের জাতিটাকে তুলতে হলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে Vote দেবার অধিকার লাভের জন্য লড়াই না করে যাতে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতাও অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথাগুলি দূর করা যায় তারই চেষ্টা আবশ্যক। এর একটা বিশিষ্ট কারণ এই যে, Vote দেবার অধিকার পাওয়া অপরের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে—কিন্তু সামাজিক কুপ্রথার দূরীকরণ আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই সফল হওয়া সম্ভব। আমাদের আর্থিক অধীনতা দূর করা অর্থোৎপাদক শ্রমে লিপ্ত হওয়া সে জন্য অতি সহজেই হতে পারে। এর সঙ্গে এ কথাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজ যে ভাবে গড়ে উঠেছে এবং সমাজের মধ্যে নারীর স্থান যেমনটী আছে তার

বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করে আমাদের কাজ বেছে নিতে হবে। পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা যেখানে হতে পারে,—সেখানে আমরা যাব না, আমাদের কাজ ঘরের মধ্যে বসেই করতে হবে; সন্তান পালন সংসার চালান ও টাকা আনবার কাজ একই সঙ্গে চলবে।

শুনিছি জাপানের match Industry, যা ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে, তা' নারীদেরই Cottage Industry. মেয়েরাই ঘরে ঘরে এ কাজ করে থাকে। কুচবিহার অঞ্চলে কিম্বা আসামে দেখেছি, অনেক মেয়ে বেশ সুন্দর সূতা কাটতে পারে গামছা ও সুজনী বুনতে পারে। মেয়েরা এণ্ডি পোকা পোষে, সূতা প্রস্তত করে ও কাপড় বয়ন করে। বেশ মোটা শক্ত এণ্ডি ১২৲ টাকা হতে ১৫৲ টাকার মধ্যে সেখানে পাওয়া যায়।

Cottage Industryই বাঙ্গালী নারীর একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। মহাত্মা গান্ধি আমাদের সকলকেই সূতো কাটতে বলেছেন। প্রতি পরিবারে গৃহে গৃহে তাঁত বসাতে হবে যদি সম্ভবপর হয় এণ্ডি মুগা বয়ন কার্য্য চালাতে হবে, বেতের কাজ, পুতুল তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে মেয়েদের শিক্ষা পাওয়ার সুব্যবস্থা ও বিক্রয়ের সুযোগ ও সৃষ্টি হওয়া উচিত। বিদেশ থেকে পুতুল তৈয়ারী হয়ে এসে আমাদের দেশের কত টাকা যে নিয়ে যাচ্ছে তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। সেলাই, বুনন প্রভৃতি কার্য্যে মেয়েরা স্বভাবতঃই নিপুণা। আমি দেখিছি যে ৮ একটী মেয়ে নারিকেলের দড়ী দিয়ে এমন সুন্দর পাপোষ তৈরী করতে পারে যার একখানির মূল্য ২৲ টাকার কম কখনই নয়। আমার মনে হয় সংসারের সকল কাজ করেও আমাদের হাতে এত অবসর থাকে যে সেই অবসরটুকু এপ্রকার কাজে ব্যয় করলে আমরাও ২০৲।৩০৲ টাকা অনায়াসে অর্জ্জন করতে পারি।

এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নারীর এ অর্থোৎপাদক শ্রম অবলম্বিত হলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হবে। পুরুষের আয়ের সহিত নারীর আয় যুক্ত হলে সমস্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভাল হবে। স্বামী স্ত্রীকে আর গলগ্রহ মনে করবে না, স্ত্রীও স্বামীকে সাহায্য করতে পারছে মনে করে অসীম আত্মপ্রসাদ লাভ করবে। সামাজিক একটী কুপ্রথা এতে কি প্রকারে দূর হতে পারে দেখাচ্ছি। আমাদের পণপ্রথা যে একটা বড় রকমের কুপ্রথা সকলেই তা এক কথায় স্বীকার করে। এই কুপ্রথার ও উচ্ছেদ এতে সম্ভব হয়। সৌন্দর্য্য সত্যই নারীর একটা বিশেষ সম্পত্তি, পুরুষের চোখে খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। আজকাল সমাজে দেখতে

পাওয়া যায় যে রূপের বদলে অনেক টাকা নিয়ে থাকে, মেয়ের রূপ থাকলে অনেক সময় টাকা কম দিতে হয়। আজকাল আর্থিক সমস্যা এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, যে মেয়ের রূপ নাই সে যদি Cottage Industry দ্বারা স্বামীর সংসার কিছু অর্থাগমের সুবিধা করতে পারে,—লোকে সে মেয়েকে রূপবতী কন্যার মত বিনা পণে গ্রহণ করবে। Cottage Industryর অবলম্বনে যে মেয়ে যত উপার্জ্জন করতে পারবে সমাজে তার দাম তত বেড়ে যাবে। তার বিবাহে পণ প্রদানের আবশ্যকতা বোধ হয় হবে না।

শুনেছি আজকাল সহরে সহরে মহিলা সমিতি স্থাপিত হচ্ছে। প্রত্যেক মহিলা সমিতিতেই এসব কার্য্য প্রচারের ব্যবস্থা আবশ্যক এবং মেয়েদের এ প্রকার শিক্ষার যত প্রকার সুযোগ সম্ভব তারও সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

প্রাণের আবেগে আজ অনেক কথাই বলে ফেললাম। এতে যদি তোদের মনে একটু ভাবনা জাগিয়ে দিতে পারি, তা' হলেই এত কথা বলা সার্থক জ্ঞান করব। তোদের মহিলা সমিতিতে এ বিষয়ে একটু আলোচনা হয়েছে শুনলে খুবই আনন্দিত হব। "চরকার গান"টা আমায় লিখে পাঠাস্। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

তোর—বিমলাদিদি।

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

স্বপ্নময়ী।

যতবার মুখ তুলি' চোখে বলি 'এসো কাছে
তত্তবার ফিরাও নয়ন'
পিয়াস-কুন্ঠিত দেহ, প্রাণ লয়ে নিশিদিন
সীমাহীন একি গো ছলন !

পরশ-সুধার আশে যতবার বাহু মেলি'
সুবাসেরে আকড়িতে চাই,
ভুলে যাই—অই দেহ সজীব আমার কাছে
অশরীরী আর সব ঠাঁই !

'কথা কও' 'কথা কও'—বেজে উঠে কলতানে
মনে মনে নহে এবে মুখে।
মিটে না তিয়াস মম অনুভবি' মনকথা
ক্ষোভ শুধু ছাপি রহে বুকে !

নিশিদিন আধ-জাগা নিমীল নয়ন তব
মেল আঁখি—মেল একবার।
অস্ফুট কলিকা রাশি হতে পারে শোভাময়ী
নাহি নাহি সুবাস সম্ভার !

অই হাসে যেন জাগি' প্রভাত প্রথম আলো
অনিবার ছুটি ছুটি যাই,
চমকি' চাহিয়া হেরি' মিলিয়াছে শেষ-রেখা
চারিধারে কেহ কোথা নাই !

ওগো স্বপনের দেবি ! নদীর কল্লোল গাথা
বসন্তের শীতল সমীর,
ঝরণার কলগানে, ঢালি' সুধা মোর প্রাণে
হিয়া মম করেছ অধীর !

আমার বাসনা মাঝে স্বরূপ লভিছ নিতি
নদী মাঝে বুদ্বুদ সমান
জলে জাগি' মিশে পুনঃ অনিবার সত্তাহীন
নাহি তাহে নাহি কভু প্রাণ !

জাগো জাগো স্বপ্নময়ি ! তৃষাতুর এ জগতে
মনে মনে নহে—এবে মুখে,
দেহ, মন দোঁহে মিলি সৃজন করেছে মোরে—
দাও মুছে পিয়াস দোঁহার !

পুষ্পে, পুষ্পে মধু হাসি থাক কিম্বা নাহি থাক
হাসি তব বহুক ছাপিয়া
তটিনীর কলতান যায় যাক্ মিশে যাক্
কণ্ঠ তব উঠুক বাজিয়া !

এক পদ ফিরে যাই, আর পদ ফিরে আসি
মুখ ফিরি চাহি মুখ পানে !
মনে হয় অই বুঝি ম্লান হ'য়ে এলো আঁখি
মুখ ভার হ'ল অভিমানে !

যাক্ বিশ্ব ডুবে যাক প্রলয়ের উর্ম্মিজলে
তুমি থাক একান্ত আমার,
স্বরগের অধিষ্ঠান যাক্ মম টলে যাক্
খুলে দাও মরম-ভাণ্ডার !

যাক্ বর্ষা চলে যাক্ শীত গ্রীষ্ম হিমকাল
নাহি চাই—কিছু নাহি চাই !
শুধু যেন বসন্তের অফুরন্ত মাধুরিমা
ফাঁকি দিয়ে নাহি পায় ঠাঁই !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

অনাথা।

চার বৎসর পর শৈলেনের সঙ্গে হ্যারিসন রোডে হঠাৎ দেখা। সে এক উড়ো হাওয়ার মত এমন ভাবে ছুটে চলেছিল যে ডেকে ফেরানো যায় না। কাজেই ছুটে গিয়ে একেবারে তার সাম্না সাম্নি দাঁড়ালাম।

"আরে, কিরণ যে! My goodness! চল্—একটা কাজ সেরে নিয়ে—বাড়ী চল্ আজ আর তোকে ছাড়্‌ছিনি" ব'লে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চ'ল্‌লো।

সারকুলার রোডে একটা বড় বাড়ীর সাম্নে এসে হঠাৎ সে থেমে আবার তখুনি আমায় টেনে নিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকল। গাড়ী বারান্দার সামনে একটা ঘড়ী টাঙ্গান ছিল। সেই দিকে চেয়ে শৈলেন বলল :—"যাক, দেরী হয় নি—এখনো দেখা করবার প্রায় আধ ঘণ্টা সময় আছে।"—

আফিসের মত একটা কুঠ্‌রীতে আমরা প্রবেশ করলাম। একটি মধ্য বয়সের ভদ্রলোক চেয়ারে বসে টেবিলের উপর খাতাপত্র নিয়ে লেখাপড়া করছিলেন। শৈলেন ঘরে ঢুকে তাঁকে নমস্কার করল। তিনি প্রতিনমস্কার করে সহাস্য বদনে আমাদিগকে পাশের চেয়ারে বসতে ব'ল্‌লেন।

শৈলেন চেয়ার টানতে টানতে ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করল "খুকী কেমন আছে প্রসন্ন বাবু?"

প্রসন্ন বাবু তাঁর লেখা বন্ধ করলেন। চোখের চসমাটি কপালের উপর টেনে তুলে শৈলেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "আরে মশাই, সে তো থাকে ভালই, বেশ আনন্দে। আপনি এসেই তো যত গোলমাল বাধান।"

শৈলেন। তবু আস্তে আস্তে একটু স্থির হয়ে আসছে, কেমন? আগের মত অতটা আর নেই।

প্রশন্ন বাবু। হাঁ, অনেকটা কম বলেই তো বোধ হয়। যাই হোক, আজ আবার দেখা করবেন নাকি? তার পাখী এনেছেন তো?

শৈলেন। হাঁ, এনেছি। আজো একবার দেখা করেই যাই, কি বলেন?

"চলুন" বলে প্রসন্ন বাবু তখনই উঠে আমাদিগকে ভিতরে নিয়ে চললেন। কচি ঘাসে ছাওয়া আঙ্গিনায় এক ঝাঁক ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়ে ছুটোছুটি করে খেল্‌ছিল। তাদের উল্লাসধ্বনি সমস্ত বাড়ীখানিকে যেন হাসিয়ে তুলেছে।

প্রসন্নবাবু শৈলেনকে বললেন "সে ওখানে নেই, ছাতে কাণামাছি খেলছে।"

লম্বা লম্বা দুই প্রস্থ সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা ছাতে এলাম। শৈলেন চিলের ঘরে উঠে, সেখানেই থেকে গিয়েছিল। ইচ্ছে সে আগে তার সঙ্গে দেখা কর্‌বে না।

ছাতটি বেশ প্রশস্ত, চারিদিকে উচু প্রাচীরে ঘেরা। প্রায় কুড়ি পঁচিশটি ছেলে মেয়ে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে সেখানে খেলা করছিল। সন্ধ্যা গগণের রক্তিম আভা তাদের কচি কচি আনন্দোজ্জ্বল মুখ মণ্ডলে পড়ে এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করছিল। মেয়েদের লাল ফিতা সমেত এলো চুলগুলি তাদের ক্রীড়াচাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে নৃত্য করছিল।

প্রসন্নবাবু ডাকলেন "খুকী", আর অমনি পাঁচ ছয় বৎসরের ফ্রক পরা একটি হাস্যমুখী বালিকা এসে তাঁর হাত ধরে ঝুলতে আরম্ভ করল আর শিশুসুলভ অভিমানের সুরে বলল "কৈ দাদাবাবু, আমার পাখী? মা পাখী আন্‌বে?"

প্রসন্নবাবু মেয়েটির বিক্ষিপ্ত এলো চুলগোছায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন "আনবেরে—আনবে ;—আচ্ছা খুকী' বলতো এ কে ?"

খুকী প্রথমে আমার দিকে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে তাকাল, কিন্তু তক্ষুনি আবার হেসে উঠে ছুটে এসে আমার চাদর ধ'রে টান লাগাল ; তার বোধ হয় বিশ্বাস হয়েছিল আমার চাদরের মধ্যেই তার আকাঙ্ক্ষিত পাখীর ছানা লুকানো আছে।

ঠিক সেই সময়ে শৈলেন একটি রবারের পাখী হাতে করে মেয়েটির সামনে এসে বলল "এই যে, খুকী, তোর পাখী এনেছি", হঠাৎ খুকীর প্রফুল্ল মুখ একেবারে কালী হয়ে গেল। সে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে মুখ লুকাল।

ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। শৈলেন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। অনেকক্ষণ ধরে প্রসন্নবাবু খুকীকে কত বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তবুও কি যেন এক অজ্ঞাত ব্যথায় সে থেকে থেকে ফুপিয়ে উঠ্‌ছিল ; যেন শৈলেনের দেওয়া পাখী সে ছুঁলোও না।

কথায় কথায় শৈলেনদের বাড়ী এসে পৌছোলাম। তখন রাত্রি হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কিন্তু, শৈলেন, ও মেয়েটার ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না ।"

শৈলেন বলল ;—"সে বড় করুণ কাহিনী। শৈলেন গল্পটা ব'লে গেল।"

"ও হ'ল এক গরীব অনাথা মেয়ে বছর দুই হ'ল ওকে আমি আমাদের দেশ থেকে এনে ওই অনাথা শ্রমে রেখে দিয়েছি। মাসে খরচ যা লাগে আমিই দিই। ওর সঙ্গে কেমন করে আমার দেখা হ'ল ব'ল্‌ছি।"

সে বার ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে আমি বাড়ী গেলোম। শান্ত পল্লীর বুকে সে নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা বড় আনন্দ ময়। কলিকাতায় বন্দী জীবনের রুদ্ধশ্বাস ব্যথাটা গ্রামের অনাবিল উল্লাস পুলকের মধ্যে নিমেষে হারিয়ে যায়। প্রবাসীর প্রাণের আনন্দে সারা গ্রামখানি আনন্দিত হ'য়ে উঠে।"

"তুমি জান আমি নৌকো চড়তে ভালবাসি। সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় ঝোপে ঝাড়ে ঘেরা খালটির ভিতর দিয়ে নিজে হাতে নৌকো বেয়ে যাওয়ার—সে কি আনন্দ!

"সে দিন একটু বাদলা মত হয়েছিল। গ্রাহ্য না ক'রে—সন্ধ্যার সময় আমি আমাদের গ্রামের ছোট্ট নদীটির ধারে ছুটলাম। খেয়া ঘাটের কাছে একখানা ডিঙ্গি বাঁধা ছিল। এদিক ওদিক চেয়ে কাকেও না দেখে ডিঙ্গিটি স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে তাতে উঠে পড়লাম।

"স্রোতের অনুকূলে অনেক দূর চলে গেলাম উজানে যে অতটা পথ একা নৌকো ঠেলে ফিরতে হবে তা আমার তখন খেয়াল হয় নি।

"রাত্রি নয়টা বেজে গেল, কিন্তু তখনো আমি অর্দ্ধেক পথ ফিরতে পারলাম না। আকাশে মেঘ আরো ঘনীভূত হয়ে এল—বৃষ্টিও জোরে নামল। অন্ধকার ভেদ করে বাতাস পাগলের মত ছুটতে আরম্ভ করল। ঝিঁ ঝিঁ ও ব্যাঙের ডাক এক সঙ্গে জড়িয়ে গেল—সে এক অপূর্ব্ব সুর। আমি প্রাণপণে বৈঠা চালাতে লাগলাম।

"হঠাৎ ডান তীর থেকে এক করুণ স্বর কানে এল—'কে যাচ্ছ বাবা, আমাকে দয়া করে পার করে দেও না!"

"আমি চমকে উঠলাম। আওয়াজ লক্ষ্য করে সেই দিকে নৌকা নিয়ে তীরে গিয়ে ভিড়ালাম। চকমকি জ্বেলে কেরোসিনের ডিবেটা ধরিয়ে দেখলাম কাদার মধ্যে এক থুরথুরে বুড়ী ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। আমি যেতেই সে ক্রন্দন সুরে বলে উঠল 'বাবা, ভগবান তোমায় ভাল করবেন, আমায় পার করে দেও।'

বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ;—

"সেই তীরেই পাঁচ সাত রশি তফাৎ তার কুঁড়ে ঘর। তার "উপযুক্ত" ছেলে বছর দুই হ'ল কলেরায় হঠাৎ মারা যাওয়াতে বুড়ীর দুর্গতির শেষ নেই। অনেক কষ্টে বুড়ী তার বিধবা পুত্রবধূ ও শিশু নাতিনীটির গ্রাসের ভাত জুটাচ্ছিল। কিন্তু আজ প্রায় পনের দিন হ'ল তার পুত্রবধূ রোগে শয্যা গ্রহণ করেছে। অসুখ কিছুতেই কমছে না, পয়সা নেই যে ওষুধ ক'রবে। আজ সন্ধ্যার সময় থেকে বৌটির অসুখ খুব বেড়েছে, বড় ছট্‌ফট্ করছে। তাই বুড়ী কেবার ওপারের

বাঘদীঘি গ্রাম থেকে হারু কবিরাজকে হাত পায়ে ধরে আনতে চলেছে। এখান থেকে পার হতে পারলে খেয়াঘাটে যাবার জন্যে তাকে বেশী দূর ঘুরতে হবে না, ফেরার সময় না হয় সে খেয়া দিয়েই আসবে!

তার কথা শুনে আমার সমস্ত হৃদয়টা ব্যথায় ভরে উঠল। হায়, এত দুঃখীও মানুষ থাকে! সত্তর বছরের অথর্ব্ব বুড়ী আজ স্নেহের টানে একা এই অন্ধকার বাদল রাত্রে গৃহ ছেড়ে নদী পার হতে এসেছে। বাঘদীঘি গ্রাম নদীর ওপার থেকে প্রায় দুই মাইল হবে। বুড়ী কতক্ষণে সেখানে পৌছবে? কতক্ষণেই বা আবার বাড়ী ফিরবে? তার শিথিল কম্পিত দেহ-যষ্টি বৃষ্টি বাতাসে হয় তো এই রাস্তার মধ্যেই কোথায় ভেঙে পড়বে। আর সে যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তাও তো অনিশ্চিত। কবিরাজ কি এই দুর্যোগে বিনা পয়সায় দরিদ্রার প্রার্থনায় কর্ণপাত করবে?

"আমি বুড়ীকে বললাম 'বুড়ী, আমিও একজন ডাক্তার; চল, তোমার বৌকে দেখে ওষুধের ব্যবস্থা করব।'

"কৃতজ্ঞতায় বুড়ীর চক্ষু ছলছল করে উঠল। আকাশের দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে সে শুধু বলল 'ভগবান তোমায় সুখী করবেন!'

"নৌকাখানি সেখানে বেঁধে বুড়ীর সঙ্গে চললাম। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপটা এসে আমাদের মুখে বিঁধতে লাগল। ঘাট ছেড়ে একটি ছোট মাঠ পেরিয়ে কতকগুলি বাঁশঝাড় দেখলাম—বাঁশঝাড়ের পিছনে পাড়া। সেই পাড়া দক্ষিণে রেখে আমরা বাঁ দিকের পথে গেলাম। আর একটা মাঠ দেখা গেল। খানিক দূর যেতেই সেই মাঠের উপরকার কয়েকটি গাছ দেখিয়ে বুড়ী বলল ওই আমার ঘর।'

"বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম 'তোমার ঘর মাঠের মধ্যে কেন? আর কোন বাড়ী তো ওখানে দেখছি না।'

"বুড়ী দুঃখের একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল 'আমার ছেলের কয়েক বিঘে ভূঁই ছিল ওখানে। দেখাশুনার সুবিধে হবে বলে ছেলে গাঁ থেকে ঘরটা ওখানে তুলে এনেছিল। অদৃষ্টের কথা কি

বলব বাবু, ছেলে মরার পর জমিটুকু ভাগে করতে দিয়েছিলাম, কিন্তু এককণা ফসলও পেলাম না। যাকে ভাগে দিয়েছিলাম সেই ও জমিটুকু মালেকের কাছ থেকে লিখে নিল। গরীব মেয়ে মানুষ, কি করব, বাবা? এবার শুনছি, আমাদের কুঁড়েটুকুও নাকি ওখান থেকে তুলে দেবে!'

"শুনতে শুনতে বুড়ীর কুটীরে এসে পৌছলাম। ঘরের ঝাঁপ বন্ধ ছিল। ঝাঁপের রন্ধ্রগুলি দিয়ে অতি ম্লান আলোরশ্মি দেখা যাচ্ছিল! বুড়ী আস্তে আস্তে ঝাঁপটি সরিয়ে আমাকে ডাকল "এসো বাবু।"

"বুড়ীর পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম ছিন্ন মলিন একখানা কাঁথার উপর একটি শীর্ণদেহ যুবতী কাত হয়ে শুয়ে আছে. আর তার মাথার কাছে বসে একটি তিন চার বৎসরের উলঙ্গ শিশু একটা ভাঙ্গা পাখা দিয়ে বাতাস করছে। ঘরের এক কোণে উপুড় করা হাঁড়ির উপর একটি কেরোসিনের ডিবা ধূম উদ্‌গীরণ করছিল।"

বুড়ী শিশুটিকে দেখিয়ে বলল "দেখছ বাবু দিদিমণির কত বুদ্ধি। যাওয়ার সময় ওকে বলে গিয়েছিলাম—মাকে বাতাস দিস্—সেই থেকে ও বসে বসে বাতাস দিচ্ছে। বড় লক্ষী মেয়ে।—হাঁ রে দিদিমণি, মা ঘুমিয়েছে?"

"শিশু গম্ভীর ভাবে 'হাঁ' সূচক ঘাড় নেড়ে চুপি চুপি বলল 'কত বাতাস করে তবে ঘুম পালালাম। তুমি তেতিও না, ঠাকুমা, তালে মা এক্‌কুনি উথে, আবাল ছৎফৎ ক'লবে—অসুখ কলেছে কিনা।"

"রোগিনীকে দেখবার জন্যে কাঁথার উপর গিয়ে বসলাম। হঠাৎ সন্দেহে আমি কেঁপে উঠলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম যুবতীর প্রাণ বায়ু অনেকক্ষণ বেরিয়ে গিয়েছে।"

"শিশুটি তখনো মাকে বাতাস দিচ্ছিল আর ঘুমে ঢুলছিল। তার ভয় হচ্ছিল পাছে আমি তার মাকে নাড়া চাড়া করে জাগিয়ে ফেলি।"

"বুড়ীকে বুক ভাঙ্গা খবর দিতে হ'ল। সে আছাড় খেয়ে প'ড়ে কেঁদে উঠলো।" সরল শিশু তখনো বুড়ীকে শাসন ক'রে ব'লছে—'চপ কল ঠাকুমা, মা উথে পলবে যে, তুমি বদ্দ দুত্তু।"

"বুড়ী ঘরের দাওয়ায় এসে মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছিল। বাতাস উদাসী দরবেশের মত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অাঁধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা খুঁটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি চোখের জল মুছতে লাগলাম।"

"ঠাকুমার চীৎকার সত্বেও মা জেগে উঠে দুষ্টামি আরম্ভ করল না দেখে মেয়েটি বোধ হয় আশ্বস্ত হল। বুড়ির মন্দীভূত বিলাপ ধ্বনি ঘুম পাড়ান সুরে গিয়ে শিশুর কানে পেঁছিতে লাগল। সে তার মায়ের কোলে মাথা রেখে অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ল।"

"অনেকক্ষণ পরে বুড়ী একটু স্থির হল। আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল 'বাবা, একটা ব্যবস্থা করে দেও। মড়া ঘরে বাসি হলে আমার দিদিমণির অকল্যাণ হবে।"

"কাছেই গ্রামে আমাদের কয়েক ঘর প্রজা ছিল। তারা বুড়ীর স্বজাতীয়। সেখানে গিয়ে সমস্ত রাত ঘুরে ঘুরে, কাউকে মিনতি করে, কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে বা লোভ দেখিয়ে, লোক আর কাঠ জোগাড় করে আনলাম।"

"মৃতদেহ যখন শশ্মানে নিয়ে আসা হল তখন প্রায় ভোর। মাকে জড়িয়ে বেঁধে আনতে দেখে মেয়েটি ভয়ানক কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। তাকে কোন রকমে ঠেকাতে না পেরে বুড়ী তাকে সঙ্গে ক'রে শশ্মানে এনেছিল। সমস্ত রাস্তা সে 'মা মা' বলে চীৎকার করে লুটোতে লুটোতে এসেছে। কিন্তু যেই মৃতদেহ শশ্মানে নামান হল অমনি মেয়েটি কান্না বন্ধ করে ছুটে এসে তার মায়ের কোলে এসে ব'সলো। আমি চোখের জল ধ'রে রাখ্তে পারলুম না।"

"শব চিতার উপর শোয়ানো হল। মেয়েটি ছুটে গিয়ে তার মার মায়ের কোলে উঠতে চায়। আমি তাকে জোর করে দূরে টেনে নিয়ে গেলাম। তাকে বুকে চেপে ধরে আদেশ দিলাম—"আগুন দাও।"

"আগুন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এক অস্বাভাবিক চীৎকার করে আমার কোলের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল।"................

"এর পর যখনই আমি বুড়ীর বাড়ী খোঁজ খবর নিতে যেতাম, মেয়েটি আমাকে দেখেই মা মা করে চেঁচিয়ে উঠতো।" আমি ব'লতাম "মা খাঁচা ভরে নীল পাখী আনতে গিয়েছে—আমি মাকে শুদ্ধ পাখী নিয়ে আসবো—তুই কাঁদিস নি!"

"মাস দুই পরে বুড়ীও মরে গেল। শিশুটির আর কেউ রইল না। আমি তাকে পাখী দোব ব'লে এখানে নিয়ে এলাম। পাখীর স্মৃতিটা এখনও ঐ শিশুর মনে সবুজ হ'য়ে র'য়েছে—কিন্তু আমি যে ভয়ানক মিথ্যে কথা ব'লেছি।"

শ্রীসুধীরকুমার গোস্বামী।

"বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই একটা কথা

পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি যখন পাটনায় ছিলাম তখন বৈশাখ মাসের পরিচারিকা পাইয়া দেখিলাম যে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মহাভারতী মহাশয় অসাধারণ বিদ্যাবত্তাপূর্ণ "বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ" নাম দিয়া আর একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ সাহিত্য সাগরে ভাসাইয়াছেন। তাহার পুচ্ছ সংলগ্ন পাদটীকা রূপ ছোট নৌকাগুলিও যথাপূর্ব্ব বিদ্যা বোঝাই। সত্য সত্যই বলিতেছি যে অখিলবাবুর বিদ্যার প্রসার ও গভীরতা বিস্ময়কর। আমি তাঁহার একটী কথার প্রতিবাদ করিব বলিয়া তখনই ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু নানারূপে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকায় তাহা ভুলিয়া গেলাম। পরে এতদিন নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কয়েকদিন হইল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত পল্লীতে আসিয়া রহিয়াছি। এমন সময়ে জ্যৈষ্ঠের পরিচারিকা পাইয়া তাহাতে সেই প্রবন্ধেরই দ্বিতীয় ভাগ দেখিলাম। উহা দেখিয়াই আমার পূর্ব্বকার ইচ্ছার কথা মনে হইল। সমগ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত না হইলে তাহার মুখ্য বিষয়ের সমালোচনা করা যায় না। কিন্তু যখন লিখিতেই বসিয়াছি প্রবন্ধ লিখিতে অবান্তর দুই একটা কথা সম্বন্ধে অল্প দুই একটা মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। আশাকরি সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া স্থান দিবেন।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশটা অখিলবাবু বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি করিয়া লিখিয়াছেন নতুবা তাহাতে "আর্দ্র অর্থাৎ ভিজা" দেখিতাম না। কেন না অখিলবাবু নিশ্চয়ই এরূপ মনে করেন না যে যাঁহারা পরিচারিকা পাঠ করেন তাঁহাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁহারা আর্দ্র শব্দের অর্থ জানেন না।

অখিলবাবু প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পূজ্যপাদ ব্যক্তিদিগের প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। সকল মহামহিম ব্যক্তি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাদের সময়ের, জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়াই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের লব্ধ জ্ঞানালোকে যদি তাঁহাদের জ্ঞান কথা ভ্রান্তি বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা শ্লেষ না করিয়া সোজা কথায় বলিলেই ত চলে। বিশেষত ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাই এ সকল বিষয়ে পূর্ব্বেও আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এখনও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাই নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন। অন্ততঃ তাঁহারা আমাদিগকে প্রকৃত সত্য পথ ধরিবার উপায় বলিয়া দিতেছেন। পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি যেমন উইল্‌সন্, ম্যাকসমূলার প্রভৃতির নির্দ্দেশিত পথে চলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়েও তেমনই ভাণ্ডারকর, রুদ্রপট্টন, এবং স্বয়ং অখিলবাবু প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা মার্শল্, মাক্‌ডোনাল্ড্, উড্‌রফ্ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত আলোকের সাহায্যে নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বকার ইয়োরোপীয়েরা নিজের প্রথম প্রচেষ্টার ফলে যদি প্রচুর আলোক নাই পাইয়া থাকেন তাহা হইলেও তাঁহারা ভক্তি ভিন্ন শ্লেষের পাত্র কখনই হইতে পারেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে ভ্রান্ত আলোক লইয়া যে সকল বাঙ্গালী ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও আমার এই উক্তি প্রযোজ্য। তাঁহারাও ভক্তিভাজন।

অখিলবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে পুরাণগুলির বহুল অংশের লোপ হইয়াছিল। সুতরাং নব কালের পুরাণগুলি দেখিয়া যদি উইল্‌সন্ তাহাদের বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে দোষই এমন কি হইয়াছে?

মহাভারতে কোন পুরাণের নাম উল্লিখিত থাকিলেই যে সেই পুরাণ মহাভারতের পূর্ব্বে লিখিত একথা অখিল বাবু বেদবাক্য স্বরূপ মানেন। কিন্তু মহাভারতে যে কত প্রক্ষিপ্ত অনুপ্রবেশিত হইয়াছে তাহা কি অখিল বাবু ভুলিয়া গিয়াছেন? মহাভারতের অনুক্রমণিকা

অধ্যায়ে লিখিত আছে যে প্রথমে ব্যাস ২৪,০০০ শ্লোকে ভারত সংহিতা রচনা করেন। সুতরাং অবশিষ্ট ৭৬,০০০ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। আর যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে ব্যাসই নিজে পরে তাহাতে এই ৭৬,০০০ শ্লোক সংযোজন করিয়া এক লক্ষ শ্লোক পূর্ণ করিয়াছিলেন তাহা হইলেও বর্ত্তমান মহাভারতে ১,৬০,০০০ শ্লোক হইল কেমন করিয়া? এখন যে মহাভারতে ১,৬০,০০০ শ্লোক আছে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের বাঙ্গলা অনুবাদের মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য।

অখিল বাবুর বিশ্বাস যে ব্যাসই সমগ্র ভারত রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়নকে পড়াইয়া ছিলেন এবং বৈশম্পায়ন তাহা জনমেজয়কে পড়িয়া শুনাইয়া ছিলেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখা যাউক যে এই সংবাদটা সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে কি না। ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল অন্যূন ১০০ বৎসর। ব্যাস ছিলেন তাঁহার জন্মদাতা। সুতরাং ব্যাসের বয়স তখন অন্যূন ১২৫ বৎসর। ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পরও যুধিষ্ঠির ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন যে হেতু ৩৬ কলি অব্দে তিনি পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তাহার পর পরীক্ষিৎ ও কিছু দিন রাজত্ব করার পর জনমেজয় রাজা হইলেন। তখন পর্য্যন্ত ব্যাস যে কেবল বাঁচিয়া ছিলেন তাহা নহে—তিনি তখনও মহাভারতের মত প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। একথা কয় জন লোক বিশ্বাস করিতে পারেন?

অখিল বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ৩,০০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল। অথচ তিনিই বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫,০০০ বৎসরে অথবা কলির প্রারম্ভে সেই যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধ বর্ণনার পূর্ব্বে মহাভারতে যে জ্যোতিঃ সংস্থান আছে তাহা দেখিয়া একজন গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে সেই যুদ্ধ ৫,০০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দেই হইয়াছিল। এই কথা আমি অনেক দিন হইল একখানা মাসিক পত্রিকায় পড়িয়াছি। কিন্তু পত্রিকার নাম, লেখকের নাম প্রভৃতি কিছুই মনে নাই।

অখিল বাবু প্রমাণ না দিয়াই বলিতেছেন যে বঙ্গরাজ চন্দ্র সেন ও সমুদ্র সেন যাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারা যে কুলীন ক্ষত্রিয় ছিলেন "তৎ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।" আমিও সেইরূপ প্রমাণ না দিয়াই বলিতেছি যে মহাভারতের এই অংশ যে প্রক্ষিপ্ত

তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন আমার আর একটা বক্তব্য এই যে পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও যাঁহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহারাও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতেন। বল্লাল সেন রাজা হইয়াছিলেন সুতরাং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এক তাম্রফলকে বা প্রস্তরফলকে তিনি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অথচ তিনি যে বৈদ্য বংশীয় একথা তিনি স্বীয় "দানসাগর" পুস্তকে লিখিয়াছেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াও যুদ্ধ করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিও আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহাকে বধ করায় অর্জ্জুন বা ধৃষ্টদ্যুম্নের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় নাই।

অতি অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়েরা বিশ্বাস করিতেন যে মানবসৃষ্টি ৫,০০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহারা অখিল বাবুর উপহাসাস্পদ। তাঁহাদের এই বিশ্বাস বাইবেলের অর্থবাদের ফল। এখন এক Saturday adventist ব্যতীত খৃষ্টীয় সকল সম্প্রদায়ই অর্থবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমগ্র হিন্দুসমাজ কিন্তু এখনও যে, পুরাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অর্থ-বাদী। অথচ গীতায় বেদবাদপর অর্থাৎ বেদের অর্থবাদী লোকদিগের নিন্দা আছে। আয়ুর্ব্বেদ-বাদরত কত বৃদ্ধ এখনও চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া এই আশা পোষণ করেন যে তাঁহারা অচিরেই পুনর্যৌবন লাভ করিবেন।

"ধার্ম্মিক" শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হউক তাহা বাঙ্গলা ভাষায় কেবল মানুষের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু অখিল বাবু ধার্ম্মিক আচার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া* অখিল বাবু ধর্ম্ম কর্ত্তা প্রভৃতি না লিখিয়া ধর্ম কর্তা লেখেন। বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে কিন্তু লোকে দুইটা ম এবং দুইটা ত

---

* রায় বাহাদুরের পদানুসরণ করিয়াই যে—অখিলবাবু "ধর্ম", "কর্তা" ইত্যাদি লেখেন এরূপ বলা যায় না। ব্যাকরণের প্রাচীন সূত্রই বলিতেছে—রেফাক্রান্ত বর্ণ দ্বিত্ব হইবে—বিকল্পে। ভারতীভূষণ মহাশয়ের এ বানান সম্ভবতঃ সেই বিকল্পবাদ। ঐ স্থানে ব্যাকরণ পুনরায় সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে রেফাক্রান্ত বর্ণ দ্বিত্ব হইবে বিকল্পে কিন্তু দুইটী মহাপ্রাণ বর্ণ অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ একত্র হইলে পূর্ব্বটী অল্পপ্রাণ হইবে। সেইজন্য—"গর্ত্ত", "ধনুর্দ্ধর" প্রভৃতি বানান। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও রেফাক্রান্ত বর্ণে দ্বিত্ব করেন নাই। সঃ।

উচ্চারণ করে। ধর্ম্ম শব্দে দুইটা ম উচ্চারিত হয় কিন্তু থর্ম মিটার এবং দর্মাহাটায় একটী মাত্র ম উচ্চারিত হয়। ধর্ম্মের দুইটা ম উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহার প্রকৃত রূপ ধর্ম্ম। কর্ত্তার দুইটা ত উচ্চারিত হয় বলিয়া অশিক্ষিত লোকেরা ইহাকে 'কত্তা' বলে। পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু অশিক্ষিত লোকে বলে কর্‌তা। হিন্দী "কিয়া কর্তা হ্যায়" এই দুই বাক্যের কর্ত্তা এবং কর্ত্তার উচ্চারণ ভিন্ন।

যাহা হউক এই সকল অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রবন্ধের প্রথম ভাগে লিখিত যে কথাটার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলাম এখন তাহাই বলিতেছি। বৈশাখের পরিচারিকায় অখিল বাবু লিখিয়াছেন যে রামচরিত প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী কায়স্থ ছিলেন। এই সংবাদটা কিন্তু ভুল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে সন্ধ্যাকর নন্দী জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন যে তিনি কায়স্থ ছিলেন। অপর পক্ষে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই দুই মত খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সন্ধ্যাকর বৈদ্য ছিলেন। এই তিন জনের কে কি যুক্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমার মনে নাই। আমার যতদূর স্মরণ হয় শাস্ত্রী মহাশয় কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। সন্ধ্যাকর নিজে যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা "করণ্য" শব্দ আছে। ইহাকে করণ শব্দ ভাবিয়াই অক্ষয় বাবু সন্ধ্যাকরকে কায়স্থ বলিয়াছেন। কিন্তু একেত করণ্য শব্দ আভিধানিক নহে তাহাতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা কখনই 'করণ' বলিয়া পরিচিত হন নাই। করণ্য শব্দ সম্ভবত বরেণ্য বা বরেন্দ্র শব্দের লিপিকর প্রমাদ। সুতরাং সন্ধ্যাকরকে কেবল করণ্য শব্দের বলে কায়স্থ বলা যাইতে পারে না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যুক্তির একটা কথাও আমার মনে নাই। আমি নিজে যে cumulate probabitilyর উপর নির্ভর করিয়া সন্ধ্যাকর নন্দীকে বৈদ্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা এই :—

১। গণিত বেত্তা শুভঙ্করের নাম বাঙ্গলা দেশের সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি নন্দী বংশীয় বৈদ্য ছিলেন। একথা প্রাচীন বৈদ্য কুলগ্রন্থে লিখিত আছে। মুগ্ধবোধ প্রণেতা বোপদেব গোস্বামীও নন্দী বংশীয় বৈদ্য ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস গোস্বামী ও নন্দীবংশীয় বৈদ্য ছিলেন। যে বংশে এই সব খ্যাতনামা বিদ্বান্ ছিলেন সেই বৈদ্যকুলেই সন্ধ্যাকর নন্দীর জন্ম হওয়া সম্ভব।

২। অন্য পক্ষে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থেরা সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চা করিবার অধিকারী বলিয়াই বিবেচিত হইতেন না। যদি এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিত যে কায়স্থেরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইবার পর তাঁহারাও তাহাতে প্রবেশ লাভের অধিকার পাইতেন। কায়স্থ লিখিত গণনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ আর একখানিও আছে ইহা কি অখিল বাবু বলিতে পারেন? যেমন বাঙ্গালীদের মধ্যে ভীষ্ম বা নেপোলিয়ানের মত কোন লোকের জন্ম হওয়া অসম্ভব কায়স্থকুলেও পূর্ব্বকালে সেইরূপ সংস্কৃত গ্রন্থকার হওয়া অসম্ভব ছিল। বিশেষ সন্ধ্যাকর নন্দীর মত গ্রন্থকারের।

সন্ধ্যাকরের জাতিটা যখন তর্কস্থলীয় তখন তাঁহার জাতির উল্লেখ না করিলেও চলিত। বিশেষতঃ তিনি কোন্ জাতীয় ছিলেন সে কথাটা অখিল বাবুর আলোচ্য প্রবন্ধে সম্পূর্ণ irrelevant বা বিষয় বহির্ভূত।

এখানে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ দেশে কায়স্থেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান প্রভৃতিতে অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অকারণে বৈদ্য দিগকে গালাগালি দেন কেন এবং প্রধান প্রধান বৈদ্যকে কায়স্থ বলিয়া জানাইতে চাহেন কেন তাহা বুঝা যায় না। এক দিন এক জন কায়স্থ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এক সভায় কায়স্থ দিগের মহত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিলেন বল্লাল সেন কায়স্থ ছিলেন। আমি কায়স্থ সাহিত্যের মোটে একখানা কি দুইখানা বই পড়িয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে যে শুভঙ্কর কায়স্থ ছিলেন। সেদিনকার রামপ্রসাদ সেনও নাকি কায়স্থ ছিলেন। আর কৃষ্ণনগরের রাজ সভায় ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কাশীরাম দাস খুব সংস্কৃত জানিতেন ইত্যাদি। এরূপ করায় লাভ না হইয়া বরং বিপরীত হয়। *

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

---

* আমরা লেখকের সহিত একমত নই

অনন্তলাল।

—ঃ৹ঃ—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
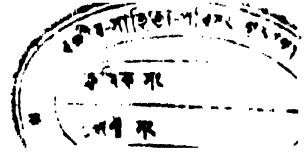
আশ্রমটি বনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিদধিক একক্রোশ পথ না যাইলে বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া লোকালয় পাওয়া যায় না। এ দেশে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রারম্ভে এ সকল স্থানে ডাকাতের ভয়ানক উপদ্রব ছিল, এবং এই বন মধ্যে তাহারা লুকাইয়া থাকিত। যেখানে আশ্রম হইয়াছে তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ ছিল। দস্যুগণ ঐ বৃক্ষতলে নরবলি দিয়া কালীপূজা করিয়া, ডাকাতি করিতে যাইত।

আশ্রমটি প্রকাণ্ড। ইহার চতুর্দ্দিক মৃৎপ্রাচীরে বেষ্টিত! অনন্তলালেরা যখন আশ্রমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন উহা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর, একজন প্রাচীন বৈষ্ণব উহার অর্গল মোচন করিল এবং সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলে পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ভিজিতে ভিজিতে তাড়াতাড়ি যাইয়া, নিকটস্থ একটি ঘরের দাওয়ায় উঠিল।

সদর দরজা পূর্ব্বমুখী। অনন্তলালেরা ভিতরে প্রবেশ করিয়াই একটি বড় উঠানে উপস্থিত হইলেন। উঠানের পশ্চিম সীমায় একটি পূর্ব্বদ্বারী মাটির ঘর। ঘরের দাওয়া উচ্চ। তদুপরি একজন জটাজুটধারী রামাইৎ বৈষ্ণব বসিয়া পাটের সূতা কাটিতেছিল। অনন্তলালেরা সেই কর্দ্দমময় প্রাঙ্গন উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাওয়ার নীচে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাড়ী কোথায়?"

হিন্দুস্থানীরা বহুদিন বাঙ্গালা দেশে বাস করিলেও বাঙ্গালা বলিতে গেলে যেমন তাহাদের কথায় হিন্দি টান থাকিয়া যায়, এই ব্যক্তির বাঙ্গালা কথাতেও তেমনি হিন্দি টান ছিল। স্বামীজী পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বৈষ্ণবটির সহিত কি কথা কহিতে পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। তিনি একণে সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"বাবা চিনিতে পারেন না?"

বাবাজী তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"ওহো! আসুন, আসুন উপরে উঠে আসুন। এত বৃষ্টিতে কোথা থেকে? সেদিন কাশী থেকে আপনার পত্র পেয়েচি। আপনাদের আরও দুদিন আগে আসবার কথা ছিল।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"আজ্ঞে, কার্য্যের গতিকে দেরি হয়ে গেল।"

পরে প্রাঙ্গন হইতে সকলে উপরে উঠিলেন। তখন স্বামীজী যোড়হাত করিয়া বাবাজীকে অভিবাদন এবং বাবাজীও "নমো নারায়ণ" বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন ও উভয়ে অল্প অল্প হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে, অনন্তলাল, হরিশ সাহু ও ভৃত্যটি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বাবাজীও "কল্যাণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"সুন্দরলাল!"

"আজ্ঞে যাই" বলিয়া ভিতর হইতে একজন উত্তর দিল। পরক্ষণে মস্তকের ঊর্দ্ধদিকে কেশ বাঁধা, জানুর নীচে পর্য্যন্ত আল্‌খাল্লা পরা শ্মশ্রু ও গুম্ফ পরিশূন্য ত্রিংশৎ বৎসরের কিছু অধিক বয়স্ক গৌরবর্ণ এক ব্যক্তি যাইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। এই ব্যক্তিকে দেখিলে স্ত্রীলোক কি পুরুষ, স্থির করা কঠিন হয়। তাহাকে দেখিয়া বাবাজী বলিলেন,—"দুবটি জল নিয়ে এসো।"

হরিশ বলিল,—"আমাকে ঘটি দেন, আর ঘাট দেখিয়ে দেন, আমি জল নিয়ে আস্‌চি।"

হরিশ তখন নিজের জাতি ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অনন্তলাল ভুলেন নাই। গঙ্গাজলে দোষ নাই বলিয়া তিনি রতনপুরে তাহার জল লইয়া ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এ গঙ্গাজল নহে অতএব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। সঙ্গের ভৃত্যটি নরসুন্দর, অনন্তলাল তাহাকেই জল আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

হরিশ ব্যাগ হইতে শুষ্ক কাপড় ও জামা বাহির করিয়া দিল এবং অনন্তলাল আর্দ্র পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন। স্বামীজীও শুষ্ক কৌপিন বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন। অনন্তলালের পদ হইতে দুই জানু পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও শরীরের স্থানে স্থানে ছিটাফোটা কর্দ্দম লাগিয়াছিল। হরিশ ও ভৃত্যের সাহায্যে সে সকল ধৌত করিয়া তিনি একবার ঘড়ি দেখিলেন।

তখন বেলা তিনটা, তাঁহার আফিস যাইবার সময় হইয়াছে। বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, এখন ভোজনের কি হবে? একটু জলযোগ করুন।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"আমাকে একটু মিষ্টি দিলেই হবে। আমি দিনমানে আর কিছুই খাব না।"

"তাই কি হয়?" বলিয়া স্বামীজী বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আশ্রমে দুগ্ধ পাওয়া যাবে?"

বাবাজী বলিলেন,—"হাঁ, আমার দুগ্ধবতী গাভী আছে।"

"তবে, এঁর জন্যে একটু গরম দুধ আনিয়ে দেন।"

কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে দুই বাটি গরম দুগ্ধ এবং হরিশ ও ভৃত্যের জলযোগের জন্য গুড় ও মুড়ি আসিল। অনন্তলাল অহিফেন ও দুগ্ধ সেবন করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় এক দৃষ্টে বাবাজীকে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিতেছিলেন, এই ব্যক্তিই সেই দ্বাপরযুগের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনিই বেদ-বেদান্ত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চাক্ষুষ ও তাঁহার সহিত কত কথোপকথন করিয়াছেন। ইনি কি সেই শরীরেই বর্ত্তমান আছেন? এঁকে দেখিলে ত পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসরের অধিক বয়স বলিয়া বোধ হয় না। এঁর মুখে ত্রেতাযুগের অনেক গল্প শুনতে পাওয়া যাবে। তবে এখন নয়, সে সব কথা পরে জিজ্ঞাসা করিলেই হবে।

অনন্তলালের চরিত্রে একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোন কথা বিশ্বাস করাইতে পারা যাইত। আবার যত শীঘ্র বিশ্বাস, তত শীঘ্র অবিশ্বাসের ছায়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিত।

সে যাহা হউক এই ব্যক্তিই সেই দ্বাপরযুগের ব্যাসদেব, সাত জন অমরের এক জন এ বিশ্বাসের প্রতিকূলে কোন তর্ক মনোমধ্যে উদিত হইলে, তাহা খণ্ডন করিতে এক্ষণে আর দ্বিতীয় লোকের আবশ্যক হইবে না। তিনি নিজেই নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া সেই প্রতিকূল তর্ককে নিরাকৃত করিবেন।

একবার তাঁহার মনে হইল যে, ইনিই যদি বেদব্যাস তাহা হইলে সামান্য গৃহীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন কেন? আবার ভাবিলেন, দ্বাপর যুগেও বদরিকাশ্রমে ইঁহার আশ্রম ছিল, ব্রাহ্মণী ছিলেন, শুকদেব নামে পুত্রও হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও ইঁহার মাহাত্ম্য থর্ব্ব হয় নাই। অনাসক্ত পুরুষের এ সকলে দোষ হয় না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তলাল প্রত্যক্ষীভূত ব্যাসদেবকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত সুন্দরলাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মহারাজ এঁদের পাক শাকের কি হবে?"

তখন বাবাজী অনন্তলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, আপনাদের পাকের কি হবে? ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আর, আমার শিষ্য। ইনি পাক করলে হবে ত?"

অনন্তলাল বলিলেন,—"বিলক্ষণ! তা আবার জিজ্ঞাসা করচেন? খুব হবে।"

স্বামীজী দেওয়ালে হেলান দিয়া, আসনে বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ঈষৎ নিদ্রা আসিয়াছিল। ইঁহাদিগের কথাবার্ত্তা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন "হবে, হবে।"

তখন সুন্দরলাল প্রহৃষ্টান্তকরণে পাক করিতে গেল। সে যাইলে অনন্তলাল বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এঁর জন্মস্থান কোথায়? আর, ইনি কতদিন আপনার শিষ্য হয়েচেন?"

বাবাজী বলিলেন,—এঁকে আপনারা চিন্‌তে পারচেন না, কিন্তু ইনি আপনাদের অপরিচিত নন্। এঁরি মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীমদ্ভাগবত শুনেছিলেন।"

অনন্তলাল ব্যস্ততাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনিই কি শুকদেব গোস্বামী?"

বাবাজী অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া বলিলেন "হাঁ ইনিই সেই শুকদেব গোস্বামী। পরীক্ষিতকে গোপীভাব বর্ণনা করে অবধি ইনি এত দিন তাহাই সাধনা করে আসচেন এবং এই জন্মে এঁর শরীরে সেই গোপী ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয়েচে।"

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে দুইজন লোকে দুইখানি লাঙ্গল স্কন্ধে ও চারিটি বলদ গরু সঙ্গে করিয়া আসিয়া প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইল। বাবাজী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে, আর ক দিনে লাঙ্গলের কাজ শেষ হবে ?"

তাহাদিগের একজন বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা আর দু দিন লাগ্‌বে।"

"যা এখন গরুকে খেতে দিগে যা।"

এই বলিয়া বাবাজী আসন হইতে উঠিয়া তাহাদিগের সহিত আশ্রমের উত্তরাংশে খামার বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন,—"অনন্তলাল দেখচ ? সুন্দরলাল লোকটা কে তা—শুন্‌লে ? তা ছাড়া, মহাত্মার কার্য্যকলাপ দেখে কিছু ঠাওরাবার যো আচে ? যেন ঘোর বিষয়ী। মনে থাকে যেন যে, এঁরই কলম—'কুত্রাপি ন নিবধ্যতে—লিখছিল।

অনন্তলাল বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ; এ ভঙ্গি বোঝা কঠিন। আর, এখানকার সবই রহস্যময়।"

কিছুক্ষণ পরে বাবাজী আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তলাল কৌতুহল আর অধিকক্ষণ দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, একটি প্রার্থনা কর্‌ছিলাম।"

"কি প্রার্থনা ?"

অনন্তলাল বিনীত ভাবে বলিলেন,—"আজ্ঞে দ্বাপরযুগের যে সকল ঘটনা আপনি স্বচক্ষে দেখেচেন, তার দু একটি গল্প শুন্‌তে চাই।"

"দ্বাপরযুগের গল্প ? তা কেমন করে বল্‌ব ?"

তখন স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বাবা অনন্তলাল ভিতরকার খবর সব জানে।"

বাবাজী মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"সে সব কথা এ কলিযুগে বল্‌বার উপায় নাই। ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়েচে।"

এ সম্বন্ধে অনন্তলালের সকল আশা ফুরাইল। তিনি এবার স্বামীজীর মুখের দিকে চাহিলেন। পরে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বৈষ্ণবটি ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিল। অনন্তলালও উঠিয়া প্রথমে বাবাজীকে পরে স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। বাবাজী এক বৃহৎ ঝোলা বাহির করিয়া, মালা জপ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এ সময়ে অনন্তলাল রুদ্রাক্ষের মালা জপ করেন। কিন্তু শক্তিমন্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া তিনি সে মালা বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। একবার কর জপিতে উদ্যত হইলেন। আবার ভাবিলেন, সে মন্ত্র যখন ত্যাগ করিতে হইবে তখন আর জপ করিয়া কি হইবে?

হরিশ্চন্দ্র ঝোলা লইয়া, এক পার্শ্বে বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল।

বাবাজী জপ করিতে করিতে অনন্তলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কখন দেখেচ বলে মনে হয়?"

"আজ্ঞে, না।"

"তাই বা কেমন করে হবে, তোমার পূর্ব্বজন্মের কথা ত কিছুই মনে নাই।"

অনন্তলাল অবাক হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"আপনি সে ক্ষমতা দিলেই মনে হবে।"

বাবাজী বলিলেন,—"এঁর পূর্ব্বজন্মের মন্ত্র গ্রহণ করে, কিছু দিন জপ করলে, সে ক্ষমতা আপনিই হবে।"

এই সময়ে সুন্দরলাল যাইয়া বলিল, "মহারাজ, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত।"

"আচ্ছা" বলিয়া বাবাজী, সকলের ভোজনের বন্দোবস্ত করিতে রন্ধনশালায় গমন করিলেন, এবং তাহার অল্পক্ষণ পরে সকলে উঠিয়া ভোজন করিতে গেলেন।

আহারাদির পর বাবাজী তাঁহার প্রাচীন শিষ্যটিকে বলিলেন,—"তুলসীদাস, তোমার ঘরে এঁদের বিছানা করতে হবে।"

তখন তুলসীদাস ও অনন্তলালের ভৃত্য, সকলের পৃথক পৃথক শয্যা রচনা করিল। অনন্তলালের অনুরোধে স্বামীজী প্রথমে যাইয়া একটি শয্যা অধিকার করিলেন, এবং পথশ্রান্তি বশতঃ শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। অনন্তলাল শয়ন করিতে যাইয়া দেখিলেন নিকটে একটা কিসের গর্ত্ত রহিয়াছে। তিনি তুলসীদাসকে বলিলেন,—"বাবা, মাথার গোড়ায় এ যে একটা গর্ত্ত রয়েচে।"

তুলসীদাস বলিল "উস্‌সে কুচ্ ডর্ নেহি—আপনি ঘুম্ করুন। ও চুয়াকা গর্ত্ত। হামি রোজ এই ঘরে থাকি।"

কিন্তু অনন্তলাল "ঘুম্ করিতে" সাহসী হইলেন না। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বাবাজী অপর ঘর হইতে বলিলেন, "বাবা, কিছু ভয় নেই, সাপে কিছু করতে পারবে না। আমি গরুড় দেবকে তোমার পাহারায় রাখ্‌লাম।"

হরিশ্চন্দ্র গর্ত্তটি বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টায় শয্যা হইতে উঠিতেছিল কিন্তু বাবাজীর অভয় বাণী শুনিয়া আর উঠিল না। অনন্তলালও "যে আজ্ঞা বাবা," বলিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। হরিশ ও ভৃত্যটি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিল, শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্তলালের ক্লান্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি ভাবিলেন, একে ভাদ্রমাস তাহাতে বনের অভ্যন্তর; এসকল স্থানে সর্প থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। যদি সাপ বাহির হয়, তহা হইলে আর রক্ষা নাই। তবে তাঁহার নিকট মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গরুড়দেবকে পাহারা রাখিয়াছেন। মহর্ষির কথা কি মিথ্যা? মিথ্যা ত নয়—আর যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে ত প্রাণ নষ্ট হইবে। মহর্ষি যাই বলুন, এ ক্ষেত্রে তাঁর কথায় বিশ্বাস করিয়া থাকা চলে না। প্রাণের অপেক্ষা বড় কিছুই নাই। আলোটিও তুলসীদাস শুইবার সময়ে নিবাইয়া দিয়াছে। এ সকল স্থানে সমস্ত রাত্রি আলো থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

এই সকল চিন্তা করিতে করিতে অনন্তলাল দেশলাই জ্বালিয়া লণ্ঠন ধরাইলেন। তুলসীদাসের তখনও নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"ফিন্ কেন দীপ্ বারলে?"

অনন্তলাল উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে, রাত্রিকাল,—একটা আলো থাকা ভাল।"

"আরে বাঙ্গালী তোমারা বিশ্বাস নেঁহি হ্যায়।"

এই বলিয়া তুলসীদাস পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতে লাগিল।

প্রদীপ জ্বালিয়া অনন্তলাল পুনরায় শয়ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বুঝিলেন গৃহস্থ সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তখন উঠিয়া নিঃশব্দে খিল খুলিলেন, এবং লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বাহিরে একেবারে উঠানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। তিনি ভিজিতে ভিজিতে উঠান হইতে কতকটা কর্দ্দম উঠাইয়া লইলেন। পরে, পুনরায় নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্দ্দম দ্বারা গর্ত্তের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিলেন। পরে, হস্ত ধৌত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলেন।

তিনি আশা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ বেদব্যাসের সঙ্গ লাভ করিয়া, তাঁহার মুখে দ্বাপরযুগের অনেক কথা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভারতে বর্ণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের গল্প শুনিয়া চির কৌতূহলের নিবৃত্তি করিবেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র বাবাজী বলিলেন যে, কলিযুগে সে সব কথা বলিবার উপায় নাই কারণ ভগবানের নিকট তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইয়াছে। যাহা হউক তখনও এক একবার আশা হইতেছিল যে, কথা প্রসঙ্গে তিনি অবশ্যই দ্বাপর যুগের দুই একটি গল্পও বলিয়া ফেলিবেন।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুন্দরলালের শুকদেব গোস্বামীর কথা মনে পড়িল। অনন্তলাল বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সুন্দরলালের মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

তিন বছর।

—*—

"এই যে—নমস্কার।"

এই বলে যোড়করা হাত দুখানা আনাগোছে কপালে ছুঁইয়ে 'রঞ্জিত' যাকে সৌজন্য-সম্ভাষণ জানালে—তিনি তরুণী এবং সুন্দরী।

মন্দির থেকে বেরোবার মুখে দোরের কাছে এ অভিনন্দন! মুন্না ঈষৎ একটু থতমত খেয়ে ঘাড়টা বেঁকিয়ে নমস্কার ফিরিয়ে দিলে, তা'পর জিগ গেষ কর্‌লে,—"আপনার কি কিছু বল্‌বার আছে?"

"হ্যাঁ এই দু'একটা কথা—"

"তা—বলুন না।'

টেরীর ভাঁজের চুলের গোছাটায় বার কতক টান মেরে—রঞ্জিত ব'ল্লে,—"কথাটা হ'চ্ছে—কেমন দিনটা আজ?"

"বেশ রাতটা—দিব্যি চাঁদ উঠেছে।"

পুলকে শিউরে উঠে রঞ্জিত জবাব দিল,—"দিব্যি চাঁদ উঠেছে—না?"

"হ্যাঁ—কিন্তু আপনার কি এই খবরটাই শুধু"—

মুনাকে শেষ ক'র্‌তে না দিয়েই রঞ্জিত তাড়াতাড়ি জবাব দিলে,—"না—না—দেখুন ঐ যে ছোকরাটি—বুঝলেন?"

"কোন্ ছোক্‌রাটী?"

ঐ যে—ছোক্‌রাটী! কি আর এমন চেহারা? রোজ সাবান মাথ্‌লে আমাদের রঙও ওরকম ফরসা হ'ত। বাবড়ী ধরণে চুল রেখে মাঝখান দিয়ে সীথি কাঁটা নাকের ওপর "পাঁসনে" চস্‌মা—ওঃ? ভাবে বুঝি ভারি কায়দা—বুঝলেন?—

"কিন্তু তিনি কে?"

"চিন্‌তে পার্‌লেন না?"

"না!"

"সে—কী ?—সেই যে—সে বছর তিনেক আগের কথা—ভিক্টোরিয়া ইস্কুলের প্রাইজের দিন—আপনি যে গান গাইলেন !—সে দিন ইন্‌ষ্টিটিউটের সিঁড়ির ওপর সুমুখো সুমুখি দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা কইছিল না একজন ?

"আমার তো কই মনে নেই !"

"মনে নেই ! সে—কী ? তাকে মনে নেই ?"

"মনে নেই !"

"আচ্ছা আরো ব'ল্‌ছি !—সেও বছর তিন হ'ল—শ্যামবাজার এসপ্লানেড ট্রামে—একদিন আপনি সেনেটের কাছে ট্রামে উঠ্‌তেই—একজন লাফিয়ে উঠে আপনাকে জায়গা ছেড়ে দিলে—তা'পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আপনার সঙ্গে অনেক কথা ব'ল্‌লে !

"সে রকম কথা আপনাদের মত কত জনে—কত দিনইতো ব'লেছেন।"

"না না সে কত জনের ভেতর নয়—সে একজনই—আপনি যে তাকে চিন্‌তেই পাচ্ছেন না—অবাক ক'ল্লেন দেখ্‌ছি !"

"আচ্ছা তাই কি ! আপনি কি ব'ল্‌বেন তাঁর কথা—বলুন না !"

"কি আর ব'ল্‌বো !—ও ছোক্‌রা ভয়ানক দম্‌বাজ ! জোচ্চোর—যে 'থিসিস' দিয়ে ও পি, এইচ, ডি হ'য়েছে—সে আমারি লেখা—আমার খাতা থেকে "ক্লু" চুরি ক'রে—বুঝ্‌লেন ?

"বুঝ্‌লাম—ভয়ানক অন্যায় ত !"

"দেখুন তো—কি অন্যায় ! কি রকম ফেরেববাজী। তা'পর আবার মুখের ওপর আমায় পাগল ব'লে গেল !"

"কেন ?"

"কি জানি !—ল'-এর ওপর আমি একটা থিসিস লিখিছি জানেন, ওকে দেখালুম—কাব্য, কলার সঙ্গে মেশানো আইনের সে এক—"ফার্ষ্ট ক্লাস" থিসিস—চমৎকার—ওরিজিনাল।"

"তাই প'ড়ে—আপনায় পাগল ব'ল্‌লেন ?"

"তাই পড়ে!—দেখুন তো কি রকম "ইম্‌পারটিনেন্স্"। বল্‌ছি শুনুন—থিসিস্‌টা কি আমার। "Merchant of Venice"এ পোর্শিয়া যে এক জন ডক্টরের গাউন পরে গিয়ে সাইলকের কেস্‌টা একেবারে জাহান্নমে দিয়ে এল—সাইলকের মত লোক কি তা ছাড়বার পাত্র? সে একটা মামলাবাজ সওদাগর! সে তখ্‌খুনি ছদ্মবেশ ফাঁসিয়ে বার করে বল্লে—এ "ফল্‌স্ পারসোনিফিকেসন্" "কোর্টকে" "চিট্" করা হয়েছে। এ বিচার চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না—এই অবধি লেখা হয়েছে—বলুন তো নতুন থিসিস্ নয়?"

"কে বলে নতুন নয়—এযে একটা রিসার্চের মতন রিসার্চ—এই থিসিস্ পড়ে—আপনায় পাগল বল্‌লে?"

"এই থিসিস্ পড়ে! আরে আমি কি তোর চেয়ে কিছু কম? গোল্‌ড মেডেলিষ্ট তুই—আমিও ফার্ষ্ট ক্লাশ—তাপর ফিলজফির ডক্টরেট—সে তো আমারি থিসিস্ চুরি ক'রে!"

"নইলে তো —আপনারই ডক্টরেট পাবার কথা!"

"তা থাক্‌গে—সেজন্যে আমার দুঃখ নেই—ডক্টরেট এবার আমি পাবই—"

"আমাদের শুভ ইচ্ছা।"

"আন্তরিক ধন্যবাদ! কিন্তু বলুন তো আমি কি ওর চেয়ে খারাপ ছেলে?"

"কে বল্‌বে এ কথা! বরং মেয়েরা কেউ আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেলে—ধন্য মান্‌বে!"

"না না সেটা আমি অবিশ্যি বড়াই করে—তা থাক্ কিন্তু তাই আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না করাই ভাল—কখন যে ঠকিয়ে বসে!"

"অশেষ ধন্যবাদ—আপনি যে সাবধান করে দিচ্ছেন! কিন্তু লোকটাকেই তো আমি চিন্‌তে পাল্লাম না।"

"অ্যাঁ—আপনি এখনো বুঝ্‌তে পারেন নি? আচ্ছা আর একদিনের কথা বল্‌ছি—"

"বলুন দয়া করে—"

"এক দিন সন্ধ্যা বেলা আপনাদের গাড়ীবারান্দার ওপর একখানা দোলনা চেয়ারে বসে আপনি কি যেন সেলাই কর্‌ছিলেন। এমন সময় এক জন কে-যেন যাচ্ছিল নীচ দিয়ে—আপনি তার দিকে লক্ষ্যও করেন নি—আর তা কর্‌বেনই বা কেন অ্যাঁ?"

"হ্যা—"

"কিন্তু সে-নির্লজ্জ, লোফার ওপর পানে কেবলি চাইছিল—আপনি হঠাৎ দেখে ওর কুৎসিৎ দৃষ্টিটা এড়াবার জন্যে উঠতে যাবেন—হঠাৎ আপনার কোমরে আলগোছে গোঁজা রুমাল-খানা টুক্ করে গরাদের পাশে পড়ে হাওয়ায় উড়ে একেবারে নীচে চলে গেল—সে অমনি টক্ করে সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে মুখের কাছে তুলে ধরলে—কি পাজী! আপনার মুখ তখুনি রাঙা হয়ে উঠলো—রক্ত-গোলাপের মত!

"লজ্জায়?"

"লজ্জায়!"

"কি রকম দেখালো মুখখানা?"

"সে কথা বলতে পারবো না—বলতাম—যদি ঐ রাস্কেলটা—"

"ওর নামটা কি—একটা কোনো—কুসুম রায়?"

"হ্যা হ্যা—সুহাসকুসুম রায়—ঠিক ধরেছেন;—কিন্তু সাবধান—সে একটা রোগ, রাস্কেল রাফিয়ান—"

"থাক্ থাক্ আর বলবেন না—তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে—সেও আজ তিন বছর।"

রঞ্জিত বিদ্যুতের মত ধাঁ করে মুখ ফিরিয়ে—এক দম বোঁ ছুট্!

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মাসকাবারী

-০:।:০——

এবার আষাঢ়ে মেঘের মাদল তেমন গুরু গুরু বাজে নাই;— বাদল ঝরিয়াছে বটে কিন্তু নেহাতই ঝুরু ঝুরু। মাসিকেও রসধারা সুতরাং অতীব তিরি তিরি বহিয়াছে। কারণ মাসিক সাহিত্য এবং সাহিত্য যাহা তাহা স্বাভাবিক—বর্ষা আর বাদল দে'য়া বা মেঘ এদের মত স্বাভাবিক আর কি হইতে পারে—কাজেই রসধারা বারিধারার সমানুপাতে ঠায় চলিয়াছে!— স্বাভাবিক সাধু!

সাহিত্যিক, বা সাহিত্য সুরসিকদিগের কাছে এক "রসস্য" না হোক সন্দেশ অন্ততঃ নিবেদন করিবার আছে। ভাদ্রে তাল পাকাইতে কিনা জানি না তবে বেতালের বৈঠক বসাইতে যে নয় সে কথা নিঃসন্দেহ মাসিকের কুঞ্জে সবুজ পত্র আবার দেখা দিবে। বিজ্ঞাপনে তাহার রঙ্গিন কিসলয়—ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইয়াছে। প্রবীন সাহিত্যিক প্রমথনাথ প্রৌঢ় হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী চিরন্তন কালের জন্য কচি—লেখা কাঁচা—অবশ্য তাহা ভাবে নয় রঙে—পত্রগুলি সুতরাং সবুজ! প্রবীনের লিখন এ পত্রিকাখানির আমরা পূর্ব্বাহ্নেই অভিনন্দন করিতেছি স্বাগত বরণ করিয়া বলিতেছি—"এস সুন্দর এস সাকি!" ভয় নাই, ব্যাকরণ ভুল করি নাই সাকী তরুণী নয়—তরুণ-ই, বরং বলি কিশোর।

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"—প্রবাসী এবার নির্ব্বাসিত যক্ষের কাহিনী মনে করাইয়া দিবার জন্য অমর কবি কালিদাসের মেঘদূতের উপর রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতা মেঘদূত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধন্যবাদ। অনেকদিন পরে পুরাতন কথা আর প্রৌঢ় মনে পুরানোদিনের স্মৃতি মনে পড়িয়া সত্যই প্রাণে মধুর অনুভব আসিবে।

"মেটার লিঙ্কের" উপর প্রবন্ধটী (প্রবাসী, আষাঢ়) সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত; সুচিন্তিত বলিলেও অন্যায় বলা হইবে না। জীবের ব্যথা মেটার লিঙ্কের মনে কেমন ধরিয়া কোনখানে আঘাত দিয়াছিল সে কথাগুলি বেশ সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় ভাল করিয়া বলা হইয়াছে। দৈন্য, বেদনা ও দুঃখ সম্বন্ধে মেটার লিঙ্কের বোধ ও ধারণা যাহা তাঁহার Pellias Et Melisando "পেলিয়াসেত মেলিসাঁদে" অর্থাৎ পেলিয়াস এবং মেলিসান্দানাটকে স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া দিয়াছেন আর্কেল বলিতেছে—

"They can make their lives marvelous so that even if sorrow comes to them it will first have become beautiful; and he makes her say that she is glad to have suffered"—

এ "সি"—বা' সে নারী হউক—সত্যটা যাহা—মেটারলিঙ্ক বলিলেন—তাহা শুধু নারীরই কথা নয় নর নারী সকলেরই সম্বন্ধে উহাই তাঁহার অন্তরের বাণী। বেদনা ও ব্যথার এই বোধ তাঁহার "মেরী মাকডালেন" মোন্নাভান্না ইত্যাদি সবগুলি নাটকের মধ্যে একইভাবে একই পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মেরী মাকডালেন অবিশ্বাসীর হাতে যে অপমান যে অকরুণ

আঘাত পাইলেন—মোন্না ভান্না—আপনার মন ও মানসের বিরুদ্ধে যে কর্ত্তব্যের জন্য কঠোর সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিলেন তাহা অনবদ্য, অনিন্দ্যসুন্দর, beautiful. রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই একই কথা বলিয়াছেন—

"দুঃখের পরে পরম দুঃখে, তারি চরণ বাজে বুকে"।

আমরা প্রবন্ধটীর বাস্তবিকই প্রশংসা করিতেছি—লেখক অনেক সমস্যা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, "মেটার লিঙ্কের" পাঠকদের পক্ষে তাহা টীকা বা ভাস্যের কাজ করিবে।

মেটার লিঙ্ক বেলজিয়ান লেখক, নাট্যকার, রচনা লেখক, এক কথায় সাহিত্যিক, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "লোয়াজো বা নীল পাখী" নাটকের উপর তিনি নোবেলের সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। মেটারলিঙ্ক বেলজিয়ান হইলেও তাঁহারা পুস্তকগুলি ফরাসী ভাষায় লিখিত। মেটারলিঙ্ক মিষ্টিক কিন্তু তাঁহার মিষ্টিসিজমের একটা বৈশিষ্ট এই যে তিান মানব মনের মিষ্টিক হেতু বাদকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহার রচনাবলীর আদ্যন্তই এই কথাটার মূলসুরে প্রতিধ্বনিত তাঁহার কথা—

"We have in our mystic reason a possession perhaps equivalent to a religion."

পূজার তত্ত্ব—সীতাদেবীর গল্প ইহাতে পূজা হয়তো আছে তত্ত্বও থাকিতে পারে কিন্তু তথ্য কিছু মাত্র নাই। সীতাদেবীর হাতের মধু গল্পটীর ফাঁকে ফাঁকে ঝরিয়া মিঠা নৈবিদ্য প্রচুর পরিবেষণ করিয়াও গিয়াছে—কিন্তু মোটের উপর গল্পটী ছোটই হইয়াছে গল্প হয় নাই।

এবারকার ভারতবর্ষে অনেকদিন পরে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের মনস্তত্ত্বের উপর লেখা পড়িলাম। ডক্টর সেন সম্ভবতঃ—খানিকটা অলস—এবং কিছুটা খেয়ালী। লেখা দিয়া দুনিয়ার উপকার করিবার তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনায় ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু এবারকার প্রবন্ধটী—আশার বাণী শুনাইয়া গিয়াছে। ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিবার ও জানিবার আমাদের আগ্রহ রহিল। এ প্রবন্ধটী মুখবন্ধ হিসাবে চমৎকার। মুখবন্ধ বলিয়াই বোধ হয় কিছু ছোট—কিন্তু বড় বস্তুর সন্ধান ইহার মধ্যে প্রচুর আছে।

অবসান—মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত গল্প। শ্রীযুত রামেন্দু দত্তের লেখা। ইহার মধ্যে অবসান হইয়াছে—গল্পের নায়িকার—সঙ্গে সঙ্গে গল্পেরও, নেহাৎ মামুলী—প্রেমের কথা।

দুই বন্ধু একজনদের বাড়ীর এক মেয়েরই প্রেমে পড়িলেন। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর সিঁড়ির ধাপেরই মত পরীক্ষাগুলিকেও এ দুটী তরুণ নায়ক—টকাটক পার হইয়া গেলেন। কোন কষ্ট হইল না—বরং আরো জল পানি পাইলেন। তা'পর এক বন্ধুর বুকে বাজ পড়িল—তার বক্ষ পঞ্জরের উপর গড়িয়া ওঠা প্রেমের তাজমহল দীর্ঘশ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহার বন্ধুর সঙ্গে সে মেয়ের বিবাহ হইল—তাহার বন্ধুটী মাতাল। এইখানে লেখকের একটা বড় ত্যাগ দেখাইবার ব্যর্থ চেষ্টা আছে। চেষ্টাটাই কিন্তু অক্ষমতা'র বেড়াজালের মধ্যে এমন হাঁফাইয়া উঠিয়াছে যে তাহা শেষ পর্য্যন্ত করুণ বা মহীয়ান না হইয়া হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বন্ধু তাঁহার প্রেমের প্রতিমাকে দান দিয়া বন্ধুকে মদ ছাড়িবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। কথাটা ভাল কিন্তু ফোটে নাই। তা'পর মেয়েটা একটা ছেলে ও মেয়ে রাখিয়া মরিয়া গেল নেহাৎ ছেলেমানুষী কনক্লুসন—কিছু পাওয়া গেলনা—না রস—না মধু—'ন চ' আট।

ভারতবর্ষে নরেনবাবুর "গরমিল" শেষ হইল। বোয়ার্ণসর বাহাদুরী তিনি বজায় রাখিতে পারিলেন না গল্পটার দেশী ছাঁচে ভাল ছাপ উঠিল না। অমন বস্তুটী—এমন করিয়া তুলিলেন যে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে—তাহা যতখানি ঠিক উপভোগ্য হওয়া উচিৎ ছিল—ততখানি উপভোগ্য হইল না।—মূলের কদরও নষ্ট হইল।

মাণিকবাবুর "রক্তকমল" গল্প।—কমলের পাঁপড়ীও আছে—রক্তও আছে কিন্তু রক্তকমল এক সঙ্গে সমাস বাঁধিয়া ফুটে নাই। মাণিকবাবু বোধ হয় এখন অতি "হেলা-ছেদ্দা" করিয়া গল্প লিখিয়া যান। গল্পের সরস্বতী অবশ্য কোন মতে তাঁহাকে ছাড়িতে না পারায় খেংড়া খাইয়াও তাঁহারই ঘরের আনাচে কানাচে আনাগোনা করেন—অথচ মাণিকবাবু পঞ্চ প্রদীপ আর পুষ্প মাল্যে তাঁহাকে বরণ না করিয়া কাড়া নাকাড়া ঢাক বাজাইয়া দেবীকে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। এ অবহেলা ভাল নয়—সুনামে কলঙ্ক পড়িবে।

জ্ঞানের ডাক প্রভৃতি আরো উৎকৃষ্ট ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। বিস্তারিত অন্য সময় বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রাবণে প্রবাসীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ—ভারতীয় বিবাহ যেমন মধুর তেমনি তত্ত্ব এবং তথ্য পূর্ণ। ভারতীয় সমাজের বিবাহ সম্পর্কীয় সমস্যার কথাও কবি নিপুণ ভাবে

আলোচনা করিয়াছেন। অতি অপূর্ব প্রবন্ধ—আমরা সকলকে ইহা পড়িতে অনুরোধ করি।

গোবিন্দদাসের কড়চার ঐতিহাসিক আলোচনা বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকদিগের উপকারে আসিবে। ভেড়াঘাট নামটা হাস্যরস হইলেও ঐতিহাসিক মূল্য ইহার কম নয়।

শ্রাবণের ভারতবর্ষে বাঙ্গলার মেয়েদের সম্বন্ধে "দরদীর" প্রবন্ধটী চমৎকার এবং সুখপাঠ্য! ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন এ সম্বন্ধে এই রকমেরই একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা "দরদীর" সহিত এক মত।

পুরুষের বাইজী লইয়া বাগানে যাওয়ার প্রতিপক্ষে মেয়েদের বাবুজী লইয়া রাস্তায় বাহির হইবার ভয়ে যাহারা সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন—দরদী তাঁহাদিগকে মাভৈঃ বাণী শুনাইয়াছেন। আশ্চর্য্য যে কবির দলের পালটা কথা কাটাকাটীর মতন এ রকমের বাদ প্রতিবাদ এবং হেতুবাদ সাহিত্যের পৃষ্ঠায় স্থানপায় এবং আমরা তাই পড়ি! বাইজী লইয়া বাগানে বাহির হওয়াটা কি পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সাধারণ? লেখক এতবড় ধৃষ্ট কথাটা অনায়াসে বলিয়া ফেলিলেন? ছিঃ!

তা'পর লেখা পড়ার কথা!—বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি মেয়েদের উপযোগী কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর যাই হউক তাহা লইয়া তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে শিক্ষা ছেলেদের সহিত মেয়েরা এখন পাইতেছেন—তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুকূল না হইলেও—সেই মেয়েদের কর্ত্রী আমাদের বড় বেশী ব্যাকুল হইবার কিছুমাত্র সঙ্গত কারণ নাই। আমি একজন মেয়ে স্কুলের মিষ্ট্রেসকে জানি—তিনি বি-এ, পাশ। তাঁহার স্বামী বি-এ, ফেল। কিন্তু এই পাস করা মেয়েটীর দাম্পত্য জীবনে কল-কলহ তো শুনিই নাই বরং তিনি ছেলে রাখেন, রান্না করেন, ভাত বাড়েন, স্বামীকে খাওয়ান এবং নিজে খান। বিলাসিতার কথা—আমাদের এ বয়সে একটু পাউডার মাখা গন্ধ ওড়ানো—ভাব মনে হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাঁহার মাসে ৩০ খানি সাবান লাগে না। আমি তাঁহার জমা খরচ দেখিয়া লিখিতেছি আর এক শিশি কেশতৈল একদিনেও ফুরায় না। তা ছাড়া আমার অনেক বন্ধু, বান্ধবকে বয়সের জোয়ার দিনে নেহাৎ কচি, ঘোমটা ঢাকা, নিরক্ষর "বউ"এর জনাও ওরকম অনেক গন্ধ টন্ধ কিনিতে দেখিয়াছি। সেটা হইতেছে রূপ, রসের কথা—যৌবন দিনের ফাল্গুনী খেয়াল—তাহা বিদ্যা শিক্ষা; ডিগ্রি পাওয়া বা সহবতে মেলা মেশার উপর

নির্ভর করে না। তা' করিলে কি আমার কবিরাজদার বউ সরোজ বৌঠান টোলে পড়া টীকি-রাখা পণ্ডিতের অসূর্য্যম্পশ্যা স্ত্রী হইয়াও সাবান মাখিত না সাড়ীর আঁচলে নাগকেশর ঢালিত!

স্বাধীনতাটা যতখানি বাহিরের জিনিষ তার চেয়ে বেশী মনের জিনিষ। এই মনের খোরাক যদি যোগাইতে পার—তবে অন্দরেই রাখ আর বাহিরেই বাহির কর—কিছুতেই ক্ষতির আশঙ্কা নাই কিন্তু মনকে না গড়িয়া যদি ঢাকনা দিয়া শুধু ঢাবিয়া রাখিতে চাও গামলা চাপা চালানী মাছের মত তাহা শুধু পচিয়াই উঠিবে—মিঠা আর তাজা থাকিবে না।

কিছুই না বলিয়া যে কথা বলা যায়—প্রবাসীর "চিত্তরঞ্জন" তাহার নম্বর পহেলা প্রমাণ। প্রবাসী ব্যবসাদারী যেটুকু দরকার তাহার কিছুই ছাড়েন নাই—চিত্তরঞ্জনের নানা প্রকার ছবি দিয়াছেন—লোকের মন ভুলাইবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি হয় নাই কিন্তু বলিবার সময় কেবল তৃতীয় পুরুষে অস্পষ্ট কথা বলিয়া মনের সত্য অনুভবটাকে দমবন্ধ গোছ চাপিয়া রাখিয়া চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিতর্পণ—না তাঁহার স্মৃতি প্রবাসীর সম্পাদকের কিছুই নাই কারণ তিনি তাঁহাকে তেমন করিয়া কিছুই জানিতেন না এবং জানেন না—সুতরাং বলি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। এ দুর্ভাগ্য চিত্তরঞ্জনের নয় চিত্তরঞ্জনের দেশবাসীরও নয়—এ দুঃখ দেশের—এ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার। Hero and hero worship এ পরাধীন জাতি বাস্তবিকই করিতে জানে না। রামানন্দবাবুকে আমরা চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে Englishman এর Leaderটা (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ) পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রামানন্দবাবুর কাগজ তাঁহার হইতে পারে কিন্তু সে কাগজের পাঠক দেশের সর্ব্ব সাধারণ। সুতরাং এরূপ ভাবে সর্ব্ব সাধারণের মনে আঘাত দিবার তাঁহার কতখানি অধিকার আছে তাহা তিনিই যেন বিচার করিয়া দেখেন আমাদের এই অনুরোধ।

সার আশুতোষ ছিলেন—"অটোক্রাট" মহাত্মা গান্ধী অবিবেচক এ সব কথা তাঁহার মত প্রবীন সম্পাদকের মুখে শোভন নয়। রামানন্দবাবু পূজনীয় সম্পাদক, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু সে শ্রদ্ধার বিনিময়ে আঘাত দিলে দুঃখটা বড় বেশী করিয়া লাগে।

শ্রাবণের অধিকাংশ কাগজই দেশবন্ধুর স্মৃতি পূজার ষোড়শোপচারে পরিপূর্ণ! সবগুলি সুপাঠ্য।

শোকসংবাদ

—০—

১। স্যর সুরেন্দ্রনাথ।

বঙ্গজননীর কণ্ঠভূষা-হার হইতে একটী একটী করিয়া রত্ন খসিয়া পড়িতেছে—জননীর বক্ষে অশ্রুর প্লাবন সৃষ্টি হইল—বাঙ্গালী ক্ষুব্ধ, আহত বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিতেছে—"একে একে নিবিছে দেউটী।" কিন্তু সেই সর্ব্বনিয়ন্তা—যাঁর ইঙ্গিতে নিখিলের রথ তার গতিপথে ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া নিয়ত চলিয়াছে—তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে—ক্রন্দন বা হাহাকারে সে বিধান বাধা মানিবে না।

বাঙ্গালার রাষ্ট্রনীতির প্রবর্ত্তক—ভারতের জাতীয়তার স্রষ্টা, বাঙ্গালীর প্রাণে দেশাত্ম-বোধের উদ্বোধনকারী স্যর সুরেন্দ্রনাথ ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। গত ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতি-বার বারাকপুরস্থ বাসভবনে সে বর্ষীয়ান্ দেশবীরের দেহ রক্ষিত হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বেও সুরেন্দ্রনাথ মহাত্মাজীকে বলিয়াছেন—"আমার পরমায়ু ৯০ বৎসর"—কিন্তু আরও পনর বৎসর ভগবান দেশের এ কৃতী সন্তানকে দেশবাসীর কাছে রাখিলেন না।

গত আঠার মাস হইল বাঙ্গালায় যে কি সর্ব্বনাশেরই কুযোগ লাগিয়াছে—তাহা স্মরণ করিলেও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে হয়। অশ্রুবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে—মর্ম্মের অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ ব্যক্ত হইতে পায় না। একটী একটী করিয়া সব যাইতেছে—অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, 'মহতো মহীয়ান্' স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্র বসু,—তা'পর বাঙ্গালী তোমার মাথার মণি—তোমার জাতীয়-জীবনের অন্ধকার পথে—উজ্জ্বলতম রত্নদীপ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তোমার বক্ষপঞ্জর চিত্তরঞ্জনের বিয়োগব্যথায় এখনও জর্জ্জরিত—অশ্রু-আবিল চক্ষু তোমার আজও শুষ্ক না হইতেই—আবার এই! বাঙ্গালার দুঃখে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সুরেন্দ্রনাথের জীবন—নানা বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে আবর্ত্তময়। বাঙ্গালী সে জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা যদি না-ই লয় শিক্ষার উপাদান প্রচুর পাইবে। বাঙ্গালাকে সুরেন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, বাঙ্গালার স্বাধীনতা তাঁহার প্রাণের কাম্য বস্তু যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

মণ্টফোর্ড শাসন প্রথার সমর্থন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায় যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—আমাদের মনে হয় তাহার মূলে একটা অতি বড় সত্য—তাঁহার অন্তরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। জীবনব্যাপী যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ আহত সৈনিক তাঁহার ক্লান্ত হৃদয়ের মধ্যে বুঝি অন্ততঃ একটু সান্ত্বনার সুর শুনিতে পাইয়াছিলেন। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট, ক্ষুদ্র, সামান্য হইলেও ইহাকেই সে মহারথী তাঁহার প্রাণপণ যুদ্ধের বিজয়-গৌরব বলিয়া প্রাণে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাই এ গৌরব তুচ্ছ করিতে—ইহাকে কিছু নয় বলিয়া ত্যাগ করিতে তাঁহার অন্তঃকরণে আঘাত লাগিত। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আজীবন সাধনার ফল,—তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই,—তথাকথিত সংস্কারকে স্বাধীনতার আভাষ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। গরমপন্থীরা ইহাকেই বলিতেন—তাঁহার বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা কিন্তু তাহার মধ্যে যে তাঁহার কতখানি প্রাণের যোগ ছিল—তাহা ভাবিলে মন শ্রদ্ধানত না হইয়া পারে না। এই জন্যই সুরেন্দ্রনাথকে হারাইয়া আজ দেশ ক্ষোভাহত। আর একটী বীর হারাইয়া আজ বাঙ্গলা শক্তিহীনা। সকলই সেই বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় সংঘটিত,—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমরা সুরেন্দ্রনাথের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক শোকানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার আত্মা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করুক।

২। জগদ্বল্লভ বিশ্বাস

গভীর দুঃখ ও বেদনাহত হৃদয়ে এখানে আমরা যাঁহার অকাল বিয়োগের সংবাদ লিখিতে অগ্রসর হইতেছি—তিনি বাঙ্গলার সন্তান হইলেও বিশেষ করিয়া কুচবিহারের। তাঁহার মৃত্যুতে আজ কুচবিহার শোকার্ত্ত; কুচবিহার নিবাসী, প্রবাসী প্রজাসাধারণ, রাজকর্ম্মচারী সকলের অন্তরই আজ বন্ধুবিয়োগের গুরু ব্যথায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রাজপরিবার—যাঁহারা তাঁহার প্রভু ও প্রতিপালক—স্বয়ং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী রিজেণ্ট সাহেবা, মহারাণী মহারাজমাতা শ্রীশ্রীমতী সুনীতি দেবী, মহারাজ কুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ—প্রত্যেকেই জগদ্বল্লভ বাবুর মৃত্যুতে শোকবোধ করিয়াছেন—রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই এ দুঃসংবাদে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন জগদ্বল্লভ বাবু কুচবিহারের রাজস্ব-সচিব ও রাষ্ট্রপরিষদের বিচারক সভ্য বা জুডিসিয়াল মেম্বার ছিলেন। এ পদ রাজ্যের দেওয়ানীর নামান্তর।

খুলনা জেলায় অষ্টমনীষা গ্রামে বরেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ—বিশ্বাস-পরিবারে জগদ্বল্লভ বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ব্রজবল্লভ বিশ্বাস রাজসাহীতে মোক্তারী করিতেন। ব্যবসায়ে বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার দুইই ছিল। কিন্তু নানা সংকার্য্যে তাঁহার আয় হইতে ব্যয়ের মাত্রা অধিক থাকায় সঞ্চয়ের ঘরে ছিল শূন্য। জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্বল্লভ উত্তরাধিকারসূত্রে তুল্য ভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন।

জগদ্বল্লভ রাজসাহী কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়িতে যান। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই তিনি বি, এ, এবং এম্ এ, ও রিপন কলেজ হইতে বি-এল, পাস করেন। সে যুগে বাঙ্গলার সরকারে চাকুরী এদিনের মত দুর্ল্লভ না হইলেও জগদ্বল্লভ বিধি নির্দ্দেশেই যেন কোচবিহারের চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে সময় ওকালতী করিতেন বর্দ্ধমানে। সবে তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে ; জুনিয়ার উকীল, আয় কম অথচ একটা বৃহৎ সংসার স্কন্ধে, এ অবস্থায় চাকুরির চেষ্টা স্বাভাবিক। তাঁহার বন্ধু ও সহায়ক বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ নলিনাক্ষবাবুর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু ইহা জানিতেন; তিনিই জগদ্বল্লভ বাবুর অজ্ঞাতে সংবাদ পত্রে কোচবিহারের ডেপুটীর পদ খালি আছে দেখিয়া তাঁহার হইয়া আবেদন করেন। কার্য্য হইয়া গেল; নিয়োগের 'তার' বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে অকস্মাৎ বিস্মিত ও উৎফুল্লিত করিয়াছিল। সম্বল তাঁহার তখন এম, এ উপাধি এবং আইনের ডিক্রি আর একটা দৃঢ়, সতেজ, স্বাধীন সাভিমান প্রাণ, অতি তীক্ষ্ণ স্থিতধী বুদ্ধি। তাহার বলেই তিনি কালে কোচবিহারে উচ্চ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আপনার সুখ-দুঃখ রাজ্যের কল্যাণে বলি দিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীমন্মহারাজ ভূপ বাহাদুরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও তিনি রাজসভায় নিয়মিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন—পীড়িত দেহেও নিত্য কর্ত্তব্য সম্পাদনে ক্রটী করেন নাই। তাঁহার গুণ ছিল অশেষ;—খাঁটি মানুষটি ছিল তাঁহাতে অবিকৃত, পদগৌরবে তাঁহাকে বদলাইয়াছিল কমই। তাঁহার সহৃদয়—আত্মীয়ের ন্যায় অকপট ব্যবহারে ছোট বড় সকলেই আপন হইত—সকলেই ছিল তাঁহার নিকট সমান—সমান আদর-সম্মান লাভ করিত। সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার বসিবার গৃহ সমাগত অর্থীপ্রার্থী প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত—ইহাতে তাঁহার কার্য্যের অন্তরায় হইত—কিন্তু তিনি কাহাকেও প্রত্যাখান করিতেন না। সত্য ও ন্যায়তাকে তিনি

সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান দিতেন, প্রার্থীকে স্পষ্ট তাহার প্রার্থনার ফল বুঝাইয়া দিতেন; আশায় প্রলুব্ধ করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল,—অনেক সময় প্রার্থী ঈপ্সিত ফল লাভে হতাশ হইয়া তাঁহাকে বার বার বিরক্ত করিত;—তিনি বলিতেন "আপনাদের সাহায্য করাই আমার কার্য্য,—যদি ন্যায্য কারণে তাহার উপায় না হয় কি করিব—আমি দশের সঙ্গে যুক্ত,—একের জন্য দশকে বঞ্চিত করা চলে না।" তিনি বালকের ন্যায় সরল ছিলেন। স্পষ্ট কথা—রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্ষতিজনক—এ বিশ্বাস অনেকেরই; অমন স্পষ্ট ভাবে নিজ মত ব্যক্ত করায় বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিতেন "এইটীতেই আপনার অপকার হয়,—অন্য কথায় প্রকৃত বিষয় চাপা দিলেই ত হয়,—করা না করা আপনার হাত—আগে বলিয়া কেন শত্রু বৃদ্ধি করেন।" উত্তরে তিনি বলিতেন "সর্ব্বদা মঙ্গলকারী, স্পষ্ট কথায় অপকার হয় না,—শত্রু বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু পরিশেষ সে শত্রুকে একদিন বুঝিতে হয়—সত্য যাহা তাহাই তাহার পক্ষে মঙ্গল—ধামাচাপা যুক্তিতে অন্ধকারই বৃদ্ধি করে।"

তিনি বিলাসী ছিলেন না সঞ্চয়ীও ছিলেন না অর্থের লোভ ছিল তাঁর বড় কম, জীবনে কখন বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেন নাই, যে পদে তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন তার বেতন ছিল পূর্ব্বে অনেক বেশী, তিনি সময়ে সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহার জন্য কখনও প্রার্থী হন নাই; বলিতেন "ব্রাহ্মণ দরিদ্র চিরকাল—দুঃখ কি অনটনে!" ব্যয় বাহুল্যের জন্য তাঁহার স্বচ্ছলতা ছিল না। ত্রিশ বৎসরের উপার্জ্জন অকৃপণ হস্তে ব্যয় করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু ছেলেরা অর্থের অভাব কখনো বোধ করেন নাই এখনও করিবেন না। পিতার জীবন যদি তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া থাকে তবে রিক্তের বেদন তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। কলিকাতায় লেখাপড়া শিক্ষার সময় তাঁহার পুত্রেরা রাজপুত্রের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া হিন্দু হোষ্টেলে বাস করিয়াছে—প্রেসিডেন্সী কলেজে বিদ্যা লাভ করিয়াছে। মৃত্যুকালে জগদ্বল্লভবাবুর ৫৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। আপনার গুণ গৌরবে জগদ্বল্লভ নায়েব আহেলকারী হইতে দেওয়ানী পদে উন্নত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর তাঁহার নিপুণতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন—এ কথা বলিতে জগদ্বল্লভবাবু পুলকিত হইয়া উঠিতেন। কুচবিহারকে তিনি ভাল বাসিতেন আপনার মাতৃভূমির ন্যায়—কুচবিহারকেই তিনি দেশমাতৃকার সম্মান ও সম্ভ্রম দিয়াছিলেন।*

বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা যদি ছিলেন তাঁহার বন্ধু—কুচবিহারীরা ছিলেন তাঁহার আত্মীয়।

একদিন কথায় কথায় মহারাজ ভূপবাহাদুরকে জগদ্বল্লভবাবু বলিয়াছিলেন—"হুজুর, আমি যে "ভাটিয়া"—মহারাজ তাঁহাকে স্বভাব মধুর মৃদু হাস্যে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"কে ব'ল্‌ল আপনি ভাটিয়া? আপনি যে আমার রাজ্যের সুখ দুঃখ নিজের ব'লে নিয়েছেন—আপনি কুচবিহারী।"

এ গর্ব্ব জগদ্বল্লভবাবু করিতে পারিতেন। এই গর্ব্বের মহীয়ান অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্ব সাধারণ আজ তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত।

প্রবল শত্রুকেও তিনি কখন ভয় করিতেন না,—মৃত্যুকেও নয়,—বলিতেন নিজে ন্যায় পক্ষে থাকিলে ভয় কিসের,—ন্যায়ের পরাজয় নাই। শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি মাথা নোওয়ান নাই,—উঠিয়া বসিতে চাহিলেন,—আত্মীয় ছিলেন—ডাক্তারের নিষেধ হৃদয়যন্ত্রের বিপর্য্যয়ের ভয় আছে,—উত্তর করিলেন—"মৃত্যু ভয়—সে আর বেশী কি—সে ত সকলেরই আসিবে,—উঠাইয়া বসাও।" সত্যই মহাপ্রস্থান কালে—মৃত্যু তাহার বদনে নয়নে একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারিল না—তাঁর শেষ কথা—"আমায় ডেক না, ঘুমাতে দাও"—পাঁচ মিনিটের মধ্যে চিরনিদ্রা।

আজ সজল চক্ষে ও ব্যথিত চিত্তে তাঁহার পুত্র ও পরিবারবর্গের সহিত একাত্ম হইয়া গভীর শোক নিবেদন করিতেছি। ভগবান তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব-হারা প্রাণে এই দুর্দ্দিনের গুরু দুঃখে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করুন। তাঁহার অমৃতময় আশীর্ব্বাদ ইহাঁদিগের মস্তকে বর্ষিত হউক। তাঁহারই চির কল্যাণময় ক্রোড়ে শ্রান্ত কর্ম্মবীরের অমরাত্মা তৃপ্তি ও বিশ্রাম লাভ করিয়া মুক্ত হউক, মধু হউক।

বি. চ. চ.

ভ্রম-সংশোধন।

"বর্ষার-ন্যারক" শীর্ষক কবিতাটীতে এই দুইটী মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে; পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন :—

১। তৃতীয় স্তবকের ১ম পংক্তি হইবে—"তাই"—সুতরাং ১ম পংক্তিরূপে মুদ্রিত পংক্তিটী দ্বিতীয় পংক্তি দাঁড়াইবে।

২। কবিতা-শেষের চরণ-চতুষ্টয়ের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পংক্তিটী অমুদ্রিত থাকিয়া গিয়াছে :—

"ফিরিয়া দাঁড়াতে চাই সেই উৎস-পানে,"

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
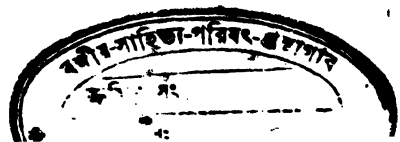
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ। আশ্বিন, ১৩৩২ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অন্বেষণ।

হে অনাদি, হে অনন্ত সুনীল সাগর
তোমায় আমায় দেখা কত দিন পর—
কত দিন, কত রাত, কত বার, মাস
কাটিয়া গিয়াছে মোর, ছাড়ি' গৃহবাস
সঙ্গীহীন পথে পথে। আজি সব ভুলে
আসিয়াছি হে সাগর তোমার এ কূলে।
মনে পড়ে কবে কোন ম্লান সন্ধ্যাবেলা
তোমার এ বালুতটে করেছিনু খেলা,

মনে পড়ে যার সাথে গেয়ে ছনু গান
তারে যে তোমার কোলে ক'রে গেছি দান।
কবে কোন আদি-যুগে—প্রবাদ-বচন—
হে সাগর তব বক্ষ করিয়া মন্থন
পেয়েছিল স্পর্শমণি—যাবার বেলায়
ফেলে গেছে তব কূলে পরম হেলায়
দেবগণ। তাই এক সন্ন্যাসী নবীন
রুক্ষ জটা শীর্ণ দেহ ম্লান জ্যোতিহীন—
ফিরে গেছে খুঁজে খুঁজে তোমারি এ কূলে
এক দিন পেয়ে যাহা ফেলে দেছে ভুলে।
সেই মত হে সাগর করি অন্বেষণ
তোমারি এ কূলে মোর সাধনার ধন।

শ্রীরেণুকা দাসী।

বয়াটে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(গোড়া)

পরের দিন সকালে উঠে সাহেব ন'ব্‌নেকে জানালেন—সেদিন আর তাঁরা বেরোবেন না। কারণ সেদিন রবিবার—বিশ্রামের দিন।

ন'ব্‌নে কিন্তু দেখ্‌লো—বেলা বারটা অবধি কেবলই—নানা রকমের লোক এল আর গেল। তাদের কেউ হিন্দুস্থানী—পায়ে নাগ্‌রাই, গায়ে মেরজাই—তার ওপর সাত পোরুষ

ধুলো—আর তেলে ছাতা পড়ে উঠেছে। কেউবা বাঙালী—তার হাতকাটা জামার ওপর ছেঁড়া ফালি চাদর জড়ানো—টেরিটী বাজারের বাদামী চটী পায়। কারো কারো আবার গলায় তুনর ক'রে কাঠের মালা। পাঞ্জাবী কেউ—তার মাথায় আঠার বছরের পুরোন আঠার হাতী পাগ্ড়ী—পারসীও দুজন এসেছিল—তাদের কিন্তু প্যাণ্টলুন পরা—তার ওপর লম্বা বুকবন্ধ কোট ঝুলে নেবেছে।

সাহেব কখনো গুজুব গুজুব ক'ল্লেন—ক্ষণে বা তাঁর সে স্পষ্ট অট্ট সরস হাসিতে—সহরের ধোঁয়া ধুলোয় ভারী হাওয়াটাও হাল্কা হ'য়ে উঠ্লো! এক একবার কাগজ নিয়ে কি হিসেব নিকেশ লিখ্লেন. কাউকে ধম্কালেন—একটা পাঞ্জাবীকে ত তেড়ে মার্তে গেলেন—সে দৌড়ে রাস্তায় নেবে গেল—কিন্তু একেবারে পালালো না—একটু পরেই আবার ফিরে এসে খাড়া।

ন'ব্নে ভেতরে নৈমিত্তিক কাজ ক'র্তে লাগ্ল। আর সাহেবের আশ্রম-তীর্থে এ জন-যাত্রা,—সেই সাত প্রদেশী নানা যাত্রীর আনাগোনা—তার অর্থই বা কি—কারণই বা কি হ'তে পারে—আকাশ পাতাল ভেবেও সে সম্বন্ধে কিছু ঠিকানা ঠাওর ক'রতে না পেরে নিজের মনে নিজেই অবাক হ'য়ে রইল।

এম্নি ক'রে ঠিক ক' র'ব্বার পরে—তা ন'ব্নের নিকেশ লেখা ছিল না,—তার অনেক আগেই জান-বাজারের বাড়ী ছেড়ে সাহেব ডেরা ব'দ্লেছিলেন। সেইখানে একদিন ন'ব্নেকে ডেকে সাহেব হুকুম দিলেন—"বয়. তোমার নোটটা আন—আজ তাই পড়া যাক।"

ন'ব্নে খাতা এনে ব'স্ল। সাহেব ব'ল্লেন—"ভূমিকাটা বাদ দিয়ে চেঁচিয়ে পড়।"

এক।

ন'ব্নে প'ড়ে গেল—

বাইরের খবর।

নোট বইয়ের প্রথম কখান পাতা ছেড়ে দিয়ে।

জ্যৈষ্ঠ তারিখ।

আজ সাহেব আমায় নিয়ে বেরিয়ে বরাবর ওয়াটগঞ্জে গেলেন—একটা জাপানী বাড়ীতে। কাগজের নানা কারু কাটা ছবি নক্সায় সাজানো সুন্দ ছাপানো মাত্তর পাতা চমৎকার ঘরখানি।

ছোট কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একজন বেঁটে, মোটা নাক বোঁচা জাপানী সাহেব বেতের হাল্কা চেয়ারে বসে কি যেন লিখ্‌ছিলেন। সাহেব গিয়ে জাপানী ভাষায় নমস্কার জানাইতেই জাপানী 'গায় তো গায় তো' বলে অভিনন্দন ক'রে আমাদের বস্‌তে বল্‌লেন। জাপানীতেই তাঁদের অনেকক্ষণ আলাপ সালাপ চল্‌লো আমি বসে বসে তাঁর ঘরের টুক্‌টাক সব ঠুন্‌কো সে সৌখীন ঠাট্‌-ঠমক্‌ চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। ঘণ্টা দুয়েক পরে বেরিয়ে রাস্তায় এলাম যখন তখন সাহেব বল্লেন এ লোকটা জাপানী ব্যবসাদার ওদের মহাজনী চর এখানে এয়েছে— কল্‌কাতার বাজারটা এক চোটিয়া ক'রে বস্‌তে। ও সব—এখানকার বাজারের হাল চাল, কি জিনিষ লোকে চায় বেশী, ফ্যাসান আর ভড়ং কি রকম হ'লে মাল কাট্‌বে বেশ এখান থেকে সেই খবর পাঠাচ্ছে। সেদিন যে চিঠী ও লিখ্‌ছিল তার খানিকটা সাহেব আমায় বল্লেন আমি তা নীচে লিখ্‌লাম!—

নবুহিরো তোকুচিহ জিয়ামার নিজের হাতের লেখা খাঁটি খবর। কারখানার কারিকরদের চিঠী পেয়েই নমুনার জিনিষ তৈরী কর্ত্তে হুকুম দেওয়া যেতে পারে।

সেন সেন—পানওয়ালী মার্কা।

ছবি এঁকেছে শুধু মুখটা—সিঁথির উপর অবধি ঘোমটা—গালভরা পান বাঁ দিকে ঢিব্‌লে হ'য়ে রয়েছে। সিগারেট কেস—বাইজী মার্কা, তরুণী বাইজী তার আঁটা কাঁচোলীর ওপর ওড়না ঝুলিয়ে গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে যেন গান ধরেছে "আরে হারে তেরা নয়নাকা কাটারি" খুব চলবে কারণ গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ এখানকার ঘরে ঘরে। দেশালাই—কালী. শিব, হরিণ, সাইকেল ইত্যাদি যা ইচ্ছে মার্কা হ'ক চলবে। তবে এদেশের লোক দেবতার নামে গলে যায়। দেবতা মার্কা কিন্তু কাজেই চল্‌বে বেশী। সিগারেট চাই ঘোড়া মার্কা। চটক দেয়া বাক্সের ভেতর দশটা। দাম—খুব কম এখানে ;—ছ' পয়সায় ছাড়তে হবে।

এলাহি বকসকে সোল এজেণ্ট ক'ল্লেই বাজার আমাদের হাতে আস্‌তে পারে। ইত্যাদি।—

সাহেব ব'ল্লেন বোঝ কি ক'রে এ জাত কুড়ী বছরে উঠে ব্যবসায় পয়সা লুটে নিচ্ছে। কিন্তু ব্যবসা ওরা রাখ্‌তে পারবে না—বড্ড খেলো মাল দেয়।

টিপ্পনী—আমার মত—খেলো জিনিষ যে ওরা জোচ্চুরি ক'রে চালায় তা নয় কেবল ফাঁকা, হালকা, পাতলা জিনিষ নিয়ে ওদের রোজকার জীবন ; কাগজ দে' বাড়ী তৈয়ের করে—উঠেছে হাওয়ার ওপর মোটে পঞ্চাশ বছরে,—কায়েমী মজবুৎ, পাকা জিনিষ জাপানীরা ক'রতে পারে না তাতে তাদের স্বভাবই ব্যথা ক'রে ওঠে।

সাত তারিখে।

আজ সাহেব এই দিকে বাঙালী পাড়ায় এক খুঁটি গলির ভেতর আমায় নিয়ে গেলো। সরু রাস্তা দু পাশের বাড়ীগুলো উঁচু হ'য়ে উঠে সূর্য্যের আসার রাস্তায় হনুমানের মতন তাকে আটকে ধ'রেছে। আমরা একটা বাড়ীর অন্ধকার সিঁড়ি ঘরের ভেতর দিয়ে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে গিয়ে উঠলাম। সেখানে এক বুড়ো ব'সে কি যেন সেলাই করছিল। তার আশে পাশে রঙ্ বেরঙা দামী কাপড় পাঁজাকরা বোধ হয় দরজী রিপু কাজে ওস্তাদ। সাহেব উঠেই পেছন থেকে ব'ললেন—"সেলাম ওস্তাদজী।"

বুড়ো মাথাও তুললো না ঘাড়ও নাড়লো না—সাহেব এবার জোরে ব'ললেন—"সেলাম ওস্তাদজী।"

বুড়ো শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই ছাইএর উপর ইলিস মাছের চিকমিকিয়ে ওঠা খোসার মত ঝিকমিকে একটুখানি হাসি হেসে উত্তর ক'রলেন —"সেলাম সেলাম সাহেব—আবকা বহুত মেহেরবাণী ফরমাইয়ে কেয়া জরুরৎ।"

সাহেব ব'ল্লেন—"সেনিজ এক ডরজন জ্যাকেট্ দশটো, ফ্রক এক ডরজন, ঔর ব্লাউজ ছোটো।

ওস্তাদজী হেসে বল্লেন—"বাস্।"

সাহেব উত্তর দিলেন—"ব্যস্।"

"দরজী কাট কি ঘরোয়া কাট?" ব'লে দরজী সাহেব—আমার সাহেবের মুখের পানে তাকালেন। সাহেব ব'ল্লেন 'ঘরোয়া কাট বিল্কুল-তামাম।"

"বহুৎ আচ্ছা" ব'লতেই সাহেব আবার সেলাম দিয়ে ফিরলেন।

চলতে চলতে আমায় ব'ললেন—এদের নতুন ধরণের সন্ধানী ব্যবসা। ওরা—ক'রে কি জাহাজের নাচের মত যদি দামী কাপড় তাই নিলেমে কেনে—অল্প দশ পনর দিলে।

তা'পর খবর নেয়া আছে ওদের অনেক বড় বড় ঘরের শিল্প চতুর মেয়েরা—নিজেদের ত'বিলে উপরি-টাকা জমাবার ফিকিরে—ফরমাস মত জামা টামা ক'রে দেন। এ ক'ল্‌কাতায় সে রকম মেয়ে ঢের আছেন। ওরা কাপড় সুতো বোতাম সব দিয়ে আসে। তারা তারিখ মত জামা ক'রে তৈরী রাখেন—এরা গিয়ে নগদ মজুরী বুঝে দিয়ে নিয়ে আসে। এদের কাছ থেকে ফিরি ওয়ালারা আবার জিনিষ নিয়ে যায়,—বাজার দরের চেয়ে—অনেক সস্তা পায় কিন্তু বেচে বাজার দরেই।

এই জন্যে কল্‌কাতায় ছোট দোকানের জামার চেয়ে ফিরিওয়ালাদের জামা সেমিজের কাট অনেক সময়েই দেখা যায় বেশ সৌখীন আর হালের ফ্যাসান-দোরস্ত।"

হঠাৎ আমাদের দুজনের ভেতর দিয়ে সাঁ করে একটা লোক চ'লে গেল। আমি অন্যমনস্কে পকেটএ হাত দিতে গিয়ে দেখি সিগারেট কেস্‌টা নেই। চেঁচিয়ে বল্লাম—"বারে আমার সিগারেট কেস্?"

সাহেব ফিরে তাকিয়ে বল্লেন—"নেই?" আমি "না" বল্‌তেই সাহেব একটু হেসে বল্লেন—"যাক্ গেছে গেছে।"

কিন্তু এমন হঠাৎ সিগারেট্ কেস্‌টা পকেট থেকে উড়ে গেল। আমার মনটায় সত্যিই বড় দুঃখ হ'তে লাগ্‌লো, লজ্জাও হ'ল। আরো খানিক দূরে এসে একটা মোড় ঘুরে গলি নিয়ে আবার ঘুরে গলির পাশের চেপা রাস্তা ধরে সাহেব আমায় নিয়ে চল্লেন। পাশে একটা বাড়ীর সামে ব'সে দু'জন মুসলমান দাবা খেল্‌ছিল। খাটী রেশমী লুঙ্গী পরা গায়ে খুব ভাল ভায়েলা ফ্লানেলের পাঞ্জাবী, ঘাড়ের উপর বড় একখানা রঙ্গিন রেশমী রুমাল। সাহেব সেখানে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—সেলাম মিঞা সাহেব শেষকালে আমারি এ আমিরজাদার সিগারেট কেস?"

একজন দাবার কোট থেকে দৃষ্টি তুলে সাহেবকে দেখে বল্লেন—"সেলাম সাহেব আবকা সিগারেট কেস্? আরেই শালা বজ্জাত বেইমান হারামখোরকে কেইসা ধরম" বলে হাঁকলো "এ রহমান সিগারেট কেস্ কোন গুদাম মে জমা হ্যায়?" একজন কে ছোকরা গলার আড়াল থেকে উত্তর করলো "তিন নম্বর"

আমাদের নিয়ে সে বাড়ীর ভেতর একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নানা রকম জিনিষে সে ঘর বোঝাই। তাতে নেই যে কি তা বলা যায় না। একপাশে দেখিয়ে বল্‌লে—"হ্যঁয়া হ্যায়

সিগারেট কেস্ দেখিয়ে আপ্‌কা কোন হ্যায় ?" সে মেল্লাই সিগারেট কেস্ সোনার অনেক গুলো কতকগুলো রূপোর। আমি দেখেই চিন্‌লেম আমারটা। দেখিয়ে দিলেম। মুসলমান হেসে কেস্‌টা আমায় এনে দিল। আমরা বেরিয়ে এসে সেলাম ক'রে বিদায় নিলাম। সেও সাহেবকে সেলাম দিল আর আমাকে বল্‌ল—"বন্দেগি আমিরজাদা,—আপকা গোলাম পকেটসে আউর কভি কুছ নেই যায়ে গা—ই কল্‌কাতামে" বুঝলাম ইনি গাঁটকাটার সর্দার। কিন্তু আমার সাহেবকে এ চেনে কি ক'রে ?

আট তারিখ।

আজ সাহেব বাড়ী থেকে বেরিয়ে খাতার পাতায় লিখ্‌তে লিখ্‌তে চল্লেন—

১। জান বাজার ... ... দু'টো।
২। চৌরঙ্গী ... ... দরকার নেই।
৩। ল্যান্স ডাউন রোড্ ... ৩টা।
৪। থিয়েটার রোড্ ... ... চারটা।
৫। এলগিন রোড্ ... ... একটা।
৬। উডষ্ট্রীট ... ... যা-তা বাজে।
৭। ওয়েলেস্‌লী ... ... একটা।
ব্যস্ আর না।

সাহেব রাস্তায় চ'ল্লেন চ'ল্লেন এক একবার থামলেন এদিক ওদিক তাকিয়ে কি দেখে নিয়ে ঐ সব লিখ্‌লেন আর কি লিখ্‌লেন তা তিনিই জানেন।

সেই দিন রাত্রি আটটা।

রাস্তা-ঘোরা শেষ ক'রে আমরা বাড়ী ফিরলাম। খাওয়া শেষ হ'লে দুজনে বসেছি এর ভিতর একজন এসে ডাক্‌লে—"আছেন নাকি মশায় ?"

সাহেব ব'ল্লেন "হ্যাঁ আছি। আসুন ভেতরে।"

যিনি এলেন তিনি অল্প বয়সী,—ছোক্‌রা বাবু। বার্ণিস লপেটা পরে ঘরে ঢুকেই সোজা সুজি ব'ল্লেন—"মশাই, আপনারা যুগল যা জুটেছেন চমৎকার। ঘরে কুলুপ চড়িয়ে ত' বেরিয়ে

যান আপনাদের ভ্যবোরায়। বাড়ীতে পাবার যোটী নেই। কিন্তু এদিকে বাড়ী ভাড়া ক'মাসের বাকী পড়েছে তার হিসেব আছে ?"

সাহেব হো হো ক'রে হেসে ব'ল্লেন—ওঃ আমি ভাব্লুম আপনি বুঝি Universityতে Historyর research Scholar—আমার কাছে সেই খবর কিছু জান্তে এসেছেন।

"ইউনিভারসিটী ঢের দিন ছাড়া হয়েছে মশাই—খেলাৎচাঁদ ইন্‌ষ্টিটিউসনে থার্ড ক্লাশ অব্ধি পড়েছিলাম কিন্তু আমার পায়রার ঝাঁক, টনি ডগ দেখবার শোন্বার, কাকাতুয়া ময়না পড়াবার লোকের বড্ড অভাব হ'ল—তাই বাধ্য হ'য়ে পড়া ছাড়্লুম।"

সাহেব ব'ল্লেন—"বেশ ক'রেছেন—তা আমার বুড়ো বাড়ীওয়ালা আপনার কি হন ?"

"আমার বাবা হতেন—তিনি তো গেল মাসে মারা গেছেন—এখন কারখানা, বাড়ী ঘর এসব আমার।"

"অ্যাঁ! বুড়ো মারা গেছেন ? ওঃ Poor soul, Poor soul! ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। তা' আপনার ক'মাসের বাড়ী ভাড়া পাওনা হয়েছে ?"

"ছ মাসে চলেছে।"

"আচ্ছা দোব!"

"দেবেন কবে মশাই ?"

"এই দু চার দিনেই।"

"সে হবেনা মশাই এক্ষুনি দিতে হবে!"

সাহেব হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে জবাব ক'র্লেন—"যদি না দিই।

বাবু গলায় রুক্ষ আওয়াজ বার ক'রে ব'ল্লেন—"আদায় ক'র্বো।"

"কি ক'রে ?"

"আদালতের দরজা খোলা রয়েছে--কি ক'র্তে ?"

কি ? যে লোক ছ বচ্ছর সমানে তোমাদের ভাড়া যুগিয়ে এসেছে—সে ছ মাসের ভাড়া দেয়নি ব'লে নালিশ ক'র্বে ? যাও বেরোও,—ক'রগে নালিশ—বিনে মোকদ্দমায় এক পয়সা পাবে না।"

"তুমি তুমি ব'লে অপমান? আবার বড় বড় কথা, আমি দেখে নোব তোমাকে সাহেব, আমার বাড়ী থেকে আমাকেই বেরিয়ে যেতে ব'লছ—দেখব আমি কাল তোমাকে—চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর আমার বাড়ী থেকে তোমায় নেবে যেতে হবে। বদমাইশ গুণ্ডা।"

গালাগাল শুনে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ রি রি ক'রে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে সাহেবের লাঠিগাছটা তুলে নিতেই সাহেব খাঁ ক'রে আমার হাত থেকে সেখানা ছিনিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"তুমি দিও নোটিশ আহাম্মক ছোক্‌রা! এখনি বেরোও এখান থেকে আর এক সেকেণ্ড যদি হল্লা কর—দেখছ বেত"

সাহেব তার মুখের সামনে সে মোটা লাঠিগাছটা ঘোরাতেই ছোক্‌রা রাগে গর গর করতে করতে সুট্‌ সুট্‌ নেবে গেল। তার বিলক্ষণ ভয় পাবারই কথা কারণ সাহেবের যে ডাণ্ডা। সাহেব আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—"বয় যারা ভদ্রলোকের পোষাক পরে অভদ্রের একশেষ তাদের সঙ্গ ছাড়াই ভদ্রলোকের উচিত। এখানে আর নয়—আমরা এখন ছোটলোকের সঙ্গেই থাক্‌বো। এক্ষুনি বেরোবো।"

সাহেব আর আমিই মুটে সেজে সেই কাঠের "হোণ্ডঅল" সিন্দুকটা দুজনে মাথায় নিয়ে নাব্‌বো—এমন সময় সেই প্রথম দিন রব্‌বারে সাহেব যে পাঞ্জাবীটাকে মার্‌তে তাড়া করেছিলেন সে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে আমাদের ঐ অবস্থা দেখে দু'সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ালো। তা'পর সহসা বিস্মিত বিস্ফারিত দুচোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"এ কেয়া?"

সাহেব জবাব দিলেন—"কুছ্‌ নেহি—তোমারা কেয়া জরুরৎ?"

লোক্‌টা বল্‌ল—"ভারি খবর।" সাহেব খুঁটিয়ে নাটিয়া সব জিগ্‌গেস কর্ত্তে লাগ্‌লেন লোকটা বলে গেল—মুন্না মরিয়া হইয়া উঠেছে সে খুন করবে—আজ আর কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। রক্তের নেশা তার শিরা ধমনীগুলোর ভেতর তাণ্ডব নাচ্‌না নেচে উঠেছে। পিশাচের বুকের খুন তার চাই—চা-ই। বারে বারে অপমান—এবার তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে! সাহেব নইলে কেউ তাকে রুখ্‌তে পার্‌বে না। দু'খানা ভোজালি শানিয়ে কোমরে গুঁজে নিয়ে বুঝি সে বেরোলো—সাহেব তাড়াতাড়ি।"

সাহেব বল্লেন—"ধর বাকস্—তুমারা ডেরা পর"—পাঞ্জাবী সাহেবের দিকটা ধর্‌লো—আমাকে বল্লেন—এর সঙ্গে বরাবর চলে যেও। আমি আগে চল্লাম। ছুটে যেতে হবে।"

খামে-পোরা কি একটা সাহেব্ পকেট থেকে বের করে টেব্‌লের ওপর ছুঁড়ে দিলেন—জিনিষটা ঠকাস ক'রে গিয়ে পড়্‌লো।

"দিয়ে গেলাম বেটার বাড়ী ভাড়া।" ব'লে সাহেব ঝড়ের মতন ছুটে নেবে গেলেন। আমরাও দুজন তাঁর পেছনে বেরিয়ে প'লাম। আমাদের খাট বিছানা চেয়ার টেবিল ভাঙা চোরা যা কিছু আসবাব পত্র ছিল সেইখানেই পড়ে রইল।

(দুই)

তার পর দিন।

পাঞ্জাবী আর আমি সিন্দুকটা ব'য়ে নিয়ে অনেক রাস্তা গলি পেরিয়ে ইটিলীর ওধারে বস্তীর ভেতর একখানা খোলার বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। লম্বা ঘরখানার ভেতরে ভেতরে বেড়া দিয়ে ভাগ করা—'ব্যারাক' আর কি! উঠোনটা অতি অপরিষ্কার,—যাচ্ছে তাই অপরিষ্কার। চারদিকে রাজ্যের নোংরা, এঁটো হাড়, কাঁটা, পেঁয়াজের খোসা, উননের ছাই, ভাঙ্গা হাঁড়ি—আস্তাকুড়ের মত দেখাচ্ছিল।

অনেকগুলো ঘরেই তখন দরজা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। দু' একটা দরজার ফাটাল দিয়ে সরু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল। কেরোসিনের কুপীর মুখে কালী জমে গিয়ে ফট্‌ফা প'ড়ে আলো মিইয়ে এসেছিল কিন্তু একেবারে নেবেনি। সব শেষের ঘরখানা থেকে কাঙালের ঘর রান্নার নিত্য দ্বন্দযুদ্ধের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল। বউটী বল্‌ছিল "পরনের কাপড় পেটে ভাত দিতে না পার্‌বি যদি তবে এনেছিলি কেন?"

"থাম বলছি হাড়হাবাত; কিছুতেই তোর জলন্ধর পেট আর ভরে না, সারাদিন বুকে পিঠে এককরে খেটে এলুম কোথায় একটু জিরোবো—না—

"জিরোবি তুই—জিরোবার কপাল নিয়ে তুই—কি রে ডেক্‌রা জন্মেছিস্? নিজের পেটে দিতে পয়সা নেই—আবার একটা মেয়ে মানুষ এনে সাত খোয়ারী করা চাই!—বল্লে ক'লকাতায় কলে ভারি চাকুরী করি। কি আমার চাকুরে রে!"

"মুখ থেঁতো করে দোব হারামজাদী, ছোটলোকের বেটী"—

"কি! আমার বাপ তুলছিস—গু খেকোর বেটা—ড্যাক্‌রা!"

বউটার চীৎকারে রাত্রির অন্ধকারও বিরক্ত মুখে শিউরে উঠ্‌লো যেন। পাশের ঘর থেকে একটা রোগা বউ দোরখানা ফাঁক ক'রে মাথা বার ক'রে দিয়ে বল্লো—"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি একটু আস্তে; মেয়েটা জ্বরএ ধুক্‌ছে গায়ের তাপে থই ফোটে একটু আস্তে গো"—

পুরুষটা জবাবে বল্লে—"শুন্‌লি—শোন ডাইনি, আমাকে ত খেয়েছিস,—বুকে ক্ষয় ধরেছে খাট্‌তে খাট্‌তে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে এখন ঐ ভাল মানুষের মেয়ের বুকের ধনটাও খেতে চাস্‌?

আর কতদূর যাবে এবার তো বউটা জিগ্‌গির ছেড়ে কাঁদ্‌তে বস্‌লো—"আমার হাতের পৈছে, দু'নর ধান-তাবিজ বেচে খেয়ে আমায় রাক্ষসী বলে গালাগাল দেয় রে বাবা—ও বাবা"—

সে মড়া কান্নার ব্যাপার!

এ ঘর থেকে রোগীর মা-টী আবার মিনতি করে থাম্‌তে বল্ল কিন্তু কার নিবেদন কে শোনে! পঞ্জরসার দৈন্যের জ্বালা বুঝি এ গৃহের চারিদিকে ধোঁয়াটে গুমোট তুষের অগ্নিকাণ্ড জেলে এই হতভাগাগুলোকে তিলে তিলে পোড়াচ্ছিল। সকলেরই এক অভিযোগ—পেটের খাবার নেই! মৃত্যু সুযোগ পেয়ে তার চিরন্তন ক্ষুধিত সর্ব্বভুক গ্রাসের ভিতর এই নিত্য দুর্ভিক্ষে অন্নহীন অভিসপ্তদের একটা একটা করে নিক্ষেপ কর্ত্তে আরম্ভ করেছে। এদেরই ঘরে ঘরে তার নিশিদিন আসা যাওয়া। খেতে না পেয়ে দুর্ভাগাদের অসুখ; ওষুধ না পেয়ে মৃত্যু মরণের বিরুদ্ধে নিরুপায় এরা রুগ্ন দুর্ব্বল তাদের মেরুদণ্ডগুলো জোরকরে খাড়া রেখে ধ্বংসের বুকে অক্লান্ত লড়ে চলেছে; আর বাইরে রাজপথে বিশ্ব তার মণি মুল্যে কেনা বিজয়রথ দ্রুত ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে। তার পুলকিত গতিছন্দে এই হতভাগ্যদের স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটা—চকিতে চম্‌কে ওঠে শুধু।

উঠোনেরই একপাশে সিন্ধুকটা নামিয়ে রেখে আমরা দুজনে তার ওপর বসেছিলেম পাঞ্জাবীটা কি ভাবছিল জানি না আমি ঐ সবকথা আকাশ পাতাল গোলাপড়া করতে করতে ঝুমে ঝুমে আসছিলাম হঠাৎ—"এ, এ—এ—ইও—শা—" এই রকম একটা জড়িত শব্দে আমার আধা তন্দ্রার ঘোর ভেংে গেল তাকিয়ে দেখি—টল্‌তে টল্‌তে একটা লোক বাড়ীর ভেতর এসে

ঢুকলো। চল্‌তে গিয়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ে—তবু চলেছে। আমাদের হয়তো সে দেখ্‌তেও পেলেনা—উঠি প'ড়ি করে এগিয়ে একটা ঘরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্‌তে—"শুনিয়া—এ—শু—উ—উ"—কথাটা শেষ ও কর্‌তে পার্‌লেনা—ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়ে "এ—শা—ল্—ল" ব'লে আবার—ওঠ্‌বার চেষ্টা ক'রে ডাক্‌লে—এ—গে"—

ডাক শুনে একটী হিন্দুস্থানী মেয়ে দোর খুলে বেরিয়ে এসে "এ দাদা,—তুঁহি—হো।" ব'লে তাকে ধরে তুল্‌লে।

আমার পাঞ্জাবী সঙ্গিটী মেয়েটাকে জিগ্‌গেষ করলে—"মুন্না কাঁহা—?"

মেয়েটী তার দিকে তাকিয়ে একটা জবাব দিলে,—ভয়ে বিস্ময়ে জড়িয়ে গিয়ে স্বরটা তার—আর্ত্তনাদের মতন শোনা গেল। সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"সাহেবকো ভেট নেহি মিলা ?"

এ জিজ্ঞাসার শেষে তার সে অবাক বিস্ফারিত দৃষ্টিটা একটী ব্যথাহত বক্ষের আশাহীন কাতরতা ব্যক্ত করে স্তব্ধ হয়ে রইল।

মাতালটা তক্ষুনি অম্‌নি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলে উঠ্‌লো—"দোঠো ভোজালি লে গিয়া উস্‌কো কলিজাসে লোউ নিকালকে পিয়েগা; শা—লা—লু—চ্‌চা আ—আ" বল্‌তে বল্‌তে আবার টলে পড়তে চাইল শোনিয়া জোরে আঁক্‌ড়ে ধরে তাকে খাড়া রাখ্‌লো।

পাঞ্জাবী বল্‌লে—"উস্‌কো ঘরমে লে যাও—সাহাব সে ভেট হুয়া।"

শোনিয়া ঘরে গেল। গরীবের ঘরের বউ সে কিন্তু সকল চোখের দৃষ্টি নিছিয়ে নেয়। বয়স তার বুকে মুখে মুঞ্জরিয়ে উঠেছে। সে অঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের কৈশোরক, এ তার গোধূলি লগ্নে আজ, ভরা যৌবনের বীণা খানি গীতছন্দে বেঁধে তরুণীর সারাদেহে সপ্তক সুরের সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। মুখে রূপ, অপাঙ্গে ভঙ্গি হিঙ্গোলা—অপরূপ; চলে গেলে পায়ের ছন্দ ধরণীর গায় লীলায়িত হয়ে ওঠে, এই মুন্নার বউ। আমি খানিকটা মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ভাবছিলাম মুন্না তাহলে এ স্বপ্নলোকে কি রূপ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে? শুনে সে-কুরূপ সে নিশ্চয়।

বাইরে দুজন লোকের পায়ের শব্দে শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখি সাহেব। কালো জোয়ান একটা লোকের শিরা-পেশল ডান হাতখানা নিজের হাতে শক্ত করে ধরে লোকটাকে এক রকম টেনে নিয়ে আস্‌ছেন। তার হাতে একখানা কুকরী ভোজালির ধারাল ইস্পাত—অন্ধকারের ভেতরেও চকমক ক'রে উঠ্‌ছিল। কাছে এসে দেখ্‌লাম—লোকটার চোখ দুটো—

গোল গোল—টক্‌টকে লাল যেন দুটো রক্তের ডেলা। খুনের নেশা—বুঝি—তখনো তার মাথায় বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। এক একবার অনিচ্ছায়ও—যেন—হাত ছিটকিয়ে নিয়ে ছুটতে চায়; কিন্তু সাহেবের হাতের বাঁধন শৃঙ্খলের চেয়েও শক্ত।

সাহেব বাঁ হাত দিয়ে ভোজালিখানা ছিনিয়ে নিয়ে, মুন্নার হাত ছেড়ে দিলেন। সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। একটুও ন'ড়্‌ছেনা। সাহেব ডাক্‌লেন—"শোনিয়া।"

তার হয়তো সে চেনা ডাক। ছুটে বেরিয়ে এসে—দেখে সাম্‌নে তার স্বামী—পাশে সাহেব।

"বাপুজি" শুধু এইটুকু ব'লে তার লতানো হাত দুখানা দিয়ে সাহেবের পুষ্ট মোটা হাতখানা জড়িয়ে নিলে। সাহেব হিন্দিতে ব'ল্লেন—"ভয় নেই—ওকে ফিরিয়ে এনেছি—নিয়ে যা মা, বিছানায় শুইয়ে একটু বাতাস কর্‌গে—ঘুমিয়ে প'ড়্‌বে—আজ আবার নেশা ক'রেছে।"

শোনিয়া—মুন্নার হাত ধরে টান্‌লো—সে একটুও আপত্তি ক'র্‌লোনা—একটা কথাও বল্লোনা—আস্তে আস্তে তার সঙ্গে গিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো—

সাহেব, আমি আর পাঞ্জাবী বাক্সটি ধরা ধরি করে এ পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ছুটো ছেঁড়া মাদুর পেতে দুজনে শুয়ে প'লাম। পাঞ্জাবী তার ডেরায় ফিরে গেল। পরের দিন সাহেব মুন্নার গল্প আমাদের শোনালেন।

মুন্না'র গল্প।

(সাহেবের কথা)

আমি রাস্তায় এসে পড়্‌বার আগেই মনে মনে একটা নক্সা ছ'কে নিয়েছিলেম। বরাবর ফিরিঙ্গিদের গলির ভেতর ঢুকে পড়ে খুঁচি রাস্তা পেরিয়ে তীরের বেগে ছুটতে ছুটতে মোড়ের মদের দোকানে গিয়ে পোঁছোলাম। হত্যার উন্মাদনায় ছুটেছে সে আজ—সহজ মস্তিষ্কে দু-পাও যে সে এগোতে পার্‌বে না তা আমি জান্‌তেম। দোকানের সাম্‌নে রাস্তার উপর বসে তখনো জন চারেক হিন্দুস্থানী মেটেখুরীতে করে সেই সর্ব্বনেশে বিষ ঢোকে ঢোকে গিলছিল। দুটো শালপাতের ঠোঙ্গায় তেলেভাজা ছোলা-সেদ্ধ। নেশার মুখে চাট চিবোচ্ছিল আর অস্পষ্ট আড়ষ্ট গলায় অশ্লীল গালাগাল ক'রে সেখানকার সুরাগন্ধি বদ্ধ-হাওয়াটাকে আরো পঙ্কিল, ভারি

করে তুলছিল। আমায় দেখে একবেটা "সেলাম সাহেব" বলে খুব নীচু হ'য়ে অভিবাদন জানালো আর তিনটে হো হো ক'রে হেসে উঠে জবাব দিলে—"হাঁ—হাঁ সে এ এ—বাঃরে বিলাট্ বেঃটুআ" খুরীর তলানিটুকু আর এক ঢোকে নিঃশেষ ক'রে—"অ্যাঁ—হ্যা—অ্যা"—আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে "থু—উ—থু" ক'রে খানিকটা ফেনায় লালায় মেশানো থুথু ফেল্‌লে।

আমি দোকানীকে ডাক্‌লাম। সে আমাকে চিন্‌তো। দেখেই অভিবাদন জানিয়ে ব'ল্‌লো—"মুন্নার খোঁজে এসেছেন তিন মাস পরে আজ সে এসেছিল—বেশী খায়নি—তিন খুরী মোটে!—কি যেন একটা তার হ'য়েছে মনে হ'ল—কিছু কথা ব'ল্লে না—একটুও হাস্‌লে না; অভিসম্পাত দিয়ে গালাগাল ক'র্‌লে না;—নেশাটুকু তিন চুমুকে গিলে—আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল—আমি অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌লাম কিন্তু সে কোন কথারই জবাব দিলে না।"

আমি ব'ল্‌লাম "তাড়াতাড়ি ব'ল সে কোন দিকে গেল?"

সাহুজী মানে মদওয়ালা সাম্‌নের গলিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি বুঝ্‌লাম—ও উড্‌ষ্ট্রীটের দিকে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সেই রাস্তায় ছুটে মোড় পেরিয়ে একটু এগিয়ে দেখি—একটা পাহারাওয়ালা—অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে অনবরত হাই তুল্‌ছে। আমি সাহেবী হিন্দীতে তাকে জিজ্ঞেস ক'র্‌লাম—"এ রাস্তায় একটা লোক যেতে দেখেছো?" আন্দাজেই বুঝিয়ে দিলাম তার গায় মেরজাই, ঢোলা পায়জামা পরা, মাথায় পাগ্‌ড়ী। পাহারাওয়ালা জবাব দিলে—"হাঁ আভি গিয়া একঠো পাঞ্জাবী।" লোকটা রাস্তা দেখিয়ে দিলে আমার বুঝ্‌তে একটুও দেরী হ'ল না, ঠিক টের পেলুম—সে কলিঙ্গা-বাজারে ঢুকেছে।

ঝড়ো হাওয়ার মত আমি আঁধির বেগে ছুটলাম—নির্জ্জন রাস্তা শুধু এক একটা বাড়ী থেকে ব্যভিচারীর কলুষিত উচ্চ হাসি যেন দমবদ্ধ নিরুদ্ধ হররায় নীচে রাস্তায় নেমে আস্‌ছিল। দূরে দেখলাম একটা লোক যাচ্ছে। আমি ছুটি ছুটি—লোকটাকে ধরি ধরি—সে পাশের একটা ঘরের চোরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পলো। আমি স্পষ্ট বুঝ্‌লাম মুন্না। ওখানে 'লুকোচুরি' বিলিতে মদ বিক্রি হয়—ও বোধহয় আর এক পেয়ালা খেয়ে তার মাঝে মাঝে জেগে ওঠা বিবেকটাকে নেশার বিষে একেবারে নিস্তেজ জর্জ্জরিত করে রেখে মার মুখো মরিয়া হ'য়ে

উঠ্‌তে চায়। মোটে এক মিনিট—আমি তখনো সে ঘরের দরজা অব্‌ধি পৌঁছতে পারি নি দেখি দুটো লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি জড়াজড়ি করতে করতে রাস্তায় এসে পল। একজনের হাতে কুকরী। আমার মাথাটা ধা করে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠ্‌লো। আরো জোরে ছুট্‌লাম। একেবারে বিদ্যুতের বেগে গিয়ে দু'জনের মাঝখানে পড়ে কুক্‌রীওয়ালার হাতখানা চেপে ধরে বল্‌লাম—"বেইমান।"

মুন্না চেচিয়ে উঠ্‌লো—"বেইমান লুচ্চা এই হারামজাদা! শোনিয়া মেরা জান্ মেরা কলিজা ছোড় দো হামকো বেইমানকা হাম জান লেগা জরুর লেগা।" আমি আরও জোরে হাত চেপে ধরে বললাম—"কাহে কো?" ও বল্ল—"শোনিয়াকো মাঙ্গ্‌তা মেরে মেহেরারুকো—শোনিয়াকে হাত পাকড়্ লিয়া—মেরা ইজ্জং গিয়া—বিলকুল গিয়া বাপুজী উস্‌কো হাম কলিজা সে লৌ নিকাল লেগা।" আমি বল্লাম—"আচ্ছা হোগা—আভি চল ঘর।" "উস্‌কো কলিজা নেহি নিকালগে" বলে তীব্র নিস্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে কী ফিরিয়ে তাকে আনা যায়। ওর মধ্যে তখন হিংস্র পশুবৃত্তি উদ্দাম হ'য়ে উঠে রক্ত পিপাসায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে অনেক কষ্টে টেনে নিয়ে এলাম। একটা পাহারাওয়ালা এসে জুটেছিল তার হাতে একখানা দশ টাকার নোট ফেলে দিতেই সান্ত্রীর হাত মুখ দুইই বন্ধ হয়ে গেল। তারপর—

মুন্না'র কথা।

ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে মুন্না তার জীবনের কাহিনী বলে গেল আমি নিজের মতন গুছিয়ে সে গল্প লিখ্‌লাম :—

মন্দুরম্ ওরফে মুন্নার সঙ্গে শোনিয়ার প্রথম যখন চেনা হ'ল শোনিয়া তখন আট বছরের। সাগরের ঢেউ এ ঢেউ এ ভেসে এসে রং বেরংয়ের ঝিনুক কড়ি বেলায় বালুরাশের উপর প'ড়ে থাক্‌তো। শোনিয়া রোজ আস্‌তো কাঁকালের ঝুড়ি ভ'রে সেই ঝিনুক কড়ি কুড়িয়ে নিতো পাশেই সাগর তীরে নারকেল সারের কুঞ্জের ভেতর ছিল মুন্নাদের সর্ব্বস্ব একখানা ক্ষেত। বাপ বেটায় এক সঙ্গে সেই ক্ষেতে কাজ করতো। বড় খেটে খেটে মুন্না যখন শ্রান্ত হয়ে এসে ক্ষেতের পাশে জিরোতে বস্‌তো তখন শোনিয়া বেলায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে চুনি চুনি ঝিনুক কুড়োচ্ছে! মুন্না চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তো ফিনিক ফোটা আলোর দেশে ঝিলিকমারা

লীলায় মত কচি একটা পরীর মেয়ে দোদুল দোলে তুলকী চলে কড়ি কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরছে। অসীম সাগরের নীল জলে নেয়ে এসে স্নিগ্ধ, সজল হাওয়া তার গুচ্ছ অলকের লাখো হাজার ভোমরা পাঁতি আকুল করে উড়িয়ে দিত—মুন্না তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তো! সে ক্ষেত ভুলে যেতো কাজ ভুলে যেতো—তার বাপকেও আর মনে পড়তো না; সে ভাবতো সমুদ্র বুঝি অফুরন্ত আসমানী রংয়ের অসীম শ্যামল কাফিক্ষেত জোয়ার লেগে যৌবনে তার গাছে গাছে গুচ্ছ ফুলের বাণ ডেকেছে আর শোনিয়া তার ঝুড়ি ভরে কাফি কুঁড়ির নিছানি নিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রামধনুর মুখে রংফলাবে বলে।

দু'দিন গেল তিন দিন গেল একমাস গেল তিনমাস গেল। মুন্না আর সবুর করতে পারলো না। একদিন গিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল,—ঝুড়িতে ঝিনুক কুড়িয়ে দিল, হেসে হেসে বল্ল "তোর ডব্‌গা গালে উল্‌কী তিলক তুলিয়ে ছিস কইগে?" শোনিয়া হেসে তার মুখের পানে চাইল।

চার চারটী বছর চলে গেছে! মুন্নার—বাপ নজর করলো—ছেলে তার কাজে মন দেয় না ঘুমের ভেতর ঘন নিঃশ্বাস ফেলে—ভাবলো বেটার কি হলো। কিছু বুঝতে পারে না সে তবু ভাবে;—বুকের ধন তার কল্‌জের রক্ত—যে ছেলেটী! ভুঁইয়ে প'ড়ে মুন্নারও প্রথম নিঃশ্বাসটা পড়েছিল যখন—দুঃখিনী তার মারও শেষ শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি তখনি বন্ধ হ'য়ে থেমে গিয়েছিল।

সেই ছেলেকে মানুষ ক'রে বুকে পিঠে ক'রে আজ এত বড় করেছে কিন্তু তার ছেলের কি হল? এমনি ভাবতে ভাবতে একদিন সাগর তীরের দিকে হঠাৎ তাকিয়ে দেখে মুন্না শোনিয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছে তার বাবা হেসে উঠ্‌লো। এত দিনে বুঝলো ছেলের মনে মনে বউ-কথা কয়েছে। সে নিজে নিজেই ঠিক করলো শোনিয়ার সঙ্গে মুন্নার বিয়ে দিয়ে দিবে।

শোনিয়ার রক্তের আপন কেউ ছিল না দুনিয়ায়। চিদম্বরন তার দূর সম্পর্কের মেসো তারি বাড়ীতে শোনিয়া দু'মুঠো ভাত খায় আর সারাদিন সাগর কূলে ঝিনুক কুড়িয়ে মেয়োর দিন কুজীর কড়ি কিছু কিছু যোগায়। মুন্নার বাবা-মাদুরা পট্টর তার কাপড়খানা ঝেড়ে পড়ের

কাছার কোণাটা ঝুলিয়ে নাবিয়ে দিয়ে চিদম্বরের বাড়ী গিয়ে নমস্কার দিল। কথা শুনেই ত মেসোর মাথার টনক নড়ে উঠলো। সে স্পষ্ট কথায় "না" জবাব দিলে। মুন্নার বাবা চলে গেলেই—শোনিয়াকে ডেকে কড়া শাসন করলে "ফের যদি সে মুন্নার কাছে যায় কি তার সঙ্গে কথা কয় তো শোনিয়াকে মেরে ফেল্‌বে একেবারে! খবর শুনে তো দু'জনেরই বুক টাটিয়ে টুটে পড়্‌তে চাইল। চুপি চুপি একদিন দেখা হ'লে গলা জড়া জড়ি করে বসে অনেক কাঁদাকাটী কর্‌লো কিন্তু কেঁদেই ত আর শোনিয়াকে পাওয়া যাবে না মুন্না কত ক'রে ক'রে ভবলো—কিছু মীমাংসা হ'ল না—আরো চার বছর চ'লে গেল।

একদিন হঠৎ মুন্নার বাবা ব্যামোয় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলো—মুন্না কত তার সেবা ক'রলে কিন্তু—কিছু হ'ল না—বাবা তাকে একলা রেখে চ'লে গেলেন। মুন্না আছাড় খেয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলো—শোনিয়া লুকিয়ে এসে তার সঙ্গে কেঁদে সান্ত্বনা দিয়ে মুন্নাকে থামাতে চেষ্টা ক'রলে।

দিন কতক পরে মুন্নার মনটা তখন একটু শান্ত হ'য়েছে—সমুদ্রের ধারে ব'সে শোনিয়ার গলার ওপর দিয়ে হাত লতিয়ে রেখে মুন্না গল্প করছিল আর মাঝে মাঝে শোনিয়ার ঠোঁটের টকটকিয়ে ওটা খুন-ছোপ হাসির ওপর চুমো খেয়ে মুন্না অপরূপ পুলক লেগে শিউরে শিউরে উঠ্‌ছিল। হঠাৎ কোথায় থেকে মেসো এসে তাই না দেখ্‌তে পেয়ে একেবারে আগুন! শোনিয়াকে জোরে চেঁচিয়ে ডেকে নিয়ে এক থাপড় বসিয়ে দিল।—তা'পর মুন্নাকে শাসিয়ে গেল—তাকে চিদম্বর খুন করবে—শোনিয়া যদি বাড়াবাড়ি করে—তাকেও আস্ত রাখবে না।"

মুন্নার বুকটা দুর দুর ক'রে উঠ্‌লো—সে ছুটে গিয়ে চিদম্বরের পায়ে ধ'রে বল্ল,—"আমায় মেরে ফেলো—কিন্তু শোনিয়াকে কিছু বলো না।"

"হুঁ" শুধু এইটুকু জবাব ক'রে শোনিয়াকে টেনে নিয়ে চিদম্বর চ'লে গেল।

মুন্নার মনে ভাবনার শেষ নেই, রান্না বান্না ভাল লাগছিল না। একটা গাছ হেলান দিয়ে ব'সে সে বাবার কথা, মায়ের কথা মনে মনে ভেবে দেখ্‌ছিল কিন্তু সব চিন্তা ছাপিয়ে তার—

বুকের ওপর শোনিয়া রূপসী মূর্ত্তি নিয়ে হেসে দাঁড়াচ্ছে। এমন সময় একজন পড়সী এসে বল্‌লো—"উঃ শুনেছিস মন্দ্‌রাম?"

মুন্না বললো—"কি? না।"

পড়সী বল্ল "শোনিয়াকে তার মেশো—পিঠ্‌ কেটে কেটে মেরেছে সে কথা মনে করলেও সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা ক'রে ওঠে! উঃ কী মার!"

মুন্না হঠাৎ কেঁদে ফেল্ল! সে কাঁচা দেহের লাবণ্য চিরে চিরে—বেতের ওপর বেত পড়েছে আর ঝির ঝির ক'রে পিচ্‌কিরীর ঝারি ছুটেছে বুঝি—টাট্‌কা তাজা সে রক্ত। একথা ভেবেই মুন্না ব্যথা বরদাস্ত করতে পারলে না। একবার ভাব্‌লো ছুটে যাবে—ঐ বেত নিয়ে মেশোর পিঠে ঘা করে দিয়ে শোনিয়ার মায়ের শোধ নেবে। আবার ভাব্‌লো—না—তা হ'লে হয়ত ও শোনিয়াকে মেরেই ফেলবে। মুন্না—মনে মনে একটা মতলব আঁটলে।

তখন গভীর রাত—শুধু দূরে সাগরের তীরাপহত ঢেউগুলোর আছড়িয়ে পড়া গর্জ্জন শোনা যাচ্ছিল—গাঁয়ে বাড়ীগুলো সব নীরব। মুন্না আস্তে আস্তে বেরোলো। ভয় নেই তার প্রাণে। ওরকম নিশুতি "বিরাতে"—আরো কতদিন সে শোনিয়াকে ডেকে জাগিয়ে বার ক'রে এনেছে—মেশো কিছু টের পায় নি—মুন্নারও কথনো মনে হয় নি যে—সে একটা পাপ করছে। আজও তার তা মনে হ'ল না—পা টিপে টিপে গিয়ে—শোনিয়ার মাথার কাছের খোলা জান্‌লাটা দিয়ে একটা কাঠির খোঁচা মেরে তাকে জাগালে। শোনিয়া উঠে বেরিয়ে এলো। মুন্না তাকে—বুকে জড়িয়ে নিয়ে—নিজের ঘরে ফিরে এসে—যা ছিল দু' একটা—ফতুয়া—আঙিয়া গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"শোনিয়া চল্‌তে পারবি?"

শোনিয়া বল্লে—"পারবো কিন্তু পিঠে বড় ব্যথা।"

মুন্না বল্লে—"তোকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব।"

"কোথায়?"

"ত্রিচিনোপলী।"

"খাবি কি?"

"নক্‌রী করবো—তুই আমি দুজনেই—তা ছাড়া আজ জমীটুকু বিক্রি ক'রে কিছু টাকা পেয়েছি—তা দিয়ে কিছু দিন ত চলবে।"

শোনিয়া ম্লান ঠোঁটের উপর মৌন মধুর হাসি একটুখানি হাস্‌লো।

শোনিয়াকে কাঁধে নিয়ে মুন্না বেরোলো—তার গায়ে তখন তিন জোয়ানের বল। কাউকে আর ভয় করে না সে—আজ শোনিয়াকে সে পেয়েছে।

মুন্না খানিকটা চলে গিয়ে—শোনিয়াকে নামিয়ে দিয়ে—ঐ অন্ধকারের ভেতরেই তার মুখের পানে একবার তাকিয়ে হেসে উঠলো!

শোনিয়া জিজ্ঞেষ করলে—"কিরে মুন্না?"

মুন্না বল্লে—"শোনি, তুই আমার বউ।"

শোনিয়া বল্লে—"হ্যাঁ তোর আমি বউ—ধরম সাক্ষী।"

সে নির্জ্জন পথ—গভীর রাত্রি—মুন্না দু'খান হাত দিয়ে শোনিয়াকে জড়িয়ে নিয়ে তার মুখের ওপর চুমো খেলো। তা'পর আবার দু'জনে চলতে লাগলো।

বিয়ে—তাদের হ'লো যে—তা মানুষ কেউ জান্‌লে না—শুধু দু'জনের মন রইল দু'জনের সাক্ষী।

ত্রিচিনোপলী এসে পৌঁছলো। এইবার জীবনের প্রথম মুন্না ভাল ক'রে বুঝ্‌লো—গরীব মা-বাপের সন্তান—ভিখিরীর মত দীন তারা শুধু নয়—তারা অস্পৃশ্য জাত। কত জায়গায় খোঁজ করলে—কিন্তু মাথা গুঁজে থাকবার মত একটা আশ্রয় মিল্‌লো না। ষ্টেশনের কাছে রাস্তার পাশে একটা নর্দ্দমায় প'ড়ে সারারাত কাটালো; রাস্তায় শুতে ভয়—কি জানি যদি ব্রাহ্মণ কি—আর কেউ—তার চেয়ে বড় জাত হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলে! ভয়ানক কথা!

সকালে কাজের খোঁজে বেরোলো—ঝাড়ুদারি—কি ময়লা সাফাইএর একটা নক্‌রী যদি মেলে! রাস্তা দিয়ে দু'জনে চ'লেছে। শোনিয়ার মারের ঘা, পিঠের টাটানিটা এত দিনে ঢের ক'মে গিয়েছিল—সে হাঁটতে পারছিল।

চলেছে চলেছে—আর থেকে থেকে কেউ পথিক আস্‌ছে দেখলে কাপড় মুড়ি দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে—"পঞ্চমা—পঞ্চমা পারিয়া—আমরা পারিয়া।" কখনো রাস্তার নীচে নেমে দাঁড়াচ্ছে।

আরো একটুক্ষণ। গল্পে গল্পে রাস্তার দিকে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিল—কল্পনার কলি ফেরানো ইমারত একখানা আসনানের অন্দরে গড়ে তুলে তারা তখন ওদের মনের মতন ক'রে

ভবিষ্যৎ সাজিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। দু'জনের ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ। দুই হাত যোড় ক'রে—উপুড় হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বল্‌তে লাগলো—"ক্ষমা করুন, দয়া করুন, দেবতা আপনি—আমি পারিয়া।"

লোকটা শুনে ধাঁ ক'রে ক্ষেপে গিয়েই মুন্নার টুঁটি চেপে ধরলো। সে একটা আওয়াজ করতে চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। শোনিয়া পাশে কাঁপছিল—ব্রাহ্মণ তাকে জোরে এক লাথি মেরে গর্জ্জন ক'রে উঠলো—"অজাত, অস্পৃশ্য,—ছুঁয়ে ফেলে আমার আজ জাত মারলি—হতভাগা পারিয়া পঞ্চমা" ব'লতে ব'লতে লোকটা যেন আরো ক্ষেপে উঠলো—বললো—"না আজ তোদের খুন করবো।"—"না তোর চোখ উপড়ে নোব—তোর বউএর মাথায় লাথ মারবো—তোদের মাথা ভেঙে ফেলবো।" এই ব'লে আর ঘুঁষি, কীল, লাথির উপর লাথি। মুন্না নীরবে—সেই আঘাত সইতে লাগলো। সইতে ত হবেই—সে যে পারিয়া—পঞ্চমা—অনজাত অনাচারী! আবার মার আবার লাথি—আর কত সইবে বেচারী?—"হাউ হাউ" ক'রে কেঁদে ফেললো—বল্ল—"মেরে ফেল—একেবারে মেরে ফেল—ওর ঐ রোগা দেহে মেরে মেরে আর ব্যথা ও নিদা—একেবারে খুন কর।"

ব্রাহ্মণ বড় উঁচু জাত, এত উঁচু যে স্পর্শে তা' ঢ'স পড়ে—ছুলে তার ধর্ম্ম যায়—সে রাগে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতে লাগলো। সে পথ দিয়ে আর একজন লোকও এগোলো না—দূর থেকে তারা শুনেছিল এ রাস্তায় পারিয়া রয়েছে। কুকুর শ্যাল নয়—মানুষ—কিন্তু পারিয়া—পারিয়া থাকবে রাস্তায়? পারিয়া পশুর চেয়েও অপবিত্র।

গোলমাল শুনে পুলীস এসে প'ড়ে ওদের ছিনিয়ে থানায় নিয়ে গেল। সব কথা শুনে দারোগা সাহেবের একটু দয়া হলো—তিনি জিজ্ঞেষ করলেন—"টাকা আছে তোদের কাছে?"

"আছে কিছু হুজুর" ব'লে মুন্না তাকে সেলাম কল্লে। দারোগাবাবু বল্লেন—"যা তোরা আজকেই কলকাতায় যা—সেখানে নকরীও মিলবে—পারিয়া বলে কেউ মারবেও না।"

মুন্না অবিশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠলো—"এমন সহর কি পৃথিবীর কোথাও আছে—হুজুর?"

দারোগা ব'ল্লেন—"আছে—ক'লকাতায় যা।"

সেইখানে একজন পাঞ্জাবী ব'সেছিল—সে ব'ল্লো—"তোদের কোনো ভাবনা নেই আমার সঙ্গে চল্‌,—আমিও ক'লকাতায় যাচ্ছি, সেখানে তোদের বাগানে চাকরী ক'রে দোব।"

শোনিয়া আর মুন্না দু'জনেই তাকে কৃতজ্ঞতা জানালো।

ক'লকাতায় এসে ওরা পেঁাছোলো। পাঞ্জাবীটা কিছু খাবার এনে ওদের দিয়ে ব'ল্ল—"এইখানে ব'সে খেয়ে নে—আমি খানা পিনা ক'রে এসে তোদের নিয়ে যাব। কিন্তু খবরদার এ বড় ভারি সহর জোচ্চোরের জায়গা—এখান থেকে উঠে কোথাও যাস্‌নি।"

মুন্না ঘাড় নেড়ে "না" ক'ল্লে। লোকটা চ'লে গেল; তখ্খুনি অম্‌নি আর একজন লোক তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেষ ক'র্‌লে—"তোমরা মালবারী?"

মুন্না তা'র মুখের কথায় আর চেহারা দেখে বুঝ্‌লে সে লোকটাও তাদের দেশী; সে "হ্যাঁ" ব'লে জবাব দিয়ে প্রশ্ন ক'র্‌লে—তুমিও মালাবরী।"

"হ্যাঁ।"

মুন্না আর শোনিয়া দু'জনেই হঠাৎ ভয়ে চম্‌কে উঠে একটু স'রে গিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—""আমরা পারিয়া পঞ্চমা।"

ওদের ভয় হ'চ্ছিল এই বুঝি আবার মার খায়। কিন্তু এ লোকটা হো হো ক'রে হেসে ব'ল্‌লো—"কিচ্ছু ভয় নেই তোমাদের—চল আমার সঙ্গে—আমি তোমাদের থাক্‌বার জায়গা ঠিক ক'রে দোব নোক্‌রী নিয়ে দোব।"

"হুঁ—আমি তাকে চিনি;—সে চা বাগানের আড়কাঠী—সর্ব্বনাশ হবে তোমাদের—মারা যাবে সেখানে গেলে—আর দেরী নয়—ও এখুনি এসে পড়্‌বে; শীগ্‌গির চল—এইবেলা আমরা পালাই—ও এসে প'লে ওর হাত এড়ানো দায় হবে।"

তিমুয়া—মুন্না আর সোনিয়াকে এই বস্তীতে নিয়ে এল। তিমুয়ার আসল নাম তিরোদরম—বলে সবাই ডাকে। মুন্নার পরম বন্ধু; সোনিয়াকে তিরোদরম বহিন ব'লে ডেকেছে। সেদিন ভারির হাত ধরে টানিয়া উঠোন থেকে দূরে টেনে নিয়েছিল।

তিমুয়া—দু'জনেরই ময়নাডাঙ্গার পাটের কলে চাকরী নিয়ে ছিল। মুন্না ইঞ্জিনে কাজ শিখ্‌তো—শোনিয়া কলে কয়লা দেবার কাজ নিলো।

কলে ভর্ত্তি হবার চার পাঁচদিন পরেই—মালিক এসে দেখ্‌লেন—মুন্না কাজ ক'চ্ছে। শোনিয়া তার পাশে—দাঁড়িয়ে। শোনিয়াকে দেখে মালিকের মনটা সেই মুহূর্ত্তেই দুলে উঠ্‌লো তিনি যাবার সময়—সর্দ্দার মজুরকে ডেকে বলে গেলেন—"ই জেনানাকো—ভারী কাম মত দেনা।"

সর্দ্দার কুলী—"যো হুকুম হুজুর মালিক" ব'লে সেলাম দিয়ে সাহেব চ'লে গেলে খুব একচোট্ হাস্‌লো। তা'পর শোনিয়াকে এসে ব'ল্‌লো—"নসীব তেরা—হো—মালিক বহুৎ সুখ দেগা"—

মুন্নার কাছে কথাটা ভাল লাগ্‌লো না। মাস তিনেক পরে··সকালে একদিন সর্দ্দার মজুর একটা রেশমী আঙিয়া এনে শোনিয়ার হাতে দিয়ে বল্ল—"লে—ধর; মনীব দিয়েছে তোকে শিরোপা—তোর কাজে মনীব ভারী খুসী হয়েছে।"

শোনিয়া মুন্নাকে নিয়ে কুর্ত্তা দেখালো—মুন্না ব'ল্লে—"লে পেহেন।"

আরো মাসখানেক পরে মালীক আর একদিন কাজ দেখতে এসে—হেসে শোনিয়াকে কাছে ডেকে ব'ল্ল—"তোমারা কাম্‌সে হাম বহুৎ খুসী হুয়া—এ এঞ্জিনকা কাম ছোড়ায়কে তোম্‌কো পাটমে দেগা—হুঁয়া আধা মেহনৎ—সম্‌ঝা ?"

শোনিয়া জবাব দিল—"সমঝ্‌ গেয়া হুজুর মেহেরবান;—বহুৎ বহুৎ সেলাম।"

"হাঁ হাঁ তোমকো হাম—একদম হাল্‌কা কাম দেগা" ব'লে মনীব আবার হেসে চ'লে গেল।

দিন যেতে লাগ্‌লো—কলের মালিক শোনিয়ার ওপর একটু বেশী মেহেরবান আর অতিরিক্ত রকম মনোযোগী হ'য়ে উঠ্‌লেন। মুন্নার মনে কেমন একটা সন্দেহ গোড়া থেকেই জড় নিচ্ছিল কিন্তু সেটাকে সে চট ক'রেই পল্লবিত হ'তে দেয় নি।

এর মধ্যে একদিন মনীব শোনিয়াকে তার বাঙলোয় ডেকে পাঠালেন। মুন্নার তখন মাথায় তাড়ির নেশা—কথাটার ভালমন্দ ভেবে দেখবার মতন জ্ঞান তার ছিল না। এই ক'মাসে নেশার পাপ মুন্নাকে শক্ত রকমেই ধরে বসেছিল।

মজুরীবস্তীতে যে বসতি নেয়—তারই বুঝি এ পাপের হাত এড়াবার যো নেই। এখানকার সব মাতাল! তাদের হাড় চোয়ানো কাজ নাড়ী চিবোনো ক্ষিধে। বেলা নটা থেকে পাঁচটা লোকগুলো খাটে! উঃ সে কী মেহনৎ! মনে করতেও প্রাণ শিউরে ওঠে! কলের চাপে পিষে সরু করা বস্তার মত—জীবন-ভরা শ্রমের চাপে পাঁজরের কঙ্কাল ক'খানা চিম্‌ড়ে লেগে গেছে! গায় মাংস বাড়ে না—খায় কি? রোজগার করে কি? ঘড়িকে এক আনা! দেহে যে পুষ্টি আগে থেকে থাকে, তাও শুকিয়ে যায়;—চামড়ার আঁট-সাঁট বাঁধন—টিনে পিপিন

হয়ে ঝুলতে থাকে—ভেতরে কঙ্কালগুলো চলতে খট্ খট্ করে বাজে! হাড়ে হাড়ে ঠক্ ঠকিয়ে এই হতভাগাদের পঞ্জর-সার জীবনের কাহিনী দিনরাত্তির লেখা হচ্ছে। চোখ দুটো বসে গিয়ে দেখা দেয়—বড় বড় দুটো গর্ত্ত—কপালের ওপর শিরার দাগগুলো নীল। জীবনের তাদের কোনো দরদ নেই—বোঝে কেবল পেটের তাগিদ! ভাবলে কি আর এক দণ্ডও বেচারীরা বেঁচে থাকতে পারে? ভাবনা ভুলে যাবার জন্যে ওরা হাঁফিয়ে ওঠে—পাগল হ'য়ে যায়;—সদ্য চোয়ানো বিষ ঢোকে ঢোকে খেয়ে—কোনোমতে মাথাটাকে খাড়া রাখে।

এ দিকে নেশা গিয়ে অন্তরের পশুটাকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠে যদিও সে মরণের বিকার! শিকার খোঁজে! ভোগ চাই—এ ওর নারী নিয়ে টানাটানি করে একজন আর এক জনের শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়।

মুন্নাও ক্রমশঃ এই জীবনে অভ্যস্থ হ'য়ে উঠ্ছিল। শোনিয়াকে সে ভালবাসে—কিন্তু তার চেয়েও ভালবাসে—তাড়ি। তবে শোনিয়ার উপর আর যারি ক্ষুধিত চ'খ প'ড়ে থাক তার কাছে আর কেউ এগোতে সাহস পায় নি! পেয়েছে শুধ্ একজন। মনীব ডাক্ছে শুনে মুন্না—অন্যমনস্কে ব'ল্লে—'যা।"

একটুক্ষণ পরে শোনি ফিরে এল যখন—চোখ দুটো তার রাঙা হ'য়ে উঠেছে—ঘন ঘন নিশ্বা'স প'ড়্ছিল—ছুটে আসতে গতরের লুগা এলিয়ে গিয়েছে তার খেয়াল নেই। এসে চেঁচিয়ে ব'ল্লে—"এর শোধ্ নে—তুই শোধ নেরে মরদ্! মনীব বলে—আমায় বুলাকী দেবে—কানে কুণ্ডল কিনে দেবে—ওর মুখ ভোঁতা ক'রে দে—সে বলে আমায় খাটে ঝোলাবে!"

চট ক'রে মুন্না ক্ষেপে উঠ্লো—তার হাতে ছিল একখানা কয়লা দেওয়া কোদালি—তাই ত নিয়ে ছুটলো! সর্দ্দার মজুর টের পেয়েছিল—সে দৌড়িয়ে গিয়ে ধ'রে ওকে ফিরিয়ে আন্লে—মুন্না চেঁচিয়ে উঠ্লো—"আমি ওর জান নেবো,—ওকে কলে পোড়াবো।"

সর্দ্দার ব'ল্ল—"থাম্ থাম্ পরে হ'বে।"

শোনিয়ার ঘাড়ে দুনো কাজ প'ড়্লো—সপ্তাহের মায়না—একটা না একটা দোষে হপ্তায়ই কাটা যাচ্ছে। শোনিয়া মনীবের চোখ থেকে সব সময় স'রে থাকে।

কিছুদিন পরে পরীর দেশ থেকে—একটী খুকী এসে শোনিয়ার কোলে হেসে উঠ্লো। সে কলে ছুটী নিল।

কিন্তু মুন্না যে এখন মদের একটা জ্বালা—যা পায়—তাই যায় নেশায়। শোনিয়া কত বুঝিয়ে বলে—"দারু খাস্‌নে—মদ ছুঁস্‌নে—দুধ কিনে মেয়েটাকে খাওয়া।"

মুন্না বলে—"মাড় খেয়ে আমি বেঁচেছি তোর বেটী খাবে—দুধ?"

মায়ের বুকের বোঁটায় দুধ নেই—দু'বেলার ভাতও তো তার জোটে না—মুন্না নেশা খেয়ে কড়ি ওড়ায়। মেয়েটা কাহিল হ'তে লাগ্‌লো। শোনিয়া কলে ফিরে গেল। মনীব আবার তাকে ভালবেসে তোষাবার ফিকিরে হালকা কাম দিলে। কিন্তু শোনিয়া মালিকের মনের খবর আঁচ ক'রতে পেরেছিল—সে মুখে কিছু ব'ল্‌তো না—মনে মনে সাবধানে সমিহ ক'রে চ'ল্‌তো!

ছোট মেয়ে কোলে ক'রে শোনিয়া কাজে যায়;—পেটেও দানা নেই—মায়েরও নেই—মেয়েরও নেই। শোনিয়া আর মুন্না দু'জনের রোজগার মুন্না মদে ওড়ায়—তাড়ি তাকে তাদের জড় বানিয়ে ব'সেছিল।

মেয়েটা ক্ষিধেয় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'লে—স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর তাকে শুইয়ে রাখ্‌তো। ওই কচি প্রাণে কত সইবে? মজুরের মেয়ে হ'লেও মজুর, মুটে, চাষা—মানুষ নয়—তারা মানুষের চেহারায় পশু কিন্তু পশুরই বা কত সয়? একটা কুকুরই বা না খেয়ে ক'দিন বাঁচে? বিড়াল একটা বেঁধে শুকিয়ে রাখ্‌লে একদিন,—দু'দিন; তিনদিন—তারপর দিনতো সে নেতিয়ে পড়্‌বেই। মুন্নার মেয়ে, শোনিয়ার খুকীর জ্বর হ'ল—ভারি ব্যামো—ধুঁক্‌তে লাগ্‌লো—জোরে জোরে নিঃশ্বাস প'ড়্‌ছে? চোখ মেল্‌তে পারে না—সারা মুখ—লাল হ'য়ে গিয়েছে। শোনিয়া কেঁদে মুন্নার পায় ধ'রে বল্ল—"যা বাপুজীর কাছে—উপায় কর্—রক্ষা কর্—মেয়েটাকে আমার বাঁচা।"

রোগা মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে—মুন্নার ছাতি ফেটে যেতে চাইছিল—শোনিয়ার প্রাণের কাকুতি তার আহত হৃৎপিণ্ডের ওপর শানিত আঘাত দিয়ে গেল—মুন্না ছুটে চ'লে গেল সাহেবের কাছে।

সাহেব এ বস্তীওয়ালাদের পুরোনো বন্ধু; ওরা বলে—সাহেব-বাবা—সাহেব বলেন—কত্তাগারা—বেটা। প্রথম দিন হাওড়া থেকে ফেরবার পথেই তিন্নোদরম্ শোনিয়া আর

মুন্নাকে সাহেবের বাড়ী নিয়ে—তার সঙ্গে চেনা করিয়ে দিয়েছিল—সেই দিন থেকে তারাও হয়েছিল—সাহেবের বেটা-বেটী।

সাহেব কতদিন এসে মুন্নাকে শাসন ক'রে গেছেন—ছ ছ "আদমী" "রুপেয়া" "কামাই" করে—কিন্তু তবু শোনিয়া—লাল ছাপ্—ছয় গজী লুগা কিন্‌ছে না—সিঁদুর তার তেলে চুকচুক-কপালের ওপর—তিলকের টানে টক টক ক'রে ওঠে না—পরীবানু মিনু খুকু—ক্রমেই রোগা হ'য়ে যাচ্ছে—সাহেব সে সব কথা ব'লে মুন্নাকে কতবার শাসিয়ে গেছেন—আর সে তাড়ি ছোঁবে না—ব'লে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন—কিন্তু কিছু হয় নি—শোনিয়া সাহেবকে কিছু বল্‌তে সাহস পায় নি—কোনদিন যদি কিছু বলেছে—মুন্নার হাতে নিদ্দম মার খেয়ে তাকে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌তে হ'য়েছে। আজ মেয়েটার মুখের পানে চেয়ে মুন্নার—সে সব কথা মনে হ'ল—সে দুঃখে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো।

সাহেব বড় ডাক্তার নিয়ে এসে খুকীকে দেখালেন। কিন্তু খাজাঞ্চীবাবু মোন্নাতান্নাকে তার শুশ্রূষার ভার দিয়ে সাহেবকে দূরে বেরিয়ে যেতে হ'ল। কোথায় যেন তাঁর আর কি একটা খুবই জরুরী দরকার ছিল। খাজাঞ্চীবাবু দিনরাত খুকীর শিয়রে ব'সে,—দু'পাশে তার বাপ-মা। হতভাগা মুন্না বসে বসে—মেয়েটার মুখের দিকে অপলক চ'খে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে—তা'পর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—চীৎকার ক'রে বলে—"আমি ওকে মার্‌লাম—নিজের হাতে মার্‌লাম—মদ খেয়ে—আমার নিজের বুকের রক্ত—শোনিয়ার কলিজা—মীনাকে—"ও হো হো"—ব'লে মুন্না হাহাকার ক'রে ওঠে—খাজাঞ্চী তাকে থামান্! শোনিয়া চেঁচিয়ে ওঠে না—শুধু তার দু'গাল ব'য়ে অশ্রুর ঝারি নেমে আসে—আঁচল দিয়ে মুছে মুছেও সে জল শুকানো যায় না।

মুন্না কেবলি ভাব্‌ছে—মদ খেয়ে—সে মেয়েটাকে মাল্লে! শোনিয়া মীণার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠ্‌তে চায়—কিন্তু পারে না।

আরো খানিকক্ষণ। হঠাৎ মেয়েটার হৃৎপিণ্ডটা জোরে দপ দপ ক'রে উঠ্‌লো—ক্রমেই আরো জোরে—বাইরে থেকে তার দাপানি-শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়! আর এক লহমা যোটে—নাড়ী নেই—একটা যন্ত্রণার শব্দ ক'রে—তার ছোট দুটী চোখের তারা একেবারে স্থির—পাশ

দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ল—দেহখানা—শক্ত কাঠ। "কি হ'ল কি হ'ল—মা—আমার" ব'লে শোনিয়া আছাড় খেয়ে প'ল। মুন্না তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠ লো—আছাড়ি পিছাড়ি ক'রে কাঁদ্‌লো—বুকে চেপে ধ'রে বল্‌লো—"ওকে ছেড়ে দেবো না—যেতে দেবো না—" কিন্তু ধ'রে রাখ্‌তে পাল্লে না—ঐ টুকুন মেয়েকে তিন তিনটে লোক ধ'রে রাখ্‌তে পাল্লে না—মৈনা—ময়না পাখীটী হ'য়ে পরী-মেয়েদের ফুলের রাজ্যে উড়ে গেল।

পরের কাজ যা করার মোম্নাভাম্না চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে—সব শেষ কর্‌লেন। মুন্না সেই দিনই তাড়ির পেয়ালা চুর চুর ক'রে ভেঙে ফেল্লে।

পনর দিন কাঁদাকাটীর পর একটু শান্ত হ'ল—মোম্নাভাম্না ওদের কলে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে সাঙ্গাতরা কেউ কোন দুঃখ জানালো না। শোনিয়া মুখ বুঁজে কাজ ক'রে যায়—তার কোলের বোঝা ভগবান হাল্‌কা ক'রে দিয়েছেন। সে আর হেসে কথা বল্‌তো না—কাছে এলে মুন্নার মুখের পানে চেয়ে—শুধু অবাক হয়ে থাক্‌তো।

কলের মালিক তার উদ্যত, উদ্দাম প্রবৃত্তিকে অনেক দিন শাসন ক'রে থামিয়ে রেখেছিল। শোনিয়াকে সে চায়—কিন্তু জোর ক'রে চায় না—সে জন্য অনেক অপেক্ষা ক'রেছে—মনের সঙ্গে ঢের ল'ড়েছে। মুন্না আর শোনিয়া অবাধ্য হয়েছে—কাজে কত অপরাধ ক'রেছে—তবু ছাড়িয়ে দেয় নি—কারণ শোনিয়াকে সে চায়। এ রূপ একদিন অন্ততঃ—সে ভোগ কর্‌বেই। ঢের দিন আশায় আশায় গে'ছে—আর সয় না—মালিক এবার ঠিক কর্‌লো—আর নয়—আজই সেই দিন।

তার বাঙলোর কাছেই শোনিয়াকে পাট মেলে দেওয়ার কাজ দিয়েছিল। বেহারাকে দিয়ে ডেকে পাঠালে—শোনিয়া একবার ইতঃস্তত ক'রে ভয়ে ভয়ে গিয়ে মনীবের ঘরে ঢুক্‌লো।

মালিক হেসে বল্লেন—"শোনিয়া—হাম্ তোম্‌কো বহুৎ আসনাই করি—আও হিঁয়া বৈঠ!" মনীব শোনিয়াকে তার কোল দেখিয়ে দিলেন।

শোকে ব্যথায় শোনিয়ার বুকে একটা অতি বড় বেদনার ফল্গু ব'য়ে যাচ্ছিল—দিন রাত;—বারে বারে এই অপমান—এমন পাপ কথা শুন্‌তে শুন্‌তে বেচারী আর ভাব্‌তে পাল্লে না—কেঁদে ফেল্লে।

মনীব উঠে দাঁড়িয়ে—"রোও মৎ মেরে দেল—আও"—ব'লে এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে—আর এক হাত পিঠের ওপর দিয়ে শোনিয়াকে জড়িয়ে নিতে চাইল—চীৎকার ক'রে উঠে শোনিয়া—মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'লো—তার মস্তিকে সে দিন এত জ্বালা সইবার বল ছিল না।

মুন্না সব সময় কান খাড়া ক'রেই রাখ্‌তো! চোখে চোখে শোনিয়াকে দেখে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তো! অনেক্ষণ সে কাজের উপর ছিল না—তা মুন্না লক্ষ্য ক'রেছিল—এবার তার চীৎকার শুনে ছুটে গিয়ে—দেখে—শোনিয়ার দেহ ভুঁইয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আহত ক্ষুধা-কাতর বাঘের মতন নিষ্পলক হিংস্র দৃষ্টিতে মুন্না, সাহেবের দিকে তাকালো দু'মিনিট,—তারপর কিছু না ব'লে—শোনিয়ার অসাড় দেহ কাঁধে ক'রে কলের কাছে এনে জলের ধারানি দিয়ে—জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌লে। সব কথা শুনে—বুকের রক্ত তার রাগে টগ্‌বগিয়ে ফুটে উঠলো।

বাড়ী ফিরে এসে, তিমুয়াকে ডেকে মৎলব অঁাট্‌লে—ও ব্যাটাকে একেবারে জাহান্নামে পাঠাবে—একদম্ গুমখুন—ওর বুকে ভোজালী ব'সিয়ে দিবে।

রাগ আর লাঞ্ছনা—তখন মুন্নার রগে রগে রক্ত ধারার সঙ্গে উত্তাল হ'য়ে ছুট্‌ছিল—মুন্না কড়া শান দিয়ে তার কাটারির তাজা ইস্পাতের মুখে ধার তুল্লে। ও জান্‌তো, ঐ পাষণ্ড হিলসলেনের রোজ রাত কাটায়। সেই চোরাই মদের দোকানে—দশটা থেকে বারোটা অব্‌ধি ব'সে ব'সে চুর নেশা করে—চুরির চোরানো মদ বেশী লোক সেখানে একসঙ্গে হল্লা করে না—খুব সুযোগ—ঐখানে শয়তানকে ধর্‌তে হবে।

মরিয়া হয়ে ছুট্‌লো মুন্না। কিন্তু সহজ মাথায় একাজ করা যাবে না। তিন মাস পরে—গিয়ে আজ তিন খুরী মদ খেলে। আর না—ট'লে না পড়ে—মাথা খাড়া রাখ্‌তে হবে।

নেশা নিমেষেই তার মাথায় রঙ খেল্‌তে সুরু করলো—চোখের সমুখে হত্যার বিভীষিকা রক্তের রঙে রাঙিয়ে উঠে মুন্নার মাথাটাকে নাচিয়ে তুল্লো—মনে কোনো চিন্তা নেই, প্রাণে একটুকুও ভয় নেই—একছুটে গিয়ে হিলস লেনে ঢুক্‌লো। ধ'রে বার ক'রে নিয়ে এল পিশাচকে—কিন্তু পাল্লে না—সাহেব খুনেকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌লেন।

মুন্নার গল্প শেষ হ'ল আমি অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ভাব্‌লাম। ক্লান্ত, ব্যথিত নরনারীর আশাহীন জীবনযাত্রার কলঙ্কে এই বস্তীর পল্বলগুলি নিত্য পঙ্কিল—ব্যাধি এদের জীর্ণ জীবনের দিনগুলো নিত্য বিষাক্ত ক'রে তুল্‌ছে—এ পল্বলের পঙ্কোদ্ধারের কি কোনো ব্যবস্থা হ'তে পারে না ?

"আমার মনের—চিন্তাটা যে সাহেবের মাথার ভেতর গিয়ে অনেক আগে থাক্‌তেই কাজ ক'র্‌তে সুরু ক'রেছিল—তা সেদিন টের পাইনি। বুঝ্‌তে পাল্লাম যখন—আহ্লাদে মন ভ'রে গেল,—সে কথা পরে লিখ্‌বো।"

"আমরা এখন এই বস্তীর খোলার বাড়ীতেই থাকি। দু'জনের শোবার দুখানা মড়ার খাটিয়া আছে। বিছানার ভেতর মাদুর—বালিস ইস্তি। বস্‌বার জন্যে আলাদা আর কিছু আমাদের নেই।"

"এখানে সঙ্গীরা সব চমৎকার। হরকিসিম—নানান ঢ'লের—এ মানুষের দোকানঘর বা চিড়িয়াখানা বল্লেও চলে। কেউ "কুলপী বরফ" ওয়ালা—কেউ বেচে 'সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা'—"নুন বদলে" আছে ক'জন—"শিশি আছে বোতল"ও থাকে ক'টা। "সাড়ী সেমিজ চাই"—৪ জন—পাশের বাড়ীতে জন, তিনেক "লা ব্রিস"। সবাই আলাদা আলাদা থাকে—লা ব্রিসের হুমড়ী খেয়ে চাংড়া চাঁছা—আর তার মেহেরাব্রুর দুলহা দুলানী গান দিনরাতই চল্‌ছে।

কলের ড্রাইভার, পোর্টকমিশানারের কুলী—এরাও থাকে কয়েকজন। আমরা খাই কোনদিন চালে ডালে—কোনোদিন বা চুনো মাছের ঝোল আর ভাত। বিকেলে জলখাওয়া—"চেনাচুর"। আমিই রাঁধি। সাহেব রিপুকর্ম্ম করেন।

খাওয়া দাওয়ায় আমরা অবিশ্যি খুব সাবধানে থাকি—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

"সাহেব মুন্নাকে কল ছাড়িয়ে এক মোটর কোম্পানীতে ড্রাইভারি আর অল্প-বিস্তর কল-কব্জার কাজ শিখ্‌তে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এ হাওয়া গাড়ীর কোম্পানীটা কেবলি ক'মাস খুলেছে—কল্‌কাতায় এ কোম্পানী বোধ হয় এই প্রথম।"

"মুন্না আর তাড়ির দোকানে যায় না—ইস্কুলে রীতিমত পড়ে। এ ইস্কুল সাহেবের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বস্তীতে বস্তীতে সাহেব শ্রমিকদের জন্যে ঘরোয়া কতক গুলো ইস্কুল খুলেছেন

দিনে দু'বার ক'রে ইস্কুল বসে। যাদের দুপুরে ব্যবসা তারা সন্ধ্যার ইস্কুলে পড়ে—আর সন্ধ্যায় যারা ফিরিতে বেরোয়—সে খুব অল্প কজনই—তারা দুপুর বেলা পড়ে।"

পড়ার খুব সহজ—সিলেবাস বা পাঠ্য-তালিকা। আমি নীচে লিষ্টি খানা লিখে দিলাম।

১। ইংরাজী ও বাঙলা পড়া

২। স্বাস্থ্যরক্ষা—খাদ্য, সাধারণ অসুখের চিকিৎসা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌বার উপকারিতা—ইত্যাদি মৌখিক বুঝিয়ে শেখানো হয়—ছোঁয়াচে অসুখ যাতে না ধরতে পারে তার জন্যে।

প্রতিষেধক উপায়ও—বেশ বিস্তারিত রকম ব'লে—যাতে ব্যবহারও সেই রকম চলে—সেজন্যে লক্ষ্য রাখা হয়।

৩। দেশের খবর।

খবরের কাগজ পড়ে বুঝিয়ে দেওয়া সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের খবর সব রকম মুখে মুখে ব'লে শেখানো। কোথায় থেকে জনকত ক মাষ্টার রেখে দিয়েছেন। তারা সবাই কিছু অদ্ভুত ধরণের লোক। অতি সাধারণ চাল-চলন; সাজ-গোজ একেবারেই নেই—অথচ দু'একজনের সঙ্গে গল্প ক'রে দেখিছি—সবাই মহা পণ্ডিত—কেউই মহিম পণ্ডিত নন। মোয়াভায়া এঁদের ইন্‌স্পেক্টর—সারা দিনের পরেও রাত্তির ১০টা অব্‌ধি—টো টো ক'রে ঘুরছে এ-পাড়া—আর ও-পাড়া। মোয়াভায়া কোথায় থাকে—তার ঠিকানা কেউ জানিনে—কেউ জিজ্ঞেষ করলে বলে না। সে ছাত্রদের সব—জুটিয়ে নিয়ে ইস্কুলে পৌছে দেয়—কেউ অস্বীকার ক'রলে তাড়া দেয়—ফাঁকি দিলে—"টিকটিকি" সাজে—তখন মোয়াভায়া পাকা গোয়েন্দা।"

"আমি এক একবার ভাবি—সাহেব এত টাকা কোথায় পান—ওঁর কি টাঁকশাল আছে! কিছু বুঝ্‌তে পারিনে—জিজ্ঞেষ ক'র্‌লে—"হো হো হো" ক'রে হেসে—আমার মন মাথা—ঘর-বার সব কাঁপিয়ে একটা হর্‌রা তুলে দেন।"

পরের রবিবার।

এখানেও—র'ব্‌বার এলো—এখন তো সাহেবের—নিত্য বিশ্রাম—রবি-সোম আর কি? কিন্তু সাহেব তা স্বীকার করেন না—সত্যিকার ব্যাপারও দেখ্‌লাম তাই। সকাল থেকে লোক আস্‌তে সুরু ক'র্‌লো। সাহেব সকলের কাছে—প্রথম একটা খস্‌ড়া হিসেব নিয়ে—বেশপাকা

"অডিটারের" মতন ভুলচুক খুঁতিয়ে দেখে নিলেন। জমা খরচ নিকাশ ক'রে—ওদের কাছ থেকে—টাকা পয়সা বুঝে নিয়ে—আবার নিজের নোট বই বার ক'রে—পড়্লেন। তাতে তাঁর লাভের ভাগ দেবার হিসাব ক'রে অঙ্ক কসা ছিল—সকলের নামে নামে—। যার যার লাভ বুঝিয়ে মিটিয়ে দিয়ে—ঐ হোল্ড অল।" এতদিনে বুঝলাম—ব্যাপার কি! কতকগুলো ফিরিওয়ালা আছে সাহেবের পোষ্য। তাদেরই জন্যে বাক্সে ভরে—জিনিস কিনে গুদাম বোঝাই রাখেন। র'ববার হিসাব নিকাশ। সাত দিনের দেনা পাওনা সেই দিন বুঝে নেন। সকলের টাকায় এক পয়সা ক'রে সাহেবকে দিয়ে যেতে হয়—সাহেব তাদের নামে—"প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড" মানে—নিদেনী-পুঁজী কিছু কিছু জমাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। অনবরত হো হো হাসেন—আর হিসেব করেন—এ—এক অদ্ভুত লোক। লোকগুলো সব চ'লে গেলে—আমি জিজ্ঞেষ কর্লাম—"এরা কারা?"

এই লোকগুলোন সেই—র'ববার জানবাজারের বাড়ীতে এসেছিল।

সাহেব ব'ল্লেন—"সবগুলো লোক রাস্তায় প'ড়ে মর্ছিল - ডেকে এনে—এই বালাই ঘাড়ে নিয়েছি—দেখোনা গেরো—র'ব্বারেও একটু দিনে ঘুমোবার উপায় নেই।"

"কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে—হাসি—হো হো হো। আমি অবাক হ'য়ে ভাব্তে লাগ্লাম—পরের আপদ নিজের ঘাড়ে নিয়ে—সরল হাসি হাসে—নিশ্চিন্তে নিবিড় ঘুম সারারাত্তির ঘুমোয়—এ আবার কেমন মানুষ? রাজা, চাকুরে উকীল কি হাকিমও নয়—তবে? কি জানি।

তারিখ আর সময়টা
ঠিক মনে নাই।

মাসখানেক "ফেয়ারলী প্লেসে",—গঙ্গা পারে—হাওড়ার কলের বস্তীতে দিন কতক "ফুলবাগানে" কিছুদিন এম্নি ক'রে বস্তীতে বস্তীতে প্রবাসী হ'য়ে—আমাদের দিন মাস আরামেই কাটতে লাগলো।—সাহেবের পেণ্টলুনের তালির ওপর তালি প'ড়লো—জুতোর তিনবার হাপ্শোল বদ্লালেন—আমাকে কিন্তু ছেঁড়াটেড়া রিপুকরা কাপড় চোপড় প'র্তে দিতেন না।

এই ঘোরাঘুরি ছিল ব'লেই জীবনটা তেমন আর ততখানি একঘেয়ে লাগ্‌তো না। সাহেব যখন—পরের শালে রিপু ক'র্‌তেন—আমি তখন কাগজ কলম নিয়ে—"বনিয়াদি সালের ইতিকথা" কিম্বা "দোশালার মালেক" ইত্যাদি নাম দিয়ে—এক একটা গল্প বা "স্বপ্ন" যাই হ'ক লিখে—আলফু সময়টা কাটাতাম।

**　　　　**　　　　**　　　　**

সেদিন পশ্চিম আকাশে সহসা কালো হ'য়ো উঠে কোনার একখানা মেঘ—জোর জল নামিয়ে দিয়েছিল! সাহেব—দাঁড় কাকের মত জুবজুবে ভিজে—কোথায় থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই "হো হো হো" ক'রে হেসে উঠ্‌লেন—হাসির হাওয়ায়—তাঁর ধব'ধ'বে সাদা দাঁড়ির ওপরকার জলের ফোঁটা গুলো ন'ড়ে উঠে ঝ'রে পল। আমি ব'ল্লাম—"কি' হ'ল?"

My warmest Congratulations." (আমার প্রাণের অভিনন্দন)।

আমি কিছু বুঝ্‌লাম না—তবু—একটুখানি হেসে বল্‌লাম—"আমার তো বিয়ে নয়"—

"না তোমার গোপন-প্রেমের গুপ্তকথা এই নাও" ব'লে সেই সপ্তাহের—"নন্দিতা" একখানা আমার সামনে ফেলে দিলেন।

আমি কাগজখানা খুলে দেখি—আমার গল্প বেরিয়েছে—"দোশালার মালেক।"

আমার সারা মনে আনন্দ স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে যেন আধ ঘুমের ঘোরে জেগে উঠে দেখ্‌লাম আমার ঘরে দক্ষিন হাওয়া পাগল হ'য়ে ফুলের রেণু ছড়িয়ে ছুটছে। আমার হাতের লেখা প্রথম ছাপার হরফে উঠেছে।

"সাহেব মোটা মোটা আঙুল দিয়ে আমার গাল দু'টো আদর ক'রে টিপে দিয়ে আবার হো—হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। আমি ভাব্‌লাম এ কী পাগল রে বাপু শুধুই কেবল হাসে।"

কিন্তু শুধু নয় সাহেব 'নন্দিতা'খানা তুলে নিয়ে তার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটা উলটিয়ে বার ক'রে বল্লেন—"পড়" আমি পড়্‌লাম—

"আজি কালি কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইলে ফিরিওয়ালা লাব্রিস ইত্যাদি নানা প্রকার হররকরাদিগের অত্যাচারে পথ চলা দুষ্কর হইয়া উঠে। এ বলে "সাড়ী, সেমিজ চাই, ও বদ্‌লায় নবণ খবরের কাগজ বাবু।"—

"সাড়ে বত্রিশ ভাজা"—"তাজা টাট্‌কা খবর আছে"—"বন্দিতা" এক পয়সা একঠো।"

"নন্দিতা'র এডিটারকে খুব কষেছে"—দেখুন না একখানা কিনে দেখুন জুতোর শুকতলা কি যাহু জানে বুড়ো নন্দিতার "তুব্‌ড়ো গাল থেবড়া করেছে বাবু?" ইত্যাদি।

এরূপ অভদ্র ব্যবহার প্রকাশ্য পথে সম্মানীয় লোকদিগের এরূপ গ্লানি শ্রুতি গোচর হইলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়; কিন্তু ক্রেতাগণ তৎপরিবর্ত্তে এ গালাগালি উপভোগ করিয়া হাস্য করেন এবং মূল্য দিয়া ঐ সকল কাগজ ক্রয় করিয়া থাকেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ইহার মূলে আছে এক ব্যক্তি বয়সে বৃদ্ধ, পুরাতন পাষণ্ড। সম্ভবতঃ কোন নীচ বংশ সম্ভূত দুষ্কর্ম্মশীল পিতার পুত্র হইবে। চৌর্য্য বা দস্যু বৃত্তি দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সেই অর্থে কতকগুলি তস্করের দ্বারা দিবসে "হকারের" ব্যবসায় করায় রাত্রিতে ধনীগৃহে সিঁদ কাটে নিঃসহায় পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়, সুযোগ পাইলেই পরস্ব অপহরণ করে।

আমরা সবিনয়ে এই দিকে পুলিষ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লোকটা অতিশয় চতুর এবং ছদ্মবেশ গ্রহণে তৎপর—উপযুক্ত গোয়েন্দা নিযুক্ত না করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন। আশাকরি কলিকাতার পুলিশ বিভাগ এই ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া দেশবাসীর আশীর্ব্বাদভাজন হইতে কাল বিলম্ব করিবেন না।"—ইত্যাদি।—

আমি ছুঁড়ে কাগজখানা মাটীতে ফেলে দিয়ে "মিথ্যাবাদী ছোটলোক" বলে চেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম। সাহেব আমায় ধরে বসিয়ে দিয়ে সেই নির্ভীক, সরল, অনাবিল হাসি আর একবার হেসে উঠ্‌লেন। তারপর বল্লেন—"বয়—এবার একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হচ্ছে—তুমি তৈরী থেকো. কাল সকালে বেরোবো খুব ভোরে।"

তার তিন দিন পর সন্ধ্যা বেলা।

ভোরে উঠেই সাহেব আমায় নিয়ে মাঠের দিকে চল্‌তে লাগ্‌লেন। তখনো মাঠের ওপর আলো সোণার আঁচল ছড়িয়ে শুকুতে দেয় নি; গাছের নীচে নীচে অন্ধকার অতি তরল-ছায়া ফেলে হালকা টানে কুমারীর মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনা টান্‌ছিল যেন।

আমরা গিয়ে একটা গাছের ওপর উঠে বস্‌লাম। মাঠে ছ'টা ঘোড়া দৌড়োচ্ছিল। সাহেব গাছের ওপর বেশ সাবধানে সতর্ক মতন আঁট সাঁট জুতসই ভাবে কাত হয়ে নিয়ে দূরবীণ লাগিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমার হাতে একখানা নোট বই আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। এবার বল্লেন,—লেখ—ফার্ষ্ট-ব্ল্যাক ফোর্টিন অ্যানাস্ স্পেস্।

সেকেণ্ড—ইকোয়াল মানে সমান স্পেস্ একটু ভারি চলে। পা খুব সিত্তর হবে মা।

থার্ড—রোন্ কালার স্পেস্ থার্টিন এ্যাণ্ড হাফ অ্যানাস্ সামনে একটু ঝুঁকে চলে—থরোব্রেড্ ইংলিস বলে মনে হচ্ছে। খুব হোপফুল—হাইলি নিম্বল্, রোখা, তেজী.—ঘাড়ের ভঙ্গীটা চমৎকার বাজী জেত্‌বার জন্যই ও স্পেসালী ব্রেড়্—নিশ্চয়। আচ্ছা দেখা যাক।" আমরা গাছ থেকে নেমে পড়্‌লাম একটু পরেই জকীরা ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে চল্লো। সাহেব একটা শব্দ ক'রে—কি যেন ইশারায় জানালেন। সেই তিনের ঘোড়াটার সোয়ার আস্তে আস্তে এ গাছটার কাছে এসে মাথাটা একটু হেলিয়ে ঝুঁকিয়ে দিলে। সাহেব ধাঁ ক'রে তার পকেটের ভেতর খান কত নোট মুচ্‌ড়ে দলা ক'রে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস কল্লেন—"কার ষ্টেব্‌ল ?"

"ঝুনঝুনি ওয়ালা" থারোব্রেড্ ইংলিস ফার্ষ্ট ফেভারিট ; ষ্টেক থার্ড এণ্ড ইউ উইল্ উইন।"

সাহেব জিজ্ঞেষ কল্লেন "নাম ?"

সঙ্গে সঙ্গে আরো দু' খানা নোট পকেটে।

"ফ্যান্সিফেয়ার "জকী সেল্‌ফ হ্যাণ্ডি ক্যাপ্‌ড্ এক পাউণ্ড অ্যাজ লাইট অ্যাজ এয়ার।"—

"হাওয়ার মত হাল্‌কা" বলে জকী মুখ ফিরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সাহেব খাতা বার ক'রে তাড়াতাড়ি পাতা উল্‌টিয়ে 'পেডিগ্রি পড়্‌লেন—"ফ্যান্সি ফেয়ার" বাপ মা দুই-ই ইংলিস্। বাপ—ডার্বি জিতেছে।" এই ঘোড়াই ধরবো—বয়—আজ রেস্ খেল্‌বো ?"

তার পর দিন।

ঠিক চারটায় আমরা রেস্ কোর্সে গিয়ে পৌছলাম। বুকীরা, দালালের দল চেঁচামেচি ক'রে ভাল মানুষেরও মাথা গোলমাল ক'রে ফেল্‌বার যোগাড় ক'রে তুল্‌লো। কেউ বল্লে—"ডিউক অ্যালবিউনি" ধরুন—কেউ বল্‌লে—"ষ্টেপ্‌ল্ চেজ্" প্লেস পাবে নির্ঘাৎ—জিত্‌তে যদি চান

"হাক্মুনে" "ষ্টেক" করুন। বুকীদের ঘরে লোকের হুড় আর ভিঁড় এক রকম প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। আমরা সোজাসুজি গিয়ে "ফ্যান্সি ফেয়ারে" হাজার টাকার টিকিট কিন্‌লাম। সাহেব আজ দু'পকেট বোঝাই ক'রে লড়াইয়ের রেস্ত মানে টাকায় পুরে নিয়ে এসেছিলেন।

ঘোড়া দৌড়োলো এক বেটা কাত হ'য়ে পড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো সবাইএরই মুখে হাসির কোল কাটিয়ে উদ্বেগের চিহ্নটাই ফুটে উঠ্‌ছিল বেশী স্পষ্ট হয়ে।

পাঞ্জাবী একজন চেঁচিয়ে বল্ল—"লেগা লেগা ওহি—হাঁ হাঁ"—

আমি দেখলাম "ফ্যান্সি ফেয়ার" পাঁচটা ঘোড়ার পেছনে দৌড়িয়েছে। সাহেব নির্ব্বিকার। আমার কিন্তু বুকটা দুরু দুরু কর্‌ছিল—এতগুলো টাকা! চোখের পলকে দেখি ফ্যান্সি ফেয়ার থার্ড—দু'সেকেণ্ডের ভেতর দ্বিতীয়—পাঞ্জাবীটা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"আরে ই-তো ফ্যান্সি ফেয়ার এহি তো লে লেগা বুঝাতা" ফ্যান্সি ফেয়ার প্রাণপণে ছুঠেছে; আমাদের কিছু আশা হ'ল তবু—একেবারে টাকাটা যাবে না—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঞ্জাবীটা আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"হাঁ হাঁ গর্দ্দান বাঢ়ায় দিয়া লে লিয়া লে লিয়া।" হাততালি হল্‌লা রুমাল ছোঁড়াছুড়ি। কারো কারো মুখ একেবারে আল্‌কাত্‌রা। "ফ্যান্সি ফেয়ার জিত্‌লো। আমরা আজ লক্ষপতি। সাহেব হো হো হো অনবরত হাস্‌ছিলেন। মেম সাহেব বাঙ্গালী শিখ অনেকেই এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। সাহেব কেবল হেসেই তার জবাব দিলেন।

দুদিন পরে।

রাত্তিরের খাওয়া শেষ হ'লে সাহেব আমায় বল্লেন—এইবার বড় মানুষী কর্ত্তে হবে বন্ধু "সোসাইটী জেণ্টেল ম্যান" সহরে সম্ভ্রান্ত লোক আমাদের হওয়া চাই। একটা বাড়ী—কিন্‌বো। রেসে সোওয়া লাখ আরো প'চিশ হাজার। আমি থাঁ করে হাঁ ক'রে গিয়ে জিগ্‌গেষ কর্‌লেম "আরো প'চিশ হাজার কিসের?" সাহেব হেসে জবাব দিলেন—"সেই মনে আছে তোমার,—একদিন রাস্তায় বেরিয়ে একটা দুটো তিনটে এমনি করে একখানা লিষ্টি করেছিলেম নোট বইএর পাতায়।"

আমি বল্লেম—"আছে।" সাহেব বল্লেন—"সে গুলো বাড়ীর খবর। আমি এগারখানা বাড়ী এক বছরের লিজ নিয়ে দেড়া দুনা লাভে আবার সাবলেট করেছিলেম তাতে লাভ হয়েছে মোটামুটি প’চিশ হাজার। আমি অবাক হ’য়ে রইলাম। "ব্যবসা ব্যবসা বয় ব্যবসা বড় টাকশাল" বলে সাহেব আবার হাস্‌লেন। আমরা ভারি বাড়ী একখানা কিন্‌লাম।

বিজলী আলো, চকচকে আস্‌বাব পত্র, গালিচা পাতা মেজে, দামী ছবি দিয়ে দেওয়াল সাজানো।

আমি সত্যই আমীরজাদা—আমির হলেন আমার সাহেব। আমীর বল্লেন—"এ বাড়ীতে আর পুলীশ আমায় ধরতে আসবে না। বড় লোকের এ ছত্র মণ্ডীল।"

পড়া শেষ হ’লে সাহেব বল্লেন "বেশ এখন ভূমিকাটা পড়।"

নব্‌নে গোড়া থেকে পড়া সুরু কর্‌লো—"আমি সাহেবের বয়। সাহেব নাদুস্ নুদুস মোটা কিন্তু ফুটবলের মতন গোলগাল নন। পুষ্ট হাড়, পেশল দেহ অতি শক্তিমান। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কি দু’ এক বছর ওপর।

ঋষির মতন সাদা দাড়ি। লাঠি একগাছা সব সময় হাতে আছে। মোটা গেঁটে—পাহারাওয়ালার হাতে হলে তাকে ডাণ্ডা বল্‌তাম। ভাগ্যিস তিনি সেটা যখন তখন যার তার ঘাড়ে ঝাড়েন না। তা হ’লে আমারও জেল—তাঁরো ফাঁসি একেবারে বাঁধা ছিল।

"সাহেব আমার পালক—আবার শিক্ষক—ডবল বহরের বাবা—সাধারণ মানুষের চারগুণ বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকেন।"

"অমন মাষ্টার পৃথিবীতে বুঝি ঐ একজনই আছেন। বেত মারেন না কিন্তু শেখান। মুখস্থ কর্‌বার জন্য বেঞ্চির নীচে ঘাড় ঠেলে উপুড় ক’রে বসিয়ে রাখেন না কিন্তু মুখস্থ হয়।"

"তিনি জানেন না বোধ হয় শুধু এস্কিমো আর আফ্রিকার মানুষ-খেকো লোকদের ভাষা নইলে এমন ভাষা নেই যা তিনি লিখ্‌তে ও পড়্‌তে পারেন না!"

"তাঁর একখানা খাতা আছে তাতে কি যে আছে আর কি যে নেই তার ঠিকানা করা যায় না। সেই-ই হ’ল আমাদের মহাভারত; আর যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে।"

নীচে তারা চিহ্ন দিয়ে ফুট-নোট করা—ভারত মানে এখানে পৃথিবী

তাঁর কাছে আমি জুতো সেলাই থেকে ছবি আঁকা অব্‌ধি হাতের কাজ সব শিখ্‌লাম।

নিজের দেশ, বিদেশ সব দেশেরই কাব্য সাহিত্য মুখে মুখে শুনেছি মাঝে মাঝে বই থেকে প'ড়ে শুনিয়েছেন। দু'জনের পড়া হ'য়ে গেলে সে সা বই পুরোনো বইএর দোকানে বিক্রি ক'রে দিয়ে টিনের সিগারেট কিনে খেয়েছি।

"আমার কাছে সাহেব যত বড় বিস্ময় তার চেয়ে বেশী হেঁয়ালী।"

তিনি বিড়াল পোষেন না সুতরাং তাঁর স্বভাব মেদামারা কিম্বা কুটীল নয়। কুকুর পোষেন না কাজেই যাকে তাকে যখন তখন খিঁচিমিঁচিয়ে খিট মিটিয়ে ওঠেন না। আবার কারো কাছে মাথা নীচু করে দিয়ে লুটিয়ে পড়ার মনও তাঁর নয়—শক্ত তিনি সহিষ্ণু ব'লে, মাথা উঁচু ক'রে চলেন কারণ তাঁর মাথা আছে। তিনি মানুষ পোষেন সুতরাং মনুষ্যত্বের দাবী তাঁর কাছে যে কেউ কর্‌তে পারে—কৃপণও নন কারণ খান ভাল। বাঁদর পোষেন না কাজেই চঞ্চল নন্—গম্ভীর। পাখী কিনে ছেড়ে দেন সুতরাং স্বাধীনতা ভাল বাসেন।

"আমি তাঁকে ভয় ত করিই না—ভক্তির কথাও ঠিক বলা কঠিন। তবে আমি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, যিশু যেমন ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তেন।

এইখানে নীচে নোট করা আছে—"নন্দিতার সম্পাদককে আমি একবার দেখে নোব।" এইটুকু বোধ হয় পরে যোগ করা হ'য়েছিল।

শুনে সাহেব বল্লেন—"তোমার কান মলে দেওয়া উচিত—তুমি আমার নামে মিথ্যে কথা লিখেছো।"

তা'পর আবার আমাকে কাছে টেনে জড়িয়ে নিয়ে বল্‌লেন—কিন্তু বয় "নন্দিতার সম্পাদককে নিয়ে গোলমাল ক'র না বুড়ো বায়াত্তর বছর বয়স হ'ল—ওকে বায়াত্তুরে ধরেছে ব'লে আমরাও কি ক্ষেপে যাব?"

নব্‌নে আর কিছু জবাব দিলে না।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভ্রষ্ট-লগ্ন।

অভিমানী বন্ধু আমার কোথায় তুমি কোন বিদেশে,
বে-দরদীর আকুল কাঁদন সেথায় কি গো যায় নি ভেসে !
সে দিন তুমি সাঁঝ অবেলায় এসেছিলে আমার দ্বারে
কুহেলিকার আবছা আলোয় চিনি নি গো তখন হা—রে
　　　　এলে যখন আমার দ্বারে।
　　ওগো মহারাজ অধিরাজ
　　তোমার হেরি ভিখারী সাজ
আঘাত হেনে বিদায় দিলুম কোন্ পাপিনীর পাপ নিদেশে !

পেয়ে অনেক ব্যথার জ্বালা বক্ষে বয়ে বেদন ভারী—
শান্তি আশায় এসেছিলে তখন যদি জান্‌তে পারি—
　　　　বক্ষভরা বেদন ভারী।
　　সাপ্‌টে টেনে সোহাগভরে
　　আসন দিয়ে বুকের 'পরে
শ্রান্ত শিথিল পা দুখানি মুছে দিতুম মাথার কেশে।

অনাদৃত জীবন তব দ্বার হতে দ্বার কাহার লাগি
খুঁজেছিল ব্যাকুল চোখে সান্ত্বনারি পরশ মাগি,
　　　　দ্বার হতে দ্বার কাহার লাগি।

ভাব্‌লে বুঝি আমার কাছে
পথের মাণিক লুকিয়ে আছে
তাই এলে কি ছিড়িয়ে নিতে বক্ষে ব্যথার বাণ বিঁধে সে।

কেউ তোমারে দেয় নি আদর—দেয় নি স্নেহ ভালবাসা।
অবহেলা কী তোর ললাটে—লিখেচে সেই সর্ব্বনাশা ?
বঞ্চিত সব ভালবাসা।
আমার বুকের রুদ্ধ কবাট
খুল্‌তে নারি জোর করাঘাত
ফিরে এলো ক্লান্ত হয়ে ব্যর্থ হারি এক নিমেষে।

এ অভাগীও বোঝার ভুলে চেনে নি তার পূজারীকে
চায় নি তখন নিঙ্‌ড়ানো তার তরুণ প্রেমের পূজার দিকে।
চেনেনি তার পূজারীকে।
নীহল দিঠি তোমার চোখের
ছিল নাতো মর্ত্ত্য লোকের
ব্যথায় তারে ভরিয়ে দিলুম হতাদরের কেমন বিষে।

আজ অবেলায় তাই যে মনে পড়্‌চে আমার বারে বারে
কিসের লাগি আঘাত দিলুম কোন্ সে ধনের অহঙ্কারে ?
পড়্‌চে মনে বারে বারে।

ছিল না তো---আজো যে নেই
পূজারীকে কি ধন যে দেই
মিথ্যা দিয়ে মন কী তারে আজ অবেলায় ছলবি শেষে ?

ও রে আমার উদাস-মনা---ওরে আমার পথিক-কবি
তরুণ বুকের গহন তলে লুকানো ও কিসের ছবি ?
ওরে আমার পথিক-কবি।

রক্ত তুলির রঙিণ লেখায়
মূর্ত্তি কাহার ঐ দেখা যায়
ও যে আমার—আমার ও যে--ওই যে আঁকা তোর হৃদে সে !!!

এগো আমায় ভালোবাসো হায় দরদী পথিক পাগল
তাই আজিকে অশ্রু ঝরে ভেঙে আমার চোখের আগল।
অকারণের পথিক পাগল,

আফ্‌শোষে মন ডুক্‌রে কাঁদে
পরাজয়ীর ব্যথায় ফাঁদে
বিজয়িনী অপমানে মুখ ঢাকে আজ আঁচল ঠেসে।

শক্তি আমার আছে কি হায় ধরে রাখা তোমায় হেথা
পথের নেশা লেগেচে যার বুঝ্‌বে সে কি ঘরের ব্যথা !
ধরে রাখার শক্তি কোথা ?

খুঁজেছিলে সে দিন যারে
ঘৃণা ক'রে আজকে তারে
অভিমানে কোথায় গেচ সেই ব্যথা যে মনকে পেযে।

কতই আঘাত পাচ্চ দেখা—আমার কথাই ভাবচো বুঝি
জানি তুমি অমন ব্যথায় আর কারুরে নওনি খুঁজি।
আমার কথা-ই ভাবলে বুঝি !
কেউ না চিনুক আমি চিনি
স্মৃতির আগুণ নিশি দিন-ই,
ভিখারী সাজ খুলে তোমায় সাজিয়ে দেচে বাউল বেশে।

আদর ছাড়া চাওনি দয়া ওগো আমার সোহাগ ভীতু
আজো বুঝি তেমনি আছো—বদলে নিক মনের ঋতু।
ওরে আমার সোহাগ ভীতু !
ছল করে সে কথার বেলায়
একটু খানিক অবহেলায়
মুখখানি তোর মলিন হোত—যাইনি ভুলে আজো যে সে।

সেই গরবী দেবতা আমার বক্ষে লয়ে দুখের কাঁটা
দেশ বিদেশে ঘুরচো পেয়ে অনাদরের আঘাত কাঁটা
বক্ষে ধরি স্মৃতির কাঁটা।

আশা-ভাণ্ডারে আগুন ঢালি
হাহাকারে বাজায় তালি
প্রতিধ্বনি দূর হ'তে তার রুদ্ধ এ মোর ব্যথায় মেশে !

পাহাড় সম হোক না তোমার অভিমানের অটুট ভার—
শুনতে যদি পাওগো কভু ঝরচে আমার অশ্রুধার ;
টুটবে তোমার মনের ভার।
দিবস রাতে তোমার লেগে
পথের পানে রই যে জেগে
শুনলে কভু আসবে নাকো—আসবে ছুটে কাঁদন-রেশ।

খামখেয়ালী বন্ধু আমার আজ কী তোমায় চলতে পারি ?
নীরবে আজ সঁপিয়া দাও ও জীবনের সকল ভার-ই।
তোমায় কি আজ চলতে পারি !
গুমরে জ্বলা তুষের দাহন
তোমার হাতের পরশ-গাহন
দিক নিভায়ে আঁধার রাতে ঘরে আমার একলা এসে।

আজকে কেন বেলার শেষে তোমার কথাই পড়চে মনে
ফিরিয়ে পেলে নয়ন জলে—চেতুম ক্ষমা পথের বনে।
তোমার কথাই পড়চে মনে।

দরদহীনা পূজারিণী
অপমানের আঘাত জিনি
দুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে একা, মুখ তুলে চাও চাও গো হেসে।

বন্দে আলী।

দয়ানন্দ সরস্বতী।

—:*:—

(২)

প্রথম প্রবন্ধ লেখার পর দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা মনে পড়িল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

বেদ যে অনন্ত নহে এতৎ সম্বন্ধে তিনি আরও এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে মনুস্মৃতিতে এই ব্যবস্থা আছে যে দ্বাদশ বৎসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া চারিবেদ অধ্যয়ন করিবে অর্থাৎ তিন তিন বৎসরে এক এক বেদ পড়িয়া শেষ করিবে। সুতরাং চারি বেদ যখন বার বৎসরে পড়িয়া শেষ করা যায় তাহা অনন্ত হইতে পারে না।

একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত দয়ানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু পরস্পর কোন আলাপ হয় নাই। দয়ানন্দ তখন কোন বন মধ্যে থাকিতেন। একদিন জ্যোতিঃসম্পন্ন পরম রূপবান এক পুরুষ বেদোচ্চারণ করিয়া তাঁহার নিকটে সমুপস্থিত হইয়া তিন চারি পল মাত্র সময় উপবেশন করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করিবার পর দয়ানন্দ অন্য লোকের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একদিন কথায় কথায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা উঠিল। দয়ানন্দ তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার সংবাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। উপস্থিত একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত বলিলেন "শুনিয়াছি রাজেন্দ্রলাল জাতিতে শূদ্র, অথচ তিনি এত বড় বিদ্বান্। এ বড়ই আশ্চর্য্য।" দয়ানন্দ বলিলেন "তিনি যে শূদ্র এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমার বোধহয় তিনি অম্বষ্ঠ।"

কলেজের কোন ছাত্র দয়ানন্দের কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন সে সংস্কৃত কিছু পড়ে কি না। সে রঘুবংশ বা কুমারসম্ভব পড়ে বলিলে দয়ানন্দ বলিতেন মনুস্মৃতিঃ কথং ন পঠ্যতে? কাব্যৈঃ সত্যনাশঃ ক্রিয়তে।

দয়ানন্দকে একাধিক বার বলিতে শুনিয়াছি যে মনুসংহিতায় পাঁচশটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে। প্রচলিত রামায়ণেও বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে এ কথাও বলিতেন।

শ্রাদ্ধ তর্পণ ও হোম দয়ানন্দের মতে সকলেরই দৈনিক অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ কেবল পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের উদ্দেশেই করিতে হয়। প্রত্যহ এই তিন মৃত পূর্ব্ব পুরুষের নাম স্মরণ করিলে দায়ভাগে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই তিনটী শব্দ ঈশ্বরেরই নামান্তর। সুতরাং শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে ঈশ্বর স্মরণও হয়। তর্পণ করিতে হয় মধ্যাহ্নকালে যখন সূর্য্যতাপে জগৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কোন বৃক্ষমূলে বসিয়াই তর্পণ কর্ত্তব্য এবং তর্পণের জল সেই বৃক্ষ মূলেই ঢালিতে হয়। ইহাতে বৃক্ষের উপকার হয়। ইহা হইতে এই শিক্ষা লাভ হয় যে কেবল জল দিয়াও পরোপকার করা যায়। বৃক্ষকেও যখন উপকার করা উচিত তখন উচ্চতর জীবকেও দয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য এবং বিনা মূল্যের বস্তু জল দিলেও যখন কাহার না কাহারও হিত হয় তখন মূল্যবান্ বস্তু দান করিলে যে অধিকতর হিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। তর্পণ ও শ্রাদ্ধে যে বস্তু দান করা হয় তাহা প্রেতগণ গ্রহণ করেন না—তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে আমাদেরই হিত হয়।

আর হোমে জগতের মঙ্গল হয়। ঘৃতের আহুতি ধূমে পরিণত হয়। সেই ধূমের স্পর্শে মেঘ বিশোধিত হয় এবং বিশোধিত মেঘের বৃষ্টিতে জগতের কল্যাণ হয়; যেহেতু সেই বৃষ্টির জলে শস্যের উন্নতি হয়। এইরূপ ব্যাখ্যাকেই পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাম দিয়াছিলেন। দয়ানন্দ বলিতেন যে ঘৃত দ্বারা সম্ভলন করিলে যেমন ব্যঞ্জন স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হয় তেমনি মেঘের জলও স্বাদু ও হিতকর হয়।

এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকই হউক বা বালকোচিতই হউক, আর্য্যসমাজভুক্ত নরনারী প্রত্যহই হোম ও তর্পণ করিয়া থাকেন। সংসারে চিরকালই সমাজ মধ্যে বহু কুসংস্কার ও বহু উপধর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে কিন্তু এই হোম ও তর্পণের মত নিরীহ উপধর্ম্ম অতি অল্পই আছে।

নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া একখানা পুস্তক লিখিবার জন্য কেহ যদি দয়ানন্দকে অনুরোধ করিত তাহা হইলে তিনি বলিতেন "ভরতখণ্ড শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি পুস্তক লিখিলে নিশ্চয়ই আর একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে। তাহা আমি ইচ্ছা করি না।" আর একটা এই বলিতেন "আমি নিজে বসিয়া বসিয়া লিখিতে পারি না। আমি বলিয়া দিলে লিখিয়া লইতে পারে এমন লোক আমার নাই।"

পরে কিন্তু দয়ানন্দ পুস্তকও লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতাবলম্বী এক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হইল। কিন্তু নূতন সম্প্রদায় হইলে ভরতখণ্ড অর্থাৎ ভারতবর্ষ আরও দুর্ব্বল হইবে বলিয়া তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন সেরূপ কুফল কিছুই হয় নাই। তাহার প্রবর্ত্তিত আর্য্য সমাজের অভ্যুদয়ের ফলে ভারতে নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে আর্য্য সমাজীদের মত যাহাই হউক কার্য্যে তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া বসিয়া ধ্যান করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন অর্থাৎ কিসে সংসারের সুখ বৃদ্ধি করিবেন কিসে সংসারের দুঃখের লাঘব হইবে এই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ উন্নতির যে প্রধান অন্তরায় জাতিভেদ তাহারই উচ্ছেদ করিয়া অবনত এবং অবনমিত জাতি সকলকে উত্তোলন করিয়া আর্য্যসমাজ ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

শূদ্র প্রস্তুত অন্ন তিনি আহার করিতে পারেন কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে দয়ানন্দ বলিতেন শূদ্র যদি নখ কেশ কাটিয়া ভালরূপে অঙ্গ প্রক্ষালন পূর্ব্বক রন্ধন করে তাহা হইলে তাঁহার আপত্তি নাই। শূদ্র বলিলে তিনি অশিক্ষিত অপরিচ্ছিন্ন লোকই বুঝিতেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া যাহারা বেদাধ্যয়ন করে নাই বা অন্য কোনরূপ বিদ্যা শিক্ষা করে নাই তাহারাই দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে শূদ্র।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

শরচ্চন্দ্র।

(কামেল ছন্দ)

শরতের আকাশ,—তাহে নাই জলদ।
স্বরগের আভাস,—কিছু নাই গলদ!
লাগে খুব মধুর,
মন প্রাণ-বঁধুর
শশীমুখ প্রকাশ,—দেখি আয় জলদ
সেবি' আয় অনিল,—সমতুল সুধার;
দেখি আয় সুনীল নভোরূপ উদার।
পাশে মোর ছাদের
দ্রব-হেম চাঁদের
নব চাঁদ, অখিল জগতের দু'ধার!
ধরো গীত কামোদ,—নব সুর দীপন!
করো ভাই! আমোদ,—উপভোগ, জীবন।
শোভা এই বিশদ,
ভরি দিক্ ঈষৎ
ভব মন অবোধ! ভুলে যাক,—কি পণ!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

হাসির দাম।

—:(*):—

সে ছিল কোনও পতিতার তথাকথিত মেয়ে। যার জীবনে যৌবন সমাগমে আত্মবিক্রয় ভিন্ন অন্য কোনও বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল না; তা' কর্‌তে সে যেন বিধাতার আইন অনুসারে বাধ্য। কাজটা ভাল কি মন্দ—তা' কখনও তার ভেবে দেখ্‌বার অধিকার ছিল না। তার মা বলে পরিচিত জীবটি তাকে যে নির্দ্দিষ্ট পথে চালাবে—চল্‌তে হবে তাকে সেই পথে!

তখন ছিল সে খুব ছোট। তার নির্দ্দিষ্ট ভাবী-জীবিকাই হোক্ অথবা আর একটা অবক্তব্য কিছু আমার দৃষ্টিকে তার দিকে লক্ষ্য কর্‌তে বাধ্য করেছিল।

তার চেহারায় একটা বিশেষত্ব ছিল—কমনীয়তা, তাকে দেখ্‌লেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হ'ত। তাকে দেখ্‌লেই আমার চোখ জলে ভরে উঠ্‌ত—আর মনে হ'ত—হায়! এমন কুসুমেও কীট দেখা দেবে!

ক্রমে তার বয়স হ'তে একটা জিনিষ আমার চোখে ধরা পড়ে গেল;—সময় অসময় নেই—আমাদের মেসের প্রতি তার উদাস দৃষ্টিতে কেমন ব্যাকুল ভাবে চাহনি।

কেন বল্‌তে পারি নে'—আমি ঠিক ভাল ছেলের বই পড়ার মত তাকে পড়্‌তে লাগ্‌লাম; তার ফলে বুঝ্‌তে পার্‌লাম—তার সে চাহনির লক্ষ্য আমাদের মেসের প্রমেশ। প্রমেশ যখন পড়্‌তে যায়—পারুল তখন তেমাথার রাস্তায় একটা দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তার বুভুক্ষু দৃষ্টি দেখ্‌লে বোধ হয় সে যেন চোখ দু'টো দিয়ে প্রমেশকে গিলে ফেল্‌তে চাচ্ছে।

প্রমেশ কিন্তু ছিল—খুব ভাল ছেলে,—Strict moralist—অর্থাৎ যারা ও-জাতিকে বড়ই ঘৃণা করে—ঠিক তাদের দলের, পারুলদের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলে কলেজ কিছু 'সর্টকাট্' হ'তে পারে—কিন্তু পাছে কলঙ্কের আব্‌হাওয়া লেগে মন ময়লা হ'য়ে যায়—সেই ভয়ে ও-রাস্তার সংস্পর্শটাকেই সে বাঁচিয়ে চল্‌ত।

কাল কারুও মুখের পানে চায় না ক্রমে মকরকেতন পারুলের অঙ্গেও পূর্ণতার চিহ্ন সৌন্দর্য্য-রাগে এঁকে দিল। চারিদিক হ'তে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের পাশে মৌমাছির মত সৌখীন বাবুর দল তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু এইখানেই দেখ্‌লাম মস্ত গোলমাল। বাবুর দলকে দেখ্‌লেই ঘৃণায় তার মুখ কেমন বিবর্ণ হ'য়ে যেত—সে বুঝ্‌ত না বুঝি—ওই বাবুর দলের খোস-মেজাজের বিনিময়ে তার ভাতকাপড়ের সংস্থান।

ক্রমে দেখ্‌লাম—না-হাস্‌বার জন্য তার উপর অত্যাচার হ'তে আরম্ভ হ'ল। এক এক দিন সে অত্যাচার নজরে পড়্‌লে মনে হত—মেসের ঘর বদ্‌লে ফেলি। কিন্তু কাজে তা' হত না। আমার প্রাণ তখন প্রেমের খেলা দেখার নেশায় ভোর, আমি আমার ঘরের জানালাটার নেশা কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌লাম না।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘট্‌ল—যাতে প্রমেশকে প্রায় অষ্টপ্রহরই পারুলের চোখের উপরে থাক্‌তে হ'ত। প্রমেশ রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের ছেলেদের 'গার্জ্জেন্‌-টিউটারি'তে নিযুক্ত হ'ল।

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী পারুলদের বাড়ীর ঠিক সম্মুখে এবং যে ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দাটি প্রমেশ ব্যবহারের জন্য পেল—সে দু'টিও ঠিক পারুলের ঘরের সাম্‌নে। পারুলের ঘরের জানলা খুল্‌লে সটান প্রমেশকে দেখা যেত। কাজেই আজকাল প্রমেশের পারুলকে দেখা না দিয়ে আর গত্যন্তর ছিল না।

আমি কোনও দিন পারুলকে দরোজায় দাঁড়াতে দেখি নি'। কিন্তু কলেজের ছুটির পর যে সন্ধ্যায় প্রমেশ আপনার জিনিষপত্র রাজা-বাহাদুরের বাড়ীতে নিয়ে যায়—সেই সময় দেখ্‌লাম—পারুল যথাসম্ভব সজ্জিত আপনার দেহ-লতাটিকে টেনে দুয়ারের উপকণ্ঠে দাঁড়াল, দেখ্‌তে লাগ্‌লাম—ক্রমে তার ক্ষুধিত আত্মা প্রমেশের অন্বেষণে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।

'থাড-ইয়ারে' আমার স্বাস্থ্য বড় খারাপ হওয়ায় জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম যাই। এক বৎসর কলিকাতার মেসের কোনও খবর জান্‌তে পার্‌লাম না। কিন্তু প্রাণটা এক একবার পারুলের খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ত।

সেদিন পুরো একবৎসরের পর ফের কলিকাতায় পড়্‌তে এলাম। দেখ্‌লাম—অনেক জিনিষ উল্টে গিয়েছে। কেবল একটা জিনিষ উল্টায় নি'—অর্থাৎ প্রত্যহ সন্ধ্যায় পারুল প্রমেশের অপেক্ষায় ঠিক আগেরই মত সেই ফুটপাথের পাশের জানালায় বসে থাকৃত।

দু' এক দিনের মধ্যেই শুন্‌লাম—গজেন্দ্রনারায়ণের মেয়ের সঙ্গে প্রমেশের বিয়ে।

আজ গোধুলি লগ্নে প্রমেশের বিয়ে; আমরা বরযাত্রী এসেছি। এমন সময় পিয়ন এসে একটা 'ইনসিওর' দিয়ে গেল। 'ইন্‌সিওর'টি প্রমেশের নামে আস্‌ছে। 'ইস্যু' হয়েছে বৌবাজার পোষ্ট-অফিসে।

প্রেরকের যে নাম বা যে ঠিকানা—পরে অনুসন্ধান ক'রে জান্‌লাম—সে নম্বরের বাড়ী—বোধ হয় সে নামের মানুষও কলিকাতায় নেই।—অন্ততঃ যে পাঠিয়েছে—তার পরিচিত।

'ইন্‌সিওর'টি খোলা হ'ল। দেখ্‌লাম—একটি চেন ও ঘড়ি—আর এক ছড়া হার। এক টুক্‌রা চিঠির কাগজে লেখা আছে—"জীবনের প্রিয় বন্ধু প্রমেশের পরিণয়ে উপহৃত হইল। ইতি জনৈক অজ্ঞাত অশক্ত বন্ধু।"

দেখ্‌লাম—ঘড়ির লকেটটিতে শিল্পীর কারুকার্য্যে যথেষ্ট। কিন্তু কাছে গেলেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম—সেই কৌশলের ভিতর ঢাকা—অথচ বেশ স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে—লকেটের গায়ে—"শ্রীযুক্ত প্রমেশচন্দ্র রায়ের করকমলে।"

এই দেখে মনে হ'ল—খুঁজে দেখি কোনও খানে প্রেরকের নামের গন্ধ আছে কিনা? কিন্তু চেনটিতে বা লকেটটির কোনও খানে প্রেরকের নামের চিহ্নও পেলাম না।

খানিক পরে হার ছড়াটি হাতে তুলে নিলাম। একটু' দেখ্‌তেই বেশ বোঝা গেল—হারের গায়ে সোণার তারাগুলি এমন ভাবে সাজান' আছে যে—একটু চেষ্টা কর্‌লেই তিনটি অক্ষর ধরে নেওয়া যেতে পারে। সে তিনটি অক্ষর—"পারুল।"

আমার চোখ দিয়ে অজ্ঞাতসারেই এক ফোঁটা অশ্রু এসে মাটীতে পড়্‌ল। ব্যথিতা পতিতার ব্যথায় আমি কেমন একটু মুসড়ে পড়্‌লাম। বিবাহের 'কমেডি' আমার কাছে 'ট্রাজিডি' ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। বিবাহ সভায় আর থাক্‌তে পার্‌লাম না। পথে নেমেই দেখি—পারুল রাস্তার পাশে উপরের জান্‌লাটিতে দাঁড়িয়ে গজেন্দ্র বাবুর বাড়ীর পানে চেয়ে আছে। মনে হ'ল—তুমি যেরূপ নিষ্কাম ভাবে দায়িত্বের আলিঙ্গনে প্রিয় স্পর্শের অভিলাষ কর—সে অতি মহৎ—অতি উদার।

*　　*　　*　　*

আমি সবে মাত্র শকুন্তলা খুলে পড়্‌তে ছিলাম—

"আবাধ্যন্তে ন খলু মদনৈঃ প্রাপ্তকালাঃ কুমর্য্যেঃ।"

আর পড়া হ'ল না। পারুলের মার কর্কশ স্বরে আমাকে উদ্বিগ্ন করিল। উঠে গিয়ে দেখি—নির্দ্দয় প্রহারে পারুলের মূর্চ্ছা হয়েছে। একবার ইচ্ছা হ'ল—যাই, ওর মধ্যে ছুটে গিয়ে পারুলের শুশ্রূষা করি। কিন্তু সেটা আমার অনধিকারচর্চ্চা ভেবে নিরস্ত হ'লাম।

সন্ধ্যায় একটা বড় কালো ঘোড়ার জুড়ি এসে পারুলদের দুয়ারে দাঁড়াল। একটি ছিপ্‌ছিপে বাবু নেমে ভিতরে গেলেন। বুঝ্‌তে পারলাম—তিনি পারুলের রক্ষক (না ভক্ষক?)

অভ্যাস মত ঘরের সেই জানালাটিতে দাঁড়ালাম। এ জন্য কত ছেলে কত রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত—তবে আমি তা' গ্রাহ্য কর্‌তাম না।

পারুলের মা পারুলকে সঙ্গে ক'রে ঘরে আন্‌ল। সে সময় তার মুখ দেখে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। সে মুখ এত ফ্যাকাসে—এত রক্তহীন; যেন মরার মত নিষ্প্রভ।

হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সেই ফিকে পাটলের মধেও রক্তের কণা ছুটে গেল। তার ঠোঁট দু'টিও একটি ক্ষীণ হাসির রেখায় রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তার কারণ বুঝ্‌বার জন্য আমি তার চোখ লক্ষ্য ক'রে তাকালাম। তখনই বুঝ্‌তে পার্‌লাম—তার হাসির কারণ। খোলা জান্‌লার পথে দেখা যাচ্ছে—প্রমেশ ও প্রমেশের স্ত্রী রসালাপে মগ্ন। হায় প্রেম! যথার্থই তোমার দেবতা অন্ধ! গুণ-সম্পর্ক-বিচার-বিহীন!

বোধহয় সেই হাসির ফলে বাবুর মন একটু প্রসন্ন হ'ল। তিনি গোটাকতক টাকা তার অঙ্গ লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলেন। টাকাগুলি ঝন্‌ঝনিয়ে মাটিতে পড়্‌ল। বাবুর ও টাকার দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। সে আগেরই মত সেইদিকে তাকিয়ে আছে। তার মা টাকাগুলো তুলে নিল।

বাবু একটু' নেশা-বিহ্বল ছিলেন। তাঁর পারুলের ব্যবহার লক্ষ্য কর্‌বার ক্ষমতা ছিল না। শুধু হাসি-টুকু লক্ষ্য করেই তিনি ফরমাস কর্‌লেন—"বিবিজান্—একটা গান।" পারুল গান গাইল—কিন্তু একটুও নড়্‌ল চড়্‌ল না।—

"রাধা ত' কলঙ্কিনী শ্যাম তব তরে
তুমি যে প্রেমের গুরু গোকুল ভিতরে।
হে নাথ প্রেমের পতি—
তব প্রেম উঁচু অতি—
পরশে অক্ষম তাহা গোপিনী-নিকরে।
নাগরী বেঁধেছে প্রেমে তোমার-নাগরে।"

গান তার চির-বিরহ-দগ্ধ-হৃদয়ের সেই করুণ উন্মাদনা!

এই সময় খাওয়ার ঘণ্টা পড়্‌ল—ফিরে এসে দেখি—পারুলের মূর্চ্ছিত দেহে জল সেক করতে করতে তার মা বক্‌ছে—"আঃ মলো! আর পারি নে'। মেয়েটার রূপ-গুণ ছিল, ভেবেছিলাম—আমার বরাত খুলবে। কিন্তু পাজী মেয়ে রীতের দোষে—খারাপ ব্যবহারে সব আশা নষ্ট করে দিল।"

*

কয়েক দিবস গেল। তার মা চিকিৎসা শুশ্রূষা করে তাকে সারিয়ে তুল্‌ল। সারলেও তখনও তার শরীরে বল হয় নি'। সে সেই জান্‌লাটির পাশে খাটের উপর শুয়ে গজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীর পানে চেয়ে থাক্‌ত। আর বোধহয় আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত—সে কেন ও-বাড়ীর মেয়ে হয়ে জন্ম গ্রহণ করে নি'।

প্রমেশ আমাদের মেস হতে চলে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আগেকারের আলাপটা নষ্ট হয়ে গেল। তাই এবার—নতুন করে তার সঙ্গে আলাপটা ঝালিয়ে নেওয়ার একটু সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম। কেন না—'ফোর্থ-ইয়ারে' উঠার সে আর যখন তখন সে ঘরটি বা বারান্দার উপর আস্‌ত না। শুধু দেখার আশায় হতেও পারুলকে হতাশ হয়েছিল।

আমার এক বৎসর নষ্ট হওয়ায় প্রমেশের সঙ্গে আলাপ গাঢ় করতে একটু সুবিধা হ'ল অর্থাৎ এখন আমরা দুই জনেই এক 'ইয়ারে' পড়ি।

অল্পদিনেই আলাপ জমানোর সফলতার আনন্দে মেতে উঠ্‌লাম। কারণ আজ ক'দিন ছলে কলে আমি তাকে বারান্দায় ধরে রাখ্‌তাম। অবশ্য সে জন্য আমাকে অনেক সময় তাদের বাড়ীতে থাক্‌তে হত। তাতেও মনে সান্ত্বনা ছিল—পারুলের হৃদয়ের তবুও একটু শান্তি আন্‌তে পেরেছি।

একদিন আমি প্রমেশকে বল্‌লাম—"জানো, কে তোমায় চেন ঘড়ি ও হার 'প্রেজেণ্ট' করেছে?"

সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কে ?"

আমি "ওই দেখ"—বলে জান্‌লার পাশে সেই একই ভাবে দাঁড়ানো পারুলকে দেখিয়ে দিলাম।

প্রমেশ বল্‌ল—"ও দেবে কেন ?"

আমি সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা কর্‌লাম এবং 'লকেট' ও হারের গায়ে খোদাই করা নামগুলিও দেখিয়ে দিলাম। দেখে ও শুনে প্রমেশ চটে উঠ্‌ল—সে আমাকে বলে বস্‌ল—"কিরণ, তোমার 'মিস্‌কোন্‌ডাক্‌টে'র বিষয় আমি জান্‌তাম ; কিন্তু তুমি যে এতদূর নষ্ট, তা' আমি জান্‌তাম না। যেহেতু তুমি আর একজনকেও ওই পথে নিয়ে যেতে চাও। চলে যাও—তুমি এখান থেকে। আর এখানে এসো না।"

তখনই সে দারোয়ান দিয়ে উপহারগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর্‌ল।

চরিত্রের উপর আঘাতে আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তখনই মনে হল—ব্যাপারটি যে ভাবে চল্‌ছে—তাতে বাড়াবাড়ি হলে আর একজনের বুকটা ভেঙ্গে চুরে মুসড়ে দিয়ে যাবে। আর রাগ করা হ'ল না। আপনাকে সাম্‌লে নিলাম। প্রমেশকে বুঝিয়ে বল্‌লাম—"ঘড়ি, ঘড়ির চেন ও হার আমার কাছে দেও, আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরৎ দিব।"

প্রমেশও গম্ভীর ভাবে ঘৃণার সঙ্গে দ্রব্য কয়টি আমাকে ফেরৎ দিল—এমন ভাবে দিল—যাতে বোঝাল—সে যেন পাপ-মুক্ত। হায় রে মানুষ, তুমি বুকের ব্যথা বোঝ না।

আমি বাসায় এসে দেখ্‌লাম—সেদিনের সেই কালো জুড়িটে আর সেই পাত্‌লা বাবুটি আজ আবার এসেছে।

কেমন একটা মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হ'ল।

সেই জানলায় গিয়ে দেখি—আজও সেইদিনের মত তার উপরে সমান ভাবে অত্যাচার—মারধর চল্‌ছে। রুগ্ন শরীর বলে কেও তাকে রেহাই দিচ্ছেনা।

আজ আর সহ্য করতে পারলাম না—একজন সহৃদয় পুলিশ অফিসারের সাথে তাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। পুলিশ দেখে বাড়ীর সকলে ভয়ে 'জড় সড়' হয়ে গেল।

আমি অন্য কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যখন তার কাছে গিয়ে পৌছলাম—তখন সে প্রায় খাবি খাচ্ছে।

খানিক পরে বোধ হল—প্রদীপ নিবে যাওয়ার আগে জলে উঠল—সে একবার তাকাল—কিন্তু তাও সেই প্রমেশের দরোজার পানে। অমনি মরণাহতের মুখ হাসিতে ভরে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি—প্রমেশ বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

ও-বেলার সকল অপমান ভুলে গেলাম। বলে উঠলাম—"পারুল, প্রমেশকে ডেকে আনব ?"

আমার মুখে তার নাম শুনে সে চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে আমার পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিয়ে বলল—"কোনও দরকার নেই কিরণ বাবু ?"

তার মুখে আমার নাম শুনে আমিও অবাক হ'য়ে গেলাম। ভাবলাম—হয় ত' মেসের ছেলেদের মুখে শুনেছে। তা' হ'লে পারুলও ত' আমার উপর লক্ষ্য রেখেছে।

সে টেনে টেনে বলতে লাগল—"কিরণ বাবু আমার আর বেশী সময় নেই। বেশী কথা আর বলতে পারব না। আপনার মহত্ব—আপনার উপকার আমি আর জীবনে ভুলতে পারব না। আমি জানি—আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। কিন্তু আমি অসহায়া প্রতিদানে কিছু দিতে পারলাম না। আমি পতিতা—আমার শিয়রে ব্রাহ্মণ'—প্রমেশকে লক্ষ্য ক'রে দেখাল—"ওই দেখুন—সম্মুখে গুরু নারায়ণ। নারায়ণ দূরে থাকেন—তা' তিনি তাইই থাকুন। বলুন দেখি—আমার আজ কি সুখের মৃত্যু ? যা' হোক্ আপনি 'পুলিশ কেশ' করবেন না। মৃত্যুর পর যেন আমার দেহ নিয়ে আর টানাটানি না হয়। জীবন্তে এ দেহের উপর অনেক অত্যাচার চলেছে। মরণের পর আবার কেন ? আর বলতে পারছিনে—দেবতা আমার—দেবতাই সে—পাপকে তার এত ভয় !"

কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো,—জীবনের শেষ।—শেষ কি সেইখানেই !

ফিরে এলাম—সেই অপবিত্র স্থান হ'তে সমাজের পবিত্রতার মধ্যে,—শান্তি এখানে কতটুকু,—হৃদয়ে আমার তখন কি ব্যথা—নয়নে অশ্রু,—পবিত্র না অপবিত্র? অভিজ্ঞতা বলছিল—সমলেও কমল ফুটে—হাসির দাম অর্থ নয়—প্রীতি—প্রেম! আর সঙ্গে রইল—চিরজীবনের মত স্মৃতির আগুন—সেই ঘড়ি—ঘড়ির চেন—আর হার ছড়াটি। তারা আজও আমার ভুলতে দিচ্ছে না—পারুলের স্মৃতি—আর তার "হাসির দাম।"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

প্রেম।

—:—

আকাশে জড়িত নিলীমা তোমার—
তটিনীতে তব তান
হে প্রেম নিখিল মাধুরি সিক্ত—
করিছ মানব প্রাণ
চাহিছ চিত্ত ফুটায়ে তুলিতে—
নব নব রসাভাসে—
নব তৃণাঙ্ক ধরণীর সম,
জাগো সদা উল্লাসে!
গৌরব তব গাহিছে মলয়—
কত মাধবীর সাঁঝে—
তটিনী হিয়ার কলরোলে তব
মৃদু জয়-গীতি বাজে

কত কৈশর ফুটায়ে তুলিছ
যৌবন টিকা দিয়া
নিখিল হিয়ার পরতে পরতে—
আছ তুমি জড়াইয়া।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদনা।

-:*:-

"মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

ছুটী নিয়ে বাড়ী গিয়েছিলুম, যখন ফিরে এলুম, দেখলুম গ্রামের ধান-খেত কাঁচা সবুজে রঙিন হয়ে উঠেছে; ছোট্ট কোপাই নদী বর্ষার জলধারা বহন ক'রে, কূলে কূলে ফেঁপে ফেঁপে, দুকুল ছাপিয়ে, পাড় ভেঙে দুলে দুলে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। বৃষ্টি হয়ে গেছে, গাছের পাতায়, ঘাসের শিষে বৃষ্টিকণার উপর বিকালের অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি পড়ে হীরার কণার মত চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে; গ্রামের পথের ধারে শিউলি গাছ, ফুলের কুঁড়িতে উপচে উঠেছে।

হাল্কা মন নিয়ে দুশ্চিন্তার বেদনা মাথায় বয়ে বাড়ী দিকে ছুটেছিলুম, যখন ফিরে এলুম তখন চিন্তা নেই, কিন্তু তা'র পরিশেষ, গভীর বিচ্ছেদ বেদনার কাঁটাটুকু বুকের কোণে বিঁধে রয়েছে। যখন নিজের গ্রাম্যস্থলের নিজের বাসা-বাড়ীর কুঁড়েখানার দাওয়ায় এসে পা দিলুম তখন পুবের পুর্ণিমার চাঁদ মুচকে হেসে যেন বল্লে "নেই বা রইল কেউ, তুই ত আছিস্" কিন্তু আমার মন ত তাতে সায় দিল না, চাঁদের আলো সেদিন যেন আমার চোখ দু'টোতে কাঁটা বিঁধতে লাগলো। চারিদিকের সান্ধ্য নিস্তব্ধতা যেন আমার বুকের উপর নিশীথ দৈত্যের মত চেপে বসতে চাইল। থেকে থেকে শূন্য হৃদয়ের গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকের ভিতরকার শূন্যতা যেন আরো বাড়িয়ে দিতে লাগল।

পূজার ছুটীর তখন অনেক দেরী, চাকুরীজীবি মানুষ যারা তাদের নিকট এই খবরটা এই সময়টা যে কত মধুর তা বাঙ্গালীমাত্রই সহজে অনুভব করতে পারেন। শরতের নীলাকাশ, সাদা মেঘ, শিউলীফুলের সঙ্গে, পূজার ছুটীর কি অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা; তাই বসে বসে স্কুলের মাষ্টারী করছি আর ছোট ছেলের মত ছাড়া পাবার জন্য ছুটীর দিন গুনছি। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ীর দাওয়ায় বসে বসে ভাবছি যে আমার ত বিদ্যার দৌড় ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত;—তা'র উপর এই বিপুল সংসারের ভার, এতদিন মা ছিলেন তিনি আমার অজ্ঞাতে এক রকম করে সংসারটাকে কোন রকমে চালিয়ে এসেছিলেন, এখন এই আনাড়ী মাঝির হাতে পড়ে, নৌকা ডোবে কি পারে গিয়ে ঠেকে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নিজের সামর্থ্যের দিকে তাকালে মন নিরাশায় ক্ষোভে ভোরে ওঠে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট গোধূলি-আলোকে থেকে থেকে যেন মায়ের মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল।

(আ)

সে দিন ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গতেই বিছানায় উঠে বসলুম, জানালা দিয়ে ভোরের ক্ষীনালোক ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে। নিশাশেষের মৃদু বাতাসে সদ্য প্রস্ফুটিত শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসতে ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মাঝে মাঝে দু'একটী পাখী প্রভাত-আগমনী ঘোষণা করছে। উষাদেবী গোলাপী রঙের সাড়ীর আঁচল উড়িয়ে, আলোর রথে চড়ে, ধীরে ধীরে বাঁশ বনের ওপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছেন। আজ দুর্গাষষ্ঠী,—ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসী-

দিগের মনে এক নব আনন্দের সঞ্চার করে জমিদার বাড়ী ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌ল। আজ-কার তপন যেন কি এক পবিত্র উজ্জ্বল--আনন্দময় আলো নিয়ে পূর্ব্বতোরণ দিয়ে "মা"কে বরণ করবার জন্য ধীরে ধীরে জগতের পরে নেমে এল, সুনীল আকাশ বুকভরা আলোর আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ হয়ে, স্থির নেত্রে জগতের পানে তাকিয়ে রয়েছে। সাদা সাদা কাটা কাটা টুকরো মেঘগুলো প্রভাত-বায়ে সারা আকাশময় অকেজো ভবঘুরের মত হাল্কা দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; সত্যি সত্যি আজকার প্রভাতের মধ্যে যেন কি এক মাধুরিমা আপনাপনি লতায়, পাতায়, আকাশের আলোর, পাখীর গানে আর শিউলি বনের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। মায়ের আবাহন-গীতি যেন আজ প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণরূপে ধ্বনিত; কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলুম "কই মাতৃ-সিংহাসন ত অপূর্ণই রয়েছে। সারা জগতের সুরে ত আমার সুর মিলছে না, সে যে আলোয় ভরা আকাশে বিশাদের সুর বিলিয়ে দিয়ে হাহাকার ধ্বনি তুলছে।" ভারি মনকে আজকার প্রভাতের স্পর্শে একটু হাল্কা করবার আশায় খাঁচা ছেড়ে বাহিরে বেরিয়ে এলুম; শিশির সিক্ত রং বে রঙের ঘাসের ফুলেভরা প্রান্তরটী শরতের উজ্জ্বল তপনালোকে ছাপিয়ে উঠেছে। সকালের সুগন্ধি হাওয়ায় চারিদিক আকুল—ঘুরতে ঘুরতে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়লুম—গ্রামের, ধানের খেতের পাশ দিয়ে, পায়ে-হাঁটা রাস্তা বেয়ে, তাল-বনের মাঝ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি, মুখ তুলে যখন তাকালুম, তখন দেখি যে আমি একেবারে একটা কৃষীদের গ্রামের কিনারায় এসে পৌঁছেছি—চারিদিকে রোদ একেবারে চম চমিয়ে উঠেছে। গাছতলায় এক, একটু বিশ্রামের জন্য বসলুম—বসে বসে তাদের নিরীহ বাধাহীন, মধুর গ্রাম্য-জীবন-যাত্রার চলন্ত-ছবির দ্রুত পরিবর্ত্তন আমার চোখের সামনে দেখতে লাগ্‌লুম—অমনি আমার গ্রামটী আমার গ্রামের প্রান্তে পুকুর-পাড়ের বাঁশবনে ঘেরা, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহে-ভরা, নানা সুখদুঃখ-বিজড়িত বাড়ীখানি, তার পাশে নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরী স্বহস্ত রচিত বেগুন আর লঙ্কাক্ষেত উঠানের ধারে লাউগাছে ঢাকা ছোট্ট গোলাটী বাড়ীর পিছনে বেড়ার ধারে দু' চারিটি কলাগাছ সব যেন একটার পর একটা মনের পটে ফুটে উঠ্‌তে লাগল, আর তার সঙ্গে মায়ের স্মৃতি বুক ভরে গম্ভীর বেদনার সঞ্চার করে তুল্লে। বেলা বাড়্‌তে লাগল, রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে

এলুম. যেখানেই যাই সেই কি এক গভীর শূন্যতা বুকের ফাঁককে যেন ভরে থাকে ; সে শূন্যতা ত পূর্ণ হলনা।

(২)

ছোট্ট গ্রামখানি আজ তিন দিন পূজা'র আনন্দে অধীর, গ্রামবাসী হইতে আরম্ভ ক'রে তা'র প্রত্যেক লতাপাতা, পশুপাখী পর্য্যন্ত আজ বিশ্বের এই বিপুল আনন্দে আত্মহারা—আজ নবমী পূজা—পূজার শেষ দিন—জমিদার-বাড়ী লোকে লোকারণ্য, কারণ সমস্ত গ্রামখানিতে এই একখানি মাত্র পূজা। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই মায়ের মুখ দেখ্‌বার জন্য, মাতৃপ্রসাদ লাভের আশায় এই জমিদার বাড়ীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমি পুজা বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়া অন্য মনে চলেছি—পথের ধারে কুকুরগুলি, এদের ভিতরের ক্ষুধা মিটাবার কোনও আহার্য্য—এদের সাম্‌নে ধরে দেয় এমন কেউ নেই! তাই মায়ের জন্য মনটা যেন জোড়ে নাড়া দিয়ে উঠ্‌লো।

বেলা পড়ে আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই যথাসাধ্য নববস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে দলে দলে জমিদার বাড়ীর দিকে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখ্‌তে চলেছে। রাস্তায় লোক ভেঙ্গে পড়েছে; আমি কোনও রকমে এ ধার ও ধার দিয়ে ভিঁড় ঠেলে ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়লুম, যখন খানিক পথ এসেছি এমন সময় কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে আমায় ডাকল "বাবু একটা পয়সা দে—না সারাদিন কিছু খেতে পাই নি" ফিরে তাকিয়ে যা দেখলুম তা হৃদয়বিদারক, মাতৃক্রোড়ের শিশুটি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ক্ষীণ-প্রাণ, কঙ্কালসার, মূর্ত্তিমান দৈন্য রূপে দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম "কেন আজ কোথায়ও তোর এক মুঠো জুটলো না?" সে বল্লে "কে আমাকে দেবে আমার যে মা নেই।"

কথাটা আমার বুকের ভিতর দ্বিগুণ করুণ সুরে বাজল; হৃদয়-বীণায় দুঃখের রাগিণীর ঝাঁর ঝঙ্কার তুল্লো—মুহূর্ত্তের মধ্য সকল অতীতকে টেনে নিয়ে এসে কে যেন বলে গেল "জগতের মা কোথায়, কে তাঁর ধূলিলুণ্ঠিত, শোকাতুর, দৈন্য পীড়িত সন্তানকে রাক্ষসীরূপ মারীর হাত থেকে উদ্ধার করবে?" আমি আর না দাঁড়িয়ে তা'র হাতে একটী "আনি" দিয়ে দ্রুতপদে

পথে বেরিয়ে পড়লুম—মনে হল মাকে হারিয়েছি আমি একা নয়, জগতের অনেকখানি সেই মাতৃরূপ থেকে বঞ্চিত ; তাই এই মা-হারাদের ক্রন্দন শরতের নির্ম্মল আকাশে, তপনালোকে, সবুজ রঙে রঙিণ প্রান্তরের মধ্যে হা হা ধ্বনি তুলছে, থেকে থেকে এই শারদ প্রাতের আপন হিয়ার কোন্ একটু দীনতা ফুটে উঠ্ছে।

শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার।

মহা-প্রয়াণ।

—:*:—

শাওন রাতে আঁধার পথে যাত্রী কে ওই যায় ?
কত দূরের পথে যাবে ? যাবে সে কোন নায় ?
গঙ্গাতীরে শুধায় সবে পথের পথিক যত
তেজে-ভরা মূর্ত্তি হেরে শ্রদ্ধা অবনত।
ধীরে ধীরে এল নেমে দীপ্ত কে ওই নারী
কুহেলিজাল সরিয়ে দিয়ে সোনার রথে চড়ি।
করুণ মধুর একটু হেসে বল্লে' ওরে শোন
চিনিস্ না কো এরে তোরা ? জানিস্ না এর মন ?
বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়, কুসুমকোমল প্রাণ,
ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ম্মপ্রিয়,—নাইক অভিমান।
প্রেম ছিল তার দগ্ধ ধরায় বারি-ধারার মত,
তেজ ছিল তার সূর্য্যসম হয় নি অবনত।
স্বচ্ছ স্নেহ-মন্দাকিনী উছলে পড়ে দিকে,
সত্যপথে গেছে সদাই যায় নি কভু বেঁকে।

স্বাধীন ছিল মনের মত,—সিন্ধু সম স্নেহ,
পবিত্রতা মনে প্রাণে—পবিত্র তার দেহ।
চায় নি কারো অনুগ্রহ তোষামোদে ধিক্,
সরলপথে কর্ত্তব্য সে কর্‌তেছিল ঠিক ;
মস্তবড় মানী যে জন অহঙ্কারের লেশ
ছিলনাক দেহে তাহার নাইক ভূষা বেশ।
দেয় নি কভু দুঃখ কারে, সদা হাস্যময়
পরের সুখে সুখী সেজন, দুঃখী কভু নয়।
সার্থক তার নামটা ছিল, জগত-বল্লভ,
"মানুষ" ছিল, এজগতে মানুষি দুর্ল্লভ।
বিশ্বাস সে করেছিল, বিশ্বাসী যে জন,
কোচরাজ্যে ছিল সে যে অমূল্য একধন।
কাঁদরে তোরা কোচবিহারী কাঁদরে তোরা আজ,
মন্ত্রী তোদের চলে গেল পড়ল হঠাৎ বাজ।
বাংলা দেশের পথিক ওরে চিন্‌বি কেমন ক'রে
বাংলা দেশের রত্ন হয়ে ছিল পরের ঘরে।
চিনলিনাত বুঝলিনাত আজকে কে ওই যায়,
যাবে নাক হাঁটা পথে,—যাবে নাক নায়
ক্লান্ত হেরে সন্তানেরে পাঠিয়ে দেছে রথ।
শ্রান্ত ছেলে কোলে নিতে মায়ের মনো-রথ।

শ্রীমতী সুধাদেবী।

অনন্তলাল ।

-:-

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

পরদিবস প্রাতঃকালে, নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র অনন্তলালের মনোমধ্যে বাড়ীর কথা, মহিলাদিগের তাগাদা ও নিজ অভাবের কথা উদিত হইতে লাগিল। তিনি রতনপুর হইতে হঠাৎ এতদূর আসিয়াছেন, ফিরিতেও দুই চারিদিন বিলম্ব হইবে। এ সংবাদে মহাজনেরা কি ভাবিবে? যাহারা নূতন তাগাদা করিতেছে, তাঁহার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিবে এবং কেহ কেহ হয় ত নালিশ করিবে। একবার একজন নালিশ করিলে আর রক্ষা নাই, তখন তাঁহার সকল মহাজনই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

নিদ্রাভঙ্গের পর অনন্তলাল' এইরূপে চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন এমন সময়ে স্বামীজী প্রভৃতি গৃহস্থিত ব্যক্তিরা প্রবুদ্ধ হইতে এবং ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

কথায় বলে, হৃদিজলধি আন্দোলিত হইতে থাকিলে ভগবান-চন্দ্রকে তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনন্তলালের মনেরও তদ্রূপ ব্যবস্থা। তবে, স্বামীজী প্রভৃতি পাছে কিছু বিসাদৃশ মনে করিবেন এই ভাবিয়া তিনিও তাঁহাদিগের ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিলেন।

সাংসারিক চিন্তায় মুহ্যমান ব্যক্তি পরমার্থিক কার্য্যে বা চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে পারে না। সে সময়টুকু বৃথা নষ্ট হইতেছে বলিয়া তাহার মনে হয়। অদ্য প্রাতঃকালে অনন্তলালের যেন তাহাই মনে হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, অদ্যই রতনপুরে ফিরিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু যে জন্য এখানে আসিয়াছেন, অর্থাৎ মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া যাইলে স্বামীজী কি মনে ভাবিবেন? সাধক বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি আছে ইহাতে তাহাও নষ্ট হইতে পারে। যাহাই হউক, যাহাতে যত শীঘ্র এ কার্য্য সমাধা হয় তাহার জন্য তিনি স্বামীজীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিবেন স্থির করিলেন, এবং প্রাতঃকালীন প্রণাম বন্দনাদির পর, নিজ আসনে উপবেশন করিয়া, মৃদুস্বরে তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, রতনপুরে অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছেন, অনতিবিলম্বে ফিরিতে না পারিলে, সে সকল নষ্ট হইতে পারে।

অতএব এখানকার কার্য্য শীঘ্র সমাধা করা বিশেষ আবশ্যক। স্বামীজী আশা দিলেন, অদ্যই বাবাজীকে বলিয়া, যত শীঘ্র পারেন তাহা শেষ করিয়া দিবেন।

প্রাতঃকৃত্যাদির পর বাবাজী নিজ আসনে যাইয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী বলিলেন, "বাবা অনন্তলালকে কবে কৃপা করবেন?"

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কোন তিথি?"

স্বামীজী বলিলেন, "আজ একাদশী। আর তিথি নক্ষত্র দেখতে গেলে অনেক বিলম্ব হতে পারে। এঁরা বিষয়ী লোক, বিলম্বে এঁদের কাজের অনেক ক্ষতি হবে।"

বাবাজী অল্প চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পরশু ত্রয়োদশী। পরশু এঁর দীক্ষা হবে।"

অনন্তলাল ভাবিলেন, মাঝে একদিন মাত্র অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।

হরিশ ব্যাগ হইতে পেন্‌সিল ও কাগজ বাহির করিয়া; মন্ত্র গ্রহণ করিতে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার এক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিল, এবং পরদিবস অনন্তলালের ভৃত্যের সহিত চন্দ্রহাট যাইয়া, ঐ সকল সংগ্রহ করিয়া আনিল। ত্রয়োদশীর দিন প্রাতে সমস্ত উদ্যোগ শেষ করিয়া বাবাজী অনন্তলালকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন; অনন্তলাল স্নাত ও শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিত হইয়া, স্বামীজী ও বাবাজীর সহিত একটি নির্জ্জন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে মন্ত্র গ্রহণের জন্য দ্রব্যাদির সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলে, বাবাজী একটি ত্রিপত্র আনাইয়া তদুপরি অনন্তলালকে তাঁহার ইষ্ট-মন্ত্র লাল কালি দ্বারা লিখিতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তলাল ত্রিপত্রের প্রত্যেক পত্রে এক একবার নিজ ইষ্ট মন্ত্র লিখিলেন। শেষে বহুদিন জপ করা সেই মন্ত্র সহ ত্রিপত্র ব্যাগের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবাজীর আজ্ঞা হইল যে, রতনপুর যাইয়া, অনন্তলাল উহা গঙ্গা জলে বিসর্জ্জন করিবেন। নিজ ইষ্টমন্ত্র ব্যাগের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অনন্তলাল যেন একটা প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক অনেকটা শান্ত হইলেন। পরে, অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ হইলে, বাবাজী রামাইৎ বৈষ্ণবদিগের প্রথামত তাঁহার কপালে সিন্দুরের এক উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়া, কর্ণে বিষ্ণু মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্র গ্রহণের পর অনন্তলাল মুদ্রাপূর্ণ একটি তোড়া লইয়া বাবাজীর পাদদেশে রক্ষাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। নিকটে স্বামীজী বসিয়াছিলেন; ইত্যবসরে বাবাজীর সহিত তাঁহার দৃষ্টির বিনিময় হইল। তখন যদি অন্য কেহ গৃহ মধ্যে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে সে তাঁহাদিগের উভয়ের ওষ্ঠোপরি মৃদু হাস্যের রেখা ও চক্ষে আনন্দের উৎস দেখিতে পাইত।

সমস্ত কার্য্য সমাধা হইলে তিন জনে বাহিরে যাইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

তুলসী দাস এতাবৎকাল হরিশের সহিত বাহিরে বসিয়াছিল। সে এক্ষণে অনন্তলালকে বলিল, "বাবুজি, এত্তো দিনে আপকা শরীর পবিত্র হুয়া, এত্‌না উমেরতক আপ্‌ গুরুমন্ত্র নেহি লিয়া কাহে ?"

হরিশ সাহা বলিল, "বাবু মন্ত্র অনেক দিন হ'লো নিয়েচেন। এত দিন কি মন্ত্র না নিয়ে ছিলেন ?"

তুলসীদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফিন্‌ এ কেয়া হ্যায় ? এক স্বামী ছোড়্‌কে দোস্‌রা স্বামী ?"

হরিশ বলিল, "এর ভেতর কথা আছে—ইনিই বাবুর পূর্ব্বজন্মের গুরু।"

তুলসীদাস বলিল, "আরে ভাই পূর্ব্বজনম্‌কা স্বামী বাত্‌লানেসে কোই স্বাধ্বী স্ত্রী ইহ জনম্‌কা স্বামী ছোড়্‌তা হ্যায় ?"

হরিশ সাহা বলিল, "সে কথায় আর এ কথায় অনেক তফাৎ।"

তুলসী দাস কিঞ্চিৎ উষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল, "তফাৎ এহি হ্যায় যে, বহুৎ জেনেনা এক স্বামী ছোড়্‌কে দোসরা স্বামী লেতি হ্যায় ; মগর্‌ যো সাধু হ্যায়, ও উস্কো গুরুমহারজ্‌কো কভি নেহি ছোড়েগা।"

ইহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া স্বামীজী একবার বাবাজীর মুখের দিকে চাহিলেন। তখন বাবাজী তুলসী দাসকে বলিলেন, "আরে তুলসী দাস !"

"মহারাজ ?"

"আরে তোম উনকা সাৎ কাহে বক্‌ বক্‌ কর্‌তা হ্যায় ? কোই কাম হ্যায়তো করো যাকে।"

"যো হুকুম মহারাজ"—বলিয়া তুলসী দাস তথা হইতে উঠিয়া গেল।

অনন্তলাল ভাবিতেছিলেন, কার্য্য শেষ হইয়াছে অতএব অদ্যই রতনপুর যাইতে হইবে। তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "তা হ'লে আজই আমরা ফির্‌বো।

বাবাজী বলিলেন, "আজ নয়, পরশু যাবে। আজ গেলে কেমন ক'রে হবে ? জপ, পূজা ইত্যাদি জেনে নিতে হবে ত ?"

বাবাজী এক্ষণে অনন্তলালের গুরু। গুরুর এই প্রথম আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিতে স্বামীজী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। অগত্যা পর দিবসও থাকিতে হইল। সেই দিন প্রাতে বাবাজী অনন্তলালকে রামাইৎ বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্রানুসারে পূজার ও জপের নিয়ম বলিয়া দিতেছেন, এবং স্বামীজী সুন্দরলালের সহিত ঘরের ভিতর বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান যাইয়া অনন্তলালকে অভিবাদন পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

তিনি তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বিস্ফারিত লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে রামসিং! তুমি যে এলে? বাড়ীর খবর কি?"

রামসিং বলিল, "বাবুজি, খোকাবাবুর বড় অসুখ; হামি আপনাকো লিতে এলাম।"

এই বলিয়া, সে একখান পত্র অনন্তলালের হস্তে দিল। পত্র সরলা লিখিতেছে। অনন্তলাল বাবাজীর দিকে পশ্চাৎ ও রামসিংয়ের দিকে সম্মুখ করিয়া গভীর একাগ্রতার সহিত উহা পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র শেষ হইলে বাবাজীকে বলিলেন, "বাবা, আর আমার থাক্‌বার যো নেই,—দৌহিত্রের বড় অসুখ—বসন্ত হয়েচে। হরিশ, সব গুচিয়ে নাও, এখুনি উঠ্‌তে হবে।"

স্বামীজী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

পরে সমগ্র বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "ট্রেন্ কখন্ পাওয়া যাবে?"

অনন্তলাল ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "এখনও তিন ঘণ্টা বিলম্ব আচে। আমাদের এখুনি বেরুতে হবে।"

জপ, পূজা, পদ্ধতি ইত্যাদিতে আর তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না। দৌহিত্রের জন্য মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তথা হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি বাবাজীকে বলিলেন "বাবা, বাড়ীতে আমার নানা রকম বিপদ যাচ্চে। জামাইটির অসুখ, নিজেরও বিষয় কার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা। আবার দৌহিত্রের এই ব্যারাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় সে আরাম হয়ে উঠুক্; তারপর, আমার ইচ্ছা আচে, একটি দৈব কার্য্য করবার। সে সময়ে আপনি দয়া করে একবার রতনপুরে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলে ভাল হয়।"

বাবাজী বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌চি, তোমার সব বিষয়ে মঙ্গল হবে। আর, দৈবকার্য্য যদি কর, তা হ'লে সে জন্য আমাকে যেতে হবে না; আমার সুন্দরলাল ও-সকল কাজে বড় ভাল, তুমি লোক পাঠালেই সুন্দরলালকে পাঠিয়ে দেব।"

অনন্তলাল বলিলেন, "যে আজ্ঞা, তা হ'লে তাই পাঠিয়ে দেবেন।" পরে সুন্দরলালকে বলিলেন,—"লোক পাঠালে যেন দয়া ক'রে যাবেন।"

এই বলিয়া অনন্তলাল বাবাজীকে ও সুন্দরলালকে প্রণাম করিয়া, সদলে আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। নবমন্ত্রে তাঁহার হৃদয় তন্ত্রী যেন বাজিতে ছিল না—মন তাঁর তখন বড় চঞ্চল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩৩২ সাল।	৭ম সংখ্যা।
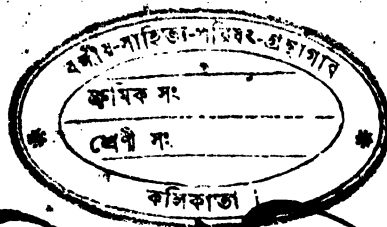
বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ।

—:(*):—

তৃতীয় প্রস্তাব।

প্রথম অংশ—কান্যকুব্জের কথা।

রাজনৈতিক সংবাদ।

প্রাচ্য অথবা গৌর দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সাধারণ ভাবে গত প্রস্তাবে বলিয়াছি। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতেই যে আমরা ঐ ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারও যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিয়াছি। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে রচিত কৌটিল্য চানক্যের অর্থশাস্ত্র হইতেও প্রাচ্যজাতির প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। ভারতের অনুরাগী এবং ভক্ত পাঠকপাঠিকা এই অমূল্য গ্রন্থখানির সম্যক পরিচয় গ্রহণ

করিয়াছেন এবং করিতেছেন ;—যাঁহারা এখনও উহার সহিত পরিচিত হন নাই'—তাঁহারাও অনতিবিলম্বে উহা পাঠ করিয়া উপকার এবং আনন্দ লাভ করিবেন, এ আশা আমরা করিতেছি।

প্রাচীন মহাভারতের মহাবিস্ময়কর সভ্যতার স্রষ্টৃগণকে আমাদের শাস্ত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—অর্থাৎ "আর্য"—এই আখ্যায় পরিচিত করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কালে এই গৌড়-মণ্ডলে যাঁহারা সেই আর্যসভ্যতার প্রচার এবং প্রসার করিয়াছিলেন,—সেই ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের পরামর্শদাতৃগণের অগ্রণী যে ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। "ব্রাহ্মণহীন আর্যসভ্যতা"র কোন অর্থই নাই। রামায়ণ মহাভারত এবং মহাপুরাণাদিতে অঙ্গবঙ্গাদি প্রাচ্য-দেশীয় যে সকল নরপতির সংবাদ পাওয়া যায়, বেদবেদাঙ্গবেত্তা, জ্ঞান ও ধর্মের মূর্তিস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ যে তাঁহাদের গুরু, পুরোহিত এবং উপদেষ্টা ছিলেন, তাহাও নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এ সময় পর্যন্ত যে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম-বিষয়ক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে স্থান বিশেষে, কোন কোন বিষয়ে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিলেও সাধারণভাবে এরূপ কোন আপদ উপস্থিত হয় নাই যাহাতে আর্যসভ্যতা-শাসিত এবং রাজন্যবর্গের সুরক্ষিত সেই প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ-সমাজের ধ্বংস অথবা ব্রাহ্মণের জাতিনাশের অনুমান করা যাইতে পারে। অন্ততঃ সেরূপ ভয়ানক বিপ্লবের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইতিহাসের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে বৈদিক সনাতনধর্মের ক্রমশঃ পরিবর্তন হেতু প্রাচ্যভারতে জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং সিন্ধুনদের পশ্চিমপার হইতে নবাগত মুসলমানধর্মের ক্রমশঃ বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল। সেই সকল ধর্ম প্রচারের প্রভাব বশতঃ প্রাচীন আর্যাবর্তের অন্যান্য অংশে যেরূপ অনিবার্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল গৌড় বঙ্গে তদপেক্ষা অধিকতর কোনরূপ বিকট বিপ্লব বা বিপর্যয় সাধিত নাই। স্মরণাতীত কাল হইতেই এদেশে পুরুষ পরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণগণ বসতি করিতেছেন ; তবে এই লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন কোন বংশ অথবা পরিবার সময়ে সময়ে আর্যাবর্ত অথবা দক্ষিণা-পথের স্থান বিশেষ হইতে আসিয়া এদেশের অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালেই শাকদ্বীপীয় মগব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিয়াছিলেন ;—অধুনা তাঁহাদের বংশধরগণ

গ্রহবৈগুণ্যে গ্রহাচার্য (আচাজ্জি বামুন) বা লগ্নাচার্যরূপে বঙ্গীয় সমাজে বাস করিতেছেন। মুসলমান (পাঠান এবং মুঘল) অভ্যুদয়-কালে যে সকল কনৌজীয়া, মৈথিলী এবং জিঝোতীয়া (১) প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণের সহিত পৃথকই রহিয়াছেন। আমাদের প্রস্তাবে সেই সকল অল্প সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কথার আলোচনা হইতেছে না। শ্রীহট্টের সামাজিক ব্রাহ্মণ এবং কামরূপ ও কোচবিহার প্রভৃতি স্থানের "কামরূপী" এবং অন্যান্য নামে পরিচিত অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণগণের কথাও আমাদের উদ্দেশ্যের বাহির।

বর্তমান বাঙ্গালাদেশে সমাজের শীর্ষালঙ্কার সদৃশ ব্রাহ্মণবর্গের প্রায় সকলেই রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক (পাশ্চাত্ত্য এবং দাক্ষিণাত্য) এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে রাঢ়ীয়গণের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক, বারেন্দ্রগণের সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূনে এবং বৈদিকগণের সংখ্যা আরও কম ;—দাক্ষিণত্য-গণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেও হয়। দাক্ষিণাত্যেরা আপনাদিগকে ওড়িশা-প্রদেশ হইতে এবং প্রথম তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের বংশধর বলেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের আগমনের কাল এবং কারণ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট কিংবদন্তীর কথা আমরা অবগত নহি। পাশ্চাত্ত্য বৈদিকেরা বলেন যে বাঙ্গালার রাজা শ্যামলবর্মা এদেশে বৈদিকযাগযজ্ঞপারগ ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব নিবন্ধন, তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষ কয়েকজনকে কনৌজ হইতে এদেশে আনাইয়াছিলেন এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বলেন যে তুল্যরূপ কারণেই বঙ্গদেশের বিখ্যাত রাজা আদিশূর তাঁহাদের পাঁচ গোত্রের পাঁচজন মূল-পুরুষকে কনৌজ হইতে আনাইয়া এদেশে সাদরে বসতি করাইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রগণের মধ্যে ঐ মূলপুরুষ পাঁচজনের নাম সম্বন্ধে মত ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই কনৌজাগত ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বর্তমান বাঙ্গালার অলঙ্কার স্বরূপ এই পঞ্চ গোত্রের

---

(১) মুরশিদাবাদ জেলার জেমো গ্রামের জমীদারগণ (৺রা[illegible] জাতি ও স্বগ্রাম নিবাসী) এই জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের আদি নিবাস জেজাকভুক্তি বা বুন্দেল খণ্ড ছিল।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এবং দ্বাদশ গোত্রের পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করিলে দেশে "ব্রাহ্মণ" পরিচয়ে পরিচিত যাঁহারা থাকেন,—তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা এবং সামাজিক সম্মানের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। এক কথায়, কান্যকুব্জাগত বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালাদেশকে ব্রাহ্মণহীন বলিতে হয়। দেশের প্রকৃত সামাজিক তত্ত্ব ও কি তাই?

বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণাগমনের কিংবদন্তী প্রায় সকলেরই সুপরিচিত। সংক্ষেপে সেই কিংবদন্তী এই—বাঙ্গলা দেশে আদিশূর নামক একজন বড় রাজা ছিলেন;—রাজা অপুত্রক। মন্ত্রিগণ বলিলেন, বৈদিক পুত্রেষ্টিযাগ করাইলেই বংশরক্ষা হইবে। দেশের ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যজ্ঞের ধার ধারিতেন না, রাজা শুনিতে পাইলেন, কন্নৌজরাজ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছে। তিনি অনেক যত্ন চেষ্টা করিয়া কন্নৌজ হইতে পাঁচ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইলেন। তাঁহারা যজ্ঞ করিলেন এবং সেই যজ্ঞের প্রভাবে রাজা পুত্রলাভ করিলেন। রাজার অনুরোধ ব্রাহ্মণেরা গৌড় দেশেই রহিয়া গেলেন। বর্ত্তমান যাবতীয় রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা সেই পাঁচ জনেরই বংশধর। *

এই ব্রাহ্মণগণের বংশধরেরা ও বাংলার জল বায়ুর গুণে কয়েক পুরুষের মধ্যেই বৈদিক যাগযজ্ঞ ভুলিয়া গেলেন। এই সময়ে বাঙ্গলায় শ্যামল বর্ম্মার রাজত্ব। একদিন রাজার গৃহচূড়ে এক গৃধ্র আসিয়া বসায় রাজ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ঘরে শকুনি বসিলে ত আর রক্ষা নাই! তবে উপায় কি? মন্ত্রীরা বলিলেন, বৈদিক শ্যেনযজ্ঞ বা গৃধ্র যজ্ঞ করিলে তবে অশান্তি কাটিবে। বাঙ্গলায় ত সেরূপ ব্রাহ্মণ নাই;—আবার কন্নৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনান হইল। তাঁহারা যজ্ঞ করিলেন, রাজার ফাঁড়া কাটিল। রাজা সমাদরে ব্রাহ্মণগণকে রাজ্যে বাস করাইলেন—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শ্রেণীর বৈদিক বিপ্রেরা সেই ব্রাহ্মণগণের উত্তর পুরুষ।

আদিশূর শ্যামল বর্ম্মার পূর্ব্বগামী তাহা নিশ্চয়; সুতরাং রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মূল পুরুষগণ বৈদিকগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। শ্যামল বর্ম্মার বংশীয় ভোজ বর্ম্মার এবং ঐ বংশের হরি বর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ঐতিহাসিকগণ শ্যামল বর্ম্মাকে খৃষ্টীয় একাদশশতাব্দে রাজা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আদিশূর রাজার সমসাময়িক কিম্বা তাঁহার বংশের কোন রাজার কোন তাম্রশাসনাদি দলীল পাওয়া যায় নাই,—সুতরাং তাঁহার সময়ও ঠিক করিবার উপায় নাই। নানাবিধ কুলশাস্ত্রের

অষ্টম শতাব্দের শেষ
নানাবিধ মত আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের মাঝামাঝি হইতে খৃষ্টীয় এক
পাদ পর্যন্ত আদিশূরের সময় আন্দাজ করা হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহাকে আনুমানিক ৭০৩ খৃষ্টাব্দের রাজা বলিয়াছেন।

নদীয়ারাজ-বংশের ইতিহাস "ক্ষিতীশবংশাবলী"র মতে ৯৯৯ শকাব্দে (১০৭৭) খৃষ্টাব্দে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের কাল; আর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মত ৬৫০ খৃষ্টাব্দ। খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দের কাছাকাছি বখ্‌তিয়ার খালজীর পুত্র মহম্মদ নোদিয়াহ (নবদ্বীপ?) দখল করিয়াছিলেন। যদি খৃষ্টীয় ৬৫০ অব্দ ব্রাহ্মণাগমনের কাল ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এদেশে মুসলমান অধিকার প্রারম্ভ হওয়ায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে তাঁহারা আসিয়াছিলেন স্বীকার করিতে হয় আর তাঁহাদের আগমনের কাল খৃষ্টীয় ১০৭৭ অব্দ ধরিলে তাঁহারা মুসলমান অধিকারের ১২৩ বৎসর মাত্র পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন ধরিয়া লইতে হয়।

এখনও গৌড়বঙ্গের সর্বত্র বৈদিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের যেরূপ প্রবল প্রভাব রহিয়াছে তাহা সকলে লক্ষ্য করিতেছেন। মুসলমান অধিকার এ দেশে বদ্ধমূল হইবার পরে ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ ধন, প্রাণ এবং ধর্ম লইয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের দ্বারা আর্য্যসভ্যতার সঙ্কোচ ব্যতীত কথনই বিস্তৃতি সাধিত হয় নাই। পাঁচটী ব্রাহ্মণ কন্নৌজ হইতে এ দেশে আসিয়া বসবাস করিবার কয়েক শত বৎসরের মধ্যে কিরূপ বংশ-বিস্তার করিতে এবং তাহার সহিত কান্যকুব্জানীত সভ্যতা এবং সদাচারের প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। পাঁচটী কেন, পাঁচহাজার নবাগত (ব্রাহ্মণ নহে) ব্রাহ্মণ পরিবারের সহায়তাও, কয়েক শত বৎসরের মধ্যে, গৌড়মণ্ডলে এরূপ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধহয় না।

যাহাই হউক, যদি কুলশাস্ত্রের এই সকল কিংবদন্তীর উপর একান্ত নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত সভ্যতার মূলে কন্নৌজীয় ব্রাহ্মণগণের কৃতিত্বের অংশ অতিশয় অল্প। পাঁচজন ব্রাহ্মণ (সস্ত্রীক?) এ বিশাল দেশে বাস করিবার কিছুকাল পরে তাঁহাদের বংশধরেরা দেশভেদে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই

উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা উভয় প্রদেশের একশত বারটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিতে থাকেন (২) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের রাজা বল্লালসেন এই রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যে কোনও কারণেই হউক বল্লালী কৌলীন্য স্বীকার করেন নাই। কৌলীন্য প্রথার মূল যে কি এবং কোন সময়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রকৃত প্রস্তাবে উহা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার আসল কোন অনুসন্ধান এ পর্যন্ত হয় নাই। কৌলীন্য প্রথার প্রকৃত রহস্য যাহাই হউক, তাহার বিচার করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

আমরা দেখিতেছি যে কুলশাস্ত্রের সংবাদ অনুসারে কন্নৌজীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠার উর্দ্ধ-সংখ্যা সাড়ে পাঁচশত বৎসরের মধ্যেই এ দেশে মুসলমান বিজয়ীর পদানত হইয়া পড়ে। কন্নৌজ প্রভৃতি পশ্চিমদেশে ইহার পূর্বেই মুসলমানের অধীন হইয়াছিল। অদ্য হইতে ৭২৫ বৎসর পূর্বে মুসলমানেরা বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছেন। তাহার পাঁচশত বৎসরের মধ্যে আগত পাঁচ সাতজন ব্রাহ্মণের দ্বারা বাঙ্গালা দেশের সভ্যতার সৃষ্টি এবং উন্নতি হওয়ার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে গৌড় দেশীয় সভ্যতা অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণ মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের সাহায্য লইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে এ দেশের সভ্যতা অদ্য হইতে ২৫০০ বৎসরের পূর্বেও সমুজ্জ্বল ছিল। আক্ষেপের বিষয় যে অনেকে বাঙ্গালার সভ্যতাকে কন্নৌজানীত এবং নূতন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখে এই গল্প শুনিয়াই হাণ্টার প্রভৃতি সাহেবেরা বাঙ্গালার সদাচার এবং সভ্যতার প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

বিদেশী কেন, আমাদের স্বদেশী বিজ্ঞজনেরাও সেই অবিচার করিয়াছেন। মাননীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও কুলশাস্ত্রের প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করত বাঙ্গালা দেশে

---

(২) বাঙ্গালা দেশে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের (প্রত্যেক শ্রেণীর ৫৬টি করিয়া মোটে) ১১২টী গ্রাম ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাই
ইহা ছাড়া বামন নাই।" বৈদিকদিগের কোন "গাঁই" নাই।

ব্রাহ্মণদিগের প্রথম আগমনকাল নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প এবং সঙ্গীত প্রভৃতির ইতিহাস অতি সামান্যরূপ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে অদ্য হইতে বার তের শত বৎসরের মধ্যে আগত কয়েক জন কনৌজীয় ব্রাহ্মণের বংশধরদিগের দ্বারা এই প্রাচীন গৌড়ীয় সভ্যতার বিশাল সৌধ নির্মিত হইতে পারে নাই।

আমাদের তাই মনে হয়, বঙ্গদেশপ্রচলিত সামাজিক সংস্কারের মূলে কোথাও কোন ভয়ানক গোল আছে। বাঙ্গালা দেশে হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণগণের অনুপাত খুব বেশী;—কেবল পশ্চিম বঙ্গের কৈবর্ত, বাগদী এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নমঃশূদ্র এবং রাজবংশী প্রভৃতি কয়েকটি জাতি ভিন্ন ব্রাহ্মণগণের সংখ্যার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে এরূপ কোন জাতি নাই। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সমাজের শিরোমণিস্বরূপ, তাঁহাদের সকলেই কনৌজের দোহাই দিয়া থাকেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাঁচজনের বংশধর রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রদিগের সংখ্যা বার গোত্রের বার জনের বংশধর পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। এই তের চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে পাঁচ সাত জন ব্রাহ্মণের এরূপ বংশবৃদ্ধি হইতে পারে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না; আমরা কেবল সেন্সাস্ গৃহীত সংখ্যাই দেখাইব। যাঁহারা এই সব বিষয় লইয়া হিসাবের অঙ্ক কষিতে পটু তাঁহারা একবার হিসাব মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

কুলশাস্ত্রের দোহাই দিয়া সকলেই বলিয়া থাকেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের শেষপাদ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণাগমনের কাল; সেই জন্য আমরা খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দের শেষ মুসলমান বিজয়ের প্রারম্ভ পর্যন্ত কনৌজ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটু আলোচনা করিব। এই আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা কান্যকুব্জপ্রদেশে ঐ সময় বেদাচারের এবং ব্রাহ্মণ-প্রভাবের প্রাধান্য অথবা প্রাবল্য থাকা সম্ভবপর কি না।

খৃষ্টীয় ৩১৯ অথবা ৩২০ অব্দে পাটলিপুত্রে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের প্রথম সম্রাট্। গুপ্ত-দিগের রাজত্ব সময়ে বৈদিক (পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায় সহিত) ধর্মের অভ্যুদয় প্রবল হইলেও জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের (অথবা সম্প্রদায়ের) বিশেষ অবনতি হয় নাই। চীন দেশের বিখ্যাত পর্য্যটক ফা-হিয়ান এই সময়েই (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রথম পাদে) ভারতের উত্তর

বিভাগের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। তিনি কন্নৌজও গিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তথায় হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দুইটি সংঘারাম এবং একটি বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান্ ছিল (৩)।

কান্যকুব্জ বা কন্নৌজ আর্যাবর্তের প্রাচীন নগর সমূহের অন্যতম। রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণগ্রন্থেই এই নগরের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র সুরি-প্রণীত অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে এই নগরের "কন্যকুব্জ কন্যাকুব্জ, মহোদয়, গাধিপুর, কৌশ এবং কুশস্থল" এই ছয়টি পর্যায় বা নামান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক "কান্যকুব্জ" নাম প্রাচীন গ্রন্থে প্রায়ই দেখা যায় না (৪);—তৎস্থলে কন্যাকুব্জ এবং কন্যকুব্জের প্রয়োগই লক্ষিত হয়। এখন উহার চলিত নাম কন্নৌজ—আমরা "কনোজ" বলি। এই কন্যাকুব্জ প্রাচীন পঞ্চাল দেশের রাজধানী ছিল এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থের মতে বিশ্বামিত্রের পিতামহ কুশনাভ (বা কুশিক) ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বেই এই পঞ্চাল দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উত্তর পঞ্চাল তৎকালে দ্রোণাচার্যের এবং দক্ষিণ পঞ্চাল দ্রুপদ রাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। উত্তর পঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রে এবং দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন কন্যাকুব্জ, অহিচ্ছত্র (অহিক্ষেত্র) এবং কাম্পিল্য এক্ষণে যুক্তপ্রদেশের ফরক্কাবাদ জিলায় পড়িয়াছে এবং তিনটি নগরেরই দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। প্রাচীন কালে কন্যাকুব্জ গঙ্গাতীরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে উহার দুর্দশা দেখিয়াই যেন গঙ্গাদেবী অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছেন।

ফা-হিয়ান যে সময়ে কন্যাকুব্জে আসিয়াছিলেন তখন তথায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল দেখা গিয়াছে (৫)। খৃষ্টীয় ৫৩৮ অব্দের নিকটবর্তী কালে গুপ্তবংশের শেষ সম্রাট্ দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের রাজত্ব শেষ হইয়া গেলে গুপ্তগণের মহারাজ্য লোপ পায় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য সময়েই

(৩) The Pilgrimage of Fa Hian, chaprs XVIII.

(৪) কন্যাকুব্জ অথবা কন্যকুব্জই প্রকৃত নাম, উহা হইতে "তথায় বাসকারী" অর্থে বিশেষণ শব্দ "কান্যকুব্জ" হওয়া সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য "কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ" এইরূপ বলা হয়।

(৫) ফা-হিয়ানের সময় সমগ্র আর্যাবর্তে, বিশেষতঃ প্রাচীন শূরসেন, (মথুরা) সাঙ্কাশ্য, কন্নৌজ, সাকেত (অযোধ্যা) শ্রাবস্তী, বৈশালী ও মগধ প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

গুপ্তবংশের দায়াদদিগের মধ্যে কেহ মালবে, কেহ মগধে, কেহ গৌড়ে এবং কেহ বা ওড়িশায় প্রথমতঃ সামন্ত স্বরূপে ও পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারী রূপে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন (৬)। স্থাণীশ্বর-রাজ প্রথম রাজ্যবর্ধনের প্রপৌত্র বিখ্যাত হর্ষবর্ধন খৃষ্টীয় ৬০৬ অব্দে, পৈতৃক স্থাণীশ্বর (প্রাচীন কুরু) প্রদেশের রাজ-সিংহাসনের সহিত কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করত পরে আর্য্যাবর্তের সাম্রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার ভগিনীপতি (রাজ্যশ্রীর স্বামী) মৌখরি কুলজ গ্রহবর্মা কন্নৌজের রাজা ছিলেন। গুপ্তগণের মহারাজ্য লুপ্ত হইলে পর কন্নৌজে এই বর্ম-মৌখরিবংশের রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজবংশের যতদূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বোধ হয় যে গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) বিক্রমাদিত্যের অথবা কুমার গুপ্তের সামন্তরাজ স্বরূপে কন্নৌজে এই বংশের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয় এবং পরে গুপ্তসাম্রাজ্যের অবসানে সেই সামন্তরাজের কোন সুযোগ্যবংশধর (সম্ভবতঃ ঈশান-বর্মা অথবা শর্ববর্মা-মৌখরি) স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিপতি বলিয়া পরিচিত হন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সুহৃৎ এবং সভাসদ্ মহাকবি ভট্টবাণ তদীয় হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী কথা-গ্রন্থে (মঙ্গলাচরণ শ্লোকাবলীর মধ্যে) "সংশেখর মৌখরি"দিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায় নিম্নলিখিত বংশ তালিকা নির্ণীত হইয়াছে—

১। হরিবর্মা।
২। আদিত্যবর্মা।
৩। ঈশ্বরবর্মা।
৪। ঈশানবর্মা।
৫। শর্ববর্মা মৌখরি।
৬। সুস্থিতবর্মা।
৭। অবন্তিবর্মা।
৮। গ্রহবর্মা—(রাজ্যশ্রীর স্বামী)। এই গ্রহবর্মা খৃষ্টীয়

(৬) মালব এবং মগধের গুপ্তগণ, গৌড়ের শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত এবং ওড়িশা-যাজপুরের যযাতি-কেশরী প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দ গুপ্তবংশের দায়াদ বলিয়া অনুমিত হয়।

৬০৬ অব্দে মালব-রাজ দ্বারা পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই মালবরাজের নাম দেবগুপ্ত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন (৭)।

এই মৌখরি বর্ম্মরাজগণ ধর্ম্মে পৌরাণিক (অথবা তান্ত্রিক) হিন্দু এবং সম্প্রদায়ে শৈব অথবা সৌর ছিলেন। বেহারের সাহাবাদ (আরা) জিলার "দেববরুণার্ক"—মন্দিরের শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শর্ব্ববর্ম্মা এবং অবন্তিবর্ম্মা উভয়েই দেববরুণার্ক-সূর্য-মন্দিরের সংস্কার-সাধন করিয়াছিহেন (৭)। পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক হিন্দুদিগের শৈব-শক্তি-সৌর-বৈষ্ণব-গাণপত্যাদি সম্প্রদায়-ভেদের প্রকৃত রহস্য য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বুঝিতে অনেক গোল করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ঐরূপ গোল করিবার বা ভুল বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা জানি, প্রকৃত জ্ঞানী হিন্দুর নিকট ঐ সকল দেবদেবীর উপাসকদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মতভেদ থাকিলেও শত্রুতার কোন কারণ নাই। হিন্দুমাত্রেই প্রত্যহ ঐ পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া থাকেন,—অন্ততঃ করা উচিত বলিয়া মানেন। একই রাজা শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য এবং গণেশের মূর্তি এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত রহিয়াছে। আজও কত ধনবান্ এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পঞ্চদেবতার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া পুণ্য এবং যশঃ উপার্জন করিতেছেন। প্রাচীন কালের রাজারা আবার ঐ সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করাইয়া ক্ষান্ত হইতেন না,—তাঁহারা বৌদ্ধ এবং জৈন

---

(৭) আফসদ-লিপি এবং অসীরগড় মুদ্রা লিপি (Seal), Corpus Ins. Vol. III, P. 203 and P. 219 দ্রষ্টব্য। পুনার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত C. V. Vaidya, M. A., LL. B., মহাশয় ভংকৃত History of Mediæval Hindu India Vol I গ্রন্থের ৩৩ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠায় প্রমাণগুলি একত্র করিয়া ইতিহাস-পাঠকের মহদুপকার করিয়াছেন। কন্নৌজের এই বর্ম্মগণের সহিত মালবের বা মগধের গুপ্তদিগের বংশগত বিবাদ ছিল বলিয়া বোধ হয়। সপ্তমশতাব্দীর প্রবেশ মুখে গৌড়পতি শশাঙ্ক ঐ গুপ্তগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া গ্রহবর্ম্মার উচ্ছেদ-সাধন সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

দেবদেবীর মূর্তি, মন্দির এবং সংঘারাম বা বিহারও প্রস্তুত করাইতেন (৮)। বৌদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত পাল বংশের নৃপতিগণের কীর্তিকলাপ আলোচনা করিলেও এই বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বিগণকে প্রাচীনকালে সকলেই সুবিশাল হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া কেহই গ্রহণ করিতেন না। আধুনিক কালের শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দের ন্যায় কচিৎ পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ-জৈনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গেলেও উত্তর কালীন মুসলমান-বিজয়ী-বীরগণের মত প্রাণান্তিক বৈর ব্যবহার কেহই করিতেন না (৯)। গৌড়বঙ্গের প্রাচীন কালের ধার্মিক ও সামাজিক ইতিবৃত্ত অতঃপর ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কন্নৌজ-রাজ মৌখরি গ্রহবর্ম্মার পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই:—গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সাম্রাজ্য-ভুক্ত কন্নৌজে বর্মগণের আধিপত্য গুপ্তবংশের দায়াদদিগের অসহ্য হওয়ায় বর্মগণকে বংশ পরম্পরায় গুপ্তদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইত এবং রাজবংশের চিরন্তনী নীত্যনুসারে সময়ে সময়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের দ্বারা সন্ধির বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টাও করা হইত। স্থাম্বীশ্বর রাজবংশ ও বিবাহ-সম্পর্কদ্বারা গুপ্তগণের সহিত সময়ে সময়ে সংযুক্ত হইতেন। রাজ-পরিবারের এই সকল বিবাহ প্রায়শঃই রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত

(৮) কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাণভট্টের কাদম্বরীতেও এরূপ আভাস আছে।

(৯) খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার শতার্ধ বৎসর পূর্বে (য়ুরোপীয় গণের ও তাঁহাদের অনুগামী দেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে) প্রণীত বরাহমিহির কৃত "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থে প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপন সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃস ভস্মদ্বিজান্
মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু
র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ব বিধিনা তৈস্তস্য কার্যা ক্রিয়া॥ ১৯॥

ষষ্টিতম অধ্যায়ে।

হইত। হর্ষ বর্ধনের পিতামহ আদিত্য বর্ধন মহাসেন গুপ্তের ভগিনী মহাসেনাগুপ্তাকে মহিষী করিয়াছিলেন (১০)। কনৌজ রাজ অবন্তিবর্মা বলসঙ্ঘের অভিপ্রায়েই নিজ পুত্র গ্রহবর্মার সহিত স্থাণ্বীশ্বর-রাজ (আদিত্যবর্ধনের পুত্র হর্ষবর্ধনের পিতা) প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহের পরই মালবের রাজা (দেবগুপ্ত ?) গৌড়ের গুপ্তরাজ শশাঙ্কের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া কনৌজ আক্রমণ করত নবযুবক রাজা গ্রহবর্মাকে পরাজিত, নিহত এবং তরুণী রাজ্ঞী রাজ্যশ্রীকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ঠিক এই সময়েই প্রভাকর বর্ধন হঠাৎ রুগ্ন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নব্যযুবা রাজকুমার রাজ্যবর্ধন পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতে কনৌজের বিপদ্‌বার্তা তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি ছুটিয়া আসিয়া ভগিনীপতির রাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবা ভগিনীর কারামোচনের পূর্বেই স্বয়ং শত্রুহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন। বাণভট্ট বলিয়াছেন, গৌড়পতি শশাঙ্কের ঘৃণিত বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই রাজ্যবর্ধন শত্রুশিবিরে প্রাণ হারাইয়াছিলেন কিন্তু, রাজকবি বাণভট্টের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৌড়পতির অপরাধের বিচার করিতে অগ্রসর হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে। রাজনীতি অথবা ক্ষাত্রনীতি-শাস্ত্র যে কিরূপ জটিল, তাহা শাস্ত্রজ্ঞের অবিদিত নহে। সে কথা যাহাই হউক, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ হর্ষবর্ধনের বয়স আঠারো বৎসরের অধিক নহে,—তাহার কম হওয়ারই সম্ভাবনা। হর্ষবর্ধন এই আকস্মিক বিপদে মুহ্যমান না হইয়া বীরপুরুষের মত রণসজ্জা করত অগ্রসর হইলেন এবং বিন্ধ্যারণ্য হইতে ভগিনীর উদ্ধার সাধন করিয়া প্রথমে মালবের রাজাকে (দেবগুপ্তকে ?) সমরে

(১০) কুমারগুপ্ত (২য়) কনৌজের ঈশান বর্মার, মহাসেন গুপ্ত সুস্থিত বর্মার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং মহাসেনের পিতা দামোদর গুপ্ত মৌখরি-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। আবার আদিত্যবর্ম্মার সহিত (হর্ষগুপ্তের ভগিনী) হর্ষগুপ্তার এবং তাঁহার পুত্র ঈশ্বর বর্মার সহিত উপগুপ্তা দেবীর (জীবিত গুপ্তের ভগিনী ?) বিবাহ হইয়াছিল। Mr. C. V. Vaidya প্রণীত পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই গুপ্তগণের কথা পরে বিবেচিত হইবে।

সংহার এবং পরে গৌড়পতি শশাঙ্ককে পরাস্ত এবং বিতাড়িত করিলেন। শুভাদৃষ্টবশতঃ এইরূপে হর্ষবর্ধন নবযৌবনে পিতৃরাজ্যলাভ ও (ভগিনীর পুত্র না থাকায়) কন্নৌজরাজ্যেরও অধিকার পাইয়া ক্রমশঃ নিজের গুণে সমগ্র আর্যাবর্তের সুদুর্লভ সাম্রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১১)।

এই রাজপরিবর্তন আর্যাবর্তের ইতিহাসের অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। খৃষ্টীয় ৬০৬ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়া খৃষ্টীয় ৬১২ অব্দে তিনি সম্রাট্ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রায় একচল্লিশ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন ও পালনের পরে এই মহা প্রতাপী, ধার্মিক এবং যশস্বী সম্রাট্ ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র জামাতা (বলভীর রাজা ধ্রুবভট বা ধ্রুবসেন) ভিন্ন আর কোন নিকট আত্মীয় না থাকায় রাজ্য অরাজক রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন এবং অতি শীঘ্রই তাঁহার সেই আসিন্ধু গঙ্গাসাগর বিস্তৃত মহাসাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। হর্ষের মৃত্যু এবং সাম্রাজ্য ধ্বংস খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত কন্নৌজের রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয় এবং আমরা সংক্ষেপে সেই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। কন্নৌজ প্রদেশে বেদাচারের প্রবলতা এবং তথাকার ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যাবত্তা এবং বিশুদ্ধতার খ্যাতি এখনও সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ খ্যাতির সম্ভাবনা কতদূর তাহার বিচার পাঠকপাঠিকাগণ করিবেন। হর্ষের সমসাময়িক হোয়েন্‌সাঙ্গ (য়ুয়ানচোয়াঙ্গ) নামক সুশিক্ষিত বৌদ্ধশ্রমণের বর্ণনা দেখিলে রাজধানী কন্নৌজ সে কালে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাবে খুব প্রভাবান্বিত ছিল, তাহাই বোধহয়; অন্ততঃ তখন বৈদিকধর্মের অনুরাগী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব এবং সম্মান খুব বেশী যে ছিল না তাহা নিশ্চয়। তবে, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সময়ে বৈদিক (অথবা পৌরাণিক কিংবা তান্ত্রিক) ধর্মাবলম্বিগণও অনাদৃত অথবা উপেক্ষিত হন নাই। তিনি সকল ধার্মিকেরই সমান আদর করিতেন। নগরে সূর্যদেব এবং মহাদেবের মন্দির ছিল এবং নগরের অধিবাসিবৃন্দ তুল্য সংখ্যায় পৌরাণিক এবং বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

---

(১১) "হর্ষচরিতম্" দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টীয় ৬৪৭ অব্দে,—অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগে,—হর্ষের সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর, কন্নৌজ যে স্বাধীন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহাদিগকে আমরা পুরাতন মৌখরিবর্ম্মবংশীয় বলিয়া মনে করি। রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মা নবযৌবনে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন পুত্র না থাকায় হর্ষবর্দ্ধনই কন্নৌজরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। চীন দেশের ঐতিহাসিক-মতানুসারে বিধবা রাজ্ঞী রাজ্যশ্রীই রাজ্যেশ্বরী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অগ্রজ তাঁহারই প্রতিনিধি স্বরূপে কন্নৌজরাজ্য শাসন পালন করিতেন। রাজপ্রতিনিধির (হর্ষের) মৃত্যুর পরে রাজবংশেরই কোন যোগ্য ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বাভাবিক; কিন্তু সেই রাজা সেরূপ যশস্বী না হওয়ায় জন প্রবাদ তাঁহার নাম ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের শেষার্দ্ধ পর্যন্ত এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক বা একাধিক রাজা রাজত্ব করিবার পর সপ্তম শতাব্দের অন্তিমপাদে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দের প্রথম ভাগেই বিখ্যাত যশোবর্ম্মা কন্নৌজের সিংহাসন লাভ করেন। যশোবর্ম্মাকে আমরা তাই মৌখরিবর্ম্মবংশীয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

১। প্রাচীন মৌখরিবর্ম্ম-বংশের ধারা—

নাম।	রাজত্বকাল।
(১) যশোবর্ম্মা।	খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের অন্তিমপাদ হইতে অষ্টম শতাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। (৬৭৫—৭১৫ খৃষ্টাব্দ ?)
(২) বজ্রায়ুধ।	অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে শেষভাগ পর্যন্ত। এই রাজা খুব সম্ভব যশোবর্ম্মার পৌত্র।
(৩) ইন্দ্রায়ুধ।	অষ্টম শতাব্দের শেষপাদ হইতে নবম শতাব্দের প্রথম পর্যন্ত।
(৪) চক্রায়ুধ।	নবম শতাব্দের (৮১৬) প্রথমপাদের মধ্যেই ইঁহার রাজত্বের অবসান হয় (১২)।

(১২) এই যশোবর্ম্মা হইতে চক্রায়ুধ পর্যন্ত চারিজন রাজার সমসাময়িক রাজগণ :—

(১) যশোবর্ম্মার সভায় বাকপতিরাজ নামক কবি রাজকবি ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীর মতে মহাকবি ভবভূতিও ইঁহার সভায় থাকিতেন। দেশীয় বিদেশীয় অনেক

২। গুর্জ্জর প্রতীহার বংশ।

নাম।	রাজত্ব কাল।
(১) নাগ ভট—	৮১৬ হইতে ৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।
(২) রামভদ্র বা রামদেব— (নাগভটের পুত্র)।	৮২৫ হইতে ৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।
(৩) মিহির ভোজ বা প্রথম ভোজ— উপাধি—আদিবরাহ (রামভদ্রের পুত্র)	৮৪০ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।
(৪) মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধ— (মিহির ভোজের পুত্র)	৮৯০ হইতে আরম্ভ শেষ অনিশ্চিত।
(৫) দ্বিতীয় ভোজ (মহেন্দ্র পালের পুত্র)	প্রথম আনশ্চিত, শেষ ৯১০ খৃঃ অব্দ।
(৬) মহীপাল (দ্বিতীয় ভোজের বৈমাত্রেয়)	৯১০ হইতে ৯৪০ পর্য্যন্ত।
(৭) দেবপাল (মহীপালের পুত্র)	৯৪০ হইতে ৯৫৫ পর্য্যন্ত।
(৮) বিজয়পাল (দেবপালের ভ্রাতা)	৯৫৫ হইতে ৯৯০ পর্য্যন্ত।
(৯) রাজ্যপাল (বিজয়পালের পুত্র)	৯৯০ হইতে ১০১৯ পর্য্যন্ত।
(১০) ত্রিলোচনপাল (রাজ্যপালের দায়াদ)	১০১৯ হইতে ১০২৭পর্য্যন্ত।
(১১) যশঃ পাল (ত্রিলোচনের দায়াদ)	১০২৭ হইতে ১০৩৭ পর্য্যান্ত।

পণ্ডিত রাজতরঙ্গিনীর মত অবলম্বন করত ভবভূতির সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতানুসরণ করিতে অসমর্থ। এই বিষয় বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (কহ্লনের মতে রাজ্যকাল খৃঃ ৬৯৯ হইতে ৭৩৫ অব্দ পর্য্যন্ত) দিগ্‌বিজয় উপলক্ষে যশোবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

(২) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র বিনয়াদিত্য জয়াপীড় বজ্রায়ুধকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কহ্লনের মতে ৭৫১ হইতে ৭৮২ খৃষ্টাব্দ জয়াপীড়ের রাজত্ব কাল।

(৩) বাঙ্গালার রাজা ধর্ম্মপাল কর্তৃক ইন্দ্রায়ুধ পরাস্ত এবং রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন।

যশঃ পালের পরে কয়েকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ১০৩৭ হইতে ১০৯০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবার পর এই বংশ লুপ্ত হয় (১৩)।

৩। গহরবাড় (রাঠোর) বংশ।

চন্দ্রদেব এই বংশের প্রথম রাজা এবং তাঁহার বংশের হস্তে কনৌজরাজ্য প্রায় একশত বৎসর থাকিবার পর শেষ রাজা জয়চন্দ্রের সহিত এই বংশ এবং হিন্দু রাজ্যের যুগপৎ লোপাপত্তি ঘটে। এই জয়চন্দ্রই ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের শ্বশুর এবং প্রতিদ্বন্দী "জয়চাঁদ।" লুণ্ঠিত সর্ব্বস্ব কন্যাকুব্জ নগরী আবার গাহড়বাড় বংশীয় রাজগণের চেষ্টায় মহাসমৃদ্ধিশালিনী

(৪) ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। "বাঙ্গলার ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, মহাশয়ের মতে ৭৯০ হইতে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধর্ম্মপালের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৮১৬ অব্দে গুর্জর প্রতীহার বা পরীহার বংশীয় নাগভট চক্রায়ুধকে পরাস্ত এবং নিহত করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।

(১৩) গুর্জর প্রতীহারবংশের আদিম স্থান রাজপুতানার অন্তর্গত ভিনমাল বা ভীলমাল। নাগভটই কনৌজে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্র ৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই বংশের ষষ্ঠ রাজা মহীপালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ড অথবা জেজাকভুক্তির চন্দেল্ল রাজ যশোবর্ম্মা এই বংশের সপ্তম রাজা দেবপালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। গজনীর অতি বিখ্যাত সুলতান মামুদ এই বংশের নবম রাজা রাজ্যপালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল মামুদের ভয়ে কনৌজ পরিত্যাগ করত গঙ্গার অপর পারে স্থিত "বারী" নগরে গিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ রাজার পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ ও মন্দিরাদি লুণ্ঠন-কার্য সুচারু রূপে সাধন করিয়া চলিয়া যান। বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাজ গণ্ডের উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর খৃষ্টীয় ১০১৯ অব্দে এই কাপুরুষ রাজা রাজ্যপালকে (তাঁহার নূতন রাজধানী "বারী"তে গিয়া) আক্রমণ, পরাস্ত এবং নিহত করিয়াছিলেন। ১০৯০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে গহরবাড় (রাজস্থানের ইতিহাসে "রাঠোর" বলিয়া পরিচিত) বংশীয় চন্দ্রদেব কনৌজ রাজ্য অধিকার করেন এবং সেই সময়ে প্রতীহার বংশের অবসান এবং গহরবাড় বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

হইয়াছিল। ঘোর বংশীয় সিহাবুদ্দীন (মহম্মদঘোরী) প্রথমতঃ এই কন্নৌজরাজ জয়চাঁদকে কিরূপে হস্তগত করত পৃথ্বীরাজের সর্বনাশ সাধন করেন, এবং পরে আবার সেই স্বদেশ এবং স্বজাতিদ্রোহী জয়চাঁদকে কিরূপ সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাস-শিক্ষার্থি মাত্রেরই সুপরিচিত। খৃষ্টীয় ১১৯৪ অব্দে জয়চাঁদের পতন এবং কন্নৌজের হিন্দুরাজ্যের অবসান ঘটিয়াছিল। আজ আর সেই পৃথিবী-বিশ্রুত (১৪) কন্নৌজের সে শ্রী-সম্পদ কিছুই নাই; স্বয়ং গঙ্গাও সেই দুর্ভগা নগরীর স্পর্শ দুঃসহ মনে করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন এবং এখন সেই মহানগরী ফরক্কাবাদ জিলার ক্ষুদ্র একটি তহশীলদারের অধিষ্ঠান স্বরূপে কথঞ্চিৎ নিজ পরিচয় প্রদান করিতেছে!

কন্নৌজের ইতিহাস যতদূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে তথায় হর্ষের পর বিশেষ পরাক্রান্ত কোন সার্বভৌম নরপতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাক্‌পতি রাজের আশ্রয়দাতা যশোবর্মদেবের কথা তুলিয়া লাভ নাই,—তিনি নিজেই কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন (১৫)। পরে যশোবর্মার বংশীয় ইন্দ্রায়ুধ বাঙ্গালার অধিরাজ ধর্মপালের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রায়ুধের পুত্র বা দায়াদ চক্রায়ুধ গৌড়রাজের প্রসাদভোজীই ছিলেন। এরূপ অবস্থায় আর্যাবর্তের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কন্নৌজে বৈদিক-ধর্মের অধিকতর মর্যাদা অথবা উন্নতি থাকার সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয় না। অপর পক্ষে গৌড়বঙ্গের ধার্মিক বা সামাজিক অবস্থা ঐ সময়ে কন্নৌজের অপেক্ষা বিশেষ হীন থাকারও কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। আগামী প্রস্তাবে আমরা বঙ্গমণ্ডলের রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লইয়া উপস্থিত হইব।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

(১৪) কন্নৌজের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান আমরা প্রধানতঃ ভিনেসাণ্ট স্মিথ এবং সি, ভি, বৈদ্য মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংকলন করিয়াছি। গ্রীক টলেমীর গ্রন্থেও কন্নৌজের উল্লেখ যখন দেখা যাইতেছে, তখন উহাকে "পৃথিবী-বিশ্রুত" বলা অসঙ্গত নহে।

(১৫) বাক্‌পতি রাজের "গৌড়বহো" (বা গৌড়বধ) কাব্যের মূলে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস অনুশীলন কালে আমরা সংক্ষেপে "গৌড়বহ" সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

মিনতি।

ক্ষমা ক'রো মোরে হে আমার প্রিয়—ক্ষমা ক'রো অপরাধ,
ভুলে যেয়ো যদি হয়ে থাকে কোন ত্রুটী,
নিমেষের তরে অবহেলা ভরে গণিয়ো না পরমাদ—
রেখো অভাগীর এই শেষ মিনতিটী।

অভিমান ভরে হয়তো কত না কহিয়াছি কটু কথা—
হয়তো তোমার ঝরায়েছি আঁখি জল,
তা' বলে তোমার ঘৃণা-করে-দেওয়া মর্ম্মন্তুদ ব্যথা
র'বেনি আমার অক্ষত হৃদি তল।

আমার জীবন নিষ্ফল তুমি ক'রেছো চরণাঘাতে
উন্নত শির করিয়া দিয়েছো নত;
তবে কেন আর বজ্রের মত ক্রূর অভিসম্পাতে
অভাগারে তুমি করিবারে চাহ হত।

আপনি যে দীপ নিবিছে নীরবে—নিবায়ে কি হবে তারে,
যতটুকু জ্বলে—জ্বলিবারে তারে দিয়ো,
এ শিখায় তব কাঁচা সোণাটুকু পোড়াইয়া বারে বারে
চিরতরে তারে খাঁটী ক'রে শুধু নিয়ো।

শ্রীরেণুকা দাস।

বয়াটে

দ্বিতীয়।

(রঙ্গ বৈচিত্রে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মুখবন্ধ

খোলার বাড়ী থেকে একেবারে দোমহলা "কোঠী"—ন'ব্নে যেন হাঁফিয়ে উঠ্লো! তাঁদের বাড়ীর সদরে এখন—দারোয়ান, অন্দরে রাঁধুনি আর আপিস ঘরে "বয়" বা আরদালী।" এই "বয়" নিয়ে হ'য়েছে—ন'ব্নের বড় আপদ;—সাহেব "বয়" ব'লে ডাক্লে—এক একবার সেই জবাব দিয়ে বসে।

সাহেব ঠিক ক'রেছেন—দম্কা খরচের মুখে হাজার হাজার টাকা পাখীর ঝাঁকের মত হুস্ ক'রে উড়িয়ে দে'য়া চাই। বাড়ীখানাকে তাই হালের বড় মান্দী কায়দায় আগাগোড়া সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হ'য়েছে। নীচে—আপিস ঘর;—সেখানে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চেয়ার, আলমারী, র‍্যাক,—হোয়াটনট! ওপরে ড্রইং রূম;—ছবি-তস্বীরে তামাম ঘরখানা সাজানো—যেন কোনো পরীজাদীর আরাম-বাগ কি স্নানের হাম্মাম্। তার পাশে লাইব্রেরী—ছোট বড় আলমারীগুলো সব দেশ বিদেশের বাছাই সাহিত্য-বিজ্ঞানে ভরপুর বোঝাই। একটা রিভলভিং বা ঘোরানো সেলফ্—তাতে পড়বার মতন 'নতুন' বই খান কত ক'রে সাজানো। এক কোণায়—তিনখানা "ইজেল"—মেহগিনির ছোট একটা সেল্‌ফে ক্যানভাস, রঙ, তুলি ইত্যাদি ছবি আঁকবার সরঞ্জাম। লাইব্রেরীর পাশে বেড্রূম বা শোবার ঘর। চেটাই ছেড়ে একেবারে স্প্রিংএর খাটে গদি-আঁটা বিছানায় বিজলী পাখার নীচে শুয়ে ঘুমানো। ন'ব্নের কাছে এ সব আরব্য উপন্যাসের মত অদ্ভুত ঠেক্তে লাগ্লো! সে জিগ্গেস ক'রলো—"এর মানে?"

সাহেব ব'ল্লেন—"আমীরী
ন'ব্নে ব'ল্লো—"বেশ কথা।"

এক।

সেদিন—আবার র'ব্বার! সাহেব ভোরে উঠেই অফিস ঘরে এসে ব'সেছেন। বয় চা চোকোলেট, টোষ্ট—মাখন ইত্যাদি ট্রের ওপর সাজিয়ে এনে টেব্লের ওপর রেখে গেল। ন'ব্নে তখন—ঘরের কোণায় তাদের সেই 'হোল্ডঅলের' ডালা উদ্‌লো ক'রে খুলে রাজ্যের খেল্‌না, বাসন, ব্লাউজ বা'র ক'রে আলাদা আলাদা থাক্ দিয়ে সাজাচ্ছিল। আজো আবার সাহেবের পোষ্য ফেরীওয়ালার দল—তাদের হপ্তার কেসাতি বুঝে নিতে আস্‌বে। সাহেব খাতা খুলে ব'সেছিলেন—হিসেব সব কড়া ক্রান্তিতে মিলিয়ে নে'য়া চাই!

সাহেব ন'ব্নেকে ডাক্‌লেন—"এস চা খেয়ে নাও"—

এর মধ্যে দারোয়ান এসে টেবিলের ওপর কার্ড একখানা রেখে সেলাম দিলে—সাহেব ব'ল্লেন—"সেলাম ব'লো।"

কার্ডে লেখা ছিল—মোম্বাছাম্মা"—এক মিনিটের ভেতরই মোম্বাভাম্মা ঘরে ঢুকে ন'ব্নে আর সাহেবকে সুপ্রভাত জানালো। সাহেব লাফিয়ে উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন—ন'ব্নে ছুটে এসে তার দুই হাতে "মোম্বাভাম্মার" ডাকাতদের হাতের মতন পেশল ডান হাতখানা জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে—"গুড্ মর্ণিং!"—সাহেব বল্লেন—"আমার কমার্শিয়াল সেক্রেটারী" বস, খবর শোন।"

ন'ব্নে মোম্বাভাম্মাকে টেনে একটা চেয়ারে বসিয়ে এক পেয়ালা চা ঢেলে সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে ব'ল্লে—"বলুন, হপ্তার খবর।"

মোম্বাভাম্মা—চায়ের পেয়ালায়—চোঁ—একটা চুমুক দিয়ে—পকেট থেকে এক তাড়া নোট টেনে বার ক'রে সাহেবের কাছে এগিয়ে ধ'ল্লো। সেই ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে—প্রথম দিন যেমন একটা বাণ্ডেল সাহেবের হাতে দিয়েছিল—আজকেও নোটগুলো মোম্বাভাম্মা সেই

রকম ক'রে কাগজ দিয়ে জড়িয়ে আধ বিঘতটাক একটা বাণ্ডেল ক'রে এনেছিলো। সে দিনও সেগুলো ছিল নোট—টাকা,—আজও তাই! সাহেব জিগ্‌গেস ক'র্‌লেন—"কাল্‌কে এসেছে?"

"হাঁ সন্ধ্যার ডেলিভারীতে পেয়েছি—এ হপ্তায় আমদানী বেশী হ'য়েছে।"

"কপাল ফ'লেছে?" ব'লে সাহেব হাস্‌লেন। ন'ব্‌নে জিগ্‌গেস ক'র্‌লো—তাপর বাজারের খবর"—

ভাঁয়া জবাব দিল—"নোটের ওপর তেজী—কিন্তু একদিক দিয়ে একটু মন্দা গেছে"—

"মানে?"

"মানে—একটা বাঙালী ছেলে—পাকা খেলোয়াড়। আর বিরিঞ্চি ফেরোয়ার!"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"অ্যাঁ?"—

"ফেরোয়ার?"—ব'লে সাহেব—আবার "হো—হো—হো—হো—হো" ক'রে ডাক ছেড়ে হেসে উঠ্‌লেন—

মোল্লাভায়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে আর এক চুমুক চা গিলে ব'লে গেল—"তার হাতে প্রায় সাঁইত্রিশ টাকা জ'মেছিল—মালও কিছু ছিল তা বিক্রি হবার আগেই—সে লাপোয়া হ'য়েছে কারণও যে কিছু তার না ছিল তা নয়—সে কথা পরে বল্‌ছি।"

ন'ব্‌নে গালের বাঁদিকে ঢিব্‌লে ক'রে টোষ্ট চিবোতে চিবোতে জিগ্‌গেস ক'র্‌লে—"তার আগের খবর।"

"হরিচরণ।" ন'ব্‌নে জিগ্‌গেস ক'র্‌লে—"সে আবার কে?"

বলরামদের ষ্ট্রীটের ক'ব্‌রেজ মশাই—আমায় ডেকে নিয়ে ছোক্‌রার সঙ্গে চেনা করিয়ে দিয়েছিলেন;—বেশ চালাকচতুর, কথাবার্ত্তা শুনে খুব সুশীল ব'লে মনে হ'ল। সে ব'ল্লে—পাবনা—সিরাজগঞ্জ থেকে ডিমের চালান এনে 'ব্যবসা' সুরু ক'রেছে—খরচখরচা বাদে—দুনো লাভ টেঁকে! আমার কাছে কিছু মূলধন চায়। কব্‌রেজ মশায় 'সুপারিস' ক'রে ব'ল্লেন 'বেশ ছেলেটী—একে দিতে পারেন।' আমি তখুনি পঁচিশ টাকা দিলাম দিন দুই পরেই সে এসে আমায় চল্লিশ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ব'ল্লে—দেখুন—একটা খুব 'দাঁ' পাওয়া গেছে!—

"রেড্‌পাল´" সাবান কোম্পানীটা ফেল প'ড়েছে—জানেন ত! আমি মোটে আটাশো টাকায় —ওদের কল মায় সরঞ্জাম-সব কিনে ফেলেছি ;—সাবানো কিছু আছে। এইটে "জয়েণ্টষ্টক সিষ্টেমে" চালাবো—আপনি, আমি আর ক'ব্‌রেজ মশাই—তিনজন প্রমোটারস্। আর একজন উকীলকেও ব'লেছি তিনি বেশ পয়সাওয়ালা লোক ৪ ভাগে দুশো টাকা ক'রে মোট আটশো আরো টাকা ৫০্ ক'রে দিতে হবে পরেও তো দরকার আছে—সেটা সেকেণ্ড "কল" দিয়ে নোন। আজ নগদ দুশো টাকা দিয়ে দিন। আমি সত্যিই সেটা তোফা-ফলাও একটা 'দাঁ' মনে ক'রে তখ্‌খুনি দুশো টাকা দিয়ে দিলুম।"

শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের তিন জনের ওপরেই চাল দিয়ে—ফলাও দাঁটা—মানে এই ছ'শ টাকা মেরে সে বেমালুন—চম্পট ?

"চম্পট।"

সাহেব হো হো হো ক'রে আবার ক'ল্‌জে—ফাটানো হাসি হাস্‌লেন। ন'ব্‌নে বল্‌লো—"বেশ হ'য়েছে!—তা'পর ক'ব্‌রেজ মশাই কি ব'ল্লেন ?"

"হরিচরণ অতি কৃতঘ্ন!"

"প্রাঞ্জল সংস্কৃতে এই জবাব দিলেন ?"

"হ্যাঁ—তাপর হিসেব দিলেন—তাঁর মোট চারটী শ' টাকা মহাত্মা হরিচরণ—নিয়ে ডিমে—"

ন'ব্‌নে ব'ল্ল—"তা' দিয়েছেন ?'

ব্যাপার বোঝ! তা'পর বিরিঞ্চি—সে রেটা সারাবেলাই—কি তাকি ঢুকি ক'র্‌তো—কেমন ক'রে ক'রে দেন চাইত—তাই দেখে ওর ওপর বিল্টু, হিলটু সককলেরই কেমন একটু সন্দেহ হ'ল—। ওরা ঠিক বার ক'র্‌লে—"ও-বেটা পুলীসের চর—আমাদের পেছনে টিকটিকি ঐ ছানাটাকে লাগিয়েছে। সবাই মিলে উত্তম-মধ্যম ব্যবস্থার যোগাড় ক'চ্ছে বুঝ্‌তে পেরেই বাছাধন পগার পার—কিন্তু এ বাড়ীর খবর এখনও কিছু পায় নি।"

সাহেব ব'ল্লেন,—"দেখা পাওতো ডেকে ঠিকানাটা ব'লে দিও।"—

কথার মাঝখানেই একজন দুজন করে সওদাগররা সব এসে জুট্‌লেন। হিসেব-নিকেশ, বুঝ-পত্র, নেনা-দেনা মিটে গেলে—তোমরাও বাজে বেরিয়ে গেলেন। ন'ব্‌নে আর সাহেব

উঠ্‌তে যাবেন এমন সময় প্রকাণ্ড একখানা প্যানহাট গাড়ী এসে ন'বনেদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালো। ভেতর থেকে একটী বাবু হেঁড়ে গলায় ডেকে দারোয়ানের হাতে একখানা চ'ক চ'কে কার্ড-সাহেবের বরাবর পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর দেহখানি বেমানানো রকম অনাবশ্যক নাদুস-নুদুস হোঁদল-কুতকুতে গোছের। ভুঁড়িটী মোটরগাড়ীর বনেটের মত সাম্‌নের দিকে ফুলে বেড়ে উঠেছে ব'লে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লে সারা অঙ্গ পেছন পানে হেলে চিং হ'য়ে আসে। গায়ের রঙ বেশ ফরসা—সাজ-গোজটীও সৌখীন।

একটু পরেই সাহেব সেলাম প্যঠালে বাবুটী গিয়ে সাহেবের কাছে ব'সে নানা রকম কি সব কথা-বার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। সে অনেকক্ষণ। কখনো চুপে চুপে, কখনো হাত মুখ নেড়ে কখনো বা মুচকী হেসে। ন'ব্‌নে দূরে ড্রয়ারের সামনে ব'সে ব'সে এক একবার তাকিয়ে এই অদ্ভুত রঙ্গ অভিনয় দেখ্‌তে লাগ্‌লো। আলাপ-সালাপ শেষ হ'লে বাবুটী নমস্কার জানিয়ে উঠে গেলে সাহেব তাঁর হো হো গদ্‌গদ্‌ হাসি হেসে উঠে ব'ল্‌লেন—"রয়, আবার ব্যবসা।"

নব্‌নে জবা ব ক'রলে "অনুমান ক'রছি বটে কিন্তু সব কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি।"

সাহেব বল্লেন—"ইনি পূর্ণরমা কটন মিলের—প্রোপ্রাইটার। হঠাং এঁদের সেয়ারের দর প'ড়ে গিয়াছে। একেবারেই নেবে গিয়েছে ব'ল্‌তে হবে কিন্তু তার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। কেন্‌ না কাপড় ঠিক সমানই তৈরি হচ্ছে সুতো বছরে বরং বাড়তিই হ'য়েছে কিছু—হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ডিভিডেণ্ট গত বছর যা দে'য়া হয়েছিল—এবার তা দিতে পার্‌লেন না খরচ যে কেন বেড়ে গেল তাও ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি। এঁদের সেয়ার-রেটটা যদি অন্ততঃ কুড়ী টাকা বাড়িয়ে দিতে পারি তবে উনি আমার মোটের ওপর দশ হাজার টাকা মর্য্যাদা দেবেন ব'ল্লেন—সোজা কথায় আমার মেহনতের মজুরী পুষিয়ে দেবেন আর কি! ব্যস! কাল থেকেই আরম্ভ ক'রতে হবে। তুমি সপ্তাহে দু দিন গিয়ে ওদের অ্যাকাউন্‌টটা আগাগোড়া অডিট্‌ ক'র্‌বে। গলদ কিছু ভেতরে আছেই নিশ্চয়।"

ন'বনে ব'ল্লে—"আচ্ছা।"

পরদিন ইংরাজী, বাঙলা, সমস্ত দৈনিকেই প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল। পূর্ণরমা কটনমিলের সেয়ারের দাম হঠাং প'ড়ে গিয়েছে বলে রামনারায়ণ কিমাজী তাঁর দশ হাজার

টাকার সেয়ার পঁচাত্তর টাকা দরে ছেড়ে দেবেন যদি কেউ ক্রেতা থাকেন—চিঠি লিখে খবর করুন।

তার সাতদিন পরে নবনীতমোহন চক্রবর্ত্তী সব কাগজেই অ্যাড্ভার্টাইজমেণ্ট বার ক'ল্লেন তিনি পূর্ণরমা কটনমিলের সেয়ার কিনবেন। দর পঁচাত্তর থেকে আশী টাকা। সাতদিনের ভেতর যাঁরা "বিক্রি" ক'র্‌তে রাজী আছেন চিঠি লিখুন।

পরের সপ্তাহে রোজ 'ডেলিভারির' পর 'ডেলিভারিতে' সেয়ার 'বিক্রীর' চিঠি এসে ন'ব্‌নের টেব্‌লের ওপর পাঁজা হ'ল। নিয়ম মত লেখাপড়া ক'রে সাহেব নব্‌নের নামে অনেক টাকার সেয়ার কিনে ফেল্‌লেন। ন'বনে শেষ সেয়ার ট্রানজ্যাক্‌সন সে'রে উঠে দাঁড়ালে সাহেব দাড়ীর ভেতর দিয়ে পাঁচটা আঙ্গুল একবার চালিয়ে নিয়ে তাঁর সেই হাসির হররায় ঘর কাঁপিয়ে তুলে—ন'বনের পিঠের ওপর একটা চাপড় মেরে ব'ল্‌লেন "তৈয়ি হও; বেলা বারটা বাজে এক্ষুনি সেয়ার মার্কেটে বেরোতে হবে।"

দুজনে বেরিয়ে প'ল।

সে এক অপূর্ব্ব চিড়িয়াখানা। মানুষের ভেতর যত আজগুবী আদর্শের জীবেরই সেখানে গতি বিধি। আশে-পাশে বড় বড় আটামোবাইল গাড়ী; এখানে ওখানে বেজায় বেজায় হর রঙা পাগড়ী, হ্যাট, কোট বুটও আছে—ভুঁড়িটা সাধারণ, প্রায় সকলেরই—সে এক একটা মামুলী দৈহিক সম্পত্তি। সবাই যেন অতিশয় ব্যস্ত। চোখগুলো লোকগুলোর কুট বুদ্ধির উৎসাহে অতিরিক্ত রকম জ্বলছে। হাসছে কেউ কেউ কিন্তু তার ভেতরেও মানে গোপন র'য়েছে, আর সে মানে—ঐ এক কথা—টাকা আর লাভ। নগদ রূপোর ঝনঝমানি বা চিকনিকানো রূপ সহরের কালি ধোঁয়ায় অপরিস্কার রোদের আলোয় জ্ব'লে উঠ্‌ছে কম বেশীর ভাগ কাজ-কর্ম্মই চ'ল্‌ছে কাগজে আর লেখায়।

পূর্ণরমার মালিক, আমাদের সাহেব আর ন'বনে তিন জনেই সেখানে হাজির হ'য়েছেন। সাহেব মিলের মালিকের মোটা হাতখানার জোরে গোটাকত ঝাঁকি মেরে ব'ল্লেন দর হাঁকুন—৯০্ টাকা।

তিনি ব'ল্লেন—পূর্ণরমা কটন মিলস্—৯০্ টাকা ১০ সেয়ার ১০০্ টাকার।"

চট ক'রে একটা মাড়োয়ারী দেহ দুলিয়ে ছুটে এসে ব'ল্‌লো একশো পাঁচ।

তার পেছনে আর একজন—হাঁক্‌লো—"একশো দশ।"

সাহেব ব'ল্লেন—"একশাও চালিস—" নব্‌নে ডাক্‌লো দেড়শাও।"

সে আজও নবাবজাদা। তেমনি সাজ ফিককরা হাসি, গাল ভরা পান কানে আতর।

পেছন থেকে কে একজন তাড়াতাড়ি এসে ন'ব্‌নের হাত চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে—"বিলকুল তামাম লে লেগা।" এক শও প'চাত্তর পৌনে দোশ।"

সাহেব ব'ল্লেন—"ব্যাস খতম।"

সবগুলো সেয়ার বিক্রী হ'য়ে গেল। পূর্ণরমা মিল্‌সের সেয়ার রেট উঠে গেল পৌনে দুশ।

তার সাতদিন পরে শ্রীমান নবনীতমোহন অডিট রিপোর্ট মানে হিসাব খতিয়ে নিকেশ করা বিবরণ সাহেবের হাতে দিলে—মিল্‌সের প্রোপ্রাইটারকে খবর দিয়ে ডাকিয়ে এনে সাহেব তাঁর সাম্‌নে প'ড়্‌লেন—"১৮৯৬ থেকে আজ পর্য্যন্ত পূর্ণরমা মিল্‌সের ক্যাস বইএর খতিয়ান খুঁটি নাটী নিকাশ ক'রে যা দেখা গেল—

প্রথম বছরেই ব্যবসায় লাভ হয়েছে। শতকরা দুই টাকা লাভ অংশীদারদের দিলেও—রিজার্ভফণ্ডে পনর হাজার টাকা থাকা উচিত।

তা'পর থেকে ৫ বছর অবধি প্রত্যেক বছরেই সামান্য লোকসান।

তারপর ২ বছর লাভ।

তারপর ৫ বছর দুনো লাভ হয়েছে। রিজার্ভের যে টাকা খরচ হ'য়েছিল সব আবার জমা রাখা যেতে পারতো। পুনাংএর রাজার দেড় লাখ টাকার সেয়ারে—ডিভিডেণ্ট খরচ লেখা হ'য়েছে কিন্তু তাঁর কাছে তারে খবর নিয়ে দেখা গেল তাঁকে এ অবধি এক পয়সাও লাভ দে'য়া হয়নি। খাতাঞ্চীর ড্রয়ারের পাশে ছেঁড়া এক টুক্‌রো চিঠি পড়ে হঠাৎ সন্দেহ হ'য়েছিল ব'লে আমরা গোপনে খোঁজ নিয়েছিলাম।

মোটের ওপর দেখা গেল প্রায় তিন লাখ টাকা চুরি হ'য়েছে। যদি কর্ম্মচারীদের কিছু জামিন থেকে থাকে তবে তা বাজেয়াপ্ত ক'রে এই টাকা আদায় ক'রে নিয়ে ব্যবসায় বাড়িয়ে দে'য়া যেতে পারে—ভাল একজন ম্যানেজার রাখা দরকার। প্রত্যেক মাসে অডিট হওয়া

চাই। বেশী টাকা দিয়ে বিশ্বাসী, খাঁটী লোক রাখ্‌বেন। বাইরে এ খবর 'রাষ্ট্র' হ'তে দেবেন না—তা হ'লে সৎনাম নষ্ট হ'য়ে যাবে। ইতি—

শ্রীনবনীতমোহন চক্রবর্ত্তী।

কড়ার ক্রান্তিতে হিসাব ক'ষে জমা, খরচ, ষ্টক, উৎপন্ন জিনিষ বিক্রীর দাম ইত্যাদি লিখে দস্তুর মত ব্যবসায়ী ধরণে নিকাশ নামানো খতিয়ানশ্লিপ রিপোর্টের সঙ্গে আঁটা ছিল। এমন কৌশলে পরিস্কার ক'রে বিবরণ লিখে দে'য়া হ'য়েছে যে যে কেউ তা থেকে—সত্য উদ্ধার ক'রে নিতে পারবেন। মিলসের মালীক তো প'ড়ে অবাক। তিনি ছোট ছোট দুটো চোখ গর্ত্তের ভেতর ফুলিয়ে বড় ক'রে ব'ল্‌লেন—"এতদিন তবে এই সব—অডিটাররা কি ক'রেছে ?"

ন'ব্‌নে মুচকী মুখে টিপি টিপি হাস্‌লো—আর সাহেব হো হো উল্লাসে ঘরের ভেতর আওয়াজ গুলজার ক'রে ব'ল্‌লেন—"এই জন্যেই বাঙালীর ব্যবসায় লাভ হয় না; মন তৈরী হয় নি লোভ সাম্‌লাতে পারে না—তারা চায় রাতারাতি বড় লোক হবে কিন্তু অসদুপায়ে।"

মিলওয়ালা ব'ল্‌লেন—"আপনার এই ছেক্‌রা বাবুটীকে আমায় দিন না—আমি সুপারিনটেনডেণ্ট রাখ্‌বো।"

সাহেব আবার হাস্‌লেন। ন'ব্‌নে ব'ল্লে "আমার অবসর কম।"

সাহেব ব'ল্লেন—"তবে তো হয় না প্রোপ্রাইটার বাবু!"

বাবুটী ভাব্‌লেন এ দুজনই অদ্ভুত বিচিত্র স্বভাবের লোক। এঁরা মাইনে নিয়ে নিয়ম মত দশটা থেকে পাঁচটা তাঁর কাজ কর্‌তে কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই মাঝে মাঝে তাঁর ব্যবসায়ের তদ্বির করবার বিনীত নিবেদন জানিয়ে এঁদের দুজনকেই অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় হ'লেন।

দুই।

পরের দিন সকালে উঠে সাহেব ন'ব্‌নেকে ছবি আঁক্‌তে ব'লে বেরিয়ে গিয়ে বেলা এগারটার সময় এক হাওয়াগাড়ী ক'রে বাড়ী ফির্‌লেন। মোটরের শব্দশুনে ন'ব্‌নে নেবে এসে জিগ্‌গেষ ক'লে—"সে কি ?"

সাহেব হেসে ব'ল্লেন—"সেই দশ হাজার টাকা বয়, পূর্ণিমা কটন মিলসের টাকায় এই হাওয়াগাড়ী কিন্‌লাম—দু'জনে মিলে হরদম হাওয়া খেয়ে বেড়াবো। সোফার আমরা রাখ্‌বো না—তোমায়ও গাড়ী চালানো শিখিয়ে দোব।"

আবার হো হো হাসি। গাড়ী চড়া আর চালানো দুই-ই এখন এঁদের বিপুল বেগে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। ন'ব্‌নে হাওয়াগাড়ী হাঁকিয়ে সাহেবের সঙ্গে অনেক মজলীস, সভা, কবি গৃহের মিলনী-উৎসব ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছে।—কিন্তু মনটা যেন তার—সৌখীন সহবতের রঙদার তালে লয়ে বেশ সহজ; সচ্ছন্দে চল্‌তে চাইল না—এই সব মুখোসপরা ভদ্রতার অতিভারে তার সরল হৃদয় যেন অনাবশ্যক রকম ভারাক্রান্ত হ'য়েই উঠ্‌লো। যেখানেই যায়—সেখান থেকে বাড়ী ফিরে একটা অবাধ নিঃশ্বাস ফেলে ন'ব্‌নে হাঁফ ছাড়ে। সহবতের হাওয়ায় বুঝি নিঃশ্বাস ফেল্‌তেও লোককে একটা নিয়ম মেনে চ'লতে হয়। তার বেনিয়মী জীবনটা এমনি সহবতের গৎবাঁধা ভদ্রতার মাঝে মাস খানেক কেটে যাবার পর—একদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে সাহেব ব'ল্লেন—"বয় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মতন সেজে-গুজে নাও—এক জায়গায় বেরোতে হবে।"

ন'ব্‌নে তৈরি হ'ল। সাহেব হাওয়াগাড়ী বার ক'রে আন্‌লেন। দুজনে উঠে গাড়ী হাঁকিয়ে ক্রমে সহর ছাড়িয়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে এসে প'ড়লেন। ন'ব্‌নে একবার জিগ্‌গেষ ক'র্‌লো—"কতদূর যাব।" নিবাদে চড়া হাসি হেসে সাহেব ব'ল্লেন "মানেক ড্যাম।"

হু হু জোরে সাহেব গাড়ী ছেড়ে দিলেন মিনিটে দেড় মাইল ছাড়িয়ে মোটর ছুটেছে—তার অবাধ গতির মুখে কোনো বাধা নেই—সাহেব তিনের "গিয়ারে" সিপ্‌ড্‌ তুলে দিব্যি নিশ্চিন্তে ষ্টিয়ারিং ধ'রে ব'সেছেন। মাঝে মাঝে দুপুরের তপ্ত হাওয়া ধুলোর রাশ ব'য়ে এসে তাদের মুখে চোখে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে। পুরু কাঁচের যোড়া যোড়া "গগল্‌" মানে 'বিরাট' চশমা তাদের চোখে পরা ছিল সুতরাং অন্ধ হ'য়ে যাবার আশঙ্কা মোটেও ক'র্‌তে হয় নি। প্রায় চল্লিশ মাইল সমানে চ'লে যাবার পর—একটানদীর রেখা সম্মুখে স্পষ্ট হ'য়ে এল; পরিস্ফুট জল কল্লোল শোনা যায়। সাহেব ব'ল্লেন—"ঐ "রূপ রেখা" বয়, ঐ নদীর মোহনায়—মানেক ড্যাম।"

ন'ব্‌নে জিজ্ঞেষ ক'র্‌লো—"ও ড্যামের" নাম "মানিক ড্যাম" হ'ল কেন?"

"করাচির শেট মানিকজী বিঠল রাম"—

ব'লতে ব'লতে সাহেব মোহনার নদী তীরে এসে গাড়ী থামালেন। নব্‌নে নামতে নামতে ব'ললো—"তাঁরই নামে এই ড্যাম ?"

"হ্যাঁ ; তিনিই রূপরেখার মুখে এই বিশাল বাঁধ বেঁধে—সব জল আট্‌কে ফেল্‌বেন ঠিক ক'রেছেন। বিজ্ঞানের তরোয়ালে ভগবানের মুণ্ডুপাত করার চেষ্টা"—

ব'লে সাহেব হাসলেন ন'ব্‌নেও শুনে হেসে উঠ্‌লো। সাহেব ব'ল্লেন—এই যে জমিগুলো দেখ্‌ছো—এক এক থানা সোণার চাপ—হীরের খনি। কিন্তু যদি সময়ে বাদল না বর্ষে—ফসল ষোল আনা জন্মে না।

ন'ব্‌নে ব'লে উঠ্‌লো—"তাই বুঝি পাকা বাঁধ দিয়ে জল আট্‌কে ফেলে সেই বাঁধা জল ক্ষেতে ক্ষেতে বইয়ে দিয়ে—বৃষ্টির জলের কাজ্‌ ক'রবেন ?"

"হ্যাঁ—ঠিক ধ'রেছ বয় ; শুধু তাই নয়—তা'পর এখানে পাট আর কাপড়ের কল খুলে—প্রকাণ্ড ব্যবসা ফাঁদ্‌বেন মনস্থ ক'রেছেন। কল সব চল্‌বে বিদ্যুতে। জল থেকে বিদ্যুৎ চ'মকিয়ে তুল্‌বেন—বয় !"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লো—"ওঃ হাইড্রোটারবাইন !"

"হ্যাঁ হ্যাঁ"—ব'লে সাহেব ন'ব্‌নের মুখের কাছে মুখ নিলেন—চুপি চুপি কথা ব'ল্‌বেন—চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে যদি কেউ শুনে ফেলে। অথচ তার আশে পাশে কতকগুলো কুলীদের ছেলে ছাড়া আর লোক ছিল না। তারা এসেছিল হাওয়ার কল দেখ্‌তে। সাহেব ব'ল্লেন—"আমিও এই ফাঁকে একটা দাঁ মারবার চেষ্টায় আছি বয়, ড্যামটা ঠিকে নিয়েছি—কনট্রাকটারের ব্যবসায় দেখি কি হয়। সেয়ার বেচে হাওয়াগাড়ী ক'রেছি"—

ন'ব্‌নে হেসে ব'ল্ল—"কনট্রাকটারি ক'রে বুঝি রাজ্য কিন্‌বেন ?"

দু'জনে মিলে শুধুই খানিকটা হাস্‌লো। তা'পর সাহেব ফিতে নিয়ে নানান জায়গায় কি কি সব মেপে জুখে,—পকেট থেকে নক্সা বার ক'রে নানা রকম রঙিন পেন্সিলের দাগ দিয়ে সব মার্কা ক'রে নিলেন। ন'ব্‌নে চারিদিক দেখে—ব'ল্‌লো—"ঠিক হ'বে ?

"হ্যাঁ ঠিক হবে বয়।"

ব'লে আর এক প্রস্থ হাসি হো হো ক'রে হেসে আবার দুজনে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। বাড়ীতে ফিরে এসে পেট পুরে খেয়ে দু'জনেই বেহুঁসে ঘুমোলেন।—নঁ'ব্‌নে পরের দিন বেলা আটটার সময় উঠ্‌লো।

তিন।

আরো মাস দেড়েক ন'ব্‌নেদের নবাবী জীবন টেক্কা মেরে কেটে গেল। সাহেব মোম ঘ'ষে পালিস করা কাগজের ওপর কি সব নক্সা এঁকে এঁকে কালি কাগজে নানা রকমের হিসাব পত্র ক'ষে নামিয়ে রাতের পর রাত জাগলেন আর নব্‌নে ইজেলের ক্যানভাস্ এঁটে কার যেন একখানি মুখ এঁকে তুলে তার রাঙা ঠোঁটের পলাস পাঁপড়িটার নীচে, কোণায় বাঁ দিকে একটী তিলের দানা—এই তিনমাস ধ'রে অাঁক্‌লো। সাহেব একদিন জিজ্ঞেষ ক'র্‌লেন—"কার এ চেহারা?"

ন'ব নে মুগ্ধের মতন জবাব দিল—"আমার প্রিয়ার।"

"কোথায় সে আছে?—"

"ব'ল্‌বো না!"

সাহেব আর কিছু না ব'লে নিজের কাজে চ'লে গেলেন। ন'ব্‌নের মন-মাথা দু'টোই হঠাৎ কেমন ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো,—ছবি অাঁকা আর ভাল লাগ্‌লো না। সেই ছবির তন্বঙ্গীর রূপকথা বুঝি বিরহি তার হিয়ার ভেতর অনেক কালের হারানো স্মৃতির হিন্দোলায় দোলা দিয়ে চ'লে গেল। ন'ব্‌নে পাঞ্জাবীটা টেনে এনে গায় দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প'ল। হাঁটতে হাঁটতে মিউনিসিপাল মার্কেটে এসে একযোড়া ম্যাগনোলিয়া গ্রাঁদিফ্লোরা কিনে মনে মনে চাল্‌তে ফুলের সঙ্গে তার রূপ আর আকারের তুলনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আবার বাড়ীর দিকে ফির্‌ছিল।

হঠাৎ পাশ দিয়ে সাঁ ক'রে একখানা মোটার ছুটে বেরিয়ে গেল। চকিতে দেখে ন'ব্‌নের প্রাণটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো। গাড়ীর ভেতর দুজন যাত্রী। একটী তরুণী। ফিকে লাল জবাফুলের রঙের সাড়ী একখানি সুন্দরী প'রেছিল—ড্রেস ক'রে। উদ্‌লো মুখ। সাহেবে বাড়ীর কাটা ব্লাউজের ওপর দিকটায় বুকের কাছে চওড়া নেটের লেস দে'য়া—তরুণীর যৌবন বে-আবরু ক'রা সে নগ্ন রূপ তার নিলাজ মনেরই বুঝি খবর স্পষ্ট ক'রে ব'লে যাচ্ছিল। পাশে ব'সেছিল—একটী তরুণ বাবু। গোঁপের ডগা কসম্যাটিক দিয়ে পাকানো। ঝাঁকালো

বাবুয়ানা জামা কাপড়। খা ক'রে ন'ব্নে এটা দেখে নিলে। চকিতে সে যেন দুজনকেই চিন্লে। কিন্তু ভাব্লে—"অ্যা—তাই কি?" খোঁজ নিতে হ'চ্ছে। ব্যাপারটা জান্তে হবে।" মোটারখানা তাদের সাম্নে এগিয়ে গেলে ন'ব্নে তার পেছনে টিনের বোর্ডে সাদা রঙে লেখা কর্পোরেসনের নম্বরটা দেখে—ভাল ক'রে ভেবে মনে ক'রে রাখ্লে।

বাড়ী ফিরে এসে সে রাত্তিরে ন'ব্নের গল্প লেখা কি ছবি আঁকা কিছুই হ'লো না—ঘুমও এল না। ভোরে উঠেই চা খাওয়া সেরে—সাহেবকে কিছু না ব'লেই হাওয়াগাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কর্পোরেশন আফিসে খোঁজ নিয়ে—আগের দিন সন্ধ্যার সেই মোটরগাড়ীর মালীক কে "গ্যারেজ" কোথায় সব জেনে নিয়ে সেইখানে গিয়ে পেঁাছোলো।

একজন বাঙালী সে গাড়ীর সোফার। ন'ব্নে তার হাতে চারটি টাকা দিয়ে ব'ল্ল—"আমার একটা জরুরী খবর জান্বার আছে—আপনার কাছে, যদি বলেন বিশেষ বাধিত হব।"

"বলুন।"

"কাল পাঁচটা বাজ্তে পাঁচ মিনিট বাঁকী থাক্তে আপনি কোথায় ছিলেন?"

"ভাড়ায় যাচ্ছিলাম—বোধহয় তখন মিউনিসিপাল মার্কেটের কাছাকাছি ছিলাম।"

"গাড়ীতে আরোহী ছিলেন একটী সুন্দরী মেয়ে—আর একজন বাবু?"

"হঁ্যা—মেয়েটী বোধহয় বাবুটীর—"

"সম্বন্ধটা বিশেষ পবিত্র ব'লে আপনার কাছে মনে হয় নি? না?"

"আজ্ঞে হঁ্যা।"

"তাঁরা কোথায় গাড়ী নিয়েছিলেন?"

"Standএ।"

"কোথায় পৌছে দিয়েছিলেন—তাঁদের ঠিকানা মনে আছে?"

"————লেনে——১৮ নং বাড়ীতে।"

"বহু ধন্যবাদ আর আমার কিছু জিগ্গেষ করবার নেই—অন্যায় কষ্ট দিলাম কিছু মনে ক'রবেন না।"

"না—কিছু না—আপনি তো তার মজুরীও আমায় দিয়েছেন। কিন্তু কথাটা হ'চ্ছে মেয়েটী কি বেরিয়ে এসেছে ?"

"ঠিক জানি নে তবে আমার একটু সন্দেহ হ'য়েছে ;—আপনার কিছু ভাবনা বা ভয় নেই কোনো কেস বা সেই রকম গুরুতর কিছু হয় নি।—আমি নিজের খেয়ালে খোঁজ ক'রছি—তাঁরা আমার কেউ আত্মীয় বা আপনার নন্।"

ন'ব্নে বেরিয়ে———লেনের কাছে গাড়ী ছুটিয়ে এসে গলির ভেতর বরাবর ঢুকে প'ল। ১৮ নং বাড়ীর সাম্নে এসে ব্রেক চেপে কার থামিয়ে দিলে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে—বাড়ীতে তো লোক নেই কেউ। বাইরে প্লাকার্ডে লেখা র'য়েছে "To let"—এই বাড়ী ভাড়া দে'য়া যাবে। কিন্তু কোথায় কার কাছে খোঁজ ক'র্তে হবে কিছুই ঠিকানা নেই। ন'বনে কল বন্দ ক'রে মোটার থেকে নেবে পাশের বাড়ীতে একজনকে জিগ্গেষ ক'র্লে—"মশায় ব'ল্তে পারেন এ বাড়ীর খোঁজ কোথায় নিতে হবে ? কার বাড়ী কে ভাড়া বন্দোবস্ত ক'র্বেন ?"

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য্য মতন হ'য়ে ব'ল্লেন—"না মশাই সে সব আমি কিছুই জানিনে আজ দশ বছর হ'লতো দেখ্‌ছি ওবাড়ী To let ?"

ন'ব্নে অবাক হ'য়ে জিগ্গেষ ক'র্লে—"সে কি মশাই ?"

"ওই রকমই মশাই ওর কিছুই খোঁজ পাত্তা পাবেন না—অন্য বাড়ীর চেষ্টা দেখুন।"

ন'বনে ভাব্‌লে একি অদ্ভুত ব্যাপার ? সোফার কি তা হলে আমায় ভুল খবর দিলে ? না। তাই বা সে দেবে কেন ? তার লাভ কি তাতে ?

ভাবতে ভাবতে আবার গাড়ীর ইঞ্জিনে Start দিয়ে বেরিয়ে প'ল গলি থেকে। বরাবর বাড়ী পৌঁছে শ্রান্ত দেহে ইজি চেয়ারের ওপর শুয়ে প'ল।

অন্যমনস্কে স্নান খাওয়া সেরে ন'ব্নে ড্রইংরূমে খাটের ওপর গড়িয়ে প'ড়ে সেই মোটরগাড়ী আর ঐ বাড়ীর কথা ভাব্‌ছে। সাহেব আগে থেকেই ন'ব্নের এই কেমন সচিন্ত, উন্মনা ভাবটা লক্ষ্য ক'রেছিল্লেন। এখন ঘরে ঢুকেই জিগ্গেষ ক'র্লেন—"বয়, কি একটা ভাবনায় যেন হঠাৎ তুমি চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছ মনে হ'চ্ছে। অল্প গুরুতর ! ব'লে বুঝ্‌তে পাচ্ছি—অবিশ্যি, কিন্তু গুরুতর ! বলতো কি ?"

নব্নে ব'ল্লো———গলির ১৮ নং বাড়ীর কথা।

সাহেবের সেই বুক ফাটানো, ঘর-কাটানো কানে-তালা-লাগানো হাসি। হাসি শেস হ'লে ব'ল্লেন—"আজ রাত্তিরে খবর হবে। কিছু সমস্যা নয় সেটা একটু হয়রাণি এই যা।"

বিকেলে সাহেব মোল্লাভায়াকে ডেকে পাঠালেন। সে আস্‌লো আর ত'র সঙ্গে একটা ফুরফুরে কাপড়-জামাপরা ফুলেল বাবু এসে সাহেবকে নমস্কার দিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কি কি কথাবার্ত্তা ক'রে সাহেব কুড়ীটী টাকা দিয়ে বাবুটীকে বিদায় দিলেন। মোল্লাভায়াও নমস্কার জানিয়ে চ'লে গেল।

রাত্তির এগারটার সময় সাহেব আর ন'ব্‌নে দুজনে রাস্তায় বেরোলেন। সেজেছেন দুটীতেই "ফুলবাবু" যাকে বলে তাই। কোঁচানো কাপড় জামা, চাদর। হাওয়ায় হাওয়ায় চাদরের সুগন্ধ ভেসে উঠ্‌ছে। মাথায় টেরি; গোঁপ বাগানো। দামী লপেটা পায়। হাতে হীরে বসানো আংটী, সৌখীন ছড়ি। গলায় বেলফুলের গ'ড়ে মালা তিন চার ছড়া ক'রে। সাহেবকে দেখে ন'ব্‌নে হেসে ব'ল্‌লো "এ যে "বুড়ো শালিকী " সাজ হ'ল।"

বুড়ো হো হো হো হেসে উঠে বল্‌লেন—"কি আর করি বল্ তেরে জন্যে আমার এও সাজ্‌তে হ'ল।"

দুজনে বরাবর গিয়ে মুক্তারামবাবুর রোএ মন্দিরটা সাম্‌নে ক'রে একবার দাঁড়ালেন। বুড়ো ন'ব্‌নের হাত ধরে টেনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লেন—"কি দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

"দু'জন মেয়ে মানুষ মনে হ'চ্ছে।"

"হ্যাঁ",—আচ্ছা চল ওদের পেছু পেছু।"

"সে কি?"

"চলত।"

অনেক দূর দুজন স্ত্রীলোকের পেছনে পেছনে গিয়ে আর একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে গলির ভেতরে দেখিয়ে বুড়ো জিগ্‌গেষ ক'র্‌লেন?—"এবার কি দেখ্‌ছ?"

"এবারও তো মেয়ে মানুষই মনে হ'চ্ছে কিন্তু একই রকম সাজ যে!"

"একই রকম সাজ! আবার চল—।"

ন'ব্‌নে আর বুড়ো ঐ দুজন মেয়ে মানুষের পেছু নিলেন আগের দুজন গিয়ে এদের সঙ্গে মিলেছিল। কত রাস্তা ঘুরে কত গলি পেরিয়ে এরা চ'ল্‌লো—ন'ব্‌নে আর সাহেবও আছেন

ওদের পেছু পেছু। কিন্তু ওরা কিছু টের পাচ্ছে না। আরো খানিকটা গিয়ে আরো দুজন—ঐ একই রকম সাজ।

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"কি আশ্চর্য্য এ সকলেরই যে বিধবার বেশ পরা।"

সাহেব ব'ল্লেন—'কিন্তু এর একটীও বিধবা নয়—আর নেহাৎ ছোট ঘরেরও মেয়ে নয়—ওরা। প্রত্যেকে সুন্দরী যুবতী। বেরিয়েছে নৈশ অভিসারে।"

"অ্যাঁ"—ব'লে ন'ব্‌নে যেন চ'ম্‌কে উঠ্‌লো।

"হ্যাঁ" ব'লে সাহেব ডাক্‌লেন—"চ'লে এস—আর একটু।"

ওদের পেছনে পেছনে—আর একটু গিয়ে—ন'ব্‌নে আর সাহেব—লেনের মোড়ে পৌছোলেন। স্ত্রীলোকেরা গলির ভেতর ঢুকে প'ল। সাহেব দূরে দেখিয়ে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লেন—"এবার কি দেখ্‌ছ?"

"একজন বুড়ো গোছ বিধবা।"

"হ্যাঁ;—ওকেই আমার দরকার—এরা সব ১৮ নং বাড়ীতে ঢুক্‌বে। ও দরজা বন্ধ ক'রে দেবার আগেই আমাদের ১৮ নং এর কাছাকাছি পৌছোনো চাই।"

ব'লে সাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন—ন'ব্‌নেকে একটু পেছনে ফেলে। ১৮ নং বাড়ীর দোর—খাঁ ক'রে খুলে গেল। স্ত্রীলোকেরা সব কটী গুটী গুটী ভেতরে ঢুকে গেল। বুড়ো মোটা বিধবাটী দরজা বন্ধ ক'র্‌তে যাবে—এমন সময় সাহেব তাকে ইসারা ক'র্‌তেই সে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে—একটু পরেই যেন কোথায় দিয়ে বেরিয়ে সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ালো। সাহেব তার হাতে দশটা টাকা দিলেন।

বুড়ী হেসে ব'ল্লেন—"কি গো—ভাল মানুষের ছেলে—খবর কি?"

"মাসি—বড্ড বেজায় রকম। একজনকে দেখেছিল আমার এই ছোক্‌রা—ইয়ার,—খোঁজ পেয়েছি—এই বাড়ীতেই সে আসে—তাকে চাই—পারতো প'চিশ টাকা।"

বুড়ী বাঁধানো তার মিসি ঘষা দাঁত বার ক'রে হেসে ব'ল্‌লে—"কি রকম দেখ্‌তে?"

সাহেব ন'ব্‌নেকে ডেকে ব'ল্‌লেন—"বলত হে কি রকম চেহারা।"

ন'ব্‌নে হুবহু মুখ, চোখ, ভঙ্গী, গড়ন সব ব'ল্‌লে। বুড়ী হেসে ব'ল্ল—"ওমা! সোজা কথা তো—এগো! ওর জন্যে—এত? আজই দেখা চাই?"

"দেরী কি আর চলে—তুমিই বলত ?"

"আচ্ছা হবে বোধহয় ; একলাই আছে সে ! কিন্তু মনটা হঠাৎ ট'কে গেছে—রূপসীর, পুরুষ জাতের ওপর। ফুসলিয়ে এনেছিল যে ছোঁড়া সে হতভাগা—ফাঁক পেয়ে টাকা কড়ি নিয়ে স'টকে প'ড়েছে।"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"তুমি ব'লো একদিন যে তোমার জন্যে গাঁ ছেড়েছিল—আজও সে তোমার জন্যে—বুক পেতে ব্যথা নেবে।"

"অ্যাঁ—আগেকারি চেনা শোনা তা হ'লে ? দাঁড়াও একটুখানি বাবা—আমি আস্‌ছি।"

বুড়ী ধাঁ ক'রে ভেতরে গিয়ে চট্ ক'রেই আবার ফিরে এসে ব'ল্লে—"হাসি বেরিয়েছে গো মুখে—অবাক চোখে আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো যেন—খবর শুনে, এস।"

বুড়ো ব'ল্‌লেন—"এক্‌লাই যাও।"

তা'পর কানের কাছে মুখ নিয়ে ব'ল্লেন—"রিভালবার পোরা আছে তো—ফতুয়ার পকেটে ?"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"হ্যাঁ।"

সাহেব ব'ল্লেন—"কিছু ভয় নেই। মাসি আছে—আর কি ?"

"কিচ্ছু না বাবা—তুমি এস।" ব'লে বুড়ী ন'ব্‌নেকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌লো—সাহেব তার হাতে তিনখানা দশ টাকার নোট দিয়ে গলির একটা বাড়ীর রোয়াকে মাতালের মত কাত হ'য়ে শুয়ে প'ড়লেন—যেন হঠাৎ কারো কোনো সন্দেহ হ'লে মাতাল ব'লেই এড়িয়ে যেতে পারেন।

মিনিট ত্রিশ পরে ন'ব্‌নে মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। সাহেব উঠে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লেন—"কি ?"

"একখানা গাড়ী পেলে হ'ত—কিন্তু বাড়ী নিয়ে কোথায় রাখ্‌বো ?"

"নিয়ে যাওয়া দরকার ?"

"হ্যাঁ—সব কথা পরে ব'ল্‌বো।"

"চল আমি ব্যবস্থা কচ্ছি—এই গলির বাইরে আস্তাবল আছে বেশী ভাড়া দিলেই গাড়ী পাওয়া যাবে।"

তিনজনে তাড়াতাড়ি গলি ছেড়ে বেরিয়ে এসে—আস্তাবলের কাছে দাঁড়ালেন। গাড়ী পাওয়া গেল। বুড়ীটাকে আরো কুড়ী টাকা ন'ব্নে দিয়ে এসেছিল সে আর কোনো গোলমাল ক'র্লে না। ন'ব্নেরা বাড়ী ফির্লো যখন—তখন রা'ত দেড়টা বেজে গে'ছে। নীচের একটা ঘরে মেয়েটীর থাক্বার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে সাহেব আর ন'ব্নে তাঁদের শোবার ঘরে এসে—'অঘোরে' ঘুমিয়ে প'লেন। তাঁদের নিশীথ রাতের শিকার যাত্রা সফল হ'য়েছিল—হু'জনে তাই নিশ্চিন্ত।

চার।

ঘুম ভেঙে উঠে, চোখ মুখ ধুয়ে ন'ব্নে নীচে গেল। ঘরে ঢুকে দেখে কিরণ বিছানার ওপর ব'সে র'য়েছে। চোখ দুটো তার রক্তের মত লাল—রাত্তিরে বোধ হয় জেগে ব'সে শুধু কেঁদেছে।

ন'ব্নে ব'ল্লে—"কিরণ, ঘুমোস্ নি? সারারাত ব'সে আছিস?"

"হ্যা।"

"আশ্চর্য্যি যা হোক তুই!"

কিরণ উত্তরে ন'ব্নের মুখের পানে একদৃষ্টি চেয়ে নীরব রইল।

ন'ব্নে আবার জিগ্গেস কর্লো—"কি ভাব্ছিস কিরণ?"

সে কথার কিছু জবাব না দিয়ে—একটুখানি শুক্নো, রূঢ় হাসি হেসে কিরণ জিগ্গেষ কল্লে—"তুমি সেই—নবু?"

"হ্যা—সে-ই! কেন? তোর কি মনে হ'চ্ছে—আমি খানিকটা বদ্লে গেছি?"

"একটুখানি কিন্তু আমি একটুও বদলাই নি!—যাক সে কথা; কিন্তু তুমি আমায় কি স্বার্থে উদ্ধার ক'রে আন্লে—নবনি?

"নিঃস্বার্থে।"

"তুমি কি নির্ব্বোধ?"

"হয় তো।"

"হয় তো—নয় নিশ্চয়! পুরুষ তুমি, তরুণ, তোমার বয়স;—আর আমি—?"

"নারী এবং সুন্দরী "কিরণের মুখের পানে না তাকিয়েই—ন'ব্‌নে জবাব ক'র্‌লো।

কিরণ হঠাৎ একটুখানি উত্তেজিত হ'য়ে ব'ল্‌লো—"তা বোঝ—সুন্দরী আমি—সে জ্ঞান আছে—ষোল আনা—আর তোমার মনে কোনো স্বার্থের চিন্তা নেই—? মিথ্যাবাদী!"

"মিথ্যাবাদী নয় ব'লেই এ কথা ব'ল্‌তে পার্‌লাম।"

"আচ্ছা আমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না তোমার?"

"করে হয় তো।"

"ভাল লাগে না?" ব'লে কিরণ চোখের শাণিত দৃষ্টিখানা মনোহর ভঙ্গিমায় বেঁকিয়ে নব্‌নের মুখের পানে চাইল।

ন'ব্‌নে জবাব দিল—"খারাপ লাগে না অন্ততঃ।

"কলঙ্কিনী ব'লে ঘেন্না করে না?"

"না।"

কিরণ উঠে গিয়ে ন'ব্‌নের হাতখানা চেপে ধ'রে--তাকে টেনে নিয়ে এসে ব'ল্ল—"কাছে এসে ব'স নবনি!"

ন'ব্‌নে কিছু আপত্তি ক'র্‌লে না—পাশে বসিয়ে কিরণ ব'ল্‌লে—"এই যে তোমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম—আমার স্পর্শে তোমার সারা স্নায়ুজালে একটা আবেশ রি রি ক'রে এলো না?"

"খুব এল!"

"তবে? কেন তবে নিজেকে এ শাসন নবনি?"

"এই শাসনের ভেতর আমি তোর স্পর্শ পাওয়ার চেয়েও বেশী আনন্দ ভোগ কার।"

কিরণ ন'ব্‌নের মুখের পানে এক পল অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বল্লো—"যদি এই স্পর্শে আমি বিদ্যুৎ চকিত ক'রে তুলি?" কিরণ ন'ব্‌নের দুখান হাত আরো জোরে আঁকড়িয়ে ধ'রে আবার ব'ল্লো—"যদি এত কাছে, বুকের পাশাপাশি পেয়ে তোমাকে প্রাণপণ জোরে জ'ড়িয়ে ধ'রে ঐ ঠোঁট দুখানা চুমোয় চুমোয় ছেয়ে দি?" ব'লে কিরণ কি যেন একটা অব্যক্ত অনুভবে পুলকিত হয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠ্‌লো। তাচ্ছিল্যের হাসি একটু হেসে ন'ব্‌নে বল্লো—"তুই কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিস?"

"তা তুমি বোঝ না—নবনি? প্রাণ কি চায়—তা—কি তুমি জান না? কি উদ্দাম জোয়ার বুকের ভেতর থামাতে না পেরেই ছুটে এসেছি!"

"এ ছোটার মানে কি?"

"প্রবৃত্তির মুখে ক্ষেপা ঘোড়া ছেড়ে দে'য়া। রাস-আলগা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাব তোমাদের পুরোনো, অথর্ব্ব, সমাজের মুঞ্জ পাঁজরের হাড় কখানা চুরিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলে তবে এ উন্মাদ-প্রবৃত্তি শান্ত হবে।"

"কিন্তু তাতে শান্তি পাবি ত?"

"শান্তি চাইনে-ত! এই অশান্তিই যে আমার আনন্দ! তোমরা সমাজ গ'ড়ে তার চূড়ার ওপর, কঠোর অনুশাসন-লেখা জয়ধ্বজা উড়িয়ে রেখেছ। তাকে উপড়ে ফেল্‌তে চাই! আমার এই অন্ধ ছোটা—সেই সমাজের বিরুদ্ধে—জনকত মিথ্যে নীতি বাদী,—তোমাদের মত চরিত্র-বানের বিরুদ্ধে জয় যাত্রা। নীতি কেবল মেয়ে মানুষের বেলায়—পুরুষ পাঁচটা বিয়ে করুক সমাজ বাজনা বাজিয়ে তাকে বরণ ক'রে নেবে—আর মেয়ে মানুষ?—সাবধান চোখ তুলে পুরুষের মুখের পানে চাওয়াও মানা! এমন সমাজের একচোখো বিধান আর আইন জোর ক'রে ভেঙে ফেলাই আনন্দ! এই যে আমার ব্যগ্র দান তুমি বার বার অবহেলায় ফিরিয়ে দিচ্ছ—কেন—এ উপেক্ষা? আমার পূজারি প্রাণের এ পবিত্র নৈবেদ্যও তোমার নীতির বিচারে কলুষিত পাপ-না?"

"পাপ ব'লে নয় তবে এ দান আমি নিতে পারি নে!"

"অন্যায় ব'লে? আবার নীতির নিক্তিতে মাপ ক'র্‌ছ বুঝি চরিত্রবান—সামাজিক? অন্যায়? কি অন্যায়? কেন অন্যায়?—আমি বিধবা ব'লে? তোমরা কি তবে স্বভাবকে পিশে, চেপে তার দমবন্ধ ক'রে মেরে ফেল্‌তে চাও? যৌবনকে, বয়সকে, তার কাজ ভুলিয়ে দিতে চাও? বাঃ বাহোবা! নিজেরা ভোগ ক'র্‌বে—আঠারো আনা আর আমাদের বেলা যোগের নিয়ম বেঁধে দিয়ে—চোখ-বুঁজে স'য়ে দাঁড়াবে? কেন? কি অধিকার তোমাদের আছে আর একজনের মনকে, মর্ম্মকে নির্ম্মমের মতন এমন করে ছেঁচে দেবার?"

"কোনো অধিকার নেই, তার বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহী হ'য়ে দাঁড়াও—তাতে আমার আপত্তি তো নেই—বরং মত আছে। আমি তাতে তোমার সাহায্য ক'র্‌তেই রাজি আছি। সমাজকে আমিও মানি না—কিন্তু তার চোখের আড়ালে চুরি করাকে আমি ঘৃণা করি।"

"তার মানে ?"

"তার মানে—তুমি সমাজের বিরুদ্ধে রাজপথে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ঘোষণা কর। তুমি বিয়ে কর। লালসার সহমার পরিতৃপ্তির জন্য নিষেধের বিদ্রোহ ব্যভিচার,—পাপ। যদি জীবন প্রতিষ্ঠা ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'র্‌তে পার—যদি সাহস থাকে—এগিয়ে এস আমি তোমার পথ দেখিয়ে দোব।"

"তার সন্ধানেই ত বেরিয়েছিলাম—কিন্তু—তোমাদের পুরুষ জাত—কোনো বিশ্বাস নেই এদের—এরা ডাকাত এরা সয়তান !"

"পিশাচকে বন্ধু ব'লে ভুল করায়—তোমার এ ক্ষতি হ'য়েছে—পশুকে মানুষ মনে ক'রে—তুমি ঠ'কেছ।"

কিরণ খাঁ ক'রে থেমে গিয়ে—ন'ব্‌নের মুখের পানে তাকিয়ে খানিকক্ষণ যেন কি ভাব্‌লো। ন'ব্‌নে সে নীরবতা ভাঙবার জন্যে কি যেন ব'ল্‌তে যাচ্ছিল—এর মধ্যে সাহেব এসে ঘরে ঢুকে ব'ল্‌লেন—"ওঁর হাত মুখ ধোয়া হ'য়েছে ?—বয় খাবার আন্‌ছে যে !"

কিরণ বুড়োকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। সাহেব ব'ল্লেন—"যাও মা,—ঐ বাথরুমে সব আছে মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

কিরণ যেন চ'ম্‌কে উঠ্‌লো ? এ কে বৃদ্ধ ? মা ব'লে আমায় ডাক্‌লেন ! কিরণ বিস্ময়ে চুপ। রাতের সেই বুড়ো ! তাঁর সে সৌম্য, গম্ভীর রূপ রাতে সে ভাল ক'রে চেয়ে দেখেনি। সকালে অনাবিল আলোকে সে মূর্ত্তি তার চোখে—শিব, সুন্দর ব'লে লাগ্‌লো। সে গলায় কাপড় নিয়ে বুড়োকে প্রণাম ক'র্‌লো।

বুড়ো দুই হাত দিয়ে তাকে ধ'রে তুলে—হাস্‌লেন—হো হো হো ! তা'পর ব'ল্‌লেন—"তোমার কোনো ভাবনা নেই মা,—আমি আছি—এ সব ছেলেরা আজ-কালকার বড় "মরালিষ্ট !"—আমি তা নই,—মেয়ে যদি পথ ভুলে গিয়েই থাকে—তাই ব'লে বাড়ী ফিরে এলে কি তাকে তাড়িয়ে দেবে ?—যা মা—মুখ টুকু ধো—আমার ক্ষিদে পেয়েছে—চা তৈরি।"

বুড়োর আবার সেই অট্ট হাস্য—তার শেষ নেই। কিরণ এক লহমায় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। সে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান সেরে ফিরে এল। সদ্য স্নাতা তার সুন্দরী মূর্ত্তির দিকে তাকি—বুড়ো ব'লে উঠ্লেন—"বড় সুন্দরী আমার মেয়ে যে!"

কিরণ মনে মনে কিন্তু ভাব্লো—অথচ এ—রূপে ঐ বয়াটে ছোক্রার অন্তরে বহ্নি জেলে দিতে পারলাম না। তবে? নেহাতই অকস্মাৎ কিরণের মনের মধ্যে একটা বিষম খট্কা খটাৎ ক'রে গিয়ে বাঝ্লো। সে ভাব্তে লাগ্লো—মানুষেরই মনে তবে কি এমন কিছু আছে যা দিয়ে—উদ্দাম উন্মাদ বাসনাটাকে বাগ মানিয়ে রাখা—অতি সহজ, সাধারণ কথা? এমনো একটা অজেয় অনুভব প্রাণের মরমী হ'য়ে জেগে উঠ্তে পারে—যার কাছে সব বাসনার উচ্ছৃঙ্খলতা মাথা হেঁট ক'রে আনে—যা দিয়ে নব-যৌবনেও যৌবন জয় করা যায়? এই যে আমার এমন রূপের অযাচিত দান হাতে পেয়েও আজ নাব্নে উপেক্ষায় তা তুচ্ছ ক'রে দাঁড়ালো—শাসন ক'রে মনকে তার ফিরিয়ে রাখ্তে পার্লো—এ শাসনটাই কি তবে সত্যি ক'রে একটা ভোগ? ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহী হ'য়ে মাথা তুলে উঠ্বে—আমি তার সঙ্গে লড়াই ক'রে—তাকে হটিয়ে দিয়ে ভোগেরই চরম সুখ, পরম সার্থকতা পাব—তা—কি সম্ভব? কিরণের মনে হ'ল—তা বুঝি পারে! তা পারে ব'লেই আজ ন'ব্নের এত অহঙ্কার—আর আমার এত অপমান—এতখানি অন্তর গ্লানি। এই প্রবৃত্তি জয়ের প্রাণপণ যুদ্ধই আজ আমাকেও আরম্ভ ক'র্তে হবে! গোড়ায় কিরণ ভেবেছিল সে কিছু খাবে না। এখন হঠাৎ একটা নতুন আনন্দে তার অন্তর মন ভ'রে উঠ্লো। সে সহজ, স্বচ্ছন্দ ভাবে খেয়ে—নিজের ঘরে চ'লে গেল। যাবার সময় ন'ব্নেকে ব'লে গেল—"এইবার একটু ঘুমোই গে।"

কিরণ চলে গেলে ন'ব্নে সাহেবের মুখের পানে তাকাতেই তিনি প্রশ্ন ক'র্লেন—"কি যেন জিগ্গেস ক'র্বে মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ—কালের সে বাড়ী আর ঐ উইডো-মিষ্ট্রি বিধবাদের ব্যাপারখানা কি?"

আর একবার হো হো হো ক'রে হেসে মন মাথা দুই পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বুড়ো বল্লেন—"ঐ বাড়ীটা হ'ল Empty house খালিবাড়ী। ও রকম খালিবাড়ী ক'ল্কাতার খারাপ প'ল্লীর দিকে অনেক জায়গায়ই আছে। ওসব বাড়ী For ever to let.—চিরদিনের জন্যেই—"ভাড়া দে'ওয়া যাবে"—বিজ্ঞাপন ওতে লটকানো থাকে—ভাড়াটে আর কেউ আসে

না। ঐ বুড়ীর "লিজ" নেয়া আছে বাড়ী। ঐ রকম এক একটা বুড়ী এক একটা বাড়ীর গোপন "লিজ-হোল্ডার!" ওদের দিনের বেলার ব্যবসা হ'লো—ফিরি করা। ছেঁড়া কাপড়ের বদল নিয়ে এনামেলের বাসন কাঁসার রেকাব, ফেরো এই সব 'বিক্রি' ক'রে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী। সুবিধে পেলেই তরুণী বউ, ঝিদের কানে কানে পাশব-লালসার পাপ-গুঞ্জরণ গুঞ্জন ক'রে ব'লে আসে। বাবু আছে সব ওদের হাতে তাঁরা আসেন গভীর-রাতে এখানে! তরুণী যারা স্বামীর আসার আশায় কত রাত্রি বিনিদ্র জেগে ব্যর্থ পুইয়ে পুইয়ে—জীবনে দাম্পত্য আনন্দের সুখে একেবারেই বঞ্চিতা হ'য়ে প'ড়েছে—তারাই আসে এ সব জায়গায় বেশী। স্বামী যান তাঁর "নৈশ বিহারে-কুস্থানে এঁরা আসেন এদিকে গোপন অভিসারে। ঐ বুড়ীকে কিছু কিছু দিয়ে হাতে রাখতে এদের বা ব্যয়। বুড়ীরা প্রথম প্রথম নিজেরাই গিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। শেষে ওরা আপ্‌নিই আসে ঠাকুর প্রণাম বা অম্‌নি একটা কিছু ছুতো ধ'রে। গাড়ী বা মোটরে যাওয়া তেমন নিরাপদ নয় কোচম্যান সোফাররা টের পায় চট্‌ ক'রে ধরা প'ড়ে যেতে পারে তাই হেঁটেই যায়। আর নিশীথ পথিকের হঠাৎ দৃষ্টি এড়াবার জন্যেই—বিধবার সাজে সেজে বেরোয়।"

ন'ব্‌নে শুনে ব'ল্ল—"এখানে বুঝি—কিরণই তা হ'লে একটা সত্যিকার বিধবা গিয়েছিল?"

সাহেবের কথা ব'ল্‌তে হ'লেই হাসিতে জোর বেঁধে নিতে হয়—সুতরাং তিনি প্রথম হেসে উঠে জবাব দিলেন—"বোধ হয়! তবে এ অভিসারিকাদের ভেতরেও যে বালিকা বা তরুণী-বিধবাও দু'একজন না থাকেন তা নয়!"

ন'ব্‌নে একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তা'পর ব'ল্লে—"কিন্তু এখন কিরণকে নিয়ে কি করা যায়?"

সাহেব ব'ল্লেন—"ব্যবস্থা ঠিক ক'রেছি—আমি ওকে নিয়ে কালই বেরোবো।"

"কোথায়?"

"তা পরে ব'ল্‌ছি—।"

পরের দিন সাহেব আবার সেই ছেঁড়া প্যাণ্টলুন, তালিমারা জুতো, ফুটো হ্যাট, কুঁচ্‌কে-যাওয়া কোট গায় দিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌লেন। কিরণ তাঁর সঙ্গে গেল। ন'ব্‌নে এখানে রইল—এ দো'মহলা "কোঠীর" মালিক।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হৃদয়হীন।

কোথাও নাই প্রিয়া, একটু ঠাঁই মোর সবারি স্নেহধারা রুদ্ধ
জনম যুগ হতে কেবলি কার সনে করেচি কেন যেন যুদ্ধ।
আজিকে বটে আমি হৃদয়হীন অতি, করুণাহারা মোর বক্ষ
তৃষিত মনে মোর আঘাত গুরুতর, ভুলায় বারে বারে লক্ষ্য।
পাইনি,—যার লাগি করেচি হাহাকার
মরুর মাঝখানে ফেলা এ আঁখি-ধার
করুণা নাই কারো আমার বেদনায় গো
আসেনি কোনোদিন মুছাতে আঁখি জল দেখাতে সান্ত্বনা সখ্য।
বৃথা এ দোষ হানো,—বৃথা এ অভিযোগ
কেন গো অকারণ অশ্রুতাপশোক,
ভেঙেচে বহুদিন আঁখির মায়ালোক গো
তুমি কী বুঝে নিবে আদিম যুগ হতে বিরহী আমি তব যক্ষ।

উথলে অনিবার বুকের পাতে মোর তৃষার সীমাহারা সিন্ধু
অতীত রেখে গেছে আবছা স্মৃতিটুকু করুণা নাহি তার বিন্দু।
দিনের কোণে কোণে রুদ্ধ হাহাকার পথের ধূলিতলে রিক্ত
উদাসী মন-ছোঁয়া সকল অভিমান নয়ন বারি অভিষিক্ত।
কোন্ সে মায়াবিনী জানি না কোন্‌দিন
মরুভূ মাঝখানে স্বপন করে লীন
আতুর ব্যথাহত দীপ্ত আলোহীন গো
আঁধারে ফেলে গেচে রুক্ষ বিষভরা নিশ্বাস্ দীনতায় রিক্ত।

করুণা করে নিক সে দিন মোরে প্রিয়া
স্মৃতির শ্মশানেতে আজিকে তাই নিয়া
চোখের মরীচিকা তোমারে সব দিয়া গো
আঘাত নিষ্ঠুর হানিয়া মোচ উঠি গানের তালে হই লিপ্ত।

বন্দে আলী।

অর্থের পরিমাণবাদ।

—:(*):—

অর্থের মূল্য ও জিনিষের দাম যে একই ঘটনার এপিঠ আর ওপিঠ তাহা দেখিয়াছি। (১) দ্রব্যের দাম বাড়িয়া গেলে যে অর্থের মূল্য কমিয়া যায়, এবং দাম কমিয়া গেলে অর্থের মূল্য বাড়িয়া যায়, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু অর্থের মূল্য বাড়ে কমে কেন?

অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেই উহার মূল্য কমে; আবার উহার পরিমাণ কমাইয়া দিলেই মূল্য বাড়ে! মনে করুন, ১০০টি পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা হইবে। এই কেনাবেচার কাজ চালাইবার জন্য সমাজে চল্‌তি অর্থের পরিমাণ যদি ১০০টি টাকা থাকে, তাহা হইলে এক টাকার মূল্য হইবে ১টি পণ্যদ্রব্য; অর্থাৎ প্রত্যেকটি পণ্যদ্রব্যের দাম এক টাকা। এখন চল্‌তি অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া যদি ২০০ টাকা করা যায়, তাহা হইলে একটি টাকার মূল্য হইবে আধখানা দ্রব্য; অর্থাৎ প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম পড়িবে ২৲ টাকা। কিন্তু অর্থের পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বদলে যে সব জিনিষ পাওয়া যায়, তাহাদের পরিমাণও যদি বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে অর্থের মূল্যের পরিবর্ত্তন সে রকম হয় না। আগের উদাহরণে সমাজে চল্‌তি অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া ১০০৲ হইতে যখন ২০০৲ হইল, তখন ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণও যদি বাড়িয়া ১০০ হইতে ২০০ হয়, তাহা হইলে, এক টাকার মূল্য একটি দ্রব্যই হইবে; অর্থাৎ প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম আগের মতো এক টাকাই থাকিবে। এই ক্ষেত্রে ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ অর্থের সঙ্গে ঠিক একই অনুপাতে বাড়িবার দরুণ অর্থের পরিমাণ বাড়া সত্বেও অর্থের

(১) পরিচারিকা শ্রাবণ ১৩৩২ 'অর্থের মূল্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মূল্যের, অথবা জিনিষপত্রের দামের কোনো নড়চড় হইল না। সেই জন্যই অর্থনীতিবিসারদগণ বলেন "আর সব অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন না হইয়া অর্থের পরিমাণ যদি ডবল বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য ঠিক অর্দ্ধেক হইবে ; অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম আগের চেয়ে ঠিক দ্বিগুণ বাড়িবে। তেমনি, টাকার পরিমাণ যদি অর্দ্ধেক হয়, এবং অন্যান্য অবস্থার যদি কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে অর্থের মূল্য ঠিক ডবল হইবে ; অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম আগের চেয়ে ঠিক অর্দ্ধেক কমিবে।" অর্থের মূল্য ঠিক উহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে বা কমে। অর্থের পরিমাণ যে হিসাবে বাড়ে, উহার মূল্য ঠিক সেই অনুপাতে কমে ; অথবা পণ্যদ্রব্যের দাম ঠিক সেই অনুপাতে বাড়ে। তেমনি অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে কমে উহার মূল্যও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়ে ; অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম ঠিক সেই হিসাবে কমে। এই সত্যকে অর্থনীতিবিসারদগণ 'অর্থের পরিমাণবাদ' বলিয়া থাকেন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রত্যেক জিনিষেরই তো মূল্য নির্ভর করে উহার টান ও জোগানের কষাকষির উপর। টানের চেয়ে যে কোনো জিনিষেরই জোগান্ বাড়িলে উহার মূল্য কমে ; এবং টানের তুলনায় জোগান্ কমিলে উহার মূল্য বাড়ে। তবে অর্থের বেলা কোনো বিশেষত্ব আছে কি ? হাঁ, অর্থের বেলা একটু বিশেষত্ব আছে। চিনির টান যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে উহার জোগান্ দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিলে চিনির মূল্য যে ঠিক অর্দ্ধেক হইবে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অর্দ্ধেক হইতে পারে, অর্দ্ধেকের কম বা বেশীও হইতে পারে। কিন্তু অর্থের মূল্যের পরিবর্ত্তন ঠিক উহার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাতে হয়।

অর্থের মূল্য কি, অর্থাৎ অর্থের কিনিবার ক্ষমতা কি রকম তাহা জানিতে হইলে সমাজে চল্‌তি অর্থের পরিমাণকে ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলেই জানা যাইবে। কাগজের অর্থ, হুণ্ডী, ঋণপত্র ইত্যাদি যাহা কিছু অর্থের কাজ চালায় সবই অর্থ বলিয়া ধরিতে হইবে। সমাজে চল্‌তি অর্থের পরিমাণ জানিতে হইলে আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। আমরা নিত্য দেখিতে পাই পণ্য দ্রব্যের শেষ বিক্রয় হইবার এবং বাজার হইতে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে একই অর্থ বহুবার হস্তান্তর হইয়া অনেক কেনা বেচার কাজ সম্পন্ন করে। একটা টাকার বদলে একবার কিছু কেনা অথবা বেচা হইলে ওই টাকাটা একবারের কাজ

করিল। কিন্তু ওই টাকাটা যদি দশজন লোকের হাত বদলাইয়া দশবারের কেনা বা বেচার সাহায্য করে তাহা হইলে উহা সমাজে ১০৲ দশ টাকার কাজ করিল বলিতে হইবে। সুতরাং কোন বৎসরে সমাজে কত অর্থ ব্যবসাতে খাটিয়াছে তাহা জানিতে হইলে কেবল অর্থের সংখ্যা জানিলে হইবে না; উহা কতবার হাতফের হইয়াছে তাহাও জানিতে হইবে। অর্থের মোট পরিমাণকে উহা বৎসরে কতবার হাতফের হইয়াছে তাহা দিয়া গুণ করিলেই ব্যবসাতে বৎসরে কত অর্থ খাটিয়াছে তাহার পরিমাণ জানা যায়। তেমনি বৎসরে কতটা পণ্যদ্রব্য অদলবদল হইয়াছে তাহার পরিমাণ জানিতে হইলেও পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই বহুবার ধরিতে হইবে। কারণ অনেক পণ্যদ্রব্যই নির্ম্মাতার হাত হইতে ভোক্তার ভোগে আসিবার মধ্যে ব্যবসাদার-দিগের লাভের লোভে বহুবার ক্রীতবিক্রীত হয়। এই বহুবার বিক্রীত দ্রব্যের সমষ্টি করিলে তবে বৎসরে কতটা দ্রব্য অদলবদল হইয়াছে তাহার পরিমাণ জানা যায়। এই দ্রব্য সমষ্টির সহিত বৎসরে ব্যয়িত অর্থের সম্বন্ধই ঐ সময়কার অর্থের মূল্য স্বরূপ। সুতরাং অর্থের কিনিবার

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{অর্থের সংখ্যা} \times \text{অর্থের হাতফের}}{\text{ক্রীত বিক্রীত দ্রব্যের সমষ্টি}}।$$

পূর্ব্বে অর্থের পরিমাণবাদ বলিতে যাইয়া বলিয়াছি "আর সব অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন না হইয়া," "অন্যান্য অবস্থার যদি কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটে" ইত্যাদি। এই 'আর সব অবস্থা' এবং 'অন্যান্য অবস্থাগুলি কি তাহা এখন পরিষ্কার করিয়া জানা দরকার। প্রথমতঃ উৎপাদক যে ভোগ্য বিনিময় না করিয়া নিজেই ভোগ করেন তাহা এই অর্থের পরিমাণবাদের হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে না। কেবল অর্থের সঙ্গে যাহা কিছু অদলবদল হয় তাহাই এই হিসাবে গণ্য। জিনিষের বদলে জিনিষের যে সোজাসুজি বিনিময় তাহাও বাদ দিতে হইবে। এই জিনিষের অদলবদলের পরিমাণ যদি একই রকম থাকে, নির্ম্মাতা তাঁহার নির্ম্মিত দ্রব্যের সম্ভোগও যদি ঠিক রাখেন, ক্রীতবিক্রীত দ্রব্য সমষ্টির যদি পরিবর্ত্তন না হয়, এবং অর্থের হাতফেরও যদি না বাড়ে কমে, তাহা হইলেই অর্থের পরিমাণের পরিবর্ত্তনে উহার মূল্যের বা কিনিবার ক্ষমতারও পূর্ব্বোক্ত ভাবে নড়চড় হয়। কিন্তু অর্থের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই সব 'অন্যান্য অবস্থার' কোন একটির বা বহুর অথবা সবগুলিরই যদি পরিবর্ত্তন হয়,

তাহা হইলে আর অর্থের পরিমাণবাদ খাটে না। সেই জন্যই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন আর সব অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া অর্থের পরিমাণ যদি ডবল বাড়িয়া যায় তাহা হইলে উহার মূল্য ঠিক অর্দ্ধেক হইবে; অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম আগের চেয়ে ঠিক দ্বিগুণ বাড়িবে। তেমনি, টাকার পরিমাণ যদি অর্দ্ধেক হয়, এবং অন্যান্য অবস্থার যদি কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে অর্থের মূল্য ঠিক ডবল হইবে; অর্থাৎ জিনিষ পত্রের দাম আগের চেয়ে ঠিক অর্দ্ধেক কমিবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

বৈষ্ণবের রসনা

—:*:—

আহা　রসিক আমার রসনা! তুই ঢাল্ রে মধুরস,
সদা　মিষ্টভাষে টানিস্ সবায় রাখ্‌তে আপন-বশ।
যেন　তোর বাণীতে থাকেনাক' মলিনতার কস্!

ওরে　ব্যথিতকে তুই সান্ত্বনা দিস্,—আনিস্ শোকের ক্ষয়,
জোরে　আশার ভাষা শুনাস্,—ভীতু হয় যেন নির্ভয়;
শুধু　ভালোবাসায় সব-মানুষের হৃদয় করিস্ জয়।

তোর　ব্যবহারে জানুক সবাই মোর যাহা বৈভব,
যেন　তোর মাঝারে সফল সে হয় কৃষ্ণনামোৎসব!
শুনে'　মানুষ যেন বলে আমায় পরম বৈষ্ণব।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

দীক্ষার দক্ষিণা।

(ক)

"গুড়ুম্—গুড়ুম্ মারণ-মন্ত্র-গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হতব্যক্তি মুহূর্ত্তেই মাটীর শরীরে মাটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মাটীর জগৎ হইতে বিদায়-গ্রহণ করিল। আততায়ী ধরা পড়িল। কাগজে কাগজে ছাপা হইয়া গেল—বড় বড় অক্ষরে এই খুনের কথা।

আততায়ী কলেজের ছাত্র। ভাল ছেলে বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সেইই যখন হত্যাকারী বলিয়া ধরা পড়িল—তখন তাহার বাড়ীর লোক হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের অধ্যাপকেরা পর্য্যন্ত সমান চমকাইয়া উঠিলেন—তাই ত এ কি!

আসামীর বিচার আরম্ভ হইল। সে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও চেষ্টাই করিল না। উকিল দিল না—একটিও কথা কহিল না। তাহার আত্মীয়স্বজন অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সবই বৃথা হইল। আসামী দায়রা-সোপর্দ্দ হইল।

দায়রার ঘটনাও ঠিক ঐ একরূপ। আত্মীয় স্বজনে আর কি করিবেন? হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছে। জেরা না হওয়ায় কোনও সাক্ষী সাক্ষ্যে গোলমাল করিল না। আসামীর ফাঁসির হুকুম হইল।

(খ)

একটা রহস্য! এমন ছেলে কেন এমন কাজ করিল। অনন্ত-সমস্যার জালে আবৃত। সকলেই রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য ব্যাকুল—কিন্তু কি করিবেন? আসামী কাট্-কবুল; কোনও কথা কহিবে না। অক্ষম উদ্বিগ্নতায় সকলেই অধীর হইয়া উঠিলেন।

কাল আসামীর ফাঁসি হইবে। সকালে একবার জেলার আসামীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন,—যদি সে কিছু বলে, এমনই মানুষের জানিবার বাসনা! কিন্তু সে কোনও কথাই কহিল না। বৈকালে তাহার দাদা আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিলেন। এ-কথা—

সে-কথা—নানা কথা হইল। শেষ মুহূর্ত্তে চোখের জলের ধারার সাথে সুর মিলিয়ে তার দাদার নাড়ী-ছেঁড়া প্রশ্ন-বাহির হইয়া আসিল—"কেন এ কাজ করলি ?"

"তুমিও"—গভীর ব্যথার আত্মনিবেদনের মতই বাহির হইল। উদ্যত রোদনকে সে সংযমের কশাঘাতে দাবাইয়া দিল। দাদার স্নেহের দৃষ্টি যেন তাহাকে ঘিরিয়া ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষার নিবেদন জানাইল—বলো !—বলো !—বলো !

সে পারিল না। ব্যথার রাগিণীর তার-কাটা সুরে সে আধ-বেসুরো আওয়াজে বলিল—"দাদা, তুমিও আজ আমায় ঐ একই প্রশ্ন করলে ?"

"হাঁ, আমিও"—তার দাদা বলিলেন।

সে জেলখানার রুদ্ধ প্রাচীরের পানে চাহিয়া ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কহিল—"তবে শোন"—

(গ)

"তোমরা ত দেখছ—আমি প্রকাশ রায়কে খুন করেছি। অতি সহজ কথা ! মদির-প্রেরণায়—রক্তলালসায় চিরদিনই একজন একজনকে খুন করে আসছে। এর মধ্যে কিছু নূতনত্ব নেই—কিছু বিচিত্রতা নেই। এ হল চিরন্তন সত্য !

কিন্তু জানো কি তোমরা—আমি আমার কাকে খুন করেছি। আমি খুন করেছি—আমার শিক্ষাদাতাকে—আমার দীক্ষাদাতাকে—আমার পথ-প্রদর্শককে। সে আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। জগতে বোধ হয় আমার চেয়ে তার আর প্রিয়পাত্র ছিল না ;—তবু আমি তাকেই হত্যা করেছি। একেই বলে প্রাক্তন।

তুমি বোধ হয় জানো—আমি যখন জামালপুরে পড়তাম—তখন সে সেখানকার শিক্ষক ছিল। এই ত্যাগী কৃতী শিষ্ট-শান্ত অধ্যাপকটিকে সকলেই একটু অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা করত। আমিও করতাম। তখন কে জানত—এই শান্তির কোলে মাথা লুকিয়ে রুদ্রের অগ্নি-দেবতা ঘুমিয়ে আছে। যে দিন সে-কথা বুঝতে পারলাম—সে দিন নিজেরও প্রাণের অনুভব করলাম—ঐ রুদ্রের প্রেরণা।

চোখে পড়ল—ত্যাগী অগ্নিমন্ত্রের ঋষিগণ একের পর একে আপনাকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে গোপনে আহুতি দিচ্ছেন। সে কি পবিত্র কি মধুর—কি মহিমাময় !

বালকের চোখ টাটিয়ে উঠ্‌ল। তখন আমার বয়স তের।

গুপ্ত-সমিতির মন্ত্রের দীক্ষা আমি তার কাছ থেকেই নিই, যখন নব-যৌবন মানুষকে নানান প্রলোভনে ভুলিয়ে রঙিনস্বপন দেখায়—তখন আমরা আর এক স্বপন দেখ্‌ছিলাম।

সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা করি নি'। কার্য্যাকার্য্যের অসঙ্গতির কথাও মনে আসে নি'। নিজের কতটুকু শক্তি!—তা' ভেবে দেখার অবসরও হয় নি। সব চেয়ে উন্মত্ততা—তাই নিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তির সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়েছি। কিন্তু তবু তখনও ছিল—মুক্তি পাগলদের চোখে রক্ত রঙের 'শেড্‌'-করা অপূর্ব্ব স্বপন।

পরে যা' ঘটেছে—তা' সকলেই জানেন। দলে দলে ফাঁসিতে ঝুল্‌ল—পালে পালে জেলে—দ্বীপান্তরে গেল—ঝাঁকে ঝাঁকে অন্তরীণ হ'ল। তার পর স্বপনের পরিসমাপ্তি—নিদ্রার পর জাগরণ।

(খ)

কিন্তু এই হ'ল মোটা কথা! হয় ত' এ প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেত—এর পরিণাম এই রকমই হ'ত। তবু এর মধ্যে আমাদের যে অপমান লুকিয়ে আছে—জাতির যে হীনতা এই দিক দিয়ে ফুটে উঠেছে—তা' যে কোন মতেই ভুল্‌তে পারছি নে'।

এই অনুষ্ঠান মাটী হ'ল—আমাদেরই নিজেদের ভীরুতার জন্য—আপনার জনের—দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতার দৌলতে—মরমীর মরমের অভাবে। মাটী হবার যা—মাটী হ'ক তা—তাতে আর দুঃখ কি—ক্ষোভ করবার কি আছে, কিন্তু কেন কোন্ পাপে—আমার দেবতাকেও হঠাৎ পিশাচে পরিণত করল—কিসে। সে দৃঢ়তা—সে নির্ভরতা আর তখন তার ছিল না। ক্রমে দুই একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে তাকে গল্প করতে—লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে দেখা গেল। পরে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল—সেইদিন—যেদিন আমরা তাকে দেখ্‌লাম—সাক্ষীর কাটগড়ায় উঠে রাজার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে।

ঠিক সময়ে মোকদ্দমা হ'ল—বিচার হ'ল—রায় বেরুল; প্রায় সকলেরই সাজা হ'য়ে গেল।

আমাকে সে বড়ই ভালবাসত। তাই আমার বিরুদ্ধে সে একটি কথাও বলে নি। ফলে আমিই কেবল খালাষ পেলাম।

ফিরে এলাম—হেসে খেলে বেড়াতে নয়—শতকরা নিরনব্বুই জন বাঙ্গালীর মত গতানুগতিক-ভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে নয়—জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেল্‌তে। আমি সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম—ওর রক্ত আমিই দেখ্‌ব। যারা আমাকে ঠিক চিন্‌ত না—আর আমাদের অতি-মাখামাখি লক্ষ্য করে এসেছে—তারা একটু' অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌ল। তবে দেখ্‌লাম—জন কতকের দৃষ্টি আমাকে অভিনন্দন কর্‌ল—আর তাদের চোখে মুখে প্রতিহিংসার আনন্দ ফুটে উঠ্‌ল।

সে দৃষ্টি কিন্তু আমাকে ছাড়্‌ল না। যেখানেই যাই—সে ছায়ার মত আমার অনুসরণ করে। আমার আর দেরি সহ্য হ'ল না। দৃষ্টির আঘাতে মরিয়া হয়ে উঠ্‌লাম।

বিশ্বাস-হন্তার শাস্তি—! অগ্নি-ফলক আমারই হাতে গর্জ্জে উঠ্‌ল। মুহূর্ত্তেই সে মাটী নিল। একবার করুণ-নেত্রে আমার পানে চাইল। তার পর মরণাহতের বুক ভেদ করে যেন বার হ'ল—"তুমি ?"

আমি বল্‌লাম—"হাঁ, তুমিই আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলে। আজ এতদিনে তার দক্ষিণান্ত হ'ল। ভয় নেই শীঘ্রই দু'জনে গিয়ে পরপারে মিল্‌ছি। সেখানে জীবন্ত জগতের বাস্তব কিছু থাক্‌বে। মানুষের যত কিছু ভুল ত্রুটি সব সংশোধিত হ'য়ে যাবে। পালাতে পার্‌তাম—কিন্তু মন সর্‌ল না। ধরা পড়্‌লাম। তার পর ত' সবই—জানো।"

(কবর্গ শেষ)

আসামী চুপ করিল। দাদার দুই কপোল বহিয়া আঁখি-জল অবিরল ধারায় জেলখানার শুষ্ক ভূমি ভিজাইয়া দিল। জেলার মুখ ফিরাইয়া রুমালে চক্ষু মুছিলেন।

আত্মসম্বরণ করিয়া যখন তাঁহারা আসামীর পানে চাহিলেন—দেখিলেন—সে বদন—প্রশান্ত—নির্ব্বিকার। বুঝিতে পারিলেন না—কাল কি এই লোকই ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দেবে!

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

মন।

—*—

মন বল্‌ছিল—'ওহে মানুষ আমার মত নিয়ে কাজ করাটা তুমি আর দরকার বলেই মনে কর না। আমার অস্তিত্বটা তুমি দিনে দিনে ভুলে যাচ্ছ। আমার সুখ স্বাধীনতার ওপর তোমার আর মোটেই দৃষ্টি নেই। এর ফল যে বড় ভাল হবে তা মনে ক'রো না। কারণ—আমি যে দিনে দিনে এমন ভাবে মরচি এতে তোমার অহিত বই হিত হবে না কখনও।' দুত্তোর মন—মানুষ তার কথা আদবেই নিলে না। আপন গুমোরে গট্‌মট ক'রে চল্‌লো। ঘোড়দৌড়ের মাঠের দরজার কাছে এসে মানুষ দাঁড়াল!—মন বল্লে—'খবরদার মনুষ এই কাঠের দরজা পার হবার চেষ্টা করো না—ওখানে গোলমালের মধ্যে আমি এক তিলও পারবো না তিষ্ঠোতে!' এখানেও হ'ল মনের পরাজয়। সে পরাজয়ে মানুষ যে কত অবসন্ন হ'ল তা' সে বুঝ্‌লে—দিনের শেষে মাঠ থেকে বেরিয়ে।

তখন মানুষ কতকটা মনের বশীভূত হবার চেষ্টা করতে লাগল। সে বুঝলে জীবনের প্রকৃত আনন্দের সঙ্গে মনের আছে অনেকখানি সম্বন্ধ। তাকে বাদ দিয়ে চলা একান্তই অসম্ভব। এই ভেবে সে একেবারে মনের সম্পূর্ণ আমলেই এল। কিন্তু তাতেও বিপদ!—মন অমৃতের সন্ধানে ছোটে!—তাতে গা ভাসিয়ে দিলে সে অমৃতের পারাবারে ছুটে গিয়ে পড়ে। এ ভাবে মরাটাও প্রার্থনীয় নয়। মন বল্লে 'তুমি ওই মেয়েটাকে ভালবাসো।' বাস্‌লাম।—শত প্রতিকূল অবস্থা ভেদ করেও হয়ত তার কাছে প্রেম জ্ঞাপন করলাম,—বিনিময়ের—প্রার্থনা জানালাম। এর ফলে পেলাম নিদারুন নৈরাশ্য, তখন মানুষ জোড় যেয়ে বুঝ্‌লে—মানুষ আর মন দুটোকে আলাদা ক'রে রাখা যেতে পারে না। তাদের দুটো মিলিয়ে যেদিন সত্যিকারের এক হবে সেই দিন জগতের আনন্দ-সভায় যোগ দিতে সে তার প্রকৃত অধিকার পাবে। মানুষকে নিতে হবে মনের অনুমতি। মানুষ হবে মনের বাহন।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্যের কথা।

-:*:——

রবিরশ্মি আমাদের খাদ্য।
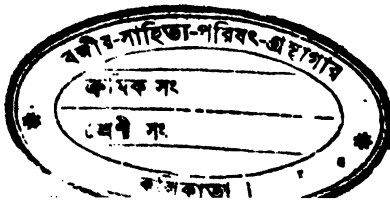
পৃথিবীতে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে যাহার জন্য আমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এবং যাহার অভাবে আমাদিগের রোগ হয়। প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় এই অতি বীর্য্যশালী বস্তু বর্ত্তমান আছে তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। ইহার অতি সামান্য পরিমাণ সেবনে মানুষের আকৃতি বড় হয় কিম্বা তাহার অভাবে বামন হইয়া পড়ে, এমন কি মানুষের জীবন ইহার উপর নির্ভর করে। ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য ঘনীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই এই খাদ্যবীর্য্য প্রকৃতির মধ্যে যে অবস্থায় থাকে সেইরূপ অবিকৃত অবস্থায় পায় নাই। একজন মানুষের সারা জীবনে যতটা ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য প্রয়োজন হয় তাহা অতি বিশুদ্ধ অবস্থায় একত্র করিলে একটা পেয়ালা ভরিয়া যাইতে পারে।

'ক' শ্রেণীর ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য জান্তব পদার্থে পাওয়া যায়, উহা উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত তৈল বা চর্ব্বিতে বর্ত্তমান থাকে না। সেইজন্য শিশুগণকে জান্তব চর্ব্বি সেবন না করাইলে তাহাদিগের বৃদ্ধি স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় হয় না। সেজন্য তাহাদের অস্থি কোমল ও ক্ষীণ হয়। তাহাদিগের খাদ্য হইতে 'ক' শ্রেণীর ভিটমিনের মাত্রা যতই কম হয় ততই তাহাদের ঐ রোগের আক্রমণ অধিক হয় ও অস্থির গঠন হয় না। এই জন্যই শিশুগণের দুগ্ধের প্রয়োজন এবং তাহারা দুগ্ধ পান করিয়া সুস্থ থাকে। দুগ্ধে চূণ ও ফসফেটের মাত্রা অধিক থাকায় তাহাদের অস্থির গঠন হয়।

জান্তব পদার্থ সেবন না করিলে যে শিশুর অস্থির গঠন হয় না এই কথা বিস্ময়কর কিন্তু তাহাপেক্ষা আরও বিস্ময়কর কথা এই যে সূর্য্যকিরণ এই সকল শিশুর গাত্রে লাগিলে যে ফল হয় তাহা জান্তব পদার্থের তুল্য। কুকুরের শাবককে সূর্য্যকিরণে রাখিয়া যদি তাহাদিগকে দুগ্ধ প্রভৃতি জান্তব পদার্থ সেবন করিতে দেওয়া না হয় তবে তাহাদিগকে নরম অস্থির রোগ বা ricket ততটা হয় না যত তাহাদিগকে অন্ধকার স্থানে রাখিলে হয়। সূর্য্যকিরণের আরও অদ্ভুত

প্রভাব জানা গিয়াছে। খাঁচার মধ্যে কোনও জন্তুকে রাখিয়া যদি তাহাকে কেবল অন্ধকারময় স্থানে রাখা যায় তবে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় বটে কিন্তু তাহার খাঁচাটি প্রত্যহ রৌদ্রে দিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয় না। রৌদ্র এই খাঁচার উপর যে প্রভাব বিস্তৃত তাহাতে তাহার বায়ুর গুণ বৃদ্ধি হয়, এই জন্যই সম্ভবতঃ স্থানবিশেষের বায়ু স্বাস্থ্যকর বায়ু বলিয়া কথিত হয়। ইহা লইয়া দুইটী বৈজ্ঞানিক দলে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, একদল অপর দলের পরীক্ষা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হয় নাই। তাহার জন্য এক সভা বসে এবং একটা পাত্রে করাতের গুঁড়া লইয়া রৌদ্রে দেওয়া হয় অপর একটি খালি পাত্র রৌদ্রে দেওয়া হয়। যে পাত্রে করাতের গুঁড়া ছিল তাহা সূর্য্যালোক শোষণ করিয়া লইয়াছিল এবং অন্ধকারে উহা জন্তুর পাত্রে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল।

ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে আলোক কাষ্ঠ ও অন্যান্য উদ্ভিদ দ্বারা সঞ্চিত হইতে পারে এবং উহা আবার সেই আলোকের প্রভাব জীবজন্তুর গাত্রে অন্ধকারের পরে সঞ্চালিত করিতে পারে। এই অত্যল্প পরিমাণ সূর্য্যকিরণের রশ্মির প্রভাব অত্যন্ত অধিক। জন্তু যদি এইটুকুও পায় তাহা হইলে অত কম মাত্রার চর্ব্বি সেবন করিয়া বাঁচিতে পারে। কিন্তু এই অত্যল্প পরিমাণ সূর্য্য কিরণের প্রভাব পাইলেও যাহা লাভ হয়, সে লাভটুকু অন্ধকারে থাকিলে একেবারেই পাওয়া যায় না। ইহাতে দেখা যায় যে, রৌদ্রে 'ক' শ্রেণীর ভিটামিনে পূর্ণ এবং ইহা গৃহের কাষ্ঠ ও কাষ্ঠের আসবাবাদি হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যে কয়েকটী বিস্ময়কর কথা লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে আরও অধিক বিস্ময়কর কথা প্রফেসর মেলানবি বলিয়াছেন, ইনি খাদ্য বীর্য্যের অনুসন্ধান সম্বন্ধে অগ্রণী; তিনি বলিয়াছেন যে খাদ্যের মধ্যে যেমন ভিটামিন আছে তেমনি এন্টি-ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য-নষ্টকারী পদার্থও বর্ত্তমান আছে। অনেক প্রকার শস্য বিশেষতঃ ওটমিলে বা যইতে এই খাদ্যবীর্য্য-নষ্টকারী পদার্থ অধিক আছে, ইহাতে ঐ নষ্টকারী পদার্থ অস্থিগঠনে বাধা প্রদান করে অর্থাৎ 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন নষ্ট করে। ঐ নষ্টকারী পদার্থ যইয়ের অনুপরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সেই জন্য যাহারা উহা সেবন করে, তাহাদিগকে দুগ্ধ বা চর্ব্বিময় খাদ্য সেবন করিতে হয়। পরিজ নামক খাদ্যের সহিত দুগ্ধ, রুটির সহিত মাখন প্রভৃতি মানুষ হঠাৎ শিখাইয়া খাইতে শিখে নাই, কিম্বা ইহা আকস্মিক নহে, ইহা মানুষের অন্তর্জনিত মনের গতি। এই স্বাভাবিক ইচ্ছার জন্যই

উত্তর মেরুর মানব চর্বি সেবন করে ইটালীর লোক জলপাইর তৈল সেবন করে এবং ভারতের লোক ঘৃত সেবন করে।

মানুষ যাহা করে তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা এই সকল আবিষ্কারের ফলে জানা যাইতেছে। মানব পৃথিবীর নানাস্থানে বাস করিয়া এবং বিভিন্ন কালে কি আহার করিয়া থাকে; মানবের আপন গৃহসজ্জা ও গৃহের দেওয়ালে কাষ্ঠ ব্যবহার করার প্রবৃত্তি, মানবের সূর্য্যালোক উপভোগ, মানব তাহার খাদ্য কি প্রকারে আপনা হইতে নানারকমে বিভিন্ন জিনিষের সহিত মিশাইয়া সেবন করে এই সকল কৌতূহলপ্রদ কথা জানা যাইতেছে। এই সকল আবিষ্কারে বিজ্ঞান মানব মনের অন্তজনিত গতির অনুসরণ করিয়াছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্যমহীনতা।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ওলাউঠা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের চিকিৎসার উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে সেই জন্য পূর্ব্বকালের ন্যায় ইহা আর সেরূপ ভয়াবহ নহে। এই সকল রোগের জন্যই প্রাচীন রোম ও গ্রীসের অবনতি ঘটিয়াছিল। এই দুই জাতি যুদ্ধ-জয়ী হইয়া দেশের পর দেশ অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত রোগগুলিতে আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানী ঘটিতে লাগিল, তাহারা স্বদেশ যাইয়া এই সকল রোগ নিজের দেশে সংক্রামিত করিয়া দিল। এই সকল কারণে জাতির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়, রাজ্যেরও অবনতি হইয়াছিল! যাহারা বক্রকীট (Hook worm) সম্বন্ধে অবগত আছে তাহারা বলিতে পারে যে সেই সকল জাতির অবনতির কারণ এই বক্রকীট সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। ৩৬৪০ বৎসরের পুরাতন মিশর দেশের তালপত্রে লিখিত এক রোগের বিবরণ আছে যাহা পাঠে এখন বুঝা যায় যে রোগীর বক্রকীটের রোগ হইয়াছিল। কেবল মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বক্রকীট সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা হইয়াছে। কয়েক প্রকার রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতা এই বক্রকীটের দরুণ হইয়া থাকে যাহা পূর্ব্বে সকলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আব-হাওয়ার জন্য উদ্যমহীনতা বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বে জলাভূমির আবহাওয়ার জন্য যেমন ম্যালেরিয়া হয় মনে করিত ইহাও ঠিক সেইরূপ।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এই বক্রকীট অধিক যদিও শীতপ্রধান দেশে ইহা কম নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক রক্তহীন, উদ্যমহীন এবং সাধারণতঃ অলসতাপ্রিয় দেখা যায়, সেইজন্য উহা অল

বায়ুর দোষে হয় বলিয়া সকলে মনে করিত। যদিও জল বায়ু কতকটা ইহার জন্য দায়ী কিন্তু অলসতা অন্ত্রের মধ্যে বক্রকীট থাকিলেই প্রধানতঃ হইয়া থাকে। ইহা রোগীর রক্ত শোষণ করিয়া প্রাণ সংহার করে। আমেরিকার চিকিৎসকগণ সর্ব্বপ্রথমে এই বক্রকীট দেখিতে পান। বক্রকীট দ্বারা আক্রমিত হইলে বিশেষ কোনও অসুখ বুঝিতে পারা যায় না, তাহার কাজ কর্ম্মে অলসতা, অন্যমনস্কতা, কার্য্যে উৎসাহ না থাকা ও ভাল করিয়া কার্য্য না করা ইহাই প্রথমে বুঝিতে পারা যায়। ক্রমে রোগের আক্রমন অধিক হইলে রক্তহীন হয়, ক্ষীণকায় ও ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার চিকিৎসা অতি সহজ একটু চিকিৎসার ফলে রক্তহীন ও উৎসাহহীন ব্যক্তি ক্রমে সকল বিষয়ে মন দিতে থাকে, হঠাৎ কর্ম্মী হইয়া উঠে এবং শরীর রক্তে পূর্ণ হয়, সেই সঙ্গে তাহার বুদ্ধি বাড়ে। এই রোগ দূর করিতে আমেরিকার রকেফেলার স্যানিটারী কমিশন অতি আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগের লোক এই বক্রকীট দ্বারা বেশীভাগ আক্রান্ত হইয়া থাকে। সে সকল স্থানে চিকিৎসকগণ হইয়া ঔষধ বিতরণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া হয় এবং তাহাদের যাহাতে পুনরাক্রমণ না হয় তজ্জন্য কি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার উপদেশ দেওয়া হয়। প্রতি রোগীর জন্য ৩৸৵৹ করিয়া ব্যয় করা হইয়াছে। ইহার ফলে সহস্র সহস্র লোক রোগমুক্ত হইয়াছে এবং স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারিতেছে।

বঙ্গদেশে এই রোগ আছে। যাহারা খালি পায়ে হাঁটে তাহাদিগকে এই কীট অতি সহজে আক্রমণ করে। এই কীট মাটিতে যে সকল আবদ্ধ পঙ্কিল জল আছে তাহার নিকটে ডিম পাড়ে। কীট পূর্ণ আকার ধারণ করিলে উহা ½ ইঞ্চি লম্বা হয়। সাধারণতঃ মানুষের চর্ম্ম ভেদ করিয়া এই কীট-শিশু প্রবেশ করে, তখন উহা চক্ষুর অগোচর থাকে। তাহার পর ক্রমে শরীরের নানাস্থান দিয়া গমন করিয়া অন্ত্রে যাইয়া অবস্থান করে। সেই স্থানে পৌঁছাইবার পর হইতে উহার শরীর হইতে বিষ বহির্গত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে মানুষের পূর্ব্বোক্ত রূপ স্বাস্থ্যহীন অবস্থা হয়। দেখা গিয়াছে এক জন মানুষের শরীর হইতে ৫৫০০ বক্রকীট বাহির হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইহারা কি প্রকারে মানুষের জীবনীশক্তি, স্বাস্থ্য, বল উহারা হরণ করে। থাইমল নামক এক প্রকার ঔষধ সেবনে এই কীট নষ্ট করা যায়। চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, বঙ্গদেশের লোক অলসতাপ্রিয়, কার্য্যে অপটু, উদ্যমহীন সকলেরই কারণ

তাহারা বক্রকীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া। যদি তাহাদের এই রোগ না থাকিত তবে তাহাদের বর্ত্তমান সময়ে যতটা কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও উৎসাহ আছে, তাহার প্রায় দেড়গুণ অধিক কার্য্য করিতে পারিত।

সঞ্জীবনী।

মনে রাখিবেন—খালি পায়ে ঘাসের উপর দিয়া হাঁটা অতিশয় অনিষ্ট কর।

সর্ব্বদা জুতা পায়ে থাকাও অনিষ্টকর—পরিষ্কার স্থানে মুক্ত বাতাস ও সূর্য্য কিরণে শিশুকে নগ্নপদে প্রত্যহ হাঁটিতে দিবেন।

অনন্তলাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন প্রাতে অনন্তলাল স্বামীর সমাভিব্যাহারে বিশালয়া বনে মহর্ষি বেদব্যাসকে দর্শন করিতে গমন করেন, সেই দিবস অপরাহ্নে তাঁহার দৌহিত্র চিন্তামণি জ্বরাক্রান্ত হইয়া বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। জ্বর ও সর্ব্বশরীরে ব্যথা—পারিবারিক চিকিৎসক রোগী দেখিয়া বলিয়া গেলেন, বসন্ত বাহির হইবার সম্ভাবনা। সতাই পর দিবস চিন্তামণির সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত বাহির হইয়া পড়িল। ব্রজেন্দ্র দিবারাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সে অল্পক্ষণের জন্য গৃহ হইতে স্থানান্তরে যাইলে, চিন্তামণি অস্থির হইত। সে আর কাহারও হস্তে ঔষধ সেবন করিত না,—আর কাহারও শুশ্রূষা তাহার পছন্দ হইত না। সুতরাং ব্রজেন্দ্রের লেখাপড়া, বা কলিকাতায় কলেজ যাওয়া বন্ধ হইল।

রসরাজ কখন কখন চিন্তামণির শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিতেন এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া তথা হইতে অপসৃত হইতেন। আজি কালি তিনি অধিক কথাবার্ত্তা ভাল বাসিতেন না। নিজ গৃহাভ্যন্তরে একাকী বসিয়া থাকিতেন।

চিন্তামণির বসন্ত দিন দিন পরিপুষ্ট ও পাকিবার উপক্রম হইল। সে অসহ্য যন্ত্রাণায় অস্থির হইয়া বিছানায় থাকিতে পারিত না; প্রায়ই নিজ শরীরের অধিকাংশ ব্রজেন্দ্রের শরীরে ন্যস্ত করিয়া, শুইয়া থাকিত।

অনন্তলাল স্বামীজী প্রভৃতির সহিত সন্ধ্যার সময়ে বাটী পঁহুছিলেন। তিনি চিন্তামণির গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে শয্যোপরি ব্রজেন্দ্রের ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে এবং সরলা নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কিছুক্ষণ চিন্তামণির নিকট উপবেশন করিয়া তাহার রোগের অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে ব্রজেন্দ্রকে ঘরের গাড়ী করিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। সে শয্যা হইতে উঠিতেছে, এমন সময়ে চিন্তামণি বলিল,—"না, দাদাবাবু, ব্রজেন্দ্রবাবুকে আমার কাছ থেকে—কোথাও পাঠাবেন না। তাহলে আমি বাঁচ্‌বো না।"

অগত্যা অনন্তলাল ডাক্তারে নিকট অন্য লোক পাঠাইলেন।

বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক পীড়া বলিয়া, সরলা শিশিরকুমারীকে: চিন্তামণির গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। একদিন ব্রজেন্দ্র স্নানাহার করিতে রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে যাইতেছে—এমন সময়ে তাহার সহিত শিশিরের সাক্ষাৎ হইল। শিশির জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার মশায়, আপনার টিকে হয়েছে?"

ব্রজেন্দ্র বলিল—"না।"

তখন শিশির বলিল—"বসন্ত বড় ছেঁায়াচে রোগ। আপনি সর্ব্বদাই—রোগীর কাছে আছেন, এতে আপনার প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

"ব্রজেন্দ্র বলিল,—"শিশির, এঁরা আমাকে প্রতিপালন করচেন—এঁদের জন্যে যদি প্রাণ যায়, তাতে আমি দুঃখিত নই।"

শিশির আর কিছুই বলিল না।

ব্রজেন্দ্র বলিল—"এখন কিছুদিনের জন্যে রতনপুর খেকে তোমার কোথাও গেলে ভাল হয়। তোমাদের জন্যেই ভয় হয়।"

তাহাই হইল। অনন্তলাল রতনপুরে পঁহুছিয়া পর দিবস শিশিরকুমারীকে কলিকাতায় তাহার এক আত্মীয়ের নিকট রাখিয়া আসিলেন।

ক্রমে চিন্তামণি আরোগ্যমুখী হইল। সে বেশ সুস্থ হইলে এবং রতনপুরে বসন্তের প্রাদুর্ভাব উপশমিত হইলে, অনন্তলাল শিশিরকুমারীকে কলিকাতা হইতে আনয়ন করিলেন। ব্রজেন্দ্র আবার কলিকাতায় পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিল। তাহার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার দিন নিকট হইয়া আসিয়াছিল। যে কয়দিন অধ্যয়ন বন্ধ ছিল তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে তাহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইল। কিছুদিন অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করায় তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। একদিন স্নানাহার বন্ধ ও পর দিবস স্পষ্ট জ্বর হইল। জ্বর দিন দিন প্রবল ও শরীরে বসন্ত বাহির হইল। চিকিৎসকেরা দেখিয়া বলিলেন, এ বসন্তের লক্ষণ অতি মন্দ, ইহাতে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না। তাহা শুনিয়া অনন্তলালের ভয় হইল। তিনি সরলাকে বলিলেন যে, বসন্তরোগ অতি সংক্রামক, অতএব কাছারীবাড়ীর একটি ঘর পরিষ্কার করিয়া, ব্রজেন্দ্রকে তথায় স্থানান্তরিত করা হউক।

সরলা বলিল "বাবা, আমার চিন্তামণির অসুখের সময়ে, ব্রজেন্দ্র নিজের জীবনকে অগ্রাহ্য করে তার সেবা করেচে। বোধহয় সেই জন্যেই তার এ রোগ হয়েচে। এ সময়ে আমি কিছুতেই তাকে এ বাড়ী থেকে বিদায় করে দিতে পারব না।"

অনন্তলাল আর কিছু না বলিয়া, মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া, বহির্বাটিতে এবং সরলা ব্রজেন্দ্রের কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন। ইহার পর, শিশিরকুমারী ও চিন্তামণি যাহাতে ব্রজেন্দ্রের নিকট যাইতে না পায়, সে বিষয়ে অনন্তলাল বিশেষ সতর্ক হইলেন।

ব্রজেন্দ্রের নিকট সর্ব্বদা থাকিবার জন্য সরলা একজন পরিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভৃত্য সমস্ত রাত্রি তথায় থাকিত না, কতক রাত্রির পর পার্শ্বের গৃহে যাইয়া শয়ন করিত।

রোগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া সরলা একদিন প্রাতে পিতাকে বলিয়া রতনপুর হইতে ব্রজেন্দ্রের মাতাকে আনতে লোক পাঠাইলেন।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র তাহা জানিল না। সে দিবস অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার চৈতন্য ছিল না। রাত্রি দুই প্রহরের পর মাঝে মাঝে অল্প অল্প সংজ্ঞা হইতে লাগিল। চিকিৎসকদিগের নির্দ্দেশানুসারে গৃহমধ্যস্থ আলোকের তেজ কম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই ক্ষীণালোকে প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ব্রজেন্দ্র দেখিল, গৃহ জনশূন্য। পরে তাহার বোধ হইল যেন দ্বারদেশে কে দাঁড়াইয়া আছে। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পুনরায় তাহার চৈতন্য লোপ হইল। পরে আবার সংজ্ঞা হইলে সে দেখিল যেন একটি রমণীমূর্ত্তি তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। পার্শ্বের গৃহস্থিত ঘড়িতে একটা বাজিল। ব্রজেন্দ্র ভাবিল এত রাত্রে এ স্ত্রীলোক কে? কোন দেবী? এই সময়ে সে পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু তখন তাহার সম্পূর্ণ চৈতন্য হইয়াছে এই অবস্থায় তাহার অনুমান হইল যেন কেহ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাহাকে বীজন করিতেছে। সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রমণীর দিকে ন্যস্ত করিল। এ কে? শিশির নাকি? ব্রজেন্দ্র ডাকিল "কে তুমি? শিশির নাকি?"

রমণী উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, মাষ্টার মশায়, আপনি এখন কেমন আছেন?"

ব্রজেন্দ্র তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল; "তুমি এত রাত্রে এখানে?"

"আপনার অসুখ বৃদ্ধি হয়ে অবধি আমি প্রতি রাত্রে এই সময়ে এসে আপনাকে দূর থেকে দেখে যাই, আজ ভারি অসুখ শুনে, ভিতরে আপনার কাছ পর্য্যন্ত এসেচি। এ কথা কেউ জানে না; আজ পর্য্যন্ত আপনিও জান্‌তেন না। দিনমানে এদিকে আমাকে আস্‌তে দেয় না।"

ব্রজেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, তুমি এখানে কেন? এখুনি নিজের ঘরে যাও, তুমি ছেলে মানুষ, এ রোগ কত ভয়ানক তা জান না। এখানে আর এসো না।"

এই বলিয়া সে পিপাসা শান্তির জন্য পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র টেবিলের উপর হইতে জলের গ্লাস লইতে হস্ত প্রসারণ করিতেছে এমন সময়ে শিশিরকুমারী গ্লাস তুলিয়া, তাহার মুখের নিকট ধরিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্র জলপান না করিয়া বলিল, "তুমি গেলাস ছুওনা, রেখে দাও—দিয়ে নিজের ঘরে যাও।"

সে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় অগত্যা শিশির কুমারী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পর দিবস প্রাতে সরলা যাইয়া দেখিল, ব্রজেন্দ্র শয্যোপরি বসিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন। উহাতে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নাই দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, রতনপুর হইতে মাতা আসিতেছেন, এই সম্বাদে তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে। আবার স্মরণ হইল যে, গতকল্য সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল তিলভাঙ্গায় লোক যাওয়া সম্বাদ জানে না। যাহাই হউক, তাহার ভাল অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার আনন্দ হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রজেন্দ্র, আজ কেমন আছ?"

"আজ্ঞে, আজ আমি কালকের চেয়ে অনেক ভাল আছি।"

"তোমার মাকে আনতে কাল্ তিলভাঙ্গায় লোক পাটিয়েচি।"

"কই, তাত আমি জানিনে না—কাল সমস্ত দিন আমার জ্ঞান ছিল না।"

ডাক্তার আসিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও বলিলেন যে গতক ্য অপেক্ষা আজ যে অনেক ভাল আছে। গতকল্য তাহার জীবনের আশা ছিল না কিন্তু আজ সে আশা করিতে পারা যায়। তিনি আরও বলিলেন যে, অকস্মাৎ রোগীর মন বিশেষ প্রফুল্ল না হইলে, এত শীঘ্র অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন হয় না এবং এরূপ পরিবর্ত্তনে অসাধ্য রোগও সাধ্য হইতে দেখা যায়।

পর দিবস বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময়ে ব্রজেন্দ্রের মাতা রতনপুরে বাবুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্তানের অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পথশ্রম অপনোদন হইলে সরলা তাঁহাকে স্নানাহার করিতে ডাকাইলেন। তাঁহার শান্ত ও পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলেই ভক্তি হইত। তিনি সরলার গৃহ মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলে, শিশির তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। ব্রজেন্দ্রের মাতা তাহাকে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি বাবুর—"

নিকটে সরলা দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "ইনি আমার বাবার মামাত ভাইয়ের কন্যা, আমার ভগিনী ও ব্রজেন্দ্রের ছাত্রী,—মাতা, পিতা, কেহই নাই,—এইখানেই থাকেন। আমার খুড়া মহাশয় অর্থাৎ এঁর পিতা যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে গিয়েচেন, সে সকলের ইনিই মালিক।"

ব্রজেন্দ্রের মাতা একবার সরলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিশিরকুমারীকে দেখিতে লাগিলেন। এরূপ সুন্দরী কন্যা তিনি ইতিপূর্ব্বে কখন চাক্ষুষ করেন নাই।

শিশির নতমুখে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া, পরে বলিল, "মা, পথশ্রমে আপনার বড়ই কষ্ট হয়েচে, আমি জল এনে আপনার পা ধুইয়ে দিই।"

ব্রজেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "না মা, আমি নিজেই ধোবো।" তখন পরিচারিকা জল আনিয়া দিল এবং ব্রজেন্দ্রের মাতা হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি।

মহিলা সমিতিতে পারিতোষিক প্রদান।

ভগবানের কৃপায় "সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির" প্রথম বৎসর নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হইতে চলিল। গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত পরলোক গমন করেন। আগামী ১৯শে জানুয়ারী তাঁহার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে কেন্দ্রসমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে সহর ও মফঃস্বলের মহিলাসমিতিসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবেন। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত এগারটী পুরস্কার কৃতকৃত্য মহিলাসমিতিতে প্রদান করা হইবে। যে মহিলাসমিতি আমাদের উদ্দেশ্যগুলি বিশিষ্টরূপে

কার্য্যে পরিণত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন সেই সমিতিকে মিঃ দত্ত প্রদত্ত প্রথম পুরস্কার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রদান করা হইবে। যে সকল মহিলাসমিতি প্রতিযোগিতায় ২য়, ৩য়, ৪র্থ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের প্রথম দশটী মহিলাসমিতির প্রত্যেকটীকে ২০৲ কুড়ি টাকা হিসাবে পারিতোষিক প্রদান করা হইবে। মহিলাসমিতিসমূহ তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ ধারাবাহিকরূপে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা পারিতোষিকের যোগ্যতা নিরূপণে সমর্থ হইতে পারিব। আমরা মহিলসামিতিসমূহকে এই পারিতোষিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে সাদরে অহ্বান করিতেছি। প্রত্যেক মহিলাসমিতি আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহাদের কার্য্যবিবরণী নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

কার্য্য বিবরণী পাঠাইবার আরও প্রায় দুইমাস সময় বাকী আছে। এই দুই মাসের মধ্যে মহিলাসমিতিসমূহের সভ্যাগণ ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা সমিতির উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া স্বকীয় সমিতিকে সাফল্যমণ্ডিত করুন; এবং যে সকল স্থানে এ পর্য্যন্ত মহিলাসমিতি স্থাপিত হয় নাই সে সকল স্থানের মহিলাগণও ইতিমধ্যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই পারিতোষিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে প্রয়াসী হউন ইহাই আমার অনুরোধ।

মহিলাদের জ্ঞাতব্য বিষয়।

"সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গলসমিতি" বঙ্গদেশের সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া মহিলাসমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কেন্দ্রসমিতি কলিকাতা হইতে সহর ও মফঃস্বলের যাবতীয় মহিলাসমিতির সভ্যাগণকে অত্যাবশ্যকীয় সংবাদাদি প্রেরণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। বাংলা দেশের কোন মহিলা আবেদন করিলে সমিতির সম্পাদিকা নিম্নলিখিত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করিয়া সাহায্য করিতে পারেন।

(১) ছাঁট, কাট ও সেলাই শিক্ষা—মফঃস্বলের যে কোন মহিলা কলিকাতায় ৩।৪ মাস অবস্থানের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে সমিতির অন্তর্ভূক্ত "ছাঁট, কাট ও সেলাই শিক্ষার বিদ্যালয়ে" বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীনভাবে, অথবা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যদ্বারা, জীবিকা

অর্জ্জনের পন্থা সুগম করিতে পারেন। যাতায়াতের জন্য তাঁহাদিগকে দূরত্ব অনুসারে অল্প মাত্র গাড়ীভাড়া দিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের জন্য সম্প্রতি এইরূপ দুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।

(২) হিন্দু বিধবাশ্রম—অসহায়া হিন্দু বিধবাদিগের বাসের উপযোগী আশ্রম কলিকাতায় আছে। চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে উপযুক্ত সার্টিফিকেট সহ আবেদন করিলে দুই বৎসর বিনাব্যয়ে আশ্রমে থাকিয়া সাধারণ শিক্ষালাভ ও শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে অথবা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করা যাইতে পারে। ষোল বৎসর বয়সের কম কোন বিধবাকে আশ্রমে গ্রহণ করা হয় না। শিশু সন্তান সহ আসিলে মাসিক ১০৲ দশ টাকা হিসাবে তাহাদের প্রত্যেকের ব্যয়ভার মাতার আত্মীয় বন্ধুগণ বহন করিবেন। ৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবামাত্র বালকদের ভবন ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

(৩) নিরাশ্রয়া মহিলাদের বিনাব্যয়ে বাসের উপযোগী আশ্রয়স্থল কলিকাতায় আছে।

(৪) পিতৃমাতৃহীনা নিঃসহায়া,—অন্ধ, খঞ্জ, রোগাতুরা বালিকা বা পরিণতবয়স্কা স্ত্রীলোক-দিগের বিনাব্যয়ে বাসের উপযোগী আশ্রম কলিকাতায় আছে।

(৫) বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী—যে সকল হিন্দু বা মুসলমান মহিলা সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহারা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলে মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া দুই বৎসর শিক্ষা লাভের পর গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা লাভে সমর্থ হইতে পারেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণে অসম্মত হইলে ৩০০৲ টাকা ফেরত দিতে হইবে। যাঁহারা অভিভাবকের অধীনে থাকিয়া বাড়ী হইতে আসিয়া স্কুলে পড়িতে চান, তাঁহারা উপরোক্ত মাসিক বৃত্তি পাইবেন না, তাঁহাদিগকে উপরোক্ত সর্ত্তেও আবদ্ধ হইতে হইবে না। শিক্ষিতা হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। শিক্ষার্থিনীদিগকে অন্তঃপুর মহিলাদের ন্যায় থাকিতে হইবে। তাঁহারা তখন পিতা, ভ্রাতা ও স্বামী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। বিদ্যালয়গুলি কলিকাতায় অবস্থিত।

(৬) নার্স—যে সকল মহিলা কালকাতায় নার্সের (Nurse) কার্য্য শিক্ষা করিতে চান তাঁহারা মাসিক ১৮৲, ২৫৲, ৩০৲ বা ৩৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া ৩ বৎসরে উপযুক্ত শিক্ষালাভের পর

৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে হাঁসপাতালে চাকুরি পাইতে পারেন। পরে বার্ষিক ৫৲ হারে বৃদ্ধি হইয়া বেতন ৭৫৲ পর্য্যন্ত বাড়িবে। এই সকল মহিলাদের বয়স ১৮ হইতে ৪০ এর মধ্যে থাকা আবশ্যক, এবং নার্সের কার্য্য শিক্ষার উপযোগী স্বাস্থ্য ও সাধারণ শিক্ষা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের অন্ততঃ ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ থাকা চাই। তাঁহারা সন্তানাদি সঙ্গে আনিতে পারিবেন না। অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে তাঁহাদের হাসপাতালে একত্র বাস করিতে হইবে। আহারাদির জন্য তাঁহাদের প্রত্যেককে মাসিক ১০৲ দিতে হইবে। তাহা ঐ বৃত্তির টাকা হইতে দিতে পারিবেন। প্রতি বৎসরে পূর্ণ বেতনে তাঁহারা একমাস ছুটি পাইবেন। তাঁহাদের কার্য্য ও ব্যবহার সন্তোষদায়ক হইলে শীঘ্র উন্নতি হইবে।

শ্রীকুমুদিনী বসু।
সম্পাদিকা।
সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি,
৮নং জ্যাকসন লেন কলিকাতা।

সাতটি সামাজিক পাপ

——:(*):——

জনৈক ভদ্রলোক মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে সাতটি সামাজিক পাপের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই সাতটি পাপ এই :—

সিদ্ধান্ত রহিত ... ... রাজনীতি।
কার্য্য রহিত ... ... সম্পত্তি।
বিবেক রহিত ... ... আনন্দ।
চরিত্র রহিত ... ... জ্ঞান।
সদাচার রহিত ... ... ব্যবসায়।
মনুষ্যত্ব রহিত ... ... বিজ্ঞান।
ত্যাগ রহিত ... ... পূজা।

শোক-সংবাদ।

অকালে গোকুলচন্দ্র নাগ মহাপ্রয়াণ করিলেন, তাঁহার বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। গোকুল ছিলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক, উভয় কলাতেই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তর্জ্জমায় তাঁহার হাত ছিল বেশ ঝরঝরে। তিনি, টেনিসনের 'প্রিন্সেস্' 'রাজকন্যা' নামে ও মেডারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড' 'পরীস্থান' নামে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ মনোহর ও অনিন্দ্য হইয়াছে। তিনি 'কল্লোল' পত্রের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন, সে কার্য্যেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইনি জীবিত থাকিলে বঙ্গভাষা অনেক আশা করিতে পারিত। সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা—মুক্তাত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

নিবেদন।

ছাপাখানার গোলমালে কার্ত্তিকের পরিচারিকা প্রকাশে দেরী হইয়া গেল,—তজ্জন্য আমরা সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট ক্রুটী স্বীকার করিতেছি। আশা করি, অগ্রহায়ণের পরিচারিকা বর্ত্তমান মাসের শেষ তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
পরিচারিকা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
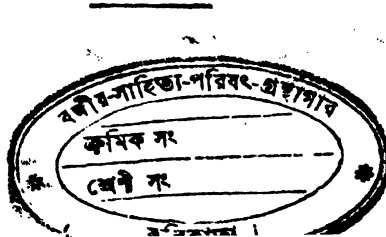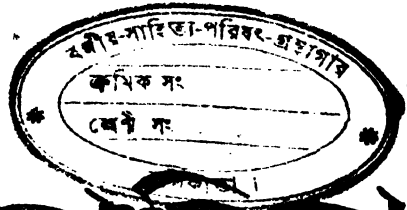
'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সাল। [illegible]ম সংখ্যা।

জাতীয়তাগঠনে সংঘবদ্ধ জীবনের প্রভাব। *

মুক্তি বা স্বাধীনতা মানবের প্রকৃত স্বরূপ। মানব প্রকৃতিগত অধিকার সূত্রে স্বাধীনতাধনে ধনী হইয়াই সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে বর্ত্তমান সংসার মানবের স্বহস্ত রচিত কারাগার। এখানে আসিবামাত্র সে যেন তাহার কৃতকর্ম্মের ফলে দস্যু তস্করের ন্যায় পরাধীনতা শৃঙ্খলে চিরতরে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আজন্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহার স্বাধীন কর্ম্মশক্তির কথা বিড়ম্বনা মাত্র। সে কলের পুতুলের মত নড়ে চড়ে, হাসে, কাঁদে, নাচে, কিন্তু ভিতরে তাহার প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। কলের কৌশলে পুতুলের ন্যায় প্রকৃতির বশে তাহার ঐ সকল দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ বেশ সমাধা হইয়া থাকে। কলের

* কলিকাতা-সুহৃদ লাইব্রেরীর পুরস্কার প্রবন্ধ

বিকলতার ফলে পুতুলের যেমন সর্ব্বনাশ, প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে পরানুগ্রহজীবী ঐ সকল মানবেরও তদ্রূপ ঐকান্তিক ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমান ভারত সমাজ যেন এরূপ কতকগুলি পুতুলের সমষ্টি। অবশ্য ইহাতে মানুষের মত মানুষ একেবারে নাই, একথা বলিলে ধৃষ্টতার একশেষ হয়। তবে অঙ্গুলিমেয় যে কয়জন আছেন, সাতকোটির তুলনায় তাঁহারা সাগরে শিশির বিন্দু সদৃশ। এখন এই স্থবির অচল নির্জ্জীব সমাজকে ভাঙিয়া চুড়িয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন সমুন্নত ও সুসভ্য জাতির রীতি-নীতি, চালচলন, ভাবভঙ্গী, সৌজন্যশিষ্টাচার ও কর্ম্ম পদ্ধতির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের কোথায় কোন জীবনপ্রদ মহদ্‌ভাব অন্তর্নিহিত আছে, ধীরচিত্তে ঐগুলির অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই স্থবির মুমূর্ষু সমাজকে সেই ভাবের পথে সুপরিচালিত করিতে হইবে। এঁদো পুকুরের পচা বদ্ধ জলের দুর্গন্ধ বিষাক্ত বাষ্পের ন্যায় কুসংস্কার জর্জ্জরিত অতিস্থবির নামমাত্র সমাজের মহামারীর প্রকোপে আজ কোটি কোটি ভারত সন্তান জীবন্মৃত। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই ঐসকল মারাত্মক দোষ অনুক্ষণ নেত্রগোচর করিতেছেন। যে পল্লী জাতির [illegible]কাগার আজ তথায় ম্যালেরিয়া বিসূচিকা পূতনার ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য। যে কৃষীবলকুল ভারতবাসীর অন্নদাতা, আজ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন প্রভৃতি প্রবল দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহারা নির্ম্মূল প্রায়। তৃষ্ণায় জল নাই, ক্ষুধায় অন্ন নাই, রোগে ঔষধ পথ্য নাই, শীতে বস্ত্র নাই, কেবল অস্থিকঙ্কালসার কতকগুলি জীবন্ত প্রেতে আজ ভারত শ্মশান মুখরিত। ইহাদের উপর প্রবলের অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত অব্যাহত। যারা দেশের মেরুদণ্ড প্রকৃতির নির্ম্মম নিয়মে সমাজতন্ত্রের কঠোর শাসনে তারা যদি অবিরত এইরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশা কোথায়? জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে এই তথাকথিত সমাজের ঘুণক্ষত কাঠাম পর্য্যন্ত বদ্‌লাইতে হইবে। দেশ কাল পাত্রের উপযোগী করিয়া ইহার পুনর্গঠন পূর্ণমাত্রায় অত্যাবশ্যক। ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যাহাতে সবল সচল ও সবিশেষ শক্তিশালী হয়, তৎ প্রতি পূর্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতে বসিয়াছি, অর্থাৎ প্রাচীন পল্লীগুলির উচ্ছেদ করিয়া নাগরিক শোভা সমৃদ্ধির বৃদ্ধি সম্পাদনেই মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি। এই অনভ্যস্ত অতিরিক্ত পৌরবিহারপ্রিয়তা দোষেই আমাদের দেশ দিন দিন ছারখারে যাইতেছে। পল্লীর [illegible] প্রাণ সেই জমিদার, তালুকদার অথবা মহাজন শ্রেণীর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এখন আর পল্লীমাঠের মুক্ত

আকাশের নির্ম্মল বাতাস সেবন, শস্যশ্যামলিত বিস্তৃত প্রান্তরে সুখ সঞ্চারণ, কমলাকর সরোবরের স্বচ্ছ সুগন্ধি সলিলপান, গৃহপালিত গাভীর খাঁটি দুগ্ধ পানে শরীর পোষণ, স্বক্ষেত্রজাত ধান্যের সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভোজন, ক্ষেত্রজাত কাপাস সূত্রে গ্রাম্য তন্তুবায়ের প্রস্তুত স্থূলবস্ত্রে লজ্জা বারণ, বিলাসবাসনবর্জ্জিত বাল্যবন্ধুদের সহিত সরল নির্দ্দোষ সদালাপ, এবং কিন্নরকণ্ঠ গ্রাম্য গায়কগণের মধুর তন্ত্রীযন্ত্র স্বর সংবলিত ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গীত শ্রবণেও আনন্দ পান না। তাঁরা এখন ধূমধূম্র নগরের বেড়ায় ঘেরা গড়ের মাঠে খোঁড়ার মত ভাড়াটে ঘোড়ারগাড়ীতে ভ্রমণ, নলের বলে চালিত বালুভীমাপা কলেরজলে পাখীর মত স্নান, ফুঁকা দেওয়া সাদারঙের গোয়ালার জল পান, অম্বলের সম্বল বালাম নামক চা'লের অন্ন গ্রহণ, ব্যবসায়ী বন্ধুবান্ধবদের সহিত রহস্যালাপ ও রজনীযোগে বহু অর্থের অপব্যয়ে রঙ্গালয়ে পণ্যাঙ্গনার অভিনয় দর্শনে রাত্রি জাগরণ করিয়া ঐ সকলের নিত্য সঙ্গী পানদোষে অভ্যস্ত হইয়া অকালে কালকবলে নীত হইতেছেন। যাঁদের অর্থে পল্লীর পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, জঙ্গল কাটা, পথঘাটের সুব্যবস্থা, শিক্ষা চিকিৎসার সংস্থান হইবে, সেই পল্লীর প্রাণগুলি যদি অকালে দলে দলে এইরূপ শোচনীয়ভাবে জীবলীলা সাঙ্গ করিতে থাকেন; তাহা হইলে দেশের উদ্ধার হইবে কাহাদের দিয়া? এখন সমাজের এই বিকৃত মস্তিষ্কগুলির প্রকৃতিস্থ হওয়ার প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী ইঁহাদের জন্য যে বিলাস বর্জনরূপ মৃত-সঞ্জীবনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, যতদিন না ইঁহারা রীতিমত ঐ ঔষধ সেবনে অভ্যস্ত হইতেছেন, ততদিন দেশের কোনও স্থায়ী মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। মূলতঃ পল্লীসংগঠনকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া এ পথে ধীরে ধীরে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে। রোগ যেমন "যাপ্য", চিকিৎসাও তেমনি, সময়সাপেক্ষ। এই চিকিৎসা-পদ্ধতির নির্ণয় কল্পে ডাক্তার দিনেশচন্দ্র সেনপ্রমুখ মনীষিগণ আদর্শ পল্লী প্রতিষ্ঠার উপদেশপূর্ণ যে পুস্তিকাদির প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছেন, আমরা ঐগুলির মতামত অনুসরণ করিয়া "বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী" প্রভৃতি মহত্তর জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নিষ্কাম কর্ম্মিগুলের পরামর্শ ও উপদেশ মত স্বদেশপ্রেমিক মহাপ্রাণ ভ্রাতৃবর্গকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাবনয় অনুরোধ করি। পরহিতপ্রাণ কর্ম্মিগুলীর কার্য্যকুশলতায় দেশের অস্থিকঙ্কালসার পল্লীগুলির দুর্দ্দশার মূল ব্যাধি নিরাকৃত হইলে উহাদের স্বাস্থ্যশ্রী ও ধন সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার হওয়ায় দেশ ক্রমশঃ প্রভূত অভ্যুদয়ের পক্ষে অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু অশিক্ষার ঘোর অন্ধকারে

বিবিধ উৎকট রোগের নিদারুণ কারাগারে দৃঢ় আবদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্লাবনের করাল কবলে চিরকবলিত দেশের জীর্ণ শোণিত পল্লীগুলির প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য ভুলিয়া সহরে বসিয়া পত্রিকা প্রচার; বক্তৃতাদান, সভাসমিতির সাহায্যে দেশোদ্ধারের চেষ্টা কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে ও হইবে, তাহা কেবল ভাগবতী ভবিতব্য তাই নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কি ছোট কি বড় সর্ব্ববিধ কার্য্যসম্পাদনে সংহতিশক্তির একান্ত আবশ্যক। এইরূপ সংহতিশক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাচীন ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গ্রাম্য উৎসব, পূজা পর্ব্বাহ ও মহোৎসবাদিতে কতকটা অজ্ঞাতসারে এই বিরাট্ সমাজ শক্তির প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিত। গ্রাম্য বারইয়ারী পূজা অদ্যাপি ইহার ক্ষীণ নিদর্শন। স্বাধীনতা দেবদুর্লভ সামগ্রী। ইহা মানবের আভ্যন্তরিক মহীয়সী শক্তি হইলেও যথাযথ প্রয়োগের জন্য নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োজন। মানব-দেহের সকল ইন্দ্রিয়ই স্বভাবতঃ স্বাধীন। কিন্তু সেগুলি যদি দীর্ঘকাল যথারীতি বিনিয়োজিত না হয়, সম্রাট্‌স্থানীয় মনের ইঙ্গিতে যদি উহাদের কার্য্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে স্ব স্ব স্বাধীন উচ্ছৃঙ্খল ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানবদেহের অশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়া অনতিকাল মধ্যেই ঐ দেহের ধ্বংস আসন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে জাতির বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাচীন ভারতের উদার সমাজ শাসনের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতে হইবে। আদর্শ সমাজ সংগঠন ব্যতিরেকে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া দুরূহ। আমাদের মধ্যে কেহ বুদ্ধিবলে বলীয়ান, কেহ ধনবলে গরীয়ান্, কেহ শরীরবলে দুর্জ্জয়; কেহবা জনবলে অজেয়। কিন্তু পরস্পরের সহিত অপরিচিত, দূরব্যবহিত, তথাকথিত স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন এই বল চতুষ্টয় কখনই কোন বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবে না। জ্ঞানী কেবল জ্ঞান বিতরণে জগতের লোককে জ্ঞানবান্ করিতে পারেন, কিন্তু কেবল জ্ঞানী লোকের দ্বারা বিরাট্ জগদ্‌যন্ত্র কখনও সুপরিচালিত হয় নাই বা হইতে পারে না। বলী কেবল বাহুবলের সাহায্যে বহুল দেশ সাময়িকভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় কেবল শারীর বল কখনও কোন দেশ শাসনে সমর্থ হয় নাই। ধনী ধনের বলে জগৎকে প্রকৃত সুখী করিতে কিম্বা নিজে অপার্থিব সুখের অধিকারী হইতে পারেন না। কারণ তাঁহার ধনাগার কুবেরের ভাণ্ডারের মত চির অক্ষয় নহে। যিনি কেবল জ্ঞানবলে বলী তাঁহার বল পূর্ব্ব পূর্ব্ব উক্ত বল ত্রিতয় অপেক্ষায় অতি দুর্ব্বল। কারণ, ভরণপোষণে অশক্ত বহু সন্তান পিতার ও জনবহুল প্রভুর পিতৃত্বের ও

ও ভুজের গৌরব অতি লঘু। এরূপ অসহায় জ্ঞান দৈহিক বল, অর্থ ও জন বলের সামঞ্জস্য ঘটিত মহতী সংহতি শক্তিই জগতের উন্নতির সিংহদ্বার। এই চতুর্ভদ্রের শুভ সম্মিলনের ফলেই প্রাচীন ভারতের সমাজ স্থিতির অনুকূল চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কালান্তরে গুণকর্ম্মের বিভেদে নামান্তরিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপ চারিটী মহাস্তম্ভের উপর ভারতের জাতীয় মর্ম্মরসৌধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। এ দেশের সমাজের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি ও বৃদ্ধির ইতিহাসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই সমাজ তত্ত্বের মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমি অবশ্য আজকালকার নাম মাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পরিপূর্ণ বিকৃত সমাজের কথা বলিতেছি না। ইহাঁরা যাঁহাদের বংশধর, যাঁহাদের প্রজ্ঞা পরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার প্রভাবে এই অভিশপ্ত দেশই একদিন পৃথিবীর জ্ঞানগুরু, বীরত্বের আদর্শ, বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র, স্বদেশ ও সমাজ সেবার এবং আতিথ্যের জন্মদাতা বলিয়া সর্ব্বদেশে সমভাবে সমাদৃত হইয়াছিল; সেই সকল পুণ্যশ্লোক দেবকল্প সমাজ-প্রতিষ্ঠাতা আমার উক্তির মূল লক্ষ্য। তাঁহাদের ন্যায় আত্মপর ভুলিয়া একমাত্র লোকহিতার্থে আবার যদি ভারতে পুরাতন চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদর্শে সমাজ গঠিত হয়, এবং ঐ পুনর্গঠিত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ নিজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্রতর অভাব অভিযোগগুলি একেবারে বিসর্জন দিয়া, চূণ সুরকির ভিতরে কৌশলে আত্মগুপ্ত সংহত অথচ স্বতন্ত্র ইষ্টকরাশির দৃঢ় সমাহারে নির্ম্মিত অভ্রংকষ সৌধের ন্যায় জাতীয় মিলন সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাহা হইলে এ ভারতের সৌভাগ্যশ্রীর পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনা।

প্রথমতঃ পল্লী সংস্কার হইলে ঐ সংস্কৃত পল্লীগুলির সাহায্যে সমাজ প্রতিষ্ঠা। তৎপর সমাজ প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় হইলে ঐ সমাজ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হইলে দেশের ধনাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইতে থাকিবে। দেশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর শুভাগমনের রাজপথ তিনটা। প্রথম বাণিজ্য, দ্বিতীয় কৃষি আর তৃতীয় রাজসেবা বা শ্রমবিনিময়। উহাদের মধ্যে ভারতে কৃষির পথটী অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত। অধুনা দেশীয় বাণিজ্যের পথ সঙ্কট সঙ্কুল। রাজসেবার কথা না তুলাই ভাল। কারণ এই পথে ভারতীয়েরা বড় জোর হিতোপদেশের বুভুক্ষু লোল দৃষ্টি শৃগালের মত "মাংসাসৃক—স্নায়ুলিপ্ত" দুই একখণ্ড হাড়ের টুক্‌রা পাইলেও পাইতে পারে। কৃষি এ দেশীয়ের পক্ষে একান্ত ও চিরাভ্যস্ত হইলেও অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাতে উহা হইতে সুপর্য্যাপ্ত ফসল পাওয়া যাইতেছে না। যে

দেশের শতকরা আশীজন কৃষিজীবী সেই কৃষি প্রধান দেশে কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কিরূপ প্রচুর আয়োজন থাকা আবশ্যক. উহা চিন্তাশীল দেশ হিতৈষীর সহজ অনুমেয়। বিদেশী রাজার জাতিগোষ্ঠী যেদেশের বাণিজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, সে দেশের দরিদ্র অধিবাসীর প্রচুর মূলধন সাধ্য বৃহৎ বাণিজ্যের পরিকল্পনা আসন্ন মৃত্যুর সুদূর যাত্রার স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় ক্ষণিক কৌতূহল-জনক হইলেও বিড়ম্বনার রূপান্তর মাত্র। অবশ্য আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে সকল শিল্পবাণিজ্য ছিল এবং এখনও যাহাদের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে, ঐগুলির পুনঃসংস্কার ও পুনরুদ্ধারের দ্বারা এ দেশবাসীকে ধনসঞ্চয় করিতে হইবে। এই কার্য্যের মূল সহানুভূতিশীল বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত সমাজের সাহায্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ দেশীয় সমাজ সংস্থান পদ্ধতির উপর দেশীয় বাণিজ্যের জীবনমরণ বহুলাংশে নির্ভর করে। ইহাতে প্রতিকূলতা ছাড়া বাহিরের সাহায্য এক কণাও মিলিবে না। দেশীয় জনসমাজকেই এই বাণিজ্যশক্তির সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। সমাজশক্তিসম্ভূত একমাত্র একতাই এই দুরূহ কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে।

একদেশজাত সমস্বার্থ বহুলোকের একযোগে একই উদ্দেশ্যে একপ্রাণতার সহিত কার্য্যকরার নাম একতা। পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য ও স্বাধীন জাতি এই একতা মহামন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক। যে জাতি বা সমাজের সঞ্জীবতার মূল একতার সংযোগ সূত্রের (Links) কিছু মাত্র বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অচিরে উহার সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছে। জাতির সর্ব্ববিধ অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ একতার অভাব। এই অমূল্য রত্নের উপযুক্ত সমাদরের অভাবে সোনার ভারত শ্মশানে পরিণত। সুদূর ঐতিহাসিক কালের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখিবে, তক্ষশিলারাজ প্রভৃতি হীন প্রকৃতি হিন্দুরাজগণ যদি বিদেশী বিজেতা আলেকজাণ্ডারের অনুগত্য না করিতেন, তাহা হইলে ঐ অসহায় এ্যালেকজাণ্ডার যত বড় বীরই থাকুন না কেন, তাঁহার পক্ষে অপরিচিত দেশের প্রবল পরাক্রান্ত পুরুরাজকে পরাজিত করিয়া আর্য্যশোণিতে পবিত্র পঞ্চনদ (পাঞ্জাব) ভূমি প্লাবিত করিয়া দিগ্‌বিজয়ী খ্যাতিলাভ করা সমূহ সন্দেহের বিষয় ছিল। হিন্দুকুলকলঙ্ক জয়চন্দ্র জঘন্য জিঘাংসা পরিতৃপ্তি লালসায় মহারাজ পৃথ্বিরাজের বৈরাচরণ করিয়া যদি মহম্মদ ঘোরীকে সাদরে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ বীরোত্তম পৃথ্বীরাজকে অকালে কালকবলিত হইতে হইত না। ভারতবাসী একতার

অবমাননা করাতেই ভারতগগনের চিরভাস্বর স্বাধীনতা ভাস্কর চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে ইংরাজজাতি আজ বিশাল ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, একমাত্র একতাই তাঁহাদের এতাদৃশ অনন্য সুলভ মহত্ত্ব লাভের সুপ্রশস্ত সোপান। একতার ফলেই জাতীয় মর্য্যাদা বুদ্ধি প্রবুদ্ধ ও জলন্ত স্বদেশপ্রেম সমুদ্দীপিত হইয়া থাকে। একতাবদ্ধ ইংরাজজাতি স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য গৌরব রক্ষায় সতত বদ্ধপরিকর, এমন কি, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত প্রাণদিতেও অকুণ্ঠিত। সহানুভূতি, পরার্থপ্রাণতা, জাতীয় স্বার্থরক্ষায় একনিষ্ঠতা প্রভৃতি বহুল সদ্‌গুণ একতার অঙ্গীভূত। একের রোগ শোকে, অভাব অভিযোগে, দুঃখদৈন্যে যদি দশজন সমবেত ভাবে প্রাণদিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে উঁহাদের মধ্যে একতার ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপে একতা বিচ্ছিন্ন দুর্বল জনমণ্ডলীকে স্বগত অসীম সামর্থ্যের প্রভাবে এক অজেয় বিরাট্ সমষ্টি বা জাতিতে পরিণত করে। মানব একাকী কোন বৃহৎ কার্য্য করিতে যাইলে তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু সে যখন দশের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ঐ কার্য্য করে, তখন তাহার নৈসর্গিক দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে না। একক মানব সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর কবলে পড়িলে উহার বিনাশ অপরিহার্য্য। কিন্তু দশ জনে মিলিয়া ঐ দুর্দ্দান্ত বলিষ্ঠ শ্বাপদকে ত্রাসিত, বিতাড়িত এমন কি সময়বিশেষে নিহত করিতেও দেখা যায়। সামান্য বায়ুর আঘাতে যে তৃণ নুইয়া পড়ে, উহার সমষ্টিভূত রজ্জুতে উত্তেজিত বলীবর্দ্দ এমন কি মত্ত মাতঙ্গ পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকা অতিক্ষীণজীবী ও ক্ষুদ্র প্রাণী। উহারা অনেকে একত্র মিলিয়া শৃঙ্খলার সহিত সুকৌশলে যে কারুকার্য্যময় সুদৃশ্য মধুচক্র রচনা করে, মাদৃশ মানবের উহা কল্পনাতীত। সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে সর্ব্বোচ্চস্তর পর্য্যন্ত সর্বত্র এইরূপ একতা শক্তির ক্রিয়া সুপরিব্যক্ত। আমরা একতাবদ্ধ জাতির মধ্যেই সভ্যতা, জাতীয় উন্নতি ও সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া থাকি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একতা অত্যাবশ্যক। এক পরিবারভুক্ত পাঁচজন ব্যক্তির মধ্যে যদি সকল বিষয়ে অনৈক্য হয়, তাহা হইলে সে পরিবারে কখনও শান্তি সুখ থাকে না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে একতাই প্রকৃত মূলধন। বাণিজ্যনিপুণ ব্যবসায়জীবী জাতির মধ্যে যাহারা যত একতার অনুরক্ত ভক্ত তাহাদের ততোধিক উন্নতি। দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে এখন একতার

অনুশীলন দ্বারা যৌথকারবারের বহুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ধনবল সঞ্চয় একান্ত কর্ত্তব্য। এ পথে একতাই প্রধান পথ প্রদর্শক। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রাচীন গ্রীস কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। একটী মাত্র সৈন্যদল ঐ বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলি অনায়াসে জয় করিতে পারিত।

কিন্তু উহাদের সমবেতশক্তি প্রবলপরাক্রান্ত পার্শিয়ান্‌দিগকে বহুবার বিতাড়িত করিয়া দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, ইংরাজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জাতি তাহাদের রাজার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধা লাভের জন্য সর্ব্বদাই একতাবদ্ধ। রাজা জনের (King john) এর রাজত্বকালের পূর্ব্বে তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারে নাই, জন্ রাজা হইলে প্রজাগণ মহীয়সী একতা শক্তির মহিমায় রাজার নিকট হইতে সর্ব্ববিধ অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছিল। দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর হৃদয় হইতে যদি অমূল্য একতারত্ন চিরতরে পরিত্যক্ত না হইত, তাহা হইলে মুসলমান ও মোগল কি কখনও ধর্ম্মক্ষেত্র হিন্দুস্থানের পবিত্র মৃত্তিকাস্পর্শে সাহসী হইতে পারিত? এখন যদি নূতন করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে উহার মহানুভব স্থপতিবৃন্দকে সর্ব্বপ্রথম একতা বনিয়াদ্ পাকা করিয়া তুলিতে হইবে। সুখের বিষয় ভারতবাসী অধুনা কিয়ৎ পরিমাণে একতার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিতেছেন। সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর কাল একতা সেবক ইংরাজশাসনের সুফল দেশে জাতীয় ভাবের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। বিশাল ভারতে আচার ব্যবহার, বেশভূষা ধর্ম্মভাষা সংক্রান্ত প্রভূতবৈষম্য থাকিলেও ইংরাজ রাজত্বের অধীনে এক শিক্ষালয়ে একই শিক্ষা, একরূপ আইন কানুন, অভিন্ন বিচার শাসন ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় উহাদের ঐক্যবন্ধন দিন দিন দৃঢ় হইতে সুদৃঢ় হইতেছে। ভারতবাসী বহুদিন হইতে একতা ভক্ত ইংরাজের সংশ্রবে থাকিয়া এবং উহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মূলসূত্র একতার সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করিয়া এখন প্রায়শঃ দেশের কল্যাণার্থ একত্র সম্মিলিত হইয়া সভা সমিতিও আন্দোলনআলোচনা করেন। এই আদর্শলব্ধ একতার প্রকৃত অনুকরণের ফল ভারতীয় রাষ্ট্র-মহাসভা (Congress) বৃটিশ ভারতীয়দের সমিতি (British Indian Association) ভারতসভা (Indian Association), সমবায় প্রথায় ঋণদান সমিতি (Cooperation Credit Soceity), দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সমিতি (Native Press Assciation), বেহার জমিদারসমিতি, ভারত সেবকসংঘ, সম্পাদকসংঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ

সমিতি ইত্যাদি। সময়ের গুণে এবং উদার ইংরাজী শিক্ষা ও শাসনের ফলে দেশে যে জাতীয়তা-বর্দ্ধক রাজনীতিক অধিকার লাভের মহতী প্রচেষ্টা চলিয়াছে, উহার ফল অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হস্তগত হইবে। মহামতি উদারচেতা লর্ড রিপণ প্রমুখ সহৃদয় সহানুভূতিশীল ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধিগণ ভারতে যে স্বায়ত্তশাসন সৌধের ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন, কালে উহার অভ্রভেদী "গৌরী শিখর" জগদ্বাসীর সকৌতুক বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই করিবে। ভারতীয় রাজনীতির আদিম আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ,—"নেহাভিক্রম নাশোঽস্তি" গীতা ২য়। হে পরন্তপ! এ জগতে আরব্ধ কর্ম্মের বিনাশ নাই। যে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হন, তিনি আবার ঐ পূর্ব্বাকাশেই পুনরুদিত হইয়া থাকেন ; ইহা প্রকৃতি নিয়মিত নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। দেশে অধুনা যে রাষ্ট্র গঠন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, উহা কখনও একেবারে ধ্বংস হইবে না, হইতে পারে না। উহাতে যুগপৎ প্রকৃতির সনাতন নিয়ম-ধর্ম্ম ও প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটে। রাজানুগ্রহলব্ধ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান প্রসারের সহিত জনসাধারণের কর্ম্মশক্তি ও রাজনীতিক অধিকার লাভ দিন দিন তিল তিল করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছেন ইহার সুফল চিন্তাশীল বিজ্ঞ ভারতহিতৈষী মাত্রেরই সহজ বেদ্য। এই আরব্ধ প্রতিষ্ঠানকে সম্যক্ গড়িয়া তুলিবার জন্য যদি কতকগুলি ত্যাগী কর্ম্মী সন্ন্যাসী ইঁহারা সে কালের রাজর্ষি জনকের ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া এবং স্বচক্ষে স্থানীয় সকল অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ করিয়া উহার নিরাকরণে যত্নশীল হইবেন। ইঁহারা মহাজন হইলে দেশের অশিক্ষিত জনগণ জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে হাতেকলমে কার্য্য করিতে শিখিবে। তৎপর স্থানীয় কার্য্য শিক্ষিত স্থানীয় লোকের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারিবে। যতদিন না গণদেবতা জাগ্রত হন ততদিন ঐ মহাপ্রাণ কর্ম্মিসংঘই দেশমাতৃকার মহাযজ্ঞে প্রধান পৌরোহিত্য করিবেন। দেশের সুসন্তান এই সকল কর্ম্মীর আদর্শ সম্পর্কে ইটালীর ত্রাণকর্ত্তা মহাপ্রাণ গ্যারীবল্ডী বলিয়াছেন.—"Let those who wish to continue the war against the stranger come with me. I offer neither pay, nor quarters, nor provisions ; I offer hunger, thirst, forced marches, battles and death. Let him who loves his country in his heart, and not with his lips only, follow me." Indian Review, October, 1921.

বস্তুতঃ মহাপুরুষনির্দ্দিষ্ট জনকপন্থী ঐরূপ কর্ম্মী সন্ন্যাসীরাই কেবল নবীন ভারতসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সৈনাপত্যপদের অধিকারী। ইহাঁরা সমুদ্রমন্থনরত দেবগণের ন্যায় প্রলোভনজনক রত্নলাভে কিংবা ভীতিজনক বিষোদ্গারে প্রলুব্ধ বা ভীত হইয়া স্বকর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না। পশ্চাদুত্থিত অমৃতলাভে দেবগণ যেমন অমর হইয়াছেন, ভয় ও প্রলোভনের কঠোর করগ্রহ হইতে মুক্ত মহনীয় কর্ম্মি সংঙ্ঘকেও তেমনি জাতীয় মুক্তি সুধা আহরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে। দুরূহ কার্য্য সিদ্ধির জন্য দেবগণ যেমন তাঁহাদের জন্ম বৈরী অসুরদিগকেও সহযোগী করিয়া ছিলেন, দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী কর্ম্মিসংঙ্ঘকেও তদ্রূপ দেশের অসুরপ্রকৃতিক জনগণের সহিত প্রথম প্রথম সখ্যমূলক সহযোগ করিতে হইবে। উহাদিগকে দূরে রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে সমষ্টির ন্যূনতা বশতঃ দুর্ব্বলতা ঘটিবে। বিশেষতঃ অভিমানাহত ঐ সকল প্রতিপক্ষের প্রবল প্রতিকূলতায় কার্য্যসিদ্ধির পথ অতিসঙ্কুর হইয়া উঠিবে। ফলোদ্যান রক্ষণের জন্য কণ্টক বৃক্ষের বেড়ার প্রয়োজন, একথাটা মনে রাখা নিতান্ত দরকার। এইরূপ হিন্দু অহিন্দু, শত্রুমিত্র, ব্রাহ্মণচণ্ডাল, বিদ্বান্ মূর্খ, নরনারী, স্বরাজ্যপন্থী, মধ্যপন্থী, চরমপন্থী বা উদাসীন ভারতবাসী, ভারতপ্রবাসী, ভারতোপনিবিষ্ট ছোট বড় সকলকে লইয়া একটী মহাজাতি গঠন করিতে হইবে। যে জাতির সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত রাজনীতিক অধিকারলাভের হুঙ্কার ধ্বনিতে বৃটিশ কুম্ভকর্ণের গভীর সুষুপ্তি চিরতরে ভগ্ন হইয়া যাইবে। এক্ষণে প্রাচীন ঋষিদিগের অমর ভাষায় সঙ্ঘ শক্তির উদ্বোধক মুক্তি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥"

"সকলে মিলিত হও, মিলে মিশে কথাকও,
মন হো'ক্ সবার সমান ;
পূর্ব্বে যথা পুরাতন, মিলেমিশে দেবগণ,
যজ্ঞভাগ করিল গ্রহণ॥"

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

গান।

—*—

ও গো আমার গোপন মনে

পুলক লেগেছে।

কাঁদনভরা নীপের বনে,

কাঁপন জেগেছে।

আজ ফুলে ফুলে অনুরাগে

যৌবনেরি পরশ লাগে,

সুরের হাওয়া নদীর বুকে

মাতন তুলেছে।

কোন্ মায়াবীর লীলাছলে

মায়ার ধারা পড়ছে গলে,—

ও গো কার সবুজ-ছায়ায়

ভুবন ভুলেছে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বয়াটে।

৩য় খণ্ড
শেষ্ণু

—

এক।

সাহেব চলে যাবার পরদিনই "নন্দিতায়" নীচের খবরটা বেরোলো—

"আমরা পুনঃ পুনঃ পুলীশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এ বিষয়ে কোনো ফললাভ করিতে পারি নাই। সেই অজ্ঞাত নামা ব্যক্তির দুষ্কর্ম্ম দিন দিনই গুরু হইতে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম—সে অসচ্চরিত্রা নারীদিগের সাহায্যে এক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। "উদ্ধার আশ্রম" নাম দিয়া নাগপুরের কোনো সাঁওতাল পল্লীতে এক আখড়া খুলিয়াছে। সেখানে ভদ্র গৃহস্থের তরুণী বিধবাদিগকে ফোঁসলাইয়া লইয়া গিয়া কুকার্য্যে লিপ্ত করে। কলিকাতার অনেক গণিকা এ কার্য্যে তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। কয়েকদিন হইল……জেলার ..গ্রামের কিরণবালা নাম্নী একটী বিধবার এইরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আমরা—কিরণবালার পরমাত্মীয় বসন্তকুমার রায় ও কাঙ্গিরাম চক্রবর্ত্তীর নিকট এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছি।"

এ খবর প'ড়েই বিষম রাগে—ন'ব্নের সারামন বারুদস্তুপের মতন দপ্ করে জ্বলে গেল। বসন্ত? কাঙ্গি?—রাস্কেল বোম্বেটে পাজী জুবেটা। আর হারামজাদা ঐ বেটা কাগজওয়ালা। ওকে আমি দেখবো। সম্পাদকের ওপরকার পুরোনো রাগ আর আবার নতুন করে একখানা প্রতিবাদ লিখে—নন্দিতা আফিসে পাঠিয়ে দিয়ে পুনশ্চ করে—সম্পাদককে জানালো—যে তিনি যেন—তাঁর লেখার জন্যে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চান।

আরো দু'দিন গেল। ন'ব্নের মনে মাথায় রাগের জ্বালাটা সমানেই জ্বলছিল। দুদিনের পরেও—"নন্দিতায়" নব্নের প্রতিবাদ—বেরোলো না। আর নয়। সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বরাবর "নন্দিতা" আফিসে গিয়ে উঠ্লো। ঘরে ঢুক্তেই দোরের পাশে দেখে—বিরিঞ্চি। বিরিঞ্চি এখানে? ন'ব্নে গম্ভীর, কড়া গলায় প্রশ্ন করলে—বিরিঞ্চি?"

বিরিঞ্চি ধাঁ করে চ'ম্‌কে উঠে একটু স'রে দাঁড়িয়ে বল্‌লো—"এখানে একটা ব্যবসার কাজে এয়েছি,—বাবু প্রণাম হই। সাহেব ভাল আছেন ত?

ন'বনে ঘৃণিত, নীরব তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে শুধু তার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো—তার কথার কিছু জবাব দিল না। একটা ছোক্‌রা মতন উড়ো বাহারে সাজা বাবু জিগ্‌গেস ক'র্‌লেন—"আপনার কি চাই?"

ন'ব্‌নে জবাব দেবার আগেই বিরিঞ্চি ব'ল্‌লো—"ইনি আমাদের নবনীবাবু,—হরিচরণবাবু।"

ন'বনে বুঝ্‌লো—"এই সেই—দুই পাষণ্ড! এরাই এ সব খবরাখবরের জন্যে দায়ী। বাইরে সে কথা তিল মাত্র বুঝ্‌তে না দিয়ে—ন'বনে হরিচরণের প্রশ্নের জবাব দিল—"আমি সম্পাদককে চাই।"

"কিছু লেখার কথা কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বসুন, বসুন, আপনি আগে বসুন"—ব'লে ব্যবসায়ী চা'লে আপ্যায়িত ক'রে হরিচরণ—সম্পাদককে ডাক্‌তে গেল।

একটু পরেই—এক বুড়ো পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায় ফতুয়ার ওপর একখানা চাদর কোণা-কুনি ক'রে ঝুলিয়ে দেয়া। বুড়োটা হাসি মুখে ন'ব্‌নেকে নমস্কার ক'রলেন। ন'ব্‌নে জিগ্‌গেষ ক'রলো—"আপনি নন্দিতার সম্পাদক?"

"হ্যাঁ; আর আপনিই বুঝি আমাদের নবনীতবাবু? আর কিছু লেখা এনেছেন কি?"

"লেখা একটা ডাকে পাঠিয়েছিলাম,—পান নি?"

"কই না!"

"একটা প্রতিবাদ!"

"প্রতিবাদ? কিসের।"

আপনাদের "নাগপুরে নারী ব্যবসায়ের।"

সম্পাদক একটুখানি রেওয়াজী মেজাজে বল্লেন "না কি? কিন্তু তার কি কিছু প্রতিবাদ সত্যি হ'তে পারে? আমরা খুব ভালরকমেই সে খবর জানি।"

"হরিচরণ আর বিরিঞ্চি আপনার প্রমাণ বুঝতে পেরেছি! কিন্তু এঁরা দুটীতেই চোর এবং জোচ্চোর আমি ইচ্ছে করলে এখুনি এঁদের পুলীশে দিতে পারি তা জানেন?"

"জোচ্চোর চোর সে কী মশায়?" ব'লে সম্পাদক জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। চীৎকার শুনেই বোধ[illegible] হরিচরণ ঘরে এসে ঢুকলো। ন'ব্‌নে চেঁচিয়েই বল্‌লো "হ্যাঁ, হরিচরণ চোর।"

"কি ব'লছেন মশাই? বলে হরিচরণ জামার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এল। ন'ব্‌নে স্থির। আস্তিনও গোটালো না—ঘুঁষিও বাগালো না। সে গম্ভীরভাবে জবাব দিল—"তোমার মত পাঁচটা হরিচরণকে পিষে মারতে পারি—বুঝতে পেরেছ হে ছোক্‌রা? গায়ের বল যেখানে, সেখানে খাটাতে এসো না।"

হরিচরণ রাগে চেঁচিয়ে বল্‌লো "তুমি আমায় চোর বল্‌ছ?"

"অবিশ্যি বল্‌ছি;—সাবানের কল ক'র্‌বে বলে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোকের কাছ থেকে দুশো টাকা,—বলরাম দের ষ্ট্রীটের কব্‌রেজ মশাইএর কাছ থেকে ডিমের ব্যবসায়ে দু'শো,—সাবানে দু'শো, মোট চারশ—ন'বনের কথা শেষ না হতেই তার কথার উত্তর সম্পাদক চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"থামুন থামুন মশাই, এ সব কথার আপনার কিছু প্রমাণ আছে?"

হরিচরণের মুখ শুকিয়ে এসেছিল তবু সম্পাদকের কথায় সাহস পেয়ে সেও একটা সচেষ্ট সপ্রতিভ ভাব দেখিয়ে ব'ললো—"হ্যাঁ ডিফেমেশন সুট করবো—আপনার কিছু প্রমাণ আছে?"

ন'বনে বিরক্ত-মুখে বল্‌লে—"পুলীশে দিয়ে তা'পর প্রমাণ দেখাবো—জোচ্চোর কোথাকার! আপনিও এই দলে নাকি মশায়?" ব'লে ন'ব্‌নে সম্পাদকের দিকে চাইল।

"আপনি ত অতি অভদ্রলোক দেখ্‌ছি!" সম্পাদক রেগে জবাব দিলে। ন'ব্‌নেও চড়া গলায় বলল—"আর ভদ্রের চূড়ামণি আপনি আর আপনার এই হরিচরণ—বিরিঞ্চি—"

বিরিঞ্চি কথাটা ন'ব্‌নে বেশ জোরেই উচ্চারণ করেছিল—সে আওয়াজ শুনেই দাঁড়িয়ে উঠে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে—"আজ্ঞে না আমি না—ছেলেপিলে নিয়ে বউটা বাবু পথে ব'সবে—পুলীশে দিও না—আমায় না! ব'ল্‌তে বল্‌তে বিরিঞ্চি রাস্তায় নেমে ভাগোয়া।

ন'ব্‌নে তাকে দেখিয়ে সম্পাদককে ব'ল্‌লে—"এই ত প্রমাণ পেলেন।"

"কি প্রবাণ? তুমি বেরোও এখান থেকে" বলে সম্পাদক খাঁ করে চটে উঠে চেঁচিয়ে,—হরিচরণকে ডাক্‌লো—"হরিচরণ, ধরতো বেটাকে" হরিচরণ কথা শুনে আবার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসতেই ন'ব্‌নে তার নাকে একটা জোর ঘুঁষি বসিয়ে দিল। হরিচরণের মাথাটা ঘুরে উঠ্‌লো। সে মুখ ফিরিয়ে বসে প'ল। সম্পাদক চেঁচিয়ে হাঁক্‌লো—"পাহারওয়ালা পাহারওয়ালা।" লাল-পাগড়ী সে নবাবজাদা অনেক দূরে খইনি টিপ্‌ছিলেন। ন'ব্‌নের রাগ ধৈর্য্যের সীমা এড়িয়ে উঠেছিল। সে আর ভেবে দেখ্‌বার,—বিবেচনা কর্‌বার অবসর পেলে না—ঝাঁ করে ঝটাপট সম্পাদকেরও নাকে-মুখে জোরে পাঁচ সাতটা ঘুঁষি কষে দিয়ে "সাবধান হ'য়ে এর পর খবর ছাপিও—নইলে তোমায় দেখে নোব old fool" বলে বেরিয়ে এক দম মোল্লাভায়ার ঠিকানায় গিয়ে হাজির। পাহারওয়ালা ততক্ষণে তামাক পাতার টিবলে জিবের নীচে ঠেলে দিয়ে পুচ করে একবার থুতু ফেল্‌লেন। ন'ব্‌নে বুঝলো এদের কাগজ চালানো জোচ্চুরিরই ব্যবসাদারী ও আপিস এই রকম করে লোক ঠকিয়ে খাবার একটা আড্ডাখানা। কিন্তু এর পর নিশ্চয়ই যে ওর পেছনে পুলীশ হুলিয়া কর্‌বে—তাত ন'ব্‌নে বেশ টের পেয়েছিল। সে তাই মোল্লাভোয়াকে সাহেবের কুঠীতে পাঠিয়ে দিয়ে বস্তীর কাজের ভার নিজে নিজে নিয়ে দিন রাত ঘুরতে লেগে গেল। এই ঘোরা ঘুরিতে মনটাও অনেক দিন পরে ভাল লাগ্‌লো। চিরদিনের দৈন্যে বাড়া জীবন দৌলতের যাদু বাক্সতে বদ্ধ হয়ে মরতে বসেছিল যেন। এবার সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। দিন ছয়েক পরে—একদিন বাজারে বেরিয়ে দেখে রাস্তায় রাস্তায় পুলীশ আপিসের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—"একশ টাকা পুরস্কার।"

"নন্দিতার সম্পাদককে এক গুণ্ডা মেরে ফেরোগার হ'য়েছে তাকে ধরে দিতে পার্‌লে একশ টাকা বকশীস পাওয়া যাবে।"

ন'ব্‌নে প'ড়ে নিজের মনেই নিজে হো হো ক'রে হেসে বাড়ী ফিরে এল। মোল্লা-ভায়ার নামে একখানা চিঠিতে সব লিখে রেখে তথ্‌খুনি আবার বেরিয়ে—সোজা লালবাজার পুলীশ অফিসে গিয়ে হাজির। এক দারোগা বাবু ব'সে সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে ডাইরী লিখ্‌ছিলেন। ন'ব্‌নে ঘরে ঢুকতেই একগাল ধোয়া উড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেষ ক'র্‌লেন—"কি চাই?"

"ধরা দিতে চাই"—

দারোগা বাবু অবাক্ চোখে নব্‌নের আপাদ মস্তক দেখে নিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ন'বনে গ্রেপ্তার হ'ল। আদালতে স্পষ্ট কথায় তার অপরাধও স্বীকার কর্‌লে—সুতরাং বিচারে তার শাস্তি হ'য়ে গেল।

দুই।

কিরণকে এনে "উদ্ধার আশ্রমে" নিরাপদ রেখে সাহেব নিশ্চিন্ত, উদাত্ত হাসি হেসে উঠ্‌লেন। কিরণ জিগ্‌গেষ ক'রলো—"এখন থেকে তা হলে এই আমার আশ্রয় ?"

"অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে" জবাব দিয়ে সাহেব আবার হাস্‌লেন। কিরণ প্রশ্ন ক'রলো—"এখানে আমার কি কাজ ?"

"তোমার প্রথম কাজ মা, ও জীবনের যে ক'খানা পৃষ্ঠা আমাদের অজানা রয়েছে সেই পাতা ক'খানা নিজের হাতে লিখে আমার হাতে দিয়ে ন'ব্‌নের কাছে পাঠাবে।"

কিরণ একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে বল্লো—"এ কী বাবারই হুকুম না ন'ব্‌নের খেয়াল্ ?"

"আমার কৌতূহল আর ন'ব্‌নের মিনতি গো পাগলি।" বলে কিরণের চিবুকটা একবার টিপে দিয়ে সাহেব কিরণের কপালের ওপর এসে ঝুলে পড়া একটা চূর্ণ চুলের গোছা মাথার ওপর তুলে দিলেন।"

কিরণ হেসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে "আচ্ছা" বলে ভেতরের দিকে চলে গেল। ......

তার তিন দিন পরে সকাল থেকে হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ করে শ্রান্ত হয়ে দুপুরে একটু আয়েস ক'রবেন বলে সাহেব শুয়ে পড়েছিলেন। কিরণ ধীরে ধীরে এসে অতি আস্তে পা ফেলে ঘরে ঢুক্‌লো। কিন্তু সাহেব ঘুমিয়ে রয়েছেন ব'লে কিছু না ব'লে আবার তেমনিই আস্তে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু তার হাল্‌কা পায়ের সে মৃদু-ধ্বনিও সাহেবের সতর্কতা এড়াতে পার্‌লো না। সাহেব চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে ডাক্‌লেন। কিরণ গিয়ে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত এক নিমেষ একটুখানি ইতস্ততঃ করেই তখুনি আবার চট্ করে একখানা খাতা সাহেবের সাম্‌নে দিয়ে আর কিছু শোনবার অপেক্ষা না ক'রে অতি "ত্বরন্ত" বেরিয়ে গেল। সাহেব হো হো হাসিটী হেসে খাতাখানা তুলে নিয়ে প'ড়ে গেলেন—

"আমার অধঃপাতের কালা কথা।"

(নবনীর অনুরোধে লেখা।)

বিয়ের ছ'মাস পরে এগার বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এলাম। তা'পর আমারও যে তনু মন রূপে রসে ভরে উঠেছে সে খবর টের পেলুম—সমবয়সী সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প ক'রে। তারা আমায় বল্লে—তাদের বিয়ের কথা,—স্বামীর কথা, নিশীথরাতে মিলন সুখের কথা! শুনে শুনে আমার মনে কি যেন অভাব গুপ্ত শত্রুর মত সহসা আঘাত দিয়ে একটা অসহনীয় লাঞ্ছনায় আমায় পাগল করে তুল্লো। আমি নিজের মনের সঙ্গে প্রাণ পণ লড়াই আরম্ভ কর্‌লাম কিন্তু জয়ী হতে পারলাম না। নিজে নিজেই তর্ক করে মীমাংসা কর্‌লাম। কি অপরাধ এতে? কি পাপ? আশে পাশে কত জনকে ত দেখ্‌ছি কি হয়েছে তাদের? লোকে কেবল দু'এক কথা বল্‌বে। বলুক তাতে আমার বয়ে গেল! এই রকম দোলা চল মন নিয়ে আরো কতদিন গেল। একদিন হঠাৎ দেখি রাস্তা দিয়ে তুমি যাচ্ছ। তোমায় আমি ভালবাসতুম চিরকাল। সে শুধু প্রবৃত্তির খেলা নয় তার ভেতর সত্যিকার প্রাণই ছিল, অনেকখানি। আমার কতদিন মনে হয়েছে নবনী, তুমি যদি আমার স্বামী হতে। যাক্! কিন্তু তুমিও আমার সে নিবেদনের উত্তরে উপদেশ দিয়ে স'রে গেলে। সে ব্যর্থ-নিবেদন আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্লো। আমি ভাবলুম এত অবহেলা? তরুণ যা চেয়ে পায় না আমি তাই সেধে দিতে গেলাম আর ও হতাদর করে চ'লে গেল? তখুনি আমার মনে হল দেখতে হবে আমাকে—এ রূপ, এ কাঁচা তরুনিমার কোনো প্রলোভন আছে কিনা! ন'ব্‌নেকে আমার দেখ্‌তে হবে।

এর ভেতর শুন্‌লাম তুমি গাঁ থেকে চ'লে গেলে। আমারি নামের সঙ্গে তোমার সে যাওয়ার কারণ নাকি অনেকখানি জড়ানো ছিল। একেবারে মিথ্যা হলেও আমার খুব আনন্দ হ'ল মনে মনে। সে তোমার ওপর আমি একটা ভীষণ প্রতিশোধ নিলাম।

কি রকম ক'রে শোধ—নিলাম জান? আমার লেখা যে চিঠিখানা তুমি আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে—কান্থির বোনের হাত দিয়ে—সে চিঠিখানা আমিই কান্থিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সে মিথ্যে করে বলেছিল তোমার সংমা তোমারই বিছানার নীচে ও চিঠি পেয়েছেন।

কিন্তু এই প্রতিশোধেই মন শান্ত হল না। রাগটা তখন—বরং বলি অভিমানটা আমার সব গিয়ে প'ড়লো—সমস্ত পুরুষ জাতের ওপর। তখন কিন্তু বুঝিনি সেটা প্রতিশোধ নেবার তীব্র ক্ষোভ নয়,—প্রবৃত্তির পাপ জ্বালারই ভোজবাজী। আমি শুধু পরকে আঘাত দিয়েই তৃপ্তি পাচ্ছিনে নিজের জন্যেও যেন কি একটা চাইছি। এই—চাওয়াতেই আমার সন্ধিৎসু চোখ শুধু শিকার খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লো।

তুমি যাবার দিন পাঁচ ছয় পর থেকেই—কাম্বির বোন আমার কাছে এসে রোজই বিকালে বসতে লাগ্‌লেন। কত তার সে গল্প—ফুরোয় আর না। এম্‌নি করে একদিন মুচ্‌কী মুচ্‌কী হেসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে জিগ্‌গেষ ক'রলে—"ও বাড়ীর বসন্তবাবু কেমন দেখ্‌তেরে কিরণ ?"

"আমি বল্‌লাম—"বেশ।" কাম্বিঠাকুরের বোন্‌ যা চান—আমার আধ আধ সায়ে সে সব কথা ভেঙেই বল্‌লেন। বসন্তবাবু তাকে পাঠিয়েছিলেন—কাম্বিকে দিয়ে ঘট্‌কী ধরে। আমি বল্‌লাম—"তাঁরতো রূপসী স্ত্রী আছেন।"

কাম্বির বোন মুখ বেঁকিয়ে হাত নেড়ে জবাব দিলে—"হ্যাঁ—সে রূপসী! ডাইনি যে লা।"

অবাক হয়ে জিগ্‌গেষ করলাম "সে কি।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ সব চিঠি ধরা পড়েছে। এমন ডাইনি সে ভাসুরের কাছে চিঠি লিখ্‌তো—তা তার মজাটা টের পাওয়াবে বসন্ত।"

"আমি ভয়-চকিত স্বরে বল্লাম কি করবেন ?"

"শুন্‌তেই পাবি সময়ে" বলে কাম্বির বোন্‌ হাস্‌লেন—সে যে প্রেতিনীর হাসি তা আমি তখন টের পাই নি। তার চারদিন পরে শুন্‌লাম—বসন্তবাবুর স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে। কাম্বির বোন এসে বল্লেন—"শুনেছিস্‌ তো ?" আমি—"হ্যাঁ" জবাব দিয়ে জিগ্‌গেষ কর্‌লাম—তিনি আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন! তাঁর স্বামী কিছু টের পেয়েছিলেন বুঝ্‌তে পেরে বুঝি ?"

কাম্বির বোন্‌—মুখের হাঁ টা—অনাবশ্যক রকম বড় করে বললেন-ওমা। তুইও যেন হাবা ছুঁড়ী। বসন্তই শেষ করেছে ওকে! আমার কাম্বি থাকতে আর ভয় কী ?" ডাকঘরের ডাক্তারখানা থেকে—সেই সব এনে টেনে গুছিয়ে দিয়েছিল—পানের ভেতর দিয়ে ব্যস।

তাপর গাছে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখলো—সেও কাহ্নির বুদ্ধি। কী বুদ্ধি আমার ভাইএর। সকলেরই বাঁচোয়া। দারোগা এসে কিছুই টের পেলেনা—ফাঁসি বলে রিপোর্ট দিয়ে দিলে।"

আমি হঠাৎ শিউরে উঠ্‌লাম। গা-মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগ্‌লো। বল্‌লাম "আপনি আজ যান—আমার দেহ মন ভাল নেই।"

সে দিন তাকে বিদায় করলুম বটে, কিন্তু একেবারে পাপ দূর করতে পারলুম না তো। সে এসে রোজই বসন্তবাবুর কথা আমার কানে কানে শোনাতো। ব'লতো এই দুঃখ পেলে বেচারী বউটার জন্যে—এবার যদি তোকে না পায় তো সে পাগল হয়ে যাবে। সেও আত্মহত্যা ক'রবে। তোর মুখ চেয়েই সে বেঁচে আছে। এমনি করে রোজই ঐ এক কথা!

আমি শেষে স্পষ্ট বলে দিলাম—"না অমন লোকের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় করে আপনি আর বল্‌বেন না—ও কথা আমার কাছে।" কাহ্নির বোন্ বল্‌লেন—"তুই একবার বউটার পাপের কথা ভাবছিস্ না। ওমা! আপন ভাসুর! ছি ছি! কেলেঙ্কারী!! এ কলঙ্ক রাখি কোথায়? অমন মানুষের এই রকম শাস্তিই হওয়া চাই। সোনার চাঁদ স্বামী থাক্‌তে কিনা—হ্যাঁ বুঝি বিধবা বউ-ঝি হয় সে এক কথা। তা না এ কি? তোকেও তো ব'লছি কিন্তু তোর যে সাজে তুই আহা বেচারী! কচি বিধবা!" আমি বল্লুম—"সে যাই হোক আমি পারবোনা আপনি বল্‌বেন না আর সে কথা।"

গেল ক দিন। আবার আরম্ভ হল। সে আমায় সত্যি করেই বোঝালো। আমি—ভাবলুম সত্যিই তো বসন্তবাবুর রাগ হবার কথা বটে!

পাকা পাকি কিছু কথা তবু আমি দিলাম না। এর মধ্যে একদিন মিত্তিরদের বাড়ী বিয়ে। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বসন্তবাবুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। সে কিছু মুখবন্ধ না করে একটাও কথা না ব'লে—একেবারে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললো—"মত দাও, কিরণ, নইলে আমি ম'রে যাব—পাগল হ'য়ে যাব। আমার সব দোষ ক্ষমা করে আমায় ভালবাস—তোমার পায়ে ধরে আমার এই ভিক্ষা।"

আমি বল্লাম "ছি ছি কি কচ্ছেন? পায়ে হাত কেন? আর তা ছাড়া কেউ দেখতে পাবে এক্ষুনি! পা-ছাড়ুন!—আমি বলে পাঠাবো আমার কথা।"

পা ছেড়ে দিয়ে তথ্খুনি উঠে বাঁ হাত দিয়ে সে নির্লজ্জ আমার গলা জড়িয়ে ধরলো—"আ-ছাড়ুন! ছাড়ুন!" বলে আমি—জোর করেই এক রকম তার হাত ছাড়িয়ে স'রে গেলাম! কিন্তু কি সে স্পর্শ। যে যেন একটা বিদ্যুৎ আমার সারা দেহের ওপর দিয়ে চ'ম্‌কে গেল। বসন্তবাবু পাগল হবেন কি আমিই যেন এক লহমায় পাগল হয়ে গেলাম।

পরদিন থেকে কাশ্বির বোনের আবার যাওয়া আসা আর ঐ কথা! "পাগল হয়ে যাবে নইলে বসন্ত।"

আমি বল্লাম "আচ্ছা রাজী আছি; কিন্তু তিনি আমায় বিয়ে করবেন বলে—প্রতিজ্ঞা করবেন।"

"সে কিরে? তুই যে বিধবা।"

"আমি বল্লাম তা যাই হক—তা আমি জানিনে, কিন্তু আমি চাই যে তিনি আমায় বিয়ে করবেন।"

কাশ্বির বোন্ বল্লেন—"তা কি করে হবে?"

আমি বললাম—"কেন বিদ্যেসাগরী মতে।"

কাশ্বির বোন চলে গেল। তারপর দিন খবর দিল—"হাঁ সব ঠিক! বিয়ে হবে কল্‌কাতায়। বসন্ত তোমায় নিয়ে সেই থানেই থাকবে আপাততঃ—তা পর পশ্চিমে কোথায়ও গিয়ে বাড়ীঘর করে সংসার পাত্‌বে। আমি যা কিছু গয়না গাঁটী পারি নিয়ে রাত্তির বারটার সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে গাছতলায় দাঁড়াবো। বসন্ত আগেই গাড়ী আনিয়ে রাখাবে। দুজনে হেঁটে গাঁয়ের বাইরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে মহকুমায় যাবে। সেখান থেকে কলকাতায়।

আমার সত্যিই আনন্দ হ'ল। সাহসও এল মনে অনেকখানি। রাত্তিরে বেরোলাম। কিন্তু বসন্ত কি কেউ নেই—রাস্তায়!—ভাবলুম আসছে। আর একটু দাঁড়িয়ে—কই বসন্ত তো এল না। ভাবছি! একটু পরে একটা গাড়োয়ান এসে বল্‌লে "মাইজি আইয়ে গাড়ী হ্যায়—উঁহা পর।" আমি ভাবলুম বসন্তও বুঝি আছে সেখানে। গেলাম তার সঙ্গে। গাড়ীর কাছে এসে গাড়োয়ান বল্লে "উঠিয়ে।" আমি জিগ্‌গেষ কল্লাম "বাবু কাঁহা?"

গাড়োয়ান বল্‌লে—"আগাড়ি গিয়া, দোসরা গাড়ীমে এক টম্‌টম্ পর—জানেমে হরজা হোনে সেথ্‌তা উসিসে বাবু থোড়া আগাড়ি গিয়া।"

আমি উঠে ব'সলাম। গাড়ী ছুটলো মহকুমার রাস্তায় আমি বাড়ী ঘর সব ছেড়ে সেই ভাস্‌লাম অজানার অকূলে।

রাতের কালোটা পরিষ্কার, ফর্সা হ'য়ে যাবার আগেই এসে ঘাটে ষ্টেষণের টিকিট ঘরের কাছে দাঁড়ালো। গাড়োয়ান আমায় নাব্‌তে ব'ল্লে আমি তাকে জিগ্‌গেস কর্‌লুম—"বাবু কোথায় ?"

সে জবাব দিলে—"আগাড়ি পৌঁছ্‌নেকা তো বাত রহা কেয়া জানে বাবু আয়া কি নেই।"

আমার বুকের ভেতরটা চকিতে দুরু দুরু ক'রে উঠ্‌লো। গাড়োয়ানকে ব'ল্‌লাম—"দেখতো বাবু টিকিট-ঘরে আছেন না কি ?"

লোকটা একটু ক্ষণেই ঘুরে এসে ব'ল্‌লো—"নেহি হ্যায়।"

ষ্টীমার একখানা তখুনি ছেড়ে যাবার জন্য এঞ্জিনের বোমাকলের মুখে প্রচুর ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। আমি নিমেষের ভেতর কর্ত্তব্য ঠিক ঠাওর ক'রে নিলাম। কুল, মান সব ভাসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে প'ড়েছি—বাড়ী থেকে—আরতো সেখানে ফিরে যাবার উপায় নেই। কিন্তু এইখানেইবা একা এই হাজারো জোড়া চোখের সম্মুখে আমার তরুণ মুখ উদ্‌লো ক'রে ব'সে থাকি কি ক'রে ! আর কিছু না হ'ক একটা জবাব দিহীর অন্ততঃ ভয় তো আছে। পুলীসেও ধ'রে নিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া আমাকে আমি ব'লেই কেউ চিন্‌তে বুঝ্‌তে পেরে খবর দিলে বাবার মুখ ও মর্য্যাদা একেবারে কালো হ'য়ে যাবে। তাই গাড়োয়ানকে ব,ল্‌লাম—"আচ্ছা একঠো 'সিকণ্ড' ক্লাসকা টিকিট লে আও ক'ল্‌কাতেওয়ালী।" আমার কাছে টাকা ছিল তাকে দিলাম। টিকিট নিয়ে এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে ব'স্‌লাম। জাহাজ ছেড়ে দিল। তখন তো জান্‌তুম না—বসন্ত আমার পেছনে পেছনেই আছে। সেও ঐ ষ্টীমারেই রওনা হ'য়েছিল। মাঝখানে একটা জায়গায় চুপি চুপি এসে সে আমার কামরায় ঢুক্‌লো। আমি তাকে দেখে প্রথমটা খুবই চ'টে গেলাম। ক্যাবিনে ঢুকেই সে আর কিছু মুখবন্ধ না ক'রে একেবারে দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে ধ'র্‌লো। আমি "ও: কি করেন ও: কি করেন" ব'লে তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'র্‌লাম। সে উঠে এসে আমার পাশে ব'সে ব'ল্‌লো—"কিরণ আমায় ক্ষমা কর ;—তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে আস্‌তে পারিনি,—রাস্তায় কারো মনে সন্দেহ হ'য়ে

হঠাৎ বিপদ ঘটে যেতে পারে—তাই একা এক গাড়ীতে এসেছি। ঘাটে এসে—ময়রা দোকানে ব'সে তামাক খেয়ে—আবার এদিকে এসে তোমার কত খোঁজাখুঁজি ক'রেছি কিন্তু তোমায় পাইনি! আমার চোখ দিয়ে তখন জলগড়িয়ে এল—ভাব্‌লাম্ আমি কি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে ব'স্‌লাম। শেষে সেই গাড়োয়ানের কাছে খবর পেয়ে টিকিট কিনে—জাহাজে উঠেছি।"

তার এ সব কথা আর নির্লজ্জ ব্যবহারে আমার যতই দয়া হোক আর নাই হোক—সে এক রকম নিরুদ্দেশ পথে আমি একা চ'লেছিলাম যাত্রী—তাকে সঙ্গী পেয়ে অনেকটা সাহস হ'ল —ভরসাও পেলাম কিছু। দুদিকে খোলা জলের ফুঁপিয়ে ফেটে পড়া ঢেউগুলোর বুক ভেঙে জাহাজ নির্ঘোষের মত গর্জ্জন ক'রে ছুটেছে—আমারও মনে ঐ কালিন্দীর কল তরঙ্গের মতই চিন্তা-স্রোত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল—বিক্ষুব্ধ, ফেনিল, দ্রুত। বসন্ত তার দু'খান হাতের ভেতর আমার হাতখানা ধ'রে—তাতে মৃদু মিঠি চাপে চাপে টিপ দিতে লাগ্‌লো। কত কথাই সে আমার শোনালে। একখানা রঙিন্ ভবিষ্যৎ—সে আমার চোখের সম্মুখে বিচিত্র ক'রে ধর্‌লে। আমরা এসে ক'ল্‌কাতায় পৌছোলাম। শেয়ালদা নেমেই দেখি—কাহ্নি। মাথায় টিকি—আর গায়—নামাবলীখানা ঠিক আছে! হাস্‌তে হাস্‌তে সে ব'ল্‌লে—"এই যে কিরণ! রাস্তায় ঘুম হয়নি বুঝি? মুখ শুকিয়ে গেছে যে! চল্ চল্ বাসায়—আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি।" ঘোড়ার গাড়ীতে ক'রে কাহ্নি আমাদের ঐ পাপের পান্থশালায় নিয়ে এল। দেখেছো তো ঘরখানা তুমি নবনী! চমৎকার ক'রেই তা সাজানো। আমি কিছু সন্দেহ ক'র্‌লাম না। কাহ্নি খাবার দাবার যোগাড় ক'রে এনে ব'ল্‌লে—"পঞ্জিকায় একটা ভাল লগ্ন আর যোগ পেলেই শুভকর্ম্ম শেষ হবে।"

একটা মধুর ভাবে আমার অন্তর ভ'রে গেল। বিকেলে হাওয়া গাড়ী ক'রে বসন্ত আমায় নিয়ে বেরোলো। আমি নব্যা মেয়েদের ধরণে সাড়ী পরে—মাথায় ভেল উড়িয়ে, জুতো প'রে বেড়াতে গেলাম। এ নতুন জীবন যাত্রা সুখের ব'লেই প্রথমটা মনে লাগ্‌লো। রাত্তিরে দুজনে আমরা দু' বিছানায় শুতাম। কাহ্নি এবাড়ীতে থাক্‌তো না। তার যেন আর কোথায়-ছিল আস্তানা। দু' বেলা এসে সে আমার খোঁজ খবর নিয়ে যেতো।

এম্‌নি করে—একদিন আমার হঠাৎ নজরে প'ল—গুটী কত বিধবা মেয়ে মানুষ আর সেই বটাই বাবু! যা তা লজ্জা-জনক ব্যাপার চল্‌ছে।

আমার ঘরের নীচে গাড়ী বারান্দায় ও পাশে। আমারই দেখে লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে এল। সন্দেহ হল ভয়ানক। জায়গাটা বুঝলাম পাপের, ব্যভিচারের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু কিছু বল্‌লাম না ওদের। সে দিন রাত্তিরে বসন্ত ঘরে ফিরলো যখন তার মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছিল। মুখে লালা ও লোল যেণা হয়ে গড়াচ্ছিল। চোখ লাল। সে এসে আমায় ধ'রতে চাইলে আমি একটু সরে গেলাম। হো হো হাসি হেসে আবার ছুটে এল। আমি আরো সরে গেলাম। বসন্ত ব'ল্‌লে "কিরণ আজ দয়া কর।" আমি জবাব দিলাম "না বসন্ত, প্রতিজ্ঞা করেছ বিয়ে ক'রবে।"

"কালই আমাদের বিয়ে হবে কিরণ এতে কোনো দোষ নেই।"

আমি ব'ললাম "না নিজেকে চোখ ঠেরে ঠকাতে আমি চাই না। প্রিয়তম! তুমি আমার, চিরদিন আমার। আর একদিন মোটে দেরী।"

"আর না আর না" বলে বসন্ত আবার ছুটে এল। এবার সে উন্মাদ। নেশা তার মাথায় রঙ খেল্‌তে সুরু করেছিল সে পাগল হয়ে ছুটে এল দুখান হাত বাড়িয়ে। আমারও প্রাণের মধ্যে কামনা বাঁধনহারা ব্যাকুল হয়েই উঠ্‌ছিল বটে শাসন ভোলা সে বিদ্রোহির জয়ধ্বজা তুলে মনকে আমার ও দুর্দ্দম করে আন্‌ছিল। কিন্তু ত'খুনিই মনে প'ল এ বাড়ী. সেই মেয়ে মানুষকটা! ভয়ানক! শেষে নিরাশ্রয় ফেলে চলে যেতে এরা অনায়াসে পার্‌বে। বিশেষতঃ কাহ্নি সঙ্গে আছে। আগে বিয়ে হওয়া চাই। আমি ব'ললাম "না না থাম।" সে জোর করে আমায় ধরতে এল কিন্তু মাতালের শক্তি তার পা টল্‌ছিল আমি জোরে একটা ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে তা পর টেনে নিয়ে তার বিছানায় তাকে শুইয়ে দিলাম। দু একবার উঠ্‌তে চেষ্টা করলো কিন্তু আমি চেপে রেখে তাকে উঠ্‌তে দিলাম না। একটু পরে অসাড় হয়ে প'লো। আমি গিয়ে শুলাম কিন্তু ঘুমোলাম না।

সকালে পরিষ্কার মাথা নিয়ে জেগে উঠে বসন্ত আমার মুখের পানে তাকিয়ে হাস্‌লে। তা পর বেরিয়ে গিয়ে খানিকটা পরে ঘুরে এসে ব'ললো "হ্যাঁ সব ঠিক হয়েছে। কাল দিন ভাল। কালই

আমাদের বিয়ে কিরণ।" আমি হেসে তার গালটা টিপে দিয়ে ব'ললাম "আমার সৌভাগ্য গো ভাগ্যের দেবতা।" পরদিন বিকালে দুজনে হেঁটেই গেলাম মিউনিসিপাল বাজারে ফুলের মালা আর তোড়া কিনতে। গন্ধ কাপড়, জামা এ সবও কিনলুম কতকগুলো। তা'পর একখানা হাওয়া গাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। বসন্ত বললে তোমার গয়নাগুলো ময়লা হয়ে গিয়েছে বিয়ের দিন নতুনই হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি তাই হল না; আচ্ছা পরে করে দোব। এখন দাও ওগুলো ঐ পাশের স্যাকরার দোকান থেকে আজের মতন একটু রঙ করে আনি।

সে যে তাদের একটা প্রকাণ্ড ছলনা বোম্বেটের ফেরেব বাজী তা আমি তখন একটুও বুঝলাম না। আমার মনে তখন বিয়ের কথাই মধুবৃষ্টি ক'রছিল। আমার বাক্সটা দিলাম। সে প্রায় তিন হাজার টাকার গয়না। এক ঘণ্টা গেল। দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা না কেউ ফিরলো না। পুরোহিত যার আসার কথা ছিল সেও এল না। আমার কল্পনার বাসর চির বিরহের ব্যর্থ শয্যায় পরিণত হল। বুঝলাম পিশাচেরা দুজনে গহনা নিয়ে পালিয়েছে—আমায় এই গহ্বরের ভিতর ফেলে। তখন বুঝলাম এ সব কাঞ্চির কারসাজী। বাবার সঙ্গে সীমানা নিয়ে মারামারি হয়েছিল বলে সে বোধহয় এই ভীষণ প্রতিশোধ নিলে। বসন্তরও বোধহয় অনুরোধ খানিকটা কাজ করেছিল। সে ভেবেছিল ফাঁকি দিয়ে—সার্থক হয়ে শেষকালে চলে যাবে। কিন্তু দেবতা রক্ষা করেছেন আমি নারীর নিজস্ব নিঃশেষে তাকে বিলিয়ে দেয় নাই দেহ আমার সে স্পর্শ করেছে। কিন্তু সেটা আমি তত বড় অপরাধ মনে করি না।

তা'পর গভীর রাতে তুমি গিয়ে আমায় উদ্ধার করলে। আমায় অধঃপাতের অতল থেকে তুলে এনে এক স্বর্গের প্রান্তে আশ্রয় দিলে। আমি সে নরক কুণ্ড থেকে উদ্ধার পেলাম। তুমি আমার অকূল পারের খেয়ার নেয়ে চিরকালই ছিলে আজও আছ। নিপুণ হাতে তরণী বেয়ে সেই হাবুডুবু থেকে বাঁচিয়ে আমায় তীরে এনে দিলে। ইতি—

শ্রীকিরণময়ী রায়।

পড়া শেষ হলে খাতাখানা ব্যাগের ভেতর চাবি বন্ধ করে রেখে সাহেব উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ডাকের চিঠি, কাগজ পত্র এল। সাহেব কলকাতার খবর ক'দিন থেকে জানতেন না—তাড়াতাড়ি "নন্দিতা" খুলেই দেখেন—বড় বড় "হেড্‌লাইন" ছাপা রয়েছে।

"পাষণ্ডের উপযুক্ত দণ্ড ।"
"গুণ্ডার সহচর গুণ্ডার শাস্তি ।"
"নন্দিতার মহামাননীয় সম্পাদককে ঘুষি প্রহার ও চপেটাঘাত করিবার জন্য নবনীতমোহন চক্রবর্ত্তীর
একমাস সশ্রম কারাবাস ।"

সাহেবের কপালের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম টস্ টস করে এল। তিন চার বার করে তিনি লেখাটা পড়্লেন। সে খবর তাঁর বিশ্বাস করতে হ'চ্ছে হচ্ছিল না। শেষবার পড়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। বুকের সে হঠাৎ ব্যথাটা চেঁচিয়ে কমিয়ে নেবার জন্যে—বুড়ো চীৎকার করে ডাক্লেন—"কিরণ।"

ডাক শুনেই কিরণের মাথাটা কাটা পড়্লো যেন। সাহেবের স্বাভাবিক রকম রুক্ষ,—আক্ষেপে আধ-নিরুদ্ধ স্বরের মধ্যে সে যেন শুনতে পেলে তারই বিরুদ্ধে ভৎর্সনা তীব্র হয়ে উঠেছে। এক সেকেণ্ড সে নিশ্চল হ'য়েই বসে রইল। তারপর ভয়ে ভয়েই ধীরে ধীরে উঠে সাহেবের ঘরে ঢুকলো। সাহেব বুকের ওপর সাদা দাড়ি-গোছার নীচে কাগজখানা রেখে ইজিচেয়ারে প'ড়েছিলেন। কপালের ওপর রেখাগুলো কি যেন বিক্ষোভে কুচ্কে উঠেছিল। মুখের উপর বিরক্তির ভাবটা পরিস্ফুট। কিরণ ভাব্লো আমার জীবনের সত্যি কথাটা প'ড়ে সাহেব এতই রুঢ় হয়ে উঠ্লেন। সে আস্তে আস্তে ডাক্লো "বাবা।"

সাহেব লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"কিরণ, ন'ব্নের জেল হয়েছে!"

নিজের চিন্তাটা কিরণের মনের অনেক নীচে নিমিষে চাপা পড়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে জিগ্গেষ করলে "সে কী?"

সাহেব কাগজখানা কিরণের হাতে দিলেন। সবখানি পড়ে সে আবার প্রশ্ন করলে—এ "ঘুষি প্রহার" ও চপেটাঘাতের মানে কি,—কারণ কি হতে পারে—কিছু ভেবে দেখেছেন কি?"

গম্ভীর ভাবে সাহেব জবাব দিলেন "বোধহয় তোমার কথা যা লিখেছিল ওরা—সে মিথ্যা নব্‌নে বরদাস্ত করতে পারে নি।" মাথা নীচু করে কিরণ একটুক্ষণ মাটীরদিকে তাকিয়ে যেন—তার অতীত জীবনের কথাগুলো এক নিমেষে মনে করে নিল, লজ্জা আর রাগে সমস্ত মুখখানা তার রাঙ্গা হয়ে এসেছিল তারই জন্যে নিরপরাধ নির্দ্দোষ ন'ব্‌নের বারে বারে এই দুঃখ বরণ? গাঁ-ছাড়া বাড়ী-ছাড়া করে সেই শেষে তাকে জেলে পাঠালে? কিরণ ধাঁ করে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো—সে মাথা উচু করে দীপ্ত দুই চোখ বিস্ফারিত করে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্ল—"তাই যদি হয় আমিও ছাড়বোনা এর শোধ না নে'য়া পাপ। বাবা আপনি ব্যবস্থা করুন—আমি মোকদ্দমা করবো—আপনি উকীলের নোটীশ দিন।" "তুই রাজী তা হলে? ব্যস্।" বলে তখুনি মোল্লাভাল্লাকে এক চিঠি লিখে দিয়ে তাঁর ডাণ্ডা আর ব্যাগ নিয়ে সাহেব তৈরি হলেন—তারপর দিনই ক'লকাতায় রওনা হবেন।

তিন।

জেলেও সেদিন রবিবার। কয়েদীদের সঙ্গে—বাইরের লোক কেউ ইচ্ছে ক'র্‌লে রবিবারে দেখা ক'র্‌তে পারেন। জেলারবাবু এসে ন'ব্‌নেকে খবর জানালেন যে একজন কে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌বেন। ন'ব্‌নে ভাব্‌লো—খবর পেয়ে সাহেবই বুঝি আস্‌ছেন। সাহেবের কথাটা মনে প'ড়েই ঘাড়ে পিঠে তার জেলের শাস্তি ঘানির ব্যথাটা যেন হঠাৎ টাটিয়ে উঠ্‌লো—নারকোলের ছোব্‌ড়া টেনে টেনে হাতে ঘা হ'য়ে গিয়েছিল—দুই হাতে তার বুঝি আর একটা শিশুর হাতের বলও নেই। তার বড় স্নেহশীল আশ্রয়দাতা সাহেব আস্‌ছেন—তার এ ব্যথা যে শুধু বিঁধে তার—একজন দরদী—সে তিনিই বুঝবেন! ন'ব্‌নে জেলারবাবুকে মুচ্‌কী হেসে ধন্যবাদ দিল।

খানিকটা পরে ওয়ার্ডার এসে ব'ল্ল—তিনি এসেছেন। উৎসুক ন'ব্‌নে তাকিয়ে দেখে—"মোল্লাভাল্লা।" মনটা অনেকখানি মিইয়ে গেল। মোল্লাভাল্লা বিশেষ কিছু ভূমিকা না ক'রে—সোজাসুজি সাহেবের চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ন'ব্‌নে প'ড়্‌লো—

"উদ্ধার আশ্রম।"

ঠিকানায় নামটা প'ড়েই ন'ব্‌নে চকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু কিছু না ব'লে প'ড়ে গেল—

"উদ্ধার আশ্রম।"
"শুক্রবার।"

বোনি ভান্না,—

'নন্দিতায়' প'ড়লাম—ন'ব্‌নের জেল হ'য়েছে। আমি একবারও ভাবি নি "বয়" ধাঁ ক'রে এ রকম একটা মারামারি ক'রে ব'স্‌বে। কাজটা সে ভাল করে নি। আমাদের যা দিন-গুজরানী হাল -তাতে যতটা সম্ভব নিজেদের এড়িয়ে, বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ! সে কী জানে না—আমি নন্দিতার সম্পাদকের কোনো কথার কোনো দিন প্রতিবাদ করি নি? তার একটা মানে নিশ্চয় আছে। এবার তো দেখ্‌ছি—পুলীশের টে'কী, টিকটিকি সব আমাদের পেছনে জোঁকের মতন লেগে ব'স্‌বে। ব্যাপারটা ঢাক পিটিয়ে "রাষ্ট্র" করা হ'ল। দোমহলা কোঠীর ভড়ং জাঁকিয়ে রেখেও তাদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না — কাজের নানা ব্যাঘাত ঘট্‌বে! তবে সম্পাদকেরও শেষ ঘনিয়ে আস্‌ছে—সে কথা যাক। তুমি জেলে ন'ব্‌নের সঙ্গে দেখা ক'রে এ চিঠি দেখিও। পরশু র'ব্‌বার তুমি ভোরেই যাবে। আমি ৮টার ট্রেণে ক'ল্‌কাতায় নেবে বরাবর জেলেই গিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
তোমার—সাহেব।

ন'ব্‌নে পড়া শেষ ক'রে ভান্নার হাতে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে—বড় বড় দুই চোখে তার মুখের দিকে একবার তাকালে। তার নির্ব্বাক সে দৃষ্টির মানে ভান্নার কাছে কেমন কিছু স্পষ্ট হ'য়ে এল না। ভান্না চিঠিখানা জড়িয়ে লকেটে রেখে দিয়ে ব'ল্লে;—"সাহেব আস্‌বেন ন'ব্‌নে।"

ন'ব্নে শুধু সঙ্ক্ষেপে উত্তর দিল ;—"হ্যাঁ"।

তার মনের মধ্যে তখন কতকগুলো বিরুদ্ধ ভাব আর ধারণায় একটা তোলাপাড়া উত্তাপ হ'য়ে এসেছিল। সে ভাব্ছিল—আমি কি তা হলে খামখা নন্দিতার সম্পাদককে মেরেছি! সে দেখ্ছি—সত্যি কথাই লিখেছিল। এইতো সাহেব নিজেই ঠিকানা লিখ্ছেন—"উদ্ধার আশ্রম"। আশ্রম একটা তাঁর তা হলে আছে। হঠাৎ ন'ব্নে ব'ল্ল—"দেখি চিঠিখানা—আর একবার!"

ভান্না—চিঠি বার ক'রে দিলে—এক দৃষ্টিতে—"উদ্ধার আশ্রম" ঐ একটা কথার দিকে দেখ্তে—লাগ্লো। মনে হচ্ছেল চিঠি পড়ছে কিন্তু ন'ব্নে ততক্ষণ ভাব্ছিল—কিরণ তরুণী ;—মনকে পড়া মুখস্ত ক'রিয়ে শাসন করার বল—তার কাঁচা হৃদয়ের মধ্যে নেই! এবং ভোগ আর লালসার তৃষা তাকে আকণ্ঠ পিপাসিত ক'রে তুলেছে—সেই তৃষা মেটাবার জন্যেই কি সাহেব তাকে নিয়ে গিয়েছেন? যদি তাই না যাবেন—ত'ব আমাকে সবকথা স্পষ্ট ক'রে ব'ল্লেন না কেন? "নন্দিতার" সম্পাদক সব খবর জানে! নিশ্চয় তাই এ নিশ্চয়!

চট ক'রে অস্থির হ'য়ে উঠে ন'ব্নে মোল্লা ভান্নাকে জিগেষ্ ক'র্লো ;—"উদ্ধার আশ্রমে—কারা থাকে?"

ভান্না হেসে উত্তর দিল ;—"জনকত হতভাগিনী।"

"মানে—বেশ্যা?"

ভান্না—স্তম্ভিতের মতন গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে, ব'ল্ল—"ছি ন'ব্নে! তুমিও নন্দিতার সম্পাদকের কথাই বিশ্বাস ক'রছ!"

ন'ব্নে আর কিছু জবাব দেবার আগেই—সাহেব ঘরে ঢুকে—তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'র্লেন। কিন্তু এ সস্নেহ গদ্গদ্ আলিঙ্গনও আজ ন'ব্নের এই অকস্মাৎ বিদ্রোহী অন্তরাত্মার তুমুল আন্দোলন শান্ত ক'র্তে পার্লো না।

সাহেব কি কি হ'য়েছিল—ন'ব্নের কাছে সব কথা শুন্‌লেন। তা'পর ব'ল্লেন "ওঃ! বয়, জেলের কষ্ট যে তোমার সহ্য হবে না—পিঠটা ভেঙ্গে প'ড়বে! বড় ছেলে-মানুষ বয়,—তোমরা বড় ছেলেমানুষ!"

বুড়োর গালের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে এল। ওয়ার্ডার হাঁক্‌লো—"টাইম হো গেয়া।"

বার দিন পরে তার খালাস হবার দিন—সাহেব আবার আস্‌বেন ব'লে ভাগ্নাকে সঙ্গে ক'রে জেল থেকে বেরিয়ে এলেন—সেদিন তিনি নাকি ন'ব্নেকে বুকে ক'রে নিয়ে যাবেন। ..

আজ সাহেব—একবারও হো হো ক'রে হাস্‌লেন না। সে সরল সহাস ভাবের বদলে তাঁর সে দিনের গম্ভীর শুষ্ক ব্যবহারটা ন'ব্নেকে আরো সন্দিহান ক'রে তুল্লো। তার কাছে মনে হ'ল—সাহেব যেন আর সে সাহেব নেই! তাঁর প্রথম দিনের প্রতিজ্ঞাও এতদিনে তিনি ভাঙলেন! আমায় সাহেব কোনো দিনও কড়া কথা ব'লে শাসন ক'র্‌বেন না ব'লেছিলেন কিন্তু আজ তিনি স্পষ্ট ক'রে লিখ্‌লেন—কাজটা আমার ভাল হয় নি। শুধু দু-ফোঁটা চোখের জলকে তাঁর প্রাণের সহানুভূতি ব'লে আজ আমি নিতে রাজী নই। আমি তো তাঁরি সুনামে বা পাছে কালি পড়ে—সেই ভয়ে সম্পাদককে শিক্ষা দিয়েছি—কিন্তু সম্পাদক তো মিথ্যে কথা বলে নি। তাই সাহেব আজ আমার কাজটা অন্যায় ব'লে গেলেন। বাল্যের সে উচ্ছৃঙ্খল, বয়াটে মনোবৃত্তিটা তার আজের এই আন্দোলিত মনের মধ্যে অনাহুত জেগে উঠে ন'ব্নেকে হঠাৎ বিচলিত ক'রে তুল্‌লো সে ভাব্‌লো যে সাহেবের সে অতি বড় গলগ্রহ! এ অকারণ ধারণাটা কিছুদিন থেকেই তার মনে যাদু খেল্‌তে সুরু ক'রেছিল। সাহেবের কথা তার কাছে আজ তাকেই শাসন ব'লে মনে হ'ল। সে বিশ্বাস ক'র্‌লো—কিরণকে সাহেব—"কুকার্য্যেই লিপ্ত" ক'রেছেন! আমি কি তাকে নরক থেকে এনে আবার পাপেরই পঙ্ক-কুণ্ডে ফেলে দিলাম।

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'স্‌লো—সাহেবের দো-মহলা বাড়ীতে তাঁর অনাবশ্যক গলগ্রহ হ'তে সে আর ফিরে যাবে না! তবে? আবার অনাহার? আবার ক্ষিধে? আবার মুটেগিরির শিক্ষানবিশী? তা যাই হোক—সে দেখা যাবে! কিন্তু ঈশ্বর, যদি তুমি থাক—

তা হ'লে এই ভিক্ষা মঞ্জুর ক'রো—সাহেব এসে পৌঁছোবার আগেই খালাস পেয়ে আমি যেন জেল থেকে বেরোতে পারি।

ভোর ছটায় ন'ব্‌নে মুক্তি পেলে। তাড়াতাড়ি এক রকম ছুটে চ'লেই, সে একটা গলি রাস্তার ভেতর গিয়ে প'লো। খু। সতর্কে সে চ'লেছে যেন সাহেব কোনো মতে তার সন্ধান না পান। অনেকক্ষণ হেঁটে মেছোবাজারের মুচী-বস্তীতে এসে হাজির। বুড়ো একজন জুতোর ওস্তাগর কেবল দোকান খুলে তার বাটাল ভুরপাণ গুছিয়ে রাখ্‌ছিল। ন'ব্‌নেকে দেখেই উঠে গিয়ে হেঁট হ'য়ে সেলাম ক'রে ব'ল্‌লো—"বহুৎ দিন সে বাবাকো ভেট নেহি—জিউ আচ্ছা হ্যায়?"

"হ্যাঁ বেশ আচ্ছা হ্যায় বুড়ো" ব'লে ন'ব্‌নে দোকানে উঠে গিয়ে—বুড়োর হাতখানা দু'হাত দিয়ে ধ'রে আপ্যায়িত ক'র্‌লে। বুড়ো মুচী আহ্লাদে, কৃতজ্ঞতায় গ'লে গেল। দু'হাত দিয়ে আবার সেলাম ক'রে ন'ব্‌নেকে তার দোকানের পাশে বসালো। এই সব দিন-কামিলা, মজুর মিস্ত্রীরা, সাহেব, মোল্লাভায়া আর ন'ব্‌নের বন্ধু, মরমী পরমাত্মীয়। এদের ঘরে ঘরে রোগে শুশ্রূষা, ক্ষিদেয় খাবার, উৎসবে উপহার নিয়ে গিয়ে এদের সুখ-দুঃখকে নিজেদের ব'লে মেনে নিয়ে ছোটলোকের এরা রাজা হ'য়ে ব'সেছিল।

ন'ব্‌নে বুড়োর দোকানে ব'সে ব'সে তার কাজের ওপর ফেলে রাখা একপাটী জুতোয় হাপসোল লাগাতে লেগে গেল। বুড়ো "হো হো" ক'রে প্রাণখোলা আনন্দে হেসে নিজে আর একপাটীর কাজ ধ'র্‌লে। হাপসোল শেষ হ'লে ন'ব্‌নে বুড়োকে জুতো দেখিয়ে জিগ্‌গেস ক'র্‌লে—"ক্যায়সা হুয়া ওস্তাদ?"

বুড়ো তার হাতিয়ারের বাক্স থেকে চামড়া বাঁধা মোটা কাঁচের চস্‌মা যোড়া বার ক'রে চোখে দিয়ে—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জুতো পাটী দেখ্‌লে একটু,—একটু এক একবার হাস্‌লে—তা'পর ব'ল্‌লে—"উম্‌দা হুয়া বেটা।"

ন'ব্‌নে ব'ল্‌লে—"এ বুঢ়ুয়া বাপ,—হাম আয়া আজ থোড়া ভিক্ মাঙ্গ্‌নে—দেগা?"

মুচী আবার হেসে ব'ল্ল—"কেয়া ভিক্—বোল—দেগা—আজ রাজাকো সোণা দান দেগা।"

ন'ব্‌নে একটা পুরোণো চামড়ার থ'লে—আর এক প্রস্থ হাতিয়ার ভিক্ষা চাইলে। বুড়ো তখুনি উঠে গিয়ে সব যোগাড় ক'রে আন্‌লো।

এর মধ্যে ন'ব নে ঐ দোকানের ওপর ব'সে-ব'সে ধুলোয় ঘ'ষে তার কাপড় জামাটা যতটা সম্ভব কালো ক'রে নিয়েছিল!

বুড়ো তোড়যোড় যন্ত্রপাতি এনে দিলে ন'ব্‌নে খাঁটি খোট্টাই ধরণে কাপড় প'রে চামড়ার থ'লে বগলে তুলে নিয়ে হেসে রাস্তার বেরিয়ে প'ল। "লা—ব্রিস্—স্ স্।" খানিক দূর গেলে এক ছোক্‌রাবাবু ডাক্‌লেন—তাঁর সেলিমে ক'ড়ে আঙুলের কাছে ফুটোটার তালি দিয়ে—কালি লাগাতে হবে।

ন'ব নে ওস্তাদ জুতো মিস্ত্রীর মত, থলিয়া থেকে চামড়া হাতিয়ার বার ক'রে নিয়ে ব'সে—বেমালুম তালি জুড়ে কালি ঘ'ষে দিল।

ছোক্‌রা জুতো পাটী বার পাঁচ সাত উল্টে পাল্টে দেখে ব'ল্লেন—"এ কি ক'রেছিস রে—কি সেলাই দিয়েছিস?"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"আচ্ছা তো হুয়া হুজুর।"

"থাম থাম বেটা,—কিচ্ছু জানিস্‌নে জুতো পাটীই আমার নষ্ট ক'রেছিস।"

"নেহি বাবু আচ্ছা হুয়া বঢ়িয়া তালি কস্ দিয়া।"

"হ্যাঁ—খুব বঢ়িয়া তালি দিয়েছ—আর কালি যা দিয়েছ—মাঝে মাঝে ত সাদাই র'য়েছে।"

ন'ব্‌নে কিন্তু বরাবর সমান টেনে ঘ'ষে, চক চ'কিয়ে কালির জেলা তুলে দিয়েছিল। বাবু ব'ল্লেন—"নে, বেটা ৪ পয়সা—যা।"

ন'ব্‌নে ব'ল্লে—"ছে পয়সা কা বাত রহা—আভি চার পয়সা।"

"ঐ ঢের দিয়েছি—যা সেরেছ জুতো—ন'ব্‌নে মানে বুঝ্‌লো—ঐ দুটো পয়সা। কিচ্ছু না ব'লে পয়সা চারটে নিয়ে আবার হেঁকে চ'ল্লো—"লা ব্রিস।"

সারাদিন ঘুরে—তার দেড় টাকা রোজগার হ'ল। এক বাঙালী হোটেলে দশ পয়সার ভাত খেয়ে ফুল বাগানে বস্তীতে গিয়ে ঘুমোলো।

লা ব্রিস্ ক'রে মাস খানেক গেল। পুঁজি যা হ'ল তাই দিয়ে আর কিছু দোকানে বাকী রেখে খানকত কাপড় আর চার পাঁচটা ব্লাউজ কিনে ন'ব্নে বেরোলো—বাড়ী বাড়ী ফিরি নিয়ে—"ভাল ভাল কাপড় চাই—সাড়ী চাই,—সেমীজ, বডি চাই"—

কত তরুণী—কাঁকন বাজিয়ে বেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাক্‌লেন। নেবেন না যিনি তিনিই ঘাঁটলেন বেশী। দশ আনার জিনিষ দর ক'র্‌ছেন চার আনা।

ন'ব্নে হাঁক্‌লো—"ভাল ভাল কাপড় চাই—সাড়ী সেমিজ।

ঘোষেদের মেজবউ মিশিঘষা দাঁত বার ক'রে—হেসে ফুলদার ব্লাউজ একটা কিনে প্রতিবেশী টগ্‌রোর মাকে দেখালেন। ট'গ্‌রোর মা কিন্‌তে পাল্লেন না ব'লে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লেন—"বেশ হ'য়েছে—তোর রঙে মানাবে চমৎকার!—আমাদের মিন্সে—আট খোয়ারী হোক ড্যাক্‌রার একটা পয়সা পাবার যো নেই গয়না গাঁটী তো হ'লই না—একটা যে জামা গায় দোব তাও পোড়াকপালে নেই।"

এক সুন্দরী তাঁকে আশ্বাস দিলেন—"কি কর্‌বি ভাই, গরীবের ঘরে প'ড়েছিস।"

ন'ব্নে শুনে একবার মনে মনে হেসে অনুকরণ করা ঝাঁঝে বাজানো গলায় আবার হেঁকে চ'ল্‌লো—"সেমিজ, বডিস চাই—ভাল ভাল কাপড়—ড়"—

এরপর "চাই"—এর—"ই"র খাদের রিসটা সহরের কোলাহলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে সাহেব, আঁতি পাঁতি খুঁজে ফির্‌ছেন—কোথায় ন'ব্নে—কই ন'ব্নে? জেলখানায় তাকে না পেয়ে সাহেব বাড়ী ফিরেছিলেন—কিন্তু ন'ব্নে তো ফেরে নি! সেই থেকেই সাহেব খুঁজে খুঁজে ফিরছেন। তাঁর বুকটা থেকে থেকে ভয়ে কেঁপে ওঠে—ন'ব্নে—তাঁর "বন্ধ"—অপঘাতে মরে নি ত? বুকের ওপর তখন একটা বড় যন্ত্রণা মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে ওঠে। সাহেব দিন রাত ক'রে—পাগলের মত ঘুরে ঘুরে—ন'ব্নের সন্ধান ক'চ্ছেন—কিন্তু কি

আশ্চর্য্য!—অমন বাহাদুর খুঁজিয়েও এ ছোকরার কোনো সন্ধান ক'র্‌তে পাচ্ছেন না। সেও অতি সাবধানে সাহেবকে এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে ফির্‌ছে!—ন'ব্‌নে দু'দিন এক বস্তীতে থাকে না—এক হোটেলে খায় না—এক পথে ফিরিতে বেরোয় না—গলি খুঁচি দিয়ে তার চলাচল। সে চলার তার—দেহে কিছু খেদ,—কি মনে কোনো ক্ষোভ নেই। এক একবার শুধু বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে যখন—সাহেবের হো হো হো হাসিটা শুন্‌তে ইচ্ছে করে।—রাত্তিরে মাদুরের ওপর শুয়ে কোনো কোনো দিন যখন অনেকক্ষণ ঘুম হয় না—সাহেবের বুকে লাগে। গভীর রাতে অনেক দিন আচম্বিতে মনে প'ড়ে সে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—ইজেলের ওপর সেই ছবিখানা যে—অসমাপ্ত ফেলে চ'লে এয়েছে—তারি টুক্‌টাক বাকী রেখা ক'টা টেনে শেষ কর্‌বার জন্যেই কি তার আর একবার ফিরে যেতে হবে—সাহেবের বাড়ী? না। আর নয়। এতকাল পরের—এ মধুর মুক্তি, বাঁধন আলগা খোলা-পাওয়া. এই অবাধ স্বচ্ছন্দ জীবনের—এ স্বাধীনতা আর ইচ্ছে ক'রে—হারাবো না। সাহেবের বাড়ী ফিরে গিয়ে সেখানকার সৌখীন বাঁধাবাঁধির ভেতর—আবার জাল-ফাঁসে আটকিয়ে পড়া—আর কিছুতেই হ'তে পারে না। ঐ বাড়ী, গাড়ী, খানসামা, খেদমৎগার—এ সব ভোগ ক'রে—ওরকমের কুড়িয়ে পাওয়া রাজ্‌গী করা—ন'ব্‌নের কাছে সখের যাত্রার দলে ভাড়াটে রাজার পাট করার মতই একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা ব'লে মনে হ'ল। এতদিন পরে আবার তার মনে অনেক দিনের হারানো কৈশোর এসে হানা দিল—মণ্টু যেন তার কাঁধে চেপে ব'স্‌লো। সে দিনের একগুঁয়ে বয়াটে বুদ্ধি—এতদিনে আবার তার মনের তন্ত্রাটাকে ঝঙ্কার দিয়ে বাজিয়ে তুলেছে।

কদিন পরে নিশ্চিন্ত, উদাসীন—ফিরি নিয়ে হেঁকে বেরোলো—"সাড়ী সেমিজ চাই"—। রাজধানীর রাস্তায় সারাদিনই জন-যানের একটানা চলাচল—ন'ব্‌নেরও গলায়—একঘেয়ে সুর—সেও দিনমানই হেঁকে চ'লেছে—"সাড়ী, সেমিজ চাই—ভাল ভাল বডিস্"—এ পথ থেকে,—ওপথ,—এ গলির ভেতর দিয়ে—বড় রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত।—ঐখানে ট্রামের রাস্তা,...... বেলা তখন প্রায় তিনটে ন'ব্‌নে হাঁক্‌লো, "ভাল ভাল কাপড়—চাই"—ওদিকে ট্রামের পাশে এক ছোক্‌রা সেই সুরের সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"মাসিক দেয়ালী"বাবু ছ'আনা—একখানা—এ মাসে নবনীবাবু গল্প বেরিয়েছে—নতুন গল্প—"জেল কয়েদী।"

হঠাৎ কথাটা শুনে ন'ব্‌নে আহ্লাদে নিজের মনে নিজেই একবার হেসে উঠ্‌লো—ওধার থেকে তাড়াতাড়ি ট্রামের কাছে এসে ।৵০ আনা দিয়ে একখানা কাগজ কিনলে। ইচ্ছে তখুনি খুলে পড়ে ;—কিন্তু মাথায় তার ফেরীর সওগাৎ—হাতে কাগজ একমনে প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে যদি হুমড়ি খেয়ে গিয়ে কারো ঘাড়েই পড়ে। ন'ব্‌নে কাগজখানা ব'গলে নিয়ে—হেঁকে চ'ল্‌লো—"সাড়ী—সেমিজ।"

খানিক দূর গিয়ে—আবার ইচ্ছে হ'ল দেখি কাগজটা। বগল-তলা থেকে "দে'য়ালী" টেনে বার ক'রে খুল্‌লো—বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠাটাতেই দেখে লেখা র'য়েছে—বড় বড় অক্ষরে ছাপা—"বয়! বয়! বয়!" ন'ব্‌নে আগাগোড়া প'ড়্‌লো—"বয়, বিষম বন্যায় দেশ ভেসে গিয়েছে—আমাদের ডাক এসেছে, ভাগ্না আর আমি দু'জনেই ক'ল্‌কাতা ছাড়্‌লাম। তুমি যদি বেঁচে থাক আর ক'ল্‌কাতায় থাক—কি যেখানেই থাক ক'ল্‌কাতায় এসে এখানকার কাজ চালাবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—সাহেব।

ন'ব্‌নের মনে চিন্তার ধারা এক মুহূর্ত্তেই উল্টো বইতে সুরু হল। কৈশোরের নিকষ বুদ্ধি আবার তাকে বয়াটে বানিয়ে তুলেছিল—হঠাৎ তা যেন উপে গেছে—ঘাড়ের ওপর সে উল্লুক বুঝি আর নেই। ন'ব্‌নে ফিরি নিয়ে মুখ ফিরিয়ে—হেঁকেই চ'ল্‌লো—"সাড়ী, সেমিজ চাই,"—মুখে সে বল্‌ছে—ভাল ভাল কাপড় মনে মনে ভাব্‌ছে—"না—সাহেব আমার ঢের ক'রেছেন—তাঁর অনেক খেয়েছি—এ ডাকে আমার সাড়া দিতেই হবে। কিন্তু বন্যা হ'ল কোথায়? খবরের কাগজ ও পড়িনে দেশের "হাল-চালও কিছুই জানিনে।" ভাব্‌তে ভাব্‌তে সাহেবের বাড়ীর কাছে এসে—ন'ব্‌নে—অভ্যাস মতই ডাক্‌লো—"সাড়ী সেমীজ"—ডাক হেঁকে বরাবর ভেতরে ঢুকতে যাবে—অম্‌নি দারোয়ানও হাঁক দিয়ে উঠ্‌লো—"এইও কাঁহা যাতা হ্যায়?"

ন'ব্‌নে হেসে ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ল্লো—"সেলাম—দারোয়ানজী, জিউ আচ্ছা হ্যায়?"

দারোয়ান চাকতে আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়ে ব'ল্ল—"আরে—ই .... কোন্—ছোট বাবু।" হো হো ক'রে হেসে ন'ব্‌নের মাথার ওপর থেকে বেসাতির বোঝাটা টেনে নামিয়ে ব'ল্ল—"একদম বেমালুমম লুগাবালা বন্ গেয়া হুজুর! সেলাম।"

ন'ব্নে জবাবে জিগ্গেষ ক'ল্লো—"সাহেব কবে গেছেন—দারোয়ান ?"

"আজ পাঁচ রোজ আব্‌গা আস্তে কুন্জী চাবি তামাম কুচ হামরা পাশ দে' গিয়া খৎ ঝি ছোড়্ গেয়া একাঠো।"

"আচ্ছা দাও" ব'লে ন'ব্নে চাবি চিঠি নিয়ে ভেতরে ঢুকে প'ল—দারোয়ান তার ফেরীর মাল সাড়ী সেমিজ নিয়ে তুলে রাখ্লো।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আন্‌মনা।

—:—

কাহার লাগি' উদাসী মন
আজ শরতের ভোরের বেলা
হিমের চুমু হার্ মেনেচে
—গরম ছোঁয়ার চাইচে খেলা !

মনের কোণের কোন্ কামনার—
ফুট্‌চে পরাগ—ঝর্‌চে নীহার
পথের মাঝে কুড়িয়ে পেনু
মাণিক-পাথার-লক্ষ-মেলা।

বাঁশরী তার সুদূরে হতে
নীল সাগরের অলখ্ পারে—
আজ্‌কে কেন একলা ঘরে—
কর্‌চে আঘাত বুকের দ্বারে।

রশ্মি রেখায় ভোরের অরুণ
হানিছে আঘাত সোহাগ করুণ
রঙের খেলায় পালক নাড়ি
অপ্সরী আজ চাইচে কারে।

বন্দে আলী।

বড়দিন।

— ঃ৹ঃ —

(ভগবান্ শ্রীশ্রীযীশুখৃষ্টের জন্মদিন অথবা
ভগবান্ শ্রীশ্রীসূর্যের জন্মদিন ?)

এখন আমরা ছোট বড় সকলেই বেশ জানি যে ইংরাজী অথবা খৃষ্টীয় বৎসরের শেষ মাস অথবা ডিসেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে খৃষ্টান্‌দিগের ভগবান্ শ্রীশ্রীযীশুখৃষ্টের (মুসলমানগণের ইশা মসীহ্ পয়গম্বরের) জন্মতিথির উৎসব হইয়া থাকে। এ বৎসর বাঙ্গালা সৌর পৌষমাসের ১০ দশম দিবসে এই উৎসব ঘটিয়াছে। ইংরাজেরা এই উৎসবকে "খৃষ্টমাস্" (Christmas, অথবা সংক্ষেপতঃ X'mas) বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালীরা এই খৃষ্টানী পর্বকে "বড়দিন" বলেন এবং বাঙ্গালা দেশের পঞ্জিকাতে "খ্রীষ্টম্যাস্ ডে। (বড়দিন)" বলিয়া ইহার নাম-করণ হইয়াছে।

ইংরাজী Christmas শব্দের উচ্চারণ Crismas এবং সাধারণ ইংরাজী অভিধানে উহার অর্থ "Festival of Christ's birth, 25th December" (যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব, ২৫শে ডিসেম্বর) লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ, "*Cristes masse*" (the Mass or Church-festival of Christ), খৃষ্টান্ ধর্মমতের উৎসব। এখনকার খৃষ্টানের

বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে প্রভু যীশুখৃষ্ট ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রির পর তাঁহার জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

কিন্তু, ইহাকে "বড়দিন" বলে কেন? খৃষ্টান্ দিগের প্রধান পর্ব দিন অর্থাৎ Day of the Great Festival বলিয়া কি ইহাকে "বড়দিন" বলে, না ইহার অন্যরূপ অর্থ আছে?

"পি. এম, বাক্‌চি পঞ্জিকাতে" (এবং বঙ্গদেশ-প্রচলিত প্রায় সকল (১) পঞ্জিকাগুলিতে) এ বৎসর ৯ই পৌষ অথবা ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের দিনমান ২৬ দণ্ড ১৯ পল এবং ৩৩ বিপল লিখিত আছে;—অর্থাৎ ঐ দিনই বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব বা ছোট দিন এবং পরদিন ১০ই পৌষ অথবা ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের দিবামান ২৬ দণ্ড ২০ পল এবং ৪৪ বিপল অর্থাৎ পূর্বদিন হইতে ১ পল ১১ বিপল বেশী লিখিত আছে এবং উক্ত ২৫ ডিসেম্বর হইতে অল্প অল্প করিয়া দিন-মান বাড়িতে বাড়িতে ৮ই চৈত্র অথবা ২২শে মার্চ্চ তারিখে দিবামান এবং রাত্রিমান ঠিক সমান অর্থাৎ ৩০ দণ্ড করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই জ্যোতিষিক নির্ণয় হইতে দেখা যায় যে ২৪শে ডিসেম্বর (৯ই পৌষ) সর্বাপেক্ষা ছোট দিন এবং তাহার পর দিন ২৫শে ডিসেম্বর (১০ই পৌষ) হইতে দিনমান বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, যেহেতু ২৫শে ডিসেম্বর

(১) বাঙ্গালা দেশের মধ্যে "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" বিলাতী Nautical Almanac বা নাবিক পঞ্জিকার মতানুযায়ী এবং অনেকটা বিশুদ্ধতর প্রণালীতে গণিত বলিয়া পরিচিত। ঐ পঞ্জিকার গণনানুসারে এ বৎসর ২০শে ডিসেম্বর (৫ই) পৌষ দিনমান ২৬।৩৪।১৫ ২১শে (৬ই পৌষ) ২৬।৪৪।৫, ২২শে (৭ই পৌষ) ২৬।৪৪।৫, ২৩শে (৮ই পৌষ) ২৬।৪৪।৫, ২৪শে (৯ই পৌষ) ২৬।৮৪।১৫ এবং ২৫শে (১০ই পৌষ) ২৬।৪৪।২৫ লিখিত আছে। এই গণনা প্রকৃত হইলে, ২১, ২২ এবং ২৩শে এই তিন তারিখের দিনমানই সমান হ্রস্ব এবং ২০শে ডিসেম্বর তারিখের দিনমান ও ২৪শে তারিখের দিনমান সমান (২৬।৪৪।১৫) হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ২৪শে ডিসেম্বর অথবা ৯ই পৌষ তারিখে এ বৎসর Winter solistice অথবা প্রথম "বড় দিন" হইয়াছে। ইংরাজী জ্যোতিষিক ভূগোলের মতে এই Winter solistice ২১শে ডিসেম্বরের কাছাকাছি পড়ে বলিয়া লিখিত আছে। "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" মতে ১৮ই মার্চ, (৪ঠা চৈত্র) দিনমান ৩০।০।৩০ হইয়াছে।

তারিখ হইতে দিনমান প্রথম "বড়" হইতে থাকে, সেই জন্য ঐ তারিখকে "বড় দিন" এই নাম দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞজনগণের এই ব্যাখ্যাটি প্রথম দৃষ্টিতে বেশ মানানসই অথবা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে একটি বড় "কিন্তু" আছে।

বাঙ্গলা দেশের পঞ্জিকাগুলির গণক মহাশয়গণের গতে ২৪শে ডিসেম্বর (এ বৎসর ৯ই পৌষ) "সর্বাপেক্ষা ছোট দিন" লিখিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা "সর্বাপেক্ষা ছোট দিন" নহে। যে কোন "জ্যোতিষিক ভূগোল" খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ২০শে ডিসেম্বরের কাছাকাছিই ঐ "সর্বাপেক্ষা ছোট দিন" পড়িবে। তাহার পরে যে দিন প্রথমে দিনমান বড় হইতে আরম্ভ করে, সেই দিনকে ইংরাজীতে "Winter Solistice" বলে। আর্য-জ্যোতিষশাস্ত্রে আমরা অজ্ঞ; তথাপি, যতদূর শুনিয়াছি, ঐ শাস্ত্রের মতে উহার নাম "মকরক্রান্তি" অথবা "উত্তরায়ণ সংক্রান্তি"; অর্থাৎ ঐ দিন হইতেই সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। জ্যোতিষের মতে, তাহা হইলে, ২১শে ডিসেম্বর তারিখ হইতেই দিনমান প্রথম "বড়" হইতে থাকে এবং উক্ত ২১শে ডিসেম্বর তারিখকেই প্রকৃতপক্ষে "বড় দিন" বলা উচিত।

তথাপি এমন এক কাল ছিল, যে সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে প্রকৃতই ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ "ছোট দিন" এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে "Winter Solistice" পড়িত। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দে (২৭৩ খৃষ্টাব্দে) ২৫শে ডিসেম্বর তারিখেই "বড় দিন" পড়িত এবং ক্রমশঃ এখন পিছাইয়া পিছাইয়া উহা ২১শে ডিসেম্বর পড়িতেছে। খৃষ্টানী উৎসবের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই প্রথম এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে খৃষ্টের জন্মদিন The Christian *Dies Natalis* বলিয়া গৃহীত এবং ঐ তারিখে তাঁহার জন্মোৎসব করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল (২)।

এই Winter Solistice অথবা মকরক্রান্তিতে (বড় দিন) কেন যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব প্রচারিত হইয়াছিল? সত্যই কি ঐ ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রির অবসানে প্রভু যীশুখৃষ্ট তাঁহার জননী মেরীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন?

---

(২) Nelson's Encyclopaedia, Vol. VI. P 133, Article, "Christmas."

য়ুরোপের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পান নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রভু যীশুখৃষ্ট অদ্য হইতে ১৯২৫ বৎসর পূর্বে ২৪শে ডিসেম্বর, মধ্যরাত্রির পর যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আমাদের শ্রীরাম নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের এবং জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে যেরূপ পৌরাণিক ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে, প্রভু যীশুর জন্মের সেরূপ চিরাগত কোন ঐতিহ্যেরও সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের (প্রাচীন ভারতবর্ষের ভিতর পারস্য, বাবিলোনিয়া মেসোপটামিয়া, মিসর এবং পশ্চিম এসিয়ার গ্রীক বা যবন রাজ্যগুলিও ছিল) যাবতীয় সভ্যদেশে এককালে শ্রীশ্রীসূর্যদেবের পূজার্চনার খুব প্রতিপত্তি ছিল। আমাদের বিষ্ণু ভগবান্ "সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী", এবং দ্বিজমাত্রেরই নিত্য উপাসনার গায়ত্রী মন্ত্র "সবিতৃদেবেরই বরেণ্য ভর্গের" মহিমা বিঘোষিত করিতেছে। আমাদের দেশে বারটি সৌর মাসে সূর্যের বারটি নাম প্রচলিত আছে। ভবিষ্যোত্তর পুরাণান্তর্গত প্রসিদ্ধ "আদিত্যহৃদয় স্তোত্রে" মাঘ মাস হইতে যথাক্রমে সূর্যের নাম "অরুণ, সূর্য, বেদাঙ্গ, ভানু, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, সুবর্ণরেতা, দিবাকর, মিত্র এবং বিষ্ণু" লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যের কথা এ দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রচলিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, যে, যেহেতু সূর্য মাসে মাসে জীবগণের পরমায়ু "আদান" বা গ্রহণ করিতেছেন, এই জন্য তাঁহাকে "আদিত্য" বলে। পৌরাণিক মতে অবশ্য অদিতির পুত্র বলিয়া তাঁহার "আদিত্য" এই নাম হইয়াছে। অধিকন্তু প্রাচীন সময়ে সূর্যকে "অর্যমা, পূষণ (পূষা), মিত্র, হংস, বিষ্ণু" ইত্যাদি নামে পরিচিত করা হইত। এই "মিত্র" শব্দ প্রাচীন পারসিক দেশে "মিথ্র" নামে এবং ক্রমশঃ "মিহির" আখ্যায় সূর্যকেই বুঝাইত। প্রথম খৃষ্টপূর্বাব্দে লিখিত "অমরকোষ" নামক অভিধানে সূর্যের নাম-পর্যায়ে "মিত্র" এবং "মিহির" উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী নুর-জহান্ বেগমের নাম "মেহের-উন্-নিশা" ছিল; সেই "মেহের" ও "মিহিরের" রূপান্তর মাত্র। উহার অর্থ "নারীকুল-সূর্য।"

সেই প্রাচীন যুগের সর্বত্রই সূর্যের পূজা খুব আড়ম্বরের সহিত আচরিত হইত এবং সেকালে একমাত্র য়ীহুদী জাতি নিরাকার পরমেশ্বরের পূজক ছিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সেকালে দিন বড় হইতে আরম্ভ করিত বলিয়া ঐ দিনে সূর্যদেবের জন্মতিথির উৎসব হইত। দেশের

আপামর সাধারণ নরনারী খুব ঘটা করিয়া ঐ জন্মোৎসব করিতেন বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ফিলোকেলাস নামক এক প্রাচীন যবন বা গ্রীক জ্যোতিষীর পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্যের জন্মদিন (*Natalis Solis Invicti*) অবধারিত হইয়াছে (৩)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার জে. জি. ফ্রেজার বলিতেছেন "যদি আমরা এক প্রাচীন টীকাকারের প্রদত্ত প্রমাণে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে গ্রীকেরা সে সময়ে ঐ ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রির পর সূর্য্যদেবের জন্মতিথির উৎসব করিতেন এবং পুরোহিত মিত্রদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে বাহির হইতে হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেন "কন্যা প্রসব করিয়াছেন! জ্যোতিঃ বাড়িয়া উঠিতেছে!" এক্ষণে, মিথ্রের (মিত্রের) পূজকগণ যে তাঁহাকে সূর্য্যের সহিত অথবা 'অপরাজেয় সূর্য্যের' সহিত (*Sotrs Invicti*) অভিন্ন অথবা একই বলিয়া গ্রহণ করিতেন তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (৩)।

উক্ত সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিতেছেন, "বাইবেল পুস্তকে যীশুর জন্মদিনের কোনই সংবাদ পাওয়া যায় না, এবং সেই জন্য প্রাচীন সময়ের খৃষ্টানেরা খৃষ্টের জন্মতিথির উৎসব করিতেন না। ক্রমশঃ, ইজিপ্ট (মিশর) দেশের খৃষ্টানেরা জানুয়ারী মাসের ৬ই তারিখে খৃষ্টের জন্মতিথি বলিয়া মানিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমশঃ ঐ তারিখে খৃষ্টের জন্মোৎসব করিবার রীতি বিস্তৃত হইতে থাকে এবং চতুর্থ শতাব্দেই প্রাচ্য দেশের (মিশর, এসিয়ামাইনর, ইত্যাদি দেশের) সর্ব্বত্রই উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। অবশেষে, তৃতীয় শতাব্দের অন্তিম সময়ে অথবা চতুর্থ শতাব্দের প্রথম ভাগে, পাশ্চাত্যদেশের (ইটালী ইত্যাদি দেশের) ধর্ম্মসঙ্ঘ ২৫শে ডিসেম্বর তারিখই খৃষ্টের প্রকৃত জন্মদিন বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। পাশ্চাত্যদেশের ধর্ম্মসঙ্ঘ কোন কালেই কিন্তু ৬ই জানুয়ারি তারিখের উৎসব করিতেন না। এন্টিওক নগরে (সিরীয়দেশের নগর, খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে স্থাপিত) খৃষ্টীয় প্রায় ৩৭৫ অব্দের পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন (৬ই জানুয়ারী হইতে ২৫শে ডিসেম্বর) গৃহীত হয় নাই। ফিলোকেলাসের পঞ্জিকাতেই খৃষ্টমাসের পর্ব্বের (সূর্য্যের

(৩) The Golden Bough নামক পুস্তকের "Adonis, Osiris, Attis" ভাগ, প্রণেতা—Dr. J. G. Frazer, D. C. L., Litt. D., LL. D.; পৃষ্ঠা, ২৫৪—২৫৫ এবং উহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

জন্মদিনের ?) কথা প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই পঞ্জিকা ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে প্রস্তুত হইয়াছিল।

"আমাদের খৃষ্টমাস অথবা খৃষ্টের জন্মোৎসব করিবার প্রথাটি অখৃষ্টান ধর্ম-সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রামের একটি চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান্ রহিয়াছে,—এবং প্রতীতি হয় যে খৃষ্টান্ ধর্মসঙ্ঘ (চার্চ) এই অখৃষ্টান্ উৎসবটিকে সোজাসুজি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। আমাদের ধর্ম-সম্প্রদায়ের কর্তারা খৃষ্টের জন্মোৎসবটির অনুষ্ঠান কেন করিলেন ? সিরীয় দেশীয় এক খৃষ্টান্ লেখক এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বেশ সরল ও স্পষ্টবাদিতার সহিত লিখিয়াছেন,—৬ই জানুয়ারী তারিখে যে জন্মোৎসবটি আচরিত হইতেছিল, তাহাকে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে পরিবর্তিত করিবার পক্ষে কর্তৃপক্ষের যে উদ্দেশ্য অথবা অভিপ্রায় ছিল, তাহা এই :—উক্ত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে অখৃষ্টান্ সম্প্রদায় সূর্যের জন্মতিথির উৎসব করিতেন, এবং সেই উৎসব উপলক্ষে আনন্দের পরিচায়ক চিহ্ন স্বরূপে আলো জ্বালিতেন। খৃষ্টানেরাও এই উৎসব এবং আনন্দে যোগদান করিতেন। খৃষ্টান ধর্মের পাণ্ডারা যখন দেখিলেন যে এই উৎসবের উপর সাধারণের অত্যন্ত অনুরাগ রহিয়াছে, তখন তাঁহারা ভিতরে ভিতরে পরামর্শ আঁটিয়া স্থির করিলেন যে খৃষ্টের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখেই করা হউক, এবং ৬ই জানুয়ারী তারিখে 'এপিফানী'র উৎসব করা যাউক (৪)। সেই জন্য এই রীতির সহিত ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়া রাখিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অগষ্টিন (৫) যে উপদেশ দিয়াছেন, 'আমার খৃষ্টান ভ্রাতৃগণের পক্ষে অখৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের লোকের মত ঐ তিথিতে সূর্যের জন্য উৎসব করা কখনই উচিত নহে, কিন্তু যিনি সূর্যের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার জন্যই (খৃষ্টের জন্যই) উৎসব করা উচিত', তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে তিনি এই কথা স্বীকার না করিলেও বেশ পরিষ্কার ভাবের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ, পোপ লিও দি গ্রেট ও যে লোকের বর্তমান বিশ্বাসকে, (খৃষ্টমাস উৎসব,

---

(৪) Epiphany,—a church festival celebrated on Jan. 6, in Commemovation of the manifestation of Christ to the wise men of the East.

(৫) St. Aujustine's Sermons *CXC* (Magnis Pafrolo gia Latina, XXVIII, 1007).

খৃষ্টের জন্মের জন্য নহে, কিন্তু নূতন সূর্য্যের জন্মের জন্য করা হয় বলিয়া লোকের যে ধারণা আছে সেই বিশ্বাসকে) তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন (৬), তাহা হইতেও এই অনুমান দৃঢ়তর হয়।

"অতএব, সূর্যের প্রতি অখৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের যে ভক্তি ছিল তাহা খৃষ্টের প্রতি (যাঁহাকে ধর্মের সূর্য বলা হইয়া থাকে) লইয়া যাইবার জন্যই যে খৃষ্টান্ ধর্মসঙ্ঘ এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে (তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের) খৃষ্টের জন্মোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে" (৭)

এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে খৃষ্টমাস উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার আরও একটি কারণের কথা কোন কোন খৃষ্টান লেখক বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ২৫শে মার্চ তারিখে যেহেতু যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণের দিন, (ইষ্টার অথবা গুড্ ফ্রাইডে পর্ব) এবং যেহেতু তিনি ঠিক নির্দিষ্ট পূরাপূরি বৎসর (Exact number of years) এই ধরাধামে ছিলেন, সেই সূত্র ধরিয়া ২৫শে মার্চ তারিখে তাঁহার জননী-গর্ভে প্রথম অবতার (Annunciation পর্ব দিন) হইয়াছিল ; এবং সেই তারিখ হইতে নয় মাস গণনা করিয়া ২৫শে ডিসেম্বর তাঁহার জন্মদিন হয়। এই হিসাব এবং গণনা কতদূর প্রকৃত তাহা "ইষ্টার হোলী উৎসব" নামক প্রস্তাবে দেখাইবার ইচ্ছা আমাদের রহিল। (৮)

এখন প্রকৃত পক্ষে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কেন Winter Solistice পড়িতেছে এবং পূর্বে কেনই বা ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে উহা পড়িত, তাহার উত্তর প্রদান করা গণিত জ্যোতিষের অধিকার ভুক্ত ; আমাদের সে অধিকার না থাকায় উহার উত্তর প্রদান জন্য আমরা জ্যোতিষী মহাশয়দিগের শরণাপন্ন হইতেছে। ৺বঙ্কিম বাবু তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে মহাভারতের সময়

(৬) Leo the Great, Sermon XXII (Magnis Petrologia Latina, XVII, 614

(৭) Dr. Frazer সাহেবের Adonis, Osiris, Attis নামক উপাদেয় গ্রন্থের ২৫৪ হইতে ২৫৬ পৃষ্ঠা হইতে এই প্রস্তাবের উপকরণ সংগৃহীত।

(৮) প্রচলিত মতে যীশুখৃষ্ট ঠিক ত্রিশ বৎসর কাল পৃথিবীতে ছিলেন।

নির্ধারণ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। যদি কোন জ্যোতিষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয় সাধারণ পাঠককে এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

আমাদের বক্তব্য আপাততঃ এই স্থানেই শেষ করিলাম,—"ইষ্টার পর্ব" এবং "বসন্ত বা হোলী উৎসব" উপলক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা পুনরায় বলিতে হইবে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

নীলমাণিক।

ওরে আমার নীলমাণিক্!
গভীর রাতে ছিট্‌কে পড়া
নীলাকাশের টুক্‌রোখানিক্—
সকল বাধা বন্ধহারা
পাগ্‌লা-ঝোরার ঝর্ণা-ধারা;
আয় ছুটে আয় বক্ষে আমার
উথ্‌লে উঠা হাসির ফিনিক্,
ওরে আমার নীলমাণিক।
মৌ-বনে হায় লুকিয়ে ছিলি
ভোম্‌রা হ'য়ে তুই কী ওরে—
মা যশোদার বুক্—চেরা-ধন
বাঁধলি আমায় কিসের ডোরে?

চপল তোরি পরশ ছোঁয়ায়
অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় ;
উষর মরুর বুকের 'পরে
বর্ষা মেঘের টুক্‌রোখানিক্‌ ;
ওরে আমার নীলমাণিক !

শ্রীসরোজকুমার সেন।

বর্ম্মাদেশে রমণীর সভ্যতা।

——:(✽):——

বর্ম্মা দেশ ভারতের এক সীমাবর্ত্তী—সমুদ্র ও পর্ব্বত দ্বারা বঙ্গদেশ হইতে বর্ম্মাকে পৃথক করা হয়েছে। চট্টগ্রামের সীমা ধরিয়াই ব্রহ্মদেশ। যে সকল স্থান চট্টগ্রামের অতি নিকটে সে সকলের সভ্যতা ও সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা বাঙ্গলার মত। আবার খাঁটী ব্রহ্মদেশের সামাজিক রীতি, নীতি ও সভ্যতা সম্পূর্ণ পৃথক। আজ পঁচিশ বৎসরের পুর্ব্বের কথা, আমি ব্রহ্মদেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সে কেবলই ভ্রমণের খাতিরে। ব্রহ্মদেশে তখনো বাঙ্গালী ভরপুর হইয়াছিল এখন ত কথাই নাই। আবার যে কবে বাঙ্গালীরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবেন তাহা অনির্দ্দিষ্ট। ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী তাড়াইবার আইন হইয়াছে। এখন আর বাঙ্গালীরা সে দেশে রাজকীয় চাকরী পায় না, সে দেশ হইতে বুঝিবা বাঙ্গালীর বাণিজ্য, স্বাধীন ব্যবসাদিও বন্ধ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালীরাই ইংরাজের পক্ষ হইয়া ব্রহ্মের শাসন, সুবিধা বিষয়ে নানা প্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল আজ সে দেশে বাঙ্গালীর এই দশা, কি পরিতাপের বিষয়! আর এই হেতুতে ইংরেজ জাতিকে অনেকে অকৃতজ্ঞ বলিবে তাহা আশ্চর্য্য কি! বাঙ্গালীরা ব্রহ্মবাসীর রাজনৈতিক গুরু কিনা তাই।

যে প্রস্তাব করিতেছিলাম তাহারই বিষয় বলিব। ব্রহ্মদেশের রমণীরা রাস্তাঘাটে, হাট, বাজারে, সভা, সমিতিতে, ধর্ম্মমন্দিরাদিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে পারেন। ইহা

ছাড়া তারা রেলে, জাহাজে সর্ব্বত্র একাকী যাইবার অধিকারী। ব্রহ্মদেশ অতি অল্পদিন হইল স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তাই তাহাদের রক্তে স্বাধীনতার তেজ এখনও বিদ্যমান। বর্ম্মারমণীরা স্বাধীনা হইলেও তাহারা কদাচ উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেখা যায় না। আমাদের দেশে স্বাধীনা বলিলে উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝায়। আমাদের ধাতে স্ত্রীস্বাধীনতা সয় না, আমাদের রমণীগণ স্বাধীনা হইলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। সে দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, বিধবা বিবাহ আছে, বহুবিবাহও অপ্রচলিত নহে তবে আজকাল নাকি বহুবিবাহ কমিয়া আসিতেছে।

বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এক পুত্র ব্রহ্মদেশে আমার ভ্রাতার নিকট গিয়া বাস করিতেছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের পরম বান্ধব ছিলেন। আমার ভ্রাতা রেঙ্গুণ হাইকোর্টের উকীল। তাঁহার সে পুত্র এক ব্রহ্মরমণীকে বিবাহ করে। সে যুবতী রূপগুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাহার বিবাহের পর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র আমার ভ্রাতার গৃহত্যাগ করে অথবা আমার ভ্রাতাই তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বিবাহের পর বর্ম্মারমণীর প্রেমে পড়িয়া সে যুবক ভারি বাবু হইয়া পড়ে। সেই যুবতী তাহাকে সোনার ঘড়ি, চেইন, হীরার অঙ্গুরী আরো কত কিছু দিয়াছিল। কিছুকাল সেই যুবতীর গৃহে বাস করিয়া যখন সে জ্বরে পীড়িত হয় ও খুব কাবু হইয়া পড়ে তখন আমার ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কলিকাতায় সমস্ত অবস্থা লিখিয়া পত্র লিখিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় সে পুত্রকে গৃহে স্থান দিবেন কিনা এ ভাবনা তার ছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় সামাজিক হিসাবে উদার তাই তিনি পুত্রকে কলিকাতায় তাঁহার বাসস্থানে পাঠাইতে পত্র লিখিলেন। পুত্র, সস্ত্রীক তাহার বাড়ীতে আসিয়া উঠিল—বঙ্গরমণীর সাজে। জাহাজে উঠিয়া সে যুবতী ব্রহ্মরমণীর পোষাক পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গরমণীর সাজে সজ্জিত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহার স্বামীর নিকট সে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। তাহার স্ত্রীকে দেখিয়া তিনি একটা আপদ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বভাবচরিত্রে ও তাহাকে সেবাপরায়ণা দেখিয়া পরিবারের সকল লোকই তাহার গুণমুগ্ধ হইয়াছিল।

আমি এক দিন কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সে পুত্র মরণাপন্ন কাতর এবং কলিকাতার এক সভায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা হইলে সকল কথা জানিলাম। এক দিন সে রমণীকে দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি সে শয্যায় পড়িয়া আছে, তাহার স্ত্রী তাহার

সেবা করিতেছে। আমি তাহাকে তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহার স্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারি নাই, মনে করিলাম সে হয়ত বা তাহার ভগ্নি হইবেন। তাহার ভগ্নিদের আমি চিনি, জানি। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ইনি অপর কোন রমণী। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র যখন অতিকষ্টে উঠিয়া আমাকে প্রণামকরিল, তা দেখিয়া সে রমণীও আমাকে প্রণাম করিল। এই সময় রোগীর মা ও ভগ্নি আসিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রোগীর বর্ম্মাস্ত্রীকে দেখিতে চাহিলে তাঁহারা আমাকে এই রমণীকে দেখাইয়া দিলেন। এবং তাহার সমস্ত বিবরণ আমাকে জানাইলেন। "সে এখন সর্ব্বদাই আমাদের দেশী পোষাকে থাকে। দেখিয়া আমার দয়া হইল, দু'দিন পরেই যে সে বিধবা হইবে ইহা আমার পক্ষে অসহ্য হইল। তখন গিয়া জানিলাম রোগীর যক্ষা হইয়াছে। কিছুকাল পরে বিদ্যারত্ন মহাশয় গৃহে আসিয়া সেই বর্ম্মাযুবতীর শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একদিন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাচনিক জানিতে পারিলাম তাহার সে পুত্র মারা গিয়াছে। আমি তাহাদের বাড়ীতে গেলাম। অন্যান্যের সঙ্গে সে ব্রহ্মযুবতীও বিধবার বেশে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি অনেক কথার পর তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিলাম। এই কথা শুনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন "আমি ইহাকে বিবাহ করিতে অনেক বার কহিয়াছি তাহা ছাড়া তাহাকে তাহার পিতার কাছে বর্ম্মাদেশে পাঠাইয়া দিতে কহিয়াছিলাম কিন্তু সে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চায় না। এ জন্য বেশী পিড়াপীড়ি করিলে সে কাঁদিয়া ফেলে। আমাদের পরিবারের সকলের নিকট সে বড় সেবাপরায়ণা আর আমি তাহারই সেবায় স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছি।" বর্ম্মারমণীর চরিত্রের নমুনা কতকটা ইহা হইতেও পাওয়া যায়। যুবতীর স্বামী অহ্লাদ করিয়া তাহার যে বাঙ্গালী নাম রাখিয়াছিলেন উহাই এখন প্রচলিত আছে।

বর্ম্মাবাসীরা মঙ্গোলিয়া জাতীয়। ইহাদের শরীরের বর্ণ পীতাভ, নাক ও মুখ চ্যাপ্টা, দেহ কথঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। রমণীদের দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব হইলেও তাহাদের দেহ কমনীয়, উজ্জল গৌর, সুগঠিত চক্ষু যুগল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। অঙ্গসৌষ্ঠবে ইহারা সুন্দরী. তাহাদের সৌন্দর্য্য-সাধন একটী বিশেষত্ব। বর্ম্মাদেশে নারীর স্থান খুব উচ্চে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ধর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্রহ্মনারীগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মনারীগণ এইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক ভাবে জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র যেমন নানাবিধ প্রকারে নারীকে অস্বাধীন ও অবলা করিয়া রাখিয়াছেন তাদের দেশে এরূপ প্রথা নাই। শাস্ত্র তাহাদের পক্ষে বড় অনুকূলে। পুরুষেরাও মনে করেন রমণীসমাজ গড়িয়া না তুলিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে না। আমাদের যেমন গৃহকোণ হইতে কোন রমণীকে দুর্বৃত্তরা জোর করিয়া ধরিয়া নিলে প্রায়ই তাহার প্রতিকার হয় না, সে দেশে রমণীরাই তাহার উচিত শাস্তি দিয়া থাকেন সুতরাং তাহারা পথে ঘাটে বাহির হইলেও কেহ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করে না আর পুরুষসমাজও তদবস্থায় যথেষ্ট প্রতিকারপরায়ণ হইয়া থাকে।

ইহারা স্বাধীনা হইলেও গৃহকার্য্যে বড় নিপুণা। গৃহের সমস্ত কাজই তাহাদের আয়ত্বাধীন। রমণীরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। স্বাধীনতা ব্রহ্ম রমণীর জন্মগত অধিকার হইলেও তাহারা তাহার অপব্যবহার করেন না। আমি অনেক ব্রহ্ম পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রহ্মরমণীর চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছি। তাহারা কোন বিষয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষী নহেন। পরিবারে নারীরস্থান সর্ব্বোচ্চ। গৃহিণী, জননী, ভগিনী, সখী ও সেবিকা যাহারা তাহারাই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া পরিবারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীরা কর্ম্মশীলা, কষ্টসহিষ্ণু এবং সুনিপণা। রমণীদের সর্ব্বত্রই অবাধগতি। রমণীরা গৃহের আসবাবপত্রের মত সজ্জিত থাকিতে চাহে না অথবা তাহারা পুরুষের বিলাস-সামগ্রী বলিয়াও বিবেচিত হন না। গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই তাহারা স্বহস্তে করেন। হাট, বাজার হইতে বা ষ্টেশন হইতে সাধারণ মালপত্র তাহারা নিজেরাই বহন করিয়া আনেন। উহারা মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে সদা অভ্যস্ত। প্রয়োজন হইলে স্বামী, পুত্রাদি বা পিতামাতার ভরণপোষণ পর্য্যন্ত তাহারা করিয়া থাকেন। তাহারা স্বামীর সম্পত্তির যেমন উত্তরাধিকারী হয় পুত্র বর্ত্তমানে পিতৃ-সম্পত্তিতেও তাহাদের উত্তরাধিকারীত্ব বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার সংক্রান্ত সকল কাজেই নারীর অধিকার পুরুষের তুল্য। পুরুষসঙ্গে না থাকিলেও ব্রহ্মরমণীরা দল বাঁধিয়া পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, ধর্ম্মমন্দির ও সভা সমিতি বা বিবাহ মজলিসে স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করেন।

বর্ম্মারমণীরা বিবাহকার্য্যেও স্বাধীনা। তাহারা নিজেই বর বাছিয়া লয় পরে পিতামাতার অনুমতি লইয়া বিবাহ করে। পিতামাতাও তদ্রূপ বিবাহে বাধা দেন না। নিজের বয়ঃ কনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও তাহারা বিবাহ করিয়া থাকে। বালিকারা পিতামাতার অধীনে থাকে। কিন্তু যুবতী অবস্থায় পিতামাতার তেমন কর্ত্তৃত্বাধীনে আর থাকেন না। তখন তাহারা জীবন পথ নিজেই বাছিয়া লয়। বঙ্গল নার মত তারা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধের বন্ধনে থাকেন না। ইচ্ছা করিলে তাহারা অবিবাহিতা বা চিরকুমারী থাকিতে পারেন। বিধবা হইলে ইচ্ছা মত বিবাহ করিতে পারেন। পিতামাতার ইচ্ছানুসারে তাহারা অপরিণত বয়সে বিবাহ করিতে বাধ্য নহেন। ইহারা বিবাহের পরও শ্বশুরবাড়ীর পদবী গ্রহণ করেন না, পিত্রালয়ের প্রদত্ত নাম আজীবন ব্যবহার করেন। ধনী রমণীরাও স্বহস্তে গৃহস্থালী কার্য্য করিয়া থাকেন দৈহিক পরিশ্রমে কেহই বিমুখ নহেন। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী যাত্রীরাও নিজেদের দ্রব্যাদি নিজেই বহন করিয়া চলেন। রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মশীলা ও ভক্তিমতি সে দেশে সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। পুরুষেরা যেমন ধর্ম্মের জন্য চিরকুমার থাকিয়া সন্ন্যাসী হন তদ্রূপ স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মের জন্য চিরকুমারী থাকিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকেন। পুরুষ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু ও স্ত্রী সন্ন্যাসীকে ভিক্ষুণী কহে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের সকল কার্য্যেই পুরুষের ন্যায় রমণীরাও যোগদান করিয়া থাকেন। গ্রাম্য সালিসী পঞ্চায়েতেও তাহাদের অধিকার পুরুষের ন্যায়। কাউন্সিল ও মিউনিসিপলটীতেও তাহাদের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

বর্ম্মারমণীরা কোন বিষয়েই পুরুষের মুখাপেক্ষী নহেন। তাহাদের মনে বিলক্ষণ সাহস, দেহে শক্তি, প্রাণে অমিত তেজ। তাহাদের স্বাস্থ্য বিলক্ষণ উন্নত। দুশ্চরিত্র স্বামীকে শাসন সংযত করিবার তাহাদের প্রাণে বিলক্ষণ তেজ আছে। উপরোধ, অনুরোধে ফল না হইলে তেমন স্বামীকে সংযত ও শোধন করিবার ভার তাহারা নিজ হস্তে লইয়া থাকেন ও প্রিয়জনকে সৎপথে আনিয়া থাকেন। তাহারা নিজের প্রিয়জনকে যথেষ্ট ভালবাসিয়া থাকেন। তাহাদের স্বাধীনতা থাকিলেও গোপনে পরপুরুষের সাহত যথেচ্ছ—হাস্য, পরিহাস ও আলাপাদি করিবার রীতি নাই, তাহাতে তাহাদের নিন্দা হয়। রমণীরা পরিজনের সেবা করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। নানাবিধ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাহারা বিবাহ ও নৃত্যগীতের মজলিসে যাতায়াত করেন। ইহারা আবদ্ধা বঙ্গরমণীর ন্যায় সমধিক অলঙ্কারপ্রিয় নহেন। গৃহের জামা ইত্যাদি তাহার

নিজ হস্তে প্রস্তত করিয়া থাকেন। আবশ্যক মত তাহারা গৃহের অন্যান্য বস্ত্রাদিও বয়ন করিয়া থাকেন। রেশমী বস্ত্রই তাহারা বেশী ভালবাসেন। ইহারা পুষ্প বড় ভালবাসেন। প্রীতিউপহারে, দেবতাকে দিতে হইলে, নিজের সজ্জায় পুষ্পের অতি প্রয়োজন। ব্রহ্মদেশে বাল্যবিবাহ নাই, আরাকাণ প্রদেশে বাল্য বিবাহ হইতে দেখা যায়।

পোড়া ভারতবর্ষের মত জাতিভেদের দারুণ প্রাচীর বা দৌরাত্ম্য বর্ম্মায় নাই। আমাদের দেশে বহু-কন্যার পিতামাতা দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হন কিন্তু সে দেশে বহু-কন্যার পিতামাতা সমধিক সৌভাগ্যশালী। ইচ্ছা করিলে বর্ম্মাযুবতীরা বিদেশীকে বিবাহ করিতে পারে তজ্জন্য মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, ইয়ুরোপীয় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে বিবাহ করিয়া সে দেশে বিস্তর বর্ণ শঙ্কর উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে। বিবাহ না করিয়াও যদি জারজ সন্তান হয় তবে তাহারাও পরিত্যক্ত বা নিন্দিত হয় না। অনেকে স্বদেশীয় সঙ্গে বিবাহ করিয়া আজীবন তাঁহার ভরণপোষণ করা অপেক্ষা অন্য দেশীয়ের সহিত বিবাহ করিয়া নিরাপদে থাকিতে ইচ্ছা করে। এইরূপে ইয়ুরোপীয়, চীনা, জাপানী, ভারতীয় ও বাঙ্গালী অনেকে বর্ম্মারমণী বিবাহ করিয়া এ দেশে বেশ ঘরসংসার করিয়া লইয়াছেন। এরূপ বিধি সে দেশে নিন্দনীয় নহে। বর্ম্মায় এরূপ বহু পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ম্মায় বর্ণসঙ্করের প্রাচুর্য্য আছে, কালে বোধ হয় তাহা বর্ণসঙ্করের রাজত্বই হইবে।

বর্ম্মারমণীরা সৌন্দর্য্য রক্ষা ও বৃদ্ধিকল্পে সবিশেষ যত্নশীল, তাহাদের পোষাকের পরিপাটী ও বাহার বড় বেশী। তাহাদের কেশদাম ভ্রমর-কৃষ্ণ ও আগুল্ফ লম্বিত হইয়া থাকে, কেশের যত্ন তাঁরা খুব করেন। কেশগুচ্ছ সাজাইয়া তারা খোঁপা বাধেন, তাহা দেখিতে কৃষ্ণ ভেলবেটের টুপির ন্যায় হয়। চুলের ভাঁজে ভাঁজে নানা বর্ণের পুষ্প গুচ্ছ গুঁজিয়া দেন। মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধি বৃদ্ধির জন্য মুখে ও হাতে পায় তানেখাঁ নামক এক প্রকার চন্দন কাষ্ঠ ঘসিয়া প্রলেপ দিয়া থাকেন। বিলাসিনীরা ভ্রূযুগল অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য তাহাতে কলপ দেন ও চক্ষুর সৌন্দর্য্যের জন্য অঞ্জন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেশের অল্পতা হইলে তা পূরণ জন্য তারা আলগা কেশগুচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবস্থাভেদে চুলের খোঁপার মধ্যে হীরা বা মুক্তাখচিত চিরুণী ও কৃত্রিম পুষ্প ব্যবহার করিয়া থাকেন। রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার এদেশে অত্যধিক, মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র লৌঞ্জি বা থামি। ইহা খুব সুন্দর ও পুরু রেশমী বস্ত্র।

ময়ূর-কণ্ঠী রঙ্গের লোঙ্গির (লুঙ্গী) ব্যবহারই বেশী। বর্ম্মা রমণীরা জরির কাজকরা ও ঢেউ খেলান লুঙ্গী বেশী ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ছয় হাত দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডের দুই দিক সিলাই করিয়া লুঙ্গী প্রস্তুত হয়। মেয়েদের লুঙ্গীর উপরিভাগে দশ বারো ইঞ্চ চওড়া লাল বা নীল বস্ত্রখণ্ড দুই বা ততোধিক ভাঁজ করিয়া কোমরে বাঁধা হইয়া থাকে। লুঙ্গীর বাড়ন্ত ভাগটুকু দোভাঁজ করিয়া কোঁচার মত সম্মুখ দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ঐ লুঙ্গীর দ্বারা পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত আবৃত হইয়া যায়। অভ্যন্তরে অবশ্যই সেমিজ বা অঙ্গরাখা রাখিবার প্রথা আছে। গাত্রাবরণ এঙ্গি, ইহা চিক্কণ, মসৃণ বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত, হাতের কব্জী ও কটি পর্য্যন্ত উহা লম্ববান থাকে। হীরা, পান্না বা রঙ্গিণ কাচের বোতাম দিয়া উহা আটকাইয়া দেওয়া হয়। এঙ্গি প্রায়ই খুব সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্রে প্রস্তুত হয়। ইহা বক্ষস্থল ও সমস্ত শরীর অস্বৃত হয়। এঙ্গির নীচে সেমিজ দেওয়া হয়। একখণ্ড দীর্ঘ সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র উত্তরীয়ের ন্যায় স্কন্ধের দুই পাশে সম্মুখে ঝুলাইয় দেওয়া হয়। ইহাকে "পাওয়া" বলে। স্থান ভেদে রমণীদের পোষাকের তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাদের পোষাক সুরুচি সম্মত এবং শরীরের সর্ব্ব অংশ আবৃত হয়।

বাহিরে যাইবার বেলায় ইঁহারা পাদুকা ব্যবহার করেন। ফানা নামক চটী জুতাই ইঁহারা ব্যবহার করেন। ইঁহারা জাতীয় ভাব বা পোষাক পরিতেই বেশী ভালবাসেন। অনেকে ইউরোপীয়ান বিবাহ করিয়াও বর্ম্মা পোষাক ব্যবহার করেন। তাহারা সকলেই দেশীয় ছাতা ব্যবহার করেন উহার নাম " ঠি " ইহার বাঁটটা বংশ নির্ম্মিত ইহা প্রায় ৪ ফিট্ লম্বা আবরণ তৈলাক্ত পুরু বস্ত্রের, শিকগুলি বংশ নির্ম্মিত। ছাতাগুলি গোল ও চ্যাপ্টা। ছাতা নানা বাহারী রঙ্গের হয় ও নানা লতাপাতায় চিত্রিত। রৌদ্র দিয়াই ইহার বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া ছত্রধারিণীর রূপলাবণ্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। উৎসবাদিতে তাহারা অলঙ্কার পরিয়া থাকেন। সর্ব্বদা কেহ অলঙ্কার পরেন না।

একটা বড় কুৎসিত, দুর্নীতি বর্ম্মারমণীদিগের মধ্যে দেখা যায় তাহা ভারতরমণীর পক্ষে অত্যন্ত হীন ও লজ্জাকর। বর্ম্মারমণীরা দলে দলে কলিকাতা ও চট্টগ্রামে শীতের প্রারম্ভে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা আত্মবিক্রয় করিয়া অর্থার্জ্জন করে ও তাহা স্বামী বা পিতা মাতাকে পাঠাইয়া দেয় আবার বর্ষার প্রারম্ভেই স্বদেশে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে যদি কাহারো

সন্তানসম্ভবনা হয় তবে সে সন্তান পরিত্যজ্য হইবে না। স্বামীও এইরূপ স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া ঘর সংসার করিবে। বাঙ্গলার কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত কথনোবা উহাদের কেহ কেহ বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্য জেলায়ও গিয়া থাকে। শীতকালে বাঙ্গলায় ও বেহারে নানা স্থানে মেলা বসে। সেই সকল মেলায় বর্ম্মারমণীরা স্ত্রীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। ব্রহ্মদেশেও ইহা দেখা যায় যে, স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা বা প্রেম করিয়া যদি কিছু উপার্জ্জন করে তাহাতে স্বামী বা পরিবারের কেহ বাধা দেয় না এবং তজ্জন্য তাহাদের গুরুতর নিন্দা হয় না। তদ্দ্বারা সন্তান হইলেও তাহা পরিত্যক্ত হয় না। ইয়ুরোপীয়, চীনা বাঙ্গালী, বেহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রবাসী নরগণের সহিত তাহারা এইরূপে মিলিয়া থাকে এবং আবশ্যক মত তাহারা তদ্রূপভাবে দু'এক বৎসর উপপতির সঙ্গে বাস করিলেও সে রমণী স্বামী পরিত্যক্তা হয় না। এইরূপ দুর্নীতি ব্রহ্মরমণীর পক্ষে আমাদের চক্ষে বড় কলঙ্কের কথা। এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য ব্রহ্মবাসীদের চেষ্টা দেখা যায় না। এখন শুনা যাইতেছে কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এই কু প্রথার বিরুদ্ধে অল্পাধিক পরিমাণে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ দুর্নীতি কতকালে দূরীভূত হইবে তাহা কে বলিতে পারে। তবে যদি উহারা চীনাদের বেণী কাটার মত একদিন সকলে সমবেত হইয়া সভা করিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারে তবে সম্ভবপর বলিয়া মনে করি। এইরূপ হীন ও লজ্জাজনক কুপ্রথার বিরুদ্ধে ব্রহ্মবাসী সকলেরই দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। এই দূরপণেয় কলঙ্ক ব্যতীত ব্রহ্মরমণীর কাছে বঙ্গ রমণীর অনেক শিখিবার আছে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।

ইষ্টারের ছুটীতে ফ্রান্স ও আল্প্‌সে।

(১৯২৫)

অক্‌সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনা হয় বৎসরে ২৪ সপ্তাহ—আর বাকিটা ছুটি। ৮ সপ্তাহ করে এক একটা 'টার্ম' (Term) তার পরই ছুটি। ইষ্টারের বন্ধ হচ্ছে ছয় সপ্তাহ কাল, মার্চের গোড়াতেই আরম্ভ হয়। আমি ছুটির আগে থেকেই ফ্রান্সের পার্ব্বত্য অঞ্চলে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম। ইংলণ্ডে এসে কোন যায়গায় বেশি দিন থাকতে ইচ্ছা আমার মোটেই করে না। একটা যায়গার সব জিনিস যেমন দেখা হয়ে যায় ও তার নূতনত্ব কেটে যায়, তখনি অন্যত্র যেতে ইচ্ছা করে। যেখানে 'গৃহ' নাই সেস্থানের জন্য ভালবাসাও বেশি দিন থাকে না।

এখানে দেশভ্রমণের বাতিক এত যে অনেক লোক ভ্রমণকারিদের নানা রকম ভাবে সুবিধা করে দিয়ে পয়সা করছে। টমাস কুক পৃথিবীর সর্ব্বত্র আফিস খুলে রেখেছে এই জন্যই। আমি যাওয়ার অনেক পূর্ব্বে থেকেই এদের কাছ থেকে সমস্ত খবর আনিয়ে রেখে ছিলাম। যা কিছু অভাব হচ্ছিল তা সঙ্গীর। কেউ ভরা শীতে পাহাড়ে ও বরফে যেতে রাজি নন। অতিকষ্টে একজনকে রাজি করা গেল। 'টাইমসে' (Times) একজন ফরাসী মহিলা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ীতেই প্রথমে থাকা হবে, স্থির হল। সব চেয়ে আনন্দ হল যে তিনি ইংরাজী জানেন, কারণ ফ্রান্সে এ জিনিসটি পাওয়া একটু কঠিন। ফরাসীরা এত দেশভক্ত যে কিছুতেই অন্য দেশের ভাষা শিখবে না, এতে তাদের হাজার ক্ষতি হকনা কেন। যদিও ইংরাজের রাজত্ব পৃথিবীর চার কোণাতেই আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে রাজনৈতিক আদান প্রদান হয় ফরাসী ভাষাতেই।

একদিন সন্ধ্যা আটটায় সাউথহামটনের ট্রেণে চেপে বসা গেল। ছুটি হওয়ার তখনও দুই দিন বাকি ছিল, তাই কলেজের কর্ত্তা অক্সফোর্ড ত্যাগ করার অনুমতি দিতে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু যখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে আমি আইন সঙ্গত ৪২ রজনীর

বেশি অক্সফোর্ডে টার্মে কাটিয়েছি. তখন আর তার কোন আপত্তি থাকল না। অক্সফোর্ডে কেউ ক্লাশে গেল কিনা তার কোন খোঁজ করে না, হাজরার কোন ব্যবস্থা নাই ; কিন্তু প্রত্যেক টার্মে অন্ততঃ ৪২ রাত অক্সফোর্ডে ঘুমুতে হবে, তা না হলে ইউনিভারসিটি পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেয় না।

সাউথহামটন (Southamton) থেকে রাত ১১॥৹ টায় আমাদের ষ্টীমার যাত্রা করল। আমাদের স্থান আগে থেকেই 'রিসার্ভ' করা ছিল। সুতরাং নির্ব্বিবাদে শুয়ে পড়লাম। ষ্টীমারে তেমন ভিড় ছিল না। ইংলিশ-চ্যানেলে প্রায় সব সময়ই ঝড় লেগেই আছে। এর উপর দিয়ে সব চেয়ে বেশি জাহাজ যাতায়াত করে বলেই বোধহয় বরুণ রাজার শাসন সব চেয়ে বেশি। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ এবার সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল। খুব সকালেই কুয়াসায় ঢাকা ফরাসী উপকূল দেখা গেল। জাহাজ 'সেন' (Seine) নদীর মুখে প্রবেশ করল। এখানেই ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ বন্দর হাভার (Havre) ফরাসীদেশ দেখতে পেয়েই মন খুসীতে ভরে উঠল। এর বাড়ীঘর লোকজন ইংলণ্ড থেকে কত তফাৎ। ইংলণ্ডে সমস্ত রাস্তা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। তাকেই ছোট ছোট বাড়ীতে ভাগ করা হয়েছে যেন একটা প্রকাণ্ড অজগর শুয়ে আছে। আর ফরাসীদেশে প্রত্যেক বাড়ীই ছোট ছোট এবং আলাদা, সেই জন্য রাস্তার বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তারপর, দুই দেশের লোকে কত তফাৎ। ইংলণ্ডে কোথায় কোন গোলমাল নাই, মুটে মজুর নীরবে আপন আপন কায করে যাচ্ছে, আর ফ্রান্সে তাদের কথা যেন ফুরোয় না। এত জোরে ফরাসীরা কথা বলে যে মনে হয় এরা যেন কেবল কথাই শিখেছে। ইংরেজদের মত প্রকাণ্ড দেহ ও তদুপযুক্ত গাম্ভীর্য্য ফরাসীদের নাই। যদিও দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে মাত্র ২৫ মাইল সমুদ্র, কিন্তু দুই জাতের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে পচিশের অনেকগুণ। সেই জন্যই ফরাসীদেশে পা দিয়েই যেন ছুটির নবীনতা আরম্ভ হয়।

বন্দরে নেমেই আবগারীর কর্ত্তাদের কাছে ট্রাঙ্ক খুলে দেখাতে হয়, চুরি করে ফ্রান্সের ট্যাক্স না দিয়ে কোন জিনিস নিয়ে যাচ্ছি কি না। ট্রাঙ্ক খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কর্ত্তারা তেমন চটপটে নন। অনেকক্ষণ পরে একজন আমার কাছে এসে লম্বা এক ছড়া বলে গেল, তার মধ্যে মাত্র দুইটি কথার মানে বুঝলাম, একটা 'তাবাক' (Tabac) তামাক, আর একটা 'লারজান' (L'arjan) মুদ্রা। কিন্তু আমি অতি জোরে মাথা নেড়ে তার ছড়ার তালরক্ষা

করতে লাগলাম। সে ট্রাঙ্কের জিনিস না দেখেই আমাকে বন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল, এখনই যাত্রীর যন্ত্রণা শেষ হয় নাই। পাসপোর্ট আফিসের কাছে আবার দাঁড়িয়ে থাকতে হল। সেখানকার কর্ত্তা সবেমাত্র এসেছেন, তার মোহরের তারিখ খুঁজে পাচ্ছিলেন না; কিছুক্ষণ পরে তারিখ মিলল। আমাদের পাশপোর্টে একটা করে ছাপ দিয়ে ফরাসীদেশে প্রবেশ করতে দিল। দেশভ্রমণের আনন্দকে মাটি করে এই আবগারীর ও পাশপোর্টের দৌরাত্ম্য। অনেক সময় এত দেরী করে যে ট্রেণ ধরতে পারা যায় না।

বন্দর থেকে ট্রামে করে ষ্টেশনে যাওয়া গেল, এবং সেখানে প্যারিশগামী এক এক্‌সপ্রেসে চেপে বসা গেল। আমাদের কামরায় সঙ্গী ছিলেন এক মহিলা ও তার ছোট এক মেয়ে। ফরাসীরা ছোট ছেলে অত্যন্ত ভালবাসে। যেমনি সেই মেয়েটি দৌড়িয়ে 'কারিডোরে' (Corridor) বের হচ্ছিল, অমনি কেউ না কেউ তাকে ধরে আদর করছিল। আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়লেন; মেয়েটি তার জুতো শুদ্ধ পা ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দিল। তার মা আমাদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমাদের যে সামান্য ফরাসী জ্ঞান ছিল, তা উচ্চারণ করবার দোষে একবারে অবোধ্য হয়ে দাঁড়াল। বাস্তবিক ফরাসীভাষা অদ্ভুত শব্দের অর্দ্ধেকই বেশি সময় উচ্চারণ করা হয় না। Prixএর (Price) উচ্চারণ প্রিক্‌স নয়, প্রি। Boucoup (many) 'বোকুপ্‌' নয় 'বকু।' ট্রেণ থামল মাত্র রুয়াঁতে (Rouea)। দুই ধারে দেখি বরফ পড়ে আছে। এবার শীতে ইংলণ্ডে বরফ পড়ে নাই, কিন্তু ফ্রান্সে বরফ দেখতে পেলাম। সাধারণতঃ ফ্রান্স ইংলণ্ডের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা।

ট্রেণ বেলা ১২ টায় প্যারিশের 'সাঁলাজার' (St. Lrzaire) ষ্টেশনে এসে থামল। আমরা যে যায়গায় যাব, তার নাম হচ্ছে মেজিভ (Megeve) তার ট্রেণ আর একটা ষ্টেশন 'গারদিলিয়' (Garedelyon) থেকে রাত নয়টায় ছাড়ে। সুতরাং লাগেজ পত্তর ষ্টেশনে জিম্মা করে রেখে প্যারিশ দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল। রাস্তায় একখানা প্যারিশের ম্যাপ কিনে নিলাম ও 'লুভার' গ্যালারিতে ঢুকে সারা বিকেল কাটানো গেল। ইংলণ্ডে ফেরবার পথে প্যারিশে কয়েক দিন ছিলাম। সেই সময় প্যারিশ সম্বন্ধে লিখব।

রাত সাড়ে নটার সময় আমাদের ট্রেণ ছাড়ল, বাইরে ভয়ানক ঠাণ্ডা। গাড়ীতে বেঞ্চির তলে গরম জলের পাইপ বসানো আছে, তাতে গাড়ী গরম থাকে। আমাদের কামরায় আর

কেউ ছিল না। এক বেঞ্চির একদিকে আমি মাথা রাখলাম, অপরদিকে আমার বন্ধু মাথা রাখলেন; আমাদের পা পরস্পরের মাথার কাছে এসে পড়ল। আমি ব্রাহ্মণ আমার বন্ধু বৈদ্য, কিন্তু পথ ঘাটে ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত সম্মান হয় না, এ আমি অনেক যায়গায়ই লক্ষ্য করেছি। দুইজনে ওভারকোট ও 'রাগ' মুড়ি দিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পাশের কামরায় কয়েকজন ফরাসী পুরুষ ও মহিলা যাচ্ছিলেন তাঁদের হাসাহাসি ও কৌতুকে আমাদের ঘুম মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ফরাসীরা ভয়ানক আলাপপ্রিয়, রেল গাড়ীতে কামরায় যত জন থাকে সকলেই পরস্পরের মধ্যে আলাপ জমে যায়। হয়ত কেউ এই শুষ্ক কথাবার্ত্তাকে সরস করার জন্য এক বোতল 'ভাঁ' (মদ) বের করে প্রত্যেককে খেতে দেয়। তারপর তাদের উচ্চ কলহাসি ও রসিকতা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে এরা যে এক পরিবারের লোক সকলের তাই মনে হবে। অথচ ইংরাজরা এসম্বন্ধে কত বিভিন্ন। আমি এক্সপ্রেস্ ট্রেণে ঘন্টার ঘন্টা এক কামরায় বহু ইংরেজের সঙ্গে চলেছি, যেই ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে সেই থেকে যে যার যায়গায় 'গ্যাট' হয়ে বসে খবরের কাগজ পড়া ও একমনে পাইপ টানা সুরু করে দিল যে গাড়ীতে মানুষ যাচ্ছে কি লাগেজ যাচ্ছে কিছুতেই বোঝবার উপায় নাই। ধন্য জাত!

ভোরের আলো চোখে লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি গাড়ী পাহাড়ে ঢুকেছে; এত শীত যে হাত বের করা যায় না; চার দিকে ঘাসপাতার বালাই নাই, সব রুক্ষ, তার মাঝে মাঝে সাদা বরফ পড়ে আছে। বেলা আটটার সময় ট্রেণ এক্স-লা-ব্যাতে পৌঁছাল। এইখানে আমাদের গাড়ী বদল করতে হবে; আমাদের ট্রেণখানা রোম পর্য্যন্ত যাবে। এই এক্স-লা-ব্যা-তে (Aix-la-Bain) গ্রীষ্মের সময় কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম, দূরে পাহাড়ের উপর আমাদের সেই বাড়ী দেখা যাচ্ছিল, তখন এক্স-লা-ব্যাকে শ্যামশোভায় সজ্জিত দেখেছিলাম, এখন এর ধূসর মূর্ত্তি। জীবনে এ যায়গাটাকে আর তৃতীয় বার দেখব না। আমাদের বাড়ীর চার পাশে ঢালু পাহাড়ের গায়ে আঙ্গুরের ক্ষেত, চেরী ও আপেলের গাছ, দূরে বরফ মণ্ডিত ইটালীয় পর্ব্বতমালা, সন্ধ্যার রক্তিম আভায় আমাদের সেই সব গল্পগুজব এবং অস্ফুট চন্দ্রালোকে কালো পাহাড়ের ভীম করাল ছায়া, এই সব পুরাণো কথা মনে করে কান্না পাচ্ছিল, হে কাল, তোমার ঐ কৃষ্ণ অন্ধকার গুহায় একবার আমাকে প্রবেশ করতে দাও, আমি আমার উজ্জ্বল স্মৃতিগুলিকে আর একবার দেখে নিই।

ক্রমে ট্রেণ উঁচুতে উঠতে লাগল; মানুষের চিহ্ন বিরল হয়ে আসতে লাগল ও বরফ ততই বেশি হতে লাগল। 'লারোশে' (La Roche) আর একবার ট্রেণ বদল করতে হল, ট্রেণ একটা উপত্যকার মধ্য দিয়া চলল। একটা নদী আগাগোড়া এর ভিতর দিয়া চলেছে। উপত্যকাটা টেবিলের মত সমতল; চওড়া আধ মাইল থেকে এক মাইলের কাছে। দুই পাশে পাহাড় এমন খাড়া হয়ে উঠেছে যে প্রাচীর বলে বোধহয়। বেলা এগারটায় ট্রেণ আমাদের গন্তব্য ষ্টেশনে পৌছিল; 'মেজিভ' (megeve) এখান থেকে ৭৷৮ মাইল দূরে; মোটরে যেতে হবে। ছোট্ট সেই ষ্টেশনে দুইজন কাল আদমী দেখে বেশ একটু 'সোর' পড়ে গেল। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গৃহকর্ত্রী তাঁর 'বাটলার' ও মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা তাতে উঠে পড়লাম। আমাদের প্রায় দুই হাজার ফিট উপরে উঠতে হবে। মোটর অদ্ভুত সুন্দর রাস্তা দিয়ে উপরে উঠতে সুরু করল। এখন চারদিকে অবিচ্ছিন্ন বরফ, সবুজের কোন চিহ্ন নাই; কেবল স্থানে স্থানে ঘন সবুজ 'পাইনের' বন সেই শুভ্রতাকে কলঙ্কিত করেছে। গরম দেশের লোক; এ রকম দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। কাযেই দুই দিনের পথের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে বালকের মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দুইজন বিস্ময় প্রকাশ করছিলাম। গাড়ীর ড্রাইভার সারা রাস্তা আমাদের লক্ষ্য করে কত কি বলে যাচ্ছিল। আমাদের মন সেদিকে একেবারেই নাই। কখনও গাড়ী পাহাড়ের গায়ে খাতের পাশ দিয়ে চলছিল; হয়তঃ বাতাসের একটা ঝাপ্টা তাকে উড়িয়ে শত শত ফিট নীচে ফেলে দিতে পারত। চারদিকে কেবল পাহাড়, এক শ্রেণীর পর আর এক শ্রেণী, এই রকম তরঙ্গায়িত শৈলমালা সীমাহীনভাবে দিগন্তে মিশে গিয়েছে। পাহাড়ের উপর 'পাইন'বনের ধারে কচিৎ একখানা কাঠের কুটীর। সেখানে গ্রীষ্মকালে লোক এসে বনের কাঠের খবরদারি করে। মোটর আর একটা সমতল ভ্যালি'তে (উপত্যকা) প্রবেশ করল। এটাকে যেন বরফের মরুভূমি বলে বোধ হচ্ছিল। তার মধ্যে এক যায়গায় খান ত্রিশ চল্লিশেক বাড়ী। সেইটাই হচ্ছে আমাদের গন্তব্য স্থান 'মেজিভ'।

মোটর থেকে নেমে মাটিতে পা দিতেই পা বরফের মধ্যে ডুবে পড়ল। সর্ব্বত্র বরফ, ঘরের চাল এক ফুট বরফের আস্তরণে সাদা হয়ে আছে। আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করে গৃহকর্ত্রীর জন্য ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরে তিনি এলেন। ও হরি, এযে একবারে ছেলে মানুষ; আমাদের চেয়েও বয়সে ছোট; কোথায় ভেবেছিলাম যে প্রৌঢ়া মার বয়সী

মহিলাকে দেখব ; তার বদলে দেখি ১৯।২০ বছরের একটি মেয়ে ; খেলার পোষাক পরে আছেন। দুইদিন আমাদের ক্ষৌরকার্য্য হয় নাই ; তারপর পথের ধুলোবালিতে চেহারা বন-মানুষের মত হয়ে আছে। পাছে তিনি মনে করেন যে ভারতবর্ষীয়রা অসভ্য বর্ব্বর, তাই তাকে বললাম, "এই অপরিস্কার চেহারায় আপনার সম্মুখে আসার জন্য মাপ করুন ; কি করব, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা পেরে উঠি নাই।" তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন, তাড়াতাড়ি লাঞ্চের জন্য আদেশ দিলেন।

আমরা বাড়ী দেখে খুব সন্তুষ্ট হলাম। এ খানা ছোট্ট একখানা কাঠের বাড়ী নূতন তৈরী, ঝকঝক করছে। সর্ব্বদা প্রত্যেক ঘরে গরম জলের পাইপ রেখে ঘর গরম রাখা হয়েছে। এই রকম ছোট্ট বাড়ীকে বলে 'স্যালে' (chalet) এই রকম বাড়ীতে লোকে অল্প দিনের জন্য ছুটি যাপন করতে আসে। ফ্রান্স ও সুইটজারল্যাণ্ডে পাহাড়ের গায়ে এই রকম কাঠের বাড়ী যথেষ্ট দেখা যায়।

আমাদের গৃহকর্ত্রী একজন রুমেনিয়ান ভদ্রলোকের কন্যা, একজন ফরাসী ভদ্রলোককে বিবাহ করেছেন। তাঁর স্বামীর বয়স ২২।২৩, বেচারী মোটরে করে ঘুরে বেরাতে ঠাণ্ডা লাগিয়ে শয্যাগত হয়ে ছিলেন, এবং আমরা যে চার সপ্তাহ ঐ বাড়ীতে ছিলাম, ততদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নাই। গৃহকর্ত্রীর পিতা রুমেনিয়ান ডিপ্লোমাটিক সার্ভিসে ছিলেন ; কাযেই অনেক দেশ ঘুরেছেন ; সেই জন্য তাঁর কন্যা অনেক কয়টি বিদেশী ভাষা জানেন। বাস্তবিক তিনি একজন অদ্ভুত স্ত্রীলোক। যত রকম পুরুষোচিত খেলা ও ব্যায়াম আছে তিনি প্রত্যেকটা অভ্যাস করেছেন, এবং লেখাপড়াও বেশ জানেন। প্রত্যহ খাবার সময় আমার বন্ধুর সঙ্গে সোশিয়ালিজম্ (Socialism) স্ত্রীলোকের অধিকার, ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়ে অনেক তর্ক করতেন। এক কথায় তিনি অনেকটা দেবী চৌধুরাণী ধরণের মেয়ে মানুষ।

পূর্ব্বেই বলেছি 'মেজিভ' একখানা ছোট গ্রাম। রেল থেকে মাইল দশেক দূরে, দিনের মধ্যে একবার মাত্র ষ্টেশন থেকে মোটর আসে। সুতরাং অন্য কোন আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা নাই। চারদিক বরফে একবারে সাদা হয়ে আছে। বরফের উপর নানা রকম খেলা আছে, যেমন স্কেটিং, স্কিং (Skating, Ski-ng) প্রতিবছর ইংলণ্ড থেকে শীতকালে অনেকে আল্‌পসে

এইসব খেলার জন্য আসে, একে ইংরাজরা বলে উনটার স্পোর্টস্ (Winter Sports) আমরা সময় কাটানোর অন্য কোন উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে এই সব খেলা আরম্ভ করলাম। আমাদের গৃহকর্ত্রী হলেন আমাদের শিক্ষয়িত্রী, তিনি এই সব খেলার জন্য এই শীতের ভিতর বাড়ী ভাড়া করে আছেন।

আমরা যেখেলা আরম্ভ করলাম তাকে বলে স্কি-ইং (Ski-ing) স্কির চেহারা বর্ণনা করা একটু শক্ত। প্রায় মানুষ-সমান লম্বা আধ হাত চওড়া পাতলা দুইখানা কাঠের উপর দুইপা আটকান থাকে। কাঠ দুইখানা খুব পালিশ ও পাতলা, ও সামনের আগা উপরদিকে বাঁকানো, যাতে বরফের মধ্যে ঢুকে না যায়। চামড়ার বকলশ দিয়ে সেই কাঠ দুইখানা এমন ভাবে পায়ের তলায় লাগানো থাকে যে কিছুতেই খুলে যায় না। যেখানে বরফ একটু ঢালু সেখানে স্কি অনায়াসে পিছলে নেমে পড়ে। খেলায় এই হচ্ছে আনন্দ। যখন ছোট ছোট টিলার মাথা থেকে স্কি নামা সুরু করে, তখন ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই হচ্ছে বাহাদুরী। স্কি যতই নামে ততই তার বেগ বৃদ্ধি হয়, ততই দাঁড়িয়ে থাকা হয় কঠিন ও ততই স্ফূর্ত্তি লাগে। সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠে, মনে হয় যেন পায়ের তলাথেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে। এই অতিবেগের সময় স্কি থামানো, কিংবা তাকে ঘুরিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে কারিকুরি। ল্যাপল্যাণ্ড নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি বরফের দেশে যখন সব পথ ঘাটের চিহ্ন থাকে না, তখন সেখানের লোকেরা এই স্কি পায়ে দিয়ে সর্ব্বত্র যাতায়াত করে। সেদিন আমাণ্ডসেন (Amundsen) উত্তর মেরুতে যে অভিযান নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন সঙ্গে করে স্কিও নিয়ে গিয়েছিলেন ও চলাফেরার জন্য ব্যবহারও করেছিলেন। এখানে একটা কথা বলি। ইংরেজরা Skiকে স্কি না বলে বলে 'সি' ; কিন্তু আমরা ফরাসী দেশে বলতে শুনেচি 'স্কি' এবং শুনেছি নাকি নরওয়ের অধিবাসীরাও ঐ বলে ; সুতরাং আমরাও স্কি বলতাম। আমি প্রথম কয়দিন এত আছাড় খেয়েছিলাম যে গায়ের ব্যথায় কয়েকদিন নড়তে পারি নাই। বরফ এত গভীর যে পড়লে তেমন আঘাত লাগত না তাই রক্ষা।

মেজিভের মত দুর্গম ছোট যায়গায়ও শীতকালে এই খেলার জন্য ভিড় হত ; তাই এখানে পাঁচ ছয়টি হোটেল আছে। আমি এক যোড়া স্কি ভাড়া করেছিলাম। বরফে এই সব খেলার জন্ত একরম বিশেষ বুটের দরকার হয়। নূতন এক জোড়ার দাম দেখি খুব বেশি ; পনর

কুড়ি দিনের জন্য কিনতে ইচ্ছা হল না। শেষকালে এক জোড়া পুরাণো ব্যবহার করা (Second hand) মিলল। তাই কিনে নিলাম। কখনও যে Second hand জুতো কিনব ভাবি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কয়েকজন আমার কাছ থেকে ঐ জুতো ফের কিনে নেওয়ার জন্য এসেছিল।

মেজিভের মত গ্রামে পূর্ব্বে ভারতীয় কেউ কখন আসে নাই; কাযেই এরা আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত। যখন চলে যাব তখন কি করে এরা জেনেছিল যে আমরা চলে যাচ্ছি। সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেছিল এবং মেজিভ আমাদের কেমন লেগেছে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল। ফরাসীরা বিদেশীয়দের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে।

আপনারা হয়ত ভাবছেন কি করে আমরা এত শীত সহ্য করেছি। দিনের বেলা শীত মোটেই ছিল না। যখন নির্ম্মল নীল আকাশে সূর্য্য উঠত তখন বরফের উপর থেকে এক তীব্র দীপ্তি চারিদিক ঝলসে ফেলত; আলো এত প্রখর যে চোখে নীল চশমা ব্যবহার করতে হত; তা না হলে বাইরে চাওয়া যেত না। বাস্তবিক এই রকম উজ্জ্বল দিন আর দেখি নাই। চারিদিকের বরফ ও পাহাড় যেন কি এক অপার্থিব আভায় জ্বল জ্বল করত; মাথার উপর ঘন নীল আকাশ; ঘন সবুজ পাইনের বন, তার পেছন থেকে পাহাড়ের সার স্তরে স্তরে উঠে আকাশের এককোণা ছেয়ে ফেলেছে। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়ত; এত ঠাণ্ডা যে হাত বের করা যেত না। কখন বৃষ্টি হতে দেখি নাই; বৃষ্টি জমাট বেঁধে পড়ত।

বিকেলে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম; কিন্তু সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ফিরে আসতাম, একটা পথে খুব বেশী যেতাম, কারণ সেই পথে কিছুদূর গেলেই আল্‌পসের সর্ব্বোচ্চ শিখর মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc)কে খুব সুন্দর ভাবে দেখা যেত; মঁ ব্লাঁ প্রায় ষোল হাজার ফিট উঁচু এবং মেজিভ থেকে মাইল ১০।১২ দূরে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। পথ থেকে মঁ ব্লাঁকে খুব ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম; ক্যামেরা সঙ্গে ছিল; একখানা ছবি নিলাম। কিছুদূর গিয়েই মনে হ'ল এখান থেকে দেখতে আরও সুন্দর, অমনি আর একখানা ছবি নেওয়া গেল; আর একটু যেয়ে দেখি যে এখান থেকে দেখতে আরও সুন্দর; কিন্তু আর প্লেট নষ্ট করতে ইচ্ছা হল না। চার দিকের পাহাড় থেকে সূর্য্য বিদায় নিয়েছে; ভ্যালিতে তাদের ছায়া

পড়েছে ; সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ; কিন্তু মঁ ব্লার মাথার উপর তখনও সূর্য্যের আলো আছে।

এই রকম অনেক বিকালই আমাদের কেটেছে। আর একদিনের সান্ধ্য ভ্রমণ সম্বন্ধে আমার ডায়রীতে (Diary) যা লিখেছিলাম, তা নীচে তুলে দিচ্ছি। "চায়ের পর আমরা দুই জনে Comblouxএর দিকে যাত্রা করলাম। নির্জ্জন পথ ; সম্মুখের পাহাড় একবারে নগ্ন, এত খাড়া যে বরফ গায়ে লেগে থাকতে পারে না। আমাদের ডানে ও বাঁয়ে পাইনের সব গাছ। পথটা পাহাড়ের এক কিনারা দিয়ে চলে গিয়েছে। নীচেই ভ্যালি (উপত্যকা) পাহাড়ের গা থেকে বরফ চলে যাওয়ার জন্য মরা ঘাস বের হয়ে পড়েছে। সাদা. কটা পাষাণের রুক্ষ ধূসরতা পাইনের ঘন সবুজের সঙ্গে মিশে এক বিচিত্র সমাবেশ হয়েছে। রাস্তা দিয়ে মনে হচ্ছিল কেবল দূরে আরও দূরে চলে যাই।"

"মধ্যে মধ্যে দুই একখানা বাড়ী এবং পথে কচিৎ পথিক দেখা যাচ্ছিল, সহরে ঘরবাড়ী ও মানুষ এত গাদাগাদি হয়ে আছে যে তাদের পৃথক করে দেখা যায় না। কিন্তু এই নির্জ্জন পাহাড় পথে যখন একজন ফরাসী কৃষক চলে যাচ্ছিল, তখন প্রকৃতির এই গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত, বরফ ও মরা ঘাসের কটা রঙের মধ্যে মানুষকে কেমন সুন্দর দেখা যায়, তার কি রকম স্থান বেশ বুঝা যাচ্ছিল।"

"এমন সুন্দর সান্ধ্যভ্রমণ আর কখনও করি নাই ; বাতাস এমন স্নিগ্ধ ও প্রীতিকর আর কখনও ঠেকে নাই। কেবল বেঁচে থাকার যে সুখ আছে, শুধু খাওয়া ও বিশ্রাম করা, খেলা করা প্রভৃতি দিয়ে জীবনের যে আনন্দ পাওয়া যায় আমরা যেন তা উপলব্ধি করতে পারছিলাম।"

মেজিভে অনেক পাহাড়েই উঠেছি। একদিনের বিবরণ দিয়ে মেজিভের প্রসঙ্গ শেষ করি।

মেজিভ থেকে সম্মুখের পাহাড়ের জন্য মঁ ব্লাঁকে ভাল দেখা যেত না। মেজিভ থেকে হাজার আড়াই ফিট উঁচুতে "স্যালে রোজা" বলে একখানা ছোট্ট কাঠের কুটীর আছে। সেখানে অবশ্য এখন কেউ নাই। কিন্তু সেখান থেকে নাকি মঁ ব্লাকে সম্পূর্ণ ভাবে. অর্থাৎ পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখা যায়। যদিও সমস্ত যায়গা বরফে ঢাকা থেকে পথের কিছু স্থিরতা ছিল না, কিন্তু

আমাদের গৃহকর্ত্রী বললেন যে এত লোক সেখানে গিয়েছে যে বরফের উপর পথের বেশ চিহ্ন আছে; এবং একবার ঠিক পথ ধরলে আর ভুল হওয়ার উপায় নাই। তিনি শুধু আমাদের সাবধান করে দিলেন যে কুটীরে পেঁছিয়ে যেন আমরা আর একটুও যেন অগ্রসর না হই, কারণ কুটীরের দুই তিন গজ দূরেই একটা আড়াই হাজার ফিট গভীর খাত আছে যার মধ্যে পড়ে গেলে আমাদের শরীর ও প্রাণ দুইয়ের শেষ হবে, আমরা বেলা দুইটার সময় যাত্রা করলাম। কিছুদূর গিয়েই পথ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হল, সম্মুখেই বরফে ঢাকা প্রকাণ্ড মাঠ, পথের কোন চিহ্ন নাই। তার ওপারে একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছিল। সেইখানে খবর পাওয়া যাবে ভেবে সেই প্রান্তর পার হয়ে গেলাম। বরফের মধ্যে হাঁটার কষ্ট ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেন না। প্রতি পদক্ষেপেই পা ডুবে পরে। সেই বাড়ীতে কোনই নির্দেশ মিলিল না কেবল শুনলাম যে আমাদের আরও উপরে উঠতে হবে। কিছু দূর গিয়ে আর এক বাড়ী পাওয়া গেল। এই সব কৃষকদের বাড়ী। এরা গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের গা চাষ করে, শীতকালে কোন কাজই থাকে না। অনেক ডাকাডাকির পর একজন মেয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের বলল 'a droit' সম্মুখে বরফের উপর পায়ের চিহ্ন দুই দিকে চলে গিয়েছে। মেয়েটি যে কথা বলল তার মানে হয় ডাইনে এবং বরাবর সম্মুখে। আমার ডাইনের পথেই চলতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার বন্ধু ফরাসী ভাষায় আমার চেয়ে বেশী পণ্ডিত; সুতরাং তাঁর কথামত সম্মুখের পথ ধরা গেল, যদিও সে পথ এমন খাড়া ভাবে উঠেছে যে দেখে বোধ হচ্ছিল বেশীদূর সে যায় নাই। একটু গিয়েই সন্দেহ সত্যি হল। একটা পাইন বনের মধ্যে এসে পথের সমস্ত চিহ্ন মিলিয়ে গিয়েছে। আমরা শেষ লোকাশ্রয় নীচে ছেড়ে এসেছি, সুতরাং কোথায় জিজ্ঞাসা করার উপায় নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যৌবনের দুর্বুদ্ধি জেগে উঠল; ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব, এ হতেই পারে না। আমরা দুইজন তখন পথচিহ্নহীন নিষ্কলঙ্ক বরফের ভিতর দিয়া পাহাড়ে উঠা আরম্ভ করলাম। পাহাড়গুলা কি পাজি! মঁ ব্লাঁকে অনেকটা দেখা যাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল সম্মুখের এই পাহাড়টার পর আর কোনো উঁচু পাহাড় নাই; এটাতে চড়লেই মঁ ব্লা সম্পূর্ণ দেখা যাবে। সেটার উপর চড়ে দেখি, সম্মুখে আর একটা। সেটার উপর চড়লে আবার আর একটা এসে হাজির হয়, ক্রমে চলাও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল এবং বরফের মধ্যে ক্রমে হাঁটু তারপরে কোমর পর্য্যন্ত ডুবে যেতে লাগল. কিন্তু আর এক নূতন বিপদ দেখা দিল। আমার বন্ধু নিঃশঙ্কচিত্তে সামনের বরফে পা দিয়েছেন, অমনি ধপাস্‌

করে তার মধ্যে গলা পর্য্যন্ত ডুবে গেলেন ; দেখা গেল সেটা একটা নদীখাতের কিনারা। পাহাড়ের এই সব ঝরণা কত গভীর খাতের সৃষ্টি করে সে আমরা দেখেছি। তার উপর দিয়ে বরফের এক ভঙ্গুর আস্তরণ শীতকালে পড়ে যায়, ভাগ্যে বন্ধু বেশী গভীর স্থানে পড়েন নাই ; তা হলে জীবন নিয়ে টনাটানি হত। কাযেই আমরা ফিরে এলাম। কয়েক ঘণ্টা ধরে হেঁটে যেমন ক্লান্ত হয়েছিলাম, তৃষ্ণা পেয়েছিল তার বেশী, কিন্তু চড়াইয়ের চেয়ে উতরাই আরও কষ্টকর ; পেছন থেকে কে যেন সর্ব্বদাই ঠেলা দিচ্ছে নেমে যাওয়ার জন্য ; কিন্তু সেটা থামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে নামতে হয়। যাই হোক, নেমে এসে সেই বাড়ীতে আমরা পানীয়ের প্রার্থনা করলাম তখন বাড়ীতে গাভী দোহন চলছিল, সেই কাঁচা গরম দুধ এনে আমাদের খেতে দিল, এ জিনিষটা মুখ প্রিয় বলতে পারি না। কিন্তু আতুরে নিয়মো নাস্তি ; তাই দুই পেয়ালা পান করা গেল। দাম এত কম যে দামের সমান বকশিশ দিয়ে নিশ্চয়ই ভারতীয়দের সম্বন্ধে সম্ভ্রম বেশী করে এসেছি।

ক্রমশঃ—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার।

সুহাসিনীর মৃত্যু।

রঙ্গপুরের নির্য্যাতিতা, হিন্দুকুলবধূ সুহাসিনী দেবী কালকবলে পতিত হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। সুহাসিনীর উপর অত্যাচার, নির্য্যাতনের কাহিনী বঙ্গে কাহারও অবিদিত নাই। সুহাসিনী গাইবান্ধার এক মোক্তারের কন্যা। কয়েকজন মুসলমানের লালসাস্থল হইয়া সুহাসিনী অপহৃতা হয়, এবং দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে অনেক প্রকারে নির্য্যাতন করে। সুহাসিনীর পিতা অতি কষ্টে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত সুহাসিনীর মামলা চলে এবং মামলার পুনর্ব্বিচারের আদেশ হয়। কিন্তু বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই গত ৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার বেলা ১১টার সময় সুহাসিনী ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছায় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের বাসায় প্রাণত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা, যন্ত্রণা, নিন্দা, অপবাদ ও গ্লানির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ

করিয়াছে। ৫ই অগ্রহায়ণ সুহাসিনীর ফিট হয়, রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আর জ্ঞান হয় নাই।

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে সুহাসিনী নারীরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে নিম্ন উদ্ধৃত পত্র লিখিয়াছিল—

"নিবেদন এই যে, পিতা, ভগবান আমাকে স্বামীর সংসারে আনিয়াছেন, উপলক্ষ আপনারাই। আপনারা যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। এখানে আসার পরে শ্বশুরের কাজ গিয়াছে। তাঁহাকে একঘরে করিয়াছে এবং এইরূপ হইয়াছে যে, জীবনে আমার সমাজে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা আমার হাতে খান নাই, খাইলে কি হইত জানি না। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আমার ন্যায় হতভাগিনী দ্বিতীয়া আছে কি না সন্দেহ। এখন ইঁহাদের এমন অবস্থা যে, না খাইয়া মরিবার উপক্রম। সংসারে এক তিল শান্তি নাই। এখন আমার ইচ্ছা যে, কোন আশ্রমে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দেই। ইহা আমার প্রাণের একান্ত বাসনা। আপনার কি মত জানাইবেন। যদি ভাল বুঝেন, আমার স্বামীর দ্বারা কিম্বা আপনি নিজে আমাকে লইয়া যাইবেন। পত্র পাওয়া মাত্র অভিমত জানাইবেন।"

সুহাসিনীকে মুসলমান পিশাচের কবল হইতে উদ্ধার করিবার পর তাহার স্বামী শ্রীমান নারায়ণ তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার শ্বশুরও তাহাকে পুত্রবধূরূপে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু যে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপায়ী, বারবনিতাসেবীর কোন দণ্ড দেয় না, যে সমাজ দুর্ব্বলের উপর সর্ব্বদা কঠোর দণ্ড দিতে সমুদ্যত, সেই সমাজ সুহাসিনীকে স্থান দেয় নাই। পরন্তু নানা প্রকার গ্লানিতে তাহার অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের আরোপ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সনাতনত্ব রক্ষা করিয়াছেন। এই মর্ম্মপীড়া ও মনোদুঃখে সুহাসিনী দিন দিন শুষ্ক হইতেছিল, পরিশেষে কাল আসিয়া তাহাকে সকল নিন্দাগ্লানির অতীত রাজ্যে লইয়া গিয়াছে।

সমাজ গোড়ামীতে কতদূর অন্ধ ও নির্ম্মম হইতে পারে তাহার পরাকাষ্ঠা এ ক্ষেত্রে হিন্দু মহাত্মাদের ব্যবহার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই যদি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের ব্যবস্থা হয়

তাহা হইলে নরকের আইন আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের ভণ্ডামী পদে পদে,—কর্ম্মক্ষেত্রে, জীবন যাপনে, সামাজিক প্রায় প্রতি ব্যাপারে! আমরা মুখে বলি রমণী দেবী,—প্রকৃতপক্ষে আমরা ভাবি তাহারা পিশাচী! কুবৃত্তি তাহাদেরই বেশী,—এই যে সমাজে ধারণা যে সমাজে পুরুষ প্রকৃত অত্যাচারী হইলেও দোষী নির্য্যাতিতা হয় রমণী, সে সমাজের সকল শিক্ষা পণ্ড,—সকল আশাই বিফল,—সোনার ভারত আজ এই পাপেই নরকের অধম! এত দেখিয়া এত ভুগিয়াও কি এ কলঙ্কের নিরাকরণ হইবে না!

বিদ্যার্থীর প্রতি আচার্য্য বসুর উপদেশ।

সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধি বিতরণী সভায় আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় 'ভারতীয় শিক্ষার ধারা' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। চারি হাজার বৎসর যাবৎ ভারতে যে শাক্তবলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যার চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে তাহার বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন ভারতের সভ্যতার মধ্যে এমন একটা নিহিত শক্তি আছে, যাহা কালের সর্ব্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে সভ্যতা অসংখ্য পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া আজও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যে সভ্যতা মিশরের, এ্যাসিরিয়ার এবং ব্যবিলনের সভ্যতার উত্থান পতন দেখিয়া আজও সবল সুস্থাবস্থায় বাঁচিয়া আছে। ভারতবর্ষ অতীতে যেমন জগৎকে জ্ঞানদান করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও তেমনি করিবে। সে শক্তি নষ্ট হয় নাই। অতীতের সেই মহিমময়ী স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিদ্যার্থীগণ কঠোর সাধনায় ব্রতী হও। কঠোর সাধনায় যে জয়ী হয়, সেই দেশসেবার প্রকৃত অধিকারী। সহজ সুলভ কার্য্যে আনন্দ ও সুফল নাই—কঠিন কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইবে। সে পথে সংযমই একমাত্র সহায়। সংযমের দ্বারাই শক্তি সঞ্চিত হয়। স্বাধীন চিন্তার স্রোত কেহ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। দুঃখ দৈন্যের নিদারুণ আঘাতেই মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে। পোষাক পরিচ্ছদ নহে—বিপদের ঘাতপ্রতিঘাতই তোমাদিগকে শক্ত করিয়া তুলিবে। বৃথা কথা বলিয়া শক্তির অপচয় করিও না, অপরকে উপদেশ দিতে না যাইয়া নিজের উপদেশ নিজে পালন করিবে। ভারতে এত খনিজ রত্ন ও কৃষিসম্পদ থাকা সত্বেও দেশের যুবকেরা বেকার ও অন্নাভাবে দারুণ কষ্ট পাইতেছে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? উপযুক্ত রূপে পরিচালিত শিক্ষাগারে শিক্ষাদান করিলে দেশীয় যুবকগণ যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়, উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী না হওয়া আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন প্রত্যেক দেশের মত আমাদেরও কর্ত্তব্য। কর্ম্মীর উপদেশ সফল হউক।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
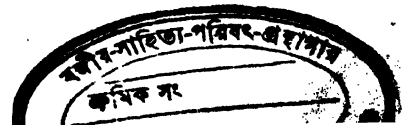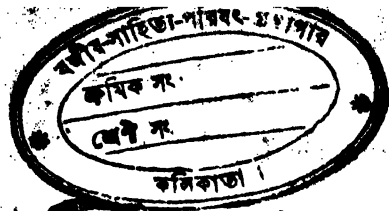
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ। | পৌষ, ১৩৩২ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

আনন্দ উৎসব।

—:(*):—

আজিকার আগুন-বায়ে
ব্যাকুল চাওয়া—
জীবনের হারিয়ে ফেলার
সকল পাওয়া
এলো ওই কোন মায়াবী
হাতে লয়ে কনক-চাবি
মায়াদ্বার ফেল্লো খুলে
আলোক্ ছাওয়া।

দোলা দ্যায় মনের বনে
পরশ অধীর
ভুখাচোখ পান করিচে
রূপের মদির।
জনমের এমন খানিক
ছিল মোর হাসির মাণিক
বাঁশরীর উৎসবেতে
কী গান গাওয়া!
অজানার পূণ্যফলে
কোন্ কাননে,—
অপ্সরী আস্‌লো আজি
মোর সামনে।
ফুলের ওই পাঁপড়ি গুলা
মাখে গায় পথের ধূলা
চলেচে পরের তরে
হারিয়ে যাওয়া!!
অরুণের রঙের বাসে
রাতের নীহার,
এলো মোর তুলির টানে
মানস-বিহার
ভাবা নাই কইতে কথা
ছবি দ্যায় নীরবতা
সাধনায় অতুল মণি
দানের নাওয়া।

ফ্যালে কেউ সুমুখ পানে
　　　　চপল চরণ,—
থামে কেউ কুটির দ্বারে
　　　　মানস হরণ।

আঁকা মোর হাতের ছবি
দ্যাখে কেউ তাহার সব-ই
ছোঁয়া দেয় সাপ্‌টে নিতে
　　　　দখিন হাওয়া।

রূপে মোর ডুব্‌লো আঁখ
　　　　মানস তরুণ,
নিভে যায় আলোক রেখা
　　　　দিনের অরুণ।

পুরা মোর হয়নি হাসি
বিদায়ের বাজলো বাঁশী ;
এসো গো আবার হেথায়
　　　　বিদায় চাওয়া !

সময়ের দাম যে এত
　　　　মানিক তুমার !
অবসর হয়নি মোটে
　　　　একটি মার।

বছরের একটি দিনে
এসো ফের লইব চিনে
থামায়ো কাঁদন-ভরা
　　　　নৌকা বাওয়া।

বন্দেআলী।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ।

—:*:—

তৃতীয় প্রস্তাব।

দ্বিতীয় অংশ, গৌড়মণ্ডলের রাজনৈতিক কথা।

এই বার আমরা গৌড়মণ্ডলের রাজনৈতিক কথা কিছু কহিব। মহাভারত মহাগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতযুদ্ধের পূর্বে এই প্রাচ্য ভারতখণ্ডে মগধাধিপতি জরাসন্ধ সম্রাট্‌ ছিলেন এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মিথিলা এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষাদি প্রদেশের নৃপতিবৃন্দ তাঁহার অধিনায়কত্বে দেশ শাসন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেনের হস্তে জরাসন্ধ নিহত হওয়ার পর তাঁহার পুত্র সহদেব মগধরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পরে কিছুকাল পর্যন্ত প্রাচ্য-ভারতীয় ভূপালবৃন্দ ইন্দ্রপ্রস্থের অধীনতা নাম মাত্র স্বীকার করিলেও যুধিষ্ঠিরের সে মহাসাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; অচিরকাল মধ্যেই জ্ঞাতি-বিরোধের সর্বনাশকর হুতাশনে হস্তিনা এবং ইন্দ্রপ্রস্থের অধীশ্বরগণের সহিত তদানীন্তন ভারতের যাবতীয় ক্ষত্রিয়রাজাই শলভবৎ আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধের পর মহারাজ জরাসন্ধের পৌত্র (সহদেবের পুত্র) সোমাধি বা সোমপ গিরিব্রজ নগরে রাজত্ব করিতে থাকেন এবং তাঁহার বংশের হস্তেই মগধ-সাম্রাজ্য এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত থাকে। তাঁহার বংশনাশের পর প্রদ্যোতবংশ ১৩৮ বৎসর ও তাহার পর শিশুনাগবংশ ৩৬২ (অথবা ৩৬০) বৎসর সাম্রাজ্য-শাসন করার পর মহানন্দীর সহিত এই শিশুনাগবংশের শেষ হইলে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার আট পুত্রকে লইয়া নবনন্দ বলা হয় এবং মগধ-সাম্রাজ্য ১০০ বৎসর এই বংশের হস্তে থাকার পর প্রথিতনামা কৌটিল্য চাণক্য এই নন্দ-বংশের উচ্ছেদ-সাধন করত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। মৌর্যবংশ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর শেষ মৌর্যরাজ বৃহদশ্ব অথবা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র (পুষ্পমিত্র) রাজাকে বিনাশ করত নিজে রাজ-সিংহাসন গ্রহণ করেন,—এবং তাঁহার বংশ (শুঙ্গবংশ) ১১২ বৎসর রাজ্য-

পালন করার পর কংগোত্রীয় ব্রাহ্মণ অমাত্য বসুদেব শেষ শুঙ্গরাজ দেবভূমিঃ অথবা দেবভূতিকে বিনাশ অথবা কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৫ বৎসর মাত্র রাজ্য তাঁহার বংশের অধিগত থাকে। অন্ধ্রদেশীয় (বা অন্ধ্রজাতীয়) সিন্ধুক (শিশুক বা শিমুক) কাণ্বায়ণ ব্রাহ্মণরাজ সুশর্মাকে এবং পূর্বরাজ-(শুঙ্গ)-বংশীয় অবশিষ্ট রাজপুত্রগণকে বিনাশ করত স্বয়ং রাজা হন এবং তাঁহাদের হস্তে এই প্রাচ্য ভারতের (এবং সমগ্র দক্ষিণাপথেরও) রাজত্ব ৪৬০ বৎসর ছিল। এই অন্ধ্রবংশের (সাতবাহনবংশের) পতনের পরে ভয়ানক রাজ-বিপ্লব ঘটে ও তাহার পর পাটলিপুত্রের গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। শিশুনাগবংশীয় রাজা উদায়ীর (বুদ্ধদেবের নির্বাণের কিছু পরেই) সময়েই মগধ-রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ হইতে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছিল (১)। নন্দবংশের উচ্ছেদের সমকাল হইতে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে এবং আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে যবন ও শকাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহাভারতের কাল হইতে পাটলিপুত্রের গুপ্ত-সাম্রাজ্যকাল (খৃষ্টীয় ৩১৯ হইতে ৫৩৮ অব্দ বা তাহারও কিছু কাল পর) পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যাহা আমাদের মহাপুরাণগ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় তাহা উপরে বিবৃত হইল। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বিগণের গ্রন্থ হইতেও অনেক ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া যায় ;—ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা তাহাও সযত্নে সংগ্রহ এবং প্রকাশিত করিয়াছেন। মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তগণের সময় পর্যন্ত কালের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পৌরাণিক প্রবাদ ভিন্ন শৈললিপি, স্তম্ভলিপি, শিলালিপি, মুদ্রা এবং তাম্রশাসনাদির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। প্রদ্যোতবংশ, শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ, শুঙ্গবংশ, কাণ্ববংশ এবং আন্ধ্রবংশের রাজগণের প্রকৃত কাল-নির্ণয় এবং তাঁহাদের প্রভাবের বিস্তৃতি লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে অনেক মতভেদ থাকিলেও আমাদের আলোচনার নিমিত্ত সেই

---

(১) আমাদের প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বায়ুপুরাণ (৯৯ অধ্যায়), মৎস্যপুরাণ (২৭২—২৭৩ অধ্যায়), বিষ্ণুপুরাণ (৪র্থ অংশ, ২২—২৪শ অধ্যায়) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের (৯ম স্কন্ধ, ২২ অধ্যায় ও ১২শ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়) ঐতিহাসিক অংশ হইতে গৃহীত। মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের ইতিহাস, অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের পুস্তকাবলী এবং কেম্ব্রিজ ইতিহাসও দ্রষ্টব্য।

সকল মতভেদের দ্বন্দ্বকোলাহলে যোগদানের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। আমরা মূলতঃ এই মাত্র বলিতে চাই যে, মহাভারতের কাল হইতে গুপ্তকাল পর্যন্ত মগধনাথই প্রাচ্য ভারতখণ্ডে সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, কামরূপও কলিঙ্গাদির রাজগণ মগধনাথের ছত্রচ্ছায়ায় নিজ নিজ রাজ্যের প্রজাগণকে শাসন পালনাদি করিতেন। গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয় বা বিক্রমাদিত্য) মহারাজের সময়েই গৌড়মণ্ডল প্রথমে মগধ-সম্রাটের সাক্ষাৎ শাসনাধীন হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তবে, পূর্বে কামরূপ হইতে দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত এই বিস্তৃত প্রাচ্য প্রদেশের সর্বত্রই যে গুপ্তনাথগণের সমান রাজনৈতিক প্রভাব বর্তমান ছিল, তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ কামরূপে ভগদত্তবংশীয় রাজগণের বংশধারা অবিচ্ছিন্নভাবেই যে বহুকাল পর্যন্ত (এমন কি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত) চলিয়াছিল এবং পূর্ববঙ্গে যে স্বতন্ত্র রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, তাহারও সাক্ষ্য (তাম্রশাসনাদি দলীল) পাওয়া গিয়াছে।

ঐতিহাসিকগণের সংগৃহীত প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ৫৩৮ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে, গুপ্তসম্রাট্ দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের সহিত, গুপ্তদিগের মহারাজ্য উৎসন্ন গিয়াছিল। নিম্নে তাঁহাদের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

মহারাজ শ্রীগুপ্ত
|
মহারাজ শ্রীঘটোৎকচগুপ্ত
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত—প্রথম সম্রাট্ (৩১৯—৩২০ খৃষ্টাব্দ)
|
ঐ শ্রীসমুদ্রগুপ্ত (খৃঃ ৩৭৫ পর্য্যন্ত)
|
ঐ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় (বিক্রমাদিত্য) ৪১৩ খৃঃ পর্যন্ত)
|
ঐ শ্রীকুমারগুপ্ত প্রথম (খৃঃ ৪৫৫ পর্যন্ত)
|
ঐ শ্রীস্কন্দগুপ্ত (খৃঃ ৪৮০ অব্দ পর্যন্ত)
|
ঐ শ্রীপুরগুপ্ত (৪৮০ খৃঃ)
|
ঐ শ্রীনরসিংহগুপ্ত (বালাদিত্য) (৪৮৫ খৃঃ)
|
ঐ শ্রীকুমারগুপ্ত দ্বিতীয় (৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)। (২)

(২) মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হইতেই প্রধানতঃ এই তালিকা গৃহীত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকার কালে গৌড়মণ্ডলের কোন কোন অংশ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দিনাজপুরের অন্তর্গত দামোদরপুরে আবিষ্কৃত পাঁচখানি এবং রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার নিকট ধানাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি এই ছয়খানি প্রাচীন তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে—

(১) নাটোরের ধানাইদহ লিপি,

সম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্ত, গুপ্তাব্দ ১১৩ (খৃষ্টাব্দ ৪৩২—৪৩৩)

(২) দিনাজপুর দামোদরপুর লিপি (ক),

সম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্ত, গুপ্তাব্দ ১২৪ (খৃষ্টাব্দ ৪৪৩—৪৪৪)

(৩) ঐ দামোদরপুর লিপি (খ),

সম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্ত, গুপ্তাব্দ ১২৯ (খৃষ্টাব্দ ৪৪৮—৪৪৯)

এই তিনখানি তাম্রশাসনই মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে তাঁহার নিযুক্ত উপরিক (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) এবং বিষয়পতির (জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মচারী) শাসনকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। দামোদরপুরের অবশিষ্ট তিনখানি শাসন লিপির দুইখানি সম্রাট্ বুধগুপ্তের রাজ্যসময়ে, (সংবতের অঙ্ক লুপ্ত হওয়ায় পাঠ করিতে পারা যায় নাই) এবং একখানি সম্রাট ভানু গুপ্তের রাজ্যকালে, ২১৪ গুপ্তাব্দে, (৫৩৩—৫৩৪ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত হইয়াছিল। ভানুগুপ্তের যে কাল (২১৪ গুপ্তাব্দ বা ৫৩৩—৫৩৪ খৃষ্টাব্দে) দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক গণের মতে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজ্য কালের মধ্যে পড়ে। "বুধগুপ্ত" এই নাম গুপ্ত সম্রাড়্গণের সুপরিজ্ঞাত বংশাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় না ;—বংশাবলীতে স্কন্দগুপ্তের পুত্র পুরগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। এই পুরগুপ্তের নামই "বুধগুপ্ত" পঠিত হইয়াছে কি না,—অথবা বুধগুপ্ত পৃথক্ কোনও নরপতি ছিলেন, (যাঁহার নাম পূর্বে জানা যায় নাই), তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ। ভানুগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের নামান্তর কিনা, তাহাও বিবেচ্য। যাহাই হউক, এই ছয়খানি তাম্রশাসন হইতেই জানিতে পারা যাইতেছে যে, উত্তর বঙ্গ (প্রাচীন পুণ্ড্রদেশ) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুপ্ত

সাম্রাজ্যের শাসনাধীন হইয়াছিল। দামোদর পুরের পাঁচখানি শাসনেই "পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি" এবং তদধীন "কোটিবর্ষ বিষয়ের" উল্লেখ এবং কোটিবর্ষ বিষয়াধিষ্ঠানের (জেলার কাছারীর) মুদ্রা বা মোহর সংযুক্ত রহিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে আবিষ্কৃত চারিখানি পুরাতন তাম্রশাসন হইতেও অনুমিত হয় যে গুপ্তসাম্রাজ্যকালে তথায় ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুপ্ত-শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল (৩)।

গৌড়বঙ্গের ধার্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস শিক্ষার্থিগণের পক্ষে এই ১০খানি অতি প্রাচীন তাম্রশাসন অতিশয় মূল্যবান্। গৌড়বঙ্গের ধার্মিক এবং সামাজিক ইতিহাস আলোচনা-কালে আমরা পুনরায় এইগুলির কথা বলিব।

গুপ্তগণের মহারাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাঁহাদের বংশের রাজপুত্রগণ মালবে, মগধে, গৌড়ে এবং ওড়িশায় প্রথমে সামন্তস্বরূপে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরে তাঁহাদের দায়াদগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা পূর্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। ওড়িশায় কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতি কেশরী, মগধের আদিত্যসেন এবং গৌড়ের শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত এই তিন জনই গুপ্তরাজকুলের দায়াদ ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অবধারণ না করুন, অনুমান করিয়াছেন। এই তিন জনের মধ্যে যযাতি কেশরী হর্ষের অগ্রগামী, শশাঙ্ক সমসাময়িক এবং আদিত্য সেন তাঁহার পরগামী ছিলেন। হর্ষের সমসাময়িক কামরূপ-পতি কুমার ভাস্করবর্মা স্বতন্ত্র রাজকুলোৎপন্ন (ভগদত্ত বংশীয়) ছিলেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

(৩) এই শাসনগুলির প্রকৃত পাঠনির্ণয়ের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ, মহাশয়ের নিকট আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। সাহিত্য, ১৩২৩ ৫৮৬ পৃষ্ঠা এবং ১৩২৭, ৭৩—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গুপ্তগণের মহারাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরও মগধে নিম্নলিখিত গুপ্ত-রাজগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

১। শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত
|
২। শ্রীহর্ষ গুপ্ত
|
৩। শ্রীজীবিত গুপ্ত (প্রথম)
|
৪। শ্রীকুমার গুপ্ত (তৃতীয়)
|
৫। শ্রীদামোদর গুপ্ত
|
৬। শ্রীমহাসেন গুপ্ত
|
৭। শ্রীমাধব গুপ্ত (৬০৬ খৃষ্টাব্দে)।
|
৮। শ্রীআদিত্য সেন (৬৭২ খৃষ্টাব্দ)।
|
৯। শ্রীদেব গুপ্ত
|
১০। শ্রীবিষ্ণু গুপ্ত
|
১১। শ্রীজীবিত গুপ্ত (দ্বিতীয়)। (৪)

(৪) আফসদ, আসীরগড়—লিপি, দেববরুণার্ক-লিপি, হর্ষ-চরিত ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। আফসদ লিপি, আসীর গড় মুদ্রালিপি এবং দেববরুণার্কলিপি Corpus Inscriptionum, Vol. III. গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। সার ভিসেণ্ট স্মিথ এবং সি, ভি, বৈদ্যের ইতিহাসেও উল্লিখিত আছে।

এই তালিকার মধ্যে সপ্তম মাধবগুপ্ত হর্ষবর্ধনের, এবং তাঁহার পিতা মহাসেন গুপ্ত হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকর বর্ধনের, সমসাময়িক ছিলেন। মহাসেন গুপ্তের ভগিনী মহাসেনা গুপ্তা দেবী হর্ষের পিতামহী এবং প্রভাকরের জননী ছিলেন। উপরি লিখিত গুপ্ত রাজগণের রাজ্য মালবে ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু প্রমাণ অভাবে আমরা তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

কন্নৌজের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ স্বপ্রণীত "গৌড়বহো"-(গৌড়বধ)-কাব্যে কন্নৌজের রাজা যশোবর্মদেব কর্তৃক এক গৌড়রাজের পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সকল পণ্ডিত ঐ কাব্যকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে উল্লিখিত তালিকার নবমরাজা শ্রীদেবগুপ্তই ঐ পরাস্ত এবং নিহত গৌড়রাজ। আমরা "গৌড়বহো" কাব্যকে কাব্যমাত্র বলিয়া গ্রহণ করি, এবং কাব্যের বর্ণিত দিগ্বিজয় কাহিনীকে কবির কল্পনার লীলা-বিলাস ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না ;—সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গুপ্তসাম্রাজ্য বিনষ্ট হইবার পরে যে দ্বিতীয় গুপ্তবংশ (শ্রীকৃষ্ণগুপ্ত প্রমুখ) মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজধানী সম্ভবতঃ প্রথমে পাটলিপুত্রে, এবং পরে পাটলিপুত্রের অবনতি হইলে, তথা হইতে "বেহারে" স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই বংশের অষ্টম রাজা আদিত্য সেনের যে আফ্‌সদ-প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি নিজ পিতা মাধব গুপ্তকে "শ্রীহর্ষদেব নিজ-সঙ্গমবাঞ্ছয়া" ইত্যাদি বর্ণনাযুক্ত করায় মনে হয় যে এই মাধবগুপ্তই হর্ষচরিত-লিখিত শ্রীহর্ষের অনুচর মাধবগুপ্ত হইবেন। আদিত্য সেনের একখানি লিপিতে (৫) তাঁহার সময় ৬৬ হর্ষ সংবৎ (অথবা ৬৭২ খৃষ্টাব্দ) উল্লিখিত হইয়াছে।

এইস্থানে কাশ্মীরের ইতিহাসের সহিত আমাদের গৌড় ইতিহাসের একটু সম্বন্ধ আছে, কিন্তু, তাহার পূর্বে

বাণভট্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরের অবস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার ভাগীরথীর পশ্চিমতটস্থ "রাঙ্গামাটী" বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা অথবা পিতামহাদির কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। হর্ষের হস্তে তিনি পরাস্ত হইলেও নিহত হন নাই, এবং পরাস্ত হওয়ার পর তিনি কর্ণসুবর্ণ পরিত্যাগ করত দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়া থাকিবেন। হর্ষের মিত্র কামরূপরাজ কুমার ভাস্করবর্মা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হর্ষবর্ধনের অধীনতায় গৌড় শাসন করিয়া থাকিবেন; যেহেতু কর্ণসুবর্ণ জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসনের দ্বারা কুমার ভাস্করবর্মা কয়েকখানি গ্রাম কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। কোঙ্গদমণ্ডল (গঞ্জাম) হইতে একজন সামন্তরাজার প্রদত্ত (খৃঃ ৬১৯ অব্দে) একখানি শাসন হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, শশাঙ্কের রাজ্য তৎকালে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গালার শাকদ্বীপীয় গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণগণের কুলপ্রবাদানুসারে মহারাজ শশাঙ্কই কয়েকজন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে গৌড়ে আনাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত গৌড়দেশের স্বাধীন বা মিত্র রাজা ছিলেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শশাঙ্কের পর, সম্ভবতঃ গৌড়দেশ পুনরায় মগধের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল, এবং আদিত্য সেন মগধ হইতে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন এবং গৌড়ে পূর্ববৎ সামন্তরাজারা মগধেশ্বরের অধীনতায় রাজ্যশাসন করিতেন।

কাশ্মীরের দুর্লভবর্ধন-(কায়স্থ)-বংশীয় মহারাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য দিগ্বিজয় উপলক্ষে বহির্গত হইয়া প্রথমে কনৌজের যশোবর্মাকে পরাস্ত করত গৌড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গৌড়পতি দিগ্বিজয়ী কাশ্মীর-রাজের সহিত সন্ধি করত তাঁহাকে অনেকগুলি হস্তী উপঢৌকন দিয়া আত্মরক্ষা করেন। কাশ্মীররাজ এইরূপ মিত্রভাবক গৌড়রাজকে আমন্ত্রণ করত সঙ্গে করিয়া কাশ্মীরে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার স্থাপিত বিষ্ণু-বিগ্রহ পরিহাস-কেশবের মন্দিরে বিগ্রহকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যে তিনি অতিথি গৌড়পতির কোন হানি করিবেন না। অবশেষে কোনও কারণে কাশ্মীররাজ নিজ পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করত গৌড়-রাজের বধ সাধন করিয়া নিজ ধবল যশোরাশির পটে অক্ষালনীয় কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীকার কবি কহ্লণমিশ্র এই স্থানে কতকগুলি গৌড়ীয় প্রভুভক্ত বীরের অদ্ভুত রাজভক্তি এবং শৌর্যের পরিচয় দিয়াছেন। কাপুরুষ বলিয়া কথিত গৌড়বাসীর পক্ষে বিদেশী কবির প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রের মূল্য অল্প নহে। কাশ্মীরের রাজকবি কহ্লণ বলিয়াছেন,—"ক্রমশঃ গৌড়রাজের নিধনবার্তা স্বদেশে পৌঁছিলে কতকগুলি রাজভক্ত গৌড়ীয় বীর রাজহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। 'সারদাদেবীর দর্শনার্থী যাত্রী' এই পরিচয় প্রদানের দ্বারা তাঁহারা কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ পূর্বক একেবারে পরিহাসপুরে উপস্থিত হইলেন। রাজা ললিতাদিত্য রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন না,—তিনি দিগ্‌বিজয়ের জন্য উত্তরাপথে যাত্রা করিয়াছিলেন; তাই রক্ষা পাইলেন। পরিহাস-কেশব তাঁহারা সম্মুখে কৃত শপথ রক্ষা করিতে অপারগ হওয়ায় প্রতিহিংসাপরায়ণ গৌড়ীয় বীরগণ তাঁহার মূর্তি ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিলেন, কিন্তু সম্মুখে রামস্বামীর মন্দিরদ্বার মুক্ত পাইয়া ভ্রমবশতঃ তাহাতেই প্রবেশ করিলেন এবং উন্মত্তের মত রামস্বামীর রজতমূর্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সেই রজত রেণুগুলিকে পথের ধূলার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন! রামস্বামীর বিগ্রহশূণ্য মন্দির আজিও গৌড়ীয় বীরগণের অচলা রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।" কাশ্মীরে প্রবাদ আছে যে স্বয়ং সীতাপতি রামচন্দ্র এই রামস্বামীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

এই নিহত গৌড়রাজ যে কে, তাহা এখনও অভ্রান্তভাবে নিরূপিত করা যায় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তিনি মগধের আদিত্যসেনের পুত্র দেবগুপ্ত। কহ্লনের মতে খৃঃ ৬৯৯ হইতে ৭৩৫ অব্দ পর্যন্ত ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের কাল। সময় লইয়া মিলাইলে (খৃষ্টীয় ৬৭২ খৃষ্টাব্দের) আদিত্যসেনের পুত্র দেবগুপ্ত অথবা তাঁহার পৌত্র বিষ্ণুগুপ্ত এই গৌড়রাজ হওয়া অসম্ভব নহে।

কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র মহারাজ জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের সহিত ও গৌড় রাজ্যের সম্বন্ধের কথা কহ্লণ কহিয়াছেন। সেই কাহিনী শুনিতে ঠিক কল্পনাময় কথাকাব্যের আখ্যানবস্তুর মত। উহা অনেকেই জানেন,—তবুও বাঙ্গালার কথা বলিয়া আমরাও কহিব। জয়াপীড় পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করত দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া সসৈন্যে প্রয়াগ পর্যন্ত আসিবার পর, সৈন্যদিগের দিগ্‌বিজয়ে বিরাগ দেখিয়া তিনি একাকীই পূর্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ক্রমশঃ গৌড়ের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধনে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে জয়ন্ত নামে এক ক্ষুদ্র

সামন্ত রাজা পুণ্ড্রবর্ধনে রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজধানীর কার্তিকেয়মন্দিরে অলোক-সামান্যা সুন্দরী কমনীয়মূর্তি নর্তকী কমলা নৃত্য করিতেছিলেন,—মহারাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে সেই নৃত্যদর্শন-কালে নর্তকীর সানুরাগদৃষ্টির অতিথি এবং কমলা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার আবাসে গেলেন। সেইখানে গিয়া শুনলেন যে, নগরবাসিজনগণ একটা সিংহের উপদ্রবে বড়ই বিব্রত হইয়াছে,—সন্ধ্যার পর কেহই একাকী নগরের পথে বাহির হইতে সাহস করে না। রাজা বৃদ্ধ, তাঁহার কর্মচারিগণও নিশ্চেষ্ট। জয়াপীড় এই কথা শুনিয়া একাকী রাত্রিতে পথে বাহির হইলেন এবং ছুরিকা দ্বারা সেই সিংহের সংহার করিলেন। সিংহকে তিনি যখন ছুরিকাঘাত করেন, তখন উহার ব্যাদিত বদনের ভিতর সশস্ত্রহস্তের কিয়দংশ প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার হস্তের রত্নবলয় সিংহের দ্রংষ্ট্রার ভিতর আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা রাজার লক্ষ্য হয় নাই। প্রভাতে নগরবাসিগণ সবিস্ময়ে দেখিল যে সিংহ মরিয়া পথে পড়িয়া আছে, আর তাহার মুখের ভিতর একগাছি রত্নবলয় আট্‌কাইয়া আছে। একজন সাহসী ব্যক্তি সেই রত্নবলয় গাছটি মৃত সিংহের মুখগহ্বর হইতে বাহির করিয়া লইয়া রাজসভায় গেল এবং সিংহবধ বৃত্তান্ত নিবেদন করত বলয় রাজাকে দান করিল। রাজা বলয় লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে উহাতে "জয়াপীড়" নাম অঙ্কিত আছে। এই ঘটনা হইতে রাজা জানিতে পারিলেন যে, দিগ্‌বিজয়ী কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে তাঁহার নগরে আসিয়াছেন; সুতরাং ভয়ে তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। রাজার আদেশে চরেরা তখনই ছদ্মবেশী সিংহহন্তার অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, কমলার গৃহেই সেই আগন্তুক বাস করিতেছেন। রাজা জয়ন্ত তখন সমারোহে রথ লইয়া স্বয়ং পাত্রমিত্র সহিত কমলার আবাসে আসিয়া অভ্যর্থনাসহকারে জয়াপীড়কে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং তথায় রাজ-কুমারী কল্যাণদেবীর সহিত জয়াপীড়ের বিবাহ হইল। জয়াপীড় নর্তকী কমলাকেও বিবাহ করিয়া তাহাকে ভোগিনী রাণীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবার পর মহারাজ জয়াপীড় বিস্তৃত গৌড়রাজ্যের আরও কয়েকজন সামন্তকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করত সদ্যোবিবাহিতা দুই রাণীকে লইয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কহ্লণের সময় পর্যন্ত গৌড়রাজকন্যা পট্টমহাদেবী কল্যাণদেবীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির রাজধানীতে বিদ্যমান্ ছিল। এই জয়াপীড় (জয়াদিত্য) সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিখ্যাত পণ্ডিতরাজ ক্ষীর স্বামীর আশ্রয়দাতা

এবং নিজেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদের মতে ইনি পাণিনীয় কাশিকাবৃত্তির গ্রন্থকার জয়াদিত্য। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে এই জয়ন্তই "আদিশূর" নামে কুলশাস্ত্রে পরিচিত হইয়াছেন। কহ্লণের মতে খৃঃ ৭৫১—৭৮২ অব্দ জয়াপীড়ের রাজত্বকাল। পুণ্ড্রবর্ধনপতি জয়ন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে, তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের মধ্য হইতে উহার শেষভাগ পর্যন্ত এই কালের মধ্যে রাজত্ব করিতেন বলিতে হয়; এবং তাহা হইলে দেববরুণার্কের সূর্য-মন্দির-সংস্কারক মগধের দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের পর (জীবিতগুপ্তের সময় ৭৩২ খৃষ্টাব্দ অনুমান করা যাইতে পারে) এই গৌড়পতি জয়ন্তের রাজ্যারম্ভের কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে এ কথা বলা উচিত যে, এক রাজ-তরঙ্গিণী ভিন্ন আর কোনও প্রমাণের দ্বারা জয়ন্তের কাহিনী সমর্থিত না হওয়ায় তাঁহাকে অবিসংবাদিতভাবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে বলিয়া বোধহয় না। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত কথাগ্রন্থ "শশাঙ্ক" অপেক্ষা "রাজতরঙ্গিণী"র ঐতিহাসিক মূল্য বড় অধিক বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে কিনা, তাহার বিচার এখনও হইয়াছে বলিয়া বোধহয় না।

যদি পুণ্ড্রবর্ধন-পতি জয়ন্তকে ঐতিহাসিক কোন গৌড়পতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই সম্ভবতঃ কামরূপরাজ হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কোশল ও কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন (৬); এবং তাঁহারই জীবনান্ত-কালে গৌড়বঙ্গে অরাজকতা নিবন্ধন "মাৎস্যন্যায়" প্রবর্তিত হওয়ায় দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ "দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, রণকুশল বপ্যটের পুত্র শ্রীগোপাল দেবকে" রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল দেব হইতেই গৌড়বঙ্গে পাল-সাম্রাজ্য প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায় পালবংশের নিম্নলিখিত রাজ-তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে (৭)।

(৬) এই ঘটনা নেপালের রাজা শিবদেবের পুত্র জয়দেবের শাসনে (খৃঃ ৭৬৯ অব্দের) উল্লিখিত হইয়াছে। এই জয়দেব হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৭) গৌড় লেখমালা,—গৌড় রাজমালা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

দয়িতবিষ্ণু
|
বপ্যট
|
১। গোপাল (খৃঃ ৭৮৫—৭৯০ মধ্যে রাজ্যপ্রাপ্তি ;) ভিসেণ্ট স্মিথের মতে ৭৫০ খৃঃ।
|
২। ধর্মপাল (৭৯০—৭৯৫ মধ্যে রাজ্যপ্রাপ্তি)
|
৩। দেবপাল
|
৪। বিগ্রহপাল (প্রথম)।
|
৫। নারায়ণপাল
|
৬। রাজ্যপাল
|
৭। গোপাল (দ্বিতীয়)
|
৮। বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়) (৯৬৬ খৃষ্টাব্দ)
|
৯। মহীপাল (প্রথম) (১০২৫ খৃষ্টাব্দ)
|
১০। নয়পাল
|
১১। বিগ্রহপাল (তৃতীয়)

মহীপাল (দ্বিতীয়) ১৩। শূরপাল ১৪। রামপাল (১০৬০ খৃষ্টাব্দ)

১৫। কুমারপাল ১৭। মদনপাল

[illegible] (তৃতীয়)

[illegible]
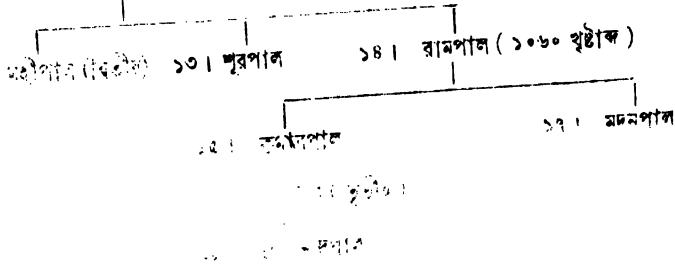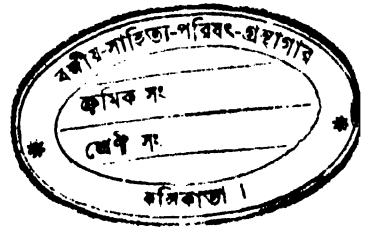
রাজনৈতিক হিসাবে পালবংশীয় ধর্মপালদেবের সময়ে গৌড়বঙ্গের গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন গগনে সমুজ্জ্বল দীপ্তিদান করিতেছিলেন। এরূপ সুদিন বাঙ্গালীর জীবনে ঐতিহাসিক কালে আর আসে নাই। যে বরেন্দ্র অথবা পুণ্ড্রদেশে একদিন পৌণ্ড্রক বাসুদেব দ্বারকাধীশ যদুপতি বাসুদেবের স্পর্দ্ধা করত আটবিক প্রদেশের মিত্ররাজ প্রসিদ্ধ একলব্যের সহিত একযোগে জলপথে এবং স্থলপথে অগণ্য সৈন্য লইয়া দ্বারকানগর অবরোধ করিয়াছিলেন (৮), সেই বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রদেশের রাজা ধর্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষ পাদে আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমোত্তর স্থিত গান্ধার-কম্বোজ-দরদাদি দেশ জয় করত কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় এবং বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের ঋণ পরিশোধ এবং কন্নৌজের যশোবর্ম্মার দায়াদ ইন্দ্রায়ুধের দর্পচূর্ণ করত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিরাজ পদ প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালীর মুখ প্রকৃতই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের যাবতীয় নরপতির সাধুবাদ লাভ করত মহারাজ ধর্মপাল অতুলনীয় রাজশ্রীবিমণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং বলিরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিবার পর বামনদেবের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যেমন ত্রৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ অপরূপ বলী ধর্মপাল কন্নৌজের ইন্দ্ররাজকে পরাস্ত করিবার পর, প্রার্থনাও প্রণাম-পরায়ণ নতকায় (বামনের মত) চক্রায়ুধকে আবার সেই কন্নৌজরাজ্য (ইন্দ্ররাজের মহোদয়শ্রী—অর্থাৎ কন্নৌজ রাজ্যলক্ষ্মী) প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন (৯)।

কিন্তু, "চিরদিন সমান না যায়।" এই পালরাজবংশের অষ্টমরাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে এক কীর্তিমান্ কাম্বোজবংশজ নরপতির পরাক্রমে বরেন্দ্রভূমিতে পালরাজলক্ষ্মী কিছুদিনের জন্য পরহস্তগত হইয়াছিলেন। বাণগড় শিবমন্দিরের স্তম্ভলিপি (যে স্তম্ভটি সম্প্রতি দিনাজপুরের মহারাজার প্রাসাদের উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত আছে) হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই কম্বোজবংশাবতংস নরপতি ৮৮৮ অব্দে (খৃঃ ৯৬৬ অব্দে?) বাণগড়ে বা প্রাচীন কোটিবর্ষ

(৮) হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব, ৯১ হইতে ১০২ তম অধ্যায়ে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(৯) ধর্মপালদেবের খালিমপুর লিপি এবং নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপি। খালিমপুর-লিপির ১২শ শ্লোক এবং ভাগলপুর-লিপির তৃতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য। গৌড়-লেখমালার ১১—১২ পৃষ্ঠা এবং ৫৬—৬২ পৃষ্ঠায় এই লিপির পরিচয় আছে।

বিষয়ে উক্ত শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, এই শৈব কম্বোজবংশজ নৃপতিকে কুলশাস্ত্রের "আদিশূর" বলা যাইতে পারে (১০)। যাহাই হউক, কম্বোজবংশের প্রাধান্য অধিককাল কোটিবর্ষে টিকিতে পারে নাই ; যেহেতু, তৎপরেই প্রথম মহীপালদেবের শাসন-লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি "অনধিকৃতবিলুপ্ত" পৈতৃক রাজশ্রী পুনরুদ্ধার করত উক্ত কোটিবর্ষ বিষয়ের একটি গ্রাম একজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন (১১)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে শেষ ভাগ পর্যন্ত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যে, জেজাকভুক্তি বা বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম এবং তাঁহার পুত্র ধঙ্গদেব গৌড়, রাঢ় এবং অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন (১২)।

প্রথম মহীপালদেব "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" কবল হইতে বরেন্দ্রদেশকে মুক্ত করিলেও তাঁহার গ্রহবৈগুণ্য দূর হয় নাই। কর্ণাট হইতে পরকেশরীবর্মা রাজেন্দ্র চোড় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, গৌড়েশ্বর মহীপালদেব বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ের রণশূর এবং দণ্ডভুক্তির ধর্মপালাদি মিত্ররাজসহ শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল, তাহা ভগবানই জানেন। রাজেন্দ্রচোড় তাঁহার জয়লিপিতে (১৩) যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে বলিতে হয়, "কর্ণভূষণ, চর্মপাদুকা এবং বলয়-বিভূষিত মহীপালদেব পলায়িত হইয়াছিলেন।" এই ঘটনা ১০২৩ অথবা ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

(১০) এই "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"র নাম এই লিপিতে নাই,—সময় সংকেতে "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" আছে, তাহা হইতে ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ ৮৮৮(কুঞ্জর=হস্তী ৮ এবং ঘটা= বহুবচন ৩=৮৮৮) পড়িয়াছিলেন। ইহাকে শকাব্দের অঙ্ক ধরিলে ৯৬৬ খৃষ্টাব্দ হয়। কুলশাস্ত্রকার ধ্রুবানন্দমিশ্র আদিশূরকে "দরদদেশাগত অম্বষ্ঠ-ক্ষত্রিয়" বলিয়াছেন। দরদদেশ (Dardistan) তিব্বতের সন্নিহিত কম্বোজ-দেশের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত।

(১১) প্রথম মহীপালদেবের বাণগড় লিপি,—গৌড় লেখমালায় ৯২-৯৮ পৃষ্ঠা।

(১২) যশোবর্ম এবং ধঙ্গদেবের খজরাহো মন্দির-লিপি (৯৫৪ এবং ১০০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত) বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসের প্রাচীন লেখমালা, দ্বিতীয়ভাগ। ৯৪—১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) রাজেন্দ্রচোড়ের তিরুমলগিরিলিপি। Epigraphica Indica, Vol. IX. pp 232—233 ইত্যাদি।

এই সময় (খৃ: ১০২৫ অব্দের কাছাকাছি) বঙ্গালদেশ বা পূর্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজা ছিলেন ; এবং যদি রাজেন্দ্রচোড়ের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তিনিও কর্ণাটবীরের সম্মুখ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই পলায়িত গোবিন্দচন্দ্র গানের বৈরাগী রাজা (ময়নামতীর পুত্র) গোবিচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহাই হউক, এই সময়ের পরেই পূর্ববঙ্গে যদুবংশীয় বর্মগণের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। বজ্রবর্মা, জাতবর্মা, শ্যামলবর্মা, ভোজবর্মা এবং হরিবর্মা এই কয়েকজন বর্মবংশীয় রাজার নাম সমসাময়িক দলীল (তাম্রশাসন) হইতে জানিতে পারা গিয়াছে এই সময়ের মধ্যেই ডাহলের (জব্বলপুরের) চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেব (অনুমান ৯৮০ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) প্রাচ্যদেশ বিজয় করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণদেব পিতৃপদানুসরণ করত গৌড় এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু উভয়স্থলেই পরাস্ত হইয়া গৌড়রাজ তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের হস্তে যৌবনশ্রী এবং বঙ্গরাজ জাতবর্মার করে বীরশ্রী নাম্নী কন্যাদ্বয়কে প্রদান করত সন্ধি করেন (১৪)।

এই তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের মৃত্যুর পরে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তগণ দলপতি দিব্যোক, রুদোক এবং দিব্যোক-পুত্র ভীমের নেতৃত্বে বিষম বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করে এবং পালবংশীয় ত্রয়োদশ রাজা শূরপাল এই বহ্নিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন এবং দেশ কৈবর্ত নায়কগণের হস্তগত হয়। শূরপালের কনিষ্ঠ বিখ্যাত রামপাল গৌড়মণ্ডলের সামন্তমণ্ডলীকে একত্র করত বহুকষ্টে কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন এবং গৌড়দেশে পালরাজত্বের সম্মান রক্ষা করেন (১৫)। বারেন্দ্র-কায়স্থ-কুল-তিলক কলিকালবাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দী (মহাসান্ধিবিগ্রহিক শ্রীকর নন্দীর পুত্র) অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ

(১৪) রামচরিতম্ ১ম সর্গের নবম শ্লোকের টীকা, ভোজবর্মার তাম্রশাসন, সাহিত্য ১৩১৯, ৩২৮ পৃষ্ঠা। আলবেরুণী (১০৩০ খৃ:) নিজের India গ্রন্থে গাঙ্গেয়দেবকে নিজের সমসাময়িক বলিয়াছেন।

(১৫) রামচরিতম্ ; ২য় সর্গের ৭ম শ্লোকের টীকা। এই টীকা স্বয়ং কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর কৃত।

সার্থক মহাকাব্য "রামচরিতম্‌" লিখিয়া স্বয়ং অমরত্ব লাভ এবং গৌড়বঙ্গের রাজনাকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। পালবংশের রাজত্ব পূর্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে মগধ, মিথিলা এবং বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু, রামপালের পরে এই বংশ শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয় এবং কয়েক বৎসর মধ্যেই নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে। রামপালের পুত্র পঞ্চদশ রাজা কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব বিদ্রোহী কামরূপপতিকে দমন করিতে গিয়া নিজেই তথাকার স্বাধীন রাজা হইয়া উঠেন এবং সপ্তদশ রাজা মদনপালের কিংবা অষ্টাদশ রাজা গোবিন্দপালের সময়েই সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন বরেন্দ্রের রাজসিংহাসন অধিকার করেন এবং পালরাজ মগধে গিয়া কোন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করেন। দ্বাদশ শতাব্দের শেষে বখতিয়ার খালজীর পুত্র মহম্মদ "বেহার" অধিকার করেন এবং তাহার পরই বাঙ্গালার এই পালরাজবংশের শেষ হইয়া যায়।

দক্ষিণাপথ হইতে আগত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সেনবংশের পূর্বপুরুষগণ বহুকাল হইতে রাঢ়দেশের পবিত্র গঙ্গাকূলে গৌড়েশ্বরের সামন্ত নৃপতি স্বরূপে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের বংশের বীরসেনের প্রপৌত্র, সামন্তসেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেন ও যশোদেবীর পুত্র বিখ্যাত বিজয়সেন সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের অন্তিমভাগে অথবা দ্বাদশ শতাব্দের উষাকালে বরেন্দ্রের বিজয়নগরে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র শস্ত্রে শাস্ত্রে সমান প্রবীণ মহারাজ বল্লালসেন দেব। বল্লালসেন দেবের জননী প্রাচীনতর শূররাজবংশের দুহিতা ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট লক্ষ্মণসেন দেব। লক্ষ্মণসেন দেব যৌবনকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক উত্তর-পশ্চিমে বারাণসী হইতে দক্ষিণে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে আপন প্রভাব বিস্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তীরভুক্তি বা তীরহুত (বর্তমান মজঃফরপুর বিভাগ) প্রদেশে আজিও বাঙ্গালাদেশের অক্ষর-লিপি এবং লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত থাকিয়া তথায় বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের উদ্দিষ্ট কাল (অর্থাৎ ৯৯৯ শকাব্দ অথবা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) যদিও পাল সাম্রাজ্যের সহিত শেষ হইয়া গিয়াছে,—অর্থাৎ বঙ্গমণ্ডলে কন্নৌজীয়া ব্রাহ্মণগণের আগমনের প্রবাদাগত কাল ১০৭৭ খৃষ্টাব্দের সহিত শেষ হইয়াছে;—তথাপি, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন সেনবংশের রাজত্বের উল্লেখ না করিয়া স্বাধীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক কাহিনী সমাপ্ত করা অসম্ভব। সেই জন্যই অতি সংক্ষেপে সেন রাজগণের কথার সহিত আমাদের প্রস্তাবের এই অংশ সমাপ্ত করিলাম। আগামী বারে ঐ সময়ের, অর্থাৎ

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দের শেষার্ধ পর্যন্ত সময়ের,—গৌড়বঙ্গের ধার্মিক, সামাজিক এবং রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ইতিবৃত্তের যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রস্তাব শেষ করিব (১৬)।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

যৌবনের ব্যথা।

-:*:-

হে প্রিয় আমার
লহ মম যৌবনের নব নমস্কার!
পিয়াসী অন্তর মোর প্রাণ ভরি' চায়,
কাহারে পাইতে বুকে কে বুঝিবে হায়!
অসীম বেদনা তবু ভাষা নাই তার;
দিকে দিকে জেগে রয় চির হাহাকার!

(১৬) সেন বংশের ঐতিহাসিক উপাদান কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায়। এখনও কোন সুযোগ্য ঐতিহাসিক সকল উপাদান একত্র করিয়া সেনবংশের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বরেন্দ্র-সমিতি তাঁহাদের আরব্ধ-কার্য সুসম্পন্ন করিলেই আমরা পরিতুষ্ট হইব।

দখিনের বায়—

ফুলের সুরভি, কিগো অমনি বিলায়;

কোন আশা নাই তার, ব্যথা নাহি বাজে,

ফুল যবে ঝরে পড়ে বিমলিন সাঁঝে!

যেদিন ফোটেনি ফুল, ছিলনা সুরভি,

ব্যথায় বাজেনি প্রাণে করুণ পূরবী;

সেদিন আমারি লাগি আকুল তৃষায়—

কত বার বার এসে, ফিরে গেছ হায়!

আজ শুধু মনে হয়—একি তব খেলা,

পথের মাঝারে ডাকি এত অবহেলা!

তাই অনিবার,

পুষ্পিত যৌবন মোর করে হাহাকার!

শ্রীসরোজকুমার সেন।

অনন্তলাল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তলাল বন মধ্যে দৌহিত্রের রোগ সম্বাদ শ্রবণ করিয়াই ভাবিয়াছিলেন যে তিনি এতদিন যে দেবীর মন্ত্র বহন করিলেন তাঁহার উপাসনা পরিত্যাগ করাতেই বোধহয় এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বিল্বপত্র সহ সে মন্ত্র কখনই গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করা হইবে না। এ কথা মনে মনে রাখিলেন, স্বামীজী অথবা অন্য কাহাকেও বলিলেন না।

স্বামীজী বিশালাবন হইতে অনন্তলালের সহিত রতনপুর আগমন করিয়াছিলেন। তথায় দুই চারিদিন অবস্থিতি করিয়া চিন্তামণি একটু সুস্থ হইলে, অনন্তলালের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, কাশীধামে রওনা হইলেন।

বিশালাবন মধ্যে অনন্তলাল যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কতকগুলি মহাজন বিরক্ত হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং অবশিষ্ট কতকগুলি তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নির্ব্বিঘ্নে সুদ পাইবার আশায় অনেক কুসীদজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর গৃহস্থ তাঁহার নিকট অর্থ রাখিয়াছিল; তাহারাও এইবার পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তলাল নিজেও বিনা লেখাপড়ায় বা কিছু বন্ধক না রাখিয়া, অনেককে অনেক টাকা ঋণ দিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও কিছুই আদায় হইল না। কেহ বলিল অনন্তলালবাবু তাহাকে টাকা দান করিয়াছিলেন, ঋণ নহে; কেহ বলিল এখন তাহার ঋণ পরিশোধের অবস্থা নহে; ইহার পর সে উহা পরিশোধ করিবে।

চতুর্ভুজ বাবুকে অনন্তলাল পাটের ব্যবসায় করিতে যে অর্থ প্রদান করিয়াছিন, সে সমস্তই নষ্ট হইল। টাকা হস্তগত করিয়া চতুর্ভুজবাবু রতনপুর যাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ পত্র ও লোক প্রেরণে কোন ফল হইল না দেখিয়া অনন্তলাল স্বয়ং একদিন তাঁহার আফিসে গমন করিলেন। তথায় চতুর্ভুজ বাবু তাঁহাকে খাতাপত্র দেখাইয়া বুঝাইল যে ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ লোকসান হইয়া গিয়াছে। পুনরায় অর্থ ব্যয় করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ না করিতে পারিলে আর আশা নাই।

যে ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইতেছে সে সম্মুখে একগাছি তৃণ পাইলেও তাহা অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে; অনন্তলালও এই অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময়ে সম্প্রতি গৃহে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইল দেখিয়া, অনেকে তাঁহার বাটীর ও তৎসঙ্গে আর্থিক মঙ্গল উদ্দেশ্যে একটি শান্তি করাইবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিল। তিনিও ঐ কার্য্যের আয়োজনে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, এই কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করাইবার জন্য, তাঁহার গুরুদেব বিশালাবন হইতে দ্বাপরযুগের শুকদেব গোস্বামীকে অর্থাৎ সুন্দরলালকে

পাঠাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে আনিবার জন্য রতনপুর হইতে হরিশ সাহা প্রেরিত হইল।

** ** ** **

অদ্য কলিকাতা হইতে মেডিকেল কলেজের ছাত্র আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত যামিনীকুমার ব্রজেন্দ্রকে দেখিবার জন্য রতনপুর আসিয়াছে। ব্রজেন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়া সে অনন্তলাল বাবুর মজলিসে বসিয়া আছে এবং ব্রজেন্দ্রের ব্যারাম অনেকটা সারিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতেছে. গৃহমধ্যে বিপিনবাবু ও আরও দুই তিন জন ভদ্রলোক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে হরিশ সাহা সুন্দরলালকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সুন্দরলালকে দেখিবামাত্র অনন্তলাল দণ্ডায়মান হইয়া, "আসুন, আসুন" বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার বসিবার জন্য একটি পৃথক আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সুন্দরলাল যাইয়া তথায় উপবেশন করিলে, অনন্তলাল প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

নিজ আসন উপবেশন পূর্ব্বক সুন্দরলাল সহাস্য বদনে একবার গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হঠাৎ যামিনীকুমারের চক্ষে চক্ষু পড়িবামাত্র তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি অকস্মাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, অনন্তলালকে বলিলেন,—"ভিতরে আমার গরম বোধ হচ্চে। চলুন দুজনে বাইরে গিয়ে বসি গে।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"বাইরে বসবেন? তবে তাই চলুন।"

এই বলিয়া তিনি সুন্দরলালের আসন বাহিরে বারাণ্ডায় বিছাইয়া দিতে একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন। এই ভৃত্যটি অল্পদিন হইল নিযুক্ত হইয়াছিল। আসন উঠাইয়া, বাহিরে লইয়া যাইবার সময়ে তাহার চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হইতেছে দেখিয়া অনন্তলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কাঁদচিস্ কেন রে?"

সে যোড়হাত করিয়া বলিল,—"হুজুর, উনি আমার বড় দিদি। আজ প্রায় দশ বছর হলো বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে এসেচেন।"

অনন্তলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তোর বড় দিদি?"

"আজ্ঞে, উনি"—বলিয়া ভৃত্য দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা সুন্দরলালকে দেখাইয়া দিল।

সুন্দরলাল ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "বাবু আপনি কি আমাকে অপমান করতে এনেচেন ?"

অনন্তলাল ক্রোধ বিস্ফারিত লোচনে ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "শুয়ার! বদমাইশ! তুই কি ঠাট্টা পেয়েছিস? কে আছিস রে?"

যামিনীকুমার এতক্ষণ ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতেছিল, এক্ষণে বাহিরে যাইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আজ্ঞে, নদে জেলা বল্লভপাড়া গ্রামে।"

যামিনী বলিল, "তোমার কিছু ভয় নাই, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল। তোমরা কি জাত?"

"আজ্ঞে, আমরা কলু।"

"এখানে কি কর?"

"আজ্ঞে অল্পদিন হ'ল এখানে এসে বাবুর বাড়ী চাকরী কর্‌চি।"

যামিনীকুমার তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, অনন্তলালকে বলিল, "একে কেন ধম্‌কাচ্ছেন? এর কথা মিথ্যা নয়।"

পরে সুন্দরলালকে বলিল, "কি বামুনঠাক্‌রুণ, আমাকে চিন্‌তে পার? অত জারিজুরি কর্‌চ কেন? এখানে আমি আছি দেখনি?"

ভিতরে যে কয়জন লোক বসিয়াছিল, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তাহারা সকলেই ইতিমধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

অনন্তলাল বিস্ময়াবিষ্ট লোচনে একবার সুন্দরলালের দিকে এবং একবার যামিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বিপিনবাবু যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যামিনীবাবু ব্যাপারটা কি বলুন দিকি?"

যামিনী বলিল, "এ পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক; জাতিতে কলু। এর বাড়ী নদে জেলা, বল্লভপাড়া গ্রামে। এক বৎসর পূর্ব্বে, বামুন ঠাক্‌রুণ সেজে, আমাদের মেসে ভাত রাঁধতো। তারপর এক দিন বল্লভপাড়া নিবাসী এক গোস্বামী আমাদের মেসে যাওয়াতে, এ তখুনি সেখান থেকে পালালো। ব্রজেন্দ্রও সেইদিন আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আমাদের মেসে গিয়েছিল; আর, তখন

সেখানে উপস্থিত ছিল। একে আমরা মারবো বা পুলিশে দেবো ভেবে গোস্বামীঠাকুর তখন এর কথা কিছুই আমাদের বলেন নি। তার কিছুদিন পরে, তিনি আবার একদিন আমাদের মেসে বেড়াতে এলেন। তখন তাঁর মুখে জানতে পারলাম, ও ব্রাহ্মণী নয়, কলুনী। এর জন্যে মেসের সকলকে মাথা নাড়া করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েচে। বোধ হচ্চে আপনাদেরও মাথা নাড়া করতে হবে।"

যামিনীর বাক্যাবসানে সকলে সুন্দরলালের দিকে চাহিল। কিন্তু কোথায় সুন্দরলাল? সে ইতিমধ্যে তথা হইতে অপসৃত হইয়াছিল। তখন অনন্তলাল সেই ভৃত্যটির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। একজন দ্বারবান আসিয়া বলিল, "হুজুর যো ব্রহ্মচারী আবি আ'য়া রহা, উন্‌কা সাং ও নকরটোভি মোকান্ সে ভাগা হ্যায়।"

অনন্তলাল মাথায় হাত দিয়া, অধোবদনে বসিয়া পড়িলেন।

হরিশ সাহা বলিল, "যা হবার তা হয়েচে, এখন সব চুপ্ করুন। এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে।"

তাহার কথায় বিপিনবাবুর বড় রাগ হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি যেন চুপ করলে,—তুমি যদি এই কলুনীর হাতে খেয়ে থাক, তাতে তোমার এমন কিছু দোষ হবে না। কিন্তু আমাদের বাবু যে ব্রাহ্মণ, কুলিনের ছেলে। ইনি কি প্রায়শ্চিত্ত না করে থাকতে পারেন?"

যামিনী বলিল,—"তা ত হবে এখন এরা গেল কোথা? এখান থেকে যদি পালাতে পায়, তা হলে আরও অনেক ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করবে।"

উপস্থিত একজন বলিল,—বোধহয় তারা রেলওয়ে ষ্টেসনে গিয়েচে। একটু পরেই কলকাতা যাবার ট্রেন পাবে। একবার কলকাতায় যেতে পারলে, আর শিগ্‌গির তাদের ধরে কে?"

তখন যামিনী অনন্তলালকে বলিল,—"আপনি আমাকে একজন দ্বারবান দেন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি ষ্টেসনে যাব। আর আপনিও এই গ্রামে স্থানে স্থানে লোক পাঠিয়ে সন্ধান করুন, যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে ত বার হবে।"

পরে সে একজন দ্বারবান লইয়া, ঘরের কম্পাস গাড়ীতে ষ্টেসন যাত্রা করিল। অনন্তলালও রতনপুরের স্থানে স্থানে শুকদেব গোস্বামীর, ওরফে কলুনীর অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন।

যামিনী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া, গাড়ী হইতে দেখিতে পাইল, যে স্থানে টিকিট বিক্রয় হয় সেই জানালার নিকট সুন্দরলাল বা তাহাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী এবং তাহার পশ্চাতে তাহার ভ্রাতা দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে দ্বারাবানের সাহায্যে উভয়কে ধৃত করিয়া, গাড়ীতে চাপাইয়া রতনপুর পুলিশ আউট্ পোষ্ট অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দারোগার নিকট উপস্থিত হইল। দারোগাবাবু তাঁহার গৃহমধ্যে চেয়ারে বসিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একখানি বড় খাতায় কি লিখিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে অন্য একখানি কেদারায় আর একজন বসিয়াছিলেন। এ ব্যক্তিরও পরিধানে পুলিশের পোষাক। টেবিলের নিকট একজন এবং দ্বারদেশে একজন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া ছিল।

আগন্তুকেরা যাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, সকলে তাহাদিগের মুখের দিকে চাইতে লাগিল। তখন যামিনী সংক্ষেপে সুন্দরলালের গুণগ্রাম ও পরিচয় বিবৃত করিল। দারোগাবাবুর পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকটি এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে যামিনীর কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তাহার বাক্যাবসানে তিনি কেদারা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিশালাবনের আথ্ড়া থেকে এসেচে, সে লোকটি কে?"

যামিনী দেখাইয়া দিবামাত্র তিনি পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিয়া সুন্দরলালের হাতে লাগাইয়া দিলেন এবং ছোট একখানি নোটবুকে যামিনীর নাম, ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন। পরে দারোগাকে বলিলেন,—"আমি তো আপনার আফিসে বসেই আসামি পেয়ে গেলাম। এইবার চন্দ্রহাট চললাম। আসামি নিয়ে যত শীঘ্র পঁহুছিতে পারি ততই ভাল।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, কোন পুলিশে থাকেন?"

"আমি চন্দ্রহাট গ্রামের পুলিশের দারোগা। চন্দ্রহাটের নিকটবর্ত্তী বিশালাবনের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম সকলে অনেক দিন হতে অনেকগুলি ডাকাতি হয়েচে। কিন্তু তার কোনটিরই ভাল কিনারা হয় নি। গত এক বৎসরের মধ্যে আবার দুবার ডাকাতি হয়। কিছু দিন হল গভর্ণমেণ্ট থেকে কয়েকজন গোয়েন্দা সে দেশে পাঠান হয়ে ছিল। তিনি বহু পরিশ্রমে কতক কিনারা করেচে। আজ প্রাতে বিশালাবনের ভিতর বাবাজীর আখ্ড়া ঘর খুঁড়ে ডাকাতির অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য বাহির হয়েচে। বাবাজী ও তাঁর চেলা সেই বৃদ্ধটি চালান গিয়েচে।

এই সুন্দরলাল সেখান থেকে রতনপুর এসেচে সম্বাদ পেয়ে, একে ধরবার জন্যে এখানে আমার আসা।”

সুন্দরলালের ভ্রাতাও ধৃত হইল। দুই পার্শ্বে দুইজন রক্ষীর মাঝে ভ্রাতা ও ভগিনী; শোভা পাইতে লাগিল! হায়! এঁরাই কলির দেবতা, সাধু—কয়জন তাহাদের মধ্যে এখন রাজসম্মান—উপযুক্ত পুরস্কার পায়!

ক্রমশঃ—

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

হাওয়ার প্রাসাদ

(গাথা)

অম্বরীশের কবল হ'তে—
মুক্তি পেয়ে মুক্তি সবে নাম্‌ল এসে গ্রামের পথে।
সাতটি বছর অজ্ঞাতবাস করে
ফির্‌ল মুক্তি আপন গৃহে অনেক দিনের পরে।
বক্ষে ছিল আশা
হয় ত দেশে শুন্‌তে পাবে সুখের নানান্ ভাষা।
কানের কাছে কল্‌কলিয়ে বল্‌ছে আশা ফির্‌ছ দেশের কোলে-
তুষ্‌বে কত প্রিয়জনে মিষ্টি-মধুর বোলে।
বুকের মাঝে উঁকি মেরে দুরাশা তায় কয়—
তাও কি কখন হয়

চল্‌ছে যখন আশঙ্কা আর আশার দ্বন্দ্ব মনের আশেপাশে
দেখ্‌ল দূরে গোবিন্দ রায় ঐ বুঝি ঐ আসে।
ঠক্‌ঠকিয়ে লাঠী ধরে আস্‌ছে ধীরে বুড়ো—
মুক্তি তারে বল্‌ল হেসে—"প্রণাম করি খুড়ো?"
পায়ের তলায় দেখ্‌লে সাপ যেমন করে লোকে—
ফিরে থাকে; তেম্‌নি করে ফির্‌ল বুড়ো জানিনেক' কোন কুহকের ঝোঁকে।
এদিক ও-দিক তাকিয়ে দেখ্‌ল—কোনওখানে নেইত কেহ আর
বল্‌ল তখন গোবিন্দ রায় মুখটি করে ভার—
"কোথা হতে আস্‌ছ তুমি মুক্তি—
এতদিনে বলো তোমার শেষ হোল কি চুক্তি?"
কাষ্ঠ হেসে মুক্তি কহে—"হোয়েছে মোর শেষ—
ফির্‌ছি বাড়ী অনেক দিনের পরে।" বল্‌লে গোবিন্—"বেশ বেশ তা' বেশ?"
কিন্তু চমৎকার!
গোবিনের সেই স্তব্ধ চরণ চপল হোল দাঁড়াল না আর।
পোষ্টাফিসে এসে—
দেখ্‌ল ইন্দু বসে আছে চেয়ারখান ঠেসে।
মুক্তিরে হায়! দেখে তাহার মুখ হোল আঁধার,
ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপ্‌ল চরণ, দুর্‌দুরিয়ে উঠল তাহার বুকের চারিধার।
জ্ঞানটি যখন আস্‌ল ফিরে প্রাণে
দেখ্‌ল মুক্তি চেয়ে কেমন রয়েছে তার পানে।
বল্‌লে শেষে পাংশু-মলিন মুখে
"মাঝ পথেতে কর্‌ছ এত বিলম্ব কোন্ দুখে?
যাওনা ফিরে ঘরে
কি কাজ তোমার গভর্‌মেণ্টের আফিসেরি পরে।"

এতক্ষণে বুঝ্‌লে মুক্তি আসল তাহার কথা
কোন খানে তার ব্যথা।
এত দুঃখেও অধর কোণে হাসি এল তার।
হল পোষ্টাফিসের বার।

সাঁঝের সময় মিলে সকল ভাই বোনে—
কর্‌ছিল সব গল্পগুজব বসে চিলের ছাদের কোণে।

এমন সময় এসে দেখা দিলেন খুড়ো তার
বল্‌লেন—"মুক্তি বলো তোমার একোন্ ব্যবহার?
এরা অবোধ, ছল-চপলের ধারে নাক' ধার
জানেনাক' মেলা-মেশার কোথায় কাহার কেমন অধিকার।
খেয়েছ ত আপন পরকাল
করিও না বেচারাদের নিজের যেমন তেম্‌নি ধারা হাল!

ফিরে তখন নিজের ছেলের পানে—
উঠ্‌লেন বলে পরুষ কণ্ঠে—"আজকালকারের কোন জনে না জানে?"
কুষ্টির ফলে যে হয় অন্তরীণ
থাকে না তার কোনওখানে ভদ্রলোকের চিন।
তার সাথেতে মিশ্‌লে পরে ভবে—
হয় নাকি ভয় কোন জনে কি কবে?

বিদায় হলেন তিনি,
মুক্তির মাথায় তরল রক্ত উঠ্‌ল করে 'রিণি-রিণি!'
বুঝ্‌ল তাহার বাড়ীতেও নেই স্থান—
অন্তরীণের কালে যখন জননী তার ত্যজিয়াছেন প্রাণ।
বাপ ত গেছেন অনেক দিনেই মারা—
কোথায় যাবে—কি করিবে ভেবেও পায় না সাড়া।
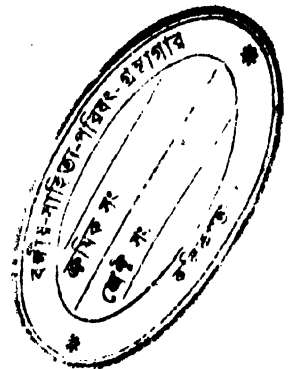
মুক্তি পাওয়ার আগে তাহার অন্তস্তলে হায়!
আশার বাসা বেঁধেছিল উড়্‌ল তা' হাওয়ায়!

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

ইষ্টারের ছুটীতে ফ্রান্স ও আল্‌প্‌সে।

(১৯২৫)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৯ই এপ্রেল মেজিভ ত্যাগ করে আমরা 'স্যামনি' (Chamonix)তে এলাম। কি রকম আশ্চর্য্য রকমের পাহাড়ের মধ্য দিয়া ইলেকট্রিক রেলে এখানে এসেছি, তার বর্ণনা আর দিব না; কারণ বর্ণনা করে সুন্দর জিনিসের পরিচয় দেওয়া শক্ত এবং আজকাল বঙ্কিমী আমলের মত বড় বড় বর্ণনা আর ফ্যাসান নয়।

স্যামনি মঁব্লাঁর পায়ের তলে ভ্যালিতে ছোট্ট একটি সহর, তিন হাজার ফিটের বেশি উঁচু। ভ্যালি খুব ছোট, মাইল তিনেক লম্বা ও আধ মাইল চওড়া। এক পাশে মঁব্লাঁ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ সমস্ত চিরতুষারমণ্ডিত পর্ব্বত শিখর খাড়া প্রাচীরের মত উঠে গিয়েছে; আর একদিকে ঐ রকম আর একদল পর্ব্বত শিখর। সূর্য্যের আলো ঘণ্টা দেড়েক পরে এই ভ্যালিতে প্রবেশ করে। স্যামনিতে পর্ব্বতের সমস্ত দৃশ্য একত্র দেখা যায়। চিরতুষারমণ্ডিত আল্পসের সর্ব্বোচ্চ শিখর, বিভীষিকাময়ী বরফের নদী (glacier), জলপ্রপাত এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য দৃশ্য স্যামনির খুব নিকটেই। স্যামনি থেকে মঁব্লাঁ আরোহণ করে। পার্বত্য দৃশ্য দেখতে হলে খুব পরিশ্রম করা দরকার হয়; কিন্তু এখানে অনেক উঁচুতে রেলে যাওয়া যায়। এই সব রেল সাধারণ রেলের মত নয়, দুইটি সাধারণ রেলের মধ্যে লোহার দাঁতওয়ালা আর এক রেল পাতা আছে; ইঞ্জিন এবং গাড়ী এই দাঁতের সঙ্গে আটকানো থাকে। আর এক রকম রেলে লোহার

দড়ীর দ্বারা গাড়ীকে উপরে টেনে তুলা হয়। আমরা যে সময় স্যামনিতে গিয়েছিলাম, সে সময় season (মস্‌রুম কাল) নয়, গ্রীষ্মে এখানে লোক আসে। সেই জন্য প্রায় সব হোটেল ও দোকান বন্ধ ছিল। এই সমস্ত পার্ব্বত্য রেলও বন্ধ, কারণ বরফে সমস্ত রেল ঢাকা। আমরা একটা হোটেলে স্থান পেয়েছিলাম, ইষ্টার উপলক্ষে কয়েকটা হোটেল খোলা হয়েছে।

আমাদের ইচ্ছা ছিল স্যামনি হয়ে সুইটজারল্যাণ্ড যাব, স্যামনি ফ্রান্স ও সুইস সীমান্তে; কিন্তু দেখি যে বরফের জন্য ও আভালান্সের (avalanche)এর উৎপাতে রেল বন্ধ। মনটা একটু খারাপ হল।

আমার অনেকদিন থেকেই পর্ব্বত আরোহণের একটা অদম্য ইচ্ছা ছিল। আমি পার্ব্বত্যদেশে ভ্রমণকাহিনী ও আল্পসের শিখরে আরোহণের বর্ণনা খুব আগ্রহ সহকারে পড়েছি। আমার এই বাতিক এত প্রবল ছিল যে আমি আল্পসের প্রায় প্রত্যেক শিখরেরই নাম এবং তাদের উচ্চতা জানি। গিরি আরোহণের কি যে বিপদ তা সামান্যরূপে উপলব্ধি করার সুযোগ আমার স্যামনিতে হয়েছিল। আমি তাই এখন বর্ণণা করব।

পার্ব্বত্য প্রদেশে এক অপরূপ দৃশ্য হচ্ছে গ্লেসিয়ার (Glacier), অর্থাৎ বরফের নদী। ইহাকে ঠিক নদী বলা চলে না; কারণ ইহা প্রায় গতিহীন; দিনে দুই তিন ইঞ্চির বেশি চলে না। চিরতুষারময় শিখর থেকে ইহা ঠিক একখানা জিহ্বার মত নীচুদেশে নেমে আসে। যদিও ইহার গতি নাম মাত্র কিন্তু উহা এত শক্তিশালী যে উহা চারিদিকের পাষাণ-প্রাকার চূর্ণ বিচূর্ণ করে নেমে আসে। এই উপায়ে প্রকৃতি পাহাড় ধ্বংস করে জীবের বাসোপযোগী মাটি প্রস্তুত করিতেছে। পৃথিবীর যখন বয়স অল্প ছিল তখন ইউরোপ এশিয়া বরফে ঢাকা ছিল; তখন এই সব গ্লেশিয়ারই পাহাড় ভেঙ্গে সমতল সৃষ্টি করেছে। এখন যেমন ডাইনোসোর (dinosaur) ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জীবের কঙ্কাল সেইকালে আমাদের মা-জননীর বিরাট পরিবারের পরিচয় দিতেছে, সেই রকম ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি গ্লেশিয়ার প্রভৃতি মা-জননীর কার্য্যশক্তির সাক্ষী রহিয়াছে। এখন আমাদের মাতা বৃদ্ধ হইতেছেন; কাজেই তাঁহার সন্তান সন্ততি, আমরা এত ক্ষুদ্র, এবং যৌবনের এই সব হাতিয়ার পত্র ক্রমে লোপ পাইতেছে।

স্যামনির কাছে অনেকগুলি গ্লেশিয়ার আছে ; তার মধ্যে "মার দি গ্লাস" (mer de glace) "বরফের সমুদ্র" সব চেয়ে বিখ্যাত। এটা দেখতে হলে স্যামনি থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক ফিট উঠতে হয়। গ্রীষ্মকালে একটা রেলে এই পথ উঠা যায় ; কিন্তু শীতকালে বরফের জন্য এই পথ বন্ধ। আমি ও বন্ধু একজন 'গাইড'সঙ্গে করে একদিন সকালে এইপথে যাত্রা করলাম। এই পথপ্রদর্শকদের পরীক্ষায় পাশ করতে হয়, এবং তাদের কাজ বিপজ্জনক এই জন্য পারিশ্রমিকও বেশি, আমাদের গাইড নাকি মঁব্লাঁতে ১২৫ বারের বেশি উঠেছে, এবং আল্পসের অন্য কোনও শিখরও এর বাদ নাই। গায়ের রঙ একবারে সূর্য্যপক্ক ; বরফের মধ্যে ঘুরলে এই রকম হয়।

হোটেল থেকে আমাদের মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য নানারকম খাদ্য দিয়েছিল। গাইড তা তার পিঠের ঝুলিতে নিয়ে নিল। প্রথম প্রায় মাইল দুই ভ্যালির মধ্যে সমতল পথে যাওয়া গেল। তারপর পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ হল। গাইড তার কোট ওয়েষ্টকোট খুলে ঝুলিতে পুরল এবং আমাদেরও তাই করতে বলল ; কারণ তা ছাড়া খুব গরম হবে ; এইসব জিনিষ ও আমার ক্যামেরা সে নিজে গ্রহণ করে আমাদের ভার লাঘব করতে চাইল ; কিন্তু আমরা তাকে কষ্ট দিতে রাজী হলাম না। সে তখন ঘারটা সম্মুখে ঝুঁকে মাথা নেড়ে চলা সুরু করল, যেন "কি সানন্দ গতিমন্দ মত্ত করিবর।" আমার বন্ধু পরে আমাকে বলেছিলেন যে ভয়ানক কঠিন পথেও 'গাইড' ঠিক এক গতিতেই চলেছে। তার হাতে একখানা লোহার লাঠি, যার মাথা ইংরাজি " T'র মত, মাথার একধার শাবলের মত ধারালো। আমরা দেখেছি যেখানে পথ খুব খাড়া, সে তার লাঠির মাথা পাহাড়ের গায়ে পুঁতে তাই ধরে উঠেছে।

আমরা পাহাড়ে উঠা আরম্ভ করলাম। পথ প্রথমত: পাইনবনের মধ্যে দিয়ে। শেষে পাইনের সীমা ছাড়িয়ে আরও উর্দ্ধে আরোহণ সুরু হল। ক্রমে পথ একটা খাতের পাশ দিয়া চলল। খাতটা প্রায় ৩০০।৪০০ ফিট গভীর ; তার মধ্যে এসে একটা গ্লেশিয়ার শেষ হয়েছে, এবং তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর পড়ে আছে। গ্রীষ্মকালে পদ্মানদীরপাড় যে রকম জল থেকে খাড়া হয়ে উঠে। আমরা যে পথে চলছিলাম সেটাও এই বরফ নদীর পাড় ; কিন্তু পথ এত কিনারায় এবং পাড় এত খাড়া যে নীচে তাকাতেই আমার মাথা ঘুরে আসছিল। কিছুদুর গিয়ে গাইড বলল যে আমাদের এই পাড়ের নীচে নামতে হবে এবং সম্মুখের গ্লেশিয়ার

পার হতে হবে। আমরা একটা কুটীরের কাছে বিশ্রাম করলাম, পাহাড়ের উপর এই রকম অনেক কুটীরই আছে, উঁচু পাহাড়ে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়; এই রকম আশ্রয় স্থল নিকটে না থাকলে প্রাণ বাঁচানো দুঃসাধ্য।

নীচে নামার যে পথ তার নাম হচ্ছে 'মভে পা' (Mauvais Pas) অর্থাৎ খারাপ পথ। এখানে পথ এত সরু যে পূর্ব্বে অনেকে এই স্থানে পা পিছলে নীচে পড়ে জীবন হারিয়েছে; সেই জন্য এই নাম। আজকাল পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে দিয়েছে; এবং হাতে ধরার জন্য পাহাড়ের গায়ে একটা রেলিং লাগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পথের ভীতি এখন আর নাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই পথের উপর একখানা নোটীশ দেওয়া হয়েছে যে এই পথের উপর আভালান্স (Avalanche) পড়ছে, সুতরাং এই পথ বিপজ্জনক। অতএব গাইড আমাদের আভালান্স বর্জ্জিত আর এক বিপথ দিয়ে নিয়ে চলল। এই পথ এত সরু যে কোন রকমে পা রাখা যায়; কিন্তু কিছু দূর এসে এ পথটুকুও নাই। প্রায় দেড় গজ যায়গা কোন রকমে পাহাড়ের উপর পা রেখে পার হলে তবে আবার পথ পাওয়া যাবে। পাহাড় এখানে এমন খাড়া এবং জলে ভিজে ভিজে এমন পিছিল হয়ে আছে যে খালি পায়ে পার হওয়াই মুস্কিল। আমাদের পার হতে হবে জুতো পায়ে; তা ছাড়া বহু নীচে এত বড় বড় পাথর পড়েছিল, তাদের মধ্যে পড়লে আমার কি দশা হবে এই ভেবেই দেহটা কাপুরুষের মত কাঁপা সুরু করে দিল। মনে আমার সাহসের অভাব মোটেই ছিল না; কিন্তু কিছুতেই অবাধ্য পা দুটো থামল না। আমি জানি অনেক বীরেরই এক রকম দুরবস্থা হয়েছে। সুলতান মামুদের সঙ্গে অনঙ্গপাল মহা বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু বেচারীর হাতী পলায়ন করেই তাঁর যুদ্ধ মাটি করেছিল। যাই হোক সম্মুখবর্ত্তী গাইড ও আমার বন্ধু পার হয়ে গেলেন। আমার পার হতে একটু দেরী দেখে গাইড আমাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হল। আমি একটু জিরিয়ে নিচ্ছি এই বলে সতেজে তার সহায়তা প্রত্যাখান করে ডান পা একহাত দূরে পাহাড়ের গায়ে রক্ষা করলাম। ইচ্ছা ছিল ঐ পায়ের উপর ভর দিয়ে এক লাফে বাকিটুকু পার হয়ে অন্য পা পথের উপর রক্ষা করব। আমি এই রকম দৈহিক ব্যায়ামে কোনদিনই বিশেষ পটু নই; পা গেল পিছলে এবং আমি গেলাম পড়ে; ভাগ্যে পাহাড়ের গায় পড়ে গেলাম; বিপরীত দিকে পড়লে হয়ত আজ এই সব লিখতে সুযোগ পেতাম না। গাইড ছিল কাছেই; সে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। নীচে নামা গেল। এইবার গ্লেশিয়ার পার হতে হবে।

আমাদের সম্মুখেই 'মার দি গ্লাস' গ্লেশিয়ার ;—মনে করুন একটা তরঙ্গক্ষুব্ধ নদী হঠাৎ জমে গিয়েছে ; তা হলে এর একটু ধারণা করতে পারবেন। চারিদিকের বরফ সাদা, কিন্তু গ্লেশিয়ারের বরফ সবুজ রঙের ; মধ্যে মধ্যে ফাটল থাকে, ইংরাজিতে বলে ক্রেভাস (Crevasse) দেখে মনে হয় যেন বিরাট অজগর হাঁ করে জিব বের করেছে। গাইড এইবার একখণ্ড দড়ি দিয়ে আমাদের দুইজনকে নিজের সঙ্গে বাঁধল। শীতকালে বরফ পড়ে অনেক ফাটলই লুকানো থাকে ; যদি ভুল করে পা দিয়ে তার মধ্যে পড়ে যাই তবে এই দড়ির সাহায্যে আমাদের টেনে উঠান যেতে পারে। বরফে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যেতে লাগল। এক যায়গায় এসে গাইড বলল সাবধান ; অমনি কাপুরুষ পা আবার কাঁপা সুরু করে দিল। ধন্য গাইডের চোখ ; আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না ; সে বরফ সরিয়ে আমাদের প্রকাণ্ড একটা ফাটল দেখিয়ে দিল। তার মধ্যে সে একটা পাথর ফেলে দিল। আমরা যতক্ষণ শুনতে পারছিলাম ততক্ষণ পাথর কেবল নীচেই পড়ছিল, তলায় পৌছানোর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। এই এক একটা ফাটল ৪০০।৫০০ গজের কম গভীর নয় ; সুতরাং তাতে পড়ে যাওয়ার ভয়ে পা দুটো যদি একটু কাঁপে তবে তাদের নেহাৎ ভীরু বলা যায় না। গ্লেশিয়ার পার হয়ে অন্য পাড় বয়ে উঠতে হবে। এটা খুব খাড়া ; শ পাঁচেক ফিট উঁচু ; তবে অন্য পাড়ের মত দুরারোহ নয়, কারণ এর গায়ে বরফ পড়ে আছে। কিন্তু উঠতে আমাদের ভয়ানক পরিশ্রম হয়েছিল ; কারণ এত খাড়া যে আমাদের দুইজনকে বিড়ালের মত চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছিল। ধন্য গাইড, সে একবার আছাড়ও পড়ল না বরং আমরা যখন পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়ছিলাম তখন দড়ি ধরে আমাদের টেনে তুলছিল। উপরে উঠে দেখি রেল এখানে এসে শেষ হয়েছে ; একটা হোটেলও আছে। কিন্তু শীতকালে সব বন্ধ।

আমরা এখন আট হাজার ফিট উপরে। আলেকজাণ্ডার তখনকার পরিচিত জগৎ জয় করে যে রকম গর্ব্ব অনুভব করেছিলেন, আমরাও এইখানে এসে তাই হল। এই আমার পর্ব্বতারোহণে প্রথম কঠিন অভিযান ; অনভ্যাস হেতু পা দুই একবার খারাপ ব্যবহার করেছে ; কিন্তু তবু এখানে এসেছি। এখন আমার কাছে মঁ ব্লাঁতে চড়া সহজ বলে মনে হল ; এমন কি মনে মনে শুধু মঁ ব্লাঁ নয় আমাদের দেশের গৌরীশঙ্কর কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি জয় করবার বাসনাও জেগে উঠল এবং এখন থেকে যেন সেই গৌরবের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম, কিন্তু সম্মুখেই

হোটেলের ছায়ায় আর একদলকে দেখে আমার গর্ব একটু কমল ; নিকটে গিয়ে দেখি দুইজন মহিলা আর একজন গাইড। আমার মন ভয়ানক দমে গেল, যখন কুসুম সুকুমার-অঙ্গ নারী এতদূর উঠেছেন তখন পুরুষোচিত যে বীর্য্য আমার আছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলাম, তাতে একটু দ্বিধা জন্মিল। গাইড আমার মলিন মুখ দেখে আমাকে ঝুলি থেকে খাবার বের করে দিল। আমি ঐ দলের গাইডের কাছে শুনলাম যে তারা আর একটা সহজ পথ দিয়ে এসেছে, বেশ বেশ ; মেয়ে মানুষ কেমন করে আমাদের পথের কষ্ট সহ্য করবে ? হয়ত: এই মহিলারা এই পাহাড়ের দেশের লোক, এবং আমাদের দেশে কোন মহিলা নিশ্চয়ই এই পাহাড়ে উঠতে পারবেন না, এই চিন্তা করে শিগ্‌গিরই আবার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

বরফের উপর বসে লাঞ্চ শেষ করলাম। আমাদের সঙ্গে একখানা প্রকাণ্ড রুটি ছিল ; আমরা সবটুকু শেষ করতে না পেরে বাকিটাকে বরফের উপর ফেলে দিলাম। আমাদের গাইড সযত্নে সেটুকু তুলে নিয়ে ঝুলিতে পুরল। আমার বন্ধু আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। আমি বল্লাম, "মশায়, এই রুটির জন্য বেচারী আমাদের সঙ্গে এই দুরারোহ পাহাড়ে উঠে এসেছে। তাই রুটিটুকু ওর কাছে অনেক দামী।"

আমরা ঘণ্টাখানেক সেখানে বিশ্রাম করলাম ও বসে বসে চারিদিকের সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলাম। আমার বন্ধুর এতদূর এসেও আরামের ধারণা ঠিক ভারতীয়ই আছে, তিনি আড়ালে যেয়ে একটা পাথরের উপর বসে বুট মোজা প্রভৃতি খুলে খালি পা হলেন। আমরা যেখানে এসেছি সেটা একটা পর্ব্বতরাজের খাস দরবারে ; চারিদিকে কেবল সব সেরা উঁচু শিখর ; গাইড প্রত্যেকটার নাম আমাদের বলছিল এবং সেই সাথে কতবার প্রত্যেকটাতে চড়েছে বলছিল, যেন তারা তার কাছে কত পরিচিত। আকাশ নির্ম্মল, চারদিক আলোতে ঝলমল করছিল। আমাদের পায়ের নিম্নে—ঠিক ৩০০।৪০০ ফিট নীচেই গ্লেশিয়ার 'মার দি গ্লাস' তার স্তব্ধ তরঙ্গ নিয়ে যেন শতশীর্ষ বাসুকির মত পড়েছিল। তার অন্য পাড় থেকে একটা পাহাড় ঠিক গির্জ্জার চূড়ার মত উঠে গিয়েছিল ; সে এত খাড়া যে তার মাথায় কোন বরফ নাই। সেই পাহাড়ে আমরা পর্ব্বতের মহিমময় আর এক দৃশ্য দেখলাম। সে হচ্ছে আভালান্স (avalanche) সময় সময় সূর্য্যের তাপে আলগা হওয়ার জন্য বড় বড় বরফের চাপ ধসে নীচে পড়ে ; একেই বলে আভালান্স। অনেক সময় ইহা বড় বড় পাথর সঙ্গে করে নামে ; কিছুদিন

পূর্ব্বে মঁব্লাঁর মাথার খানিক অংশ এই সঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছিল। গত বছর সুইটজারল্যাণ্ডে পাহাড়ের কোলে একটা গ্রাম আভালান্স পড়ে গ্রামের সমস্ত ঘর বাড়ী লোপ করেছে। আমরা একটা পাহাড় থেকে অনবরত এই আভালান্স পড়া দেখছিলাম; চারিদিকের অসহ্য মৌন এই বজ্রধ্বনিতে কেবল একটু ভাঙ্গ ছিল।

আমরা যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরতে হল, কারণ অন্য পথ আভালান্সের জন্য নিরাপদ নয়। আমাদের পেছনে সেই মেয়ের দল আসছে দেখে মন আবার একটু খারাপ হল। কিন্তু তারা আমাদের এত পেছনে পড়ে গেল এবং বরফের উপর পিছলে পড়ার জন্য কাপুরুষের (কা-নারীর?) মত এতই সভয়ে চীৎকার করছিল যে তাদের কথা চিন্তা করে আমার আজকার ভ্রমণের পৌরুষ একটুও খর্ব্ব করলাম না। সেই "মভে পা"র কাছে আর কোন বিপদ হয় নাই, কারণ গাইড এবার আমাকে ধরে পার করিয়েছে।

বুক ফুলিয়ে বিকেল ৪টার সময় হোটেলে প্রবেশ করলাম। স্নান করে ঘরে এসে বিশ্রাম করছিলাম; বাইরে আল্পসের প্রত্যেক সাদা শিখরের উদ্দেশে মনে মনে বললাম 'দাঁড়াও, তোমার মাথার উপর চড়ব, তবে ছাড়ব।" কে বলে বাঙ্গালী ভীরু। ডিনারের ঘন্টা পড়ল। সিঁড়িতে একজন ফরাসী ভদ্রলোক ইংরিজিতে নিজে থেকেই আলাপ সুরু করলেন। আমি তাঁকে প্রথমেই গর্ব্বের সহিত জানিয়ে দিলাম যে আজ সারাদিন আমি গাইডের সঙ্গে করে "মার দি গ্লাস" পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছি; সেই জন্য একটু ক্লান্ত আছি। তিনি বললেন যে তিনিও বিকেলে তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'নিশ্চয়ই গাইড সঙ্গে ছিল?" তিনি হেসে বললেন "এইটুকু যেতে আর কে গাইড নেয়।" আমি শেষ চেষ্টা করে বললাম "নিশ্চয়ই 'মভে পা' পার হয়ে যান নাই; সে পথ যে মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব।" তিনি আবার হেসে বললেন "কই, সে পথে আমাদের ত কোন কষ্ট হয় নাই।" আর না; আমি ছুটে ডিনার ঘরে চলে গেলাম। খেতে খেতে মনে হচ্ছিল কেন সাজাহান তাজনির্ম্মাতা সেই শিল্পীকে মৃত্যু পুরস্কার দিয়েছিলেন; তা না হলে হয়ত তাঁকে দিল্লীর বাইরে আর কোথায় আর একটা তাজ দেখার দুঃখ ভোগ করতে হত।

এদেশে পাহাড়ে চড়া এক দুর্নিবার বাতিক; লাভ এতে কিছুই নাই; কারণ ইহা ব্যায়াম নয় যে শরীরের উন্নতি হবে, বরং এই নিদারুণ পরিশ্রমের পর শরীর সারতে কিছু সময় লাগে।

আমার এই অভিযান থেকেই বুঝবেন যে এতে হাত পা ভাঙ্গার সুযোগ খুব বেশি এমন কি ঘাড়মটকানোর সম্ভাবনাও বড় কম নয়, আমি এই দুই বছরে আল্পসে বহু দুর্ঘটনার বিবরণ কাগজে পড়েছি। কিন্তু তবু এদেশে উৎসাহীর অন্ত নাই। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন গৌরী-শঙ্করের মাথায় উঠে কি লাভ হবে? মেরু আবিষ্কারে অনেক ভৌগলিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, গৌরীশঙ্করে তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু তবু চড়তে হবে; কেন? Sir Younghusbandএর জবাবে বলেছেন যে মানুষের সহ্যের সীমা কতদূর এবং আমাদের শক্তি কতখানি এর পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কি রকম পরিচয়? তারই গোটা কয়েক কাহিনী লিখছি। কিছু দিন পূর্ব্বে একদল আমেরিকান গাইড প্রভৃতি নিয়ে স্যামনি থেকে মঁব্লাঁর চড়ল। মঁব্লার মাথায় চড়তে তিন দিন সময় লাগে। প্রথম দিনে দশহাজার ফিট উঁচুতে "গ্রাঁদ মুল" (Grand Mulets) বলে একটা কুটিরে উঠা হয়। সেখান থেকে শেষ রাতে রওনা হয়ে পরদিন বেলা ৮টা, ৯টার সময় মঁব্লাঁর মাথায় পৌঁছান হয়; তারপর সেখান থেকে নেমে সন্ধ্যায় সেই কুটিরে আবার রাত কাটাতে হয় এবং পরের দিন স্যামনিতে নামতে হয়। এই আমেরিকান পার্টি নির্বিঘ্নে মঁব্লাঁর মাথায় পৌঁছাল। কিন্তু নামার সময় আরম্ভ হল ঝড় ও তুষার বর্ষণ; সাতদিন ধরে তাই চলল। এরপর স্যামনি থেকে যে দল তাদের খোজে গেল তারা তাদের প্রাণহীণ শীতে-জমা দেহ নিয়ে নেমে এল। একজন আমেরিকান শেষ পর্য্যন্ত তার ডাইরীতে সমস্ত লিখে রেখেছে,—মৃত্যুর করাল শীতল স্পর্শের সে কাহিনী কি ভয়ানক! আর একবার আর এক রাশিয়ান ভদ্রলোক চার জন গাইড নিয়ে মঁব্লাঁতে চড়েন; ফেরবার সময় এক গ্লেশিয়ার পার হতে দুই জন গাইড তার ফাটলে পড়ে যায়। প্রায় চল্লিশ বছর পড়ে গ্লেশিয়ার সরে যাওয়ায় তাদের মৃতদেহ বের হয়ে পড়ে; বরফের মধ্যে থাকার জন্য কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই। তাদের আর দুইজন সঙ্গী এত দিনে অশীতিপর বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে; একজনের জ্ঞানলোপ পেয়েছিল। আর একজন এসে সেই দুইজনকে সনাক্ত করল। বৃদ্ধ তার যৌবনের এই দুই সঙ্গীর হাত ধরে চীৎকার আরম্ভ করল যেন তারা ঘুমিয়ে আছে। সে কি দৃশ্য! এই রকম কত দেহ এই সব পর্ব্বতের পাষাণ জঠরে লুকানো আছে। হয়তঃ কোন সুদুর ভবিষ্যতে—যখন মানুষের অস্তিত্ব লোপ পাবে, তখন পাষাণ তার বক্ষ থেকে এই সব রহস্য প্রকাশ করবে এবং এখন যেমন আমরা লুপ্তপ্রাণীর চিহ্ন মিউজিয়ামে

রক্ষা করি, তখনকার অধিবাসীরাও মানুষের এই সব দেহকে সেই ভাবে রক্ষা করবে। স্যামনিতে এই সব বিভীষিকাময় জিনিসের এক মিউজিয়াম আছে! যে সর্ব্বপ্রথম মঁব্লাঁতে চড়ে তার একটা মর্ম্মর মূর্ত্তি রক্ষা করা হয়েছে। তার নাম জাকুয়ে বাল্‌মা (Jacques Balmat) ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সে একলা মঁব্লাঁতে চড়ে। শুনেছি বৃদ্ধ বয়সে বাল্‌মা ভয়ানক লোভী হয়ে পড়েছিল; তাই নানা পর্ব্বত শৃঙ্গে সোণার খোঁজে ঘুরে বড়াত; একদিন তার একটা থেকে পড়ে ভদ্রলোক প্রাণ হারিয়েছে; উপযুক্ত মৃত্যু বটে!

১৪ই এপ্রেল স্যামনি ত্যাগ করে জেনেভা এলাম। জেনেভা প্রাচীন সহর; সেই জন্য সহর দুই রকমের। যে অংশ প্রাচীন সেখানে বাড়ী ঘর পুরাণো, রাস্তাঘাট সরু, আধুনিক অংশে বাড়ী ঘর প্রকাণ্ড, রাস্তাঘাট চওড়া। জেনেভার হ্রদের ধারই সুন্দর। হ্রদের তীরে সুন্দর একটা বাগান আছে; তার নাম হচ্ছে "জার্দাঁ আংগ্লে" (Jardin anglais) "ইংরাজ উদ্যান।" ইংরাজদের খুসী করার জন্য অনেক স্থানেই অনেক রাস্তা ও উদ্যান এবং হোটেল ইংরেজদের নামে করা হয়। সুইটজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অনেক টাউনের ধনাগম হয় দর্শকদের কল্যাণে। ইউরোপে ইংরাজরাই সব চেয়ে ভ্রমণ করে বেশি। সুতরাং ইংরাজদেরই প্রাধান্য এই সব স্থানে অধিক। বাস্তবিক ইংরাজ জাতকে সম্ভ্রম না করে পারছি না। এদের জন্যই সুইস হোটেলের সব দাসীরা ইংরাজি শিখতে বাধ্য হয়; ফ্রান্সে দোকানে লেখা থাকে "English is spoken here".

জেনেভার দেখার বিশেষ কিছুই নাই; সেই জন্য পরদিনই প্যারিশ চলে যাই। কোন দুটি মজার ঘটনা হয়েছিল,—সন্ধ্যাবেলা হ্রদের ধারে একটা রেস্তরায় বসে ডিনার খাচ্ছি এমন সময় কিছু বলা নাই হঠাৎ একজন বৃদ্ধ এসে আমাদের টেবিলে বসে গেল এবং টুপী খুলে আমাদের ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলল যে সে একজন ভারতবাসী; ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তার রাজদ্রোহিতার জন্য তাকে ভারতবর্ষে ফিরতে দেয় না; তাই সে আজ পনর কুড়ি বছর জেনেভায় নির্ব্বাসনে আছে। ভদ্রলোক বলা আরম্ভ করলেন "তোমরা হয়ত: বুঝবে না আমার ভারতীয় দেখে কি আনন্দ হয়। সেই জন্য হঠাৎ তোমাদের উপর এসে পড়ছি; কিছু মনে করো না।" তারপর ভদ্রলোক কেবল বকে যাচ্ছিলেন। আমাদের যখন খাওয়া শেষ হল তখন তিনি বিদায় নিলেন। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে সেইদিন রাতে। আমাদের হোটেল সহরের একপ্রান্তে; ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর এসে পড়েছি; তাই পথ খুজে পাচ্ছিলাম না। শেষে জেনেভার এক নির্জ্জন অংশে এসে পড়লাম।

সম্মুখে কেউ নাই। একখানা মোটর চলে যাচ্ছিল ; মাত্র তাতে একজন লোক। শেষকালে তাকে থামিয়ে পথ জিজ্ঞাসা করলাম! লোকটা প্রথমে পথ বলে দিল ; তার পরে কি ভেবে আমাদের মোটরে পৌঁছে দিতে চাইল। আমাদের দুইজনের পকেটে ছিল অনেক টাকা ; বিদেশ ; তাতে রাত ; এবং জেনেভায় ইউরোপের যত নির্ব্বাসিত ব্যক্তির আশ্রয় ; কাযেই ইতস্ততঃ করছিলাম। শেষে লোকটা বলে উঠল তোমাদের কোন ভাড়া দিতে হবে না। এর পর অবশ্য লজ্জায় আমরা মোটরে চড়লাম। লোকটি বাস্তবিক ভদ্রলোক ; আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাস্তবিক এ রকম ভদ্রতা খুব কম দেখা যায়।

১৬ই মার্চ প্যারিশে এলাম। প্যারিশে হোটেল পেতে একটু কষ্ট হয়েছিল, তখন প্যারিশে একটা অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছে ; তাই খুব ভিড়। অবশেষে একটা হোটেলে স্থান মিলল, সেখানে সবেমাত্র ঘর খালি হয়েছে।

প্যারিশ লণ্ডনের চেয়ে অনেক ছোট। প্যারিশের কতক অংশবাদে আর সব বহু পুরাণো, রাস্তাঘাট সরু, পাথর দিয়ে বাঁধানোর জন্য সমতল নয়। লণ্ডনের সব রাস্তাই পিচ দিয়ে সুন্দর বাঁধানো ও পরিপাটী। লণ্ডনের মিউনিসিপালিটি প্যারিশের চেয়ে এ বিষয়ে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ ইংলণ্ডের প্রত্যেক সহরই কি রাস্তা হিসাবে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ফ্রান্সের সহরের চেয়ে ভাল, কিন্তু প্যারিশে বুলেভাঁদ অতুলনীয়। প্যারিশের সব চেয়ে বিখ্যাত রাস্তার নাম হচ্ছে "সাঁজ্ইলিজে" (Champs Elyseis) অর্থাৎ দেবতাদের প্রান্তর, এই রাস্তার দুই ধারে উদ্যান ও তার মধ্যে বড় বড় সৌধ। একটা যায়গায় অনেকগুলো রাস্তা এসে মিসেছে, তার নাম হচ্ছে "প্লাস দি লা কনকর" (Place de la Concord) অর্থাৎ সৌম্য স্থান। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই স্থানে সাধারণের দৃষ্টি সম্মুখে অপরাধীদের গিলোটিনে বধ করা হইত ; রাজা অষ্টাদশ লুই, মেরি আঁটনেৎ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই স্থানে হত হয়ে ছিলেন ; তখন এই যায়গাকে বলা হত প্লাস দি লা রিভলিউসিয়োঁ (Place de la Revolution) অর্থাৎ বিপ্লবের স্থান ; পরে এর নাম বদলিয়ে সৌম্যস্থান করা হয়েছে। এই খানে প্যারিশের সব চেয়ে ভাল দৃশ্য ; একপাশে ছোট্ট ছবির মত 'সীন' নদী, আর একদিকে টুলেরি (Tulleris) উদ্যান ও সেই উদ্যানের মধ্যে রাজপ্রাসাদ লুভার (Louvre), আর একদিকে বিখ্যাত রাস্তা রু রয়াল (Rue Royalo) ; এই রাস্তার প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই একটু বারান্দা থাকায় রাস্তাটির

অপূর্ব্ব চেহারা হয়েছে। আর একদিকে সাঁজ ইলিজে রাস্তা। ফ্রান্সে বড় বড় বুলেভার্ড এর দুই পাশে বাগান, সেই বাগানে সুন্দর সুন্দর মর্ম্মর মূর্ত্তি। টুলেরি উদ্যানে বিখ্যাত রোড়িন (Rodin) নামক ভাস্করের অনেক অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি আছে। সাঁজ ইলিজে একবারে সোজাসুজি এক মাইল গিয়ে একটা স্থানে পড়েছে যার নাম হচ্ছে ইতোইল (Etoile) অর্থাৎ নক্ষত্র। এখানে অন্ততঃ এক ডজন রাস্তা এসে মিশেছে, যেন একটা তারার রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এইখানে নেপোলিয়ানের তৈরী বিখ্যাত Arc de Triomphe (Arc of Triumph) অর্থাৎ বিজয়-তোরণ। যেমন তাজমহলের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, কিংবা কথার শেষ করা যায় না, সেই রকম প্যারিশে এই রাস্তা, তার চার পাশের বাগান ও সৌধমালা, নেপোলিয়ানের এই বিজয়-তোরণ, দূরের লুভার প্রাসাদের কালো গম্ভীর মূর্ত্তি ও টুলেরি উদ্যানের সৌন্দর্য্য—এই সমস্ত কথায় বলে শেষ করা যায় না, লুভার প্রাসাদের সম্মুখেও একটা বিজয়স্তম্ভ আছে; সেখান থেকে সাঁজ ইলিজে ঠিক একটা সরল রেখার মত এসে এই Etoileএর তোরণে মিশেছে, যে দিন নেপোলিয়ানের মৃত্যু দিন সেইদিন সূর্য্যাস্তও এই সরলরেখার মধ্যে এসে পড়ে, মনে হয় যে দূরের ইতোইলের বিজয়তোরণের মধ্যে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ফরাসীরজাত এই রকম কল্পনাপ্রবণ; ইংরাজদের উপবন উদ্যান প্রভৃতি ফরাসীর যথার্থ প্রতিলিপি। দুইজাত কল্পনায় কত তফাৎ তা একটা ব্যাপারেই বুঝা যায়। যুদ্ধের পর প্রত্যেক জাতিই তাদের মৃত বীরগণের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একজন অজ্ঞাত মৃত সৈন্যকে কবরস্থ করে তার উপর বহুমূল্য স্মরণ-সৌধ নির্ম্মাণ করেছে। লণ্ডনে যেখানে চারদিকে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের রাজপ্রাসাদ পার্লামেন্ট প্রভৃতি আছে সেই বিখ্যাত হোয়াইট হল (White hall) নামক রাস্তার উপর মাঝখানে সাদামার্ব্বেলের একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে, যাকে ইংরাজেরা বলে Cenotaph (স্মরণ চিহ্ন) এখান দিয়ে চলে যেতে মাথা থেকে টুপী খুলে সকলে জাতির সেই মৃত বীরের সম্মান করে। দুঃখের বিষয় মার্ব্বেলের সেনোটাফটি এমন বিশ্রি দেখতে এবং পাশের পুরণো কালো সৌধের মধ্যে থাকায় এমন বেখাপ্পা দেখায় যে ইংরাজ ছাড়া আর কেউ সেটাকে সুন্দর বলবে না। ফরাসীরা এর জন্য সুন্দর এক উপায়ে স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করেছে। নেপোলিয়ানের যে বিজয়স্তম্ভ, সেখানে চারদিক থেকে আলোর রশ্মির মত দশ বারটা রাস্তা এসে মিশেছে, ঠিক সেইখানে মাটির উপর একটা প্রদীপ জলছে; এর তলেই

তাদের জাতির অজ্ঞাতবীর সমাধিস্থ ; এই আলোটাকে বলা হয় স্মরণবাতি (The flame of remembrance) ; কেমন সুন্দর কল্পনা !

সমস্ত প্যারিশই এই রকম সৌন্দর্য্যেভরা ; ইতিহাসে প্যারিশের অনেক রাস্তা ও অনেক বাড়ী অমর হয়ে আছে ; এর গির্জ্জা অতুলনীয়। 'নোতার দাম' মর্দেলীন, স'াক্রারমে প্রভৃতি গির্জ্জা অপূর্ব্ব অদ্ভূত। পূর্ব্বে যে সব রাজপ্রাসাদ ছিল এখন সেই সব সরকারী আফিস হয়েছে ; প্রত্যেকটাই দেখতে সুন্দর, এক একখানা ছবির মত। যদিও ফরাসীজাত ভয়ানক Democratic কিন্তু এর কল্পনা এখনও রাজরাজড়াদের মতই বিলাসিতাপূর্ণ।

প্যারিশের তিনটি স্থানের কথা বলেই প্যারিশ থেকে বিদায় নিব। প্রথম হচ্ছে লুভার মিউজিয়াম ও চিত্রশালা ; এখানে এত সব শিল্পসম্পদ রক্ষা করা হয়েছে যে দেখে শেষ করা যায় না, আমরা দুইদিন কেবল চিত্রশালাতে গিয়েছিলাম ; মিউজিয়ামের কিছুই দেখি নাই। কিন্তু তবুও সব চিত্র দেখে শেষ হল না, জগদ্বিখ্যাত অনেক চিত্রকরের ছবি এখানে আছে। নেপোলিয়ান যখন সমস্ত ইউরোপ জয় করেছিলেন তখন তিনি সব রাজধানী থেকে সমস্ত শিল্পকলাসম্পদ প্যারিশে লইয়া আসেন ; তিনি অর্থের দিকে তত দৃষ্টি দিতেন না ; অবশ্য নেপোলিয়ানের পতনের পর সেই সব ছবি, মূর্ত্তি প্রভৃতি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, তা না হলে প্যারিশ কি যে হত জানি না। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে প্যারিশে ইউনিভারসিটি সারবোঁ (Sarbonne) ও তার চারপাশের স্থান যাকে "লাটিন কোয়াটারস্" বলা হয় (Latin quarters) ইউনিভারসিটির বাড়ী দেখতে খুব মহিমান্বিত ; দেওয়ালে নানা রকম কারুকার্য্য মণ্ডিত ; বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপিতে দেওয়াল সুদৃশ্য করা হয়েছে ; সিনেট হল নানা রকম মর্ম্মর মূর্ত্তি ও ছবিতে ভরা ;—বাণীর মন্দিরে প্রবেশ করেছি তা যেন প্রতিপদেই মনে হয় ; "কোয়াটার লাটিন" প্যারিশের খুব প্রাচীন অংশ ; চিরদিনই ছাত্র ও আর্টিষ্টদের বাস। এইখানে ফরাসী উপন্যাসে বিশেষতঃ ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo)এর অমর লেখনীতে এই পল্লীর উপর কেমন একটা কবিত্বের মোহজাল ছড়াইয়া দিয়াছে। এইখানে অনাহারাক্লিষ্ট চিত্রকর, ছেঁড়া প্যাণ্টালুনপরা খালি-পায়ে দরিদ্র ছাত্র, বৃদ্ধ শীর্ণ অধ্যাপক প্রভৃতি বাণীর সেবকগণ পূর্ব্বকালে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যারা বাণীর সেবা করেন তাঁরা সব দেশেই সব কালেই নিঃস্ব এই সব ছাত্রগণই ফরাসী বিপ্লবে অমর কায করেছে, এরাই ফ্রান্সের বড় বড় চিত্রকর ও লেখক

হয়েছে, এরাই বিজ্ঞানে ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ফ্রান্সকে শ্রেষ্ঠ করেছে। এই জীবন মৃত্যুপারের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীনের" দল খালি পকেটে রাতের পর রাত প্রচণ্ড আমোদে কাটিয়ে তারপর হয় ত সীনের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এদের এই সব পাগলামি, দারিদ্য, কলাপ্রিয়তা, প্রণয়কাহিনী ফরাসী লেখকগণের তুলিকায় রোমান্সে রঞ্জিত হয়ে আছে। আমি সেই ছেঁড়া পোষাকপরা দরিদ্র আর্টিষ্টদের খোঁজে একানকার একটা বিখ্যাত রেস্তরাঁয় প্রবেশ করলাম; কিন্তু ভাল পোষাকপরা কয়েকজন বাবু ছাত্র ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

এইবার তিন নম্বরের কথা বলে শেষ করব—সে হচ্ছে নেপোলিয়ানের সমাধি এবং আইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower) নেপোলিয়ানের মৃতদেহের উপর যে সমাধি নির্ম্মাণ করা হয়েছে, তা তাঁর মত লোকেরই উপযুক্ত। শবাধার একটি গর্ত্তের মধ্যে রক্ষিত করা হয়েছে, যাকে দেখতে হলেই মাথা নীচু করতে হয়। তার চারপাশে 'জয়ে'র (Victory) কয়েকটি মর্ম্মরমূর্ত্তি ' অষ্টার লিজ প্রভৃতি যুদ্ধে যেসমস্ত শত্রুর পতাকা অধিকার করেছিলেন, সেই সব পতাকা, শবাধারের মাথার উপর ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্ত্তি তার চারপাশে সোণালী রঙের আরও অনেক কারুকার্য্য। জানালার কাচ দিয়া দিনের আলো সোণালী আভায় মণ্ডিত হয়ে এই সমাধির উপর চন্দ্রকিরণের মত হয়ে পড়ছিল; যেন চারদিকে ম্লান জ্যোৎস্নাসিক্ত রজনী শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করেছে ধন্য বল্পনা! নেপোলিয়ানের চিহ্ন প্যারিশের সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের যত ক্ষতি করেছেন অন্য কেউ তত করেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁর বিজয়কাহিনী ফরাসীজাতকে পাগল করে রেখেছে; যে ছেলেটি সব চেয়ে দুর্দ্দান্ত, মা যেমন তাকেই সবচেয়ে ভালবাসে এ যেন ঠিক তাই। আইফেল স্তম্ভ প্যারিশের এক আশ্চর্য্য বলে সকলেই মনে করে। আমার কাছে কিন্তু এর কোন সৌন্দর্য্যই প্রকাশ পেল না। বরং এই হাজার ফিট উঁচু কতগুলো লোহার কড়িবর্গাকে বিনা প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছে এই ভেবে রাগ হচ্ছিল। আজকাল এটা বিনাতার টেলিগ্রাফের ষ্টেশন রূপে ব্যবহার করা হয়। আমরা লিফ্টে (Lift) এর মাথায় চড়ে নিলাম। সেখান থেকে সারা প্যারিশ ও বহুদুর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

প্যারিশ শেষ করার পূর্ব্বে তার একটা কথা বলব, সে হচ্ছে প্যারিশের রেস্তরা; ফরাসী রান্না ইউরোপের সর্বত্র আদৃত; এমন কি ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড় বড় হোটেলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে এখানকার রান্না Cuisine Francaise (French cooking); বড় বড় ভোজে মেনু

ছাপানো হয় ফরাসী ভাষায়। একখানা ভৌগলিক পুস্তকে প্যারিশের বর্ণনায় তার বড় বড় সৌধ, রাস্তা, উদ্যানের সঙ্গে বলা হয়েছে যে এই খানে পৃথিবীর (?) মধ্যে সব চেয়ে ভাল খাবার পাওয়া যায়। আমি ইংলণ্ডের খাদ্যের রস কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনা। আমার বারে বারে ফ্রান্সে আসার কারণও তাই। মেজিভে আমাদের পাচিকা এই বিষয়ে অসাধারণ গুণী ছিল, তাই সেস্থান ত্যাগ করার সময় আমি তার করগ্রহণ করে বলি "Much of the pleasure of this Valetion is due to you (এই ছুটির অনেক আনন্দই তোমার কল্যাণে) আমার বন্ধু আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন, কিন্তু দেখেছি তাঁর ভোজনশক্তি আমার চেয়ে আরও বেশী। পাহাড়ে অনেকদিন মাছ খাওয়া হয় নাই, সেইজন্য জেনেভায় মাছের উপর আমাদের ভয়ানক লোভ হয়েছিল, একদিন একটা মাছের ডিমের জন্য ৬ ফ্রাঙ্ক (৪৲টাকা) দিতে হয়। প্যারিশে এসে এই জন্য আমাদের আনন্দের অবধি ছিলনা, নানা ভাল ভাল রেস্তর াঁর খেয়ে বেড়াতাম। এইজন্য কেউ যদি আমাদের পেটুক মনে করেন, তবে যেন তিনি কিছুদিন ইংলণ্ডে এসে রোষ্টবিফ ও মাটন খেয়ে দেখেন।

প্যারিশ থেকে একদিন ভারসাই (Versailles) দেখতে যাই। এখানে চতুর্দ্দশ লুই যে প্রাসাদ ও উদ্যান তৈরী করে গিয়েছেন, তা এখনও সৌন্দর্য্য হিসাবে চূড়ান্ত। এইখানে এলে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। যে ঘরে চতুর্দ্দশ লুই শয়ন করতেন, সেই ঘরে বিছানা পত্র ঠিক সেই রকম আছে। যেখানে মেরি আতনেতো (Marie Antoinette) এর প্রসাধনকক্ষ ও স্নানাগার ছিল তা ঠিক রকমই আছে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা থিয়েটার আছে, তার গ্যালারী ও ষ্টেজ অদ্ভূত সুন্দর। তার কোথায় পঞ্চদশ লুই বসতো এবং কোথায় ম্যাদাম পম্পাডুর (Madame Pompadour) বসত, গাইড আমাদের দেখিয়ে দিল। এই কক্ষেই নেপোলিয়ান প্রথম রিপাবলিকের প্রতিনিধিগণকে বিতারিত করে স্বয়ং ফ্রান্সের কর্ত্তা হয়ে বসেন। আর একটা স্থানে নাকি গত মহাযুদ্ধের শেষে যখন সন্ধির প্রস্তাবনা চলছিল তখন সমস্ত প্রতিনিধিরা এসে আহার করতেন, এবং কোন জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হলেই দৌড়িয়ে এসে একগ্লাশ পানীয় খাওয়ার আছিলায় লয়েডর্জ্জও ক্লেমেনসু পরামর্শ করতেন। আর একটা ঘর হচ্ছে জগদ্বিখ্যাত Hall of Mirror (দর্পণ কক্ষ) দেওয়ালে বড় বড় আয়না বসানো আছে, এবং বাইরে দৃষ্টিপাত করলে বহুদূর পর্য্যন্ত শ্যাম শোভাময় ফ্রান্সের মাঠ দেখা যায় ; রাজা নাকি

কাউকে বাড়ী করতে দিতেন না। এই কক্ষে ১৮৭১ সালে ফ্রান্স, জার্ম্মাণ সমরের অবসানে বিজয়ী প্রাশিয়ার রাজা নিজকে জার্ম্মাণীর সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন ; বর্ত্তমান জার্ম্মান সাম্রাজ্যের সূত্রপাৎ হয়। আবার এই ঘরেই ১৯১৯ সালে পরাজিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে ; যে টেবিলের উপর যে কলমে সকলে দস্তখত করে তা এই ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছে। ইতিহাস যদি কখন নাটকের মত হয়, তবে তা এই ঘরে হয়েছে। সমস্ত ঘর এখন ফরাসী জাতির ইতিহাসে যে যে ঘটনা কীর্ত্তিকর তার ছবিতে ভরা ; ফরাসী বালক যদি এখানে বেড়াতে আসে তবে তার আর ইতিহাস মুখস্ত করতে হবে না। এই সমস্ত কক্ষের মধ্যদিয়ে যখন চলছিলাম তখন কেবলই মনে হচ্ছিল হয়ত এই চেয়ারে নেপোলিয়ান বসেছেন, কিংবা এই পথে চতুর্দ্দশ লুই কত বার যাতায়াত করেছেন। বাইরেই সুন্দর উদ্যান, মর্ম্মরমূর্ত্তি ও ফোয়ারায় ভরা ; এখন মাসে দুই রবিবারে মাত্র ফোয়ারায় জল দেওয়া হয়। এই রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য ফরাসীদেশ শোষণ করে চতুর্দ্দশ লুই যে অর্থগ্রহণ করেন, তার প্রতিফল পান হতভাগ্য ১৬শ লুই ; তিনি নিজে খুব শান্তস্বভাব ও দয়ালু ছিলেন।

ভারসাইএ আর দুইটি রাজপ্রাসাদ আছে ; এখান থেকে মাইল খানেক দূরে, একটার নাম গ্রাঁদ ত্রিয়ানোঁ (Grand Trianon) অন্যটার নাম পেতি ত্রিয়ানোঁ (Petit Trianon) পেতি ত্রিয়ানোঁতে মেরি আতোঁনেৎ বাস করতেন। মেরি আতোঁনেৎ ভুবনমোহিনী সুন্দরী ছিলেন; তিনি অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসীর কন্যা। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ষোড়শ বর্ষীয় ১৬শ লুইয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, এবং সেই সঙ্গে তিনি মাতাকে ত্যাগ করে ফরাসী রাজদরবারে চিরদিনের জন্য চলে আসেন। তাঁকে ফরাসীর লোকেরা দেখতে পারত না ; কারণ অষ্ট্রীয়া ছিল চিরদিন ফ্রান্সের শত্রু, সেই জন্য ফরাসীরা মনে করত যে রাণী রাজাকে কুপরামর্শ দিচ্ছেন ; তারা ঘৃণা করে তাঁকে বলত Austrian woman. তাঁর স্বামীও তেমন চতুর ও গুণশালী ছিলেন না, বোধহয় তাঁর মত রূপসীর অনুপযুক্তই ছিলেন। মেরি আতোঁনেৎ এইখানে একটি ক্ষুদ্রপল্লী স্থাপন করেন ; তাঁর একটা গোশালা ছিল, চাষার মেয়েদের মত তিনি গরুকে খাবার দিতেন ও দুধ দোহন করতেন। এখনও সেই সব খড়ের ঘর পড়ে আছে, একটা ছিল তাঁর পরিচালিত ইস্কুল, আমাদের ছেলেরা যেমন রাজা রাজা খেলা করে সেই রকম মেরি আতোঁনেৎ চাষা চাষা খেলা করতেন। এতে তাঁর কর্ম্মহীন দুঃখময় জীবনের

ছবি যেন পরিস্ফুট হয় ; স্বামী কোন দিন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নাই ; হয় ত অধিকাংশ সময়ই তিনি মৃগয়া কিংবা বন্ধুদের আড্ডায় থেকে স্ত্রীর কাছে আসতেন না ; বাইরে ফরাসী জাতের কেউ তাঁকে দেখতে পারত না, সকলেই অভিশাপ দিত। সেই জন্য এই বন্দিনী এই ভাবে নানা কাযের সৃষ্টি করে নিজকে ব্যাপৃত রাখতেন। আমার মনে হয় ইতিহাস তাঁর উপর যত খানি কালিমা লেপন করছে, তা অনেকটা তাঁর এই মানসিক দুঃখেই ঘটেছে। একটা ঘরে তিনি বেড়িয়ে এসে বিশ্রাম করতেন। এর দেওয়ালে যত সব ভ্রমণকারী নাম লিখে গিয়েছে ; আমিও একজন আমেরিকান নামের পাশে নিজের নাম লিখে রাখলাম !

প্যারিশ থেকে আর একদিন যাই ফন্টেনব্লোতে (Fountainebleu) প্যারিশ থেকে মাইল ৩৫ দূরে। এইখানে ফরাসী রাজাদের বাসস্থান ছিল। এইখানে নেপোলিয়ানের স্মৃতি বেশি। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে যে চত্বর সেখানে তিনি তাঁর গার্ডদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে ছিলেন। এই প্রাসাদ দেখার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট লোক রেখেছে ; কারণ এত মূল্যবান সব জিনিস আছে যে কেউ একজন সঙ্গে থাকা দরকার। এর প্রতি কক্ষই আশ্চর্য্য ভাবে সজ্জিত, ছাদে সোণালীকায করা ; প্রত্যেক ঘরেই বিচিত্র Panelling (কাঠের দেওয়াল),—বিলাসিতায় যে মাথার দরকার হয়, তা এইখানে এসে বুঝা যায়। এক ঘর হচ্ছে ফরাসী রাজ্ঞীর শয়ন ঘর ; বিছানাপত্র ঠিক সেই রকম পড়ে আছে। যে কক্ষটা ১ম ফ্রান্সিস (Francis) নিজের জন্য সাজিয়ে ছিলেন সেইটাই সর্ব্বসুন্দর ; যেটা উপাসনা কক্ষ সেটাও খুব সুন্দর। এক ঘরে নেপোলিয়ান শয়ন করতেন ; তাঁর বিছানা পড়ে আছে, আর এক ঘরে তিনি কায করতেন, টেবিলের উপর তাঁর বিখ্যাত টুপী পড়ে আছে ; আর এক ঘরে স্নান করতেন ; লোহার টব প্রভৃতি এখনও সেই রকম পড়ে আছে। আর এক ঘরে তিনি পোপকে বন্দী করে রেখেছিলেন, সেখানে বিছানাপত্র ও আসবাব এত মূল্যবান ও লোভনীয় যে পোপের মত সন্ন্যাসীর কিছুতেই উপযুক্ত নয়। আর একটা লাইব্রেরী ঘর, এখানে দেওয়ালের গায়ে বিচিত্র আলমারীতে সব ঝকঝকে বাঁধানো বই, ঘরটা আরও সুন্দর সোণালী আভায় ভরা, এখানে এলে কেউ বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে না ; ঘরের কারুকার্য্যই বরং দেখবে। এইখানে টেবিলের উপর নেপোলিয়ান এল্বা (Elba) গমন করার পূর্ব্বে যে পত্রে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, সেই পত্র পড়ে আছে। এত বড় লোকের হাতের লেখা এই বিশ্রী যে আমিও এই হিসাবে তাঁর

চেয়ে বড়; কিছুতেই পড়া যাচ্ছিল না। এই সব লোক কবে চলে গিয়েছেন; কিন্তু এই সব বাড়ীঘর দেখে মনে হল যে তাঁরা কেবল ইতিহাসের পাতাতেই ছিলেন না, তারা এককালে আমাদের মত পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতেন। ফন্তেনব্লোতে প্রকাণ্ড বন আছে; এখানে রাজারা হরিণ এবং বরাহ শিকার করতেন। এখন অবশ্য সে সব কিছুই নাই, কিন্তু বন আছে। আমরা সারা বিকাল মোটরে করে সেই বনে ঘুরে এলাম, বন মানে জঙ্গল নয়; ভিতরে খুব পরিষ্কার, গাছ সব শ্রেণীবদ্ধ এবং ভিতরে সুন্দর রাস্তা, এর ভিতর একটা গ্রাম আছে, তার নাম বারবিজোন (Barbixon) এখানে যত সব কলার উপাসক বাস করেন, গ্রামখানা ছবির মত, বনের মধ্যে লোকের বাস নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

—:*:—

শুষ্ক-দহন আগুন তুমি, রুদ্র বৈশাখ-মেঘ
বজ্রে আমাদের চমকে দিলে জাগিয়ে প্রাণের বেগ,
জীর্ণ দেহে পরাণ দিলে, ভগ্নহৃদে আশ,
মাতিয়ে-দেওয়া বৈশাখ-বায়ে আনলে প্রাণের শ্বাস;
দীপ্ত তব প্রাণের শিখায় নিরাশ পুড়ে ছাই,
মানুষ মোরা জানিয়ে দিলে, বাঁচার গাথা গাই।
তোমার বিজয়-ডঙ্কা সাথে আজকে গাহি গান,
তোমার সাথে আজকে বলি—দেশের তরে প্রাণ।

গাছপালা ও মাঠে ঘেরা দেশটা শুধু নয়,
শীর্ণ শত দেশের লোকে ঐ ওখানে রয়,
ওদের নিয়ে ক্লিষ্টে নিয়ে জাগ্‌রে ওরে জাগ,—
তোমার অভয় কণ্ঠ শুনি, প্রাণ-মাতান ডাক।
ক্ষিপ্ত উতাল সাগর তুমি দেদার দিলে দোল্,
বল্লে মোদের—আয় না ছুটে, ভোল্ রে ব্যথা ভোল,
তড়িৎ তুমি, বজ্র তুমি, দীপ্ত হুতাশন,
যজ্ঞ তোমার লক্ষ প্রাণের সুপ্তি-বিলোড়ন।
কে গো তুমি ভীষণ-আরাব কোন্ ব'শেখের মেঘ,
বজ্রে মোদের চম্‌কে দিলে জাগিয়ে প্রাণের বেগ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বয়াটে।

—*—

চার।

এক।

পূরবী রঙ ভোরের দিগঙ্গনে সোনা ফলিয়ে দেবার আগেই ন'ব্‌নে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ল। তার ঘাড়ের ওপর থেকে ফিরির বস্তা নেমে গিয়ে সেখানে আজ যত রাজ্যের কাজের বোঝা আবার চেপে ব'সেছে। ক'লকাতায় বস্তী—দুঃখের নিরেট নিকষ যেখানে অন্ধকারের চেয়েও নিবিড়—রাত পোয়ানোর অনেক আগে থেকেই সেখানে দীন-জীবনের দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে যায়। সেইখানে নব্‌নের কাজ—সাহেবের আদেশ। সে গিয়ে খোঁজ নিল—কার হাঁড়িতে চাল নেই—দুমুঠো পেটের দানা ভিখ্ মেঙে কে পায় নি,—সে তার যোগাড় ক'রে দিল। মজুর

বউ কে আজ দু'দিন থেকে ব্যথা খাচ্ছে ন'ব্‌নের ডাকে দাই এসে তাকে দেখ্‌লে—রাতে তাড়ির দোকানে নেশা ক'র্‌তে গিয়ে কোন্ দুঃখিনীর স্বামী এই এত বেলায়ও ঘরে ফেরে নি—ন'ব্‌নে গিয়ে তাকে হয় নর্দ্দমা থেকে বেহুঁস অবস্থায় তুলে নিয়ে এল—হতভাগাকে,—নয় তো থানায় জামিন হ'য়ে খালাস করে আন্‌লো। কোথায় কোন্ দুঃখী রাতভর বর্ষা বাদলে পথে প'ড়ে প'ড়ে ভিজে সকালে সর্ব্বাঙ্গে জ্বর নিয়ে ঠির ঠিরিয়ে কাঁপ্‌ছে—বস্তীর ছোট হুজুর ন'ব্‌নে তাকে কাঁধে করে নিয়ে হাসপাতালে দিয়ে এল। ইত্যাদি। এই সাহেবের রোজকার কাজ ন'ব্‌নে আজ তাঁর প্রতিনিধি। ঘুরে ঘুরে—ঘরে ঘরে খোঁজ নিতে তার মাথার ওপর বেলা গড়িয়ে গেল। দুপুরের তপ্ত রোদ জ্ব'লে উঠে বড় বড় বাড়ীর ছায়াগুলোকে ফুটপথ-বরাবর বিছিয়ে দিয়েছে। ন'ব্‌নে কাজ সেরে বাড়ী ফিরছিল। মনের ভেতর তার বয়াটে বুদ্ধিটা এক একবার গুঞ্জন ক'রে উঠ্‌ছিল। নিজের মনে নিজেই সে তর্ক আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল—যে সাহেবের এ কাজের শেষ কই? এর শেষ নেই! তা হ'লে তারো কি এই ভবঘুরে জীবনের চলাফেরা এম্‌নি ক'রেই চিরন্তন কাল ধ'রে চ'ল্‌বে? না আর নয়! সাহেবের বাড়ীতে থেকে জবরদস্তী নবাবী ত আর বরদাস্তই হবে না;—তার হুকুম মেনে—এ চাল-ডাল বিলোনো দিন-গুজরানোও এইবার খতম! এবার একটা স্থিতি নিয়ে স্থির হ'য়ে সে ব'স্‌বে! সাহেব আসার খবর পেলেই স'রে প'ড়্‌বে তাঁর সঙ্গে আর দেখাও ক'র্‌বে না। ক'ল্‌কাতার বাইরে একটা চাকরী বাকরী নিয়ে—সেইখানে গিয়েই কায়েমী হবে! ব্যবস্থা ঠিক হ'য়ে গেছে সুতরাং তার মনে আর কোনো ভাবনা নেই!—একেবারে নির্ব্বিকার সে একখানা হিন্দী খেয়াল—গজলের একটী কলিই বারে বারে গুণ গুনিয়ে বাড়ী ফিরলো। এইবার মনে হ'ল বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। গিয়ে পাশের দোকানটা থেকে এক পয়সার ছোলাভাজা আর দু'পয়সার মুড়ি মুড়কী কিনে ফিরে এসে, খাবে ব'লে—তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে, ঘরে ঢুকছিল হঠাৎ অনাহুত—"এ কেরে?" একগাল হাসি আর চোখে যাদু নিয়ে—কিরণ এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো। ন'ব্‌নে একটুখানি অবাক মনে হ'য়ে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লো—"কিরণ?"

কিরণকে দেখে ন'ব্‌নে নিমেষে চকিত হয়ে উঠেছিল। কিরণ তা লক্ষ্য না, করেই—জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—"হ্যাঁ; চম্‌কে গেলে না কি নবনী?"

ন'ব্‌নে ব'ল্ল—"একটুখানি গেলাম বই কি!"

কিরণ মুচকী হেসে বল্ল—"ভাব্‌লে বুঝি আমি যদিও বা বাঘ ভাল্লুক না হই—"বিষধরী।" নিঃসন্দেহ—কেমন না?"

"ভাব্‌লাম তুই সেই তরুণী কিরণ রাণী।"

"ভাগ্যি আমার যা হোক"—বলে হেসে কিরণ তাড়াতাড়ি ন'বনের মাথার ওপর বিজলী পাথাথানা, খুলে দিয়ে ব'ল্ল—"বসো।"

ন'ব্‌নের বড় মেহনত লেগেছিল একটা কৌচের ওপর ব'সে প'ল। তার মুখ দেহের দিকে চকিতে আর একবার তাকিয়ে কিরণ ব'ল্ল—"উঃ ঘেমে জল হ'য়ে গে'ছ যে—জামা খোল"—ন'ব্‌নে শুধু একটু হাস্‌ল।

কিরণ ন'ব্‌নের ঘাড়ের ওপর থেকে চাদরখানা টেনে নিয়ে আলনায় রেখে আবার ফিরে এল। ন'ব্‌নে ততক্ষণে ফতুয়ার বোতামকটা খুলে ফেলেছিল। জামাটা গলিয়ে আন্‌বে ব'লে পিঠের বাঁ পাশটা একটুখানি মুচড়িয়ে কেবল বেঁকিয়ে নিয়েছে—কিরণ এসে ধপাস ক'রে তার সাম্‌নে ব'সে প'ড়ে জুতোর ফিতেয় হাত দিল—লেসের ফাঁস খুলে নিজের হাতে আজ সে ন'ব্‌নের জুতো ছাড়িয়ে দেবে। ন'ব্‌নে তাড়াতাড়ি কিরণের হাত ধ'রে তুলে ব'ল্লে—"তুই কি ক্ষেপেছিস?"

একটা হেঁচ্‌কা টান মেরে ন'ব্‌নে নিজেই জুতো খুলে ফেল্লে। কিরণ ব'ল্লে—"কেন নবনি, আমার হাতের সেবা নেয়াও কি তোমার মানা—পাপ হবে?"

কিরণের সত্যিকার আন্তরিক কথাটার সব গুরুত্ব লঘু ক'রে দেবার জন্যেই—"যা তুই কেবলি যাই তাই বলিস" জবাব দিয়ে ন'ব্‌নে সোজা, সরল কথায় কিরণকে জিগ্‌গেষ ক'র্‌লো—"তোর নাওয়া হয়েছে?"

কিরণের পুষ্ট নিটোল পিঠের ওপর দিয়ে, তার সে দ্রাক্ষারঙের হালকা সাড়ীখানার গায় গায় ঈষৎ আর্দ্র মুক্ত চুলের গোছা—এলিয়ে ছড়িয়ে দে'য়া ছিল। সে এক গোছা চুল পিঠের ওপর থেকে টেনে এনে দেখিয়ে ব'ল্ল—"তা'কি দেখ্‌ছ না?"

"দেখিছি;—খেয়েছিস কিছু?"

"খেয়িছি।"

"বেশ ক'রেছিস্—এইবার যা রাত জেগে এসেছিস একটু ঘুমোগে—আমি চট ক'রে রান্না ক'রে নি"—

কথা শেষ না হ'তেই কিরণ কল হাসি হেসে উঠে একটুখানি শ্লেষ ক'রেই ব'ল্ল—"তবু তো তোমায়—রাঁধুনী ব'লে পেলাম—এ ভাগ্যিও আমার বড় কম নয় !"

ন'ব্নে এ কথার একটা জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না—কিরণ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ব্র্যাকেটের ওপর থেকে গামছা একখানা পেড়ে এনে ন'ব্নের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ব'ল্ল—"যাও নেয়ে এস—রান্নার ব্যবস্থা যা হয় দেখা যাবে।" কিরণ হাত ধ'রে টেনে জোর ক'রেই ন'ব্নেকে নাইতে পাঠিয়ে দিলে। ন'ব্নে যেন মন্ত্র শক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। একটুও আপত্তি ক'রতে পারলে না। স্নান সেরে ফিরে এসে দেখে—আসন পেতে জায়গা করা হ'য়েছে—গেলাসে জল সরপোষ দিয়ে ঢাকা।

কিরণ সেখানে নেই। ন'ব্নে খুসী হ'য়ে ভাব্লো—"কিরণ দেখ্‌ছি সব জোগাড় ক'রেই রেখেছে।"

ন'ব্নে ডাক্বার আগেই কিরণ ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকে ব'ল্লো—"খেতে ব'স নবনী।"

"খুব মেয়ে তুই কিরণ,—সব তৈরি করে রেখেছিলি ?" ব'লে ন'ব্নে আজও সেই কিশোর কালের সরল হাসি হেসে খেতে বস্লো।

কিরণ বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ওপর থেকে সাড়ীর আঁচলখানা টেনে নামিয়ে আসনের সাম্নে জায়গাটা পুঁছে দিয়ে থালা রাখ্লো। ন'ব্নে বাধা দেবারও সময় পেলে না। ছুটে গিয়ে আর এক থালায় সাজিয়ে বাটী ভরা ডাল তরকারী নিয়ে এসে এ পাশে ও পাশে বাটীগুলো সব নামিয়ে রেখে—আবার গিয়ে একখানা পাখা নিয়ে ন'ব্নের পাশে এসে ব'স্লো।

ন'ব্নে ব'ল্লো—"ওঃ আবার কীরে ?—আমার খাওয়া তাই আবার হাওয়া ক'র্তে হবে।"

"হবে বই কি একটুখানি ;—কেন তুমি কি মানুষ নও ?—তোমার কেউ নেই ব'লে কি তুমি কেউ-ই নও ?"

ঠাট্টার মতন ক'রে একটুখানি হেসে ন'ব্নে ব'ল্‌লো—"আমার বুঝি তুই আছিস ?—হ'লই না হয় সে কথা ! কিন্তু তুই-ই যে আমার অতিথি আমি তো তোর বাড়ী আসিনি !"

"কিন্তু আমি মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষ যেথানেই থাক—এই তার কাজ !—তা সে কারা হোক আর না হোক।" ব'লে কিরণ আস্তে আস্তে হাওয়া দিতে লাগ্‌লো। নব্নে খাওয়া শেষ করে হাত তুল্‌তে যাচ্ছিল, কিরণ বাধা দিয়ে বল্‌লো ;—"ও মাছখানা খাও।"

ন'ব্নে জবাব দিল—"তুই তা হ'লে খুসী হবি ?"

"খুব খুসী হব।"

"আচ্ছা খাচ্ছি। কিন্তু এত সব কি করে রেঁধেছিস—এ সব পেলি কোথায় ?"

"রান্নাঘরে সবই প্রায় ছিল—কি আর এমন বেশী ক'রেছি ?—মাছটা শুধু দারোয়ানকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলাম।"

আর একখানা মাছ বাটী থে:ক তুলে নিয়ে—ন'ব্নে বল্ল—"সাহেব যাবার সময় ভাগ্যিস্ বামুনঠাকুরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন—তাই অনেক দিন পরে তোর হাতে আজ দেশের রান্না খেতে পেলাম।"

"বেশ তৃপ্তি হ'ল—নবনি ?"

"পরম তৃপ্তি হ'ল কিরণ, সত্যি ব'ল্‌ছি।

"আমারও সত্যি গর্ব্ব হ'চ্ছে তবু খাইয়ে তোমায় তৃপ্তি দিতে পেরেছি।"

ক্রমশঃ—

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সমর্পণ।

দুটি ক্ষুদ্র আঁখি মোর তাঁরি পানে চেয়ে,
দুটি ক্ষুদ্র কর্ণ কথা শুনিবারে তাঁর;
দুটি ক্ষুদ্র পদে চলি তাঁরি পথ বেয়ে,
দুটি ক্ষুদ্র হস্তে ন্যস্ত তাঁরি কার্য্যভার।
ক্ষুদ্র রসনাতে ব্যক্ত হয় তাঁর নাম,
এ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি তাঁহারি আসন;
হে মূর্ত্ত গোপাল! লহ—ইথে কিবা কাম্—
আমার সকল-কিছু ভূষণ-ভাষণ!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

চা'র পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা।

আমরা ব্যবসায়ের মূলনীতিগুলি জানি না এবং বুঝি না, তাই আমাদের সকল বিষয়েই অবনতি। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া 'চা'এর চাষ করিল, 'চা'এর প্রচলন করিল, এবং বিস্তৃত 'চা'এর ব্যবসায়ে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্বাপর কিছু বিবেচনা না করিয়া আমরা অমনি অনুকরণ করিয়া ফেলিলাম। দেশের ধনীরা অনেক অর্থ 'চা'এর চাষে নিযুক্ত করিলেন। সকলেই এক দিকে ছুটিলাম! উপকারিতার দিক দিয়া 'চা'এর চেয়ে অনেক আবশ্যক এবং

বেশী উপকারী জিনিষ আছে; কিন্তু প্রচারাভাবে তাহারা 'চা'এর মত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এত অধিকার বিস্তার করিয়া নিজকে প্রসারিত করিতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ আমরা একটি জিনিষের উল্লেখ করিতেছি,—ইহা অশ্বগন্ধা। 'চা'এর মত ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইতে পারি। যথেষ্ট প্রচার হইলে ইহা 'চা'এর চেয়েও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অধিক অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। দেশের ধনীগণ ও দেশের শিক্ষিত 'বেকারগণ' যদি ইহার জন্য একটু চিন্তা করেন, তবে ইহার চাষের দ্বারা একটি নূতন আয়ের পথ খোলা যাইতে পারে। 'ভৈষজ্যপরিচয়' পুস্তকের মতে অশ্বগন্ধা বলকারক, রসায়ন এবং শুক্রবৃদ্ধিকর। ইহাতে পরিপাক শক্তি বাড়ায়, মেধা বৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের দৌর্ব্বল্য নাশ করে, শরীরের মধ্যে উত্তাপ আনয়ন করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উদ্ভিদশাস্ত্র বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থে ইহার মাদকতা গুণেরও বর্ণনা দেখিতে পাই। কবিরাজেরা অশ্বগন্ধার শিকড় এবং অভাবে শাখা হইতে নানাবিধ ঘৃত ও রসায়ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সেগুলিও খুব মূল্যবান ঔষধ। 'চা'এর মত ইহারও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াকে দ্রুততর করিবার, আলস্য ও ক্লান্তি দূর করিয়া নবোদ্যম আনিয়া দিবার ক্ষমতা আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় ইহার পাতা 'চা'এর মত শুকাইয়া পরীক্ষার্থ কলিকাতা মেডিকাল কলেজের এবং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কেমিকাল এক্‌জামিনার বা রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার মেজর সি এইচ বমফোর্ড, ডি এস এম্ ডি, আই এম এস, সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, 'চা' এবং অশ্বগন্ধার মধ্যে উপাদানগুলি একই, অধিকন্তু অশ্বগন্ধায় 'ক্যানেলিন' নামক একটি উপাদান আছে, 'চা'এ যাহা নাই। প্রবোধবাবু নিজে 'চাএর' মত অশ্বগন্ধা পাতা-সিদ্ধ-জল নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন, 'চা' পান করিয়া ক্ষুধামান্দ্য হয়, আহারে রুচি থাকে না, পরিপাক শক্তির অভাব হেতু শীঘ্র ভুক্ত সামগ্রী হজম হয় না, এবং ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অশ্বগন্ধা 'চা'এর মত পান করিলে এ সকল দোষ ঘটে না, বরং তদ্দ্বারা শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা নষ্ট হয়, এবং শরীরকে বলিষ্ঠ ও নীরোগ করে। 'চা'এর মত ইহাও শরীরের মধ্যে উত্তাপ আনয়ন করিয়া কার্য্যে উৎসাহ জন্মায়। পূর্ব্বে বিষম 'চা'পায়ী ছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা-পায়ী হইয়া প্রভূত উপকার পাইয়াছেন এমন অনেক লোক আছেন। ইহাতে ক্ষুধা

ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রবোধবাবু তাঁহার পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইহাতে 'চা'এর সমস্ত গুণই পাইয়াছেন, দোষগুলি পান নাই, আর অশ্বগন্ধার অনেক গুণও বেশী করিয়া পাইয়াছেন। অশ্বগন্ধার গন্ধও 'চা'এর গন্ধ হইতে অধিক রুচিকর। যথারীতি 'চা'এর মত দুগ্ধসহ ইহার ব্যবহার চলে। ইহার আস্বাদ 'চা'এর চেয়ে মিষ্ট, সুতরাং সুস্বাদুও বটে। তিনি নিজে ব্যবহার করিবার পর ইহার ফলাফল সম্বন্ধে "আয়ুর্ব্বেদীয় চা" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

কৃষক।

শোক-সংবাদ

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ।

উত্তর-বঙ্গের আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানীর বংশোজ্জ্বলকারী মহাপ্রাণ জগদিন্দ্রনাথ বিগত ২১শে পৌষ মঙ্গলবার ৫৮ বৎসর বয়সে অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার কুলগৌরবে তিনি কেবল বড় লোক নন, এরূপ বহুগুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন যে যদি তিনি দরিদ্র গৃহেও জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও আজ তাঁহার গুণগরীমায় তাঁহার অভাবে উত্তরবঙ্গে তুল্য হাহাকার উত্থিত হইত। তিান ছিলেন অতি কোমল স্নেহপ্রবণ প্রাণ,—দানে ছিলেন মুক্তহস্ত,—চিরজ্ঞানপিপাসু। কি সাহিত্য চর্চ্চা, কি সঙ্গীত-সঙ্গত সাধনায়, কি ব্যায়াম চর্চ্চায়, শিল্পকলার উন্নতি সাধনে মহারাজা ছিলেন অদম্য উৎসাহী। তাঁহার ভাষা ছিল শব্দ সম্ভারে ঐশ্বর্য্যবতী, লালিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ঝঙ্কারে শ্রুতিমনমোহিনী। তাঁহার 'নূরজাহান', 'সন্ধ্যাতারা', 'জীবনস্মৃতি' প্রভৃতি এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে। আধুনিক এই ভাষারবিপ্লবযুগে জগদিন্দ্রনাথ রক্ষা করিয়াছিলেন

সেই সুসংস্কৃত পুরাতন রচনার ধারা। তিনি ছিলেন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অন্যতম কর্ণধার, মানসীর বৈশিষ্ট্যতা তাঁহার সাহিত্য সাধনার পরিচয় দিবে। তিনি ছিলেন কবি, লেখক দার্শনিক, ও সুবাদক। অনন্য কর্ম্মী পুরুষ যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাতে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন; কোন কাজকেই ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলা করিতেন না। আরব্ধ কার্য্যের সাফল্যের জন্য সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। অনেকবার তাঁহাকে অনেক সভায় সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে; এই সকল উপলক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা রচনা করিয়াছেন তাহা বহু পরিশ্রম করিয়া লিখিতেন ও সেগুলি এমন সুন্দর, যে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। প্রত্যেক কাজটির খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত তিনি যত্ন করিয়া করিতেন এবং করাইতেন। এমন কি খেলিতে গিয়া তিনি যেরূপ অধ্যবসায় ও মনোযোগ দেখাইতেন তাহাতে সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। তাঁহার ক্রিকেট পার্টি ভারতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। খেলা যে শুধু খেলা নয় তাহাতেও যে বিমল আনন্দ নিহিত আছে, সাধনায় তাহাতে অতুল আনন্দ লাভ করা যায় তাহা মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ও আমাদের চিরপ্রিয় পুণ্যস্মৃতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ছোট ছেলেদের মহারাজ বড় স্নেহ করিতেন এবং কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ-আশাস্থল বালকগণ মানুষ হইতে পারে সে চিন্তা তিনি করিতেন। নাটোর মহারাজ স্কুল, ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট তাঁহার এই আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিচয় দিবে। তিনি রাণী-ভবানীস্কুলের কেবলমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না; প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকরূপে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহে দুইবার করিয়া এই স্কুলের ছাত্র পড়াইতেন। নিজের শত অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া এরূপভাবে কখনও কোন মহারাজা সাধারণ শিক্ষকের মত কার্য্য করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। এই সময়ে তিনি অন্যান্য শিক্ষকের মত স্কুলের নিয়মকানুন মান্য করিয়া চলিতেন ও কোন দিন কোন কারণে স্কুলে উপস্থিত হইতে না পরিলে প্রধান শিক্ষকের নিকট যথারীতি আবেদন করিয়া ছুটী লইতেন। পৃষ্ঠপোষকের অভিমান তখন তাঁহার ছিল না। তিনি কাব্য রসের রসিক, কবিতার ব্যাখ্যা করিতেন অতি সুন্দর; সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রগাঢ় ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে ও বর্ত্তমান যুগের কাব্যে ছিল তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি। সুন্দর সুন্দর কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; তাঁহার আবৃত্তি যে একবার শুনিয়াছে সে তাহা জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

তাঁহার গুণ অশেষ ছিল,—তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহার ছিল তিনিই জানেন—মহারাজ কেবল বিপুল জমীদারীর অধীশ্বর ছিলেন না—তিনি ছিলেন হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্য্যে ধনী। ধনী দরিদ্র উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য ব্যবহার লাভ করিত। তিনি এরূপ সুন্দর আলাপ করিতে পারিতেন যে শ্রোতা তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া বিস্মৃত হইত যে অত বড় সম্মানী লোকের সম্মুখে সে উপস্থিত। বক্তার ব্যবহারে, আকিঞ্চনে, আলাপে সুরসিকতার তাহার মনে হইত তিনি যেন আমাদেরই একজন পরম আত্মীয়। তিনি ছিলেন অতিশয় বন্ধু-বৎসল। মহারাজা ও আমাদের কুচবেহারের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব ৺জগবল্লভ বাবু ছিলেন আবাল্য সমপাঠী। মহারাজা যখন কুচবিহারে আগমন করেন তখন ইঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হইয়াছে যে তাঁহারা তখনও যেন বালকই আছেন,—সংসারের আবিল্য ইঁহাদের বাল্যের নির্ম্মল বন্ধুতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

সর্ব্বস্থানে, সকলের সহিতই তাঁহার ব্যবহার ছিল—প্রাণমনমোহিতকারী; তাই আজ তাঁহার অভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে এরূপ হাহাকার—তর্পণাশ্রু! সকলের মুখেই এক কথা—আজ মহারাজার অভাবে বঙ্গ একজন ধনী হারায় নাই—সর্ব্বগুণান্বিত একটি মানুষের মত মানুষ হারাইয়া হাহাকার করিতেছে!

লর্ড কারমাইকেল।

বিগত ১৬ই জানুয়ারী রাত্রিকালে লণ্ডন মহানগরীতে বঙ্গের প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমাদের রাজপরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন,—স্বর্গীয় মহারাজা ভূপ বাহাদুর-ভ্রাতৃদ্বয়কে তিনি আত্মীয়ের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কোচবিহারে তিনি একাধিকবার আগমন করিয়াছেন,—স্থানীয় সরকারী চিকিৎসালয়ের একটি বিভাগ তাঁহার নামে অভিহিত হইয়া তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে,—শাসকরূপে নহে বন্ধুরূপে! ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

'বড়দাদা'—দ্বিজেন্দ্রনাথ।

৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার প্রত্যুষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৮৭ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মহাপ্রাণ পিতার উপযুক্ত সন্তান। শেষ জীবনে তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে নির্জ্জনবাসে ভগবৎ চিন্তায় রত ছিলেন। তিনি আজীবন সাহিত্যসেবী এবং এ বয়সেও সাহিত্য, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা নিরত ছিলেন, অতি সরল ভাষায় তিনি জটীল দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্বনামধন্য পুরুষ, কর্ম্মান্তে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। শান্তিময়ের ক্রোড়ে পুণ্যাত্মা মহাশান্তি লাভ করুন।

প্রিয়নাথ দত্ত।

আমাদের চিরপ্রিয় ভূতপূর্ব জজ প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তিনি বিগত ৮ই জানুয়ারী গতাসু হইয়াছেন। দত্ত মহাশয় বহুগুণে বিভূষিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিসে এই রাজ্যে তিনি ১৮৭২ খৃ অব্দে বিচার-বিভাগে নিযুক্ত হন। গুণদর্শী ঈশ্বরচন্দ্র সুপারিস-পত্রে লিখিয়াছিলেন—"একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাঠাইতেছি।" কার্য্যতও তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছিলেন, আলোক ও উষ্ণতা উভই ইঁহাতে দৃষ্ট হইত অথচ ইঁহার ব্যবহার ছিল মধুর, ইনি অতি নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ১৯১০ খৃঃ অব্দে ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু কোচবিহার রাজ্যে ইঁহার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। ভগবান সদনে আমরা ইঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি

নারীকুলরত্ন সরোজনলিনী দত্তের নাম শিক্ষিত সমাজে অনেকেরই পরিচিত। তিনি, শ্রদ্ধা-ভাজন শ্রীযুক্ত বি দে, আই সি এস (অবসর প্রাপ্ত) মহাশয়ের কন্যা এবং স্বদেশের উন্নতিকামী

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহোদয়ের সহধর্ম্মিনী ছিলেন। মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল, কিন্তু হায়, গত বৎসর ১৯শে জানুয়ারী, বহু লোকহিতকর আরব্ধ-কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া অকস্মাৎ অকালে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে দত্তজায়া পরপারে চলিয়া গেলেন। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নারী ও শিশুমঙ্গল সমিতি, ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষার কেন্দ্র, গৃহশিল্পের পুনপ্রতিষ্ঠা, নারীজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুব্যবস্থা,—একবাক্যে বঙ্গীয় নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান এই স্বর্গগতা মহীয়সী মহিলার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ইহার উন্নতিকল্পে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহার এই আত্মাহুতি নিরর্থক হয় নাই। কর্ম্মীর অদম্য চেষ্টা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, চরিত্রবল, সর্ব্বোপরি অমায়িক ও বন্ধুজনোচিত সুমধুর ব্যবহার বঙ্গনারীর প্রাণে যে বিমল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া গিয়াছে, পরহিতৈষণার মাধুর্য্যে, নবরাগরঞ্জিত আলোক-সম্পাতে হৃদয়ে হৃদয়ে যে উন্মেষের ব্যাকুলতা,—অনুভূতি সাড়া দিয়া গিয়াছে তাহা নিরর্থক হয় নাই—নারীমঙ্গল সমিতি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন,—কৃতজ্ঞ বঙ্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি—স্মৃতিতর্পণ! আশা হয় দত্তজায়ার রোপিত যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, কালে তাহা মহা মহিরুহে পরিণত হইয়া বঙ্গে আবার শান্তি-ছায়া প্রদানে সমর্থ হইবে। অল্পকাল মধ্যেই এই সমিতি কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, বহু স্থানে ইহার শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কর্ম্ম গণ্ডি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। বিগত ১৯শে জানুয়ারী এই সমিতির প্রথম বাৎসরিক সভা, মহানগরী কলিকাতায় ইউনিভারসিটি ইন্‌সটিটিউটে ময়ূরভঞ্জের মাতা মহারাণী শ্রীযুক্তা সুরুচি দেবীর সভানেত্রীত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও প্রথিতনাম্না মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সমিতির সুযোগ্য সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, মহাশয়া সমিতির বাৎসরিক কর্ম্মপরিচয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। সমিতির কর্ম্মীরা আলোচ্যবর্ষে নারীজাতির উন্নতিকল্পে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে শিক্ষিতা ধাত্রী,—মহিলা শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া সমিতির কার্য্যের প্রসার ও সাফল্য দানের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু মহাশয়ার সম্পাদকতায় সমিতির মুখপত্র স্বরূপ 'বঙ্গ লক্ষ্মী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে, আমরা তাহা উপহার প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। পত্রিকাখানি

সার্থকনামা—সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের সম্পূর্ণ অনুকূল—প্রবন্ধগুলি প্রাঞ্জল ও সুলিখিত—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গ লক্ষ্মীকে' সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"লক্ষ্মী, তুমি এসো এসো,
আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে
পুণ্য দীপ জ্বালো॥
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা,
আলো নিত্য জ্বালো॥
এসো শুভ লগ্ন বেয়ে, এসো হে কল্যাণী!
শুভ সুপ্তি, শুভ জাগরণ দেহ আনি।
দুঃখ রাতে মাতৃ বেশে
জেগে থাকা নির্নিমেষে,
আনন্দ উৎসবে, তব
শুভ্র হাসি ঢালো॥"

কবির সহিত আমরাও প্রার্থনা করি—

দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে
পুণ্য দীপ জ্বালো—

বঙ্গের এ শুভ অনুষ্ঠান সফল হউক—সার্থক হউক—আশীর্ব্বাদ কর দেবতা।

তাসের ইতিহাস।

এখন আমাদের দেশে যে সকল তাসের আমদানী হয় তাহার মোড়কের উপর স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকে—"Great Mogul Cards",—এইজন্য কোন কোন পণ্ডিতের মত—"মোগলেরাই ভারতবর্ষে তাস আনিয়াছে।" কিন্তু ঐ এক "গ্রেট মোগল কার্ডস্" ছাড়া মোগলেরা যে তাসের সৃষ্টিকর্ত্তা ইহার আর কোনও প্রমাণ নাই।

মিশরবাসীরা পূর্ব্বে জ্যোতিষ শাস্ত্রের খুব আলোচনা করিতেন। বৎসরে যে ৫২টি সপ্তাহ থাকে এ গণনা প্রথমে মিশরবাসীরাই করিয়াছিলেন। আমরা যেমন বৎসরকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ছয়টি ঋতুর নামে এক এক ভাগের নামকরণ করিয়াছি, মিশরবাসীরা তেমনি বৎসরকে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

অনেকের বিশ্বাস ৫২ সপ্তাহের অনুকরণে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনার সুবিধার জন্য মিশরবাসীরাই প্রথমে ৫২ সংখ্যক তাসের সৃষ্টি করেন শেষে ১৩খানি করিয়া ৪ ভাগে ৪ ঋতুর অনুকরণে—চারিবর্ণে তাসগুলিকে ভাগ করিয়া দেন।

কেহ কেহ বলেন, তাসের জন্ম চীনদেশে। "চিংসিটং" নামক অভিধানে তাসের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি প্রমাণ, ১১২০ খৃষ্টাব্দে 'সিং-হো' নামক রাজা চীনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই রাজা এতদূর ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন যে ৫২টী উপপত্নী লইয়া তিনি প্রমোদভবনে কালাতিপাত করিতেন। এই বাহান্ন সুন্দরীর চিত্তবিনোদনার্থে এক রসিক চৈনিক শিল্পী এই তাসখেলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ফরাসীরা গর্ব্ব করিয়া বলেন, ফ্রান্স দেশেই তাসের জন্ম। ফরাসীর প্রমাণ—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তাসে "fleur-de-less" নামটী লেখা আছে। এই নামটী তাসনির্ম্মাতার নাম, এবং এই নির্ম্মাতা জাতীতে ফরাসী। ফরাসীদের প্রমাণ কিন্তু ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতের রয়াল এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রদর্শনী-গৃহে সহস্র বৎসরের পুরাতন একজোড়া তাস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই তাসে ফরাসীদের নাম গন্ধ কিছুই নাই।

আরবেরা বলেন, আমরাই তাসখেলা বাহির করিয়াছি। স্পেন বলেন, ওকথা কাজের কথা নয়, তাসখেলা আমাদের আবিষ্কার। আপনার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য জার্ম্মানীও বলেন, আমরাই প্রথমে তাসখেলা প্রচার করিয়াছি। অবশ্য আপনার মতকে দৃঢ় করিবার জন্য ইহারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

সকল সভ্য দেশই তাস খেলাকে আপনাদের আবিষ্কার বলিতে চাহেন। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, ভারতই তাসের জন্ম স্থান। তবে এখন যে আকারে তাস খেলা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখন তাস খেলার এমন রূপান্তর হইয়াছে যে তাস খেলা যে একদিন আমাদেরই জিনিষ ছিল তাহা আর চিনিতে পারা যায় না।

স্পেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ইহারা সকলেই তাস খেলাকে নিজস্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু দুখের বিষয়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ের পূর্ব্বে এ সকল দেশে তাস খেলার প্রচলনই ছিল না। ইংরাজী বা ফরাসী ভাষার নাটক নভেল পড়িলে বুঝিতে পারা যায় একাদশ, দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন পুস্তকেই তাসের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না।

কি বিদ্যায়, কি সভ্যতায়, তখন য়ুরোপের মধ্যে ইটালীই সকলের অগ্রণী। এই ইটালীর একজন লেখক বলেন,—১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে, ভিটার্বো নগরের একজন অধিবাসী, সারাসিনদের কাছে প্রথম তাস খেলা শিক্ষা করেন। তখন তাসের নাম ছিল—"নাইব"। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীতের তাসের খুব প্রতিপত্তি হয়। সে সময় চারিবর্ণের তাসের চিহ্ন স্বতন্ত্র রকমের ছিল। কোন তাস তরবারী, কোন তাস গদা, কোন তাস পিয়ালা এবং কোন তাস মুদ্রার চিত্রে চিহ্নিত হইত। এখনও ইটালীর অনেক স্থানে এই ধরণের তাস প্রচলিত আছে। এই সকল কারণে ইটালী বলেন,—আমাদের কাছেই অন্যান্য জাতি তাস খেলা শিখিয়াছে।

কিন্তু গর্ব্বিত স্পেন এ কথা মানিতে একেবারেই প্রস্তুত নহেন। স্পেন বলেন,—আমি তাস খেলার গুরু। বলা বাহুল্য, স্পেনের এ গর্ব্ব নিরর্থক নহে। "Primero" "Quadrille" "Spadille" প্রভৃতি তাস খেলার নামগুলি স্পেন দেশের। এই "Primero" খেলাই এক সময় স্পেনের সর্ব্বপ্রধান খেলা ছিল। শুধু স্পেন কেন, প্রেমারা খেলাকে সকলেই তাসের প্রধান খেলা বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান প্রচলিত তাসের রং ও তাসের চিত্র, স্পেনের

নিকট হইতেই লওয়া হইয়াছে। আমরা যাহাকে "ইস্কাপন" বলি, তাহার মূর্ত্তি বিলাতী খোন্তা বিশেষের অগ্র ভাগের ন্যায়, এই জন্য ইংরাজেরা ইস্কাপনকে Spade বলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্পেন দেশবাসীরাই ইস্কাপনের নামকরণ করেন। ইস্কাপনের মূর্ত্তি স্পেনের Espada নামক অস্ত্র ফলকের ন্যায়। ইস্কাপনের চিত্র আমরা স্পেনের নিকট হইতে শিখিয়াছি। এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। স্পেন দেশে তাস খেলার খুব উন্নতি হইয়াছিল। এক সময় স্পেনের আবালবৃদ্ধবনিতা তাসের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাস খেলা পাইলে তাহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। নরনারীর অধঃপতন দেখিয়া, কর্ম্মনাশা তাস খেলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজা প্রথম জন্ এক গুরুতর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া দেশবাসীকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করেন। এহেন তাসপ্রিয় স্পেনও প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা মুরদিগের নিকটে তাস খেলার কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন।

ফ্রান্স বলেন,—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ফ্রান্স অধিপতি ৬ষ্ঠ চার্লস মানসিক বিকারে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, তখন রাজার চিত্তবিনোদের জন্য কোন ফরাসী শিল্পী তাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ তাস খেলার সাহায্যে রাজাকে নাকি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ কথা বিশ্বাস হয় না, কেন না সম্রাট চার্লসের বহুপূর্ব্বে ফরাসী দেশে তাস খেলার প্রচলন ছিল। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত প্রোভেন্স নগরীর বিবরণীর মধ্যে তাস খেলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময় ফ্রান্সের অনেকেই তাস ক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তাসের গোলামের নাম তখন Tuchim নামে অভিহিত হইত। Tuchim একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত ছিল, তাহাকে সকলেই ভয় করিত। এই ডাকাতের নামে ফরাসীরা তখন গোলামের নামকরণ করিয়াছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত ল্যানকেবো প্রমাণ করিয়াছেন, চার্লস্ রাজার শাসন কালের পূর্ব্বেও ফরাসীরা তাস খেলিতে ভাল বাসিতেন। তবে তাসের চিত্রগুলি খেলোয়াড়দের খেয়ালানুযায়ী বদল করা হইত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে তাসের যে চিত্র ছিল তাহাতে দেখা যায়, ইস্কাপনের রাজা—ডেভিড্, রাণী—জোয়ান অফ্ আর্ক, গোলাম—অনার। হরতনের রাজা—সলোমন, রাণী—জুড়ি, গোলাম—লায়ার। চিড়িতনের রাজা—আলেকজাণ্ডার, রাণী—আর্জিনী, গোলাম—লনসেণ্ট। রুইতনের রাজা—সিজার, রাণী—রাসেল, গোলাম—হেক্টর।

ফরাসীরা যে তাস খেলার কত রকম চিত্র ব্যবহার করিতেন তাহা পম্পাট সাহেবের হিসাবের খাতা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রাজার আদেশে চিত্রকর তাসের চিত্র পরিবর্ত্তন করিত। জ্যাক কুমারনিন নামে ফরাসী দেশে এক বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। তাস চিত্রাঙ্কনের জন্য রাজ কোষাধ্যক্ষ এই চিত্রকরকে বহু অর্থ প্রদান করিতেন। নূতন নূতন চিত্র অঙ্কিত করিয়া ইনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন।

এক সময় ফরাসী দেশেও তাস খেলা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাসীর বিলাস কুঞ্জে তাস সমাদরের সহিত স্থান পাইয়াছিল। তাস খেলায় দেশের অধঃপতন হইতেছে দেখিয়া প্যারিসের একজন প্রধান বিচারক কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া খেলা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্পেনের নিকট হইতে আমরা যেমন ইস্কাপনের চিত্র শিক্ষা করিয়াছি, ফরাসীদের নিকট হইতে তেমনি চিড়িতনের মূর্ত্তিটি পাইয়াছি। ফরাসীরাই প্রথমে চিড়িতনকে Treflo অর্থাৎ ত্রিপত্রের আকারে অঙ্কিত করেন।

যে সময়ে ফ্রান্সে তাস খেলার খুব প্রতিপত্তি সে সময়ে জার্ম্মনীরাও তাসের আদর করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রথমে চারিবর্ণের তাসকে মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদের আকারে চিত্রিত করিতেন। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত চিত্র সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া তাসকে তাঁহারা হৃদয়, ঘণ্টা, বৃক্ষপত্র এবং ওক ফলের আকারে অঙ্কিত করেন। জার্ম্মানীর অঙ্কিত চারিবর্ণের তাসের নাম—Schellen, Hertzen, Grion & Eichelu. এই হার্টজন হইতে আমরা হরতনের চিত্র শিক্ষা করিয়াছি। আমরা যাহাকে হরতন বলি, ইংরাজেরা তাহাকে Hearts বলেন। বাস্তবিক হরতনের আকার হৃদয়ের গঠনের মত। সুতরাং অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, আমরা জার্ম্মানীর নিকট হইতে হরতনের চিত্র অঙ্কিত করিতে শিখিয়াছি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে জার্ম্মানীতে অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল কারখানায় কেবল তাস প্রস্তুত হইত। জার্ম্মান বণিকগণ সেই সকল তাস নানা দিগ্ দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেন।

ইংলণ্ডে যখন তাস খেলা প্রবেশ লাভ করে, ইংরাজেরা তখন ভিন্ন দেশীয় তাস লইয়া ক্রীড়া করিতেন। তাহার পর তাসের পসার জাঁকিয়া উঠিলে, তাঁহারা স্বদেশে তাস প্রস্তুত করিবার

সঙ্কল্প করেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়, ইংরাজেরা তাস প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে যথেষ্ঠ তাসের আমদানী হইত। কাজেই দেশীয় কারিকরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। শেষে, কারিকরগণ সকলে মিলিয়া রাজার কাছে এক দরখাস্ত করিলেন, দরখাস্তের মর্ম্ম—"বিদেশের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।"

ষষ্ঠ এডওয়ার্ড তখন ইংলণ্ডের অধীশ্বর। ইংরাজের প্রধান গুণ স্বজাতিবাৎসল্য ও দেশাত্মবোধ। প্রজার কাতর প্রার্থনায় রাজা তাসের আমদানী রহিত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। কিন্তু সে আদেশে আমদানী একেবারে বন্ধ হইল না, তবে অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। ইংলণ্ডের কারিকরেরা তখনও ভাল তাস প্রস্তুত করিতে পারিত না, এইজন্য সৌখিন ধনকুবেরের বংশধরগণ গোপনে ফ্রান্স হইতে তাস আনাইয়া তাঁহাদের সখ মিটাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুদিন কাটিল। রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। দেশে তখন তাসের খুব আদর অথচ দেশের লোকে ভাল তাস প্রস্তুত করিতে জানে না। কাজেই বিদেশ হইতে তাস না আনিলে চলে না। এলিজাবেথ বিদেশ হইতে তাস আমদানী করিবার অনুমতি দিলেন। রাণীর হুকুম, বিদেশের তাসে ইংলণ্ড ছাইয়া পড়িল। দেশীয় কারিকরেরা রাণীর চরণে কাঁদিয়া পড়িল কিন্তু, তাহাতে কোনও ফলই ফলিল না। পূর্ব্ববৎ অবাধে বিদেশ হইতে তাসের আমদানী হইতে লাগিল।

ইহার পর ১ম জেম্‌স ইংলণ্ডের ভাগ্যবিধাতা হইলেন। ইংলণ্ডের তাস প্রস্তুতকারকগণ ভূপতিকে মর্ম্মব্যথা জানাইল। রাজা ফাঁপরে পড়িলেন। একদিকে দেশের ধনীগণ বিদেশী তাসের প্রতি অনুরক্ত, অন্যদিকে দরিদ্র কারিকরগণ বিদেশী তাসের আমদানীতে উদরান্নের জন্য লালায়িত; এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া রাজা এক উপায় করিলেন। বিদেশ হইতে আমদানী তাসের উপর অধিক হারে মাশুল নির্দ্ধারিত হইল। আমদানীর অবাধ স্রোত অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। রাজা দেশীয় কারিকরগণকে উৎকৃষ্ট তাস প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিলেন। উপদেশের ফলে তাহারা প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ভাল ভাল তাস প্রস্তুত করিতে লাগিল। এবং উহার আধিপত্যও বৃদ্ধি হইল।

ইংরাজেরা যে কাহার নিকট হইতে প্রথমে তাস খেলা শিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন পণ্ডিত বলেন, ধর্ম্মযোদ্ধার (Crusader) দল অন্য দেশ হইতে তাস খেলা শিখিয়া

আসিয়া ইংলণ্ডের অধিবাসীগণকে ইহা শিক্ষা দেন! কিন্তু এ কথা যদি সত্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন কবি Chaucer ইহার উল্লেখ করিতেন। Chaucer ধর্ম্মযোদ্ধাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কেবল তাসের কথাই কিছু বলেন নাই। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Chattor মতে ইংরাজেরা ইটালী ও স্পেন হইতে এ খেলা শিক্ষা করিয়াছেন। বরং ইহা যুক্তিযুক্ত কথা। তবে ইটালী ও স্পেনের কাছে শিক্ষা করিলেও ইংরাজেরা যে তাসের বর্ণ ও চিত্রের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা তাসের যে চিত্রকে রুইতন নামে অভিহিত করি, সে চিত্র ইংরাজেরাই আবিষ্কার করিয়াছেন। রুইতনকে ইংরাজেরা বলেন—Diamond বাস্তবিক রুইতনের আকারও হীরকাকৃতি সদৃশ।

এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে, এখন আমরা যে তাস ব্যবহার করিতেছি, তাহা আমরা চারি জাতির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। স্পেনের নিকট হইতে আমরা ইস্কাপনের মূর্ত্তি আঁকিতে শিখিয়াছি, ফ্রান্সের নিকট হইতে চিড়িতন, জার্ম্মানীর নিকট হইতে রুইতনের চিত্র শিখিয়াছি।

হরতন, ইস্কাপন, চিড়িতন ও রুইতন—তাসের এই চারিবর্ণের চিত্রে সমাজের চারিটী সম্প্রদায়কে বুঝায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ অভিমত দেখিতে পাওয়া যায়। হরতনের অর্থ—ধর্ম্ম যাজক সম্প্রদায়। পূর্ব্বে ইটালীবাসিগণ হরতনকে "পিয়ালার" আকারে এবং স্পেনবাসিগণ "কমণ্ডলুর" আকারে অঙ্কিত করিতেন। ইহার পর ফ্রান্স ও জারর্ম্মানী হৃদ্‌যন্ত্রের আদর্শে হরতনের চিত্র অঙ্কিত করেন। কমণ্ডলু ধর্ম্মযাজকগণের সম্পত্তি, আর হৃদয়গত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মযাজক হওয়া যায় না. এই রহস্য বুঝিবার জন্যই কমণ্ডলু বা হৃদ্‌যন্ত্রের আকারে হরতনের চিত্র অঙ্কিত হইত।

ইস্কাপনের অর্থ—যোদ্ধ সম্প্রদায়। ইটালী ও স্পেন প্রথমে তরবারী আকারে ইস্কাপনের চিত্রিত করিতেন। শেষোক্ত দেশে ইস্কাপন এস্ পেড়া নামক অস্ত্রের আকারেও অঙ্কিত হইত। তাহার পর ফ্রান্স এই ইস্কাপনকে বর্ষাফলকের আদর্শে অঙ্কিত করেন। আবার জার্ম্মাণীতে ঘণ্টার আকারে ইস্কাপন চিত্রিত হইত। প্রাচীন কালে জার্ম্মান যোদ্ধগণ যুদ্ধের পোষাকে ঘণ্টা গাঁথিয়া পরিতেন। সেই আদর্শে তখন ইস্কাপনের চিত্র অঙ্কিত হইত, এই সব যোদ্ধ পুরুষের সম্পত্তি, তাই ইস্কাপনের অর্থ যোদ্ধ সম্প্রদায়।

চিড়িতনের অর্থ—বণিক বা কৃষক। ইটালী ও স্পেনে ইহা মুদ্রার আকারে অঙ্কিত হইত। জার্ম্মানীতে ইহার আকার ছিল বৃক্ষপত্রের ন্যায়। জার্ম্মানীর পর ফ্রান্স ইহাকে ত্রিপত্রের আকারে অঙ্কিত করেন, সেই অবধি চিড়িতনের আকারের আর পরিবর্ত্তন হয় নাই।

সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক বুঝাইবার জন্য রুইতনের সৃষ্টি। ইটালী ও স্পেনে ইহা গদা ও কাষ্ঠ খণ্ডের আকারে অঙ্কিত হইত। জার্ম্মানীতে ইহার আকার ছিল এক ফলের মত। আর ফ্রান্সে রুইতনের চিত্র ছিল তীরের অনুরূপ। যাহারা কাষ্ঠজীবী, তীর ধনুক লইয়া যাহারা বনে বনে বেড়ায়, তাহারা নিতান্তই নিম্ন শ্রেণীর লোক। রুইতনের চিত্রে সেই নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরই বুঝাইত।

১৫শ শতাব্দীর প্রথমে জার্ম্মানীতে তাসের "উড্ এন্‌গ্রেভিং" আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে চিত্রকরেরা তুলি দিয়া তাস আঁকিত করিত। সুতরাং একজোড়া তাসের জন্য চিত্রকরকে অনেক পয়সা মুজুরী দিতে হইত। জার্ম্মানীরাই প্রথমে তাসকে উড্ এন্‌গ্রেভিংয়ের সাহায্যে মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন।

যাহারা তাস প্রস্তুত করিত, জার্ম্মানেরা তাহাদিগকে "ব্রিফ্ মেকার" নামে অভিহিত করিতেন। জার্ম্মানেরা যখন প্রথম তাস খেলিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহারা একেবারেই "টেক্কা" ব্যবহার করিতেন না, ৪৮ খানা তাসে খেলা চলিত, ইহারা "দহলা" ব্যবহার করিতেন না। পরে সকল দেশেই ৫২ খানা তাস প্রচলিত হইয়াছিল।

তাস খেলার 'রকম' অনেক আছে। কিন্তু স্পেন দেশে সকল দেশের অপেক্ষা তাস খেলার বাহুল্য লক্ষিত হয়। ইংরাজেরাও অনেক রকম তাস খেলা জানেন। তন্মধ্যে "হুইষ্ট" খেলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই হুইষ্ট খেলা সম্বন্ধে ইংরাজদের দেশে অনেকে অনেক রকম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই খেলা অনেকটা আমাদের "গ্রাবু" খেলার মত। তাস খেলার মধ্যে আর একটী ভয়ঙ্কর খেলা আছে, তাহার নাম Baccarat, ফরাসীরাই প্রথমে এই সর্ব্বনেশে খেলার সৃষ্টি করেন। যাহারা এই খেলা খেলেন তাঁহারা বাজি রাখিয়া থাকেন। হস্ত কৌশলের উপর এই খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করে। এই খেলা খেলিয়া যে য়ুরোপের কতশত ধনকুবের পথের ভিখারী হইয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

অনেকের বিশ্বাস, তাস খেলা ভারতবর্ষেরই খেলা। অনেকেই জানেন, অতি প্রাচীনকালে ভারতে "চতুরঙ্গ" খেলার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। তাস খেলা—চতুরঙ্গ খেলার সহজীকৃত রূপান্তর মাত্র।

হিন্দু সমাজের জাতি ভেদের উপর কটাক্ষ করিয়া বৌদ্ধগণ চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি করেন। ভারতের চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হইতেই চতুরঙ্গের চতুবর্ণ বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল। এই খেলা শেষে এমন সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায় যে, বৌদ্ধগুরু ইহাকে ব্যসনের অন্তর্গত অবিয়া এই খেলা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য এক কঠিন বিধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পারসীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া এই চতুরঙ্গ খেলা শিখিয়া যান। তাঁহারা এই খেলার নাম দেন—চতুরং। আরবেরা পারসীদের নিকটে এই খেলা শিক্ষা করেন। আরবদের অনুকরণ—চতুরঙ্গের নাম "শতরং"এ পরিণত হয়। শতরংকে আমরা আবার "শতরঞ্চ" করিয়া ফেলিয়াছি। শতরঞ্চ খেলা হইতেই যে তাস খেলার সৃষ্টি হইয়াছে ইংরাজেরাও ইহা অস্বীকার করেন না। স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ কৃত এসিয়াটিক রিসার্চ্চাস্ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তবে মোগলদের আমলেই যে এ দেশে তাস খেলার পুনঃ প্রচলন হইয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাস খেলার বর্ত্তমান কৌশল আমরা মোগলদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। এখন ভারতে তাস খেলা যে আকারে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিদেশের আমদানী। এমন কি তাস খেলিতে বসিয়া আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করি সে সকল শব্দও বৈদেশিক। সাহেবের স্থানে রাম, কৃষ্ণ, শিব আঁকিয়া, বিবির—সীতা, রাধা, পার্ব্বতী লিখিয়া গোলামের পদে—হনুমান, গরুড় ও নন্দীকে বসাইয়া আমরা যতই "কদম্বকেলী" করি না কেন—বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত তাস খেলা যে আমরা মোগলের কাছে শিখিয়াছি এ কথা কখনও অস্বীকার করা যায় না।

মোগল সম্রাট আকবর সাহেব রাজত্বের শেষ ভাগে ভারতে তাস খেলার প্রচলন আরম্ভ হয়। জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সময়ে বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে তাস খেলারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। এমন কি সে সময় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে, "প্রমবার আড্ডা" বসিত; সম্রান্ত নাগরিকগণ রাত্রিকালে গোপনে গিয়া সেই সকল আড্ডায় বিহার করিতেন। জয়ের আনন্দে,

কত আমীর ওমরাহের বদনে উল্লাসের বাসন্তী বিলাস শোভা পাইত। পক্ষান্তরে সর্ব্বস্ব খেওয়াইয়া কাহারও নেত্রে কেবল জাগরণজনিত অরুণাভা ফুটিয়া উঠিত। জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সময়ে অন্তঃপুরেও তাসের অবাধগতি প্রসারিত হয়। কিন্তু স্বভাব সরলা সুন্দরীগণ "প্রেমাবার" প্রেম বুঝিতে পারিতেন না, তাই তাঁহাদের জন্য "নক্সা" খেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। নাগর নাগরীর চিত্ত বিনোদনের জন্য—"বিন্তী" খেলার জন্ম হয়।

মোগলদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাসেরও অধঃপতন আরম্ভ হয়। এই সময় সর্ব্বনেশে "তেতাস" খেলার সৃষ্টি হয়।

তখন সহরের সর্ব্বত্রই তেতাস খেলার আড্ডা বসিত। ভদ্র অভদ্র সকলেই তেতাস খেলায় উন্মত্ত হইত। অনেকে গৃহের তৈজস বিক্রয় করিয়াও তেতাসের চরণে আত্মসম্প্রদান করিত। যাঁহাদের মনের আভিজাত্যের গর্ব্ব ছিল তাঁহারাও গোপনে তেতাস খেলিতেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও তেতাসের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আজকাল আইনের কঠোর শাসনে তেতাসের প্রতাপ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। প্রকাশ্যে কেহ আর তেতাস খেলে না।

সম্মিলনী।

(নব পর্য্যায়)
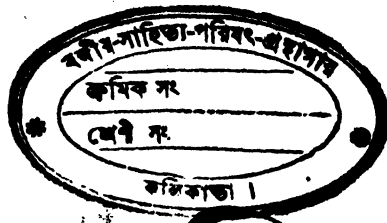
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ।	মাঘ, ১৩৩২ সাল।	১০ম সংখ্যা।

নয়নের জল।

—:*:—

ব্যর্থ নিশার ব্যাকুল পিয়াসে
হতাশা-দহনে পরাণ ভরি—
গলিয়া গলিয়া তৃষ্ণা জ্বালায়
বুকের পাথর এলো কি করি!
বজ্র আঘাতে ব্যথা নির্ঝর,
ছুটিল ছলকি' একি ঝর্ঝর;
পাষু-পাদপ বক্ষ টুটিয়া
মূর্ত্ত দহন পড়িছে ঝরি'!

মানস অতলে কত যুগ ধরি'
সোহাগ-লালসা নিয়ত জুটি'—
মুক্তা ফলকে ঝলসি' কি আসে
ঝলমলি' নীল নয়নে ফুটি ?—
গগনের ব্যথা তারায় তারায়,
পড়িল কি ধরা নয়ন-আভায় ?
সুদূর মধুর স্মৃতি-মেখলায়
মানসের ভাতি পড়ে কি লুটি' ।

কানন-বেদনা ফুটিল কি ফুলে
জগতের আলো-সভার তলে ?
পাষাণ হিয়ার দুর্ব্বল গাথা
বাহিরিয়া এল চকিতে পলে !
অনুতাপে শত লজ্জা টুটিয়া,—
অভিমান-ফুল পড়ে কি ঝরিয়া !
বিশ্ব-মানব একতা-সায়র
জাগিল কি এই নয়ন-জলে !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ইষ্টারের ছুটীতে ফ্রান্স ও আল্‌প্‌সে।

(১৯২৫)

(উত্তরার্দ্ধ)

আমাদের ছুট ফুরিয়ে এল ; এইবার ইংলণ্ডে ফিরতে হবে। পথে আমরা এমিয়াঁতে (Amiens) নেমে যুদ্ধক্ষেত্র দেখে আসার মতলব করলাম। এমিয়াঁ বিখ্যাত 'সোম' (Soame) নদীর উপরে ; বিগত মহাযুদ্ধে 'সোম' নদীর তীরে ইংরেজ সৈন্য হাজারে হাজারে প্রাণ হারিয়েছে। জার্ম্মানরা কখনও এমিয়াঁ দখল করতে পারে নাই ; কিন্তু এমিয়াঁ সর্ব্বদাই জার্ম্মান কামানের হাতার মধ্যে ছিল। এমিয়ার গির্জ্জা ইউরোপে বিখ্যাত ; এত বড় 'গোথিক' (Gothic) শিল্পের নিদর্শন খুব কমই আছে। আমরা গির্জ্জার মধ্যে গিয়েছিলাম। সেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক কলনির নাম দেওয়ালে খোদা আছে, এবং প্রত্যেক কলনিরই পতাকা সেখানে আছে ; কেবল ভারতবর্ষেরই কোন উল্লেখ নাই ; এতগুলো ভারতীয় সৈন্য যে সোমের কাছাকাছি প্রাণ দিয়েছে অন্য কলনির পাশে তার কোন কথাই নাই। সোম নদী এত ছোট যে দেখে রাগ হল ; এরই এত নাম ; আমাদের কর্ত্তারা এই নালাটুকু পার হতেই এত নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। আমরা এমিয়াঁ ত্যাগ করে একবারে আসল যুদ্ধক্ষেত্রে এলাম। এমিয়াঁ থেকে ৩০ মাইল দূরে আলবার্ট বলে যে সহর আছে সেটা হল আমাদের কেন্দ্র। এই আলবার্ট (Albert করাসীরা বলে এলবিয়ার) ও বেপুম (Bapaume)-এর জন্য কত লক্ষ লোক যে প্রাণ দিয়েছে তার সংখ্যা নাই ; এই আলবার্ট থেকেই ইংরেজরা মহা ধুমধাম করে সোম অভিযান (Soame offensive) সুরু করে ; এবং প্রাণপণ চেষ্টার ফলে জার্ম্মানকে কিছু দূর সরাইয়া দেয় ; পরে জার্ম্মানেরা একদিনেই সে সমস্ত যায়গা উদ্ধার করে। আলবার্ট অনেকবার দুই পক্ষের হস্তান্তরিত হয়েছে, ফলে এলবার্টের পুরাতন বাড়ী একখানাও খাড়া নাই। এখানে প্রায় তিরিশ হাজার লোকের বাস ছিল ; গোলাতে টাউন এমন ভাবে ভেঙ্গেছে যে বাঁধানো রাস্তাঘাটের পর্য্যন্ত চিহ্ন নাই, বাড়ী ঘর ত দূরের কথা, আবার সব নানারঙের নূতন বাড়ী

উঠেছে; যুদ্ধক্ষেত্র সর্ব্বত্রই এই রকম; মনে হয় যেন দেশটাতে নূতন বসতি হচ্ছে। একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে রেল ষ্টেশনের কায হয়; নূতন ষ্টেশন এখনও শেষ হয় নাই। আলবাটের গির্জ্জা এমন ভাবে ভেঙ্গে চুরমার করা হয়েছে যে সে এক দেখার জিনিস। রোম পম্পাই প্রভৃতি স্থানে কাল-জীর্ণ যে সব ধ্বংসাবশেষ দেখে লোকে অবাক হয় তারা যদি আলবাটের গির্জ্জা দেখে তবে আরও বেশি অবাক হবে;—এখানে ধ্বংস কতদূর সম্পূর্ণ, মানুষ এমন পরিপাটিরূপে ধ্বংস করতে পারে যে তার কাছে কালও হার মানবে।

এই সব যুদ্ধবিধ্বস্ত জলপথ আবার নূতন করে তৈরী হচ্ছে; সেই জন্য এইখানে ইউরোপের সব দেশ থেকে মজুর এসে জুটেছে; গ্রেটব্রিটেনের যে সব সৈন্য এখানে কবরস্থ, তাদের কবরের খবরদারি করার জন্য এক দল ইংরেজ কর্ম্মচারী আছে, তাদের নাম হচ্ছে Imperial War-grave Commission এক এক স্থানে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা; সেখানে ১০০।১৫০ কবর; প্রত্যেক কবরের উপর একখানা মার্ব্বেল ফলক এবং প্রত্যেক সমাধি স্থানের সঙ্গে একখানা মৃতদের রেজিষ্টার ও দর্শকদের মন্তব্যই আছে। কোন কোন স্থানে অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা প্রভৃতি কলনি তাদের সৈন্যদের জন্য বড় বড় স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছে।

আমরা দুইজন আলবার্ট ষ্টেশনে পৌছান মাত্রই কয়েকজন ইংরেজ এসে ঘিরে ধরল যে আমরা যেন তাদের মোটরে করে যুদ্ধক্ষেত্র দেখে আসি; একজন জিজ্ঞাসা করল আমরা কি এইখানে ভারতীয় লানসার (Lancers)-দের কেউ ছিলাম। আর একজন জিজ্ঞাসা করল আমাদের কোন আত্মীয় কি এখানে যুদ্ধ করতে এসেছিল, আমাদের জবাবে তারা খুসী হল না। যাই হোক ষ্টেশনের সম্মুখেই একটা বড় নূতন হোটেল দেখে উঠে পড়া গেল।

বিকালে আমরা একজন ইংরেজ কর্ম্মচারার কাছ থেকে এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়ের অনুসন্ধান নিলাম ও দুই মাইল দূরে "লা বোসেল" (La Boiselle) বলে একটা বিধ্বস্ত গ্রাম দেখতে রওনা হলাম। আমরা বিখ্যাত আলবার্ট বেপুম রোড দিয়ে চলছিলাম। এখন চারদিকে আবার চাষবাস আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু তবুও ভাঙ্গা গোলা কামান বন্দুক গড়াগড়ি যাচ্ছে। ঠিক দশবছর পূর্ব্বেই এই রাস্তায় কাইজারের বাহিনী যাতায়াত করত। বন্ধু বললেন দশবছর পূর্ব্বে এই রাস্তায় মাথা উঁচু করে চলার দাম হচ্ছে বন্দুকের গুলিতে মাথা দেওয়া। লা বোসেলে যুদ্ধের অন্য সব চিহ্ন (ট্রেঞ্চ ইত্যাদি) আছে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে একটা mine crater

অর্থাৎ মাইন ফেটে যে গর্ত্ত হয়েছে তাই। এ গর্ত্তটা এত বড় যে একখানা ছোটখাট বাড়ী তার মধ্যে বেশ পুরে ফেলা যায়। এই গর্ত্তটার উপর একখানা নোটিশ টাঙ্গানো আছে যে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শিল্পকলার ডিপার্টমেণ্ট (Ministry of beautiful Arts) এই স্থানটাকে রক্ষা করছে অতএব কেউ যেন এর ক্ষতি না করে ; সুকুমার কলার নিদর্শন বটে !

পরদিন সকালেই বের হওয়া গেল। পাঁচ ছয় মাইল দূরে বোকোর্ট হ্যামেল (Beau Court Hamel) বলে একটা ষ্টেশনে নেমে সেখানকার সব দৃশ্য দেখতে গেলাম। এই গ্রামটি যত রক্তপান করেছে, তাতে এর মাটি লাল হওয়া উচিত ছিল। ফ্রান্সের এই অংশ বসতিবিরল ও জমি উঁচুনীচু। এই ষ্টেশনে পণ্যদ্রব্য দেখলাম যত সব ভাঙ্গা গোলা বন্দুক কামান প্রভৃতির লোহা ; তাই মালগাড়ী ভর্ত্তি করে চালান দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে মাইলটেক দূরে অনেকখানি যায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করছে ; এর নাম হচ্ছে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পার্ক (Newfoundland Park) এখানে ঐ কলনির সৈন্যরা যুদ্ধ করেছিল এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছিল। যুদ্ধের সময় এখানকার যে রকম অবস্থা ছিল ঠিক সেই রকম ভাবেই রক্ষা করা হয়েছে। আমরা পার্কের মধ্যে প্রবেশ করলাম। মৃতদেহ এখন পড়ে নাই বটে, কিন্তু সৈন্যদের মাথার টুপী, বন্দুক, পায়ের জুতো ; জলপানের বোতল, টোটার বেল্ট অজস্র গাড়াগড়ি যাচ্ছে। কত যে কামান পড়ে আছে ! বড় বড় ট্রেঞ্চ মরটার (এক রকম কামান) হাঁ করে আকাশের দিক চেয়ে আছে যেন কতদিন পেটে খোরাক পড়ে নাই। ট্রেঞ্চের অভাব নাই। ম্যাক্সিম কামান গোলাগুলি গ্রিগেড ছড়াছড়ি যাচ্ছে ; সমস্ত স্থানে কামানের গোলার গর্ত্তে পরিপূর্ণ ; এক একটা গর্ত্ত মানুষ সমান। কাঁটাওয়ালা তারের বেড়া সেই রকমই পড়ে আছে ; এক যায়গায় দেখি একখানা ভাঙ্গা এরোপ্লেন। একটা গোলার পাশে আমার বন্ধু দাঁড়ালেন, সেটা তার কাঁধ সমান উঁচু। সম্মুখেই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড সৈন্যদের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটা কৃত্রিম পাহাড়ের উপর একটা ক্যারিবু (caribou) নামক নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডীয় হরিণের মূর্ত্তি। এইখানে একখানা ফলকে লেখা আছে" Tread softly here. Go reverently and slow. For not one foot of this dank sod but drank its surfeit of blood of gentlemen, who for their faith etc."

এই মৃত্যু পুরীতে পা ফেলাতে গা শিউরে উঠছিল ; হয়ত পায়ের নীচের মাটিতেই "কোন অভাগীর কপাল পুড়েছে"; রক্ষকের যে ঘর আছে সেখানে গেলাম। তারা তখন লাঞ্চ খাচ্ছিল ; কিন্তু আমাদের দেখেই খাওয়া ফেলে এসে দর্শক-বই বের করে' দিল, এরা ইংরাজ। আমরা কলনি কিংবা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি ; সুতরাং আমাদের একটা মন্তব্য তাদের বইয়ে থাকা দরকার ; তবে বৃটিশ পাবলিক তাদের চাকরীর একটা সার্থকতা খুঁজে পাবে। আমি লিখলাম " We saw a bit of the war " (আমরা যুদ্ধের সামান্য একটু দেখলাম) আমার বন্ধু কিপলিং থেকে লিখলেন " Lest we forget " (পাছে আমরা ভুলি)। পার্ক থেকে বের হয়ে খাওয়ার অন্বেষণে গ্রামে প্রবেশ করলাম। এদেশে প্রত্যেক গ্রামেই একটা রেস্তরাঁ থাকেই কিন্তু এ গ্রামে এসে দেখি তখনও সে-সমস্ত বাড়ীঘর তৈরী হয় নাই ; আগুণে বাড়ী পুড়ে গেলে যেমন " বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" অবস্থা হয় এখানকার অধিবাসীর অবস্থাও তাই। শেষে একটা পানশালার খোঁজ মিলল। তার কর্ত্রী আমাদের নিতান্ত বুভুক্ষিত দেখে কিছু রুটি, পনির (cheese) ও ওমলেট করে এনে দিল ; সেখানে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ও তার ছেলে বসে খাচ্ছিল। পাশের সব বেঞ্চিতে ইউরোপের নানা দেশ থেকে যে সব মজুর এসেছে তারাই দুপুরের ছুটিতে বসে মদ খাচ্ছিল। ইংরাজ বলল যে এমন অন্তর্জাতিক সম্মিলনী খুব কমই হয় ; ইটালীয়ান, স্পেনীয়, পোলিশ, ফরাসী, ইংরাজ, ভারতীয় এসে সেই ক্ষুদ্র কফিখানাটাকে ধন্য করে ফেলেছে। আমি মনে মনে হেসে ভাবলাম যে জীবনে আর এমন মজার লাঞ্চ খাব না।

লাঞ্চের পর থিপভাল (Thiepval) বলে একটা যায়গায় গেলাম এটা একটা ছোট টিলার উপর ; এইখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল ; আশে পাশে বহুদূর কোন বাড়ীঘর নাই ; সমস্ত জমিকে যেন কামানের গোলায় চাষ করে রেখেছে। পাহাড়ের মাথার উপর ৪৬ নং আলষ্টার ডিভিসনের (Ulster Division) জন্য এক মেমোরিয়াল খাড়া করা হয়েছে। 'থিপভাল' অধিকার করতে ইংরেজদের অনেক বেগ পেতে হয় ; জার্ম্মানরা এটা খুব সুরক্ষিত করে রেখেছিল। সোমনদীর যুদ্ধের প্রথম দিন এই আলষ্টার সৈন্যদল খুব সাহসের সহিত জার্ম্মানদের আক্রমণ করে ; এবং হটাইয়া থিপভাল দখল করে। যখন দিন শেষ হল তখন দেখা যায় ডিভিসন প্রায় নির্ম্মূল হয়েছে ; সেই বীরত্বের জন্য এখানে একটি টাওয়ার (Tower) নির্ম্মিত হয়েছে। আমরা সেখানে যাওয়া মাত্র

তার রক্ষক তাড়াতাড়ি পরিদর্শক-বই নিয়ে এল, এবং তাতে আমাদের নাম ও মন্তব্য লিখে নিয়ে তবে শান্ত হল। আমরা টাওয়ারের মাথার উপর আরোহণ করলাম; সেখান থেকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দেখি সমস্ত প্রদেশই সমাধি, মেমোরিয়াল এবং স্মৃতিফলকে ভরা; যেন কোন মহাশ্মশানের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যাঁরা ক্যাবিনেটে বসে এই সমস্ত যুদ্ধ সৃষ্টি করেন, তাঁরা যেন একবার এই সব দেখে যান এবং বুঝে যান যুদ্ধ কি রকম বিভীষিকাময় ব্যাপার। যারা এইখানে প্রাণ দিয়েছে তাদের এই কাষ্ঠফলক ছাড়া আর কিছু লাভ হয়েছে কিনা জানি না। সব চেয়ে মজার এই যে এই হাজার হাজার ক্রশের মধ্যে একটিও জার্ম্মান সৈন্যদের স্মৃতি-ফলক দেখলাম না; তারা পরাজিত সেইজন্য বেচারীদের একখানা কাষ্ঠফলকের সান্ত্বনা জুটল না। স্বর্গে ভগবান তাদের জন্য এবং মিত্র সৈন্যদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন জানি না।

রক্ষক আমাদেক একটা জার্ম্মান dug-out দেখাতে নিয়ে গল। ট্রেঞ্চ হচ্ছে শুধু একটা খাল, 'ডাগ-আউট' হচ্ছে মাটির তলে একটা সুরঙ্গ; এর মধ্যে প্রবেশ করার তিন চারটা ভিন্ন ভিন্ন মুখ আছে। আমরা লণ্ঠনের সঙ্গে করে প্রবেশ করলাম; দেখি ভিতরে বেশ আরামজনক; ছাদ পাথর দিয়ে তৈরী; ভিতরে শয়ন করার জন্য লোহার খাট পাতা আছে, শীতকালে ভিতরকে গরম করার ব্যবস্থাও ছিল এবং ভিতরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলত; মোটের উপর বেশ আরামের। শীতকালে যখন ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে সৈন্যরা বাইরে ট্রেঞ্চে কাঁপত তখন তাদের কাছে এই ডাগআউট নিশ্চয়ই স্বর্গের মত মনে হত; এর ভিতরে কামানের গোলা ঢুকতে পারে না; এই জন্যই এই সব গর্ত্ত থেকে জার্ম্মানদের তাড়াতে মিত্রদের এত কষ্ট পেতে হয়েছে। আমরা যেটায় ঢুকেছিলাম তার নীচে ক্রমে ক্রমে আরও দুইটি সুরঙ্গ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ করে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে দর্শকরা যেন ভাঙ্গা গোলাগুলির কিছুই স্পর্শ না করে; কারণ সময় সময় এখনও তাদের মধ্যে বারুদ আছে। আমি রক্ষককে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ইংরেজ লাইনে এই রকম "ডাগআউট" নাই, আছে শুধু ট্রেঞ্চ। সে বলল সে ইংরাজরা এখানে অবস্থান করতে আসে নাই, তারা জার্ম্মানদের তাড়াতে এসেছিল; সেইজন্য জার্ম্মানদের মত স্থায়ী পাকা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে নাই।

থিপভাল থেকে বেরিয়ে আমরা আলবার্টে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করলাম, চারিদিকেই যুদ্ধের ভগ্নাবশেষ। একটা স্থানে পূর্ব্বে জঙ্গল ছিল; কিন্তু কামানের গোলা জঙ্গলকে এমন ভাবে সাফ

করেছে যে এখন গোটা কয়েক অঙ্গার-আবৃত ভাঙ্গা কাণ্ড ছাড়া বড় বড় গাছের কোন চিহ্নই নাই। আমাদের দেশে এই উপায়ে জঙ্গল পরিষ্কার করলে মন্দ হয় না। আর একটা যায়গায় দেখি একটা ডোবার মধ্যে শত শত জার্ম্মান সৈন্যদের লোহার টুপি গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমরা এই যুদ্ধক্ষেত্রের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ একটা করে টুপী নিয়ে চললাম। রাস্তায় তাই দেখে সকলেই হেসেছে; এবং ইংলণ্ডে পদার্পণ করার সময় কাষ্টমস্‌কর্ত্তারা এই অভিনব জিনিষটার উপর কোন শুল্ক ধার্য্য করা উচিত কিনা এই নিয়ে একটু বিব্রত হয়েছিল। পথে আমাদের এনকার (Ancre) নদী পার হতে হল। সোম যুদ্ধের সময় এই এনকার নদীর নাম শুনে শুনে এবং তাই পার হতে মিত্রদের দুরবস্থা অন্ত নাই দেখে এনকারকে আমাজন, মিসিসিপির সমান মনে করেছিলাম; কিন্তু দেখি যে একটা কুকুর জোরে লাফ দিলে নিশ্চয়ই পার হতে পারবে। এর পর যদি মিত্রদের আমি গালিভার বর্ণিত লিলিপুটের সৈন্য বলে মনে করি তবে হোমরা চোমরা যুদ্ধ বিশারদ ফিল্ডমার্শালরা আমার অজ্ঞতায় যতই হাস্থন না কেন আমি লজ্জিত হব না। বীর বটে আমাদের হনুমান; এক লাফে সাগর পার হয়েছিল; অত বড় কিছু একটা পার হতে হলে মিত্রদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের ভয়ে মুর্চ্ছা হত কি মৃত্যু হত জানি না।

এলবার্টে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহে ফিরে এলাম। স্নান করে এবং এক কাপ গরম চকোলেট পান করে সুস্থ হওয়া গেল। দোতালায় আমার কক্ষের জানালার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নীচে বিপর্য্যস্ত সমস্ত আলবার্ট সহরকে দেখতে পেলাম এবং দিগন্ত বিস্তৃত উঁচু নীচু তরঙ্গায়িত শ্যাম শোভায় ভরা পিকার্ডির (Picardy) প্রান্তর দেখা যাচ্ছিল। তারই একপ্রান্তে ধূসর বনের আড়ালে সূর্য্যাস্তের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। চারদিকে এমন শান্তি যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কিছুদিন পূর্ব্বে এইখানে ধ্বংসের তাণ্ডব চলেছিল এবং এইখানে লক্ষ লক্ষ লোক কত যন্ত্রণা ও কষ্ট পেয়ে মৃত্যুর কোলে শুয়ে আছে। যারা একদিন জীবন্ত ছিল, একটু ধুলোবালি লাগলে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলত, কোথায় বের হতে হলে যাদের পথের কষ্ট ভেবে স্ত্রী আকুল হত তাদের এই ভূশয়ন দেখে মা বোনরা আজ কি ভাববে? অথচ প্রকৃতির কোন খেয়ালই নাই; এই মাটির তলে একজন মানুষ আছে কি গরু আছে সে চিন্তা যেন তার হয় নাই। তাই

সে নির্ম্মম হস্তে তার হৃদয়হীন চিরন্তন নিয়ম মত আবার ঘাসের আস্তরণ বিছয়ে দিয়াছে; অভাগ্য মৃতের জন্য তার একটু ব্যতিক্রম করে নাই।

এই আলবার্টের সূর্য্যাস্তের সঙ্গে আমার ইষ্টার ভ্রমণ কাহিনী শেষ করি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার।

পথ।

—*—

পাহাড় দিয়ে ঐ যে গেচে
রাঙা মাটির পথ—
ঐ সে পথে চল্‌লে কিগো
পূর্‌বে মনোরথ।
ওগো পথিক, তোমায় শুধাই,
কেমন ক'রে নিশানা পাই;
শ্রান্ত আমার চরণ যুগল
টল্‌বে না কি কভু—
পথের ধারে পান্থশালা
মিল্‌বে না কি তবু?

বন্ধু আমার, দাঁড়াও খানিক
একটুখানি থাকো—
পথ যে কোথায় শেষ হয়েচে
তার কি খবর রাখো?
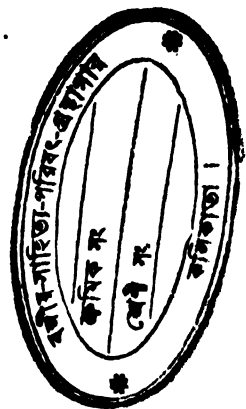
আঁধার যখন ঘিরবে আমায়,
আলোর চমক্ লাগ্‌বে কী গায় ;
চিনে যা রইলো আমার—
যা কিছু সব বাকী,
বিরামবিহীন এই যে চলা
সফল হ'বে নাকি ?

শ্রীমতী তৃপ্তি সেন।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

তৃতীয় অংশ, বৌদ্ধ-বিপ্লব।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলেই বৌদ্ধবিপ্লবের কথা আসিয়া পড়ে। শ্রদ্ধাভাজন ৺বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া যিনিই বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণাগমনের কথা কহিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন যে, এদেশে বৈদিক যাগযজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণের অভাববশতঃই মহারাজ আদিশূরকে কনৌজ হইতে তাদৃশ বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। কিন্তু, "এদেশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-কুশল ব্রাহ্মণের অভাব কেন হইয়াছিল ?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে গেলেই সর্ব্বদা এই উত্তর পাওয়া যায়, যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবে পড়িয়া বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্তই আদিশূর রাজাকে কনৌজের রাজার নিকট হইতে পাঁচগোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। আবার, বাঙ্গালার সামাজিক জলবায়ুর দোষে ক্রমশঃ সেই পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশধরদিগের মধ্যেও বেদাচারের

লোপ পাওয়ায় রাজা শ্যামলবর্ম্মাকে পুনরায় সেই কন্নৌজ হইতেই বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণের বেদজ্ঞান-লোপের কারণ সেই "বৌদ্ধ-বিপ্লব" সম্বন্ধে সুতরাং দুইচারি কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে।

ভারতখণ্ড অথবা বিশালতর ভারতবর্ষে, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, উন্নতি এবং পতনের ইতিহাস আলোচনা করার স্থান এই প্রস্তাবে হইবার নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচ্য-প্রদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই প্রাচ্য ভারতে গৌতমবুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধসম্প্রদায় বদ্ধমূল হইয়াছিল। মগধের শিশুনাগবংশীয় সম্রাট্ অজাতশত্রুর রাজত্ব-সময়ে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের কথা ঐতিহাসিকবর্গ স্বীকার করিয়াছেন। জৈনসম্প্রদায়ের শাস্ত্রপ্রবাদানুসারে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ধর্ম্মে জৈন এবং শেষ বয়সে চরম শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু স্বামীর শিষ্যত্ব এবং প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ এবং জৈন এই দুই সম্প্রদায় বেদের কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলেও বর্ণ এবং আশ্রমাচার যে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহা আধুনিক বিশেষজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন। ডাক্তার রিস্ ডেভিড্স্, ওল্‌ডেনবার্গ এবং জেকোবি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থাবলী আমাদের কথার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়কে অধিক সম্মান করিতেন, এই মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব অথবা জিন মহাবীর স্বামিপাদ বর্ণাশ্রম-বিলোপী ছিলেন বলিয়া যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। বেদকে তাঁহারা "অপৌরুষেয়" বলিয়া স্বীকার করিতেন না বলিয়াই বেদাচারীরা তাঁহাদিগকে "নাস্তিক" এই আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রসিদ্ধ শাব্দিক অমরসিংহ স্বকীয় অভিধানে "নাস্তিক" শব্দের অর্থ "বেদ-নিন্দক"ই লিখিয়া গিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মে অনাস্থাবান্ বলিয়াই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত "বৃষল" (১) এই খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। "বৃষল" শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারার জন্য তাঁহাকে

(১) বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥১৬॥ অষ্টম অধ্যায়, মনুসংহিতা।
উত্তরকালে "বৃষল" শব্দের অর্থ "শূদ্র" হইয়া গিয়াছিল। (অমর-কোষ)

এবং তাঁহার বংশধর গণকে "শূদ্রবর্ণান্তর্গত" মনে করিয়া অনেকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তদেবের পুত্র বিম্বিসার এবং প্রপৌত্র সম্প্রতিও ঐ জৈন সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, এই কথা জৈনেরা বলিয়া গিয়াছেন; আর বৌদ্ধ-প্রবাদ বা ইতিবৃত্তের মতে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মহারাজ অশোক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ভক্ত, আশ্রয়দাতা এবং উন্নতির মূল বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সমগ্র প্রাচ্য প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সময়ে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ডের এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার্চনা ও রীতিমত প্রচলিত ছিল। তাঁহার মহামন্ত্রী মহামতি কৌটিল্য তাঁহারই সাম্রাজ্যের সুশাসনের নিমিত্ত "অর্থশাস্ত্র" নামে যে মহাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। মহামতি কৌটিল্য তাঁহার গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণ এবং তাঁহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, লোকরক্ষা এবং যুদ্ধ, বৈশ্যের পক্ষেও অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ এবং কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য আর শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাতির সেবা, কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং কারু-কুশীলবকর্ম (শিল্পী এবং নটের বৃত্তি) ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ণধর্মের পরই তিনি গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং পরিব্রাজক এই চারি আশ্রমের বর্ণনা করিয়া রাজাকে এই বর্ণাশ্রমধর্ম রীতিমত রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন (২)। উক্ত ব্যবস্থা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৌটিল্য শূদ্রবর্ণের জন্য অনেকগুলি বৈশ্য-বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন; নতুবা তাঁহার অন্যান্য ব্যবস্থা প্রায়ই মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের অনুগত দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পৌত্র মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধসংঘ অথবা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উন্নতি হইলেও বেদাচারের লোপ হয় নাই। "অশোকাবদান" প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি স্বকীয় প্রণয়িনী রাজ্ঞী তিষ্য-রক্ষিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেবি, অহং ক্ষত্রিয়ঃ কথং পলাণ্ডুং ভক্ষয়ামি" (৩)? তাঁহার প্রচারিত অনুশাসনের মধ্যেও ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণের

(২) Arthasastra, Book I, Chapter III, (English Version).

(৩) গল্পটি এই, এক সময়ে রাজার উদরের মধ্যে স্ফোটকের উদ্ভব হইয়াছিল। রাজ্ঞী তিষ্য-রক্ষিতা আয়ুর্বিদ্যার বিদুষী ছিলেন। তিনি রাজাকে ঔষধ হিসাবে পেঁয়াজের রস খাইতে বলেন; তাহাতেই রাজা মনুর অনুশাসন স্মরণ করিয়া আপত্তি তুলেন, "দেবি, আমি ক্ষত্রিয়, কেমন করিয়া পেঁয়াজ খাইব?" (মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে এই নিষেধ আছে।)

সমান সম্মান এবং বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষার সুব্যবস্থা আছে। হিংসাবহুল যজ্ঞের প্রাচুর্য না থাকিলেও তাঁহার দ্বারা বেদপন্থী বর্ণাশ্রমধর্মিগণের কোন হানি হয় নাই অথবা ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধেও কোনরূপ কার্য সাধিত হয় নাই। মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর, শুঙ্গরাজগণের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণদিগের মর্যাদার বৃদ্ধি এবং বেদবিহিত যজ্ঞাদির বহুল প্রচার হইয়াছিল, এমন কি শুঙ্গরাজগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের ও অনুষ্ঠান করিতেন। শুঙ্গরাজগণের পর কাণ্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাজগণের এবং তাঁহাদের পরবর্তী অথবা সমসাময়িক অন্ধ্রবংশীয় শাতবাহন রাজগণের সময়েও বেদাচার ও বর্ণাশ্রমধর্মের কোন হ্রাস হয় নাই। অন্ধ্রগণের পতনের পর আর্যাবর্তে কিছুকাল রাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এই বিপ্লবের পরে মগধের গুপ্তনাথগণের অভ্যুদয় কাল। এই বংশের সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য উপাধিযুক্ত) এবং প্রথম কুমারগুপ্ত বিশেষ তেজস্বী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহারা বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক নানাবিধ দেবদেবীর পূজার্চনা করিতেন। গুপ্তরাজগণের সমসাময়িক লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের সময়ে শিব, শক্তি, কুমার, সূর্য এবং গণেশাদি দেবদেবীর মূর্তিপূজা খুব চলিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েই (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, দেশের নানাস্থানে সে সময়ে এ দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরও মঠ এবং মন্দিরাদি ছিল। "বৌদ্ধ-বিপ্লবের" কোন প্রমাণ এ পর্যন্তও পাওয়া যায় না। জ্যোতিঃশাস্ত্র-নিষ্ণাত বরাহমিহির তৎকৃত বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থের "প্রতিষ্ঠাপন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্
মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু
র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্যা ক্রিয়া॥" ১৯॥

৬০ম অধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ কোন্ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ কর্তৃক কোন্ দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে তৎসম্বন্ধে বরাহ-মিহির ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

দেবমূর্তি—	সম্প্রদায়—
(১) বিষ্ণুমূর্তি	ভাগবত সম্প্রদায়,
(২) সূর্যমূর্তি	মগ বা শাকদ্বীপীয় সম্প্রদায়,
(৩) শিবমূর্তি বা (লিঙ্গমূর্তি)	ভস্মদ্বিজ বা শৈব সম্প্রদায়,
(৪) শক্তি বা মাতৃমূর্তি	শাক্ত সম্প্রদায়,
(৫) ব্রহ্মারমূর্তি	ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়,
(৬) বুদ্ধমূর্তি	শাক্য সম্প্রদায়,
(৭) জিনমূর্তি	নগ্ন সম্প্রদায় ;

অর্থাৎ,—যাঁহারা যে যে মূর্তির উপাসক, তাঁহাদের দ্বারা নিজ নিজ বিধিব্যবস্থানুসারে সেই সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে।

কাশ্মীরের ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণী গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায়, যে, এ কালের রাজা অথবা জমিদারেরা যেমন শিব, দুর্গা, কালী এবং কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর শ্রীমূর্তি স্থাপন করিতেছেন,—সে কালে কাশ্মীরের রাজা, রাণী এবং কুমারেরা ও তদ্রূপ বিষ্ণুমূর্তি, শিবমূর্তি এবং বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ-বিহারের প্রতিষ্ঠা করিতেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় এবং জৈন-সম্প্রদায়ের দেবদেবীগণ সাধারণের নিকট অন্যান্য দেবদেবী অপেক্ষা কম সম্মান পাইতেন না। বরাহ-মিহির ও প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ এবং সমসাময়িক আচার রক্ষা করিয়াই উক্ত রূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন (৪)।

(৪) য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ এবং এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিতের মতে বরাহমিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। আমাদের মতে তিনি খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে কবি কালিদাসাদির সহিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম রত্নরূপে শোভা পাইতেন।

কৌটিল্য বা চাণক্য নগর-নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, নগরের মধ্যভাগে অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিদ্বয় এবং মদিরা দেবীর আয়তন নির্ম্মাণ করিতে হইবে (৫)।

বর্ত্তমান প্রস্তাবের গত সংখ্যায় উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত গুপ্তকালের যে কয়েকখানি তাম্র-শাসনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, গুপ্তরাজদিগের সময়ে বাঙ্গালাদেশ সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ শাসনাধীন ছিল এবং এদেশে দেব দেবীর মন্দিরের এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না।

মগধের গুপ্তরাজগণ বৈদিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুগত এবং ভক্ত হইলেও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের শত্রু ছিলেন না। য়ুরোপের মধ্যযুগে খৃষ্টান্ ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সম্প্রদায়-কলহের যেরূপ শোচনীয় ঘটনার কথা আমরা পড়িয়া থাকি, তাহা মনে করিলে একথা বেশ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যাবর্ত্তে কখনও সেরূপ সর্ব্বনাশকর সম্প্রদায়-কলহের উদ্ভব হয় নাই। দক্ষিণাপথে কখনও কখনও শৈব, স্মার্ত্ত, লিঙ্গায়েত, জৈন এবং বৈষ্ণব বা ভাগবত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় কলহের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। কলহের কথা দূরে থাকুক আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিবৃন্দ সকল সময়েই প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই সমান আদর করিয়াছেন। নালন্দার জগদ্বিখ্যাত মহা-বিহার মগধের গুপ্তরাজগণের দানেরই পরিচয় প্রদান করিত।

গুপ্তরাজগণের পতনের পর হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ চৈনিক ভ্রমণকারী হোয়েন্থসাঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া হর্ষের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছেন তাহা একদেশদর্শিনী হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। হর্ষবর্ধনের বন্ধু, সভাসদ্ এবং রাজকবি পণ্ডিতরাজ এবং কবিকুলশিরোমণি বাণভট্ট-প্রণীত "হর্ষচরিত" পাঠ করিলে হর্ষকে বেদাচার বা ব্রাহ্মণ বিরোধী "গোঁড়া বৌদ্ধ" বলিয়া বুঝা যায় না। হর্ষের পূর্ব্বজগণ যেরূপ সূর্য্য এবং শিব-শক্তির ভক্ত ছিলেন, হর্ষকেও তদ্রূপ বলিয়াই মনে হয়। তিনি "শিবাঙ্ক" (শিবমূর্ত্তিচিহ্নিত) স্বর্ণমুদ্রার প্রচার করিয়াছিলেন এবং কোনস্থলেই পিতৃ-পিতামহগণের গৃহীত মতের প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই। তাঁহার সভাসদ্

---

(৫) Koutilya's Arthasastra; Book II. Chap IV. English Version.

বাণভট্ট নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক সদাচার সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলিতেন দেখিতে পাওয়া যায়। হর্ষের ভগিনীপতি কনৌজরাজ মৌখরি গ্রহবর্ম্মা বরং বৌদ্ধ সাধু দিবাকর মিত্রের ভক্ত ছিলেন। এই দিবাকর মিত্রের আশ্রম বর্ণনা পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রকৃতই সমদর্শী শান্তমনাঃ সাধু পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার আশ্রম সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধুর চরণরেণুতে পবিত্র হইত। হোয়েন্থ-সাঙ্গের বর্ণনা হইতে এইমাত্র বোধ হয় যে, সম্রাট্ হর্ষ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের দেব দেবী এবং সাধু সন্ন্যাসীকেও যথোচিত ভক্তি করিতেন। হোয়েন্থ-সাঙ্গও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, হর্ষের দান ব্রাহ্মণ শ্রমণাদি সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধুগণ সমানভাবে প্রাপ্ত হইতেন। শিব-শক্তির পরমভক্ত ভগদত্তবংশজ কামরূপরাজ কুমার ভাস্কর বর্ম্মা হর্ষের মিত্র ছিলেন (৬)। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে গৌড় বঙ্গে মহাপ্রতাপী শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি শিব-শক্তি এবং সূর্যের উপাসক ছিলেন এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিষম বৌদ্ধ-শত্রুরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের কুলক্রমাগত প্রবাদানুসারে গৌড়পতি মহারাজ শশাঙ্কই গৌড়বঙ্গে সূর্য-মূর্ত্তির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনিই সূর্য-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা এবং সেবার্চ্চনার নিমিত্ত অযোধ্যাদি প্রদেশ হইতে সূর্য-পূজক মগ অথবা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণকে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করিয়াছিলেন (৭)। এই গৌড়পতি মহারাজ শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধনকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া বাণভট্ট হর্ষচরিতে অভিযোগ করিয়া গিয়াছেন। হর্ষ কামরূপপতির সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া

(৬) চৈনিক শ্রমণ হোয়েন্থসাঙ্গ ভাস্করবর্ম্মাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভুল। রবর্ম্মা মহাভারতবিখ্যাত মহাবীর ভগদত্তের বংশধর সুতরাং ক্ষত্রিয় ছিলেন। হোয়েন্থ-সঙ্গ এরূপ ভুল অনেক করিয়াছেন।

(৭) এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ইতিহাস প্রকৃতই অনুসন্ধানের যোগ্য। বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে তাঁহাদের অবস্থাবিপর্যয়ের কারণ যে কি, তাহা স্থির করা দুরূহ। যদি কোন বিজ্ঞ পাঠক দয়া করিয়া এই রহস্যের উন্মোচন করেন, তাহা হইলে আমাদের সামাজিক ইতিহাসানুশীলন অনেকটা সার্থক হয়।

শশাঙ্ককে পরাস্ত করিলেও তাঁহার বিনাশ করিতে পারেন নাই, তাহা পূর্বেই আমরা লিখিয়াছি। যাহাই হউক, হর্ষবর্ধন-সম্রাটের সময়েও গৌড়মণ্ডলে কোনরূপ "বৌদ্ধ-বিপ্লব" ঘটিয়াছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক দেবদেবীর প্রতিমা-পূজা কতকাল হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে প্রচলিত ছিল, তাহা এখন সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন। এই অর্থশাস্ত্রেও ইতিহাস-পুরাণকে বেদের সহিত সমান সম্মান দেওয়া হইয়াছে,—আমাদের সমুদায় আপ্তশাস্ত্রেও ঠিক তাহাই আছে। গত শতাব্দের শেষপাদেও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের তথাকথিত আবিষ্কারের ভয়ে স্বর্গগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহাশয় শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ঠাকুরাণীর প্রতিমা-পূজাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের অপেক্ষা পুরাতন বলিতে সাহস করেন নাই। যদিও তখন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাচ তিনি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির স্মৃতি, রামায়ণ-মহাভারত এবং মহাপুরাণগ্রন্থাবলী, গুণাঢ্যের বৃহৎ কথার অনুবাদ কথাসরিৎসাগর, মৃচ্ছকটিক নাটক, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি শত শত সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আলোকে য়ুরোপীয় এই অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন। আজকাল ত য়ুরোপীয় পৌরাণিক রাপসন্ সাহেব স্বয়ংই পুরাণের প্রাচীনত্বের সাক্ষিস্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বায়ু এবং মৎস্যাদি মহাপুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত যে খৃষ্টের আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই শাস্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা লইয়া এখন আর বিচারের কচ্‌কচি করিবার প্রয়োজন নাই। গুপ্তরাজগণের সমসাময়িক লিপির সাহায্যেও প্রতিমাপূজার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, আর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মঠ কর্মচারিবৃন্দের কল্যাণে গুপ্তকালের কয়েকটী মন্দির ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতেছে না। পুণ্ড্রবর্ধনে পাটলাদেবী, কোকামুখ স্বামী, শ্বেতবরাহ স্বামী, কার্তিকেয়, বাগীশ্বরী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক দেবদেবীর শত সহস্র মূর্তি ব্যতীত গৌড়মণ্ডল জৈন এবং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক মূর্তি, মন্দির, মঠ বা বিহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। নানাবিধ-ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্ত গৃহস্থ নরনারী এবং বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীগণের ধর্মানুশীলনের পুণ্যফলে দেশ ধন্য এবং বরেণ্য

হইয়াছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্ত দেশে বৌদ্ধ অথবা অন্য কোন "ধর্ম্মবিপ্লবের" অভ্যুদয় হয় নাই।

চৈনিক শ্রমণ হোয়েন্থ-সঙ্গ (য়োয়ান-চাঙ্গ) প্রকৃতই একজন পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মপ্রাণ কৃতীপুরুষ। সম্রাট্ হর্ষের সময়ে তিনি ভারতখণ্ডে আসিয়া অনেক দিন এদেশে বাস করিয়াছিলেন এবং এ দেশের সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা শিখিয়া বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এবং বহুসংখ্যক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পুথি সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া অমর যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইংরেজী, ফরাসী এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় তাঁহার ভ্রমণের ইতিবৃত্ত এবং জীবনী অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ভক্ত বৌদ্ধের চক্ষুতে ভারতখণ্ড বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাবে পরিপূরিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার সঙ্কলিত বৃত্তান্ত অনেকটা পক্ষপাত-যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তথাপি, তাঁহার গ্রন্থে গৌড়মণ্ডলের তাৎকালীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দেখা উচিত। সেই জন্য, আমরা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে, তাঁহার প্রদত্ত পরিচয়ের আভাস প্রদান করিতেছি।

প্রদেশের নাম।	বিবরণ।
১। মগধ, (বৈশালীর দক্ষিণে, গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত। প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ,—নূতন পাটলিপুত্র।)	রাজার নাম দেওয়া হয় নাই। অধিবাসিগণ সত্যনিষ্ঠ, বিদ্যোৎসাহী এবং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান্। গয়াতে গয়-ঋষির বংশধর এক সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন; তাঁহারা সকলেরই ভক্তি-ভাজন। রাজগৃহের পূর্ব্বদিকে নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।
২। হিরণ্যপর্বত (মুঙ্গের)। রাজধানী গঙ্গাতীরে অবস্থিত।	অল্পদিন পূর্বে প্রতিবেশী এক রাজার দ্বারা পূর্বনৃপতি রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। এই রাজ্যে (বা নগরে) ১০ দশটি বৌদ্ধমঠ এবং ২০ কুড়িটি দেব-মন্দির বিদ্যমান। রাজধানীর উপকণ্ঠস্থ পর্বতে বহুসংখ্যক ঋষির আশ্রম; দেবমন্দিরে তাঁহাদের উপদেশাবলী রক্ষিত হইতেছে।

৩। চম্পা (ভাগলপুর); রাজধানী গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এই প্রদেশের দক্ষিণদিকের জঙ্গলে বহু বন্যহস্তী আছে।

রাজার নাম দেওয়া হয় নাই; বৌদ্ধমঠগুলি ভগ্নদশায় পড়িয়া আছে। গঙ্গার দক্ষিণতীরের নিকট (গঙ্গাবক্ষঃস্থ) একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অতি সুন্দর একটি দেবমন্দির আছে।

৪। কজুগল (রাজমহল); চম্পার পূর্বে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

পৃথক্ রাজা নাই,—অপর রাজার অধীন; ৬ ছয়টি বৌদ্ধমঠ এবং ১০ দশটি দেবমন্দির অবস্থিত।

৫। পুণ্ড্রবর্ধন (বরেন্দ্র); পূর্বদিকে, গঙ্গার পর পারে।

রাজার নাম দেওয়া হয় নাই; ২০ কুড়িটি বৌদ্ধমঠ এবং ১০০ একশত দেবমন্দির আছে। দিগম্বর নিগ্রন্থ (জৈন) সম্প্রদায় ভুক্ত অনেকে আছেন।

৬। কামরূপ (কোচবিহার হইতে আসাম পর্য্যন্ত)।

রাজা কুমার ভাস্করবর্মা। অধিবাসিগণ ক্ষুদ্রকায়; বিভিন্ন (পুণ্ড্রবর্ধনের ভাষা হইতে) ভাষা ব্যবহার করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে আস্থা শূন্য। এই প্রদেশে শত শত দেবমন্দির বর্তমান; অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ গোপনে সম্প্রদায়িক উপাসনা করিয়া থাকেন।

৭। সমতট (পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গ)।

রাজার নাম দেওয়া নাই; ৩০ ত্রিশটি বৌদ্ধমঠ এবং ১০০ একশত দেবমন্দির আছে। দিগম্বর নিগ্রন্থ (জৈন) সম্প্রদায়ের অনুগামী অত্যন্ত অনেক।

৮। তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক); সমুদ্রের একটি শাখার উপর অবস্থিত,—এখানে স্থলপথ এবং জলপথের মিলন স্থান।

রাজার নাম দেওয়া হয় নাই; ১০ দশটি বৌদ্ধ-মঠ এবং ৫০ পঞ্চাশটি দেব-মন্দির বর্তমান।

৯। কর্ণসুবর্ণ (মুরশিদাবাদ, রাঙ্গামাটী); ভাগীরথীর তীরে।	রাজার নাম শশাঙ্ক। অধিবাসিগণ বিদ্যা-শিক্ষায় অনুরক্ত। ১০টি বৌদ্ধমঠ এবং ৫০ পঞ্চাশটি দেবমন্দির বর্তমান। নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকে এখানে বসবাস করে।
১০। উড্র অথবা ওড্র (ওড়িশা)।	রাজার নাম দেওয়া হয় নাই। অধিবাসিবর্গ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভক্ত; ভাষায় এবং আচার-ব্যবহারে মধ্যদেশবাসিগণ হইতে পৃথক্। ১০০ একশত বৌদ্ধমঠ এবং ৫০ পঞ্চাশটি দেবমন্দির বর্তমান। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক।

হোয়েন্থ-সাঙ বর্ণিত বিবরণ হইতে আমরা তাঁহার সমসাময়িক গৌড়মণ্ডলের (পূর্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে রাঢ় এবং বেহার এবং উত্তরে বরেন্দ্র হইতে দক্ষিণে দক্ষিণবঙ্গ এবং ওড়িশা পর্যন্ত দেশের) যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালার কোন প্রদেশেই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগেও "বৌদ্ধ-বিপ্লবের" কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। কামরূপ-রাজ কুমার ভাস্করবর্মা হর্ষের মিত্র-রাজ-স্বরূপে যুদ্ধ করিয়া গৌড়পতি শাশাঙ্ককে পরাস্ত এবং রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন এবং শশাঙ্ক অগত্যা দক্ষিণে সুহ্ম, ওড্র এবং কোঙ্গদ প্রদেশে (রাঢ়, ওড়িশা এবং গঞ্জাম ইত্যাদি নামে অধুনা পরিচিত প্রদেশে) গিয়া নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। সেই রাজ-বিপ্লবের সময়ে শশাঙ্কের পূর্বরাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ কুমার ভাস্করবর্মার অধীন হইয়াছিল। পূজ্যপাদ বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম-এ, মহাশয় ঢাকার "প্রতিভা" পত্রে কুমার ভাস্কর বর্মার একখানি তাম্র শাসনের পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ শাসনপত্র দ্বারা রাজা ভাস্করবর্মা অনেকগুলি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে বহু ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং উহা "কর্ণসুবর্ণ-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল (৮)। ভাস্করবর্মা পুরুষানুক্রমে শিব-শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালেও বঙ্গ-মণ্ডলে "বৌদ্ধ-বিপ্লব" ঘটিবার কোন প্রমাণ নাই।

(৮) দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি "প্রতিভা"র এই সংখ্যাখানি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

গুপ্তরাজবংশীয় নৃপতিগণের শাসন কালে এবং তাহার পরে শশাঙ্ক এবং ভাস্কর বর্ম্মার রাজত্ব সময়ে গৌড়মণ্ডলে অথবা বাঙ্গালা দেশে যে বেদ-বিদ্যা-পারগ, যাগযজ্ঞশীল এবং নিষ্ঠাবান্ বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ (তাম্রশাসনাদি হইতে) পাওয়া যাইতেছে। সপ্তম শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গৌড়মণ্ডলের রাজনৈতিক ইতিহাস স্পষ্টভাবে অদ্যাপিও বুঝিতে পারা যায় নাই। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাহার অক্সফোর্ড সংস্করণ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে আদিশূরের কাল ৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (৯) বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশের মতে আদিশূরের কাল ৯৯৯ শক বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ (১০)। আদিশূরের কালনির্ণয়ের এই গোলোযোগের ভিতর প্রবেশ না করিয়া আমরা পাল-সামাজ্য স্থাপয়িতা গোপালদেবের সময় হইতে সামাজিক ইতিহাসের নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ করিতে চাই। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে খৃষ্টীয় ৭৫০ অব্দের কাছাকাছি এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ৭৮৫ হইতে ৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোপালদেব গৌড় রাজ্যে প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

গোপালদেব হইতেই গৌড়ের পালবংশের আরম্ভ হয় এবং তিনিও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্র আদিশূরকে দরদ দেশাগত অম্বষ্ঠ-কায়স্থ-কুলোদ্ভূত (১১) এবং বৌদ্ধরাজ-বিজয়ী বলিয়াছেন। রাজ-তরঙ্গিণী-বর্ণিত মহারাজ জয়াপীড়-বিনয়াদিত্যের শ্বশুর জয়ন্ত সম্ভবতঃ পালবংশ-প্রতিষ্ঠাতা গোপালের

(৯) Vincent A. Smiths' Oxford History of India, Latest Edition, p 185. গোপালের রাজ্যারম্ভের অঙ্কও এই পৃষ্ঠায় আছে।

(১০) ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি এবং ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের মতে ৯৯৯ অঙ্ক শকাব্দের নহে, পরন্তু সংবতের; তাহা হইলে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ হয়।

(১১) আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম অংশে দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের মধ্যে অম্বষ্ঠ কায়স্থ এক প্রকার। এখনও তাঁহাদের অস্তিত্ব আছে। দরদদেশের আধুনিক নাম দার্দিস্তান (Dardistan); কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

পূর্ব্বগামী ছিলেন। এই জয়ন্তের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনেই কহ্লন-বর্ণিত কার্ত্তিকেয়-মন্দির এবং অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কলানিপুণা নর্ত্তকী কমলার আলয় ছিল।

পাল-রাজগণ বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত থাকিলেও বিপ্লবকারী ছিলেন না। তাঁহারা বৈদিক যাগযজ্ঞে এবং পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার্চনায় পরম আস্থাবান্ এবং ব্রাহ্মণগণের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বেদবিৎ এবং যাজ্ঞিক বীরদেব নামক ব্রাহ্মণের ছয় জন বংশধর ক্রমান্বয়ে পালরাজগণের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ গুরব মিশ্রের প্রতিষ্ঠিত বাদাল-গরুড়স্তম্ভে যে প্রশস্তি-কাব্য ক্ষোদিত আছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত রাজমন্ত্রী এবং রাজার নাম পাওয়া যায়, যথা—

এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ যে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন এবং তাঁহারা বৈদিক এবং পৌরাণিক (এবং তান্ত্রিক) যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াদি করিতেন,—এই পালরাজগণ যে যজ্ঞশেষে ভক্তির সহিত সেই যজ্ঞের শান্তিবারি গ্রহণ করিতেন, তাহা এই প্রশস্তি-কাব্যে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে (১২)।

পালবংশের দ্বিতীয় নৃপতি দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্-কল্প ধর্ম্মপাল দেব তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মার প্রার্থনানুসারে "শুভস্থলী" নামক স্থানে স্থাপিত ভগবান্ নন্ন-

(১২) দিনাজপুর জেলার বাদাল-প্রস্তর-লিপি। Epigraphica Indica Vol. II. pp 16[illegible]—167 এবং গৌড় লেখমালা, প্রথম স্তবক, ১৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৯ পৃষ্ঠা।

নারায়ণ দেবের পূজোপস্থাপন জন্য পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি চারিখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন (১৩)।

এই বংশের তৃতীয় নরপতি দেবপাল দেব বেদার্থবিদ্ যজ্বা ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র ঋগ্‌বেদী, ঔপমন্যবগোত্র ভট্টপ্রবর বীহেকরাত মিশ্রকে শ্রীনগর ভুক্তির অন্তঃপাতি একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন (১৪)।

এই বংশের পঞ্চম নরপতি নারায়ণপাল দেব তীরভুক্তির অন্তর্গত কলসপোত নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত সহস্রায়তন ভগবান্ শিব ভট্টারকেরও পাশুপত আচার্য-পরিষদের যথার্হ পূজা-বলি-চরু-সত্র-নব-কর্মাদির জন্য "মুকুতিকা" নামক গ্রামখানি দান করিয়াছিলেন (১৫)।

এই বংশের নবম নৃপতি প্রথম মহীপাল দেব ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করত বিষুব সংক্রান্তির দিন বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া পরাশর-সগোত্র শক্ত্রি, বসিষ্ঠ এবং পরাশর প্রবরযুক্ত যজুর্বেদের বাজসনেয় শাখ্যাধ্যায়ী চবটি গ্রাম নিবাসী মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্ক-বিদ্যাবিদ্ ভট্ট-পুত্র কৃষ্ণাদিত্য শর্মাকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত "কুরটপল্লিকা" গ্রামখানি দান করিয়াছিলেন (১৬)।

এই বংশের একাদশ নৃপতি তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল প্রবরযুক্ত সামবেদী কৌথুমশাখাধ্যায়ী মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্ক-বিদ্যাবিৎ ক্রোড়ঞ্চি বিনির্গত মৎস্যাবাস বিনির্গত ছত্রাগ্রামবাস্তব্য বেদান্তবিৎ মহোপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র খোদ্দল দেবশর্মাকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া কোটীবর্ষ বিষয়ে ভূমিদান করিয়াছিলেন (১৭)।

(১৩) খালিমপুর-লিপি, উক্ত গৌড় লেখমালা, ১১ পৃষ্ঠা হইতে।

(১৪) মুঙ্গের-লিপি, উক্ত গৌড় লেখমালা, ৩৫ পৃষ্ঠা হইতে।

(১৫) ভাগলপুর-লিপি, উক্ত গৌড় লেখমালা, ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে।

(১৬) বাণগড়লিপি, ঐ গৌড় লেখমালা, ৯২ পৃষ্ঠা হইতে।

(১৭) আমগাছি-লিপি, ঐ গৌড় লেখমালা, ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে। গৌড় লেখমালায় ব্রাহ্মণের নাম নাই,—তখন উহা পড়া যায় নাই। পরে শ্রীযুক্ত রাখালবাবু উহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন ; (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৩ সাল, ২৩৩-২৩৯ পৃষ্ঠা)।

এই বংশের সপ্তদশ নৃপতি মদনপাল দেবের পট্ট মহাদেবী চিত্রমতিকা দেবী বেদব্যাস প্রোক্ত মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করত উক্ত পাঠ-কার্যের উৎসর্গ সম্পাদন করিতে চাহিলে রাজা ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করত কৌৎস-সগোত্র, শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল প্রবরযুক্ত, সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়ী চম্পাহিট্টীয় (চম্পটী গ্রামীণ?) চম্পাহিট্টী বাস্তব্য বৎস স্বামীর প্রপৌত্র, প্রজাপতি স্বামীর পৌত্র, শৌনক স্বামীর পুত্র পণ্ডিত ভট্ট পুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামিশর্মাকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত, কোটিবর্ষ বিষয়ে, হলাবর্ত মণ্ডলে,—ভূমি দান করিয়াছিলেন (১৮)।

আমরা এই কয়েকখানি শাসন-পত্রের পরিচয় পাইয়াছি ; এরূপ শাসন-পত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে ভূমি দানের যে কত শত নিদর্শন ছিল, তাহা কে বলিবে? যে পালরাজগণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর নিকট প্রণত হইতেন, যজ্ঞের শেষে তথায় গিয়া আশীর্বাদ এবং শান্তিবারি গ্রহণ করিতেন, বিষ্ণু এবং শিবের মন্দির ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রাম দান করিতেন, বিধিবৎ কাম্য গঙ্গাস্নান করিয়া এবং বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠ শুনিয়া তাহার "প্রতিষ্ঠার্থ" গ্রাম এবং ভূমি দান করিতেন,—তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণের শত্রু ছিলেন না এবং তাঁহাদের সময়ে ব্রাহ্মণেরা দেশত্যাগ অথবা আচার-ত্যাগ করিতে বাধ্য হন নাই। যাঁহারা বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, মাধবসেন, কেশবসেন এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে পালরাজগণের শাসনসমূহে বর্ণিত (দান গ্রহীতা) ব্রাহ্মণগণের গোত্র, কুল এবং বিদ্যাবত্তার পরিচয় সেনরাজগণের সমসাময়িক ব্রাহ্মণগণের তত্তৎ পরিচয় অপেক্ষা কোন অংশেই বিভিন্নরূপ ন্যূন বা হীন নহে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের শেষে অথবা দ্বাদশ শতাব্দের আরম্ভ কালে পালবংশের ভাগ্য-বিপর্যয় এবং তৎ সঙ্গে সেনবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অবধারণ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বঙ্গমণ্ডলে "বৌদ্ধ-বিপ্লবের" কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণগণের ন্যূনতা অথবা তাঁহাদের বেদজ্ঞানের অভাবের কারণ বৌদ্ধ বিপ্লব নহে, ইহা স্বর্গত সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র

---

(১৮) মনহলিলিপি, ঐ গৌড় লেখমালা, ১৫৮ পৃষ্ঠা হইতে।

চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করিয়াছেন (১৯)। আমাদের মতে, বঙ্গমণ্ডলে কোনও কালেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না ;—অন্ততঃ ইতিহাস যত প্রাচীন কালের সংবাদ দিতে সমর্থ, তত প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গমণ্ডলে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য অংশের ন্যায় ব্রাহ্মণের প্রাচুর্য্য আছে। সে কথা ক্রমশঃ বলিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

মাটি'র মায়া।

সাথী যারা ছিল দূরে গেছে সব কখন কেমনে জানি,
যত ব্যথা পাই তত মনে হয় আরো কাছে টেনে আনি ;
বুঝেছি এখন অশ্রুসায়র জীবনের দুই কূলে—
কেন উঠে দুলে' দুলে' ;
আঁধারের বুকে আলোর বাসনা কেন করে হানাহানি !

অন্তরে কাঁদে ক্রন্দসী মোর,—স্মৃতিসুখ উথলায়,
নয়নের পাতে নেমে আসে ধীরে মরণের কালো ছায় ;
এই ধরণীর স্নেহ সুনিবিড় মৃন্ময় কারাগারে—
ধরা পড়ি বারে বারে ;
মাটির মায়ায় ভুলে থাকি তবু হিয়া করে হায়, হায় !

শ্রীসরোজকুমার সেন।

১৯) বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ; দ্বিতীয় প্রস্তাব শেষাংশ

অনন্তলাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কি ভীষণ প্রতারণা, সংসার এমনও হয়—অনন্তলাল এত দিন যাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করিয়া ভক্তি করিয়া আসিতেছেন সেই স্বামীজিইর এই কাজ! যে ব্যক্তি একজন প্রতারককে সাক্ষাৎ বেদব্যাস বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত করিতে এবং তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করাইয়া সেই প্রতারকের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করাইতে পারিয়াছে—তাহার অসাধ্য কোন কাজই নাই। সেই স্বামীজীর সকল কথাই অবিশ্বাস্য। তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই অনন্তলালের আশা হইয়াছিল যে সম্প্রতি সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেলেও ভবিষ্যতের জন্য যে প্রভূত অর্থরাশি সঞ্চিত আছে তদ্দ্বারা তাঁহার শেষদশা সুখে অতিবাহিত হইবে—সে আশাও এবারে সমূলে উন্মূলিত। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র তাহার মানস-নয়নে উদিত হইয়া তাঁহাকে হতাশাসাগরে নিমজ্জিত করিল। অনন্তলালের আর কিছুই ভাল লাগিল না; তিনি নির্জ্জনে কাটাইবার জন্য, বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। "থিয়জফিষ্ট্" নামক একখান মাসিক পত্রিকা তাঁহার আসনে পড়িয়াছিল। যাইবার সময়ে সেখানি হাতে করিয়া লইয়া গেলেন।

অন্দরে, নিজ শয়নকক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশ্যে অনন্তলাল উক্ত পত্রিকাখানির মধ্যভাগে খুলিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। পত্রিকা খুলিয়াই "Teachings of Buddha" অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ নামক একটি প্রবন্ধে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, এবং উহা পাঠ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় এক নূতন ভাবে পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিতেছিলেন, বৌদ্ধ মতই অভ্রান্ত মত। এ মতে কোন দেবদেবীর উপাসনা, অথবা কোন দেবতার কৃপায় ভববন্ধন মোচন হয় এ বিশ্বাস নাই। বৌদ্ধেরা বলে, বৌদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিলে মনুষ্য আপনা হইতেই মুক্ত হইতে পারে, সেই জন্য কাহারও উপাসনার প্রয়োজন নাই। অনন্তলাল ভাবিলেন, এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুমতে উপাসনা জপ, ইত্যাদি অনেক করিলেন কিন্তু তাহার ফল কি হইল?

অতএব এ সকলে কিছুই হয় না। হিন্দুমতের সাধুসন্ন্যাসী সকলেই প্রতারক, কাহারও কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অগত্যা তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবেন স্থির করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে তিনি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ডাকাইয়া, নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের পক্ক অন্নভোজনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বস্ত্যয়নের জন্য যে সকল দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা এই প্রায়শ্চিত্তে ব্যয় কবিলেন।

বৈষয়িক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রতিনিয়তই কলিকাতায় যাইতে হইত। এই মহানগরীতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই অবস্থিতি করিয়া থাকে। তিনি তথায় তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশবাসী বৌদ্ধদিগের সহিত পরিচয় করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুস্তকাগার হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ সকল লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজ পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তদ্দারা তাঁহ'রা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থ বুদ্ধদেবের জন্মের পর এবং অনেক স্থলে তাঁহার মত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠে ক্রমে অনন্তলালেরও দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, হিন্দুরা অনেক বহুমূল্য তত্ত্বকথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে লইয়া তাঁহাদের শাস্ত্র-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। কেবল এ বিষয়ে নহে, তিনি যখনই সুলেখক রচিত কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন সেই গ্রন্থোক্ত যুক্তি ও মীমাংসা কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁর হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিত। সেই গ্রন্থ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা যে কোনও ধর্ম্মানুমোদিত হউক তাহাতে তাঁহার আপত্তি হইত না—ইহা তাঁহার স্বভাব।

এখন তাঁহার সম্মুখে কেহ যদি হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ হইতে, উচ্চভাব সম্বলিত কোন কথার উল্লেখ করিত, তাহা হইলে তিনি বলিয়া উঠিতেন "ওগো, ও সব বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে হিন্দুদের চুরি করা।"

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। উহা দর্শন শাস্ত্রের নামান্তর মাত্র, সহজে বোধগম্য হইবার বিষয় নহে। অনন্তলালের সভাসদ বিপিন বাবুর তাদৃশ পাণ্ডিত্য ছিল না। তথাপি

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এ ধর্ম্মে কোন দেবদেবীর উপাসনা করিতে হয় না। এসম্বন্ধে অনন্তলাল কোন কথার উল্লেখ করিলে, তিনি কখন কখন বলিতেন "বাবু, আপনার মুখে শুনে এ ধর্ম্ম আমারও বড় ভাল লাগছে। আমাদের হিন্দুধর্ম্মে আছে কেবল গোঁজেলি আর ভণ্ডামী।"

হরিশ সাহা এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিত না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ষাঁড় কি শালিখ পাখী সে তাহা কিছুই বুঝিত না। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মালা জপে প্রবৃত্ত হইত।

** **
**

অনন্তলালের আর্থিক অবস্থা যতই মন্দ হউক না কেন, অভাব তাহা বুঝিত না। সর্ব্বদাই তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইত। কিন্তু আজ কাল দেশে ঋণ প্রাপ্তির তাদৃশ আশা নাই দেখিয়া তিনি বিদেশস্থ ধনাঢ্য বাঙ্গালীদিগের নিকট উহার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশস্থ অথবা প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের অনেকেই রতনপুরের বাবুদিগকে জানিতেন। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে প্রথম প্রথম বেশ কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। সম্প্রতি কাশী হইতে একজন ধনবান বাঙ্গালী কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত অনন্তলালের পিতার বন্ধুত্ব ছিল। অনন্তলাল একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রতনপুরে আনয়ন করিলেন, এবং আহারাদির পর হরিশ তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, কিছু টাকা ঋণের প্রস্তাব করিল। অনন্তলালের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া, সে ব্যক্তি দুঃখিত ও ঋণদানে সম্মত হইল। পরে উভয়ে গৃহমধ্যে যাইয়া উপবেশন করিল। তথায় অনেকগুলি লোক বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এই ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অনন্তলাল হরিশের সহিত ঐ ব্যক্তিকে নির্জ্জনে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও—কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কারণ লোকটি তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"আপনার এমন অবস্থা"—

অনন্তলাল দেখিলেন সব প্রকাশ হইয়া যায়, অমনি হঠাৎ লোকটির গলদেশে দোদুল্যমান রুদ্রাক্ষের মালায় হস্ত প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার কথায় বাধা দিয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা এ মালা আপনি কোথা থেকে কিনেছিলেন ?"

সে ব্যক্তি অগত্যা নিজ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল, "এ মালা কাশী থেকে নেওয়া। একটি কথা মনে পড়্‌ল। কাশীতে আপনার গুরু এক স্বামীজী ছিলেন? আজ পাঁচ সাত দিন হবে তাঁর মৃত্যু হয়েচে।"

অনন্তলাল কাশীতে স্বামীজীকে পত্র অথবা মসিক পাঠান অনেক দিন হইতে বন্ধ করিয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথমে কিছুদিন টাকার জন্য তাগাদা করিয়া, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন। শেষে তাঁহাকে বিশালার আশ্রমস্থ সুন্দরলালের, ওরফে শুকদেব গোস্বামীর, ওরফে বামুন ঠাকরুণের ওরফে কলুনীঘটিত সমস্ত ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইবার পর হইতে তিনি আর পত্রাদি লিখিতেন না। এক্ষণে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অনন্তলাল চমৎকৃত হইলেন। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছিল?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কলেরা।"

'কলেরা!' অনন্তলালের ধারণা ছিল যে, মহাত্মারা কখনই কলেরা রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন না। স্বামীজী যখন কলেরায় মারা গিয়াছেন, তখন তিনি যে মহাত্মা ছিলেন না, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। রীতিমত বৌদ্ধদলভুক্ত হইতে অনন্তলালের যাহা কিছু আপত্তি ছিল, এ সম্বাদে তাহা তিরোহিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, এইবার কলিকাতায় যাইয়া যথারীতি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আসিবেন। তাহাই হইল। তিনি একদিন কলিকাতায় যাইয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতায় আলোকিত জাপান নিবাসী একজন বৌদ্ধের নিকট, ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আসিলেন।

এইরূপে এই বিশাল হিন্দুধর্ম্মে কিছু না পাইয়া, অনন্তলাল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন।

এস্থলে একটি কথার উল্লেখ না করিলে, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের এক প্রধান ঘটনা পাঠকের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। অতএব আমরা অনিচ্ছা সত্বেও তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

ব্রজেন্দ্র রতনপুর যাইবার অথবা তাহার জন্ম হইবার অনেক পূর্ব্বে, অনন্তলালের পিতার জীবদ্দশায় গঙ্গাতীরস্থ তাঁহাদের পুষ্পবাটিকায় কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পাদরী সাহেব সস্ত্রীক আসিয়া, কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সাহেবের সহিত তাঁহার অবিবাহিতা যুবতী কন্যা

আসিয়াছিল। এই কন্যা অতীব রূপবতী। অনন্তলালও তখন অবিবাহিত যুবক। তিনি পাদ্‌রি দুহিতার রূপে মোহিত হইলেন এবং অধিকাংশ সময় পুষ্পবাটিকায় এই ইংরাজ পরিবারের মধ্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সাহেব তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সাহেব কলিকাতায় এক প্রসিদ্ধ গির্জ্জায় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। এই গির্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে প্রতি রবিবারে তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইত তাঁহার সহিত অনন্তলালও গির্জ্জায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। শেষে পুত্রের জন্য পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া অনেক ভৎর্সনা করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, যদি তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পাদরিকন্যা বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই, তবে তাঁহাকে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে।

অনন্তলাল দেখিলেন, পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। বিশেষতঃ কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় মেম বিবাহ করিবার আশা আকাশকুসুম তুল্য অসম্ভব। পাদ্‌রি সাহেবের নিকট তাঁহার যে খাতির তাহাও তিনি বড়লোকের পুত্র বলিয়া, নতুবা সাহেব নিজ পরিবার মধ্যে তাঁহাকে অত প্রশ্রয় কখনই দিতেন না। পিতার সেই একদিনের ভৎর্সনায় পাদরী কন্যার নেশা তাঁহার ছুটিয়া গেল, এবং সাহেবের নিকট যাওয়া বন্ধ হইল। ইহার অল্পদিন পরে সাহেবও সপরিবারে কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিশিরকুমারী কৈশোর অতিক্রম করিয়া ক্রমে যৌবনঃসীমায় পদার্পণ করিতেছে দেখিয়া অনন্তলাল তাহার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইলেন।

ব্রজেন্দ্র এ সংবাদে অধিক বিচলিত হইল না। সে বেশ জানিত যে শিশিরের দর্শন সুখ বা তাহার সহিত এ ঘনিষ্ঠতা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। তাহার বিবাহ হইলেই এ সুখ ফুরাইবে। অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছিল।

তাহার হৃদয় শিশিরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ এ কথার এক বর্ণও শিশির কখনও তাহার মুখে শুনে নাই, দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর কন্যাকে ভালবাসে একথা নিতান্ত অপ্রকাশ্য ; শুনিলে শিশিরই তাহাকে মনে মনে উপহাস করিতে পারে। শিশিরের অনেক কার্য্যে তাহার প্রতি প্রবল অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে সকলকে সে অনুরাগের প্রমাণ স্বরূপ মনে করিতে রাজি নয় তাহা শিশিরের অত্যধিক দয়ার নিদর্শন হইলেও হইতে পারে। হয়ত ব্রজেন্দ্র দয়াকেই অনুরাগ মনে করিতেছে। যদি অনুরাগই হয়, তাহা হইলেও তাহা বালিকাসুলভ অপরিণামদর্শিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার স্থায়িত্বই বা আর কয় দিন ? কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রের সহিত শীঘ্রই শিশিরের বিবাহ সমাধা হইবে। তখন ব্রজেন্দ্র তাহার মন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

মানুষ কখন কখন জাগ্রত অবস্থাতেও স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ব্রজেন্দ্রও কখন কখন নিজের অবস্থা ও দারিদ্র্যের সহিত শিশিরের ধনসম্পত্তির পার্থক্য ভুলিয়া যাইত নিজ অন্তঃকরণ মধ্যে প্রেমের সিংহাসন পাতিয়া তদুপরি সেই অতুল রূপরাশিকে স্থাপিত করিত এবং ভাবিত বুঝি বা এ সুধারাশি ভগবান তাহারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার অল্পক্ষণ পরে কঠোর বাস্তবিকতার মধ্যে সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত,—অসহ্য মনস্তাপে তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে প্রবল বেগে বারিধারা পতিত হইত।

কিন্তু শিশিরের ব্যবহার দেখিলে বোধ হইত সে বুঝি এসকল কথা ভাবেনা। নতুবা ব্রজেন্দ্রের সহিত তাহার এ ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে কেন ? ব্রজেন্দ্রের প্রতি তাহার নানা বিষয়ে অভিমান অনুরোধ বা সহানুভূতি দেখিলে বোধ হইত যেন তাহার জীবনে বিবাহরূপ এক মহৎ পরিবর্ত্তন অচিরে সংঘটিত হইবে, এ কথা সে জানে না। সম্প্রতি তাহার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়াও সে কিছুমাত্র দুঃখিত বা আনন্দিত হইল না।

এ কার্য্য এতদিন সম্পন্ন করিতে হইত। কিন্তু উত্তমর্ণদিগের তাগাদায় বিব্রত হইয়া অনন্তলাল এবিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক আর বিলম্ব করা চলে না। তবে তাঁহার আশা ছিল যে, শিশিরের বিবাহ দিতে তাঁহাকে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। এরূপ পাত্রীর সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে অনেক গুণবান রূপবান ও উচ্চবংশজাত পাত্রের

পিতা উৎসুক হইবেন! পরলোকগত পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং রূপবতী কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে কে না ইচ্ছা করিয়া থাকে ?

পাত্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইতে হইবে না সত্য কিন্তু পাত্রনির্ব্বাচনরূপ কঠিন কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন পাত্রের পিতা তাঁহার নিকট উপযাচক হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখন তাদৃশ মনঃসংযোগ না করায় তাহারা নিরস্ত হয়। এইবার এই কার্য্য তিনি অবিলম্বে সমাধা করিবেন শুনিয়া অনেকে নিজনিজ পুত্রের রূপ গুণ ও কুলের বর্ণনা সহ তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিল এবং তন্মধ্য হইতে দুইচারিখানি বাছিয়া লইয়া তিনি তাহাদিগের তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিশির নিতান্ত বালিকা বা অশিক্ষিতা নহে, অতএব তাহার অমতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা অনন্তলাল যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি কোন পাত্রের সন্ধান করিয়া আসিয়া সরলার নিকট সে সমস্ত বর্ণনা করিতেন। সরলা আবার সে সকল শিশিরের নিকট বিবৃত করিয়া তাহার মতামত অবগত হইবার চেষ্টা করিত। শিশির মুখে কিছুই বলিত না। কিন্তু তাহার আকার ইঙ্গিতে মনোভাব জ্ঞাত হইতেও সরলার বিলম্ব হইত না। ক্রমে ক্রমে তিন চারি স্থানে পাত্র মনোনীত করিয়া, অনন্তলাল সরলাকে জানাইলেন, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই শিশিরের মত নাই শুনিয়া, তিনি চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন।

আরও কয়েক স্থানে পাত্র স্থির করিয়া শিশিরির মত করিতে না পারিয়া, অনন্তলাল এক যুক্তি স্থির করিলেন। তিনি শুনিলেন, শিশিরের পিতার কুলের যোগ্য কুলজাত, কলিকাতা নিবাসী এক ধনবান ব্যক্তি কয়েক স্থানে নিজ পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে যাইয়া তাঁহার ন্যায় বিফলমনোরথ হইয়াছেন। পুত্রের বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর। সেকালকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়িতেছে; দেখিতেও রূপবান। তাহার প্রতিজ্ঞা, সে রূপবতী কন্যা ভিন্ন বিবাহ করিবে না, এবং স্বয়ং দেখিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। দুই চারি স্থানে দেখিতে যাইয়া তাহার পছন্দ হয় নাই। ঘটকদিগের মুখে এই পাত্রের কথা শুনিয়া অনন্তলাল ভাবিলেন, এরূপ পাত্রকে দেখিলে শিশিরেব মত হইতে পারে। অতএব যাইয়া কন্যাকে সমস্ত বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন—"শিশিরকে দেখতে আসতে তাঁদের লিখবো মনে করছি!"

সরলা বলিল, "না, বাবা, হঠাৎ দেখতে আসতে লিখবেন না। শিশিরের মনের ভাব কি আজ তা জেনে আপনাকে বল্‌ব।"

"আচ্ছা মা, তাই বো'লো" বলিয়া অনন্তলাল সদরে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন রাত্রে সরলা শিশিরকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং একথা ও-কথার পর বলিলেন, "শিশির, তোকে কলকাতা থেকে দেখ্‌তে আস্‌বে। বাবা এইবার যার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কর্‌চেন, সেই নিজে দেখ্‌তে আস্‌বে। তারা খুব বড় লোক, ঘর ভাল, আর পাত্রটিও দেখ্‌তে ভাল; প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ, পড়্‌চে; বয়স একুশ বছর।"

সরলার বাক্যালাপনে, তাহার কথায় যেন মনোযোগ না দিয়াই শিশির বলিল, "দিদি, সত্য-বানের সঙ্গে সাবিত্রী দেবীর সম্বন্ধ কে করেছিল ?"

সরলা শিশিরের মুখের দিকে চাহিল। সে এ সময়ে হঠাৎ পৌরাণিক উপাখ্যান উত্থাপন করায় কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল. "কেন এখন সে কথা ?"

"আমার প্রয়োজন আচে।"

"সাবিত্রী নিজের সম্বন্ধ নিজেই করেছিলেন।"

শিশির জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে তার পিতা অশ্বপতির মত হয়েছিল ?"

সরলা বলিল, "না।"

"কেন ?"

কারণ মহারাজা অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের মুখে শুনেছিলেন যে, সত্যবানের আর এক বৎসরের অধিক পরমায়ু নাই। পাত্রের এর চেয়ে আর অধিক দোষের কথা কি হতে পারে ?"

"তার পর কি হ'ল ?"

সরলা বলিতে লাগিল, "কিন্তু সাবিত্রী মনে মনে, সত্যবানকে বরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, আমি একবার যাঁকে পতি বলে স্থির করেচি, তাঁকে ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারি না। কন্যার অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দেখে অশ্বপতি সত্যবানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন।"

শিশির মুখখানি নত করিয়া বলিল, "কলিকালেও ত সাবিত্রীর মত কাকেও মনে মনে বরণ করে, আবার অপরকে বরণ কর্‌লে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম থাকে না ?"

তাহার বাক্যাবসানে সরলার বদনপ্রান্তে অল্প হাস্য দেখা দিল। কিন্তু শিশিরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সে হাসি দূর হইল। সরলা দেখিল, শিশিরের মুখমণ্ডল হইতে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "ভগিনি, তোর মন আমি অনেক দিন আগে থেকে জানি। তবে, তোর মুখ থেকে না বেরুলে বাবাকে বল্‌তে পার্‌ছিলুন না।"

শিশির আর কিছু না বলিয়া, তথা হইতে উঠিয়া গেল।

সরলা গৃহমধ্যে একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছিল যে দারিদ্র্য দোষ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েই ব্রজেন্দ্র শিশিরের অযোগ্য পাত্র নহে। কুল, শীল, বিদ্যা প্রভৃতি দেখিলে, ব্রজেন্দ্রের ন্যায় পাত্র পাওয়া কঠিন। পরন্তু শিশির যাহার গলে বরমাল্য প্রদান করিবে, সে কখনও দরিদ্র থাকিবে না। তবে, এ বিষয়ে অনন্তলালের মত হওয়া কঠিন।

সেই রাত্রে, অনন্তলালের ভোজন সময়ে সরলা বলিল, "বাবা, শিশির নিজের সম্বন্ধ নিজেই স্থির করেচে।"

অনন্তলাল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ?"

সরলা বলিল, "সে ব্রজেন্দ্র ভিন্ন আর কাকেও বিয়ে কর্‌বে না।"

অনন্তলাল অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "ব্রজেন্দ্র ? সে কে ?"

সরলা বলিল, "আমাদের ব্রজেন্দ্র।"

"আমাদের ব্রজেন্দ্র ? সে কি কথা ? ব্রজেন্দ্রই তবে বালিকার মন এমন খারাপ করেচে! তার মনে মনে এত দুরভিসন্ধি। সংসারে কারুই চিন্‌তে পারা যায় না দেক্‌চি।"

সরলা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না বাবা ব্রজেন্দ্রের দোষ দেবেন না। তার কোনই দোষ নাই। বিনা অপরাধে কাকেও অপরাধী কর্‌তে নাই।"

অনন্তলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে শিশিরকে এ বুদ্ধি দিলে কে ?"

সরলা বলিল, "কেউ দেয় নাই। আর সে আজকের কথা নয়, ব্রজেন্দ্র এ বাড়ীতে এসে অবধি তার ওপর শিশিরের শ্রদ্ধাভক্তি।"

"কই, আমাকে এত দিন এ কথা বলনি কেন ?"

সরলা উত্তর করিল, "আমি ভেবেছিলাম, সে ছেলেমানুষ, এর পর জ্ঞান হ'লে এ ভাবের পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে। কিন্তু এমন দেখ্‌চি যত জ্ঞান হচ্চে, ব্রজেন্দ্রের ওপোর তার এ শ্রদ্ধা বাড়্‌চে বই কম্‌চে না। আজ স্পষ্ট তার মনের ভাব জান্‌তে পার্‌লাম।"

অনন্তলাল বলিলেন, "তা'হ'লে ব্রজেন্দ্রকে কিছু দিনের জন্য এখান থেকে সরাতে হবে। কিছু দিন দেখতে না পেলেই শিশির তাকে ভুলে যাবে।"

সরলা বলিল, "না বাবা, এ সম্বন্ধে এখন তাকে কিছুই বলবেন না। কাল থেকে তাদের পরীক্ষা আরম্ভ হবে। আপনার মুখে অপ্রীতিকর কোন কথা শুনলে তার মন খারাপ হবে। তা হ'লে হয়ত ভাল পরীক্ষা দিতেও পারবে না। আমাদের দ্বারা গরীবের সে অনিষ্ট যেন না হয়। আর পরীক্ষা দিয়ে সে আপনিই দেশে চলে যাবে।"

"হাঁ, তাও বটে," বলিয়া অনন্তলাল ভোজনান্তে আচমন করিতে উঠিলেন।

যে রাত্রে শিশির সরলার নিকট নিজ বিবাহ সম্বন্ধে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াছিল তাহার পর দিন ব্রজেন্দ্রের এফ-এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইল; সে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে—তখনও গৃহমধ্যে সামান্য অন্ধকার আছে বলিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে—বাটীর প্রায় সকলেই নিদ্রিত, দুই এক জন জাগিয়াছে কিন্তু শয্যাত্যাগ করে নাই, ঘরের দ্বার অর্গলবদ্ধ নাই, কেবল ঠেসান আছে। হঠাৎ বাহির হইতে কে আঘাত করিল এবং দ্বার অবদ্ধ দেখিয়া ভিতরে যাইয়া প্রবেশ করিল। ব্রজেন্দ্র মাথা তুলিয়া দেখিল শিশিরকুমারী দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তথা হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "মাষ্টার মশায়, আজ থেকে আপনাদের পরীক্ষা আরম্ভ হবে?"

ব্রজেন্দ্র বলিল "হাঁ,—শিশির তুমি ত খুব সকালে উঠেছ!"

শিশির সে কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় বলিল "পরীক্ষার পর আপনি বাড়ী যাবেন?"

ব্রজেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "হাঁ, বাড়ী যাব শিশির, অনেক দিন দেশে যাই নি এবার যাবার জন্যে মার বিশেষ অনুরোধ।"

এত কৈফিয়ৎ শিশির চাহে নাই, ব্রজেন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বাড়ী যাইবে কিনা, কেবল তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তবে ব্রজেন্দ্র বোধ হয় তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল—যে দেশে যাইবার বিশেষ কারণটি কি, জানিতে না পারিলে সে সন্তুষ্ট হইবে না।

ইহার পর শিশির আর তথায় দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

যথাসময়ে ব্রজেন্দ্রের পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল এবং সে দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এ কয় দিন শিশির একবারও তাহার সম্মুখে বাহির হইল না দেখিয়া ব্রজেন্দ্রের মনে বড় বিস্ময় হইল।

শিশির ভাবিয়াছিল, সরলাকে সে যাহা বলিয়াছে তাহা পরদিন ব্যতিরেকে প্রকাশ হইবে না। অতএব রাত্রি শেষ হইবা মাত্র এবং সকলে জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই সে একবার ব্রজেন্দ্রের কক্ষে উপস্থিত হইয়া ব্রজেন্দ্র পরীক্ষার পর বাটী যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার পর সে অত্যধিক লজ্জা বশতঃ আর ব্রজেন্দ্রের সম্মুখে বাহির হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, ব্রজেন্দ্র ও তাহাতে কি ভাব তা ত তখন বাড়ীর সকলে জানিয়াছে, লজ্জার কারণ সেইটী!

কিন্তু অনন্তলাল অথবা সরলা, সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং ব্রজেন্দ্র তাহার কিছুই শুনিতে পায় নাই; শুনিলে বুঝিতে পারিত যে, লজ্জাই এ অনুপস্থিতির একমাত্র কারণ।

স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিশিরকে দেখিবার আশা তাহার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল কিন্তু সে আশা সফল হইল না। ব্রজেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না—কেন এমন হইল। সে স্বইচ্ছায় সর্ব্বদা দেখা দিয়া তাহাকে বিমল আনন্দ দান করিত, পরীক্ষার পূর্ব্ব দিন প্রভাতেও উষার সহিত যে তাহার হৃদয়ে বিপুল আনন্দ-আলোকে উদ্ভাষিত করিয়া দিয়াছিল, কেন সে বিরূপ হইল! তবে কি শিশিরও তাহাকে দরিদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করে!

ক্রমশঃ—

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

জোৎস্নাবালা।

———:*:———

কাদের দেশের ফুট্‌ফুটে তুই মেয়ে
কুন্দ হাসি হেসে
ফেল্‌লে সারা সুনীল আকাশ ছেয়ে
পুলক মোহন বেশে।
তোমার চির শুভ্র প্রেমের ধারা
সিক্ত করে অন্তর মোর সারা,
তরল আবেগ ভাসিয়ে ল'য়ে চলে
কল্প-লোকের দেশে।
পাওনি কখন বিরহ কি প্রিয়া
মিলন সুখে সুখী।
উঠ্‌ল জগৎ সোহাগ উথলিয়া
তোমায় বিধুমুখী।
নিথর রাতে মুক্ত বাতায়নে
প্রেমিক ভোলে তাহার প্রিয়া সনে,
সকৌতুকে তখন তাদের পাশে
করছ লুকোলুকী।
তারির রাঙা বৃন্দাবনের বনে
হোলির উজল রাতে।
মাত্‌লে প্রেমের সুধা বরিষণে
তোমার প্রিয় সাথে।

আজও হোলির আবির মাখামাখি।
চলছে সাথে তোমার ডাকাডাকি,
দিচ্ছ আজও প্রেমের কাজল আঁকি
হাজার আঁখি পাতে।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ।

—:*:—

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে 'পরিচারিকা'য় দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই দুইটির সহিত আমার মতের কিছু অনৈক্য হইয়াছিল তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি। এবার তিনি খ্রীষ্টের জন্মদিন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত কিন্তু আমার কোনরূপ মতানৈক্য নাই। তবে সেই প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মনে একটা পুরাতন প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। অখিলবাবু অথবা অন্য কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ যদি ইহার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে সাহিত্যসেবীগণ অবশ্যই আহ্লাদিত হইবেন।

খ্রীষ্টের জন্ম যে ৪ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল এ বিষয়ে মতানৈক্য নাই। তাঁহার জন্ম যে ২৫এ ডিসেম্বর অর্থাৎ ১০ই পৌষে হয় নাই এ বিষয়েও কোন মতানৈক্য নাই। পৌষ মাসে পালেষ্টিনে বর্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু বাইবলে খ্রীষ্টের জন্মকালের যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে তখন বসন্ত কাল। অগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসেই পালেষ্টিনে বসন্ত বিরাজ করে। এই জন্য অগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় জগতের বিশ্বাস। অন্য পক্ষে কৃষ্ণের জন্মও অগষ্ট মাসে হইয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে খ্রীষ্ট যে অগষ্ট মাসে জন্মিয়াছিলেন তাহা শুনিয়াই কি ভারতবর্ষে কৃষ্ণের জন্মকাল অগষ্ট মাসে হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে? প্রশ্নটা

শুনিবামাত্র হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিবেন যে খ্রীষ্টের জন্মকালের সংবাদ জানিয়া যে কৃষ্ণের জন্মকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ইহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয় কথা— কৃষ্ণ যখন খ্রীষ্টের অনেক পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণের জন্মের সময় অনুসারেই খ্রীষ্টের জন্মকাল অগষ্ট মাসে আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার এই প্রশ্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনপেক্ষী ঐতিহাসিকদিগের প্রতি। কেন আমার মনে এ বিষয়ে প্রশ্ন উদিত হয় তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে—খ্রীষ্ট জন্মের অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তখন যে কাহারও জন্মদিন লিখিয়া রাখা হইত এবং লিখিয়া রাখিলেও যে সেই লিখিত বিবরণ দুই বা আড়াই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল তাহা অসম্ভব। কৃষ্ণের সমসাময়িক ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কাহারও জন্মকালের সংবাদ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ যখন দেবত্ব আরোপিত হইয়াছিল তখনই তাঁহার জন্মদিনটা স্থির করা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। তাঁহাতে দেবত্ব আরোপিত হয় মহাভারত প্রণীত হইবার কয়েক শতাব্দী পরে। মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল খ্রীষ্টের অন্তত দুই শত বৎসর পরে। ইহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। আদি পর্ব্বে এক দেশের বিবরণ আছে যেখানকার লোক তাহাদের উপাস্য দেবতার মাংস ভক্ষণ করে। উপাস্য দেবতার মাংস ভক্ষণ যে ইউকারিস্ট্ (Eucharist) নামক অনুষ্ঠান সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। এই অনুষ্ঠান খ্রীষ্টীয় সমাজ ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। খ্রীষ্টের ক্রুশে আরোপিত হইবার পূর্ব্বদিন তিনি স্বীয় শিষ্যদিগকে লইয়া এক সঙ্গে আহার করিবার সময়ে তাহাদের প্রত্যেককে এক খণ্ড রুটি এবং একপাত্র মদ্য দিয়া বলিয়াছিলেন "এই রুটিকে আমার মাংস এবং এই মদ্যকে আমার রক্ত বিবেচনা করিয়া ভক্ষণ কর।" তাহার পর এ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় সমাজে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও ইতিহাসসম্মত। সেই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইউকারিস্ট্ অনুষ্ঠানের কথাও ভারতের লোকের অবিদিত ছিল না। এই অনুষ্ঠানের কথা যখন মহাভারতে আছে তখন মহাভারত যে খ্রীষ্টের পরে লিখিত হইয়াছিল তাহা বোধহয় মানিয়া লইতে হইবে। পদ্মপুরাণ প্রভৃতি সমস্ত পুরাণই যে মহাভারতের কয়েক শত বৎসর পরে লিখিত এমতও সার্ব্বভৌম। কৃষ্ণ যে দেবতা ছিলেন তাহা এই পুরাণকারেরাই

প্রথমে লিখিয়াছেন। তাঁহারা কেমন করিয়া শত শত বৎসর পরে জানিলেন যে তিনি ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মিয়াছিলেন।

অন্য পক্ষে খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল ঐতিহাসিক সময়ে এবং তাঁহার জীবনচরিতগুলিও তাঁহার মৃত্যুর পর শত বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। অথচ তাহাতেও তাঁহার জন্মের দিন অবধারিত হয় নাই। কেবল আনুসঙ্গিক বর্ণনা দেখিয়াই পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যখন পালেষ্টিনে বসন্ত কাল এবং ভারতবর্ষে বর্ষা কাল তখনই তিনি জন্মিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের ইতিহাসে যদি কেবল জন্ম সময় বিষয়েই ঐক্য থাকিত তাহা হইলে এই ঐক্যকে আকস্মিক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারিত। কিন্তু কৃষ্ণধর্ম্মে এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে বা য়িহুদীয়ধর্ম্মে আরও কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। একটা দুইটা সাদৃশ্য আকস্মিক হইতে পারে কিন্তু সাদৃশ্যের সংখ্যা যখন বহু হয় তখন সকলগুলিই আকস্মিক অর্থাৎ একটার অনুকরণে যে অন্য হয় নাই ইহা বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন। সাদৃশ্যগুলি এক্ষণ আমার মনে যতদূর হইতেছে তাহা নিম্নে লিখিলাম।

১। কৃষ্ণ ও খৃষ্টের নামের সাদৃশ। কৃষ্ণ সংস্কৃত শব্দ কিন্তু খৃষ্ট গ্রীক। গ্রীক অনেক শব্দ ঈষৎ পরিবর্ত্তিতভাবে সংস্কৃতে দেখা যায়। গ্রীক কেন্দ্রে (Centre) এব diameter সংস্কৃতে ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া কেন্দ্র এবং জামিত্র হইয়াছে। গ্রীক হোরা অপরিবর্ত্তিতভাবেই সংস্কৃত হোরা হইয়াছে। সুতরাং "খৃষ্ট" যে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিতভাবে "কৃষ্ণ" হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

২। য়িহুদীয় ধর্ম্মগ্রন্থে শয়তানকে সর্পরূপধারী বলা হইয়াছে। ইহা রূপক মাত্র। খৃষ্ট সেই শয়তান বা সর্পকে দমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণও কালীয় দমন করিয়াছিলেন।

৩। উভয়েরই জন্ম অলৌকিক।

৪। উভয়েরই জন্মের পর পলায়ন।

৫। উভয়েরই জন্মকালে রাজশক্তি কর্ত্তৃক শিশুহত্যা।

৬। উভয়েরই শোচনীয় মৃত্যু বৃক্ষের উপরে।

৭। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ এবং পিতরের সাক্ষাতে খৃষ্টের দিব্যরূপ ধারণ।

৮। য়িহুদী ভাষায় ঈশ্বরের নাম যিহোবা কিন্তু য়িহুদীরা এই নামকে এতই ভয় ও ভক্তি করিত যে তাহারা বিশেষ হেতু ব্যতীত ইহা উচ্চারণ করিত না। তাহার পরিবর্ত্তে আদোনাই বলিত। এখনও তাহাদের মধ্যে এই রীতি আছে। যিহোবা বলিলে ঈশ্বরের সহিত মানুষের স্রষ্টা এবং সৃষ্ট সম্বন্ধ বুঝায়। আদোনাই (Adonai) অর্থাৎ প্রভু বলিলে ঈশ্বরের সহিত মানুষের পতিপত্নীর সম্বন্ধ বুঝায়। এই ভাবটাই বোধহয় বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া চরম গতি বা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক বৈষ্ণবই ভাবেন যে কৃষ্ণ তাঁহার পতি এবং তিনি কৃষ্ণের পত্নী। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা নারী-বেশ ধারণ করেন; কাছা দেন না এবং অলঙ্কার ও তিলক ধারণ করেন।

৯। খৃষ্টীয় নববিধানে এবং বাইবলের বহু পরে লিখিত গীতায় যে বহু সাদৃশ্য আছে তাহা বহুজন সম্মত।

এই সকল সাদৃশ্য হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

রূপময়ী।

পাথর চিরে গান গেয়ে বয়
আনমনে ওই নির্ঝরে—
উঠ্‌ছে মধুর ছন্দেঃ গীতি
কানন পাতায় মর্ম্মরে।
আকুল বকুল মুকুলগুলি
হর্ষে ওঠে মুঞ্জরি—
নূতন হরষ-জাগা বুকে
ভ্রমর চলে
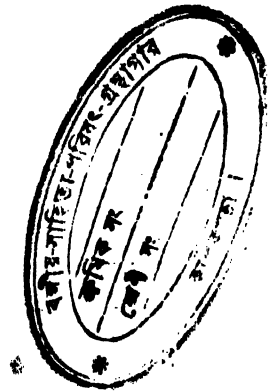
কোন অজানা সুরের রেশ আজ
দখিন বাতাস হিল্লোলে
ছন্দেঃ বুঝি হিন্দোলিছে
কল্লোলিনীর কল্লোলে
জোস্না ধোয়া নিশিথ রাতে
ছুটছে পুলক হর্ষ যে।
বিরহেরই অন্তে এ কি
আকাঙ্ক্ষিতের স্পর্শ এ।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারীশিক্ষা

-:*:-

(আলোচনা)

সম্প্রতি আমাদের স্থানীয় নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান 'সুনীতি একাডেমী' উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এত দিন এখানে ছাত্রবৃত্তি বা মধ্যবাঙ্গলা, মাইনর বা মধ্যইংরাজী পরীক্ষা অবধি শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা অবধি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। ছাত্রীদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য একটী মোটর বাস্‌ও ক্রয় করা হইয়াছে। নারীশিক্ষার এই উন্নত আদর্শের প্রবর্ত্তনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সহরবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

জাতির সমাজের সকল প্রকার উন্নতির জন্য লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ববাদিসম্মত। কেবল মাত্র পুরুষের শিক্ষার দ্বারা লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না, স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের শিক্ষাই যথার্থ লোকশিক্ষা। এই প্রকার লোকশিক্ষাতেই জাতি ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। পুরুষের শিক্ষার সহিত নারীশিক্ষার তুলনায় কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, জাতীয় উন্নতির পক্ষে পুরুষের শিক্ষার অপেক্ষা নারীশিক্ষার উপযোগিতা অধিক, একজন শিক্ষিতা নারীর প্রভাবে যত সহজে একটী পরিবার উন্নত হইতে পারে, একজন শিক্ষিত পুরুষের প্রভাবে তত সহজে পারে না। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা আরও দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, যখন দেখিতে পাই যে দেশের মহৎ উদ্দেশ্যগুলি নারীর সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া বিফল হইতেছে। দেশের এই মঙ্গলময় প্রচেষ্টাগুলিকে সফল করিতে হইলে শিক্ষার দ্বারা নারীর সহানুভূতি জাগ্রত করিতে হইবে। শিক্ষার প্রভাবেই আমাদের মন দেশের কাজে ও দশের কথায় আকর্ষণ বোধ করে, শিক্ষার প্রভাবেই আমরা নিজের কিম্বা আত্মীয়স্বজনের সুখ-সুবিধা ভিন্ন অন্য দশজনের কথা ভাবিতে শিখি, শিক্ষারগুণেই মানুষ দেশের ও সমাজের মঙ্গলের তুলনায় নিজের স্বার্থকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিতে পারে। স্যাডলার কমিশন রিপোর্টে নারীশিক্ষার আবশ্যকতার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "The education of women has the most profound influence upon the whole texture of national life and the whole movement of national thought."

এই ত গেল নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই একটী কথা। এখন প্রশ্ন হইল, কি প্রকার শিক্ষা নারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী—এক কথায় নারীশিক্ষার আদর্শ নির্ণয়।

শিক্ষাসম্বন্ধে আদর্শ স্থির করিতে হইলে আমাদের প্রথম কথা, নারীশিক্ষা—নারীর জন্যই আবশ্যক। পুরুষের মত নারীও ব্যক্তিত্বের গৌরবে ভূষিত, এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাগ্রেই স্বীকার করিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত, পরিণত হইবার সুযোগ ও সাহায্য-প্রদান। নারীশিক্ষার দ্বিতীয় কথা, নারীর সামাজিক জীবনের পরিণতি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সামাজিক জীবনের পরিণতি একটী অপরটীর প্রতিকূল অবস্থা নয়। ব্যক্তিত্ব যেখানে পদে পদে অস্বীকৃত ও অবমানিত

সমাজ সেখানে অচল। ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশের ক্ষেত্রই সমাজ। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে উভয় তীর-মধ্যবর্ত্তী নদীপ্রবাহের মত সমাজ-প্রবাহ সজীব ও সচল থাকে।

শিক্ষার যে আদর্শে আমাদের এই উভয়বিধ জীবনের পরিণতি সম্ভাবিত হয়, তাহাই আমাদের মতে যথার্থ আদর্শ। আত্মোন্নতি, আত্মোৎকর্ষ প্রভৃতি আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিণতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, আবার সমাজের জন্য যে জীবন আমরা যাপন করি, তৎসম্পর্কীয় কর্ত্তব্যপালন শিক্ষা সামাজিক জীব হিসাবে আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয়। নারীশিক্ষার আদর্শ এই উভয় প্রকার শিক্ষার সম্মিলনে গঠিত হউক,—ইহাই আমাদের কামনা।

এখন দেশে নারীশিক্ষার যে প্রতিষ্ঠানগুলি রহিয়াছে তাহাতে এই আদর্শ অনুসৃত হইতেছে কি? সমগ্র বাংলাদেশে নারীশিক্ষার নিমিত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কেবলমাত্র চতুর্দ্দশটী। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্যই মেয়েদের প্রস্তুত করা হয়। সাধারণ রকমের সেলাইর কাজ ও গান শিক্ষার ব্যবস্থা কোন কোন বিদ্যালয়ে রাখা হইয়াছে কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকানুযায়ী তাহাদিগকে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি পড়িতে হয় এবং এই বিষয়গুলিতেই তাহাদের পারদর্শিতা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এই প্রকার শিক্ষাতে নারীর চরিত্র ও মনের পরিণতি ঘটিলেও সামাজিক জীব হিসাবে সাংসারিক জীবনে যে দায়িত্বপূর্ণ স্থান তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞানই তাহার জন্মে না। স্যাডলার কমিশন রিপোর্টে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতই প্রকাশ করা হইয়াছে। Sharp সাহেবও প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী; তিনি বলিয়াছেন, "I regard the Matriculation course as unsuitable for girls, I should be in favour of giving it a more womanly tendency" অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য আমি বালিকাদের অনুপযুক্ত বিবেচনা করি আমি এই শিক্ষা অধিকতররূপে নারীজনোচিত করিবার পক্ষপাতী। Diocesan কলেজের প্রধান কর্ত্রী Miss Victoria বলিয়াছেন যে প্রচলিত শিক্ষা কোনও প্রকারেই নারীর উপযোগী নয়।

সমাজে নারীর স্থানটী কোথায় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সমাজে নারীর কর্ত্তব্যের ধারা তিনটী—পত্নীত্ব, মাতৃত্ব ও গৃহিণীত্ব। সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য নিচয়ের মধ্যে

কয়েকটী কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে—সন্তানপ্রসব, সন্তানপালন, গৃহকার্য্য রন্ধনাদি ব্যাপার, রোগীর সেবা প্রভৃতি। এই প্রকার কর্ত্তব্য আমাদের দেশের সকল নারীকেই পালন করিতে হয় অথচ অনেক স্থলেই শিক্ষার অভাবে অজ্ঞতার দরুণ অতিশয় কুফল ফলিয়া থাকে।

সমাজের সহিত নারীর সম্বন্ধ প্রধানতঃ সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে শিক্ষার কোনও প্রকার ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে থাকে না। আমাদের মেয়েরা তাহাদের মা, মাসী পিসী প্রভৃতির নিকট এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু শিক্ষা পায় সত্য কিন্তু ঐ শিক্ষার সঙ্গে অনেক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস জড়িত থাকে। প্রাচীনাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষাও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুমোদিত শিক্ষার সুযোগ না পাইয়া তাহারা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে এবং এই অবস্থায় মাতৃত্বের গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। এই যে আমাদের নবজাত শিশুর দল মাতৃঅঙ্ক শূন্য করিয়া অকালে ঝড়িয়া পড়িতেছে তাহার জন্য এই অজ্ঞতা কতখানি দায়ী তাহা বিবেচনার যোগ্য। এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বিদ্যালয়ের মেয়েদের এই শিক্ষা প্রদান সম্ভবপর কি না? তাহার উত্তর, বাঙ্গালীর মেয়েকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান বিশেষ কোন কঠিন কার্য্য নয়। বাঙ্গালীর মেয়ের হৃদয়ে বালিকা বয়স হইতেই মাতৃত্বের ভাব অঙ্কুরিত হয়। হিন্দু গৃহের আচার অনুষ্ঠানের নীরব শিক্ষার দ্বারা ও বর্ষীয়সী মহিলাদিগের উপদেশে বিবাহ বন্ধনের পবিত্রতা ও মাতৃত্বের গৌরব প্রভৃতি বিষয় বালিকারা অতি সহজেই অনুধাবন করিতে পারে এ সম্বন্ধে স্যাডলার কমিশন রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"Three instincts and powers show themselvs with significant beauty in the nature of the Indian girl. From an early age she discloses in a very marked degree the instinct of motherhood. This natural disposition is strengthened and evoked by the spoken teaching and silent assumptions of the Hindu home in which she is born." অতএব আমাদের মনে হয় আমাদের কন্যাদিগকে সন্তানপালন, সন্তানপ্রসব, ধাত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইবে না। তবে এ কথা খুবই সত্য যে

এই শিক্ষা উপযুক্ত বয়সের মেয়েদিগকেই দেওয়া হইবে এবং শিক্ষা প্রদানের ভার সুবিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর হস্তে অর্পিত থাকিবে।

আমাদের দেশে খাদ্য সম্পর্কীয় সমস্ত কর্ত্তব্যই নারীদের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কি কি খাদ্যের কি কি গুণ, কোন্ ঋতুতে কি প্রকার খাদ্য স্বাস্থ্যের উপযোগী, রোগীর পথ্য প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ও সাংসারিক জীবনে মেয়েদের জ্ঞাতব্য বিষয়। Hygiene ও Sanitation,, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা প্রণালী আমাদের মেয়েদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী বাংলার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতি বৎসর কাল ব্যাধির প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। খাদ্যাদি সম্বন্ধে অসাবধানতার দরুণ কলেরা প্রভৃতির দ্বারা আমরা আক্রান্ত হইয়া থাকি। অতএব মহামারীর সময়ে আমাদের দেশের নারীদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ তাহাদের অসাবধানতার জন্যই একটী পরিবার উচ্ছন্ন যাইতে পারে। এই সকল বিষয়ও মেয়েদের অবশ্য-পাঠ্য তালিকায় ভুক্ত হওয়া উচিত।

এতদ্ব্যতীত মেয়েদের আরও অনেক বিষয় জানিবার রহিয়াছে। যাঁহারা নারীশিক্ষায় ব্রতী রহিয়াছেন তাঁহারাই এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন এবং পাঠ্যতালিকা স্থির করিবেন। আমরা কেবল চাই জাতিগঠনে আমাদের দেশের নারীর পুরুষের সহিত সহযোগিতা ও সহকর্ম্মিতা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ মহৎ ব্যাপারে পুরুষের অপেক্ষা নারীর দায়িত্ব অধিক।

এ সম্পর্কে আমি অতি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে সুনীতি একাডেমীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা উপরে উল্লিখিত কতকগুলি বিষয়ে (যেমন Sanitation, Hygiene, মুষ্টিযোগ প্রভৃতি) শিক্ষার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা এই বিষয়গুলি আরও পূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হউক। এ সব বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, তবে আমাদের ভরসা আছে যে জনহিতকর কার্য্যে আমাদের শ্রীশ্রীমহারাণী মহোদয়া ও তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ কখনও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সম্প্রতি সহরে প্রজার হিতার্থে অনেক মহৎ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে ; যেমন জলের কলের প্রতিষ্ঠা, বিশাল

চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ প্রভৃতি। আমাদের নিবেদন এই যে নারীশিক্ষার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আরও আকৃষ্ট হউক ও একটী আদর্শ বিদ্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হউক।

শ্রী অশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রসঙ্গ

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন "প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। ওরে বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥" ধর্ম্মের পথে রামপ্রসাদ নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিতে বলিয়াছেন। কিন্তু নিবৃত্তি কাহাকে বলে? ভোগানুরক্তির বিরতিকেই নিবৃত্তি বলে। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি পশু যেমন ভোগ্য পদার্থের অনুসন্ধানে উন্মাদের মত ছুটিয়া যায়, মানুষও তেমনি ভাবে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিচয়ে আকৃষ্ট হইয়া অবিরত চিরচঞ্চল গতিতে সংসারপথে ধাবিত হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই পশু তার নিজ ভোগের পরিণাম চিন্তা বিহীন হইয়া আত্মদমনে অসমর্থ, আর মানুষ আপন বিবেকবলে নিজকে কতক পরিমাণে সংযত করিয়া ধর্ম্মের পথে, মঙ্গলের পথে নিজেকে পরিচালিত করিতে পারে। এই সংযমকেই রামপ্রসাদ নিবৃত্তি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মানুষের ভিতরে—শুধু মানুষ কেন জীবমাত্রের ভিতরেই এই যে প্রবৃত্তি, এই যে ভোগ লিপ্সা—ইহাতেই ভগবানের সৃষ্টির বীজ নিহিত। মানুষের যদি আহার্য্য পদার্থে রুচি না থাকে, স্ত্রী-পুত্র পরিবারে যদি অনুরক্ত না হয়, সংসারের সর্ব্ববিধ বিষয় হইতেই যদি মানুষের নিবৃত্তি ঘটে তবে সমাজের অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়ায় একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। আমরা সূতা দ্বারা মালা গাঁথি, আর ভগবান জীবের ভিতরের এই ভোগ লালসারূপ সূতার সাহায্যে বিশ্বের মালা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই রচনার সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা কি তাহা স্রষ্টা ভিন্ন আর কে বলিবে?

মনু বলিয়াছেন—"ন মাংস ভোজনে দোষঃ ন মৎস্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ভোগানুরক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুতরাং কেউ যদি ভোগ

সুখকেই জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করে তবে তাহাতে তাহার দোষ কিসের ? সে যে প্রবৃত্তির দাস, ক্রীড়নক। এ বিষয়ে হয়ত কাহারও কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে জীব যেন কাহার একটা অজ্ঞাত প্রেরণায় ছুটিয়া চলিয়াছে—সে ছুটিয়া যাওয়াটাকেই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে—প্রেরণার মূল প্রস্রবণ খুঁজিবার বিন্দুমাত্রও অবসর পায় না। ভাতের হাড়ির ভিতরে আলু পটল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়; আলু পটল হয়ত মনে করিতে পারে এ বিক্ষেপের কর্ত্তা তাহারাই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্নিশিখাই যে তাহাদের এবম্বিধ চাঞ্চল্যের কারণ তাহা ভাবিবার অবকাশ তাহাদের নাই। যাহারা নিজেকে সংযত মনে করিয়া অপরকে প্রবৃত্তির দাস বলিয়া ঘৃণাধ চক্ষে দেখিতে চান তাহারা তাহাদের সংযম শক্তির মূল অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিবেন কি ?

পিচ্ছিল পথ, পথে দুইজন পথিক—একজন বালক, অপরটী যুবক। যুবক অনায়াসে পথ অতিক্রম করিতেছে আর বালক পিছনে বার বার পদস্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইতেছে। যুবক পিছনে তাকাইয়া বলিল "ব্যায়াকুব, বাতুল, দুর্ব্বল তুমি, এখনও হাঁটিতে শেখ নাই ?" বালকটী একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "মহাশয়, বোধহয়, বাল্যকালের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন।"

যাহারা ভাগ্যধর, জীবনের কোনো কাজেই যাহাদের বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই, তাহারা অপরের পদস্খলনে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? কিন্তু একথা সত্য যে অধিক সংখ্যক মানুষই পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে বিঘ্নের দুরতিক্রম্য ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইতে হইলে কোন শক্তিধর পুরুষের সাহচর্য্য প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পায় না। এই যে মানুষে মনুষে পার্থক্য—কেহ সহজেই একটা বিষয় আয়ত্ব করিতে পারে, দুর্ব্বার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আপন গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইতে পারে, আর কেহ শত চেষ্টা সত্বেও পথে একপদ অগ্রসর হইতে পারে না—শাস্ত্র ব্যক্তিগত পূর্ব্ব সংস্কারকেই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংস্কারের প্রথম আরম্ভ কোথায় তাহা নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং ভগবদেচ্ছাকেই জীবের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য, উত্তেজনা, বা প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সমীচীন।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ।" রাগ দ্বেষাদি স্বাভাবিক গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে। সুতরাং যে যে কার্য্যই করুক না কেন তাহাতে নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই, জীবমাত্রই প্রবৃত্তির প্রেরণায় কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় মানুষ কর্ম্মফল জানিতে পারিয়াও সেই কার্য্যে পুনঃ পুনঃ নিবিষ্ট হয়; কেন হয়? এ বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তির প্রাবল্যই একমাত্র কারণ। রামপ্রসাদ অতি দুঃখে গাহিয়াছেন "আমি ঐ খেদে খেদ করি; তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে চুরি।" জাগা ঘরে চুরি মানে কর্ম্মের পরিণাম ফল মন্দ জানিয়াও আমরা পুনরায় তাহাতেই আসক্ত হই।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে "তবে কি মানুষের স্বাধীনতা কিছুই নাই?" না; জীবের জীবত্ব চিরদিনই কাল, স্থান ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Time space and causation) দ্বারা সীমা বদ্ধ, এই সীমা বা গণ্ডির বাহিরে যাওয়ার অধিকার জীবের নাই। সে অনেক কথা।

রামপ্রসাদ নিবৃত্তিকে সঙ্গে লইতে বলিয়াছেন কিন্তু মানুষ যদি ইচ্ছা করিলেই নিবৃত্তির পথে চলিতে পারিত তবে আর "তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে চুরি" বলিয়া রামপ্রসাদের খেদ করিতে হইত না। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে যদি কেহ ভগবদেচ্ছা বলে কোন কঠিন প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিবৃত্তির রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তবে তখন সে জানিতে পায় নিবৃত্তির পরমানন্দের সহিত তুলনায় ভোগের চিরচঞ্চল সুখানুভূতি কত তুচ্ছ, কত ঘৃণিত।

যাহা হউক একই ক্রিয়াকে যেমন আমরা আসা ও যাওয়া আখ্যা প্রদান করি, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিও তেমন একই শক্তির অভিব্যক্তি। অগ্নির যে শক্তি প্রভাবে অন্ধকার দূরীভূত হয়, আবার সেই শক্তি প্রভাবেই মানুষের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যায়। সেই প্রকার যে ঐশী শক্তি বলে জীব প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হইয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে, আবার সেই শক্তি প্রভাবেই মানুষ নিবৃত্তির পথে চলিয়া চিরশক্তির অধিকারী হয়। বিচিত্রতাই বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম। ভাল মন্দ, সাধু দুর্বৃত্ত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ লোক চিরদিনই সংসারে আছে ও চিরদিনই থাকিবে। ইহাই বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রায় ও ইহাই তাহার খেলা। সুতরাং সংসারে যে যে ভাবে থাকুক না কেন কাহাকেও দোষ দিও না বা ঘৃণা করিও না। যদি তোমার শক্তি থাকে সাহায্য কর, হাত

ধরিয়া দুর্ব্বলকে পথে লইয়া যাও; সর্ব্বভূতে ভগবানেরই অভিব্যক্তি, তাঁহারই লীলা দেখিয়া আনন্দে ডুবিয়া যাও। তাই যীশু বলিয়াছেন "Hate the sin and not the sinner" পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গুহ।

খাদ্যবীর্য্য বা ভিটামিন

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিকিৎসকগণ পথ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মতের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এতদিন পরে প্রাকৃতিক চিকিৎসকগণের ন্যায় অন্যান্য চিকিৎসকগণও বিশ্বাস করেন যে সভ্য জাতি যাহা আহার করিয়া থাকে তাহার মধ্যে উপযুক্ত মাত্রায় প্রধান পুষ্টিকর উপকরণ থাকা প্রয়োজন। বিশেষ খনিজ দ্রব্যের লবণ, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য, অভ্যাস, স্থানীয় আবহাওয়া ও সেই ব্যক্তি যে পেশা অবলম্বন করিয়াছে তদনু-যায়ী করিয়া কম, বেশী বা পরিবর্ত্তিত রকম খাদ্য তৈয়ার করিয়া সেবন করা প্রয়োজন। এক জনের কাছে যাহা স্বাস্থ্যানুকুল খাদ্য অন্যের কাছে তাহা বিষ হইতে পারে। খাদ্য সম্বন্ধে মত ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং বর্ত্তমান সভ্যতার জন্য আমরা যেরূপ ভাবে খাদ্য প্রস্তুত করি ও যাহা সেবন করি তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক এবং ইহা দিন দিন বুঝা যাইতেছে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অর্দ্ধসিদ্ধ ও অর্দ্ধপোড়া খাদ্য সেবন করিতেন তাহাই স্বাস্থ্যরক্ষার্থে উত্তম ও প্রয়োজনীয়।

খোসাসহ যে গম পিষা হয় তাহা দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিলে সাদা ময়দার রুটি অপেক্ষা উপ-কারী কারণ গম পরিষ্কার করিয়া মিহি সাদা ময়দা প্রস্তুত করিতে গমের অনেক পুষ্টিকর দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। খোসাসহ গম পিষিয়া যে আটা প্রস্তুত হয় তাহা কেবল যে পুষ্টিকারক

তাহা নহে কিন্তু উহা মসৃণ নহে বলিয়া অন্ত্রের কার্য্য বর্দ্ধন করে, সেজন্য উহা কোষ্ঠবদ্ধতার ঔষধ, বর্ত্তমানকালে কোষ্ঠবদ্ধতা এক মহারোগ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া অধিকক্ষণ ধরিয়া খাদ্য রন্ধন করা কিম্বা অত্যধিক উত্তাপে রন্ধন করা সভ্যতার ফলে হইয়াছে। খাদ্যের অনেক পরিমাণ পুষ্টিকারক দ্রব্য তাহাতে নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার উপকারিতা কমিয়া যায়।

খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্যের অবস্থিতির প্রয়োজন সম্বন্ধে সকলের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে অবশ্য অনেকে বলেন যে খাদ্যের মধ্যে খনিজ দ্রব্যের লবণ থাকিলেই আপনা আপনি ভিটামিন থাকিবে। তাহাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ভিটামিন প্রয়োজন নাই। টাটকা শাক সব্জী এবং টাটকা ফল অতি স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য, বিশেষতঃ যাহারা বসিয়া থাকেন বা বসিয়া বসিয়া কাজ কর্ম্ম করেন তাঁহাদের পক্ষে উহা বিশেষ উপকারী। "ক" শ্রেণীর ভিটামিন সবুজ বর্ণের শাক সব্জীতে, পালং শাকে, বাঁধাকপি গাজর এবং শস্যে থাকে। "খ" শ্রেণীর ভিটামিন চাউলের সূক্ষ্ম আবরণে কেবল আছে তাহা নহে কিন্তু উহা অনেক জিনিষে বর্ত্তমান যাহা সেবনে শরীরের বৃদ্ধি হয়; এই ভিটামিন জলে দ্রবণীয়। ইহা উত্তাপে বা বাতাসে সহজে নষ্ট হয় না এবং ইহা দ্বারা গ্রন্থি সকলের ক্ষয় পূরণ ও উহার রস নিঃসরণ বৃদ্ধি হয়। ইহা শস্যে, বাদামে, বিলাতী বেগুনে, লেবুতে, কমলালেবুতে এবং শাকসব্জীতে পাওয়া যায়। "গ" শ্রেণীর ভিটামিন কমলালেবুতে, লেবুতে, বিলাতী বেগুনে, গাজরে, শিমে, লেটুস শাকে, পিঁয়াজে সবুজ শাকসব্জীতে ও নূতন উদ্গত ফসলের মধ্যে পাওয়া যায়। অল্পক্ষণের জন্য তীব্র উত্তাপে এই সকল জিনিষ রন্ধন করিলে উহার ভিটামিন কতকটা নষ্ট হয়।

স্বাস্থ্য সমভাবে রক্ষা করিতে হইলে এই কয় শ্রেণীর ভিটামিন খাদ্যের মধ্যে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। অধিক উত্তাপে বা অল্প উত্তাপে অধিকক্ষণ রন্ধন করিলে খাদ্যের অল্পাধিক পুষ্টিকারিতা গুণ নষ্ট হইয়া যায় সেই জন্য দৈনিক কিছু টাটকা ফল সেবন করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সময়ে পাথর কয়লাতে অধিক উত্তাপ দ্বারা রন্ধন করিয়া থাকি এবং রন্ধনকরা দ্রব্য অধিকতর নরম করিবার অভিপ্রায়ে অধিকক্ষণ রন্ধন করি। সেইজন্য আমরা খাদ্যের যেসকল পুষ্টিকর দ্রব্য নষ্ট করি তাহা পূরণ করিবার জন্য প্রত্যহ কিছু টাটকা ফল সেবন করা আমাদের উচিত। আমরা যে পেশা করিয়া থাকি এবং ব্যক্তিগত কাজ

আবহাওয়ার প্রতি সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদিগের প্রত্যেকের খাদ্য ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সকল ব্যক্তির ও সকল আবহাওয়াতে টাটকা ফল সেবন করা কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

সম্প্রতি জাপানে চারিজন বৈজ্ঞানিক খাদ্যবীর্য্য বা ভিটামিনসম্বন্ধে কয়েকটা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা যদি অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে এক নূতন ও আশ্চর্য্য পথ উন্মুক্ত হইবে। ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য এক প্রহেলিকাপূর্ণ পদার্থ। মানুষ ও অন্যান্য জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ইহা অতি প্রয়োজনীয় এবং ইহা না হইলে জীবনরক্ষা করা চলে না। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর অতি বিচক্ষণ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই খাদ্যবীর্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিতেছেন। কোন খাদ্যে এই খাদ্যবীর্য্য আছে, কোনটাতে নাই; অধিক ভিটামিন সেবনে কিম্বা কম সেবনে মানুষ ও অন্যান্য জীবের শরীরে কি ফল হয় এই সকল বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধান করিতেছেন। এই ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্যের যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে তাহার কয়েকটীকে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে কিন্তু কোন খাদ্যে কি পরিমাণে কোন শ্রেণীর ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য বর্ত্তমান তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে জানা গিয়াছে।

আজকাল সাধারণ লোকেও জানে যে কডলিভার "ক" ও "ঘ" শ্রেণীর দুই রকম ভিটামিন অধিক পরিমাণ বর্ত্তমান। ইহাও জানা গিয়াছে যে "ঘ" শ্রেণীর ভিটামিন খাদ্যে অভাব হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অতিবেগুণি রশ্মি গাত্রে লাগাইলেও সে অভাব পূরণ হয়। "ঘ" শ্রেণীর ভিটামিনের অভাব হইলে অথবা গাত্রে উপযুক্ত মাত্রায় সূর্য্যকিরণ না লাগিলে রিকেট নামক রোগ হইয়া থাকে। এই রোগে অস্থি শীর্ণ ও নরম হয়। খাদ্যে "ক" শ্রেণীর ভিটামিনের অভাব হইলে শিশুদিগের কয়েকপ্রকার চক্ষুরোগ হইয়া থাকে এবং তাহার জন্য অন্ধ হওয়ারও সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া "ক" শ্রেণীর ভিটামিনের অভাবে সকল জীবেরই নানাপ্রকার রোগ হইতে পারে। জাপানে এজন্য চক্ষুরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে জাপানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে কডলিভার তৈল ও সবুজ বর্ণের শাকসব্জীতে এই "ক" শ্রেণীর ভিটামিন বাহির করিয়া ফেলা সম্ভব হওয়ায় একটা বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিষের আবিষ্কার হইয়াছে। এই পদার্থ প্রাণীর বাঁচিয়া থাকার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা লাল ও হরিদ্রাবর্ণ মিশ্রিত তৈলের ন্যায় দেখিতে। ৫৬মণ কডলিভার তৈল হইতে মাত্র অর্দ্ধসের এই পদার্থ

বাহির হইয়াছে। এই খাদ্যবীর্য্য পালং শাকে এবং অন্যান্য শাকাসব্জীতে বর্ত্তমান। শুষ্ক সবুজ বর্ণের পাতার উপরে নানা প্রক্রিয়ার পরে প্রায় এক ছটাক এই পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে ৪০০০০ ভাগ কডলিভার তৈলে উক্ত খাদ্যবীর্য্য একভাগ মাত্র বর্ত্তমান। ইন্দুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পরমাণু পরিমাণ এই পদার্থ উহার দৈনিক প্রয়োজন হয় এবং তাহাতেই উহার স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। মানুষের পক্ষে উক্ত পদার্থ সমগ্র জীবনে অর্দ্ধ ছটাক মাত্র প্রয়োজন হয়। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে অর্দ্ধসের উক্ত পদার্থে কতজন লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে। এই খাদ্যবীর্য্য অধিক পরিমাণে ইন্দুরকে খাইতে দিয়া উহার স্বাস্থ্যনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। ইন্দুরের খাদ্যে যত পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তাহার দুই সহস্রগুণ অধিক খাদ্যবীর্য্য সেবন করিতে দেওয়ার ফলে ইন্দুরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে উহার গাত্রের লোম পড়িয়া যায়, চক্ষুরোগ হয়, শরীর ক্ষীণ হয় অবশেষে পশ্চাদ্দিকের অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়। দেখা যাইতেছে যে খাদ্যবীর্য্য আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে কম হইলে যেমন নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে তেমনি অধিক সেবনেও রোগ হয়।

আমরা জানি যে খাদ্যে ভিটামিন না থাকিলে বেরিবেরি রোগ, চর্ম্মরোগ, নরম অস্থির রোগ প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ছাড়া অনেক প্রকার রোগ হইয়া থাকে যাহার মূল কারণ খাদ্যে ভিটামিনের অভাব। খাদ্যে ভিটামিনের অভাব হইলে প্রথমতঃ শরীর কৃশ হয়, ওজন কমিয়া যায়, রক্ত কম হয়, সহজে শ্রান্তি অথবা কঠিন শ্রম করিতে অক্ষম হয়, পরিশ্রমে সহজেই হাঁপায়, দুর্ব্বলতা, অবসাদ, কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব, হস্ত পদ শীতল বোধ ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই রোগ হয়, সহজে সংক্রামক রোগেও তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ অন্য রোগেও হওয়া সম্ভব সেজন্য কোনও রোগের প্রথমেই বলা যায় না যে ইহা ভিটামিনেই অভাবেই হইয়াছে কি অন্য কোনও রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। ব্যক্তিগত কোন কারণে কিম্বা জাতীয় কষ্টের দরুণ যথা রোগ অবসানে, মানসিক কষ্ট ও বিরক্তিতে যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষে শরীরে যেটুকু ভিটামিন থাকে তাহা ব্যয় হইয়া যায়, তখন উপরোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে সন্দেহ হয় যে, ভিটানের অভাবই এই সকল লক্ষণের কারণ। এই সময়ে রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত এবং কোন খাদ্য ও কি পরিমাণে সেবন করে, তাহা দেখিয়া উহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

খাদ্যে ভিটামিনের অভাব হইলে প্রথমেই পাকস্থলীর গোলযোগ ঘটে সোজা কথায় উহাকে ডিস্‌পেপসিয়া বা অজীর্ণ বলিয়া সকলে সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করে। এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যখন অতিরিক্ত আহার করিতে থাকে তখন সন্দেহ উপস্থিত হয়। মানুষের ভিটামিনপূর্ণ খাদ্য সেবনের জন্য একটা স্বাভাবিক আকাঙ্খা আছে। এই রোগে যদি কোনও লোক একই প্রকার খাদ্য সেবন করে এবং সেই লোক ক্রমাগত আহার করিতে থাকে ও তাহার আহারের প্রবল ইচ্ছা কমে না। এই কারণে তাহার কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। এইরূপ না হইয়া কাহার কাহারও ক্ষুধা কমিয়া যায়, ভেদ, শীরর ক্ষীণ ও উত্তাপ কম হয়। ইহা ব্যতীত পাকরস নির্গত না হওয়ায় ভুক্ত-দ্রব্য পাকস্থলীতে হজম না হইয়া অন্ত্র বাহিয়া চলিয়া যায় তজ্জন্য যাতনা, পেটে কষ্টবোধ ও নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়। খাদ্যে ভিটামিন না থাকার দরুণ রক্তে অম্লাধিক্য হইতে পারে। এই অবস্থায় হজম হয় না ও অম্লরোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে অল্পবয়স্কদিগে বৃদ্ধি বন্ধ হয় ও তাহারা সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ভিটামিনের অভাবে নানপ্রকার রোগ দেখা দেয় যথা রক্তহীনতা, হস্তপদের পেশীর দুর্ব্বলতা, স্পর্শবোধের অভাব, সর্দ্দিপ্রবণতা, সন্ধিস্থলে বেদনা, রক্তস্রাব, চক্ষুরোগ, সহজেই ক্রোধ, হৃদযন্ত্রের আকার বৃদ্ধি ও তাহার দুর্ব্বলতা ঘটে। তাহা ছাড়া সানয়িক অবসাদ, বুদ্ধির প্রাখ্যর্য্যের অভাব প্রভৃতি ও যৌবনে জরা আক্রমণ ও অল্পজীবি এই কারণে হইয়া থাকে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অবস্থার বাঙ্গালী পরিষ্কৃত ছাঁটা চাউল খায় বলিয়া তাহাদের মধ্যে অজীর্ণ রোগ, অক্ষুধা, অম্লরোগ, বহুমূত্ররোগ, পাকস্থলীতে বেদনা হয় ও পাকরসের নানাপ্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে। শাকসব্জীর খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সেই শব্জী রন্ধন করায় ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতিতে বাঙ্গালী আরও অনেক পরিমাণ ভিটামিন নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য বাঙ্গালীর পাকস্থলীর রোগে সর্ব্বপ্রথমে তাহার খাদ্যে ভিটামিনের অভাব কতটা আছে তাহা ঠিক করিয়া 'ক' 'খ' বা 'গ' শ্রেণীর যে ভিটামিনের অভাব তাহা আহার করিতে দিয়া পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

'ঘ' শ্রেণীর ভিটামিন।

বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ 'ঘ' শ্রেণীর ভিটামিনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ক ও ঘ শ্রেণীর ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্যের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ আছে; সেই জন্য সাধারণতঃ এই

দুই ভিটামিন একই পদার্থের মধ্যে এক সঙ্গে পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলের মধ্যে এই দুই ভিটামিন এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দুই শ্রেণীর ভিটামিনের কার্য্য প্রায় একই। 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন শরীর বৃদ্ধি ও গঠনের সহায়তা করে, 'ঘ' শ্রেণীর ভিটামিন শিশুদিগের অস্থির দোষ দূর করে নরম অস্থি সবল করে। মাখন 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন ইহা সেবনে গঠন ও বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহাতে অস্থি গঠন কি নরম অস্থি শক্ত হয় না। অপর দিকে নারিকেল তৈল সেবনে অস্থি গঠন হয় কিন্তু তাহাতে শরীর বৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বে মনে করা যাইত যে যেহেতু 'ক' শ্রেণীর ভিটামিনের গঠন ও বৃদ্ধি প্রদানের শক্তি আছে তাহার অস্থি গঠনের ও দৃঢ় করিবার শক্তিও সেই হেতু বর্ত্তমান আছে।

কডলিভার অয়েল আংশিকভাবে উত্তপ্ত করিলে 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তখনও ঐ কডলিভার অয়েলের অস্থি দৃঢ় করার শক্তি বর্ত্তমান থাকে ইহা 'ঘ' শ্রেণীর ভিটামিনের দ্বারা হইয়া থাকে। এইরূপে এই শ্রেণীর ভিটামিনের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় ও ইহা যে 'ক' শ্রেণীর ভিটামিন হইতে বিভিন্ন তাহা বেশ বুঝা যায়। হংস ও মুরগীর ডিম্বের হরিদ্রাভ অংশে প্রচুর পরিমাণে 'ঘ' শ্রেণীর ভিটামিন আছে সেজন্য নরম অস্থি যাহাদের ও যাহাদের রিকেট রোগ আছে তাহাদের পক্ষে ডিম্বের হরিদ্রা বর্ণের অংশ বিশেষ উপকারী! গোদুগ্ধে ইহা বর্ত্তমান কিন্তু মানব মাতৃদুগ্ধে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। এইজন্য মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশুর নরম অস্থির রোগ হওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা কম, কিন্তু যাহারা পেটেণ্ট দুগ্ধাদি সেবন করে তাহাদিগের মধ্যেই রিকেট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

কাঁচি।

বয়াটে।

—:※:—

(পূর্ব্বপ্রাশিতের পর।)

[পরিচ্ছেদের পূর্ব্বাংশের চুম্বক ;— কিরণের স্বহস্তের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনে নবনী পরিতৃপ্ত হইয়া যখন বলিল—"বেশ তৃপ্তি হল কিরণ, সত্যি বলছি।" তদুত্তরে কিরণ বলিল—"আমার সত্যি গর্ব্ব হচ্ছে তবু খাইয়ে তোমায় তৃপ্তি দিতে পেরেছি।"]

তখন নব্‌নে—"সেই তৃপ্তি দেবার জন্যেই বুঝি আজ এমন অপ্রত্যাশিত এখানে এসে প'ড়েছিলি!" ব'লে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিরণও হেসে বল্লে ;—"সাহেবের হাসিটাও নকল কর্‌ছ বুঝি?"

নব্‌নে আর এক গরাস ভাত মুখে দিয়ে কিরণের মুখের পানে তাকিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে উদ্ধার-আশ্রমের খবর জিজ্ঞেস করে ফেল্‌লে! কথাটা অনেকক্ষণ থেকেই তার মনের ভেতর ওঠা-পড়া কর্‌ছিল ; এই ক'দিন আগেই একদিন সে মনে কর্‌ছিল আর কিছু টাকা হাতে হলেই সাহেবের "উদ্ধার আশ্রমের" রহস্য ভেদ করবার জন্যে বেড়িয়ে পড়বে। আজ মুখো-মুখি কিরণকে পেয়েছে, খোঁজাখুঁজির হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে—কিরণের কাছেই সব শুন্‌বে। কিরণও খুঁটিয়ে-নাটিয়েই আশ্রমের কথা বল্‌লে—নব্‌নে খেতে খেতে শুন্‌লো। শুনে এক এক-বার রাগে কখনও বা জ্বালায়—তার মুখের ওপর বিকৃত এক একটা ভাব ফুটে উঠতে লাগলো। প্রকাণ্ড কাণ্ড। শুন্‌লে সে এক বিস্ময় বলে মনে হবে। আশ্রমের প্রকাণ্ড বাড়ী, চার্‌টে ভাগ। তার একটা 'জননী-আশ্রম' ;—তারই পাশে 'শিশু-মঙ্গল' তা'পর 'আতুরালয়' সকলের শেষে 'চিকিৎসা। চিকিৎসা বিভাগটা মানে আর কিছু নয়—সোজা-সুজি হাসপাতাল। কুড়ি জন রোগীর থাক্‌বার ব্যবস্থা আছে। ডাক্তার, নার্স্‌, কম্পাউণ্ডার সবই আ:ছেন। আবার কবিরাজও আছেন এক জন—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাও সেখানে হয়। গাঁয়ের বাইরে থেকেও ঢের রোগী রোজ ওষুধ নিতে আসে। ওষুধের দাম কি ডাক্তারের 'ভিজিট' লাগে না। খবর

দিলে এখানকার ডাক্তাররা বাড়ী বাড়ী গিয়েও রোগী দেখে আসেন। 'জননী-আশ্রয়টী' অতি গোপন ; সেখানে 'পাশ' নইলে কেউ যেতে পারে না—এবং সাহেবের নিজের দস্তখতে সে পাশ বিলি হয়। অনেক দুঃখিনী জননী সেখানে সন্তান প্রসব ক'রে—সুস্থ হলে—হয় অ বার ফিরে যান—নয় ত আশ্রমেরই সেবার ভার নিয়ে সেইখানেই থাকেন। সন্তানেরা বড় হয়ে তাঁদের পিতার নাম হয় তো ঠিক বল্‌তে পারে না—কিন্তু সাহেবকেই তারা বাবা বলে চেনে। 'শিশু-মঙ্গলে' একটা 'ইস্কুল', খেলার মাঠ ইত্যাদি শিশুর প্রয়োজনীয় সবই প্রচুর যোগাড় করে রাখা হ'য়েছে। 'আতুর-আশ্রয়ে' ব্যাধি-আতুরা নারীদের সেবা ও চিকিৎসা হয়। প্রত্যেক বিভাগের ভার নিয়ে এক একটী জননী আছেন। সব কটাই তাঁদের বশীরনী;—স্নেহে করুণায় মায়েরই মত। তা' নইলে—সেখানকার সাত বালাই মাথায় নিয়ে চলা—সাধারণ মানুষে পারে না। এদিকে কোলাহল ওদিকে আর্তনাদ—

"শিশুমঙ্গলে"—ছেলের ছেলের কুস্তাকুস্তী, মারামারী—পাটকেল মেরে হয়তো একজন আর একজনের কপালটাই ফুটো ক'রে দিল—এই ব্যাপার! আর এই মায়েরা আছেন সব অশান্তি শান্ত ক'র্‌তে! প্রাণ বিলিয়ে দে'য়া—হৃদয়ের শাসনে সবাইকে তাঁরা আপন ক'রে নিয়েছেন। অনেক সময় হয়তো চোখ রাঙিয়ে তাঁদেরও কঠোর হ'য়ে উঠ্‌তে হয়—কিন্তু অন্তরে তাঁদের অলকনন্দার ফল্গুধারায় অমৃত ও মধুর বারি ঝরে।

বলা শেষ হ'তেই "পাজী, গুণ্ডা,—দমবাজ" ব'লে ন'ব্‌নে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কিরণ প্রথমটা 'অবাক' হ'য়েই জিজ্ঞেস ক'র্‌লো—"সে কী—কার কথা ব'লছ?"

ন'ব্‌নে চেঁচিয়ে ব'ললো—"ঐ নন্দিতার সম্পাদক।"

"ও!" ব'লে কিরণ গম্ভীরমুখে ন'ব্‌নেকে জানালো যে তারো চার-পো পাপ পূরে এয়েছে—আর সেই জন্যেই সে এসেছে।

ন'ব্‌নে জিজ্ঞেস ক'র্‌লো—"মোকদ্দমা ক'র্‌বি?"

"আমি আর বাবা দু'জনেই তার নামে নালিশ দায়ের ক'রেছি। বাবা—আমাদের মহকুমায়ও গেছেন—কাজি আর বসন্তকেও আমরা ছাড়্‌বো না।"

"আমার আনন্দে নাচ্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌ছে কিরণ!"—পরের ওপর। শোধ নেবার যে আনন্দে কৈশোরে তার মনে পুলক জেগে উঠ্‌তো—আজও সহসা সেই উল্লাসে উতলা হ'য়ে উঠে ন'ব্‌নে ব'ল্ল—"আমি আজই বেরোবো।"

"কোথায় ?"

"জেলায়—সেখানেই বন্যায় সারা দেশ ভেসে গিয়েছে— এ সময় দেশে যাওয়া আমার একটা কর্ত্তব্যও—বটে।"

ঝটিতি কিরণ মুখটা ফিরিয়ে ব'ল্ল—"তা বরং না হয়—কাল যেয়ো।"

ন'ব্নে ব'ল্লো—"না আজই এই সন্ধ্যেয়ই। সাহেব মহকুমায় গেছেন—সেখানে কাজেই লোকের দরকার।"

কিরণ ন'ব্নেকে মনে করিয়ে দিল তার আঁচানো হয় নি—দুঃখ ক'রে ব'ল্লো—যে একটা অনাহুত হাঙ্গামায়—ন'ব্নের খাওয়াও ভাল হ'ল না।

"খুব খেয়েছি রে— কিরণ !—তুই আজ আমার মন থেকে কি চিন্তার পাষাণ ভারই যে নামিয়ে দিলি—আমি কথা ব'লে তা তোকে বোঝাতে পার্‌বো না—আমি আজই ছাড়্‌বো।" ব'লে ন'ব্নে আঁচাতে গেল। কিরণও এঁটো তুলে নিয়ে বার হ'য়ে গেল।...

ন'ব্নে সেই রাতেই ক'ল্‌কাতা ছাড়্‌লো। বস্তীর সেই পাঞ্জাবীর হাতে ক'ল্‌কাতার কাজের ভার দিয়ে গেল—টাকা কড়ির ব্যবস্থা সব রইল কিরণের হাতে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহাত্মাজীর আত্মজীবনী।

প্রথম অধ্যায়।

ভূমিকা।

—:*:—

(বিজলীর মারফত।)

চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠতম সহকর্ম্মী আমাকে আমার আত্মজীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের অনুরোধ মত, কাজ আরম্ভও করিয়া দিয়াছিলাম।

কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠা শেষ হইতে না হইতেই বোম্বাইয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়, আর সেই কারণে আমার লেখাও সেইখানেই বন্ধ হইয়া যায়। তারপর পরপর এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যার ফলে আমাকে জারবেদা জেলে কিছুদিনের জন্য কয়েদ থাকিতে হইল। জেলে আমার সহ-কয়েদী ছিলেন শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস। তিনি আমাকে সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আমার আত্মজীবনী লিখিয়া শেষ করিতে হুকুম করিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, একটু বিশেষ পড়াশুনা করিব পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছি, তাহা শেষ না করিয়া আত্মজীবনীতে হাত দিতে পারি না। জারবেদা জেলে যদি আমার নির্দ্দিষ্ট কাল কয়েদ থাকিতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিতাম। নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই আমি মুক্তি পাইলাম। সম্প্রতি স্বামী আনন্দও সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ইতিহাস লেখা শেষ হওয়ায় তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে আমার আবার আগ্রহ জাগিয়া উঠিল এবং নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে আমার "নবজীবন" পত্রে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলাম। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, ইহা একবারে লিখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এক সঙ্গে লিখিয়া শেষ করিবার মত সময়ের অভাব হওয়ায়, প্রতি সপ্তাহে একটি মাত্র করিয়া অধ্যায় লিখিতে পারি, জানাইলাম এ-দিকে যখন প্রতি সপ্তাহেই "নবজীবন"-এও কিছু লিখিতে হইবে, তখন তাহা আত্মজীবনীই হোক না কেন? স্বামীজী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, আর তাই আমি আমার আত্মজীবনী লইয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুর মনে সন্দেহ জাগিল (তিনিও আমার সঙ্গে সপ্তাহে একদিন করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করেন)। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কার্য্যে কেন হাত দিলে? আত্মজীবনী লেখা জিনিষটা আসলে পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্য দেশে এমন এক জনকে দেখি না, যিনি আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া পাশ্চাত্যের প্রভাব মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। তুমি কি লিখিবে? কাল যাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে আজ কি তাহাকেই প্রত্যাখ্যান করিবে? তোমার আজিকার কর্ম্মপদ্ধতি যদি ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন কর? যে সকল লোক তোমার কথিত বা লিখিত বাক্যে অবস্থা স্থাপন করিয়া তাহাদের জীবনের ধারা গড়িয়া তোলে, ইহার দ্বারা কি তারা ভ্রমে পড়িতে পারে না? কাজেই এখনই তোমার পক্ষে আত্মজীবনী না লিখিতে যাওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

বন্ধুবরের যুক্তির প্রভাব এড়াইতে পারিলাম না, তবে খাঁটি আত্মজীবনী লিখিবার চেষ্টা আমার উদ্দেশ্য নহে। সত্যের সঙ্গে আমার জীবনে যে পরীক্ষা চলিয়াছিল, তারই বিবরণ আমি

বলিতে চাই। আর আমার জীবন বলিতে ঐ সকল পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নহে। এ-কথা অবশ্য সত্য যে, এই গল্পটিই আত্মজীবনীর রূপে রূপান্তরিত হইবে। যদি ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাই আমার জীবনের পরীক্ষায় ভরপুর হয়, তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইব না। আমার বিশ্বাস,—বিশ্বাস করিতে গৌরব বোধ করি যে, এই সব পরীক্ষার ধারাবাহিক বিবরণ পড়িলে পাঠকের কিছু না কিছু উপকার হইবেই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষার কথা কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নহে, "সভ্য জগতের"ও কেহ কেহ অবগত আছেন। আমার কাছে তাহার খুব বড় একটা মূল্য নাই এবং কাজেই রাজনৈতিক কাজের জন্য যে "মহাত্মা" উপাধি পাইয়াছি, তাহারও যে কিছু একটা মূল্য আছে তাহাও মনে করি না। সময় সময় এই উপাধি আমার বেদনার কারণ হইয়াছে। আমার মনে পড়ে না যে, এই উপাধি আমাকে কখনও বিচলিত করিয়াছে।

অধ্যাত্ম জগতে আমি যে পরীক্ষা চালাইয়াছি এবং যাহার কথা কেবল আমিই জানি, সেই কাহিনীই আমি বলিব। কেন না ইহা হইতেই আমি রাজনৈতিক জগতে কার্য্য করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি। এই পরীক্ষাগুলি যদি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে তাহা হইলে আত্মপ্রশংসার কোন হেতুই থাকিবে না। বরং তাতে আমারই দীনতা প্রকাশ পাইবে। আমি এ বিষয়ে যতই চিন্তা করি এবং আমার গত জীবনের দিকে তাকাইয়া দেখি, ততই আমার যোগ্যতার সীমা আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। আমার জীবনের এই ত্রিশ বছর কাল আমি শুধু নিজকে জানিয়া জীবনে ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিতে অথবা মোক্ষলাভের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। এই আদর্শে পৌঁছিবার জন্যই আমার সমস্ত জীবন ও কর্ম্ম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি যাহা করি, বলি বা লিখি সবই এই একই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া। আমি বিশ্বাস করি যে, যাহা একজনের পক্ষে সম্ভব তাহা সকলের পক্ষেও সম্ভব। আমার পরীক্ষাগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা প্রকাশ্য ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; সুতরাং আমি মনে করি না যে, এই সত্য তাহার আধ্যাত্মিক চরিত্র থেকে এতটুকু বাহিরে গিয়া পড়ে। এমন কতকগুলি কাজ সম্পাদিত হয় যাহা মাত্র এক জনেরই জানা থাকে, আর তাহা জানেন সে ব্যক্তির স্রষ্টা। এই সব বিষয় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় না। আমি যে সকল পরীক্ষার কথা বলিতে চাই তাহা সেরূপ নহে। তবে তাহা আধ্যাত্মিক বা নৈতিক, কেন না নীতিই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের যে সকল নিয়ম বালক, যুবক বৃদ্ধ সকলেই বুঝিতে পারিবে, এই আখ্যায়িকায় তাহাই লিপিবদ্ধ হইবে।

আমি যদি আমার এ কাহিনী খুব সরল ও যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে বর্ণনা করিতে পারি তাহা হইলে আর যাহারা এরূপ পরীক্ষায় ব্রতী হইবেন তাঁহাদের পক্ষে নিশ্চয় অনেক সুবিধা হইবে। আমার এই পরীক্ষা যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ইহা আমি কখনো মনে করি না।

বৈজ্ঞানিক যেমন, তাঁহার সমস্ত সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের পর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সমস্ত রকম চিন্তার অনুশীলনের দ্বারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন—সে সিদ্ধান্তের সর্ব্বশেষ অভ্রান্ততা সম্বন্ধে যেমন তিনি কোনও রকম দাবী না করিয়া আপনার অন্তরকে নিরপেক্ষ রাখিতে সক্ষম হন—আমিও সেইরূপ আমার সমস্ত পরীক্ষা-লব্ধ সিদ্ধান্তের সর্ব্বশেষ যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনও দাবী রাখি না।

আমার অন্তরে গভীর তলদেশে সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজিয়া দেখিয়াছি এবং প্রত্যেক মানসিক অবস্থাটিকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা ও যাচাই করিয়া দেখিয়াছি এবং আমি যে সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি তাহাই যে চরম ও অভ্রান্ত তা কখনো আমি মনে করি না। একটি মাত্র দাবী আমার আছে তাহা এই—আমার পক্ষে তাহা একেবারে শুদ্ধ, তাতে ভুল ত্রুটি এতটুকু নাই। এবং সময়ে সময়ে ইহাই শেষ পরিণতি এরূপ মনে হইত। কেন না যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমি কোন কার্য্যই করিতাম না। তবে আমি প্রতিপদক্ষেপে গ্রহণ ও বর্জ্জনের নিয়ম মানিয়া চলিয়াছি এবং তদনুসারে কার্য্যও করিয়াছি এবং যতক্ষণ আমরা কার্য্যাদি যুক্তি ও মনের পুরো সায় না পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুরাতন সিদ্ধান্ত কখনো আমি পরিত্যাগ করি না।

সত্যের পূজা

পুঁথিগত নিয়ম-কানুনের আলোচনা করাই যদি প্রয়োজন হইত তাহা হইলে আমি এই আত্মজীবনী রচনায় হাত দিতাম না আসলে ঐ সকল নিয়ম-কানুনের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য। এই কারণে আমার প্রবন্ধগুলির

নাম দিয়াছি "সত্যের সঙ্গে যে অবিরাম পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম তাহার কাহিনী।" বলা বাহুল্য, অদ্রোহ, চিরকৌমার্য্য ও মানব-জীবনের অন্যান্য আচার-পদ্ধতির সঙ্গেও যে পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম তাহাও এই সকল প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। কিন্তু আমার কাছে সত্যই চরম বিধি এবং আরো শতকগুলি বিধিও ইহার অঙ্গীভূত। এই সত্য কেবলমাত্র মৌখিক সত্যবাদিতাই নহে, পরন্তু মানসিক সত্যবাদিতাও বটে। এবং ইহা কেবলমাত্র আমাদের ধারণার আপেক্ষিক সত্যই নহে, বরং ইহা নিগুর্ণ সত্য, শাশ্বত বিধি, অর্থাৎ ভগবান। ভগবানের বহু সংজ্ঞা আছে, কেন না তাঁহার রূপও বহু। তাহারা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে এবং একটা সম্ভ্রমের ভাব আনিয়া দেয়। ফলে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমি বিহ্বল হইয়া পড়ি। কিন্তু আমি কেবলমাত্র সত্যকে মনে করিয়াই ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকি। তিনিই একমাত্র অকৃত্রিম, আর সবই কৃত্রিম। আমি আজো তাঁহাকে পাই নাই, তবে তাঁহার সন্ধানে এখনো আছি। এই সন্ধানের জন্য আমার জীবনের প্রিয়তম সব কিছুই আমি উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, ইহার জন্য যদি আমাকে জীবনও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও আমি দিতে পারি বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু যতদিন না আমি এই নিগুর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিব ততদিন ব্যবহারিক সত্য বলিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। সেই ব্যবহারিক সত্যই ততদিন আমায় পথ দেখাইয়া নিবে, সে-ই হইবে আমার বর্ম্ম, আমার আশ্রয়। এই পথ সঙ্কীর্ণ বন্ধুর এবং ক্ষুরধার হইলেও আমার পক্ষে তাহা সঙ্কীর্ণতম ও সব চাইতে সহজ। এমন কি, আমার সব চাইতে বড় ভ্রান্তিও আমার কাছে নগণ্য মনে হয়, কেন না আমি এই পথটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছি এই পথই আমাকে দুঃখ শোকের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। এবং আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসই আমাকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে। সময় সময় অস্পষ্ট ক্ষণিকালোকে নিগুর্ণ সত্য, ভগবান এবং তিনিই যে একমাত্র অকৃত্রিম এই বিশ্বাস. দিনের পর দিন আমার মনে বাড়িয়া চলে। আমার জগৎ অর্থাৎ যাহারা এই লেখা পড়িবে বা আমার সংস্পর্শে থাকিবে, তাহারা, কেমন করিয়া এই বিশ্বাস আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল তাহা এবং যদি তাহারা পারে তাহা হইলে আমার পরীক্ষার অংশ ও আমার বিশ্বাসের অংশ গ্রহণ করুক। আমার মধ্যে আর একটি বিশ্বাস জন্মলাভ করিয়াছে তাহা এই যে, আমার পক্ষে যাহা করা সম্ভবপর, একটি শিশুর পক্ষেও তাহা সম্ভব। এবং আমার এ কথার অকাট্য যুক্তিও আছে। সত্যানুসন্ধানের

উপায় যেমন সহজ তেমনি কঠিন। সত্যানুসন্ধানের উপায়গুলি গর্বিত ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু একটি সরল চিত্ত শিশুর পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভব। যিনি সত্যানুসন্ধানে ব্রতী তিনি ধূলিকণার চাইতেও বিনীত হইবেন। পৃথিবী তার পায়ের নীচে ধূলিকণাকে দলিত করিয়া চলে, কিন্তু সত্যানুসন্ধানীকে এতটা বিনয়ী হইতে হইবে যে, ধূলিকণাও যেন তাঁহাকে দলিত করিতে পারে। তবেই তিনি (তার আগে নয়) সত্যের রূপ দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথোপকথনে ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম্মেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদি কোন পাঠক আমার এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে গর্ব্বের একটুকু গন্ধও পান তাহা হইলে তিনি যেন তাহা এই মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করেন যে, আমার তত্ত্বানুসন্ধানের কোথাও ত্রুটি বা দোষ রহিয়া গিয়াছে এবং আমার সত্য-দৃষ্টি মায়া-মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমার মত শত শত লোক ধ্বংস হইয়া যাক কিন্তু তবু সত্যের জয় হোক। আমার ন্যায় ভ্রান্ত মানবের পক্ষে বিচার করিতে যাইয়া সত্যের আদর্শকে এক চুলও যেন খাট না করি।

আমি আশা করি এবং অনুরোধ করি যে, আমার এই লেখাকে কেহ যেন প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ না করেন। আমার এই কাহিনীতে যে পরীক্ষাগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার দ্বারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষায় ব্রতী হইতে সাহায্য পাইবেন। আমার বিশ্বাস এ-গুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ লোকের অনেক কাজে আসিবে। কেন না যে সকল কুৎসিৎ বিষয় প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক তাহা আমার দ্বারা কখনও গুপ্ত বা অযথোচিত ভাবে লিখিত হইবে না। আমার জীবনে যে সব দোষ ত্রুটি ও ভুল ভ্রান্তি হইয়াছে সেগুলির সঙ্গে পাঠকের সম্যক পরিচয় করিয়া দিতে পারিব বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমি যে পরীক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলাম, তাহার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করাই আমার কাম্য, আমি কত ভাল তাহা বর্ণনা করা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজেকে বিচার করিতে যাইয়া আমি সত্যের ন্যায় কঠোর নির্ম্মম হইতে চেষ্টা পাইব। কেন না আমিও যে চাই, অপরেও সেরূপ হোক। এবং নিজেকে সেই আদর্শের মাপে মাপিয়া সুরদের সঙ্গে যেন বলিতে পারি—

"আমার ন্যায় অধম হতভাগ্য ঘৃণিত ব্যক্তি আর কোথায় আছে ? আমি আমার স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি এমন বিশ্বাসহন্তা।"

আমি যে এখনো তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে আছি, ইহা আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করিতেছে। আমি এ-কথা বেশ ভাল করিয়াই জানি যে, তিনিই আমার জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসটিকে চালাইতেছেন এবং তাঁহা হইতেই আমার জীবন। এ-কথা আমি জানি যে, আমার মধ্যেকার দুষ্ট ইন্দ্রিয়ই আমাকে তাঁহার নিকট হইতে এত দূরে রাখিয়াছে। এ সত্য জানিয়াও আমি ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না।

কিন্তু এইখানেই আমাকে থামিতে হইবে, কেননা পরের অধ্যায় হইতে আসল আখ্যান আরম্ভ করিতে হইবে।

ক্রমশঃ—

রঙ্গরস।

—:#:—

তারকের বউ ও মেয়ে দু'ই-এরই মরণাপন্ন ব্যামো। বন্ধু এসে ব'ল্লে—"তারক, বউএর তো শক্তই ব্যামো—ভাব্‌বার কথা ; কিন্তু মেয়েটাকে দেখো শুনো"—

তারক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলে—"ওরে ভাই ঘরই যদি যায়—তো দাবান্দা রেখে আর কি এগোবে ?"

** ** ** **

হাকিম। (সাক্ষীকে) তোমার বয়েস কত ?

সাক্ষী। চোদ্দ বছর।

হাকিম। (আশ্চর্য্য হইয়া) চোদ্দ বছর ? সে কি হে ? ইয়া গোঁপ, বিঘত খানেক লম্বা দাড়ি—অমন গেটে দেহ—তোমার চোদ্দ বছর ?

সাক্ষী। হুজুর, এই গোঁপ-দাড়ি আমার না—বাবা তারকনাথের,—আমি এনেছি ? সে তো ঐ আবাগের বেটার। হুজুর, চোদ্দ বছরই লিখে নিতে আজ্ঞা হয়।

"অমল"

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৯ম বর্ষ। } চৈত্র, ১৩৩২ সাল। { ১২শ সংখ্যা।
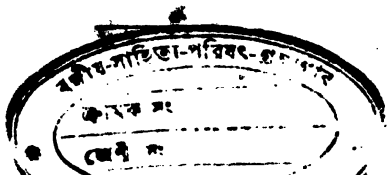
মাটীর ব্যথা।
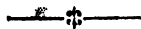
তোরা কি বুঝিবি শ্যামল বুকের
গোপন মর্ম্মে কি জ্বালা বহি'
শত হতাদর, বঞ্চনা, গ্লানি
দীর্ঘনিশ্বাসে লুকায়ে সহি'!
আপন বুকের রস নিঙারিয়া—
স্নেহের দুলালে রাখি সরসিরা;
স্তন্য-ধারার অভাবে নিয়ত
রক্ত-ব্যথার জ্বালায় দহি'!

মোর মধু-মাস করিয়া হরণ

শাখে, শাখে ভাতি ফুটিয়া উঠে

আমার জীবন চরণে দলিয়া

মুঞ্জরি' শাখী নিয়ত লোটে !

আমার বসন হরণ করিয়া

কাপ্‌াস জাগে শাখা দোলাইয়া—

আপন ভোগ্য অশনে, বসনে

ভাগ নিতে হেরি' সকলে জোটে !

মুকের বেদনা মুখর হইয়া

মরুভূ-গাথায় যখন নাচে—

তখন আমার মত্ত বেদনা

মরমীর কাছে দরদ যাচে !

তার আগে কেবা বোঝে হতাশায়—

নিশিদিন ঝরে কত জল হায় !

পঞ্জর-কাঁপা রিক্ত ব্যথায়

অভাগিনী হায় কেমনে বাঁচে !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ।

চতুর্থ প্রস্তাব,—দ্বিতীয় অংশ।

ব্রাহ্মণাগমনের কাল-বিচার।

গত প্রস্তাবে আদিশূরের কাল-সম্বন্ধে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহার এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন মতের কথিত প্রত্যেক সময় সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, সেই সময়ে গৌড়-বঙ্গে এবং কন্নৌজে কোন কোন রাজার রাজত্ব করার সম্ভাবনা, তাহার দুইটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তালিকা দুইটিতে বারটি বিভিন্ন বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম তিনটির মতে আদিশূরের কাল খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত, পরের দুইটির মতে নবমশতাব্দীর শেষার্ধে, তাহার পরের চারিটির মতে দশমশতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-পাদে, এবং শেষ তিনটির মতে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-পাদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১)। এই মতগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ মতেই আদিশূর এবং তৎকর্ত্তৃক বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণানয়নের কাল খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীর শেষ-পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-পাদে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাঙ্গালী রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলক্রমাগত ঐতিহ্য এবং সমসামরিক দলীলের বিচার করিলে এই অধিকাংশমতের নির্দ্দিষ্ট সময়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কেন যে তাহা পারা যায় না,—তাহাই এক্ষণে দেখিতে হইবে।

১। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের লাহেড়াবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, রাজা শ্রীধর্ম্মপাল সুরধুনী-তীরে সুখে বসতি করিবার নিমিত্ত ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি বিপ্রকে "ধামসার" নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন (২)।

---

(১) গত ফাল্গুন সংখ্যা পরিচারিকার ৭৩৬ এবং ৭৪০ পৃষ্ঠা।

(২) "রাজাশ্রীধর্ম্মপালঃ সুরসমরধুনীতীরদেশেবিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রংগুণযুতনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামংতস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশংপ্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥"
লাহেড়ীবংশাবলী, বঙ্গেরজাতীয় ইতিহাসধৃত, প্রথমভাগ, প্রথমাংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা।

ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এবং আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে একজন। তাঁহারই ধারা হইতে বারেন্দ্রদিগের "বাগছি" এবং "লাহেড়ী" গাঞি বা উপাধির কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়ীয়দিগের "বন্দ্যঘটী" (বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি উপাধির কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তির কথা কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়। যদি ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝা পালবংশীয় বিখ্যাত সম্রাট্ ধর্মপালের নিকট গ্রাম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণাগমন খৃষ্টীয় নবমশতাব্দের অন্তিমপাদে হইতে পারে না। ধর্মপাল পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পুত্র এবং গোপালদেবের রাজ্যলাভের কাল খৃষ্টীয় ৭৫০ হইতে ৭৯০ অব্দ পর্যন্ত; এবং ধর্মপালদেবের রাজ্য-লাভকাল খৃষ্টীয় ৭৮০ হইতে ৮৩১ অব্দ পর্যন্ত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন (৩)। লাহেড়ী বংশাবলীর এই সংবাদ সত্য হইলে বাঙ্গালায় ভট্টনারায়ণ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের আগমন শ্রীগোপালদেবের রাজ্য সময়ে ঘটিয়াছিল; এবং তাহা হইলে তাঁহারা খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর শেষার্ধে কোন এক সময়ে এদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন, বলিতে হয়।

২। দিনাজপুর বাদাল গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়ে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বীরদেব নামক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং তাঁহার বংশে জাত "পঞ্চাল" নামক ব্রাহ্মণ মহারাজ ধর্মপালের সমসাময়িক এবং তাঁহার পুত্র গর্গ ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই শাণ্ডিল্য-গোত্রের ব্রাহ্মণবংশীয় গর্গ, দর্ভপাণি, সোমেশ্বর, কেদারমিশ্র এবং গুরবমিশ্র যথাক্রমে ধর্মপাল, দেবপাল, বিগ্রহপাল প্রথম (শূরপাল) এবং নারায়ণপালের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন (৪)। ধর্মপালদেবের খালিমপুর-লিপির দ্বাদশ শ্লোকে (৫) ধর্মপালের মন্ত্রীস্থানীয় "পঞ্চাল-বৃদ্ধের" উল্লেখ আছে। এই বাদাল স্তম্ভলিপি এবং খালিমপুর-লিপি প্রভৃতি হইতে অনুমিত হয় যে,

(৩) গোপালদেবের রাজ্যারম্ভকাল ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে ৭৫০, ডাক্তার রমেশচন্দ্রের মতে ৭৭৩, রাখালবাবুর মতে ৭৮৫—৭৯৯ খৃষ্টাব্দ। ধর্মপালের রাজ্যারম্ভকাল ডাক্তার রমেশচন্দ্রের মতে ৭৮০, রাখালবাবুর মতে ৭৯০—৭৯৫, ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে ৮১০, রমাপ্রসাদ চন্দের মতে ৮১৫ এবং কনিংহামের মতে ৮৩১ খৃষ্টাব্দ।

(৪) গৌড়লেখমালা (প্রথমস্তবক)।

(৫) গৌড়লেখমালা (প্রথমস্তবক)।

গুরবমিশ্রের বীজ-পুরুষ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বীরদেব ধর্মপালদেবের অভিষেকের অনেক কাল পূর্বেই গৌড়দেশে বসতি করিতেছিলেন। "গৌড় লেখ-মালায়" বাদালস্তম্ভ-লিপির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণবংশ রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, বাদাল-স্তম্ভের প্রশস্তিকার কবি গুরব-মিশ্রকে ভৃগুরামের সহিত উপমিত করিয়াছেন; সুতরাং এই শাণ্ডিল্যগোত্র জমদগ্নি-গোত্রের ধারা; পরন্তু, রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র শাণ্ডিল্যগোত্র কশ্যপ ঋষির ধারা;—অতএব উভয় গোত্র নামে "শাণ্ডিল্য" হইলেও মূলতঃ এক নহে। প্রশস্তিকারের "জমদগ্নি-কুলোৎপন্নঃ রামইবাপরঃ" বাক্যাংশ হইতে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় গুরবমিশ্রকে "জমদগ্নি"-গোত্রজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; আর গুরব-মিশ্রের "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ" বিশেষণ হইতে ভৃগুরাম-পক্ষে "সমৃদ্ধক্ষত্রিয়দিগের নিধনকারী" এবং গুরবমিশ্রের পক্ষে "সম্পৎ-নক্ষত্র-চিন্তকঃ"—অর্থাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্রপারগ এই শ্লিষ্ট অর্থ বাহির করিয়া তিনি এই শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ শাকদ্বীপীয় বা গ্রহ-বিপ্রজাতীয় ছিলেন, এরূপ আভাস দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় প্রগাঢ় ঐতিহাসিক এবং তাঁহার মতের উপর আমাদের বিশেষ আস্থা এবং সম্মান বোধ আছে; তথাপি, এক্ষেত্রে তাঁহার উপন্যস্ত যুক্তি সুসমীচীন বোধ না হওয়ায় গ্রহণ করিতে পারি নাই। গোত্র-মালায় দেখা যায় যে, যাবতীয় গোত্র মূল সাতটি ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শাণ্ডিল্য গোত্র মরীচিপুত্র কশ্যপঋষির এবং জমদগ্নিগোত্র ভৃগুঋষির ধারা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং জমদগ্নিগোত্র হইতে শাণ্ডিল্যগোত্র কিছুতেই উদ্ভূত হইতে পারে না। নক্ষত্রশাস্ত্র উত্তমব্রাহ্মণ-গণেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিষয় ছিল; এরূপ অবস্থায় বীরদেব ব্রাহ্মণের বংশ রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-বিপ্রগণের সগোত্র এবং সমান জাতীয় হওয়ার কোন বাধা দেখা যায় না। আমাদের মনে হয় যে, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশ গোপালদেবের রাজ্যারম্ভের (খৃঃ অষ্টমশতাব্দের মধ্যভাগের) অনেক পূর্বকাল হইতেই বাঙ্গালার নানা স্থানে বসতি করিতেছেন। বীরদেবের বংশের ব্রাহ্মণগণ যে বৈদিক যাগযজ্ঞ রীতিমত ভাবে সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহাদের আশ্রয়দাতা পাল নৃপতিগণ যে তাঁহাদের যজ্ঞভূমিতে গমন পূর্বক ভক্তির সহিত যজ্ঞের শান্তিবারি এবং ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন, তাহা উক্ত বাদাল-স্তম্ভলিপিতে সুস্পষ্টভাবেই উক্ত আছে।

৩। আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের মধ্যে সাবর্ণ-গোত্রীয় বেদগর্ভ (মতান্তরে পরাশর) নামক ব্রাহ্মণের নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বারেন্দ্র শাখায় কেহ কৌলীন্য

মর্যাদা লাভ করেন নাই, রাঢ়ীয় শাখায় "গাঙ্গুলী" বা "গঙ্গোপাধ্যায়" উপাধির "শিশু" কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন। রাঢ়ী-বারেন্দ্র উভয় শাখায়ই এই গোত্রের শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অস্তিত্ব আছে। বাঙ্গালা সামবেদী ব্রাহ্মণগণের পদ্ধতিকার বিখ্যাত ভবদেব ভট্ট এই সাবর্ণ গোত্রীয় "সিদ্ধল" গ্রামীণ শ্রোত্রীয়-কুলজাত ছিলেন। ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে বিন্দু-সরোবর এবং তাহার তীরস্থ অনন্ত বাসুদেবের মন্দির এই ভবদেব ভট্টের কীর্তি। এই মন্দিরের প্রাচীরের সংলগ্ন একটি শিলালিপিতে ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। তাঁহার মিত্র বাচস্পতি মিশ্র এই প্রশস্তির রচয়িতা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ এই শিলালিপির পাঠ এবং একটি অতি ক্ষুদ্র প্রতিলিপি তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণকাণ্ডের প্রথমাংশে ছাপাইয়াছেন। এই শিলালিপি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে ভট্ট ভবদেব তদানীন্তন বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানাবিধ অনুসন্ধান করত হরিবর্মদেবের কাল খৃঃ ৯৫০—১০০০ বর্ষের মধ্যে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (৬)। ভুবনেশ্বরধামের এই প্রশস্তিখানি বাঙ্গালার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত মূল্যবান্ দলীল। ঐ প্রশস্তির সারাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"সাবর্ণ মুনির সুমহৎ কুলে যে সকল বেদজ্ঞ (শ্রোত্রিয়) ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ রাজ-প্রদত্ত শতশত গ্রামে বাস করিতেন। তাহাদের মধ্যে আর্য্যাবর্তের ভূষণ স্বরূপ এবং রাঢ়াশ্রীর (রাঢ় দেশের লক্ষ্মীর) অলঙ্কার রূপ সিদ্ধল গ্রামই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। সেই সাবর্ণবংশ এই সিদ্ধল গ্রামে নানা প্রকারে সমৃদ্ধ এবং বদ্ধমূল হইয়াছে। সেই বংশের চূড়ামণি স্বরূপ নিখিল বিদ্যার আকর ভবদেব (প্রথম) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়াধিপতির নিকট হইতে শ্রীহস্তিনী নামে একখানি অতিশয় সুন্দর গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আটটি পুত্রের মধ্যে রথাঙ্গ নামক পুত্র বিখ্যাত হন। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ (তাঁহার অন্য নাম ফুরিত) এবং অত্যঙ্গের পুত্র বুধ। বুধের আদিদেব নামক পুত্র জন্মে; এই আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী, মহাপাত্র এবং সন্ধি-বিগ্রহী ছিলেন।

---

(৬) "হরিবর্মদেব খৃঃ ৯৫০—১০০০ মধ্যে বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।" "সম্বোধন" প্রস্তাব; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩ সাল ৮১—৯৪ পৃষ্ঠায়। বিশেষতঃ ৯২ পৃষ্ঠা।

আদিদেবের গোবর্ধন নামে পুত্র হয়, তিনি বাহুবলে এবং বিদ্যাবলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গোবর্ধন বন্দ্যঘটী বংশীয়া সুজনীয়া সাঙ্গকা নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই গোবর্ধনের ঔরসে এবং সাঙ্গকার গর্ভে বিখ্যাত ভবদেব ভট্ট জন্মিয়াছেন। এই ভবদেব শস্ত্রে এবং শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ও বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। হরিবর্মদেব বহুকাল রাজত্ব করিয়া স্বর্গগত হইলে ভবদেব হরিবর্মদেবের পুত্রেরও মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। ভবদেবের "বালবলভীভুজঙ্গ" উপাধি ছিল এবং তিনি বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি-ন্যায়-জ্যোতিষাদি সর্বশাস্ত্রে অত্যাশ্চর্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। এই ভবদেব ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের অত্যুচ্চ এবং সুবিশাল প্রাসাদ এবং অতি বিস্তৃত "বিন্দুসরোবর" নামক বিখ্যাত জলাশয় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত রাঢ়দেশের জল-শূন্য জাঙ্গল পথে, গ্রামের উপকণ্ঠে এবং নানাস্থানে জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিতবর বাচস্পতি মিশ্র কবিজনোচিত অলঙ্কারচ্ছটাদ্যোতিত সুললিত দৈবীভাষায় এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। আমরা উহার অতি সামান্য অংশই নীরস এবং নিরাভরণ বাঙ্গালা-গদ্যে প্রকাশ করিলাম। এই প্রশস্তি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে বাচস্পতি মিশ্র বঙ্গাগত সাবর্ণ গোত্রীয় বীজপুরুষের নাম ও অবগত ছিলেন না। তাঁহার রচনা পাঠে বোধহয় যে রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা স্মরণাতীত কাল হইতেই সুখবাসে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—

সাবর্ণ গোত্রীয় সিদ্ধল গ্রামীণ প্রথম ভবদেব (হস্তিনী গ্রাম প্রাপ্ত)

(২) রথাঙ্গ (এবং আরও ৭ পুত্র)
|
(৩) অত্যঙ্গ (নামান্তর স্ফুরিত)
|
(৪) বুধ
|
(৫) শ্রীআদিদেব (বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী)
|
(৬) গোবর্ধন + সাঙ্গকা (বন্দ্যঘটীয়া)
|
(৭) ভবদেব ভট্ট বালবলভীভুজঙ্গ (বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের মন্ত্রী)।

এই বংশলতা হইতে দেখা যাইতেছে যে ভট্ট ভবদেবের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ প্রথম ভবদেব হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যকালের অন্ততঃ ১৫০ দেড় শত বৎসর পূর্বে বা আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান্ ছিলেন এবং তিনি কোনও গৌড়রাজ্যের নিকট হইতে হস্তিনী নামক একটি গ্রাম পাইয়াছিলেন। এই ভবদেবের (খৃঃ ৮০০ অব্দের) কত কাল পূর্বে যে সিদ্ধল গ্রামে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথম বসতি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা কে জানে ? প্রশস্তিকার বাচস্পতি মিশ্র অথবা ভট্ট ভবদেব যদি আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়নের গল্প জানিতেন, অথবা কন্নৌজ হইতে আসিয়াছেন এরূপ পরিচয় দিলে সেকালে পূর্ব পুরুষের সম্মানবৃদ্ধি হইত বুঝিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আদিশূরের এবং কন্নৌজের নাম গ্রহণ করিতে তাঁহারা ত্রুটি করিতেন না। এই কারণে আমাদের ধারণা হয়, যে, এই প্রশস্তি-রচনার সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আদিশূর অথবা কন্নৌজের প্রবাদ জন্ম পরিগ্রহ করে নাই। আরও দেখা যাইতেছে যে, ভট্ট ভবদেবের জননী বন্দ্যঘটীয়ের অথবা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। সুতরাং রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটী গাঁই (শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়) ও সাবর্ণগোত্রীয় সিদ্ধল গাঁই এর ন্যায় খুব প্রাচীন বলিতে হইবে।

হরিবর্ম-দেবের একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে, রাজা বৎসগোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবৎ-ঔর্ব-জমদগ্নি-প্রবরযুক্ত ঋগ্‌বেদী ভট্ট পদ্মনাভের পুত্রকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছেন (৭)।

রাজা শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনে পাওয়া যাইতেছে যে, রাজা সাবর্ণগোত্রীয় যজুর্বেদী কাণ্বশাখাধ্যায়ী ভৃগু-চ্যবন-আপ্নুবান-ঔর্ব-জমদগ্নি প্রবর-যুক্ত মধ্যদেশ-বিনির্গত উত্তররাঢ়ার সিদ্ধল-গ্রামীণ শান্ত্যাগারাধিকারী শ্রীরামদেব শর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়াছেন (৮)।

---

(৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ৩য় অংশ ২১৫—২১৭ পৃষ্ঠা। সিদ্ধল গ্রামের সাবর্ণগোত্রীয় প্রথম ভবদেব যে গৌড়পতির নিকট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বিখ্যাত ধর্ম্মপালও হইতে পারেন বলিয়া মনে হয়।

(৮) সাহিত্য, ১৩১৯, ৩৮১ পৃষ্ঠা।

রাজা বিজয়সেন দেবের একখানি তাম্রশাসনে পাওয়া যাইতেছে যে, রাজা ঋগ্বেদী বৎস গোত্র ভার্গব-চ্যবন-আপ্নবান-ঔর্ব-জামদগ্নি (গ্ন্য) প্রবরযুক্ত মধ্যদেশ-বিনির্গত কান্তিযোঙ্গীয় শ্রীউদয়কর দেবশর্ম্মাকে ভূমি প্রদান করিয়াছেন (৯)।

রাজা দেবপালের মুঙ্গেরলিপি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, রাজা ঋগ্বেদী ঔপমন্যব গোত্রের (উপমন্যু গোত্র) এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছেন (১০)।

প্রথম মহীপালের লিপি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, যজুর্বেদী বাজসনেয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী পরাশর সগোত্র শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রবরযুক্ত হস্তিপদ-গ্রাম-বিনির্গত, চবটি গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে গ্রাম দান করিয়াছেন (১১)।

তৃতীয় বিগ্রহপালের এক লিপি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সামবেদী কৌথুমশাখাধ্যায়ী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শাণ্ডিল্য-অসিত-দেবল প্রবরযুক্ত ক্রোড়ঞ্চি বিনির্গত মৎস্যাবাস বিনির্গত ছত্রাগ্রাম বাস্তব্য খোদুল দেবশর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়াছেন (১২)।

মদনপাল দেবের এক লিপি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে সামবেদী কৌথুমশাখাধ্যায়ী কৌৎস সগোত্র শাণ্ডিল্যাসিত-দেবল প্রবরযুক্ত চম্পাহিট্টীয়, চম্পাহিট্টি বাস্তব্য বটেশ্বর স্বামীকে ভূমি দান করিয়াছেন (১৩)।

এ পর্যন্ত যতগুলি দলীল পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে আশ্রয়দাতা অথবা ভূমিপ্রদাতা রাজগণের নামানুসারে সাজাইলে, তত্তৎকালে বাঙ্গালা দেশে নিম্ন লিখিত রূপ ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—

(৯) সাহিত্য, ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১ম পৃষ্ঠা।

(১০) গৌড়লেখমালা, প্রথম স্তবক, ৩৯—৪০ পৃষ্ঠা।

(১১) ঐ ঐ ৯২—৯৮ পৃষ্ঠা।

(১২) ঐ ঐ ১২৩—১২৬ পৃষ্ঠা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০ সাল ২২৩—২৩৯ পৃষ্ঠা।

গৌড়লেখমালায় এই লিপিটীর সম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হয় নাই; পরে রাখালবাবু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিশুদ্ধতর পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৩) গৌড়লেখমালা, ১৪৮—১৫২ পৃষ্ঠা।

ভূমিদাতা অথবা আশ্রয়দাতা রাজার নাম এবং সময়।	ব্রাহ্মণের বর্ণনা।
(১) ধর্মপাল (৭৮০—৮১৫ খৃঃ)	শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বীরদেব ব্রাহ্মণের বংশ; দিনাজপুর জেলায়,—সামবেদী?
(২) দেবপাল (৮১৫—৮৫০ খৃঃ)	ঋগ্বেদী, উপমন্যু গোত্র বীহেকরাত মিশ্র।
(৩) প্রথম মহীপাল (৯৭৮—১০২৬ খৃঃ)	যজুর্বেদী, পরাশর গোত্র চবটিগ্রামবাসী কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা।
(৪) হরিবর্মদেব (৯৫০—১০০০ খৃঃ)	সামবেদী, সাবর্ণগোত্রীয় সিদ্ধলগ্রামী ভট্ট ভবদেবের বংশ এবং তাঁহার মাতামহ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় (সামবেদী?) বন্দ্যঘটীয় বংশ। বৎসগোত্রীয় ঋগ্বেদী পদ্মনাভ ভট্ট।
(৫) তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৪২—১০৫৫ খৃঃ)	সামবেদী, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় খোদ্দলদেব শর্ম্মা।
(৬) ভোজবর্মদেব (১০৭২ খৃঃ?)	সাবর্ণগোত্রীয় যজুর্বেদী উত্তররাঢ়ার সিদ্ধলগ্রামী শ্রীরামদেব শর্ম্মা।
(৭) বিজয়সেন দেব (১১০৩—১১৪৯ খৃঃ)	ঋগ্বেদী বৎসগোত্র, শ্রীউদয়কর শর্ম্মা।
(৮) মদনপাল দেব (১১৩০—১১৪৯ খৃঃ)	সামবেদী, কৌৎসগোত্র, চম্পাহিট্টি বাস্তব্য বটেশ্বর স্বামিশর্ম্মা।

মহারাজ বল্লালসেন দেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের দলীলে আমরা এই কয় গোত্রের ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইতেছি :—

১। শাণ্ডিল্য (সামবেদী ?)
২। উপমন্যু (ঋগ্বেদী)

৩। পরাশর (যজুর্বেদী)
৪। সাবর্ণ (সামবেদী)
৫। সাবর্ণ (যজুর্বেদী)
৬। বৎস (ঋগ্‌বেদী)
৭। কৌৎস (সামবেদী)

রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় সামবেদী এবং যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যজুর্বেদীয় নাই বলিলেই হয়। অথচ দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগেও কাণ্বশাখাধ্যায়ী যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ যে রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে অনেক ছিলেন, তাহা রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধ-কৃত "ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব" গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক্ষণে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণ এই পাঁচটি গোত্র ভিন্ন আর কোন গোত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না ; এবং তাঁহাদের কুলগ্রন্থে ঐ পাঁচটি গোত্রের পাঁচ জন বীজপুরুষ কনৌজ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, এই সংবাদ লিখিত আছে। উপরের তালিকায় আমরা যে ছয়গোত্রের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার মধ্যে শাণ্ডিল্য এবং সাবর্ণ গোত্রের ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু উপমন্যু, পরাশর, বৎস এবং কৌৎস গোত্র তাঁহাদের মধ্যে নাই।

পাশ্চাত্য বৈদিকব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঋগ্‌বেদী উপমন্যু, যজুর্বেদী পরাশর ও বৎস গোত্র আছে। শ্রীহট্ট-সামাজিক বৈদিকগণের মধ্যে পরাশর এবং বৎস গোত্র আছে। কৌৎস গোত্র একমাত্র সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন শ্রেণীর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় নাই (১৪)। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য, শ্রীহট্টসামাজিক এবং সপ্তশতীদিগের মধ্যে আছে ; আর সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীহট্ট-সামাজিক এবং সপ্তশতী ভিন্ন আর সকল শ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যায়।

(১৪) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয়ভাগ, তৃতীয় অংশে" বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য-বিষয় একত্র করিয়া আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

উপরিধৃত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের পূর্বেই বাঙ্গালাদেশে শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, উপমন্যু এবং পরাশরাদি গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বিলক্ষণ অস্তিত্ব ছিল এবং নবম শতাব্দীর শেষ পাদে অথবা তাহার পরে ব্রাহ্মণগণের প্রথম আগমনকাল সূচিত হইতে পারে না। আরও দেখা যাইতেছে, যে, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে নাই, অথচ পাশ্চাত্যাদি শ্রেণীর মধ্যে আছে, এরূপ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা-দেশে বিদ্যমান্ ছিলেন।

আমাদের দেশে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষগণ প্রথমে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহার অনেক পরে তাঁহাদের মধ্যে বেদজ্ঞানের অভাব অথবা হ্রাস হওয়ায় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষগণকে আনান হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেও সন্দেহ হইতেছে।

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থের মতে বাঙ্গালার রাজা শ্যামলবর্মা দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া কন্নৌজ হইতে ঋগ্‌বেদী শুনক (শৌনক?) এবং সামবেদী বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য এবং ভরদ্বাজ এই পাঁচগোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন; পরে বহু গোত্রের (তেত্রিশ গোত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে) বহু ব্রাহ্মণ আসিয়া বঙ্গে বাস করত ঐ সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। এই কুলগ্রন্থগুলিতে শ্যামলবর্মাকে বিখ্যাত বল্লালসেনের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা কুলগ্রন্থের লেখক মহাশয়দিগের ভ্রান্তির ফল বলিয়া বোধহয় বর্মবংশীয় শ্যামল (বা সামল) বল্লাল সেন অপেক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় একশত বৎসরের পূর্বগামী ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সমসাময়িক কয়েকখানি দলীলের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিতরূপ তুলনামূলক বংশ-লতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যথাঃ—(১৫)।

(১৫) সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, ভোজবর্মার তাম্রশাসন, সাহিত্য, ১৩১৯, ৩৮১ পৃষ্ঠা। সুলতান মামুদের অনুচর বিখ্যাত আলবেরুণী লিখিয়াছেন যে দাহলের চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব তাঁহার সময়ে জীবিত ছিলেন।

গৌড়ের পালবংশ	দাহলের চেদিবংশ	বঙ্গের বর্মবংশ
নয়পাল (১০২৬—১০৪২)	গাঙ্গেয়দেব (আনুমানিক ৯৯০— ১০১৯ খৃঃ)	বজ্রবর্মা
	। কর্ণদেব	

তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৪২—১০৭০) + যৌবনশ্রী   বীরশ্রী + জাতবর্মা
    ।   ।
রামপাল (১০৭৭ ?)   শ্যামলবর্মা (১০৭২ খৃঃ বা ৯৯৪ শাক)
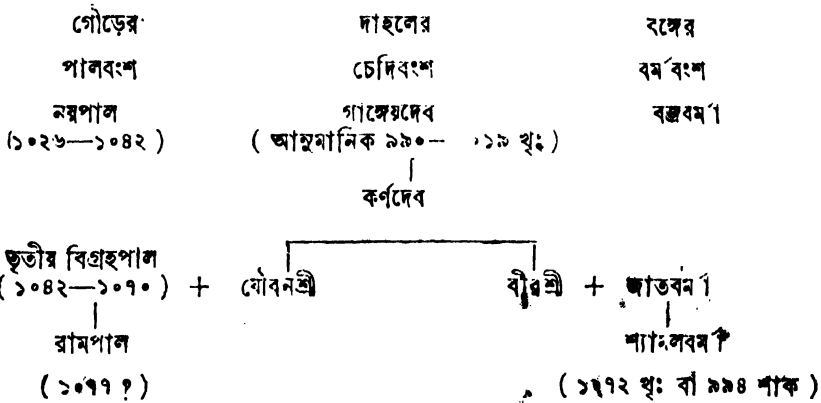
দাহলের (জব্বলপুরের) চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষভাগে অথবা একাদশ শতাব্দের আরম্ভকালে গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কর্ণদেবও পিতার অনুকরণে গৌড় এবং বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় রাজার নিকটই পরাস্ত হইয়া (উভয় রাজাকেই একটি করিয়া কন্যা দান করিয়া—গৌড়পতি তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত কন্যা যৌবনশ্রীর এবং বঙ্গরাজ জাতবর্মার সহিত বীরশ্রীর বিবাহ দিয়া) তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্যামলবর্মা এই কর্ণের দৌহিত্র অর্থাৎ বীরশ্রীর পুত্র। বিখ্যাত রামপাল তৃতীয় বিগ্রহপালের (অন্যতমা মহিষী শঙ্করদেবীর গর্ভজাত) পুত্র। অতএব রামপাল এবং শ্যামলবর্মা প্রায় সমসাময়িক হইতেছেন। দিব্বোক প্রমুখ কৈবর্তদলপতির করে তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়রাজ্য হারাইয়াছিলেন; কিন্তু কৈবর্তেরা বঙ্গরাজ জাতবর্মার কিছুই করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিকগণের মতে রামপাল ১০৭০—৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্যামলবর্মাও সুতরাং একাদশ শতাব্দের তৃতীয়পাদের রাজা হইতেছেন। বল্লালসেন দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্য করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় শ্যামলবর্মা বল্লালসেনের সহোদর হইতে পারেন না। আর সেনরাজবংশাবলী এবং বর্মরাজবংশাবলী একেবারে পৃথক্‌। আমাদের মনে হয়, বঙ্গরাজ হরিবর্মার বংশেই শ্যামলবর্মা জন্মিয়াছিলেন এবং হরিবর্মদেব শ্যামলের প্রায় শতবর্ষ পূর্বগামী ছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীর রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমিবার্তা" অথবা কোটালিপাড় সমাজের

বিবরণে বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রথম আগমন সম্বন্ধে যে ঐতিহ্য পাওয়া গিয়াছে (১৬), তাহার মূলে সত্য আছে বলিয়া বোধহয়। প্রসিদ্ধ বিজয়ী মুসলমান রাজা সুলতান মামুদ দশম শতাব্দীর শেষাংশে ও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (৯৯০—১০১৯ খৃঃ) কনৌজ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কনৌজ-রাজ রাজ্যপাল রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যান। মুসলমানগণের এই আক্রমণকালে কোন কোন ব্রাহ্মণের পলাইয়া গৌড়বঙ্গে আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা। হরিবর্মদেব ও প্রায় ঠিক এই সময়ে বঙ্গে রাজত্ব করিতে ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব রাঢ় ও উৎকলের ভুবনেশ্বরধাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এরূপ প্রতাপী রাজার আশ্রয়ে মুসলমান-তাড়িত ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ এবং বাস খুব সম্ভব, সন্দেহ নাই।

এদেশের অধিবাসী কোন ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে আগত কোন বীজপুরুষের বংশধর কিনা, তাহার প্রমাণ সমসাময়িক কোন দলীলে পাওয়া যায় কি না? এ পর্যন্ত যতগুলি দলীল পর্যালোচনা করিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে তিনখানি তাম্রশাসনে যাহা আছে, তাহা হইতে কনৌজের সূচনা সমর্থিত হইতে পারে। সেই তিনখানি এই :—

(১) তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপি,—ইহাতে ভূমি গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে সামবেদী, কৌথুমশাখাধ্যায়ী, শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, ক্রোড়ঞ্চি বিনির্গত, মৎস্যাবাস বিনির্গত, ছত্রাগ্রাম-বাস্তব্য বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের কাল, আনুমানিক ১০৪২—১০৫৫ খৃষ্টাব্দ।

(২) ভোজবর্মদেবের বেলাব লিপি,—(কাল ১০৭২ খৃঃ আনুমানিক),—ইহাতে ভূমি-গ্রহীতাকে সাবর্ণগোত্রীয়, কাণ্বশাখাধ্যায়ী, যজুর্বেদী, মধ্যদেশ বিনির্গত, উত্তররাঢ়ার সিদ্ধল-গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

(৩) বিজয়সেন দেবের ব্যারাকপুর লিপি (কাল খৃঃ ১১১৯ আনুমানিক),—ইহাতে ভূমিগ্রহীতাকে ঋগ্‌বেদী, বৎসগোত্রীয় মধ্যদেশ বিনির্গত কান্তিষোঙ্গীয় বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

(১৬) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয়ভাগ, তৃতীয় অংশ, ভূমিকা ৬/০ হইতে ৬৮/০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার লিখিত আছে যে, কন্নৌজাগত ব্রাহ্মণ পাঁচজনের মধ্যে শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ "ডিল্লিচত্বর" হইতে, ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষ "ঔড়ম্বর" হইতে, কাশ্যপ দক্ষ "কোলাঞ্চ" হইতে, বাৎস্য ছান্দড় "তাড়িদেশ" হইতে এবং সাবর্ণ বেদগর্ভ "মদ্রদেশ" হইতে আসিয়াছিলেন (১৭)।

যিনি এই প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞান উপকথার ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। নচেৎ কোথায় দিল্লি (ডিল্লি), কোথায় ঔড়ম্বর (উদুম্বর—কাশ্মীর-প্রদেশে), কোথায় মদ্রদেশ (পারস্যের পশ্চিম)? তবে এই "কোলাঞ্চ" বিগ্রহপালদেবের শাসনোল্লিখিত "ক্রোড়ঞ্চি"র অনুকৃতি কিনা, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। ঐ শাসনের "মৎস্যাবাস" যদি "মৎস্যদেশ" হয়, তাহা হইলে উহা জয়পুর রাজ্যে ছিল বলিতে হইবে। মনুর মতে মৎস্যদেশ "ব্রহ্মর্ষি" দেশের অন্তর্গত।

ভোজবর্মদেবের এবং বিজয়-সেনদেবের শাসনে ভূমিগ্রহীতা ব্রাহ্মণকে "মধ্যদেশ বিনির্গত" বলা হইয়াছে। মনুসংহিতায় "মধ্যদেশের" যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কন্নৌজ প্রদেশ উহার অন্তর্গত হইতে পারে (১৮)। আবার বাঙ্গালাদেশে মেদিনীপুর অঞ্চলকেও "মধ্যদেশ" বলিত। এই অঞ্চল রাঢ় এবং উৎকল এই দুই প্রদেশের মধ্যে পড়ে বলিয়া ইহাকে "মধ্যদেশ" ও এই স্থানের ব্রাহ্মণগণকে "মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ" বলে। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুলপ্রবাদে তাঁহাদের বীজপুরুষগণ এই "মধ্যদেশ" হইতে বঙ্গে গিয়াছিলেন, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় (১৯)। দামুন্যার কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ) স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া

(১৭) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর "জাতীয় ইতিহাস", প্রথমভাগ, প্রথমাংশ, ১০২ পৃষ্ঠা পাদ টীকা। বীজপুরুষগণের নামভেদ এবং তাঁহাদের আদিমবাসস্থানের ও নামভেদ আছে, সবই যেন উপকথা।

(১৮)　"হিমবদ্‌বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে যৎপ্রাগ্‌বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ২১ ॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(১৯) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর "জাতীয় ইতিহাস", দ্বিতীয়ভাগ, তৃতীয়াংশ ২০ পৃষ্ঠা।

এই "মধ্যদেশস্থ" বিখ্যাত পরগণা "ব্রাহ্মণভূমির" আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর গৃহে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন।

উপরিধৃত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যদি উল্লিখিত তাম্রশাসন-বর্ণিত ব্রাহ্মণত্রয়কে কণৌজাগত ব্রাহ্মণদিগের বংশধর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সকল ব্রাহ্মণও যে রাজা হরিবর্ম্মদেবের (৯৫০—১০০০ খৃঃ) সময়ের অগ্রে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন,—তাহাই বোধহয়। এই তিনখানি তাম্রশাসনের কাল মোটামোটি ১০৪২—১১২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পড়িতেছে। প্রাচীনতর কোন দলীলে এপর্যন্ত আমরা এই "ক্রোড়ঞ্চি", "মৎস্যাবাস" কিংবা "মধ্যদেশ"---বিনির্গত কোন ব্রাহ্মণের দর্শন পাই নাই।

আদিশূর এবং ব্রাহ্মণাগমনের কাল সম্বন্ধে গৌড়ের পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণনগরের রাজবংশের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি এবং ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রজনীকান্ত ৯৫৪ শক (অথবা ১০৩২ খৃষ্টাব্দ), পণ্ডিত লালমোহন (সম্বন্ধ নির্ণয়) এবং বঙ্কিমবাবু (বঙ্গদর্শনে) ৯৯৯ শক নহে পরন্তু সংবৎ—(৯৪২ খৃষ্টাব্দ) ধরিয়া লইয়াছেন। "ভট্টগ্রন্থে ৯৯৪ শক (১০৭২ খৃষ্টাব্দ) আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণগণের আগমনের সম্বন্ধে যদি কোন সত্যতা থাকে, তবে তাহা ৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পরে হইতে পারে না। বাদাল গরুড়স্তম্ভ-প্রশস্তি এবং ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দির প্রশস্তি—এই দুইখানি দলীল—এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিতেছে। অথচ পণ্ডিত রজনীকান্ত প্রমুখ বিদ্বদ্বর্গের অনুসন্ধানের ফল এরূপ হইল কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—অনুসন্ধানকারিগণ কুল-শাস্ত্র-বিশেষের প্রমাণকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। লালমোহন বিদ্যানিধি এবং বঙ্কিমবাবু ৯৯৯ (ক্ষিতীশ-বংশাবলীর "নবনবত্যধিকনবশতী শকাব্দে") অঙ্ককে সংবতের অঙ্ক কেন ধরিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই বোধহয় যে, ৯৯৯ শকাব্দ হইলে ব্রাহ্মণাগমনের কাল অতিশয় আধুনিক হইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহারা উহাকে সংবতের অঙ্ক ধরিয়া সেই কালকে (৫৭+৭৮=১২৫) একশত পঁচিশ বৎসর পিছাইয়া দিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, এরূপ ভাবে যেন তেন প্রকারেণ গায়ের জোরে কোন প্রমাণকে ইচ্ছামত অনুকূল পথে পরিচালন করা যে, তাহা হইলে, সাধু উপায় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অথচ এরূপ কেন হইল? শকাব্দ ৯৫৪ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত (১০৩২—১০৭৭ খৃষ্টাব্দ) কালের উপর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের ঝোঁক পড়িল কেন? ইহার অবশ্যই কারণ আছে। "পাশ্চাত্য বৈদিককুল-পঞ্জিকা"র রাজা শ্যামল বর্ম্মার কাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া যায়, যথা—

"আসীদ্ গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ।
প্রচণ্ডাখিলভূপালৈরর্চিত স মহীপতিঃ ॥১২
বেদগ্রহগ্রহ'মাঙ্কে স বভূব রাজা
গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্॥
শূরান্বয়াভিনবান্ বিজিতান্তরায়া
শাকে পুনঃশুভতিথৌ বিজয়না স্বয়ুঃ ॥১৩" (২০)

বর্ম্মবংশীয় জাতবর্ম্মার পুত্র এবং দাহলের চেদিরাজ কর্ণের দৌহিত্র শ্যামল বর্ম্মার সময় যে ঠিক এই ৯৯৪ শাকের (খৃঃ ১০৭২ অব্দের) কাছাকাছি পড়ে, তাহা আমরা প্রস্তাবের বর্ত্তমান অংশে ইত্যগ্রেই দেখিয়াছি। * পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবের সময়ে প্রথমতঃ কয়েকজন এবং তাঁহার বংশীয় শ্যামলবর্ম্মদেবের সময়ে অধিকাংশ কন্নৌজ বা মধ্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবল জনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের অধিকাংশ কুলগ্রন্থেই প্রাচীনতর হরিবর্ম্মদেবের প্রবাদের স্থলে নূতনতর শ্যামলবর্ম্মদেবের প্রবাদই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জনপ্রবাদ নিজ নিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বেদবিদ্যার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতে গিয়া দেশের পুরাতন ব্রাহ্মণগণের বেদজ্ঞানের অভাবের গল্প রচনা করিয়া নানা

---

(২০) নগেন্দ্রবাবুর "জাতীয় ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয়াংশ, ১৮ পৃষ্ঠা, ৪র্থ পাদটীকা। এই উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইবে যে, শ্যামল বর্ম্মদেবের রাজত্ব কাল "বেদ গ্রহগ্রহমিতে শাকে" (৯৯৪ শাকে অথবা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে) আরম্ভ হইয়াছিল, লিখিত আছে। এই কাল নির্ণয় ঠিক হইতে পারে। কিন্তু উহাতে শ্যামলবর্ম্মাকে যে বিজয়ের পুত্র বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট ভুল। শ্যামল যে বিজয় সেনের পুত্র নহেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। শ্যামলের পিতা জাতবর্ম্মা এবং পিতামহ বজ্রবর্ম্মা এবং তিনি বিজয় সেনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বগামী ছিলেন। কুলশাস্ত্রের কোন কথাই বিনা সমর্থনে যে গ্রহণ যোগ্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

চন্দ্রে নানা আজগুবি বা আষাঢ়ে গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগণের বেদ-বিদ্যায় অভাব, বৈদিক যজ্ঞ-সাধনে তাঁহাদের অপটুতা, কনৌজ হইতে পাঁচ গোত্রের বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সিপাহীর বেশে আগমন, তাঁহাদের সেই অপূর্ব যোদ্ধবেশদর্শনে রাজার অশ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশীর্বাদী নির্মাল্য শুষ্ক শালকাষ্ঠের মল্লস্তম্ভে নিঃক্ষেপ করিলে সেই স্তম্ভ সদ্যঃ পুষ্পপল্লবে শোভিত হওয়া, - ইত্যাদি গল্পগুলি বৈদিক পাশ্চাত্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে যেরূপ আছে, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রগণের কুলগ্রন্থেও তদ্রূপ আছে। এই অবস্থা হইতে অনুমিত হয় যে, একে অপরের অনুকরণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, নবাগত পাশ্চাত্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সম্মান দৃষ্টে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থরচকেরা তাঁহাদের বীজপুরুষগণের ও কনৌজাদি দেশ হইতে আগমন, আগমনের কারণ, অদ্ভুত ব্রাহ্মতেজঃ,—ইত্যাদি গল্পের হুবহু অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। সেই অনুকরণের ফলে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থেও ব্রাহ্মণাগমনের কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের শেষার্ধে (শ্যামলবর্মার প্রকৃত রাজ্যকালে) পড়িয়া গিয়াছে।

বর্মবংশীয় হরিবর্মদেব, জাতবর্মা এবং শ্যামলবর্মা প্রমুখ ভূপতিগণ প্রধানতঃ বঙ্গে (পূর্ববঙ্গে) রাজত্ব করিতেন। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুল-স্থান অথবা সমাজও তাই পূর্ববঙ্গেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। রাঢ়ের নবদ্বীপে তাঁহাদের (বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বলিয়া ?) একটি ক্ষুদ্র সমাজ ছিল বটে, কিন্তু সেই প্রাচীন সমাজের ব্রাহ্মণগণের কেহ অদ্যাপি আছেন বলিয়া বোধহয় না। গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, পূর্বস্থলী, এবং ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে বৈদিকগণের বাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক! অপরপক্ষে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই রাঢ়ে (পশ্চিমবঙ্গে) এবং বারেন্দ্রগণের অধিকাংশই বারেন্দ্রে (রাজসাহী বিভাগে) বাস করিতেছেন। গৌড়বঙ্গের এই দুই প্রদেশই (রাঢ় এবং বরেন্দ্র) সমধিক প্রাচীন এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষগণ স্মরণাতীত পুরাতন কাল হইতে তৎ তৎ প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের বিশ্বাসের অনুকূল কতকগুলি যুক্তি দিয়াছি, অপরগুলি আগামীবারে দিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

অশোকের ব্যথা।

স্তবকে স্তবকে অশোক আজিকে
উঠেছে ফুটি,
কার পথ চেয়ে রেখেছে তুলিয়া
নয়ন দুটি ;
আকাশের ঐ নীলিমার মাঝে,
সঙ্কেত তার বুঝি প্রাণে বাজে,
আশা নিরাশায় রাঙ্গা হ'য়ে গেছে
কপোল দুটি ;
শিথিল বসন পড়েছে খসিয়া
চরণে লুটি।

(২)

কচি পাতা তার বলে গেছে কারে
আশার কথা,
মলয় দিয়েছে সঙ্কেত তারে
দোলায়ে লতা,
পাখী বলে গেছে 'ওগো আসিবে সে'
জোছনা আসিয়া গেছে কেন হেসে ?
বুঝিস্ নি তোরা তার ব্যথা টুকু
তার ব্যাকুলতা,
প্রাণ দিয়ে সে যে শুনিয়েছে তার
আশার কথা।

(৩)

তাই প্রাণ দিয়ে সব ব্যথাটুকু

রাঙিয়ে তুলি,

কা'র তরে সে এসেছে আজিকে

পথটি ভুলি,

—শুধু পাবে বলে পরশ তাহার

চির দিবসের চির দেবতার,

রঙ্গে রঙ্গে আজি ভরে গেছে তাই

পাপড়ি গুলি।

তাই আসিয়াছে ফাগুনের সাথে

পথটি ভুলি।

(৪)

কখন যে তার দেবতা আসিয়া

বুকেতে ক'রে,

প্রাণমন খানি দিয়েছে এমন

সুধায় ভ'রে,

সারা বরষের অভিসার তার

সার্থক আজি পরশে কাহার,

পায়ে বুঝি তার ফাগুনের শেষে

পড়িবে ঝ'রে

ফুটিবার ব্যথা জীবন জনম

সফল ক'রে

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার।

মানবের আগমন

সাধারণতঃ আমরা ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। অনেকে গ্রীস রোম ইত্যাদির ইতিহাসের খবর যে না রাখেন তাহা নয়। কিন্তু সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসের সংবাদ খুব অল্প লোকেই রাখিয়া থাকেন বলিয়া জানি। কিন্তু এ কথাটা বোধ হয় সকলেই জানেন যে সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস না জানিলে কোন খণ্ড দেশের বা বিশেষ কোন জাতির ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝা কঠিন। নিজেকে বুঝিতে হইলে নিজের ইতিহাস আলোচনা করা উচিত এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব-জগতের ইতিহাসও বুঝা উচিত। সেই জন্য সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক, সকলের পক্ষেই সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস একবার ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কোন কিছু ভাবিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে কথা উঠে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহার জন্ম হইল কিরূপে, এবং সে পৃথিবীতে মানুষই বা আসিল কি প্রকারে।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই এখন দেখা যাক্। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মানুষের ধারণা ছিল আমাদের পৃথিবী জগতের মধ্যস্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রে অবস্থিত এবং সূর্য্যাদি তাহারই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ আরও বিশ্বাস করিত যে এই বিশ্বের বয়স বড় জোর ছয় হাজার বৎসর। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ও তৎপরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণ মানুষের এ ধারণা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যথা, (ক) পৃথিবীটা গোল এবং ইহা অস্থির, ঘুরিয়া বেড়ানই ইহার কার্য্য; (খ) পৃথিবী একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রহ এবং ইহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, (গ) সূর্য্যও যে খুব বড় তাহা নহে; সাধারণ একটা নক্ষত্রের মতই ইহার আকৃতি ও জ্যোতি।

সময় বা কালের এবং স্থান বা আকাশের অসীমত্ব হাতে-কলমে দেখাইয়াছেন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং জ্যোতির্ব্বিদগণ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দির ভূতত্ত্ববিদগণ দেখাইয়াছেন যে পাহাড়ের

ধ্বংসাবশিষ্ট কণা দ্বারা পৃথিবীর আবরণ অর্থাৎ মাটি প্রস্তুত হইতে অসংখ্য কোটি বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বয়স মাত্র ছয় হাজার বৎসর বলা এখন কেবল বাতুল ও বালকের পক্ষেই সম্ভবপর। আর জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখাইয়াছেন যে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,৪০০ মাইল। আর সেই আলোকের চন্দ্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে লাগে সোয়া সেকেণ্ডে, আর সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের লাগে আট মিনিটের একটু বেশী। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের লাগে চারি বৎসরেরও অধিক। ছায়াপথের যে কোন নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের কম পক্ষে ৪০০০ বৎসর লাগে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় আকাশ কত বড়। জ্যোতির্ব্বিদগণ আরও বলেন যে এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবী সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিত। খুব কম পক্ষে ৩০০ কোটি বৎসর হয় তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে বিরাট অসীমের মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটী ক্ষুদ্র কণা মাত্র, আর মানব জাতির ইতিহাস জাগতিক সময়ের এক মুহূর্ত্ত মাত্র সহজ ভাষায় ব্রহ্মার বৎসরের এক নিমেষ।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব মাত্র ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। অর্থাৎ যদি একখানি এরোপ্লেনে চড়িয়া পৃথিবী হইতে সূর্য্যের অভিমুখে যাত্রা করা যায় আর সেই এরোপ্লেন যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে দিনরাত্রি ক্রমাগত চলিতে থাকে তাহা হইলে সূর্য্যে পৌঁছিতে সেই এরোপ্লেনের প্রায় ১৮০ বৎসর লাগিবে। কয় পুরুষ ধরিয়া যে এই সূর্য্যপথ-যাত্রী এরোপ্লেনকে চালাইতে হইবে তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

পৃথিবীর ন্যায় আরও অনেক গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বুধ ও শুক্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিত। বুধ সূর্য্য হইতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে আর শুক্র সূর্য্য হইতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীর অন্যদিকে যে সমস্ত গ্রহ বিদ্যমান তাহাদের মধ্যে মঙ্গল ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ মাইল, বৃহস্পতি ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল শনি ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল, য়ুরেনাস ১৭৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল ও নেপচুন ২৭৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক গণের মতে কেবল মঙ্গল গ্রহেই মানুষের মত প্রাণী থাকা সম্ভবপর। কিন কতক বৈজ্ঞানিক মঙ্গল গ্রহে বেতার বার্ত্তাবহের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

সূর্য্যও যে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন তাহা নহে। তিনি তাহার গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু কোন্ পথে এবং কোন্ নক্ষত্রের দিকে যে চলিয়াছেন তাহা এখনও বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু হার্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে যদি ঘণ্টায় ২০ হাজার মাইল সূর্য্যের গতি ধরা যায় তাহা হইলে কোন নক্ষত্রের নিকটে পৌছিতে কিম্বা কোন নক্ষত্রের প্রভাবের মধ্যে পৌছিতে সূর্য্যের প্রায় কোটি কোটি বৎসর লাগিবে।

পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত অবস্থায় আকাশমার্গে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তখন সমস্ত ধাতু দ্রব্য জলমাটী পাথর ইত্যাদি ঐ অগ্নিকুণ্ডে গলিত অবস্থায় ছিল। দিন দিন পৃথিবীর উত্তাপ আকাশে ছড়াইয়া পড়ায় পৃথিবী শীতল হইয়া আসিতেছিল। একদিন সহসা বর্ত্তমান পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশমার্গে চলিয়া গেল এবং মধ্যাকর্ষণের জন্য সেই অংশটুক পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই অংশটুকুকেই এখন আমরা চন্দ্র নামে অভিহিত করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে অংশে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত ঠিক সেই স্থানেই চন্দ্র পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল এবং সেখান হইতেই উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে চলিয়া গিয়াছে। ছোট বস্তুর উত্তাপ সহজেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্য চন্দ্রের উত্তাপ অনেক দিন হইল একেবারেই লোপ পাইয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপ বা রশ্মি চন্দ্রে না পড়িলে এখন আর তাহাকে দেখাই যায় না। পৃথিবীর উত্তাপ কমিয়া যাওয়ার ফলে জল ও মাটীর আবির্ভাব হইল। এই উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ক্রমেই সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে বৎসরের দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এখন ৩৬৫·১ দিনে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দিনরাত্রির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ২৪ ঘণ্টায় আসিয়া পৌছিয়াছে। সুতরাং এমন দিন আসিবে যখন এই দূরে চলিয়া যাওয়ার জন্য পৃথিবী জীবজন্তু বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িবে। এখনও সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের সাহায্যেই জীবজন্তু পৃথিবীতে বাস করিতে পারিতেছে। সূর্য্যের সাহায্য ব্যতীত পৃথিবী এখন জীবজন্তুকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম নহে। সুতরাং প্রাচীন কালে লোকে যে সূর্য্যকে পূজা করিত তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

পৃথিবীতে জল ও মৃত্তিকার আবির্ভাবের পর ভীষণ ভীষণ ভূমিকম্পন ও ঝড় এবং কালান্তক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণের জন্য পৃথিবীর স্থানে স্থানে উচু নীচু হইয়া নদনদী, পর্ব্বত, উপত্যকা ইত্যাদির আবির্ভাব হইল। এখনও যে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন দিন এক দিন না এক দিন আসিবে যেদিন বরফে ও সমুদ্রে সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিবে।

সুতরাং বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা দেখিতে পাই সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল এবং কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং মানুষের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের বড়াই করিবার মত আহাম্মুকী আর নাই। একথা আমরা বুদ্ধদেব ও গ্রীক্ দার্শনিক হিরাক্লাইটাসের মুখেও শুনিয়াছি।

২)

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠিক কোন সময়ে যে জীবনের বা প্রাণের আবির্ভাব হইল তাহা বৈজ্ঞানিকগণ এখনও নিরূপণ করিতে সক্ষম হন নাই। অজীব হইতে কেমন করিয়া জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় তাহার মীমাংসাও বৈজ্ঞানিকগণ আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন খুব কম পক্ষে ৮০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব হয়। জীবের ও অজীবের মধ্যে যে তারতম্য তাহা বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জীবের প্রথম বিশেষ লক্ষণ হইল বৃদ্ধি পাওয়া বা চলিয়া বেড়ান। দ্বিতীয় লক্ষণ হইল বাঁচিয়া থাকার জন্য আহার করা। আর তৃতীয় লক্ষণ হইল নিজের মত অপর জীবের জন্মদান করা। পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন যে সর্ব্বপ্রথমে যে সকল জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহারা জলমধ্যে বাস করিত, এবং এই জলেই তাহারা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বাস করিয়াছিল। সুতরাং ভগবানের মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হওয়া যে একেবারে কবির কল্পনা তাহা নহে। এই মৎস্য যুগই জীবজগতের ইতিহাসের প্রথম যুগ।

প্রথমে যে সকল জলচরের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কাঁটা বা মেরুদণ্ড ছিল না। জেলী, সামুদ্রিক ক্রিমি ইত্যাদি মেরুদণ্ডহীন জলচর প্রাথমিক জীবজাতীয়। ইহাদের মধ্য হইতে কালক্রমে মেরুদণ্ডযুক্ত প্রকৃত মৎস্যের আবির্ভাব হয়। সুতরাং যে সমস্ত জীবের মেরুদণ্ড আছে তাহাদের আদি পুরুষ হইল মৎস্য। এই জন্য বোধ হয় উত্তর ভারতের অনেক স্থানে মৎস্যাহার করিবার নিয়ম নাই!

এই যুগেই জলচরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষলতায় পৃথিবীর উত্তর অংশটুক ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই ভীষণ অরণ্য কালক্রমে কয়লায় পরিণত হইয়া মাটীর নীচে পড়িয়া আছে! মানুষ এখন আবার কয়লা খুঁড়িয়া তুলিয়া নানা রকম কার্য্যে লাগাইতেছে। এই যুগে অতিকায় মাকড়সা ও প্রায় সোয়া হাত লম্বা পক্ষ বিশিষ্ট মক্ষিকার আবির্ভাব হইয়াছিল।

এই যুগের অবসান হইয়াছিল প্রায় ৩০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে। ইহার পরে অনেক বৎসর ধরিয়া ভীষণ ঠাণ্ডা পড়িল। এবং সেই জন্য অধিকাংশ স্থলই বরফে আবৃত হইয়া গেল। শীতের জন্য অধিকাংশ জন্তু ও গাছপালা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এই সময় অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা সংযুক্ত ছিল এবং একই মহাদেশের বিভিন্ন অংশ ছিল। এই যুগে জলের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত অল্প, আর যাহা ছিল তাহাও বরফে আবৃত ছিল। সুতরাং এ যুগে যে সকল জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহারা মাটীতেই বাস করিত এবং প্রয়োজন হইলে জলেও নামিয়া যাইতে পারিত! এইরূপে সরিসৃপের জন্ম হইল। এই সকল জন্তু মাটীর উপরেই ডিম পারে এবং সেই ডিম ফাটিয়া তাহাদের বাচ্চাকাচ্চা হয়। এই যুগে দেবদারু প্রভৃতি বড় বড় গাছের আবির্ভাব হইল। ইহারা জন্মভূমির সাহায্য না লইয়াই সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে শীত কমিতে লাগিল এবং একটু করিয়া গরম পড়িতে লাগিল। এই গরমের সঙ্গে সঙ্গে সরিসৃপের ও বৃক্ষের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে ভীষণাকার ডাইনোসরের ও পেরোড্যাকটিলের জন্ম হইল। ডাইনোসরের কঙ্কাল ও ডিম এশিয়ার মরুভূমিতে পাওয়া গিয়াছে। পেরোড্যাকটিলের ভয়ানক বড় বড় পাখা ছিল, আর সেই পাখার সাহায্যে তাহারা উড়িয়া বেড়াইতে পারিত। এই পেরোড্যাকটিল হইতেই পক্ষী

জাতির জন্ম হইয়াছে। প্রায় ৭ কোটী বৎসর পূর্ব্বে এই পক্ষী ও সরিসৃপের যুগ শেষ হইয়াছিল। এই যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনোসর ও পেরোড্যাকটিল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইহার পর আসিল স্তন্যপায়ী জন্তুর যুগ। কিন্তু এই সরিসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীবের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল চকের যুগ। এই অন্তর্ব্বর্ত্তী যুগে অনেক স্থানের মাটী বসিয়া গিয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সমুদ্র অগ্রসর হইয়া অনেক যায়গা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। এই যুগেই ব্রিটেন ইয়োরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপে পরিণত হইয়াছিল।

স্তন্যপায়ী জীবের যুগকে *Eocene* অথবা প্রভাত যুগ বলা হয়। সাধারণতঃ তিনটী বিশেষ স্বভাবের জন্য এই স্তন্যপায়ী জীবগুলিকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ দেখিতে পাই এই সকল জীবের গাত্র লোমে আবৃত থাকে এবং লোমের আবরণের জন্য প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্ম হইতে ইহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখি যে এই সকল জীব অণ্ডের পরিবর্ত্তে বাচ্চা প্রসব করে। এবং এই বাচ্চাগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জন্মের সময় বেশ পরিস্ফুট থাকে এবং তাহারা অনেক কার্য্য নিজেরাই জন্ম হইতেই করিতে পারে। সরিসৃপ ও মৎস্যযুগে দেখিয়াছি জীবের ডিম হইত এবং সরিসৃপকে তাহার ডিম তা দিতে হইত আর এই ডিম হইতে অপরিস্ফুট বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিত। কিন্তু এ যুগের এই নূতন জীবকে ডিমেও তা দিতে হয় না, অপরিস্ফুট বাচ্চার জঞ্জালও পোহাইতে হয় না। তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই এই স্তন্যপায়ী জন্তুর বাচ্চা শৈশবে মায়ের বুকের দুধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে, জননীদিগকে এই সকল বাচ্চাকে দুধ খাওয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, সময়োপযোগী অন্যান্য বস্তু খাওয়াইতে হয় এবং নিজ জাতির করণীয় অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে হয়। এই স্তন্যপায়ী জীবগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথঞ্চিৎ তাহাদের সন্তান সন্ততিকে প্রদান করিতে পারে। আরও আমরা দেখিতে পাই যে এই সকল স্তন্যপায়ী জন্তু দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে ও বাস করে। আবার ইহাদের বাচ্চাকাচ্চা লইয়া অনেকেরই ছোট খাট পরিবারও থাকে। সুতরাং পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ যে ইহাদিগকে না পোহাইতে হয় তাহা নহে।

এই যুগেই কুকুর জাতীয় জন্তুগণের অর্থাৎ কুকুর, শৃগাল, নেকড়ে প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। বিড়াল জাতীয় জন্তুর অর্থাৎ বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতিরও জন্ম হইয়াছিল।

আরও জন্ম হইয়াছিল ঘোড়া জাতীয় জন্তুর অর্থাৎ ঘোড়া, গাধা, উট, হাতী, গরু, ভেড়া, শূকর প্রভৃতির।

এই যুগে সর্ব্বশেষে দেখা দিয়াছিল বানরজাতি। ইহাদের তিনটি বিষয়ে বিশেষত্ব ছিল। ইহাদের হস্ত ছিল অত্যন্ত কার্য্যক্ষম। উহাদ্বারা তাহারা পাথর লাঠি ইত্যাদি ধরিয়া সদ্ব্যবহারে লাগাইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ ইহারা গাছে থাকিত। তৃতীয়তঃ ইহাদের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত ও বৃহৎ থাকায় ইহাদের চাতুর্য্য ও বুদ্ধি অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা এত অধিক ছিল যে অনায়াসে ইহারা ভীষণকায় শক্তিশালী জানোয়ারকে পরজিত করিতে পারিত। এই বানর হইতেই বৈজ্ঞানিকগণের মতে মানুষের জন্ম হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের সম্মানকে কঠিনরূপে আঘাত করে সত্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ কঙ্কাল, ভ্রূণ ইত্যাদি সাদৃশ্য দেখাইয়া এই সিদ্ধান্তটী আমাদের সম্মুখে এমন ভাবে ধরিয়াছেন যে গান্ধারীর মত চক্ষু বাঁধিয়া না রাখিলে তাহাদের কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় থাকে না।

সৌর জগতের উল্কাপিণ্ড হইতে আমরা মানুষের আবির্ভাবের সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সুতরাং এইবার মানুষের যুগের কথা বলা যাক্। এইখানে মনে রাখা ভাল যে মাত্র **৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের জন্ম হইয়াছিল।**

৩)

প্রথম প্রথম কে মানুষ আর কে বানর তাহা ভাল করিয়া বুঝা যাইত না। কিন্তু কালক্রমে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ পার্থক্য দেখা গেল মস্তিষ্কে। মানুষের মস্তিষ্ক যেমন আকারে বৃহৎ হইয়া উঠিল তেমনই তাহার আভ্যন্তরিক পাকের বা Convolusionsএর সংখ্যাও বেশী হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় পার্থক্য দেখা গেল তাহাদের চলিবার ভঙ্গিমায়। মানুষ ক্রমে ক্রমে সোজা খাড়া হইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল। তৃতীয় পার্থক্য দেখা গেল তাহাদের হাতে। মানুষের হাত বানরের হাতের চাইতে অনেকগুণ অধিক কার্য্যক্ষম হইল। এই হাতের সাহায্যে মানুষ অবশেষে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থ পার্থক্য দেখা গেল ভাষার মধ্যে এবং স্বরযন্ত্রের মধ্যে। মানুষ অন্যান্য জন্তুকে বশীভূত করিয়া করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে লাগাইয়া বানরদের উপর টেক্কা দিয়া বসিল। পরিশেষে দেখা গেল

মানুষের মধ্যে যেমন সামাজিকতা বা একতা আছে, বানরদের মধ্যে তেমন নাই। শারীরিক বলে অন্যান্য জন্তু হইতে হীন হইয়াও মানুষ এই সকল গুণের বলে পৃথিবীর রাজা হইয়া বসিতে সমর্থ হইয়াছে। যে মানুষ পূর্ব্বে বাঘ ভালুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুদের ভয়ে গাছের ডালে কোন রকমে লুকাইয়া থাকিয়া প্রাণ রক্ষা করিত সেই মানুষের ভয়ে আজ অন্যান্য জীবজন্তু গভীর জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং বংশলোপের আশঙ্কায় অজ্ঞাত গিরিগহ্বরে লুকাইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করিতেছে। কালের কি বিচিত্র মহিমা !

এই মানুষের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বেই উত্তর মেরুর বরফ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে সরিয়া আসিতে লাগিল। এই প্রচণ্ড হিমানীর কোপে পড়িয়া উত্তর ইয়োরোপের ও ব্রিটনের সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল। ড্যানুব নদী, কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত আসিয়া এই বরফের অভিযান স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় বাধ্য হইয়া বানরগণ মধ্য এশিয়ার মরুভূমির নিকট আসিয়া আশ্রয় লইল। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন মধ্য এশিয়ার বানর বংশ হইতেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে।

এই যে বরফের অভিযানের কথা বলিলাম সেই অভিযান হইতেই বরফের যুগের সূচনা হইল। এই যুগ আবার চারি ভাগে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেক ভাগের পরেই আবার একটি করিয়া গ্রীষ্মাবকাশ বা উষ্ণযুগ দেখা দিয়াছে। এই বরফের যুগের বিস্তৃতি সম্বন্ধে H. E. Osborn সাহেব তাঁহার Men of the old stone Age নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন। সুতরাং ঐ সকল সন তারিখ নীরস হইলেও আমাদের শ্রবণ করা অসঙ্গত নহে।

প্রথম বরফের যুগ	B. C.	৫ লক্ষ হইতে ৪½ লক্ষ পর্য্যন্ত।
প্রথম গ্রীষ্মাবকাশ	,,	৪½ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ পর্য্যন্ত।
দ্বিতীয় বরফের যুগ	,,	৪ লক্ষ হইতে ৩½ লক্ষ পর্য্যন্ত।
দ্বিতীয় গ্রীষ্মাবকাশ	,,	৩½ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ পর্য্যন্ত।
তৃতীয় বরফের যুগ	,,	২ লক্ষ হইতে ১½ লক্ষ পর্য্যন্ত।
তৃতীয় গ্রীষ্মাবকাশ	,,	১½ লক্ষ হইতে ৫০ হাজার পর্য্যন্ত।
চতুর্থ বরফের যুগ	,,	৫০ হাজার হইতে ২৫ হাজার পর্য্যন্ত।

কেউ কেউ বলেন আমরা চতুর্থ গ্রীষ্মাবকাশে বাস করিতেছি এবং সম্ভবতঃ ৫০ হাজার বৎসর পরে আবার বরফের যুগ দেখা দিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই রকম ভয়ানক বরফের অত্যাচার সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিয়া আছে। ভূতত্ত্ববিদগণ এই বিভিন্ন বরফের যুগের মানবের কঙ্কাল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিতে পারিয়াছেন যে মানুষের উপর বারম্বার বরফের অত্যাচার হইয়াছে।

সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ফরাসী পণ্ডিত Dr. Eugene Dubois যবদ্বীপে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে একটি নরকঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে এই কঙ্কাল মানব ও বানরের অন্তর্ব্বর্ত্তী অবস্থার পরিচায়ক। ডাক্তার ডুবোঁএর মতে এই কঙ্কাল যাহার তিনি খৃষ্টের জন্মের ৫,০০,০০০ পূর্ব্বে বাঁচিয়া ছিলেন অর্থাৎ বরফ যুগের প্রারম্ভের পূর্ব্বেও বাঁচিয়া ছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মাওএর বালুকা স্তরের ৮০ ফিট নীচে যে Heidelbergmanএর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে সে মানুষ খৃষ্টের জন্মের ২৫০০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁচিয়া ছিল। ১৯১২ সনে Charles Dawson (চার্লস ডসন) যে Piltdown manএর মাথার খুলী আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে মানুষ খৃষ্ট জন্মিবার ১০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাস করিত। এই রূপে প্রায় সকল যুগের মানুষের চিহ্নই বৈজ্ঞানিকগণ বাহির করিয়াছেন।

খৃষ্ট জন্মিবার এক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ পাথরের ব্যবহার শিখিয়াছিল। পাথর যে ঘসিয়া মাজিয়া অস্ত্রেশস্ত্রে ও তৈজসপত্রে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা এই সময়ের মানবগণ জানিত। এই সময়ের অস্ত্র ছিল হস্ত চালিত পাথর নির্ম্মিত কুঠার আর ছোট ছোট বর্শা ফলকের ন্যায় ফলক। এই যুগের লোককে Old Stone Ageএর লোক বলে। এই যুগে প্রচণ্ড শীতে বাধ্য হইয়া মানুষ গুহার মধ্যে আশ্রয় লইতে শেখে এবং সৃষ্টির ২০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অগ্নি আবিষ্কার করিয়া শীতকে অনেকটা জব্দ করিয়া ফেলে। এমন গুহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেখানে এক শত বৎসর কিম্বা আরও অধিক কাল ব্যাপিয়া আগুন জ্বালিয়া রাখা হইয়াছিল। এই সকল গুহার গাত্রে হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তুর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সুতরাং শিল্পানুরাগ এই সময়েই প্রথম উদিত হইয়াছিল, এবং খাদ্য ও আবরণের জন্য হরিণ প্রভৃতি জন্তুর মাংস ও চর্ম্ম গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল। এই যুগের গুহার চিহ্ন কেণ্ট ও ডাবরী শায়ারে

বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। খৃষ্টের দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই যুগ শেষ হইয়াছিল। তার পর আসিয়াছিল নব প্রস্তর যুগ বা *the New Stone Age.*

নব প্রস্তর যুগ।

এই যুগের বিশেষত্ব বৈজ্ঞানিকগণ নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শীত কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলিতে লাগিল। ইহার ফলে ব্রিটন ইয়োরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল আর ব্যালটিক সাগর মহাসাগরের সহিত মিলিত হইল। যাহা এখন ভূমধ্যসাগর নামে অভিহিত তাহা পূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদে বিভক্ত ছিল। বরফ গলিয়া যাওয়ার পর দেখা গেল তাহারা সকলে মিলিয়া এক প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হইয়াছে এবং এক পার্শ্বে উহা সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল ভীষণ অরণ্য বরফের চাপে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাদের বংশধরগণ আবার নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হরিণও হরিণ শিকারী দক্ষিণ হইতে ক্রমেই উত্তর দিকে অগ্রসর হইল। উত্তর দেশীয় পতিত জমীর জন্য দক্ষিণের লোক ক্রমেই উত্তর দিকে ধাবিত হইল। শিকারের লোভ, ঋতুর পরিবর্ত্তন ও গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যও অনেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হইল। এই উত্তরপথযাত্রী মানবকেই Mediteranean raee বা ভূমধ্য সাগর তীরবর্ত্তী জাতি বলা হইয়া থাকে। ইহাদের গাত্রবর্ণ ছিল ধূম্রবর্ণ আর মস্তকের কেশ ছিল কাল বোধ হয় অনেকটা আধুনিক বাঙ্গালীর মত। ইহারা উত্তর দেশীয় লোক অপেক্ষা জীবনযাত্রায় ও শিল্প কার্য্যে অনেক উন্নত ছিল। বাঙ্গালীর মত ইহারা মৎস্যপ্রিয় ছিল। সেই জন্য শিকার ফেলিয়া মাছ ধরাতেই তাহারা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিত। ইহারা একটু একটু কৃষিবিদ্যাও শিখিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই উহারা শিখিয়াছিল জন্তু পোষ মানাইবার উপায় এবং তাহাদিগকে গৃহপালিত জন্তুরূপে পালন করিবার কায়দা। যুদ্ধ বিদ্যাতে ইহারা তীর ধনুক আবিষ্কার করিয়া শৌর্য্যে বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহকার্য্যের জন্য ইহারা আবিষ্কার করিয়াছিল সূর্য্যতাপে দগ্ধ মাটির তৈজসপত্র। সেলাই ও বয়নবিদ্যা ইহারাই আবিষ্কার করিয়াছিল। পূর্ব্বে মানুষ গুহাতে থাকিত নতুবা বরফে জমিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কিন্তু বরফ গলিয়া যাওয়ার পর গুহাতে থাকা আর

সুবিধা জনক হইল না। গুহার বাহিরে তাহারা বাস করিতে লাগিল আর এই বহির্বাসের জন্য তাহারা নানারকম গৃহ আবিষ্কার করিয়া বসিল। এই গৃহের সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের তীরে ছোট ছোট গ্রাম বসিয়া গেল। শীতের প্রকোপ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে লোক সংখ্যা বেশ ভাল করিয়াই বাড়িয়া চলিল। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে এই নব পাথর যুগের শেষে রীতিমত সমাজ ও সভ্যতা স্থাপিত হইয়ছিল। হিয়ারণশ বলেন এই যুগ শেষ হইয়াছিল পূর্ব্বপ্রান্তে খৃষ্টের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর পশ্চিম প্রান্তে শেষ হইয়াছিল খৃষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে। এই পশ্চিম প্রান্তের তারিখটা সত্য হইলেও হইতে পারে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার অনেক পূর্ব্বেই এই নবপাথরীয় যুগের অবসান হইয়াছে ধরা উচিত এবং সেইজন্য বলিতে হয় যে পূর্ব্বপ্রান্তে এইযুগ অন্ততঃ খৃষ্টের ১০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল।

এই যুগের পর আসিয়াছিল ধাতুর যুগ।

ধাতুর যুগ।

এই যুগে মানুষ সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণ আবিষ্কার করিয়াছিল। কারণ স্বর্ণ যেমন অমিশ্রিত ভাবে পাওয়া যায় এরূপ আর অন্য কোন ধাতু পাওয়া যায় না। স্বর্ণ সহজে মলিনও হয় না আর উহাতে মরিচাও ধরিতে পারে না। সোনার জ্যোতি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে পার্ব্বত্য নদীর বুকে বরফ গলিয়া যাওয়ার পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ খণ্ড বাহির হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। এবং পাথরের কারিকরগণ উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অপরাপর সকলকে দেখাইয়া বিস্ময়াভিভুত করিয়াছিল। কিন্তু এই স্বর্ণ মানুষের কেবল বিলাসবাসনাই চরিতার্থ করিল। অলঙ্কারের সাধ নরনারী ইহা দ্বারাই মিটাইল। কিন্তু যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের পক্ষে স্বর্ণ একেবারেই উপকারে আসিল না।

ইহার পরেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাম্র। সম্ভবতঃ সাইপ্রাস দ্বীপে খৃষ্টের সাড়ে চারিহাজার বৎসর পূর্ব্বে তাম্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্রদ্বারা নানারকম যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্র মানুষ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়াছিল। তাম্রনির্ম্মিত এই সকল জিনিস পত্র, পাথর কাষ্ঠ

ও চর্ম্মনির্ম্মিত জিনিস অপেক্ষা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট হওয়ায় মানবসভ্যতা তাম্র আবিষ্কারের ফলে কথঞ্চিৎ উচ্চস্তরে অগ্রসর হইল।

এই তাম্র যে সর্ব্বপ্রথমে কোথায় পাওয়া গিয়াছিল তাহা লইয়া বিদ্বান-মণ্ডলী এখনও একমত হইতে পারেন নাই। তবে উহা যে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে, খৃষ্টের জন্মিবার ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা অনেকেই এখন স্বীকার করেন। অধ্যাপক ব্রেষ্টেড্ মহোদয় বলেন তাম্র সর্ব্বপ্রথম সাইপ্রাস দ্বীপে পাওয়া গিয়াছিল। অনেকের মতে সিনাই উপদ্বীপে তাম্র সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গিয়াছিল। অধ্যাপক স্লোণশয়ের মতে ব্রেষ্টেড্ মহোদয়ের মতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কেমন করিয়া তাম্র আবিষ্কৃত হইল সে সম্বন্ধে ব্রেষ্টেড্ বলেন একদিন এক দল ভবঘুরে আগুন জ্বালাইয়া সেই আগুনের চারিদিকে মাটীর চাকা এমন করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল যাহাতে বাতাস আসিয়া ঐ আগুনের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে। ঐ সকল মাটীর চাকা প্রকৃতপক্ষে মাটী ছিল না উহারা ছিল তাম্রের খনিজ পিণ্ড, যাহাকে ইংরাজীতে বলে *Ore* সকালে উঠিয়া ঐ ভবঘুরের দল দেখিল আগুন নিভিয়া গিয়াছে কিন্তু ছাইএর মধ্যে কি যেন চক্ চক্ করিতেছে। অগ্নির উত্তাপে খনিজ তাম্রপিণ্ড গলিয়া তাম্রে পরিণত হইয়াছিল আর সেই তাম্রই চক্ চক্ করিতেছিল।

এইরূপে তাম্র আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু এই সময় হইতে খনিজ তাম্রপিণ্ড গলাইবার উপায় আবিষ্কার করিতে ও তাম্র দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র তৈজসপত্র প্রস্তুত করিতে যে কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এত করিয়াও দেখা গেল তাম্রনির্ম্মিত কুঠার একটুতেই ভোঁতা হইয়া যায় এবং তাম্রনির্ম্মিত তীরের ফলক অতি সহজেই বাঁকিয়া যায়। সেইজন্য এত কষ্টের ও আশার তাম্রের কুঠার ও তীর ফেলিয়া মানুষ পাথরনির্ম্মিত কুঠার ও তীর আবার ব্যবহার করিতে লাগিল। তথাপি তাম্রসম্বন্ধে মানুষ একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল না। কেমন করিয়া তাম্রকে শক্ত করিয়া কার্য্যোপযোগী করা যাইতে পারে ইহাই তখন সকলের জল্পনা কল্পনা ও সাধনার বিষয় হইল। একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে ব্রাঞ্জ আবিষ্কৃত হইল—সাধনায় মানুষ সিদ্ধিলাভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতা আর একটি স্তর উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। নানারূপ বস্তুর সহিত মিশাইয়া মানুষ দিনের পর দিন দেখিতে ছিল তাম্রকে শক্ত ধাতুতে পরিণত করা যায় কিনা। একদিন তাম্রের সহিত টিন মিশাইয়া মানুষ দেখিল বেশ শক্ত নূতন এক

প্রকার ধাতু তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। এই নূতন ধাতুই হইল ব্রোঞ্জ। এই ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাম্র যুগের অবসান হইল, ব্রোঞ্জের যুগ আরম্ভ হইল। প্রত্নতাত্বিকগণের মতে সাইপ্রাস বা ক্রীট দ্বীপেই ব্রোঞ্জ সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কারণ ঐ দুই দ্বীপে টিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার কিছু পরেই মিশরে ব্রোঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেশ সমূহে ব্রোঞ্জের সার্ব্বজনীন প্রচলন সম্ভবতঃ খৃষ্টের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই মানুষ ব্রোঞ্জের অশেষ উপকারিতা সহজেই বুঝিতে পারিল। ব্রোঞ্জের বাটালী দ্বারা পাথর খোদাই কার্য্য মানুষ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ব্রোঞ্জের কুঠার দ্বারা ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী গভীর বনানী অনায়াসে পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ব্রোঞ্জের করাত দ্বারা বৃক্ষ চিরিয়া মানুষ তক্তা প্রস্তুত করিতে শিখিল। কাষ্ঠের চাকা, রথ, গাড়ী এমন কি নৌকা ও জাহাজ এই ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত যন্ত্রপাতীর সাহায্যেই মানুষ প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। এই ব্রোঞ্জের সাহায্যে মানুষ পাথর কাটিয়া ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত গঠন করিয়া বসিল। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে মিশরের পিরামিড্ একটা। সে পিরামিডও এই ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত যন্ত্রপাতীর সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। যে আল্প দেশীয় জাতি ব্রিটন অর্থাৎ বর্ত্তমানের ইংলণ্ড খৃষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে জয় করিয়াছিল তাহারা এই ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেশবিদেশে আপনাদের জয়পতাকা উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল।

ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইল। ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত লাঙ্গল, কোদাল ইত্যাদি কৃষি সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্ষেত্রসমূহ সহজে সুচারুরূপে কর্ষিত হওয়ার ফলে চতুর্দ্দিক শস্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং উদ্যানসমূহ ফলে পুষ্পে শোভিত হইয়া মানব রসনা ও দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিল। অতিকায় প্রস্তর খণ্ড সমূহ বহন করিয়া দেশবিদেশে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত ভারবহনশীল একরকম রোলার বা চক্রযান প্রয়োজন হইল। ইহাও মানুষ ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। সুতরাং ব্রোঞ্জের মাহাত্ম্য ভাল করিয়া লিখিতে গেলে যে একখানি পুঁথি হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন কেমন করিয়া লৌহ আবিষ্কৃত হইল সেই কথাই বলিব। খৃষ্টের প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে, মিশরে এক ভীষণ উল্কাপাত হইল। তখন সেখানে ব্রোঞ্জের যুগ সবে মাত্র আরম্ভ

হইয়াছে।* ঐ উল্কাপাতের পর চতুর্দ্দিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে স্থানটীতে উল্কাপাত হইয়াছে সে স্থানের ঘরবাড়ী গাছপালা সব জ্বলিয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে কিসের একটা কাল পিণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। । সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিল উহা এক প্রকার বিশেষ শক্ত ও ভারী ধাতুতে গঠিত। এই শক্ত ও ভারী ধাতুর নামই লৌহ। এই প্রকারে মানুষ অতি প্রয়োজনীয় লৌহের সহিত সর্ব্ব প্রথমে পরিচিত হয়। আর স্বর্গ হইতে লৌহ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে এই জন্য লৌহের নাম হইল স্বর্গীয় ধাতু। কিন্তু এ আবিষ্কারে মানুষের বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। স্বর্গের বস্তু তাহাতে পরিমাণে অল্প সুতরাং ইহার চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের প্রাচীর অতি শীঘ্র গড়িয়া উঠিল এবং মানবের বৈজ্ঞানিক ও কেজো দৃষ্টি হইতে ইহাকে লুকাইয়া রাখিল। লৌহের প্রকৃত আবিষ্কার এশিয়া মাইনরের হিট্টাইট্‌স নামক এক জাতীয় লোক সর্ব্বপ্রথমে করে। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী এশিয়া মাইনরের উত্তরাংশে হিট্টাইট্‌স জাতিদ্বারা খনিজ লোহ সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হয়। খৃষ্টের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইজিয়ান সাগরস্থিত দ্বীপ সমূহে লৌহ প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টের প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর-বাসীরা ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্ত্তে লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় লৌহের সংবাদ ইয়োরোপের পশ্চিম প্রান্তে পৌছিতে বহুকাল লাগিয়াছিল। আজ যে ইয়োরোপ সভ্যতার অগ্রগামী দূত সেই ইয়োরোপ প্রাচীনকালে সভ্যতার সর্ব্ব পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। সেই জন্য গঅল অর্থাৎ ফ্রান্স নামক দেশে পৌছিতে প্রায় ৭০০ বৎসর লাগিয়াছিল, অর্থাৎ গঅলের লোক লৌহের সংবাদ জানিয়াছিল খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা তাহারও পরে। আর আয়ারল্যাণ্ডের লোক লৌহের কথা জানিয়াছিল খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে। আধুনিক সময়ে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধকে কসাইখানাতে পরিণত করিয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনকালে লৌহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের মূর্ত্তি ভীষণাকার ধারণ করিল এবং যুদ্ধ বাধিলেই যুদ্ধভূমিতে ভীষণ রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আশিরীয় নরপতি "সারগণ" ও "সেনাচেরীব" তাহাদের সৈন্যসামন্ত লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া খৃঃ পূঃ ৭২২ হইতে খৃঃ পূঃ ৬৮১ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪১ বৎসর ধরিয়া এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে যে রক্ত গঙ্গা বহাইয়া ছিলেন তাহা মনে করিলে এখনও সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। এই লৌহ যুগের প্রথম ইতিহাস

হইতে আমরা অতি সহজে বুঝিতে পারি জ্ঞানের সহিত শক্তির কতখানি নিকট সম্বন্ধ আর স্বার্থের জন্য সেই শক্তি কেমন জঘন্য ও নিষ্ঠুর ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই লৌহ যুগকেই কলিযুগ কহে। আমরা সকলে কলিযুগের মানুষ। সুতরাং লৌহ-যুগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলিযুগের আধুনিক মানবের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি। এখান হইতেই ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বের সময়ের নাম প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষের মস্তক ও হস্তপদের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ হইতেছিল। ঐ সঙ্গে মানুষের কথা বলিবার শক্তিরও ক্রমবিকাশ হইতেছিল। ক্রমেই মানুষ তাহার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে শিখিল এবং ধীরে ধীরে অতীত কাহিনী ও ঘটনা মনে করিয়া রাখিতে শিক্ষা করিল। সুতরাং প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষের মস্তিষ্কের; ভাষার ও স্মরণশক্তির বিকাশ হাওয়ায় মানব উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পর মানুষ নব প্রস্তর যুগে বাড়ী তৈয়ার করা, মাটির তৈজসপত্র তৈয়ার করা, কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও ধাতু নির্ম্মিত বস্তু নির্ম্মাণ করিতে শিখিল। এই সকল বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লিখন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বসিল। এবং এই লেখার সাহায্যে আদেশ উপদেশ দূরদেশে পাঠাইতে সমর্থ হইল। অতীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া স্থায়ী করিতে শিখিল এবং সুবৃহৎ ব্যাপার বা ঘটনা স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করিতে শিখিল এবং ইতিহাসের উপযোগী করিয়া সেই সকল ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিখিল।

এই লিখনপদ্ধতি আবার বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া আসিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমতঃ লোকে ছবির সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিত। একটা বাঘ আসিয়া একটা গরু লইয়া গেল। এই ঘটনাটী ব্যক্ত করিতে ছবি আঁকিয়া দেখাইতে হইবে যে বাঘ গরু লইয়া চলিয়াছে। এরূপ লেখাকে ইংরাজীতে Pictograph কহে। আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই লেখার প্রচলন ছিল। ছবি সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিতে দক্ষতাও লাগে আর সময়ও নেহাৎ অল্প লাগে না। মানুষ আরও দেখিল যে জীবজন্তুর সমস্ত ছবি না আঁকিয়া তাহাদের অংশ বিশেষ আঁকিলেই বুঝিতে পারা যায় লেখক কোন জন্তু বুঝাইতে ইচ্ছা করেন। ইহার পর দেখিল সকল বস্তুরই ছবি কিম্বা তাহাদের অংশ বিশেষের ছবি আঁকা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য লেখাকে জীবজন্তুর প্রতীক বা চিহ্ন না ধরিয়া শব্দের প্রতীক বা চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করা

হইল। "ইহার পর মানুষ যখন শব্দ ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর আবিষ্কার করিয়া ফেলিল তখন তাহারা আধুনিক অক্ষর মালার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইয়া লিপিবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। ব্যাবিলন ও মিশরে এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যা যে এই কয়েকটী স্তরের মধ্য দিয়া আসিয়া আধুনিক আকৃতিতে পৌঁছিয়াছে। তাহা প্রাচীন লেখমালা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চীন দেশীয় লিখন প্রণালী এখনও দ্বিতীয় স্তরে পড়িয়া আছে। মিশর ও ব্যাবিলনের লেখা ঐতিহাসিকগণ পড়িতে সমর্থ হইয়াছেন কিন্তু ক্রীট এবং মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লেখা উদ্ধার করিতে ঐতিহাসিকগণের আরও কিছুকাল লাগিবে।

মানব কেমন করিয়া একক জীবন পরিত্যাগ করিয়া দল বাঁধিতে শিখিল এবং পরিশেষে তাহারা কেমন করিয়া বিরুদ্ধ স্বার্থ বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতি গঠন করিল তাহা সুযোগ পাইলে আর একবার বলিব। কেমন করিয়া মানব পাশবিক মনোভাবের স্থানে নীতি ও ধর্ম্মের ভাব আনয়ন করিল, আর কেমন করিয়াই বা জীবজন্তুকে বশীভূত করিয়া পৃথিবীর উপর মানবের একছত্র রাজত্ব স্থাপন করিল তাহা ভবিষ্যতে বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল।*

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

চোখের ভাষা।

চেয়ে চেয়ে গেছ তুমি
গাওনিক গান।
নীরব চোখের ভাষা—
জানাইলে ভালবাসা
উঠেছিল গুমরিয়ে
কাঁদি মোর প্রাণ!

* অধ্যাপক হিয়ার্ণশএর গ্রন্থাবলম্বনে মুঙ্গেরের ম্যারিয়েট ক্লাবে পঠিত

নিখিলের দিকে দিকে
দেখেছি যে আঁখি।—
কালো যে উজল তারা—
কেঁদে কি হ'য়েছে সারা
বাতাসের আর্ত্ত সুরে—
নিতি ডাকি ডাকি !—
তবু ত মুখের ভাষা
ফোটেনিক তার !—
চোখের নীরব বাণী
করে' গেল কানাকানি !
এ দুটী তরুণ হিয়া
প্রেমে একাকার।
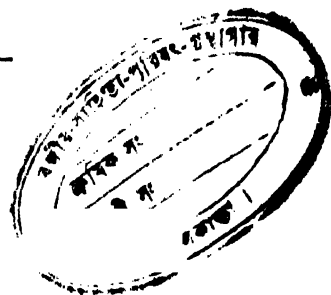
শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনন্তলাল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জেলা নদিয়া বল্লভপাড়া গ্রামে কালিদাস ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি কার্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। ভার্য্যা এবং দিগম্বর নামে পুত্র ভিন্ন সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না। বহু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার 'শাসন' অর্থাৎ শান্তি কার্য্য করিতে

গতিবিধি ছিল। অর্থাগমও বেশ হইত। এদিকে সংসারে খরচ অল্প। এই সকল কারণে সঙ্গতিপন্ন হইতে তাঁহাকে আয়াস করিতে হইল না। পুত্রকে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে দিয়া, তিনি পরলোকে গমন করিলেন।

কালিদাস ভট্টাচার্য্যের যখন পরলোক হইল, তখন তাঁহার পুত্রের বয়ঃক্রম বাইশ বৎসর। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। কালিদাসের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রবধূ অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক মাস পরে দিগম্বর সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পত্নী এক মৃত পুত্র প্রসব করিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পিতার মৃত্যুর পর দিগম্বর অভিভাবক শূন্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে গ্রামস্থ চরিত্রহীন যুবকদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহার স্বভাব কলুষিত হইতে আরম্ভ হইল।

বল্লভপাড়া গ্রামে শ্রীরাম গড়াঞী নামে এক তৈলিক বাস করিত। এই ব্যক্তির ভবতারিণী নামে কন্যা ছিল। কন্যা যখন কৈশর অতিক্রম করিয়া, যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছে, এমন সময়ে সে বিধবা হইয়া, পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিল। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিতে, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্মতুল্য তাহার সেই সৌন্দর্য্যে, গ্রামস্থ ভ্রমরকুল মত্ত হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে, গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ও নিন্দুক লোকেরা মাঝে মাঝে ঐ ভ্রমরকুলের এক একটির নামের সহিত ভবতারিণীর নাম সংযুক্ত করিতে লাগিল। আমরা কিন্তু অত নামের কথা বিশ্বাস করি না। সে যাহাই হউক, আমাদের দিগম্বর ভট্টাচার্য্য এ সকল সংবাদে একেবারে বধির ছিলেন না। শ্রীরাম গড়াঞীর বাটী গ্রামের পূর্ব্ব সীমায় এবং তাঁহার বাটী পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। অতঃপর দিগম্বর তৈল কিনিবার ছলে প্রতিদিন শ্রীরামের বাটীতে যান ও তাঁহার সহিত ভবতারিণীর চক্ষুর একত্র মিলন আরম্ভ হইল। দুই জনেরই দশা এক রকম; এক জনের তরী কাণ্ডারীহীন এবং আর একজন তরীহীন কাণ্ডারী। প্রথম দিন তৈল লইয়া বাটী যাইয়া, দিগম্বর দেখিলেন, তাঁহার চিত্ত শ্রীরাম গড়াঞীর ঘানিঘরে রাখিয়া আসিয়াছেন। ঘানিগাছের ন্যায় উহা শ্রীরামের বাড়ীর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহার মন যেখানে যায়, তাহাকেও বাধ্য হইয়া সেখানে উপস্থিত হইতে হয়। দুই তিনদিন তৈল আনিবার পর, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য দিবসের অধিকাংশ সময়, গড়াঞী বাড়ী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে কুল, শীল, মান,

বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া তিনি ভবতারিণীরূপ অরুণবর্ণ গোলাপটি গ্রহণ পূর্ব্বক বক্ষস্থলে পরিধান করিলেন। ইস্ত্রিকরা পরিস্কার জামার বটন্-হোলে যেমন গোলাপ শোভা পায়, দিগম্বরের ব্রাহ্মণকুলে এ ফুলের শোভা তেমনি। কিন্তু এ শোভা পরসুখে কাতর তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের চক্ষুশূল হইতে লাগিল। প্রথমে জ্ঞাতি, পরে প্রতিবেশী, পরে সমাজ তাহার পর গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার এ সুখের বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিজ বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণ ভবতারিণীকে লইয়া, কলিকাতায় পলায়ন করিলেন।

কলিকাতার ন্যায় অধমতারণ সহর আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় নাই। দিগম্বর তথায় এক গলির ভিতর বাসা লইলেন। পিতার পেশা শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন। কলিকাতায় যাইয়া তিনি ভবতারিণীকে নিজ বিবাহিত পত্নী বলিয়া পরিচিত করিলেন এবং ভদ্রলোকদিগের বাটীতে শান্তি করিয়া অবাধে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কলকুল পাবনী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী ভবতারিণি বড় বুদ্ধিমতী ছিল। কিছুদিনের মধ্যে, এ সকল কার্য্যের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারী সমস্তই তাহার বেশ শিক্ষা হইল।

কিন্তু পরের শান্তি করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের নিজের জীবন অশান্তিময় ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। উৎকট শূলরোগের আক্রমণে, ক্রমে তাঁহাকে শয্যাগত করিল। কলিকাতায় ডাক্তার কবিরাজের অভাব নাই, তাঁহার চিকিৎসারও ত্রুটি হইল না। কিন্তু কিছুতেই রোগের শান্তি না হওয়ায়, দিগম্বর অবধৌতিক মতে চিকিৎসা করাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কোনও লোক তাঁহাকে চন্দ্রহাট গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিশালা বন মধ্যস্থ বাবাজীর অবধৌতিক চিকিৎসার কথা জ্ঞাপন করিল, এবং তিনিও তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পরে, একদিন ভবতারিণিকে সঙ্গে লইয়া দিগম্বর বিশালা বন মধ্যস্থ বাবাজীর আখড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাবাজী তাঁহাকে আরোগ্য করিবেন কি, স্বয়ং এক বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। মহাভারতের আমলে যখন কুন্তী প্রভৃতি মানবীদিগরে রূপ দেখিয়া, সূর্য্য, যম ইত্যাদি দেবতারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন এই ঘোর কলিতে, বিশালা বনের বাবাজী ভবতারিণির ঢল ঢল যৌবনের ছটায় মুগ্ধ হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কন্দর্পবাণে বিদগ্ধব্যক্তির হৃদয়ে কতদূর যন্ত্রণা, তাহা ভবতারিণিরও অজ্ঞাত

ছিল না। তথায় কিছু দিন অবস্থিতি ও চিকিৎসাদির পর, ভবতারিণী দিগম্বরকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। যাইবার সময়ে বাবাজীর মন ও প্রাণ—এই দুইটি বস্তু অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া গেল। ইহার পর বাবাজীও রোগী দেখিবার ছলে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় দিগম্বরের বাসায় গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই প্রকারে তাঁহার মনসিজ জনিত রোগের চিকিৎসা বেশ হইতে লাগিল কিন্তু দিগম্বরের শূল রোগের কিছুই হইল না। পরন্তু তাঁহার শরীরের এক রোগ হইতে নানা রোগের সৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং অনেক দিন কষ্ট পাইয়া, তিনি ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। বাবাজীরও কলিকাতায় তাঁহাকে দেখিতে যাইবার অছিলা ফুরাইল।

দিগম্বরের মৃত্যুর পর, ভবতারিণী সহায় সম্পত্তিহীনা হইয়া পড়িল। তবে তাহার ন্যায় চতুরা যুবতীর পক্ষে কলিকাতা নিতান্ত মন্দ স্থান নহে। সে এখন রূপের ডালি সাজাইয়া "বার দিয়া বসিল বাহির দেওয়ানে।" সহায় সম্পত্তি জুটিতেও বিলম্ব হইল না।

এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর আর এক দিগম্বর যাইয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় বারাঙ্গনাদিগের পৌরোহিত্য ও নীচ জাতির মৃতের মুখাগ্নির মন্ত্র বলান তাহার পেশা ছিল। ভবতারিণী তাহাকে লইয়া, সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক একটু দূরে অন্য এক পাড়ায় বাসা লইল ও উভয়ে স্বামীস্ত্রীর ন্যায় বাস করিতে লাগিল। এই স্থানে আসিয়া, সে যামিনীদের মেসে, পাচিকা ব্রাহ্মণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। এক দিন বল্লভপাড়ার একগোস্বামীকে মেসের মধ্যে দেখিয়া, স্ত্রীলোকের বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে বিশালাবন মধ্যস্থ বাবাজীর আখরায় পলায়ন করিল।

তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাঠক মহাশয় সমস্তই অবগত আছেন। রতনপুর হইতে পুলিশকর্ম্মচারীদিগের সহিত চন্দ্রহাট চালান যাইয়া ভবতারিণীর সহিত তাহার ভ্রাতা এবং বিশালার বাবাজীর সহিত তাহার চেলা, দুইটি পৃথক গৃহে অবরুদ্ধ হইল ও তথা হইতে শীঘ্রই মহকুমায় প্রেরিত হইল। পুলিশের লোকেরা, চুরির একরার করাইতে আসামীদিগকে যে সকল যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর। বর্ণনা করা দূরে থাক, সে সকল স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু নানাপ্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিয়াও পুলিশে, বাবাজীর মুখ হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিল না। ভবতারিণীর কিন্তু দুঃখের

দুই বছরের পড়া এক বছরে শেষ করাটা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নহে! কিন্তু তাহাতে কেবল আমার অক্ষমতাই প্রমাণিত হইবে না, যে শিক্ষক মহাশয় আমার পরিশ্রমশীলতায় আস্থা রাখিয়া আমাকে উপরের শ্রেণীতে তুলিয়া দিবার জন্য উপরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার মান থাকে না। কাজেই দুই তরফা দুর্নামের ভয়ে আমি এই সংকল্প ত্যাগ করিলাম। সে যাহা হউক, অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া আমি ইউক্লিডের ত্রয়োদশ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত কোন প্রকারে আয়ত্ত করিলাম। এই বিষয়টি যে অত্যন্ত সোজা ইহা হঠাৎ একদিন আমার কাছে প্রকট হইল। আমার বিশ্বাস, ছেলেদের একটু যুক্তিতর্কের জ্ঞান ও পরিষ্কার মাথা হইলেই এই বিষয়টি আয়ত্ত করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। সেদিন হইতেই জ্যামিতিশাস্ত্র আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিল এবং তখন আর তাহা আমার কাছে কঠিন রহিল না।

সংস্কৃত পাঠ সুরু।

সংস্কৃতটা কিন্তু আমার কাছে বেশ একটু কঠিনই ঠেকিল। জ্যামিতিতে কিছুই মুখস্থ করিবার ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতে, আমার বিশ্বাস, সব কিছুই মুখস্থ করিতে হইত। সংস্কৃতও এই চতুর্থ-মান হইতেই সুরু হয়। ষষ্ঠমানে উঠিয়াই আমি সংস্কৃত একদম ছাড়িয়া দিলাম। যিনি আমাদের সংস্কৃত পড়াইতেন, তিনি পড়াশুনায় ভারী কড়াকড়ি করিতেন এবং আমার মনে হইত তিনি ছেলেদের অনেকখানি করিয়া পড়া দিতে ব্যস্ত হইয়া যাইতেন! পণ্ডিত মহাশয় ও মৌলবী সাহেবের মধ্যে বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। মৌলবী সাহেব ছিলেন সংযত চিত্ত। ছেলেরা পরস্পর বলাবলি করিত যে, পার্শীভাষা ঢের বেশী সোজা, আর মৌলবী সাহেব ছিলেন বেশ ভালমানুষ, ছেলের উপর যথেষ্ট সুবিচার করিতেন। পার্শীভাষার সারল্য আমায় বেশ প্রলুব্ধ করিল এবং একদিন আমি গিয়া পার্শী পড়ায় যোগ দিলাম। পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পাশে বসাইয়া বলিলেন, 'তুমি কেমন করিয়া ভুলিলে যে, তুমি এক বৈষ্ণব-পিতার সন্তান? কঠিনই যদি তুমি মনে কর, তাহা হইলে আমার কাছে আস না কেন? আমার যতটা শক্তি তাই দিয়ে তোমাদের আমি সংস্কৃত পড়াইতে প্রস্তুত আছি। এই সাহিত্যে যতই তোমরা প্রবিষ্ট হইবে ততই ইহার মধ্যে গভীরভাবে অনুরাগী হইবার মত বিষয় পাইবে। তোমাকে নিরাশ হইতে হইবে না। আবার তুমি সংস্কৃত পাঠে যোগ দাও।'

আফ্রিকায় ব্যবহারজীবি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শিক্ষিত যুবকদের সুন্দর হাতের লেখা দেখিয়া আমার নিজের বিশ্রী লেখার জন্য ভারী লজ্জা বোধ হইত। এবং হাতের লেখা সম্বন্ধে মনোযোগ না দেওয়ার জন্য ক্ষোভের সীমা ছিল না। দেখিলাম যে, হাতের লেখা ভাল না হইলেই বুঝিতে হইবে যে, শিক্ষা নিখুঁত হয় নাই। আমি শেষটায় হাতের লেখা উন্নত করিতে সচেষ্ট হইলাম কিন্তু তখন এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে, আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যৌবনে যে অমনোযোগী হইয়াছিলাম তাহা কখনো শুধরাইতে পারিলাম না। আমার নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রত্যেক যুবক যুবতীকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি যে, সুন্দর হাতের লেখা শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, ইহা যেন তাহারা কখনো ভুলিয়া না যায়। আমি এখন এই মত পোষণ করি যে ছেলেপিলেদের লেখা পড়া সুরু করিবার আগে প্রথমটায় অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া দরকার। ছেলেরা চোখে দেখিয়া যেমন পাখী প্রভৃতি জিনিষ চিনিতে পারে, তেমনি অক্ষরগুলিও বস্তুর মধ্য দিয়া যাহাতে শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থাই করা উচিত। দ্রব্যাদি আঁকিতে শেখার পর ছেলেদের হস্তাক্ষর লিখিবার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবেই তাহাদের হাতের লেখা সুন্দর আকার ধারণ করিবে।

জ্যামিতিশাস্ত্রে অনুরাগ।

আমার ছাত্রজীবনের আর দুইটি স্মৃতি কথা উল্লেখ করিবার যোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহের ফলে আমার একটি বছর নষ্ট হয়। যে সকল ছেলে পড়াশুনায় রীতিমত খাটে, কোন কোন কারণে কারুর একবছর পড়া ক্ষতি হইলে তাহাদিগকে এক শ্রেণী উপরে তুলিয়া দেওয়া হয়। আমাকেও শিক্ষক তাই তুলিয়া দিতে চাহিলেন, ফলে তৃতীয়মানে মাত্র ছয় মাস থাকিয়াই গ্রীষ্মাবকাশের পরেই একটা পরীক্ষা দিয়া চতুর্থমানে উঠিলাম। চতুর্থমান থেকেই প্রায় সবগুলি শিক্ষণীয় বিষয়েই ইংরেজী হইল শিক্ষার বাহন। আমি যেন সমুদ্রে পড়িলাম এই শ্রেণীতে উঠিয়াই আমাকে জ্যামিতি নূতন আরম্ভ করিতে হইল, অথচ এই বিষয়টিতে আমি তেমন পটু ছিলাম না। এবং ইংরেজী বাহন হওয়ায় আমি আরো মুশ্‌কিলে পড়িলাম। শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়টি বেশ ভাল করিয়াই পড়াইতেন কিন্তু আমি তেমন জুত পাইলাম না। ফলে সময় সময় ভারী নিরাশ হইয়া পড়িতাম এবং পুনরায় তৃতীয়মানে নামিয়া যাইতে ইচ্ছা হইত। আমার তখন মনে হইত,

ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতি আমার বিতৃষ্ণার কারণ এই যে, পিতৃদেবের সেবাশুশ্রূষা করিবার আগ্রহ ছিল আমার অত্যন্ত প্রবল। স্কুলের ছুটি হইবা মাত্র আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম, এবং বাবার সেবায় লাগিয়া যাইতাম। স্কুলে যখন ব্যায়াম চর্চ্চা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল তখন বাবার সেবায় আর তেমন সময় পাইতাম না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমি প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বাবার সেবা করার কারণ দেখাইয়া ব্যায়াম-চর্চ্চা হইতে অব্যাহতি চাহিলাম কিন্তু তিনি আমার কথা শুনিলেন না। এক সময়, কোনও শনিবারে আমাদের স্কুল ভোরে বসে এবং ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য বিকেল চারিটার সময় আমাদিগকে স্কুলে যাইতে হয়। সে-দিনটা ছিল মেঘলা, তা-ছাড়া আমার ঘড়িও ছিল না, সময় ঠিক পাই নাই ; স্কুলে যখন পৌঁছিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম যে, সকল ছেলেই চলিয়া গিয়াছে। পরদিন মিঃ গিমি আমাদের হাজিরা বই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আমি অনুপস্থিত। অনুপস্থিত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাবে আমি কি হইয়াছিল সব বলিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। আমার এখন মনে নাই, এক আনা কি দুই আনা যেন জরিমানা করিয়া বসিলেন। মিথ্যা কথায় ওজুহাতে আমার শাস্তি হইল! প্রাণে বড় লাগিল। আমি যে নিরপরাধ তাহা কি করিয়া প্রমাণ করিব? কোন পথই যে নাই। গভীর দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম যে কেবল সত্যবাদী হইলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে হুঁস থাকাও দরকার। আমার ছাত্রজীবনে এইটিই হইতেছে আমার প্রথম ও শেষ অমনোযোগিতার দৃষ্টান্ত। মনে হইতেছে যেন শেষ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতেও অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলাম।

হাতের লেখায় অবহেলা।

ব্যায়াম চর্চ্চা হইতে শেষটায় আমি একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছিলাম। কারণ স্কুলের ছুটির পরই আমার বাড়ী ফেরা দরকার, এই মর্ম্মে পিতৃদেব প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যায়াম চর্চ্চায় মন দিই নাই বলিয়া যদিও আমার তেমন ক্ষতি হয় নাই, তবে আর একটি বিষয়ে অমনোযোগী হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত আমার আজো করিতে হইতেছে! সুন্দর হাতের লেখা যে শিক্ষার অঙ্গ নয়, এ ধারণা আমার কোথা হইতে যে আসিয়াছিল জানি না এবং ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত আমার সেই ধারণাই ছিল। ইংলণ্ডে এবং পরে দক্ষিণ

খেলাধুলায় বিতৃষ্ণা।

আমার মনে পড়ে আমার নিজের সম্বন্ধে আমার কখনো উচ্চ ধারণা ছিল না। পারিতোষিক বা জলপানি পাইলে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। কিন্তু আমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সজাগ ছিলাম। সামান্য এতটুকু কলঙ্কেই আমার চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িত। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, শিক্ষকের সামান্য ভর্ৎসনাও আমার কাছে অসহ্য ছিল। মনে পড়ে, একবার বেত্রাঘাত পাইয়াছিলাম, কিন্তু সেই শাস্তিতে আমার মনে কোন ক্ষোভ হয় নাই, কেন না মনে হইয়াছিল যে, সে শাস্তি আমার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু বেদনায় খুব খানিকটা কাঁদিয়া ছিলাম। তখন আমি সম্ভবত প্রথম বা দ্বিতীয় মানে পড়িতে ছিলাম। সপ্তম মানে যখন পড়ি, তখনকার একটি ঘটনা বলিতেছি। তখন আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দোরাবজী এডলজী গিমি। ছাত্র-সম্প্রদায় তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত, কেননা তিনি যেমন ভাল পড়াইতেন, তেমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সব কাজ করিতেন, উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের তিনি ব্যায়াম করা ও ক্রিকেট খেলা অবশ্য- কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এই দুটো জিনিষেই ছিল আমার বিশেষ বিতৃষ্ণা। অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার আগে কখনো আমি ফুটবল বা ক্রিকেট খেলায় যোগদান করি নাই। লজ্জাশীলতাই খেলা-ধূলা হইতে দূরে থাকার অন্যতম কারণ। আজকে অবশ্য মনে হইতেছে, আমার পক্ষে তাহা অন্যায় হইয়াছে। সেদিন আমার এই ভুল ধারণা ছিল যে, ব্যায়ামের সঙ্গে শিক্ষার কোনই সম্বন্ধ নাই। আজ কিন্তু আমার ধারণা যে, যতটা মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন, ব্যায়াম চর্চ্চাও ততটাই শিক্ষা-প্রণালী-ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

তবে একথা বলিতে পারি যে, ব্যায়ামাদি হইতে দূরে থাকিলেও আমার তেমন ক্ষতি হয় নাই। কেননা খোলা রাস্তায় দীর্ঘপথ হাঁটার গুণাবলী আমি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম। এবং উপদেশটী আমার মনঃপুত হওয়ায় প্রতিদিন খানিকটা করিয়া হাঁটা আমার অভ্যাসে পরিণত হইল এবং আজো সেই অভ্যাস অটুট রহিয়াছে। এই হাঁটা অভ্যাসে আমাকে বেশ কর্ম্মঠ করিয়া তুলিয়াছে।

মহাত্মাজীর আত্মজীবনী।

——ঃ-ঃ——
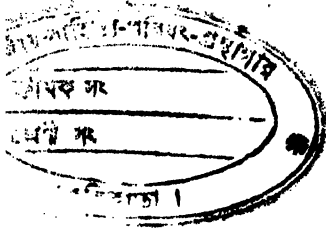
পঞ্চম অধ্যায়।

ছাত্র-জীবনের স্মৃতি।

আমার বিবাহের সময় আমি উচ্চ-ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছিলাম, এ কথা আগেই বলিয়াছি। আমরা তিন ভাইয়ে এই স্কুলে পড়িতাম। দাদা আমার চাইতে ঢের উপরের ক্লাসে পড়িতেন, এবং মেজ দাদা মাত্র এক ক্লাস উপরে পড়িতেন এবং তাঁহার বিবাহের সঙ্গেই আমারও বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের ফলে আমাদের একটি বছর নষ্ট হইল। মেজদাদার পরীক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। তিনি তাই একদম পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলেন। ভগবান জানেন, মেজদাদার মত কত ছেলের এ রকম দুর্ভাগ্য হয়। কেবল মাত্র আধুনিক হিন্দুসমাজেই পড়াশুনা ও বিবাহ এক সঙ্গে চলিতে পারে।

আমার পড়াশুনা চলিতে লাগিল, উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িবার সময় আমি নেহাৎ নির্ব্বোধ বলিয়া গণ্য হই নাই। শিক্ষকদের স্নেহ আমি সকল সময়েই পাইয়াছি। প্রতি বৎসর ছাত্রের পড়াশুনা ও চরিত্র সম্বন্ধে ছাত্রের অভিভাবকের নিকট মন্তব্য পাঠাইতে হয়। আমার সম্বন্ধে কখনো খারাপ মন্তব্য প্রেরিত হয় নাই। দ্বিতীয় মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি পারিতোষিক পাইয়াছিলাম। এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের পরীক্ষায় যথাক্রমে চারি টাকা ও দশ টাকা করিয়া জলপানি পাইয়াছিলাম। ইহার জন্য আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, কেননা আমার গুণের অপেক্ষা অদৃষ্টই আমায় এতটা সাফল্য আনিয়া দিয়াছিল। বিশেষতঃ এই জলপানিটা সকল ছেলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল না, কাঠিয়াবাড়ের সোরাত বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছেলেদের জন্য একান্ত ভাবে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ক্লাসের চল্লিশ পঞ্চাশটি ছাত্রের মধ্যে সেকালে সোরাত বিভাগের ছাত্র খুব বেশী ছিল না।

সাকী।

—※—

শাওন্ সাকীর বেদন ভরা, কাঁদন্ ঝরা সুর
অঝোর ঝরে, ঝরণা ধারে দিচ্ছে ক'রে—আমার ব্যথার পেয়ালা ভরপুর।
আমার সাকীর, কাজল আঁখির ওই কোণে;
মূর্ত্তিমতী ব্যথার ব্যথী, অশ্রু ঝরে—লাল গালে।
—শান্তি ঝরে লাল খুনে।
সাকীর—রুক্ষ চুলে, ঝড়ো হাওয়া, রুদ্ধশ্বাসে গুমরে উঠে;
পাগল হাওয়া চুম্ খেয়ে যায় সাকীর আমার সরাব পিয়া লাল ঠোঁটে
রুদ্ধ হাওয়া রণিয়ে উঠে, পবন স্বনে;
মেতে যায় বজ্র গানে, রুদ্র তানে, প্রবল রণে।
পরাণ-বঁধু, সাকীর শুধু অশ্রু ঝরে, পরের ব্যথায়।
ওদের ওই খুনো খুনীর রুদ্র কথায়।
সাকী আমার পুরাণ মাঝে নূতন খোঁজে;
ঝড়ো হাওয়া পাগল বায়ে, রুদ্র তেজে,
লাল সরাবের নেশায় মেতে, ভেঙ্গে চুরে পাগল ক'রে
ভেঙ্গে দিয়ে সব—আবার বলে—
এ যে প্রেমের হাওয়া, আসা যাওয়া,—
লীলার লীলা, প্রেমের খেলা—সৃষ্টি এ যে
আমি চাই নিত্য নূতন, কল্পজের খুণ
ভাঙ্গাগড়া ধরার মাঝে।

———

শ্রীপ্রদ্যুম্নভূষণ গুহ।

ডাকাতী হয়। এই দুই ডাকাতীতে যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশই আশ্রম ঘর খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছিল; এবং ভবতারিণী পুলিশের তাড়নায়, ঐ সকল দস্যুর নাম, ধাম এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির তালিকা বলিয়া দিয়াছিল। সে দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত বল্লভপাড়া হইতে কলিকাতায় পলায়ন করিবার পর প্রতারণা পূর্ব্বক অনেক ভদ্রলোকের জাতিধ্বংশ করিয়াছে। সমস্ত দোষই প্রমাণিত হইল, শাস্তিও পাইল সকলেই। কেবল বৃদ্ধ তুলসী দাস কোন দোষে দোষী ছিল না। সে বাবাজিকে সাধু বলিয়াই জানিত; আশ্রমের সকলে কারাশ্রমে যাত্রা করিলে সেও অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্বদেশে যাত্রা করিল।

অশ্রু নয়নে নয়নে,—কোথায়ও বা পঙ্কিল, কোথায় পবিত্র! তুলসী দাস জানিত গুরু সে সরল প্রাণের সে বিশ্বাস হারাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত করিল। অনন্তলাল—সংসারের সকল হারাইয়া সংসারত্যাগী হইলেন—ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিলেন।

ব্রজেন্দ্র ও সুশীলা অনেক প্রকারে বৃদ্ধ অনন্তলালকে সংসারে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ অনুনয় করিয়াছিল—কিন্তু অনন্তলালের সংসারে মতি ছিল না। বৃদ্ধের শেষ অবস্থা ও মনের ভাব স্মরণ করিয়া ব্রজেন্দ্র অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না,—হায় অশ্রু! গঙ্গোদকের ন্যায়—পবিত্র নয়নবারি আজ ব্রজেন্দ্র ও সুশীলার হৃদয়ে নয়নে। হৃদয়ে বান ডাকিয়াছে—তাদের এ সুখের দিনে তাহাদের আশ্রয়দাতা বৃদ্ধবয়সে চলিলেন—ভিক্ষুকাশ্রমে—এ দুঃখ মর্ম্মন্তুদ!

সমাপ্ত।

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

শরীর। আদর যত্নে এতাবৎকাল তাহার অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে অধিক যন্ত্রণা দিতে হইল না। দুই চারিটি তর্জ্জন গর্জ্জনেই সে যাহা জানিত সমস্তই বাহির হইল।

বিচারে প্রমাণ হইল যে, কএক বৎসর হইতে বিশালাবনের চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামে যে সকল দস্যু ডাকাতী করিতেছে তাহারা সকলেই বাবাজীর পরিচিত, এবং তাঁহারি সাহসে তাহারা ডাকাতী করিয়া বেড়ায়; যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনে, নাম মাত্র মূল্য দিয়া তিনিই সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। পরে যেমন সুবিধা পান, আখ্‌রায় বসিয়াই তাহার এক একটি বিক্রয় করেন। যাহা অবশিষ্ট থাকে, বা যাহা বিক্রয়ের সুবিধা না পান, তীর্থযাত্রার ছলনায় সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যান। ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া, এ দেশে যতগুলি ডাকাতী হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ মাল তিনি আত্মসাৎ ও বিক্রয় করিয়াছেন।

তখন তাঁহার দেশ কোথায় এ সম্বাদ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইল। কিন্তু সে কথা তিনি ভিন্ন আর কেহই জানেন না। তাঁহার মুখ হইতে বাহির করাও কঠিন। অবশেষে তাঁহার ঘরের চালে গোঁজা, দেবনাগরী অক্ষরের একখানি পত্র পাওয়া গেল। উহার সাহায্যে তাঁহার নিবাস ইত্যাদি অজ্ঞাত রহিল না। তখন চারিজন পুলিশকর্ম্মচারী বাবাজীকে লইয়া তাঁহার দেশাভিমুখে গমন করিল। তথায় জানিতে পারা গেল যে, তিনি "হজ্জম" অর্থাৎ নাপিতের কুল উজ্জল করিয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভে "ঠগী" নামক দস্যুদিগের দলে মিশিয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত খুন, লুট ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে যখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঠগীর দলের লোক ধরা পড়িতে লাগিল, তখন স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এক রামাইৎ বৈষ্ণবের চেলা হইয়া তাঁহার সহিত নানাদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এই বৈষ্ণব অবধৌতিক চিকিৎসা ভাল জানিতেন। তাঁহার নিকট এই চিকিৎসা এবং সাধু ফকিরের ভাবভঙ্গী সমস্ত শিক্ষা করিয়া, বাবাজী অবশেষে বাঙ্গালায় আসিয়া; বিশালাবনে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

তাঁহার সমস্ত অপরাধ প্রমাণ হইবার পর, বিচারক তাঁহাকে যাবজ্জীব দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পূর্ব্বে, ভবতারিণী যামিনীদের মেস হইতে পলায়ন করিয়া, বাবাজীর আখরায় জুটিয়াছিল। এই এক বৎসরে বিশালাবনের পার্শ্ববর্ত্তী দুইখানি গ্রামে দুইবার

আমি লজ্জিত হইলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের স্নেহের অসম্মান করিতে পারিলাম না। আজ কৃষ্ণশঙ্কর পাণ্ড্যে মহাশয়ের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ না করিয়া পারি না। কেননা সে সময় যে সামান্য সংস্কৃতটুকু আয়ত্ত করিয়াছিলাম তাহা যদি না করিতাম তাহা হইলে আজ আমাদের ধর্মশাস্ত্রের এতটা অনুরাগী হইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। আজ আমার এই বলিয়া দুঃখ হইতেছে যে, আরো বেশী কেন সংস্কৃতটা শিখি নাই! পরে বুঝিয়াছি যে, কোন হিন্দু ছেলে-মেয়েরই সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান না থাকিলে চলে না।

উচ্চশিক্ষায় ভাষার স্থান।

আমার এখন মনে হয়, ভারতে উচ্চ শিক্ষায় হিন্দী, সংস্কৃত, পার্শী, আরবী, এবং ইংরেজী ও প্রাদেশিক ভাষাগুলি অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। এত বড় লম্বা তালিকা দেখিয়া কাহারও ভীত হইবার কোনই কারণ নাই, কেননা আমার বিশ্বাস, আমাদের শিক্ষা-প্রণালী যদি আরো সুসম্বদ্ধ হয় এবং শিক্ষার্থীদের যদি বৈদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের গুরুভার বহন করিতে না হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এই সকল ভাষা শিক্ষা 'দারুণ কর্ত্তব্য' বলিয়া পরিগণিত হইবে না বরং শিক্ষার্থীরা ইহাতে বেশ আরামই পাইবে। একটি ভাষা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আয়ত্ত করিতে পারিলে আর আর সকল ভাষা আয়ত্ত করা অনেকটা সোজা হইয়া পড়িবে। সত্য কথা বলিতে কি, হিন্দী, গুজরাটী এবং সংস্কৃত ভাষাকে একটি ভাষাই মনে করা যাইতে পারে এবং পার্শী ও আরবীও একটি। সংস্কৃত ও পার্শী যদিও আরবী ও হিব্রু ভাষা হইতে আলাদা ঘরে বাস করে, তবুও পার্শী ও আরবীর মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, কেননা উভয় ভাষাই একই উৎস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর সে উৎসই ইস্লামের অভ্যুত্থান। উর্দ্দু ভাষাকে আমি আলাদা ভাষা বলিয়া মনে করি না, কেননা এই ভাষা হিন্দী ব্যাকরণ ও শব্দসম্পদে প্রধানত পার্শী ও আরবীর কাছে ঋণী। এবং যিনি উর্দ্দু ভাল জানিবেন তিনি পার্শী ও আরবীও জানিবেন; তেমনি তিনি গুজরাটী, হিন্দী, বাঙলা বা মারাঠী ভাল জানিবেন, তাঁহাকে সংস্কৃতও ভাল জানিতেই হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাংস আহার

পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, হাই স্কুলে অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার খুবই কম ছিল। বিভিন্ন সময়ে আমার দুইটি মাত্র বন্ধু ছিল। ইহাদের একজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। দ্বিতীয় বন্ধুর আবির্ভাবে প্রথম বন্ধুটি আমায় ত্যাগ করেন। এই দ্বিতীয় বন্ধুর বন্ধুত্বকে আমার জীবনের একটি পরম দুর্ঘটনা বলিয়াই মনে করি। এই বন্ধুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। সংস্কারকের মনোভাব হইতে এই বন্ধুত্বের জন্ম। এই বন্ধুটি আসলে ছিল আমার দাদার বন্ধু ও সহপাঠী। আমি তাহার চরিত্রের দোষত্রুটি সব কিছুই জানিতাম, তাহাকে বিশ্বাসী বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। আমি অসৎসংসর্গ করিতেছি এই বলিয়া মা, দাদা ও স্ত্রী—সকলেই আমকে অনুযোগ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। স্বামী হিসাবে আমি এতটা গর্ব্বোদ্ধত ছিলাম যে স্ত্রীর সাবধান করাটাকে মোটেই গ্রাহ্য করিলাম না। মায়ের ইচ্ছার বিপক্ষে যাইবার দুঃসাহস অবশ্য আমার ছিল না, আর দাদাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেও আমি বাধ্য। কাজেই তাঁহাদের কাছে এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিলাম,—তাহার সম্বন্ধে তোমরা যে সব দোষত্রুটির কথা বলিতেছ, আমি তাহা সবই জানি; কিন্তু তাহার মধ্যে যে সদ্‌গুণও আছে তাহা তোমরা জান না। সে আমার ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারে না। কেননা তাহাকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই আমি তাহার সঙ্গ লইয়াছি। আমি বেশ জানি, সে যদি সৎপথে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সে একজন মানুষের মত মানুষ হইবে। আমি তোমাদের মিনতি করিতেছি যে, আমার জন্য তোমরা ভাবিও না। এই কথায় তাঁহারা খুশী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না, কিন্তু আমার যুক্তি তাঁহারা মানিয়া লইবেন, আর আমার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ান নাই।

পরে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার ধারণাকে ভুলের উপর দাঁড় করিয়াছিলাম। একজনের চরিত্র শোধরানই যাহার উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে অতটা মাখামাখি ঘনিষ্ঠতা মোটেই উচিত হয় নাই। প্রকৃত বন্ধুত্ব দুইটি হৃদয়ের অভিন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহা খুব সহজ লভ্য নহে। সমপ্রকৃতির মধ্যেই বন্ধুত্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর তাহা স্থায়ীও হইয়া থাকে। এক বন্ধুর

চরিত্র অপর বন্ধুর চরিত্রে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কাজেই যেখানে বন্ধুত্ব, সেখানে সংশোধনের কোন সুযোগই আর থাকে না। কাজেই আমার মত এই যে, সকল প্রকার ঘনিষ্ঠতাকেই একেবারে বর্জ্জন করিতে হয়; কেননা মানুষ সহজেই পাপের পথে অগ্রসর হয়, পুণ্যের পথে নয়। ঈশ্বরকে বন্ধুরূপে পাইতে হইলে হয় নিঃসঙ্গ থাকাই উচিত, নতুবা দুনিয়া সুদ্ধ সকলকেই বন্ধু বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আমার এ মত ভুলও হইতে পারে। সে যাই হোক বন্ধুত্বের চর্চা করিবার যে প্রচেষ্টা আমার মধ্যে আসিয়াছিল তাহা ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কারের ঢেউ— মাংসাহার

এই বন্ধুটির সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, সে সময় রাজকোটে সংস্কারের একটা প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া পড়ে। বন্ধু আমাকে জানাইলেন যে, আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই গোপনে মদ ও মাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, রাজকোটের আরো কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিও নাকি এই দলে আছেন। হাইস্কুলের কয়েকটি ছেলেও নাকি ইঁহাদের মধ্যে আছে একথাও শুনিলাম। খবরটা পাইয়া আমি বিস্মিতও যেমন হইয়াছিলাম, বেদনাও কম অনুভব করি নাই। বন্ধুকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এমনি ভাবে তাহার ব্যাখ্যান করিল—আমরা মাংস খাই না, কাজেই আমরা দুর্ব্বল। ইংরেজ মাংস খায়, তাই তাহারা আমাদের শাসন করে। তুমি ত জান, আমি কেমন কষ্টসহিষ্ণু, আর কেমন দ্রুত দৌড়াইতে পারি। ইহার কারণ কি জান?—কারণ, আমি মাংস খাই। যাহারা মাংস খায় তাহাদের কখনো ফোঁড়া বা আঁব হয় না। এবং যদিও বা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঘা শুকাইতেও বেশী দেরী লাগে না। আমাদের শিক্ষক ও যে সকল বড়লোক মাংস খান তাঁহারা ত নির্ব্বোধ নহেন। তাঁহারা ইহার উপকারিতা কি তাহা বেশ জানেন। সুতরাং তোমারও তাই করা উচিত। দেখই না একবার ইহাতে কি আছে?

এক দিনেই অবশ্য এতটা যুক্তিতর্কের অবতারণা হয় নাই। বন্ধু সময় সময় যে সকল বিস্তৃত ও সুদীর্ঘ যুক্তি আমার উপর প্রক্ষেপ করিতেন উপরে তাহার সারমর্ম দেওয়া গেল। ইতিমধ্যেই মেজদাদার পতন সুরু হইয়াছিল; কাজেই তিনিও বন্ধুর যুক্তিতে সায় দিলেন। মেজদাদা ও বন্ধুবরের পার্শ্বে আমাকে নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা উভয়েই ছেলেন আমার চাইতে অধিক কর্ম্মঠ, শক্তিশালী এবং সাহসী। বন্ধু যে সকল অসমসাহসের

কার্য্য করিত তাহা আমার মনে অক্ষমতার একটা দুঃখ আনিয়া দিত। সে অদ্ভুত রকমে দ্রুত দীর্ঘপথ দৌড়াইতে পারিত। দৌড়ঝাঁপ উল্লম্ফনে সে ছিল একের নম্বর ওস্তাদ। সকল প্রকার শারীরিক শাস্তি সে নীরবে সহ্য করিতে পারিত। সময় সময় সে আমাকে তাহার এই সব দুঃসাহসিক কাজ দেখাইয়া তাক লাগাইয়া দিত। নিজের মধ্য যে গুণের অভাব আছে, তাহা অপর কাহারো মধ্যে দেখিতে পাইলে মানুষের মন স্বতই বিমুগ্ধ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, আমিও বন্ধুর এই সব ক্রিয়াকলাপে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মতো হইবার প্রবল আকাঙ্খা আমাকে পাইয়া বসিল। আমি লাফ দিতে বা দৌড়াইতে মোটেই পারিতাম না। আমার মনে হইল, আমি কেন বন্ধুর ন্যায় শক্তিমান হইব না ?

নিরামিষাশীর আত্মবিশ্বাস

কিন্তু আসলে আমি ছিলাম অত্যন্ত ভীরু স্বভাব; চোর ভূত, সাপ ইহাদের ভয়ে আমি সর্ব্বক্ষণই সশঙ্কিত থাকিতাম। কাজেই রাত্রি বেলা দরজার বাহিরে আসিতে সাহস পাইতাম না। অন্ধকার আমাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত। অন্ধকারে ঘুমানও আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, কেননা আমার কেবলই মনে হইত, একদিক দিয়া ভূত, আর এক দিক দিয়া আসিত চোর, সাপ অন্য আর এক দিক দিয়া; এই কারণে আমার শয়ন ঘরে একটি আলো না জ্বলাইয়া ঘুমাইতে পারিতাম না। পার্শ্বেই স্ত্রী ঘুমাইতেন, তাঁহাকে আমার ভয়ের কথা কি করিয়া বলি ? তখন আমি সবে যৌবন সীমায় পদার্পন করিয়াছি। তাঁহারও যে আমার অপেক্ষা ঢের বেশী সাহস আছে তাহা জানিতাম আর সেই কারণেই অত্যন্ত লজ্জানুভব করিতাম। ভূত বা সাপের ভয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। অন্ধকারে তিনি যেখানে সেখানে চলাফেরা করিতে পারিতেন। আমার এই সব দুর্ব্বলতার খবর বন্ধু রাখিত, তাই সময় সময় বলিত যে, সে জ্যান্ত সাপ হাতের মুঠোয় ধরিতে পারে, চোর ডাকাতের ভয় তাহার নাই, আর ভূতের অস্তিত্বে তার কিছু মাত্র আস্থা নাই। আর এ সবই নাকি মাংসাহারের ফল।

যে সময় নর্ম্মদা যে মাংসাহারের ব্যাপার লইয়া একটি ছড়া বাঁধিয়া ছিলেন, তাহা আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ধিঙ্গি সাহেব,   ঐ চেয়ে দেখ,
নেটিভ্ লোকের শাসক—
লম্বায় চওড়ায়   পাঁচহাত তিনি
কারণ মাংস-খাদক।

সংস্কারের নেশায় মশগুল

তাহার পর মাংসাহারের জন্য একটা বিশেষ দিন স্থির হইয়া গেল। নবসংস্কার সুরু করিতে বিশেষ দিন কেন স্থির করা হইয়াছিল, তাহা বুঝা অনেকের পক্ষেই একটু কষ্টকর ঠেকিবে। গান্ধী-পরিবার বৈষ্ণব, বিশেষত আমার মাতাপিতা বিশেষ করিয়া গোঁড়া বৈষ্ণব। তাঁহারা নিয়মিত হাবেলীতে (বৈষ্ণব মন্দির) যাইতেন। আমাদের নিজেদের পারিবারিক মন্দির আছে। গুজরাটে জৈনধর্মও বেশ প্রবল এবং সর্বত্রই সব ব্যাপারেই তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মাংসাহারের বিপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ গুজরাটের জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল; ভারতে বা বাহিরে কোথাও বৈষ্ণবেরা মাংসাহার করে না। এই প্রথাগত নিয়মের মধ্যে আমার জন্ম আর এই আওতায়ই আমি মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। আমি ছিলাম পিতামাতার উপর অত্যন্ত ভক্তিমান, কাজেই এটা আমার বেশই জানাছিল যে, যে মুহূর্তে তাঁহারা আমার মাংসাহারের সংবাদ পাইবেন তখনই বিশেষ মর্ম্মাহত হইবেন, হয় ত সে আঘাত সহ্য করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্যও হইয়া উঠিতে পারে। তাছাড়া জানিয়া হউক, কি না জানিয়াই হউক, সত্যের প্রতি আমার একটা ভৃত্যোচিত টান ছিল। একবার মাংস আহার ধরিলে পিতা মাতাকে যে মিথ্যা দিয়া প্রতারিত করিতে হইবে; ইহা যে তখন আমি জানিতাম না, একথা বলিতে পারি না। কিন্তু সংস্কারের দিকেই আমার মন একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, মাংস যে অত্যন্ত মুখরোচক সুখাদ্য এ প্রশ্নও ছিল না। মাংসের যে একটা বিশিষ্ট স্বাদ আছে ইহা আমার জানাও ছিল না। দৈহিক বলশালী ও সাহসী হওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমার দেশবাসীও যেন সেই রকম হইতে পারে ইহাও ছিল আমার কাম্য। কেননা শারীরিক শক্তি ও মানসিক সাহস বাড়িলেই ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত স্বাধীন করা যাইবে, এই ছিল আমার বিশ্বাস। 'স্বরাজ' শব্দটি তখনো শোনা যায় নাই। সংস্কারের নেশা আমায় একেবারে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাই নিঃশেষে নিজেকে লুকাইয়া যাইতে পারিয়াছিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

একটি দুর্ঘটনা

অবশেষে দিনটি আসিল। আমার সে দিনের অবস্থার ঠিক্ ঠিক্ বর্ণনা করা আজ আমার পক্ষে মুশ্‌কিল। একদিকে সংস্কারের জন্য অসীম উৎসাহ এবং জীবনে একটা নূতনত্বের মোহ আর একদিকে এ কার্য্য করিতে যাইয়া চোরের মত আত্মগোপনের তীব্র লজ্জা। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব যে আমার মধ্যে প্রবলতর ছিল, আজ তাহা আমার মনে নাই। আমরা নদীর তীরে একটি নির্জ্জন স্থানের সন্ধান করিলাম এবং সেখানে, জীবনে যাহা কখনো দেখি নাই, সেই মাংস দেখিলাম। তার সঙ্গে পাঁউরুটিও ছিল। আমার কাছে কিন্তু কোনটাই ভাল লাগে নাই। মাংস চামড়ার মত শক্ত মনে হইল। কিছুই খাইতে পারিলাম না। গা বমি বমি করিতে লাগিল, না খাইয়াই চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

রাত্রিতে আমার ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ঘুম আসিল না, রাজ্যের যত রকম দুঃস্বপ্ন আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। আমার কেবলই মনে হইতেছিল যে, আমার পেটের মধ্যে যেন একটা জ্যান্ত পাঁঠা রহিয়াছে আর সে করুণভাবে কাঁদিতেছে। আমি সচকিতে উঠিয়া পড়িলাম এবং আমার ভীষণ অনুতাপ হইতে লাগিল। আবার তখনই মনে হইল, মাংসাহার আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে, ভয় করিলে চলিবে না ত! বন্ধুটিও অত সহজে হটিবার পাত্র নয়। তখন হইতে সে মাংসের নানারকম সুস্বাদু জিনিষ তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমাদের আর এখন খাওয়ার জন্য নদীর তীরে যাইতে হয় না। বাবুর্চির সঙ্গে গোপনে বন্দোবস্ত করিয়া সরকারী অতিথিশালায় সব ব্যবস্থা ঠিক্ হইল। সেখানে ভোজনাগার, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সবই ছিল। ইহার ফলও ফলিল। রুটির উপর আমার যে বিতৃষ্ণা ছিল তাহাও আর রহিল না এবং পাঁঠার প্রতি যে একটু মায়া ছিল তাহাও পরিত্যাগ করিলাম। মাংসের প্রতি যদিও আমার টান জন্মিল না, মাংসের তৈরী অন্যান্য জিনিষে বেশ আরাম পাইতে লাগিলাম। এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল এবং এই সময়ে আমাদের মাংসের ভোজ ছয়বারের বেশী হয় নাই। কারণ সরকারী অতিথিশালা রোজ পাওয়ার কোন উপায়ই ছিল না অধিকন্তু যখন তখন এইরূপ ব্যয়সাধ্য সুস্বাদু খাদ্য বানাইতে অনেক টাকার প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য আমি অবশ্য এই কাজে কিছুই দিতে পারিতাম না কেননা আমার কাছে একটি পয়সাও ছিল না। বন্ধুকেই সমস্ত খরচা জোগাইতে হইত, কিন্তু কোথা হইতে যে সে তাহা পাইত, জানি না। তবে তাহাকে জোগাড় করিতেই হইত, কেননা আমাকে পুরা দস্তুর মাংস-খাদক বানাইয়া তোলার দিকে সে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই সে খরচ করিত। তবে তাহার তহবিলও ছিল নিশ্চয়ই সামান্য। তাই বাধ্য হইয়া আমাদের 'খানা'র সংখ্যাও কম হইতে লাগিল। আর কাজে কাজেই তাহা বহুদিন অন্তর হইত।

মায়ের কাছে মিথ্যা কথন

যেদিন এইরূপ 'খানা' খাওয়া হইত সেদিন অবশ্য বাড়ীতে আসিয়া রাত্রিবেলা খাওয়া হইত না। মা স্বভাবতই আমাকে খাইতে ডাকিতেন এবং খাইতে না চাহিলে কেন খাইব না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন। আমি অবশ্য তখন জবাব দিতাম, ক্ষুধা নাই, ভাল হজম হয় নাই। কিন্তু এই সব মিথ্যা কথা বলিতে আমার মনে যে খুব আঘাত লাগিত না এমন কথা বলিতে পারি না। একে মিথ্যা কথা তাহাও আবার মায়ের কাছে! এ কথাও অবশ্য জানিতাম যে, মা-বাবা যেদিন জানিবেন যে, আমি মাংস-খাদক হইয়াছি, সেদিন তাঁহাদের মাথায় বজ্রপাত হইবে। এই কথা মনে করিয়া আমার মনে ভয়ানক যন্ত্রনার উদ্রেক হইল। কাজেই মনে মনে ভাবিতাম, মাংস খাওয়া প্রয়োজন, এবং এই সংস্কার দেশের মধ্যে যাতে প্রচারিত হয় তাহাও করা দরকার। কিন্তু পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা করা, মাংসাহার হইতে বিরত থাকা অপেক্ষা ঢের বেশী অন্যায়। সুতরাং ঠিক করিলাম, তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন আর মাংস খাইব না। এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে আমার পক্ষে স্বাধীন-ভাবে চলা ফেরার কোন বাধাই থাকিবে না, তখন প্রকাশ্য ভাবেই মাংসহার করিব, কিন্তু সে সময় না আসা পর্য্যন্ত মাংসাহার হইতে নিবৃত্ত থাকিব। আমার এ সংকল্প বন্ধুকে জানাইলাম এবং সেদিন হইতে আর কখনো মাংস স্পর্শ করি নাই। আমার পিতামাতা কখনো জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের দুই ছেলেই মাংসাহারী হইয়াছি।

পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা না করিয়া পবিত্র ইচ্ছার বলেই আমি মাংস ত্যাগ করিলাম। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম না। তাহার চরিত্র শোধরাইবার জন্য তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব

করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি স্বয়ং ভ্রষ্ট হইতে লাগিলাম—আমার অজ্ঞাতে আমি নিজের গর্ত্তেই নিজে পড়িলাম। কিন্তু তাহা জানিতেও পারিলাম না।

বেশ্যা লয়ে

এই বন্ধুর সংসর্গ আমাকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কোনও ক্রমে রক্ষা পাইয়াছি। বন্ধু একদিন আমাকে এক পতিতালয়ে লইয়া গিয়া আবশ্যক উপদেশ দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিল। পূর্ব্বেই বন্ধু সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। টাকা পয়সাও পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছিল। আমি সেই মূর্ত্তিমান পাপের গহ্বরে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ভগবানের অসীম করুণার বলে আমি নিজেকে নিজের নিকট হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। পাপপুরিতে প্রবেশের পরই আমার অবস্থা এমন হইল যে, আমি চোখেও কিছু দেখিতে পাই না, কিছু বলিবার শক্তিও আমার লোপ পাইয়াছে। উপায়ন্তর দেখিতে না পাইয়া পতিতার পাশে তাহার খাটের উপরই বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার জিহ্বা যেন কণ্ঠতালুতে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া গেল। আমার এই ব্যাবহারে স্বভাবতই পতিতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সে আমাকে বেশ কড়া কড়া দুই চারিটি বুলি শুনাইয়া দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল। সেই সময় আমার পৌরুষ যেন বেশ আহত হইল. তাই লজ্জায় মনে হইল যে, মাটিতে মিশিয়া যাইতে পারিলে বাঁচিয়া যাই। এই ভাবে আমি রক্ষা পাওয়ায় আজীবন ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ আছি

এই প্রকার আরো চারিটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহাও আমার বেশ মনে আছে। এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই আমার নিজের চেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশত বাঁচিয়া গিয়াছি। নৈতিক বিচারে এই সমস্ত ব্যাপারকে নৈতিক অধঃপতন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কেননা ইহাতে পাশব ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট ছিল, আর ইহা ও ইহার পরিতৃপ্তি একই কথা। কিন্তু যে লোক বাসনা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ পাপের হাত হইতে নিস্তার পায়, সাধারণের ভাষায় তাহাকেই বাঁচিয়া যাওয়া বলে। এবং এই অর্থে আমি সেই প্রকার আংশিক বাঁচিয়া গিয়াছি বলিয়া মনে করিতে হইবে। কোন কোন কাজ এইরূপ আছে, যাহা হইতে বাঁচিতে পারায় যে বাঁচে তাহারও যেমন লাভ, তাহার পরিবার পরিজনেরও তেমনি লাভ। মানুষ যখন এইভাবে বাঁচিয়া যাইয়া শুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করে, তখন সে তাহা ঈশ্বরের করুণা বলিয়াই মনে করে।

ইচ্ছা না থাকিলেও যেমন মানুষের অধঃপতন হয়, ঠিক তেমনই অধঃপতনের ইচ্ছা সত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে রক্ষা পাইয়া যায়। পুরুষার্থ, না দৈব না অন্য কোন ঐশ্বরীক শক্তি আসিয়া মানবকে এইভাবে রক্ষা করে? এ একটি রহস্যময় প্রশ্ন। আজ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের কোন মীমাংসাই হয় নাই। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত হইবে কিনা, কেহ বলিতে পারে না।

যাহা বলিতেছিলাম। বন্ধুর সংসর্গ যে কতদূর অনিষ্টকর সে সম্বন্ধে এত সব ব্যাপারেও আমার চৈতন্য হইল না। কাজেই নিজের দোষে আমাকে আরো অনেক ভোগ ভুগিতে হইল। তার পর একদিন যখন আমি অকস্মাৎ তাহার কুকার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। সে কথা পর পর বলিতেছি।

এই সময়ে একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। এই সময় আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মনান্তর ঘটিত, এই বন্ধুর সংসর্গ যে এই সব কারণের একটি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বামী হিসাবে আমি যেমন স্নেহবান ছিলাম, তেমন সন্দিগ্ধও কম ছিলাম না। এবং বন্ধুবর আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে সেই সন্দেহের আগুনে বাতাস দিয়া তাহাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত। বন্ধু যে কখনো মিথ্যা বলিতে পারে এই বিশ্বাস আমার ছিল না। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, আমার সেই অপরাধ আমি কখনো ক্ষমা করিতে পারি নাই। কেবলমাত্র হিন্দু স্ত্রীই এই সব অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, আর সেই কারণেই আমি স্ত্রীলোককে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে করি। চাকরের উপর অন্যায় সন্দেহ করিলে, চাকর চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাপারে পুত্রও পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে—বন্ধু বন্ধুত্বের শেষ করিতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামীকে সন্দেহ করে তবে সে মুখ বুজিয়া থাকিবে, কিন্তু স্বামী যদি সন্দেহ করে তবে স্ত্রীর সর্ব্বনাশ! কোথায় তার স্থান? হিন্দু স্ত্রী আদালতে যাইয়া বিবাহচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করিবে না, আইনে 'তাহার' জন্য কোন প্রতীকারই নাই। আমি আমার স্ত্রীকে এইরূপ সহায়হীন করিয়াছিলাম, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি নাই এবং এই অপরাধের জন্য নিজেকে মার্জ্জনাও করিতে পারি নাই। পরে যখন আমি অহিংসার সূক্ষ্মমন্ত্রলাভে সমর্থ হইয়াছি তখন আমার এই সন্দেহ দূর হইয়াছে। তখনই আমি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। স্ত্রী আমার ক্রীতদাসী নহে—সে তাহার সহচারিণী সহধর্ম্মিনী, পরস্পর পরস্পরের দুঃখের সমানভাগী। স্বামী যেমন নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে

চলিতে পারেন, স্ত্রীরও সেইরূপ নিজের মতে চলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে! এখন যখনই আমার সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ হয় তখনই আমার মূর্খতা এবং পাশবিক নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি—আর বন্ধুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের জন্য মনে মনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হই।

অষ্টম অধ্যায়।

চৌর্য্য ও অনুশোচনা।

মাংসাহারের সময়কার এবং তাহার আগেকার আরো দুই একটি স্খলনের কথা বলিতে বাকী আছে। বিবাহের পূর্ব্বে বা অল্পকাল পরেই ঐ সব স্খলন হইয়াছিল।

আমি ও আমার জনৈক আত্মীয় ধূমপানে আশক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের পয়সা ছিল না। ধূমপান ভাল এ-কথা আমরা মনে করি নাই, সিগারেটের সুগন্ধে যে আমরা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম তাহাও নহে। মুখ হইতে ধূমপুঞ্জ বাহির করায় একটা আনন্দ আছে বলিয়া আমরা মনে করিতাম। আমার কাকার ধূমপানের অভ্যাস ছিল এবং আমরা যখন তাঁহাকে ধূমপান করিতে দেখিতাম তখন আমাদিগকেও তাঁহার অনুকরণ করিতে হইবে বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু আমাদের পয়সা ছিল না। কাকা যে সিগারেটের টুক্‌রা ফেলিয়া দিতেন, আমরা তাহা চুরি করিতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু সব সময় এই টুক্‌রা পাওয়া যাইত না। আর পাওয়া গেলেও তাহা হইতে যথেষ্ট ধূম বাহির হইত না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমরা চাকরদের হাত-খরচের পয়সা চুরি করিতে আরম্ভ করিলাম এবং তাহা দিয়া দেশী সিগারেট কিনিতাম। কিন্তু একটা মুশকিল হইল যে, সিগারেট রাখি কোথায়? বলা বাহুল্য যে, গুরুজনদের উপস্থিতিতে ত আর সিগারেট খাওয়া যায় না। যাহা হউক, চোরাই-পয়সায় সিগারেট কিনিয়া কয়েকদিন কষ্টেসৃষ্টে কাটাইলাম। একদিন শুনিতে পাইলাম যে, এক প্রকার ফাঁপা গাছ আছে, তাহা সিগারেটের মত ব্যবহার করা যায়। আমরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং তাহারই ধূমপান আরম্ভ করিয়া দিলাম।

আত্মহত্যায় বদ্ধপরিকর।

কিন্তু ইহাতে আমাদের মোটেই সুখবোধ হইল না। জীবনে স্বাধীনতার অভাব বোধে একান্ত করিয়া আমরা বেদনা পাইতে লাগিলাম। বড়দের অনুমতি ছাড়া কিছু করিতে পারিব না এ চিন্তা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমরা আত্মহত্যা সঙ্কল্প করিলাম।

কিন্তু কেমন করিয়া আত্মহত্যা করিব? বিষ কোথায় মিলিবে? শুনিয়াছিলাম ধুতুরা ভয়ানক বিষ। জঙ্গলে গিয়া ধুতুরা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। স্থির হইল যে, সন্ধ্যার সময়ই সুলগ্ন। আমরা কেদারজীর মন্দিরে গিয়া প্রদীপে ঘৃত প্রদান করিলাম, দেব দর্শন হইল। তারপর একটি নির্জ্জন কোণ খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের সাহস চলিয়া গেল। প্রশ্ন জাগিল, আচ্ছা যদি তৎক্ষণাৎ না মরি?—আর নিজেদের মারিলেই বা কি লাভ হইবে? একটু পরাধীনতাই বা কেন সহ্য করি না? যাহা হউক, আমরা দুই তিনটি বীজ খাইয়া ফেলিলাম, আর বেশী খাইতে সাহস হইল না। তাহার পর মৃত্যুর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আমরা রামজীর মন্দিরে গিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং আত্মহত্যার চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিলাম।

আত্মহত্যা করার সংকল্প করাটা যত সহজ, আসলে তাহা করা যে তত সহজ নয়—ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাই যখনই কাহাকে আত্মহত্যা করিবে বলিয়া শাসাইতে শুনি, আমার মনে এতটুকু আশঙ্কা জাগে না।

ধূমপানের অবসান।

আত্মহত্যার সংকল্পের ফলে এই দাঁড়াইল যে, আমরা উভয়েই টুকরা সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করিলাম। এবং সিগারেট খাওয়ার জন্য চাকরের পয়সা চুরি করাও পরিত্যাগ করিলাম।

বয়স হইবার পর আর আমার কখনো ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা হয় নাই এবং ধূমপানকে আমি অসভ্যতা, বিশ্রী ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিয়াছি। দুনিয়ার সর্ব্বত্র ধূমপানের আগ্রহ এত চরমে

উঠিয়াছে কেন তাহার কারণ নির্ণয় করিতে আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হই নাই। ধূমপায়ীতে পূর্ণ কোন গাড়ীতে আমি যাতায়াত করিতে পারি না, আমার যেন দম বন্ধ হইয়া আসে।

গুরুতর স্খলন ও স্বীকারোক্তি।

পরে এই চুরি অপেক্ষাও গুরুতর আর একটি অপরাধ আমি করিয়াছিলাম। বার তের বা তাহার চেয়ে কম বয়সে আমি সেই অপরাধ করি। অন্য অপরাধটি যখন করি তখন আমার বয়স পনর বৎসর। আমার মাংস-খোর দাদার "বাজু" হইতে খানিকটা সোনা চুরি করিয়াছিলাম। দাদাটি আমার প্রায় পঁচিশ টাকা ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার ছেচা সোনার একটা বাজু ছিল। তাহা হইতে খানিকটা কাটিয়া লওয়া শক্ত ছিল না।

এই সোনা চুরি করিয়া তাহার মূল্য দিয়া তাঁহার ধার পরিশোধ করিলাম। কিন্তু এ কার্য্যে যে অন্যায় হইয়াছিল তাহাও আমার কাছে অসহ্য বোধ হইল। আর কখনো চুরি করিব না শপথ করিলাম। ইহাও সঙ্কল্প করিলাম যে, বাবার কাছে অপরাধ স্বীকার করিব। কিন্তু মুখে বলিবার সাহস আমার হইল না। বাবা যে আমাকে মারিবেন তার জন্যই যে ভয় পাইয়াছিলাম, তাহা নহে। না—তিনি যে আমাদিগকে কখনো প্রহার করিয়াছেন তাহা আমার মনে পড়ে না। আমি যে তাঁহার প্রাণে বেদনার সৃষ্টি করিব ইহাই ছিল আমার ভয়ের কারণ। কিন্তু আমি ভাবিলাম, এই কথা যে তাঁহাকে বলিতেই হইবে; সম্পূর্ণ দোষ স্বীকার করা ছাড়া আত্মশুদ্ধির আর কোন উপায়ই নাই।

অতঃপর আমি স্থির করিলাম, আমার স্বীকারোক্তি কাগজে লিখিয়া পিতার নিকট দিব এবং তাঁহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব। এক টুক্‌রা কাগজে আমার অপরাধের কথা লিখিয়া তাহা তাঁহার হাতে দিলাম; তাহাতে কেবল যে অপরাধই স্বীকার করিলাম তাহাই নহে, পরন্তু কৃত অপরাধের জন্য যথাযোগ্য শাস্তিও প্রার্থনা করিলাম। শেষকালে লিখিলাম যে, আমার অপরাধের জন্য তিনি যেন নিজেকে দণ্ডিত না করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিলাম যে ভবিষ্যতে আর কখনো চুরি করিব না।

অনুতপ্ত পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতা

পিতার হাতে যখন কাগজের টুকরাখানা ধরিয়া দিলাম তখন আমি কাঁপিতেছিলাম। তিনি তখন ভগন্দর রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, একখানা খাটের সাধারণ খাটে তিনি শুইয়াছিলেন। তাঁহার হাতে চিঠিখানি দিয়া আমি খাটের অপর প্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। তিনি সেখানা পড়িলেন। এবং তাঁহার তুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু বিন্দু ঝরিয়া কাগজের টুকরাখানি সিক্ত করিয়া দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজিয়া কি ভাবিলেন। পড়িবার জন্য তিনি উঠিয়া বসিয়া ছিলেন, আবার শুইয়া পড়িলেন। আমিও কাঁদিতে ছিলাম। বাবার মনে যে কি বেদনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি যদি চিত্রী হইতাম তাহা হইলে সেই দৃশ্যের গোটা ছবি আজও অঙ্কিত করিতে পারিতাম। সেই দৃশ্য আজো আমার স্মৃতিপটে জীবন্ত রহিয়াছে।

এই প্রেমাশ্রুর মুক্তধারা আমার সকল পাপ তাপ ধুইয়া মুছিয়া আমাকে পবিত্র করিয়া তুলিল। যাহার ভাগ্যে এই স্নেহলাভ হইয়াছে, সে-ই কেবল জানে যে, ইহা কি বস্তু।

ইহা হইতেই আমি অহিংসার শিক্ষা পাইলাম। সেদিন আমি ইহাকে পিতৃস্নেহের অতিরিক্ত কিছু মনে করি নাই, কিন্তু আজ বুঝিয়াছি যে, ইহাই খাঁটি অহিংসা। এই অহিংসা যখন সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হয় তখন ইহার সংস্পর্শে যাহা আসে তাহাই পবিত্র হইয়া যায়। ইহার ক্ষমতার সীমা নাই।

এইরূপ মহান ক্ষমা পিতার স্বভাবের মধ্যে ছিল না! আমি ভাবিয়া ছিলাম তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, কটু কথা বলিবেন এবং শিরে করাঘাত করিবেন। কিন্তু দেখিলাম, তিনি আশ্চর্য্য রকম শান্ত। আমার বিশ্বাস যে, অকপটে আমার অপরাধ স্বীকার করার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। দণ্ড দিবার অধিকার যাঁহার আছে তাঁহার কাছে অকপটে অপরাধ স্বীকার করা এবং ভবিষ্যতে আর কখনো অপরাধ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়াই প্রকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। আমি জানি যে, আমার স্বীকারোক্তির ফলে তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন এবং আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ উথলিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

বিদায়।

আজ দুঃখ নিয়ে সরে থাকা
সাজেই না গো,
তাঁর চরণধূলি লুট করে নাও
মনের মাঝে।

বিদায়ের দিন এসেছে, বাঁধন ছিঁড়তেই হবে—নিয়ন্তার নির্দেশ! যাঁর কর্ম্ম,—কর্ম্মের প্রেরণা যাঁর কাছে থেকে এসেছিল,—সেই সর্ব্বময়ের ইচ্ছাই যদি হয়,—অশ্রুফোটা কুসুম দিয়ে তাঁর পূজা,—আশীর্ব্বাদ তাঁর অশ্রুআসারে—তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক তবে!

দশটী বৎসরের বাঁধন; বুঝি কত যুগের সঞ্চিত গোপন-আশা আঘাত পেয়ে আজ উদ্বেলিত ফেণিল হয়ে উঠেছে। সেই শুভ দিনে, যে দিন 'পরিচারিকার' উদ্বোধনে অনন্তের ক্ষুদ্রতম কণিকা-আমরা আনন্দময়ের আহ্বানে আত্মশক্তি বিবেচনায় না এনে লীলাময়ের লীলাস্রোতে কর্ম্মে যোগ দিয়াছিলেম,—যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল আমাদের চক্ষে মহাকর্ম্মীর বিরাট অপূর্ব্বমূর্ত্তি—কণ্ঠে জেগেছিল তাঁর ধ্যানমন্ত্র —

সুন্দর তুমি, মঙ্গল তুমি, কান্ত
সত্য তুমি হে, তুমি হে ভুবন ভূপ,
চঞ্চল তুমি, তুমি শিব, তুমি শান্ত,
তুমি অমৃত, তুমি আনন্দরূপ।

কি আনন্দ! আনন্দের আস্বাদ যে একবার পেয়েছে, তার প্রাণে নিরানন্দের ছায়া ক্ষণিক;—অমৃতের আস্বাদে মৃত অবিনশ্বর—

সঙ্কীর্ণ মনের লাজ কোথা ডুবিয়াছে আজ
কোথা শঙ্কা ভয়?

আজ তোমার বরে আপাতঃ-নিরাশায়ও নির্ভর হৃদয়।

ছোট সুখে ছোট দুখে জীবনের অভিমুখে
চলেছি সবাই,
সহসা মনের মাঝে ভূমার রাগিণী বাজে
থমকি দাঁড়াই।

অনুভব করি, কি বিরাট বিশ্ব-প্রবাহ,—লীলায়িত—কখন মন্থর,—কখন অতি দ্রুতগতি,—নিষ্ক্রিয় নহে কখনো; শেষ তার কোথায়—কিসের শেষ? অনন্তের অংশ যা অমৃত উৎসে উদ্ভব

যার— তাতে—কোথায় বেদনা কোথায় দুঃখভয়, মরণে ধ্বনিছে জীবনের জয়, যে সৃষ্টি প্রবাহে,—তার শেষ কোথায়? অন্ত কোথা? শত মৃত্যুর শক্তিতে জীবন। দান—গ্রহণ,—নব হয়ে ফুটে উঠে চির পুরাতন। দয়া-ভিক্ষা তবে কেন—কিসের এত দৈন্য!

ভিক্ষু যেথা শীর্ণদেহ
ভিক্ষা মাগি লয়
সেইখানেতে এলাম নামি
তোমার পায়ে জগৎস্বামি;
দু'হাত দিয়ে অহঙ্কারের
গর্ব্ব করি ক্ষয়।
প্রেমের লাগি ভালবাসি
পাওয়ার লাগি নয়

বঞ্চিত দুঃখ-কাতর বেদনাতাপিত প্রাণে তবু কেন প্রশ্ন জাগে আজ কেন এ দশা?—কেন কর্ম্মপ্রবাহ হতে এমন ভাবে উৎক্ষিপ্ত,—কর্ম্মগণ্ডীর বহির্ভূত হতে হল আমাদের! যে যুগে, যে দেশে প্রাণে প্রাণে বন্যাপ্রবাহ,—"আগে চল, আগে চল" যে দেশের প্রাণের ভাষা—আকুলতা, সে দেশে—পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি মন প্রাণ ধন সকলি দাও, প্রাণের প্রকৃতি—সে দেশে পরিচারিকার সেবা-পূজার আয়োজন সহসা বিনা কারণে ব্যর্থ কেন! কোচবিহার সভ্যতাসদন,—সুধীজন-শোভিত বিক্রমাদিত্যের বরেণ্য সভা হইতেও মহত্তর; বহু সৎকার্য্যের জন্য যে রাজ্য ধন্য, সে রাজ্যে সহানুভূতির এক বিন্দু উৎসারিত হ'ল না, এই সেবিকার সেবা আয়োজনে! রাজ-অনুগ্রহ-পুষ্ট হয়েও সহসা সে উৎস কেন শুষ্ক হ'ল!—অর্থের জন্য নিশ্চয় নয়। উন্নত শিক্ষার নিদর্শন সাময়িক পত্র-পত্রিকা—উন্নত রাজ্যে তা'র আবশ্যকতা নেই—এ ভাবের প্রসার কি এরাজ্যে সম্ভব! না—হ'তে পারে না তা কখনি—সে হিসাবেও পরিচারিকার ব্রত উপেক্ষনীয় নহে কিছুতেই।

তবে এমন হ'ল কেন? আমাদের অক্ষমতাই কি?—ভাল—সক্ষমের কি এমনি অসদ্ভাব! উদরান্নের সংস্থানের জন্য কঠোর শ্রমের পর সাহিত্যের সেবানন্দে আকৃষ্ট হয়ে আমরা নিয়োজিত ছিলাম, পরিচারিকার সেবায়—অযাচিত অনর্থক পরনিন্দা পরচর্চ্চার প্রশ্রয় পরিচারিকা কখন দেয় নাই,—ভীত কম্পিত শঙ্কিত প্রাণে, কর্ম্মের অসীম শক্তিতে, আনন্দে শত ঝঞ্জাবাতের মধ্যেও আপনাকে সে সজীব কর্ম্মক্ষম রেখে আত্মব্রতে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেছে। কিসে ব্যর্থতা এনে দিল কে জানে!—ব্যর্থ? যেখানে—মরণ ধ্বনিছে জীবনের জয়—যেখানে সহস্রবার বিদায় নিলে আবার ফিরে আসে—সে অমৃতের দেশে পরিচারিকার পূজার আয়োজন কখনই

ব্যর্থ হবার নয়। এ যে তুচ্ছ নয়—এ যে মহান্! এ যে জীবনের চরম ব্রত; আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ!

আমরা কে?—তুচ্ছই ত কিন্তু কার অংশ আমরা! কে করবে এর ধ্বংস—সাধ্য নাই কারও!—

এত তুচ্ছ নয় প্রাণ এত খেলা নয়
নহে অলসের ধন, বুঝিবাবে এ জীবন—
সমস্ত জীবন দান—সমস্ত হৃদয়!

আমরা সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত!—আহ্বান করি—অনুনয় করি—কে আছ কর্ম্মি! কে আছ সুধি এ সহরে—সমস্ত হৃদয় নিয়ে এস অক্ষমদের স্কন্ধ হতে এ গুরুভার গ্রহণ করে কর্ম্মপ্রবাহে ছুটে চল—অকালে আপাতঃ মরণের কোলে পরিচারিকাকে শায়িত হতে দিয়ে এ রাজ্যের—সভ্যতার নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক আরোপণ হতে দিও না।

যাঁরা এতদিন আমাদের কর্ম্মের সহায় ছিলেন—যাঁদের সাহায্য ভুলবার নয় আমরা বিদায়-মুহূর্ত্তে নতশিরে আমাদের অন্তরের পূর্ণকৃতজ্ঞতা তাঁদের জ্ঞাপন করি। আমরা বহু প্রকারে লেখক, পাঠক সাময়িকপত্রপত্রিকার সম্পাদক ও বিদেশী গ্রাহকের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা পরদেশ হ'তে যে পরিমাণে সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি কোচবিহার হতে যদি তার আংশিকও প্রাপ্ত হতেম তা'হলে পরিচারিকার আজ অকাল তিরোধান ঘটত না! জানিনা কেন—এ-রাজ্যের বড়লোক, ধনীগণের সাহিত্যে অরুচি · ২৸০ আনা বার্ষিক ব্যয় করতে অনেকেই কুণ্ঠিত, মধ্যবিত্ত ত কোন মতে জীবন রক্ষা করেন—অন্নচিন্তায় অবসন্ন,—যেটুকু সময় অবসর,—সেটুকু কাটে পরচর্চ্চায়,—অথবা পরঅনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় বৃথা স্তুতিবাদে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির মূলে যে আত্মোন্নতি,—জ্ঞানচর্চ্চা—সহিষ্ণুতা, অদম্য চেষ্টা নিহিত এ চিন্তা ভ্রমেও বারো আনার মনে উদয় হয় না.—স্তব স্তুতিতেই প্রসাদ লাভ—এই নীতি যে স্থানে সেখানে—যে তিমিরে সেই তিমিরে। অমানিশার অন্ধকার কাটবে কবে! ভিক্ষায় প্রাণ বাঁচবে না এ কথা বিস্মৃত হবার নয়,—আত্মবিস্মৃত হয়ে মোহের মৌতাতে ঝিমুলে জীবন বাঁচবে না—কর্ম্মকর—কর্ম্মী সহানুভূতির উৎস উৎসারিত কর—এমন নিষ্ঠুর, এমন বিমুখ, আত্মসর্ব্বস্ব হয়ে কর্ম্মহন্তা হয়ো না.—আজকার এ কলঙ্ক, এ অক্ষমতা একা পরিচারিকার নগণ্য সেবকসদনের নয়—তোমাদেরও—এ কথা স্মরণে রেখো!

রাজঅনুগ্রহ জীবনে উপভোগ্য সত্য—তার তিরোধান অকারণে সম্ভবে না সত্য কিন্তু তা বন্যার মত আসে না—যোগ্যের ভোগ্য তা!—রাজ্যবাসী যোগ্য হও! আমরা তোমাদের মাঝে কর্ম্মীর—শক্তিশালীর উদ্ভব কল্পনা করে—নয়নের বারি নয়নে নিবারি। নিয়ন্তার শ্রীশ্রীচরণে প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভবিষ্য আশায় বিদায় হই!